কে বা মনে রাখে

কে বা মনে রাখে

ফেরারী

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক :

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট :

সন্দীপন ভট্টাচার্য

মুদ্রক :

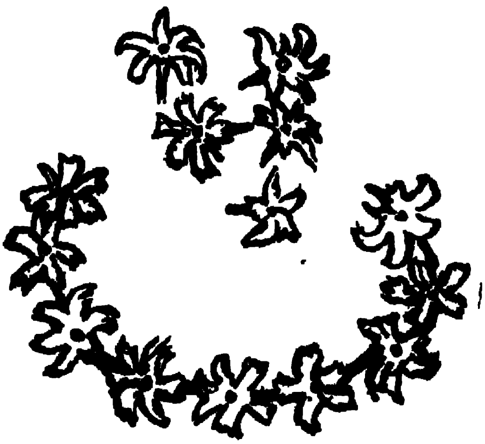
রতিকান্ত নস্কর

দীপঙ্কর প্রেস

২/১এ, আশুতোষ শীল লেন,

কলিকাতা-৯

কে বা মনে রাখে



"মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুল কে বা মনে রাখে"

উৎসর্গ

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শতসহস্র শহীদের স্মৃতির তর্পণে :

"I will ranson them from the power of the graves
I will redeem them from death."

কঠিন শীতল কবর খুঁড়ে উদ্ধার করে এনে আমি তাদের
মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবো।

কেয়ারী

—ঃ মুখবন্ধ ঃ—

'কে বা মনে রাখে'—না, কেউ মনে রাখে না !

লেখক বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের কথা বলছেন—সেই যুগের কথা যখন বাংলা বিভক্ত হয়নি। আমাদের অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যাদের জন্ম—শৈশব এবং যৌবন, কেটেছে তাঁদের সাহচর্যে।

যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে ওঁরা দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন জাতীয় চরিত্রে তার মূল্যই সর্বাধিক। স্বাধীনতা-উত্তর-কালে সেই প্রতিজ্ঞা হারিয়ে গেছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে গান্ধী আন্দোলনকে বড় করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে ছোট করা কোন কোন অবাঙালী ঐতিহাসিকদের বিশেষ প্রবণতা—অথচ গান্ধী-পূর্ব ভারতবর্ষের সব নেতাই সন্ত্রাসবাদ সমর্থক। গান্ধীজীর আবির্ভাব ১৯২০-তে। ঐ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন "লাল-বাল-পাল"।—পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল। এঁরা সকলেই সন্ত্রাসবাদ সমর্থক ছিলেন।

১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয়। এঁরা ছিলেন তিলকের শিষ্য। তা ছাড়া বাংলায় প্রথম যুগে যাঁদের ফাঁসী হয়—ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন, ওঁরাও ছিলেন হয়ত তিলকেরই অনুগামী। মাণিকতলা মামলার পর অরবিন্দের নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন বিপিন চন্দ্র পাল। অতবড় পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে বিরল। পরবর্তী কালে যুগান্তর দলের প্রধান, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (মধুদা) আমাকে বলেছিলেন বিপিন পালই ওঁর মন্ত্র-দাতা।

সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে অনেক বই আছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কার্যকলাপের কাহিনী নেই। 'কে বা মনে রাখে' পুস্তকের গ্রন্থকার 'ফেরারী' সে অভাব মিটিয়েছেন। এক বিশেষ উপদলের ক্রিয়াকর্মের সমগ্র কাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। উপদল বলছি এই জন্ত যে দু'টি প্রধান দল—অনুশীলন যুগান্তর। সবই জেলা-ভিত্তিক উপদলে বিভক্ত।

লেখক তাঁর পুস্তকের নায়ক-নায়িকার আসল নাম প্রকাশ করেন নি—সবাই ছদ্মনাম। স্থান নির্দেশও নেই। তবে পুস্তকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঘটনা-

প্রবাহ—লুণ্ঠন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চিত্র থেকে ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে পূর্ব বাঙলার পার্বত্যনদী বিধৌতা এক শৈলনগরী ও তার আশ-পাশে অবস্থিত পর্বত ও অরণ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনীতে তার নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।'

লেখক বাল্যকাল থেকেই সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত। তিনি তাঁর কাহিনীকে 'উপন্যাস' আখ্যা দিয়েছেন। 'দুটি পার্শ্ব চরিত্রে প্রণয় কাহিনী স্থান পেয়েছে—তবে অত্যন্ত সংযত। রচনায় চরিত্রগুলির প্রকৃত পরিচয় উপস্থিত থাকলেই ঐতিহাসিক আখ্যান বলা যায়। তবে ইংরেজিতে যাকে বলে "Blood and Thunder Tragedy" এই রচনায় সেই Tragedy-র গুণ পুরোমাত্রায় বর্তমান।

সত্যপ্রসন্ন

। নিবেদন ।

বাংলার বিপ্লবীদের স্বদেশ প্রেম এবং স্বাধীনতার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এসেছে আঘাতের পর আঘাত, পরাজয়ের পর পরাজয়। তারই মাঝে নিঃশঙ্কচিত্তে ঈপ্সিত লক্ষ্যে মনের আনন্দে চলেছে তাদের এগিয়ে চলা। অপরাজেয় তাদের শক্তি অকল্পনীয় তাদের শৌর্য বীর্য আত্মোৎসর্গের কাহিনী।

কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর চলার পথে অকথিত অভাবিত তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রেমঃপ্রীতি ভালবাসার আখ্যান—বহু যত্নে, শ্রমে ও সাধনায় দিনান্তে-নিশান্তে চয়ন করা মালাখানি—তবু, মালিকা পড়িলে গলে প্রতি ফুল কে বা মনে রাখে!

এই গ্রন্থ রচনাতে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত সঞ্জীব দত্ত স্মরণীয়।

লেখক

পূর্বাভাষ

ঘটনা পরিবেশনে কল্পনার খাদ না মিশালে চিত্তাকর্ষক হয় না, মন ভরে না। যে ঘটনা সুদূর অতীতে এককালে ঘটেছিলো তাকে নানা রঙে রঞ্জিত, নানা রসে সিক্ত ও পরিপুষ্ট, নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত আর নানা রূপে পরিস্ফুট করে তুলতে হয়। তবেই না তা মানুষের মন রাঙিয়ে তোলে।

সকল দেশের আদিগল্প হলো রূপকথা। তার কুশীলবরা সকলেই অসাধারণ। জল স্থল পাতাল অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাদের অবারিত অবাধ গতি। ঘটনা প্রবাহও তেমনি আকস্মিক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। অচিন দেশের অজানা রাজার রূপবতী কেশবতী কন্যার কথা মনকে অভূতপূর্ব রহস্য আর রোমাঞ্চের স্বপ্ন জালে আচ্ছন্ন করে। গল্প লোক তখন রূপান্তরিত হয় কল্পলোকে। তাই তার আকর্ষণ সর্বকালে সর্বলোকে আর সর্বদেশে।

অপরিচয়ের দূরত্ব মনের গতি রুদ্ধ করতে পারেনা। মন তখন কল্পনার দড়বড়ি পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ি সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে পাতাল পুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে লক্ষহীরা মাণিক দেশের উদ্দেশে ছুটে চলে। দেশকাল পরিচিতির বালাই নেই ভূগোল ইতিহাসের বন্ধন নেই—শুধু ছুটে চলো।

মহাভারতের বায়ুর ঔরস-জাত কুন্তীর নন্দন মধ্যম পাণ্ডব অমিত বলশালী মহাকায় বৃকোদর ভীম কুরুক্ষেত্রের বিধ্বংসী যুদ্ধ শেষে ধৃতরাষ্ট্র তনয় কুরুপ্রধান দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করে উরুভঙ্গ করে নিধন করেছিল। মহাভারতের পাঠকমাত্রই জানি

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা পাঠ করেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে গদাপাণি ভীমকায় যোদ্ধৃদ্বয়ের সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের আখ্যানভাগের চমৎকারিত্বে তারা বিমুগ্ধ। দ্বৈপায়ন হ্রদের অবস্থিতি নিয়ে তারা মাথা ঘামান না আর মহাভারতকারও দ্বৈপায়ন কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে না সুদূর সাইবেরিয়াতে ভৌগোলিক মাপকাঠিতে তা যাচাই করেন নি। তাঁর উপাখ্যানে সে প্রয়োজন আদৌ অনুভূত হয়নি। কারণ কুরুক্ষেত্র ও দ্বৈপায়নের দূরত্ব দুরধিগম্যতা তার রচনায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি।

একালে যে তরুণ তরুণী আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর তীরে প্রেম নিবেদনে রত কাল তাদের পক্ষে সুদূর কাশ্মীরে ডাল নাগিনের পদ্মবনে শিকারা বিহারে মধুযামিনী যাপন অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সেকালে যানবাহনের শ্লথগতি জল স্থল অন্তরীক্ষের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে একমাত্র কাহিনীর অতুলনীয় রম্য রচনা সম্ভার আর কল্পনার ঐশ্বর্য দূরকে নিকট আর অপরিচিতকে করেছে আপন।

এযুগ একান্ত বাস্তবধর্মী। গল্প সৃষ্টির জন্য যে রহস্যময় দুরধিগম্য পরিবেশ ও কল্পনাশ্রয়ী মনোভাবের প্রয়োজন তা বিরল। পাঠক ও শ্রোতার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে ঘটনার যে চমৎকারিত্বের দরকার বাস্তবের সংস্পর্শে তা লঘু হয়ে যায়। নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দেয়।

সুদূর অতীতের কথা নয়—স্মৃতিকে করতে হবেনা মন্থন। বর্তমান শতকের তিরিশ দশকের এক স্মরণীয় মহান গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা রক্তাক্ষরে ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের পাতায় লেখা। যার তুলনা মেলে লাল রুশ, শ্যাম, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, আলজিরিয়ান বিপ্লবীদের বিস্ময়কর নানা ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে আর অধুনা কিউবায় কাস্ট্রোর অভ্যুত্থানে। সে অদ্ভুত বীরত্বব্যঞ্জক রোমহর্ষ অতবড় ঘটনার লিখন পরাধীন ভারতের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় সন্ধান পেলেও ব্রিটিশোত্তর যুগের স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তা এতই স্বল্প বিবৃত ও অবহেলিত যে খুঁজে পাওয়াই ভার। দেশের স্বাধীনতা লাভের মহান ব্রত উদ্‌যাপনে যাঁদের

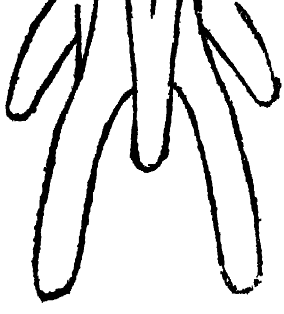
অতুলনীয় মরণজয়ী বীরত্ব, আত্মদান, অদ্ভুত কলাকৌশল-পূর্ণ বিপ্লব কর্মকাণ্ড আর সর্বোপরি চরম শৃঙ্খলাবোধ গানে গাথায় কীর্তিত হয়ে স্বাধীন ভারতের যুবক যুবতীদের চরিত্রগঠন ও আদর্শের খোরাক যোগাতে এবং দেশহিতব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে পারতো তারা উপেক্ষিত অবহেলিত অবজ্ঞাত ও ইতিহাসের আবর্জনা-স্তূপে নিক্ষিপ্ত। চলেছে বাঘা রঙীন উত্তরীয়ের আড়ালে ভুঁইফোঁর জনদরদীদের পালা কেত্তন।

হায় ইতিহাস! কে বলে সে সত্যাশ্রয়ী!! যুগযুগ ধরে এভাবেই বুঝি ইতিহাস শাসকের মর্জিমাফিক আর ফরমায়েশ মতো তৈরি হয়ে আসছে! সত্যের সঙ্গে প্রচুর খাদ মিশ্রিত যে বিকৃত বিবৃতি তৈরি হয় তারই জয়গান আর ঢক্কানিনাদে চতুর্দিক মুখরিত। একই ইতিহাস এক শাসকের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে লিখিত হয়ে তার নির্ভেজালত্ব প্রমাণের জন্য নতুন শাসকবর্গ ইনিয়ে বিনিয়ে কত যুক্তিরই না অবতারণা করেছে আর আপ্তবাক্য উদ্ধৃতি করে পূর্ব ইতিহাস নস্যাৎ করেছে! সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে পেটোয়া কাক চিলের সমবেত ঐক্যতান কোলাহলে আকাশ বাতাস তোলপাড়!

বর্তমান শতকের লাল রুশের ইতিহাস অনুরূপ ঘটনার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। জোশেফ ভিসারিয়নোভিচ্ স্টালিন এককালে রাশিয়ার হর্তকর্তা বিধাতা বলে গণ্য ও মহামানবরূপে পূজিত হয়ে এসেছেন। তাঁকে ভিন্ন এই শতকের লাল রুশের আধুনিক ইতিহাস—ভালো মন্দ, কীর্তি কুকীর্তি অনেক কিছুই বাদ পড়ে, এমন কি বর্তমান রাশিয়াকেও কল্পনা করা কষ্ট সাধ্য। যে স্টালিনকে সারা পৃথিবীর লাল যোদ্ধৃবর্গ ও সমাজ গণতন্ত্রীরা নিপীড়িত জনগণের একমাত্র ত্রাতা, মুক্তির দিশারী, সর্বদেশের সর্বহারাদের আশ্রয়স্থল মনে করে তাঁর অর্চনা ও গুণকীর্তন করেছেন তিনিই কিনা রাশিয়ায় ক্রুশ্চভ রাজত্বে বিংশতি কংগ্রেসে এক মসীলিপ্ত কালো-দৈত্য রূপে চিত্রিত হয়ে ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হলেন! অনতিবিলম্বে দেশের বীরপুঙ্গব লাল যোদ্ধৃবর্গ যাত্রাগানের ভীমের মতো লম্ফঝম্ফ দিয়ে গদা ঘুরিয়ে দুর্যোধন নিধন পালা আরম্ভ করলেন। এককালে যাঁরা স্টালিনকে পিতৃ সম্বোধনে গর্ব বোধ করতেন তাঁরাই

তাকে জাহান্নামের ভ্রাতা বলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে কণ্ঠা বোধ করতেন না। হায় ইতিহাস !!

তাতেও শান্ত হলো না রাজ-রোষ। "Never Disturb the Dead" মৃতদের কবর ঘেঁটোনা—আপ্তবাক্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্টালিনকে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক বিপ্লবী সন্তানকে, রুশ জনগণের শ্রদ্ধেয় নেতাকে তাদেরই সম্মুখে তাঁর শেষ শয্যা থেকে তুলে এক অখ্যাত অবজ্ঞাত স্থানে কবর দিলে তাঁর শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্য ! যার তুলনা মেলে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের উমেয়া আর আব্বাসী বংশের ঝগড়া কাজিয়ার মধ্যে। আব্বাসী বংশের হাসিমরা তখন উমেয়া বংশের খালিফদের কংকাল কবর থেকে তুলে তাদের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দামাস্কাসের মরুভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বর্বর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে ! হায় ইতিহাস !!!



তখন জোড়-বাংলা। সেই এক যে ছিল সোনার বাংলার ছোট্ট এক শহর—পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তার বুকের ওপর ঢেউ খেলানো উঁচু ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়। তাদের শীর্ষদেশে বাড়িগুলি দেখতে ছবির মতো সুন্দর সুসজ্জিত। কোনোটায় কোর্টকাচারী, কোনোটায় জেলখানা, কোনোটায় হাসপাতাল, কোনো কোনোটায় সাহেব সুবাদের গীর্জা, ক্লাব বা বড় বড় বাংলো। লাল মাটির রাস্তা আবর্জনা-বিহীন ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার পাশে উভয় দিকে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাতে গুচ্ছগুচ্ছ রাশি রাশি লাল ফুলের মাতামাতি। তাদের দেখন-হাসিতে আকাশ জুড়ে যেন লাল আবিরের ছড়াছড়ি। প্রত্যূষে পাতলা কুয়াশার আবরণে আর প্রদোষে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিমিলি আলো আঁধারে দূর থেকে দেখে মনে হয় এক স্বপনপুরী।

একপাশে খরস্রোতা পার্বত্য নদী। প্রবল গতিতে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে নানা ছন্দে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলে অদূরে সাগরে মিলায়েছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাইনে তাকালে দূরে এক পোতাশ্রয় দৃষ্টিগোচর হয়। সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজের উত্তুঙ্গ মাস্তুল আর শ্বেত বিন্দুর মতো অসংখ্য উড্ডীয়মান গাংচিল নীল আকাশের পটে আঁকা ছবির মতো দেখায়। নদীর বুকে অসংখ্য ছোট বড় নানা আকারের নানা রঙ-এর নৌকা—যেন বিচিত্র নৌকার মিছিল। কোনটা পাল তুলে, কোনটা দাঁড় বেয়ে আর কোনটা বা স্রোতের টানে এমনি ছুটে চলেছে। মাঝি শুধু পিছনে হাল ধরে বসে আছে। দু-দাঁড় সামপানের মাঝি উচ্চ কণ্ঠে গন্তব্যস্থল ঘোষণা করে যাত্রীদের আহ্বান করছে। ওপার থেকে যাত্রী নিয়ে এপারে ভিড়ছে। আবার এপাড় থেকে যাত্রী নিয়ে ওপার করছে। অবিরাম এভাবেই চলেছে পারাপারের স্রোত।

শহরের অন্য এক প্রান্তে ফৌজি পুলিশ পল্টনের কুচকাওয়াজ আর চাঁদমারির মাঠ। আরও কিছু দূর গেলে দেখা যায় ছোট্ট টিলার উপর প্রসিদ্ধ এক দেবীর মন্দির, একপাশে প্রশস্ত রাজপথ দূরবর্তী পাহাড় অবধি বিস্তৃত। শিকারের সন্ধানে দিশী বিলেতি সাহেব মেমদের আনাগোনা

হামেশাই চোখে পড়ে। রাস্তার এক ধারটা ঢালু হয়ে অনেক দূরে নালা পর্যন্ত প্রসারিত। মাঝে মাঝে বাড়িঘর, দালান কোঠা, ঝোপঝাড় ফল ফুলের গাছ—নিবিড় ছায়া ঘন। নানা পাখীর কূজনে দিন রাত মুখরিত —রাস্তাই যেন এক নন্দন কানন!

নালার আশপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে গভীর বন—একেবারে জন মনুষ্যহীন। ঝোপঝাড় ভেঙে নালার কিনারে পৌঁছলে দেখা যায় ছোট বড় নানা আকারের পাথর। চতুর্দিকে বুনো লতাপাতা ঘেরা—প্রকৃতি যেন নিপুণ হাতে সুন্দর সুন্দর কুঞ্জবন তৈরী করে রেখেছে। দিনের বেলাতেই এদিকে লোকজন বড় একটা আসে না বা আসতে চায় না। রাত্রিবেলার তো কথাই নেই। সাপখোপ ইত্যাদি নানা বিষাক্ত কীটপতঙ্গ তো আছেই সেই সঙ্গে আছে অশরীরী ভূত পেত্নীর ভয়-ভীতিকর নানা রহস্যপূর্ণ কাহিনী ও কিংবদন্তী। এসব ডরভয় উপেক্ষা করতে পারলে স্থানটা প্রকৃতই চোর ডাকাত, প্রেমিক-প্রেমিকার এবং গুপ্ত আড্ডার স্বর্গ। হতাশ প্রেমের যবনিকাপাত—বিষভক্ষণে কিংবা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা এখানে হামেশাই ঘটে থাকে। একবার কোতোয়ালীর পুলিশ কিছু দিন পূর্বেকার রহস্যাবৃত এক খুনের সূত্রানুসন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঝোপের আড়ালে অস্বাভাবিক অবস্থায় এক জোড়া তরুণ-তরুণীর মৃতদেহ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে বিমূঢ়! উভয়ের দেহের শ্লথ বিস্রস্ত অবস্থা বহু দুষ্কর্মে বিচক্ষণ তৎকালীন খ্যাত ও কুখ্যাত পুলিশের কাছেও অভাবিত এবং অদৃষ্টপূর্বে। মৃতদেহ এতদূর বিকৃত হয়েছিল যে তা সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। পুলিশ সারা কোতোয়ালী এবং আশেপাশের থানাগুলির নিখোঁজের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলো কিন্তু কোন সন্ধান সূত্র মিললো না। কিছুদিন পূর্বে চাঁদমারী মাঠের অদূরে পাহাড়ের ধারে ঝোপের মধ্যে প্রাপ্ত পশুপক্ষীর ভুক্তাবশিষ্ট ব্যক্তির লাশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তাও পুলিশ হদিশ করতে পারলো না। কেননা ঐ লাশ সম্পর্কে পুলিশের উঁচু মহল সম্পূর্ণ নীরব। অতঃপর ঘটনার সংক্ষিপ্তসার সংবাদপত্রে এবং থানায় থানায় টাঙিয়ে দেওয়া হলো। কেউ এগিয়ে এলো না। কোনোখান থেকে সাড়া মিললো না। ইতিমধ্যে শবব্যবচ্ছেদের বিবরণ পুলিশের গোচরে এলো—মৃত্যু বিষপান জনিত। মরীয়া হয়ে পুলিশ স্কুল কলেজ হোস্টেল, মেস বোর্ডিং খোঁজাখুঁজি করলো। ফল হলো না। দাবীদারের অভাবে

যুবকের পরিচয় চিরকালের মতো পুলিশের অগোচর এবং তাদের মৃত্যু কাহিনী আত্মজনের অজ্ঞাত ও ঘোর যবনিকা অন্তরালে রয়ে গেল।

ঘটনার পরিসমাপ্তি দৃশ্যতঃ এভাবেই ঘটলো। কিন্তু জীবনের রঙ্গমঞ্চে এই দুই নটনটীর বেদনা-বিধুর অশ্রুসজল বিয়োগান্ত দৃশ্যের একমাত্র নীরব সাক্ষী হয়ে রইল অনন্ত আকাশের শতকোটী যোজন ঊর্ধ্বে বিরাজমান নক্ষত্ররাজি যারা যুগযুগ ধরে বিনিদ্র নয়নে অহোরাত্র অকম্পিত দৃষ্টি মেলে এই বিশাল ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে আছে। অপরিণত দুই তরুণ তরুণী অকাল কুসুমের মতো ঝড়ে পড়লো। জীবনের শোধবোধ দেনা পাওনা এক ভয়াল পরিণতি পেল। সে আর এক অভাবিত বিচিত্র করুণ কাহিনী!

ভয় ভীতিকর এই অঞ্চলে পুলিশ, খুনে ও আত্মহত্যাকারী ভিন্ন আর এক দলেরও যাতায়াত ছিল। তারা নগরের এবং আশপাশ গঞ্জ গ্রামের যুবক যুবতী। তাদের প্রাণে না ছিল ডরভয় না ছিল শঙ্কা—জীবন মৃত্যু তাদের পায়ের ভৃত্য। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অনলস সাধনা, অদ্ভুত কর্ম-দক্ষতা, চরম শৃঙ্খলাবোধ, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, উদ্দেশ্য সাধনে স্থির-প্রতিজ্ঞ, দলীয় আদেশ অনুশাসন পালনে দ্বিধাহীনতা প্রভৃতি গুণাবলী এদের ইস্পাত-দৃঢ় করে তুলেছিল। এরা বিপ্লবী— সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা দেশের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে গোপন সলাপরামর্শ সভা সমিতি ইত্যাদির জন্য লোক চলাচলের বহির্দেশে লোকলোচনের অন্তরালে এখানে মাঝে মাঝে সম্মিলিত হতো।

দিন-দুপুরে কিংবা রাত্রির অন্ধকারে এদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেত। তাদের গুপ্ত আড্ডার স্থান নির্ণয়, আলোচনার বিষয়সূচি ও সলাপরামর্শ এমন গোপন কঠিন লৌহ যবনিকার অন্তরালে হতো যে কাক পক্ষীটিও টের পেতো না। পুলিশ এদের পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরেও কিছু হদিশ করতে পারতো না।

বিপ্লবীদের মিলিত হবার পন্থা ও পদ্ধতি ছিল অতি অভিনব ও বিচিত্র। নানা পশুপক্ষীর স্বর অনুকরণ ও অনুসরণ করে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে তাদের আগমন ও নিষ্ক্রমণ ঘটতো এবং আপৎকালে অন্তর্ধান বাঞ্ছিত হতো। পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর নকল করবার দক্ষতা ছিল তাদের অসাধারণ।

নিদাঘ-তপ্ত পৃথিবী দ্বিপ্রহরে যখন নিঝুম, নিথর নিস্তব্ধ—গাছের

পাঁচটা পর্যন্ত নড়ে না, শাখায় শাখায় পাখীরা বসে ঝিমোয় তখন হঠাৎ উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে ঘুঘু পাখী করুণ কণ্ঠে ডাকতে থাকে। পর মুহূর্তে দূরে অন্য কোনখান থেকে ভেসে অনুরূপ কণ্ঠস্বর। উভয় কণ্ঠ এক সুরে কিছুক্ষণ চলার পর বউকথাকও বলে একটা পাখী যেন এধার থেকে ওধারে উড়ে যায়। সব ঠিক প্ল্যান মাফিক উৎরে যায়। জমায়েত হলো শেষ, মন্ত্রণা হলো শুরু।

কর্মব্যস্ত পৃথিবী দিনের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে কালো আঁচল মুড়ি দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ। আকাশে তারার আলোর ঝিকিমিকি। ঝোপে ঝাড়ে বৃক্ষপত্রে জোনাকির চিকমিকি। গভীর অন্ধকার মথিত করে অকস্মাৎ কতগুলো পেঁচার কর্কশ কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভেলকিবাজির মতো এদিক ওদিক থেকে যুবকদের আবির্ভাব। প্রত্যেকের হাতে ছোট ছোট টর্চ। নিম্ন কণ্ঠে একে একে দলীয় কোড নাম্বার উচ্চারণ করে আপন আপন পরিচয়-দাখিল। এভাবেই জমতো গুপ্ত আড্ডা—চলতো গোপন সলাপরামর্শ।

সে যুগে নানা দলে বিভক্ত বিপ্লবীদের মধ্যে এরা স্বকীয়তায় সারা দেশে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। পুলিশ গুপ্তচরদের শ্যেন-দৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার তাগিদে তারাও নানা ফন্দিফিকির অবলম্বন করতো। তা ছাড়া সরকারি গোয়েন্দাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা খোঁজ খবর রাখা ও তাদের কার্যকলাপের ওপর খবরদারী করবার জন্য এদেরও পুলিশের অনুরূপ একটা গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। কিছু নির্বাচিত সদস্যদের ঐ কাজে নিয়োগ করে শিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলা হতো। যে দিন দলের গুপ্ত সভা সমিতি ও সলাপরামর্শের তারিখ নির্ধারিত হতো সেদিন ঐ বিভাগীয় সভ্যরা কর্ম-তৎপর হয়ে উঠতো। নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত স্থানে যথাসময়ে জমায়েত হবার পূর্ব থেকেই তারা লোকলোচনের অন্তরালে থেকে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। দলের সভ্যদের তত্ত্বতল্লাশ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত কর্মীদেরও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও ছিল এদের ওপর ন্যস্ত।

দলের মধ্যে এই গুপ্ত সন্ধানকারী কে বা কারা তা একমাত্র দল-প্রধান ব্যতীত কেউ জানে না। এদেরই কর্ম কুশলতায় একবার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আশু বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সে বিবরণ যেমনি রোমহর্ষক তেমনি চমকপ্রদ।

অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে অতি সংগোপনে তড়িঘড়ি এক বৈঠক ডাকা হয়েছে। বাইরে থেকে আগত এবং সদ্য জেল-মুক্ত বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় কয়েকজন তাতে উপস্থিত থাকবেন।

শীতের অন্ধ তিমির নিশি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ নিথর, মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর কর্কশ কণ্ঠস্বর আর গাছের শুকনো পাতা ঝরার শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রুতিগোচর নয়। হুহু করে উত্তুরে বাতাস বইছে। শরীরে যেন চাবুক বিঁধছে। রজনী একখানা মোটা ঘন কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে বুঝি ঠক ঠক করে কাঁপছে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত ঠাহর হয় না।

দলের সন্ধানীরা বৈঠকের জায়গা থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে উৎকর্ণ হয়ে চতুর্দিক ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। রাত্রি কত তা অনুমান করে নির্ধারণ করা ভিন্ন উপায় নেই। টর্চের আলোতে হাত-ঘড়ি দেখা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। অনুমিত সময়ের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী এতক্ষণে বৈঠক শুরুর সঙ্কেতধ্বনি হওয়া উচিত। তবে কি পুলিশ তাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে? কিন্তু তাও বা কি করে সম্ভব! গত কয়েকদিন যাবৎ তারা সকল প্রকার গোপনতা সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করেছে। সন্ধানীদের প্রতীক্ষা ক্রমে বিষম উৎকণ্ঠায় পরিণত হলো!

অকস্মাৎ নিঃসীম নিশ্ছিদ্র নিথর অন্ধকার চিড়ে বৃক্ষ-কোটরস্থ তক্ষকের ভয় ভীতিকর রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সন্ধানীদের সকল চিন্তা ভাবনা ও প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু, ও কি! ও কিসের শব্দ! শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্মরে যেন ত্রস্ত লঘু পদ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। না কি, মনের ভুল! না, তাও তো নয়। অতি সন্তর্পণে শিকারী শ্বাপদের মতো শুকনো গাছের পাতা মাড়িয়ে কারা যেন এগোচ্ছে। তারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত! শব্দ আরো স্পষ্ট আরও কাছে! নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা! এই দুর্গম অঞ্চলে শীতকাঁপুনে গভীর রাত্রে পুলিশ ভিন্ন আর কে হতে পারে? দারুণ উত্তেজনা অনুভূত হয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবার উদগ্র বাসনা জাগে। কিন্তু দলের কঠোর নির্দেশ—একান্ত প্রাণের দায় ভিন্ন পুলিশের মুখোমুখি কিংবা তাদের 'কণ্ঠ পাকড়ি' জড়াজড়ি কদাপি নয়।

আত্মসংবরণ করে তারা নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে শুরু করে। চলতে চলতে আচম্বিতেই তা স্তব্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণেই আবা–

তৰ্ক হয়। এই ক্ষণে চলা ও না-চলার কারণ বোধ হয় তাদের দিক-ভ্রম! না কি কোন সংকেতের অপেক্ষা? কোন সূত্রে পুলিশ হয়তো জেনেছে এই রাত্রে জংগলের মধ্যে বিপ্লবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসছে। তবে ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঠিক কোনখানে সে ধারণা তাদের পরিষ্কার নয়। সেজন্য তাদের লক্ষ্য অনিশ্চিত, গতি শ্লথ। এ ভাবেই চলমান খশ্‌খশ্‌ শব্দ বৈঠকের ভিতরকার চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ে! আর তো অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। এই গোয়েন্দাদের পশ্চাতে অবশ্যই পুলিশ বাহিনী রয়েছে। এদের সংকেত পাওয়া মাত্রই তারা চতুর্দিক ঘিরে ফেলে দলের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে! সুতরাং সকলকে শত্রুপক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে সাবধান করে দিতে হয়। অন্যথা মারাত্মক আশু বিপদের সম্ভাবনা! অতএব "সর্বনাশে সমুৎপন্নে" ধ্বনি ঘোষিত হলো। শীতার্ত রাত্রিব গভীর নীরবতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ শেয়াল ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে দূরে সারমেয়র চীৎকার শোনা গেল। সভা ভঙ্গ করে সকলে গা ঢাকা দিলো।

সে-রাত্রিতে অকস্মাৎ সভা ভঙ্গ যেন বিনা-মেঘে নিদারুণ এক অশনি সম্পাত। দলের শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসের ভিতে চিড় ধরানো-এক কঠিন আঘাত। নেতারা উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত। মন সন্দেহের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। দলের গুপ্ত শাখার প্রধানের বিবরণেও তার আভাস রয়েছে। বিশেষ বিশেষ সভ্য ব্যতীত গোপন বৈঠকের খবর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। খুবই এক জরুরী কর্মসূচী গৃহীত হবার কথা—কিন্তু সব ভেস্তে গেল!

দেশের পরিস্থিতি তখন গভীর সংকটপূর্ণ। উত্তর প্রদেশে গোরখপুরের সন্নিকটে চৌরী চৌবার মর্মান্তিক ঘটনা, বোম্বাইয়ের হত্যাকাণ্ড, মাদ্রাজে ব্রিটিশ যুবরাজের আগমন উপলক্ষে প্রচণ্ড হিংসার বাতাবরণ সারাদেশে বাড়বানলের মত ছড়িয়ে পড়াব আশংকা গান্ধিজীকে ভাবিয়ে তোলে। ফলে অসহযোগ ও গণসত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাময়িক কিংবা আংশিক বিরতি বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন, সংখ্যালঘু সংরক্ষণ ইত্যাদি আলোচনা আসলে শাসককুলের এক কূট-কৌশল-চাল আর কালহরণের অছিলা মাত্র। তারা একমাত্র রক্ত চক্ষুকেই ভয় করে, বিশেষ করে তার পেছনে যদি অস্ত্রের

ঝনৎকার শুনতে পায়। ভিক্ষারঝুলি হাতে নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, তা ছিনিয়ে আনতে হয়। সুতরাং বিপ্লবীদের সংগ্রামে এই বৈঠকের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কার হঠকারিতায় তা পণ্ড হলো! কে সেই ধূর্ত বিশ্বাসঘাতক যে পুলিশের কানে খবর পৌঁছে দিয়ে তাদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল? যার ইংগিতে এটা ঘটেছে সে দলের সাধারণ সভ্য নয়। দলের বিশিষ্ট সভ্য সেই দুষ্ট ব্রণকে নির্মূল না করা পর্যন্ত গোপন সলা পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সীমিত করা হলো।



"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—বলহীনের সিদ্ধিলাভ হয় না। বিপ্লবের মূল শক্তি—সংগঠন। ঐ সংগঠনী শক্তির সঙ্গে অস্ত্রবলের সমন্বয় সাধনেই রক্তাক্ত বিপ্লব সম্ভব এবং তার ফল সুদূরপ্রসারী। অসংগঠিত ও অস্ত্রবল-হীন বিপ্লব এক শোচনীয় ব্যর্থতা ও করুণ তামাশায় পর্যবসিত! ইতিহাসে এর ভূরিভূরি নিদর্শন বিদ্যমান।

সংগঠন সঠিক ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অস্ত্র? তা তো চাওয়া মাত্রই পাওয়া যায় না। তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সরকারের কঠিন অস্ত্র আইনের বেড়া ডিঙিয়ে, গুপ্তচরদের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে ও তাদের পাতা ফাঁদ কাটিয়ে তা যোগাড় করতে হয়। এমন বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডে যারা ঘুরে বেড়াতো তাদের খবর—দু'খানা বিদেশী জাহাজ শীঘ্রই এসে জেটিতে ভিড়ছে। ঐ জাহাজের মাঝিমাল্লার নিকট অস্ত্র পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

অস্ত্র শস্ত্র কেনা বেচার গোপন হাটে সাদা কালো পীত ইত্যাদি নানা রঙের, নানা জাতের কত অদ্ভুত রকম লোকের যে আনাগোনা তার ইয়ত্তা নেই। ও এক আলাদা দুনিয়া—ঠগি বর্গির রাজত্ব। হত্যা, রাহাজানি, লুণ্ঠন, অপহরণ ইত্যাদি এমন কোনো অপকর্ম নেই যা এখানে না ঘটে! এই অপরাধীর স্বর্গে কি ভাবে কত হাত ঘুরে যে ঐ ঈপ্সিত দ্রব্য হস্তগত হয় তা যেমনি রোমহর্ষক তেমনি বিচিত্র। বহু বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে অনেক ঘাট ঘুরে হাত বাড়িয়ে ধরবার মুহূর্তে যেমনি তা ফসকে যায়, তেমনি

পাওয়া গেলে তার জন্য যে নগদ পণ দিতে হয় তাও একেবারে আকাশ-ছোঁয়া।

বিপ্লবীদের সে পরিমাণ অর্থ কোথায়। এদিকে তো ভাঁড়ে ভবানী! স্বেচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান, মুষ্টি ভিক্ষা আর সভ্যদের দেয় চাঁদা থেকে তাদের ভাঁড়ে যে অর্থ আসে তা দৈনন্দিন খরচ যোগাতেই খালি হয়ে যায়। কংগ্রেসীরা যখন শিল্পপতি ও বিত্তশালীদের অর্থ ও আশীর্বাদে পরিপুষ্ট বিপ্লবীরা তখন তাদের নিকট অচ্ছুৎ ও তিরস্কৃত। সুতরাং অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় কী? বিলম্বে শত বিঘ্ন—কার্যহানি। এমন সুযোগ হয়ত আর শীঘ্র আসবে না। সময় দ্রুত গতিতে বয়ে যাচ্ছে। অর্থ চাই—যে করেই হোক তা যোগাড় করতেই হবে।

সে-যুগে ব্যাঙ্ক থাকলেও টাকা লেনদেন-এর ব্যাপাবে সরকার ও জন-জীবনেব সঙ্গে তাদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। সুতরাং বিপ্লবীদের অর্থ সংগ্রহের অনুমোদিত কর্মসূচীর মধ্যে সবকারী খাজনাখানা, ডাকঘর ও ডাক লুণ্ঠন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বিত্তশালী খয়েব খাঁ যাবা বিপ্লবীদের অচ্ছুৎ মনে করতেন এবং তাদের সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করে রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর খেতাব অর্জন করেছেন তাদের লুণ্ঠন করাও ছিল উক্ত সূচীর অন্তর্ভুক্ত। আশু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহর ও শহরতলীর সরকারী কোষাগার, ডাকঘর ও ডাক লুট করা স্থির হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজেব ভার দলেব বিশেষ কয়েকজনের উপর অর্পিত হলো।

দলের যুবকদের মধ্যে যারা চরিত্রে শৌর্যে বীর্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অসাধারণ, লাঠি ও ছোরা চালনায় কুশলী সেই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে সুনিপুণ বলে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত তাদেব মধ্যে অনুতোষ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জন-সংযোগের প্রধান হাতিয়ার দলের সেবা প্রতিষ্ঠান। অতি প্রয়োজনীয় এই বিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে থাকা সত্ত্বেও অনুতোষ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিভাগেও আপন কর্মদক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সমাদৃত। প্রয়োজন-বোধে নানা জরুরী কর্ম সম্পাদনের জন্য তার আহ্বান আসে। সুতরাং জরুরী অর্থ সংগ্রহের জন্যও তার ডাক পড়লো।

কর্মভার গ্রহণ করে অনুতোষ প্রথমে সরকারী কোষাগার সম্বন্ধে নানা খোঁজ খবর ও তথ্য আহরণ করে নিজেই সরজমিনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে মনস্থ করে। খাজানাখানার দিকটা নিরিবিলি। এর চৌহদ্দির

ধ্যেকার সম্মুখের মাঠে কয়েকটা বড় বড় গাছ ভিন্ন ঝোপঝাড় কিছু
। মাঠের অপর প্রান্তে রাস্তার ওধারে কোর্টকাচারী। সেখানে দিনে লোকজন গিজগিজ করছে। উকিল, মোক্তার, টস্নি, মুহুরী মক্কেলের ভীড় হৈহল্লা আর সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে—আসামী হাজির হো-ধ্বনিতে সরগম।

জনতার ভিড়ে নানা লোক নানা ধান্ধায় ঘোরাফেরা করে। ঠগ, জোচ্চোর, পকেটমার যেমন ফাঁক মতো পকেট কাটছে, উকিল, মোক্তার, সেরেস্তাদার, মুহুরী থেকে চাপরাশী মায় দ্বাররক্ষী পর্যন্ত তেমনি ছারপোকার মত রক্ত শুষে খাচ্ছে। দায়রা মামলা হলে তো আর কথা নেই থানা-হাজত থেকে জেলখানা তারপর কোর্টকাচারী ঘুরে বিচার এজলাসের কাঠের রেলিং অবধি যেন এক সূত্রে গাঁথা—চাওয়া মাত্র না-দিলে অনেক হেনস্থা আর অশেষ দুর্ভোগ! এ ভিন্ন আছে ভিখিরি—সে যে কত জাতের কত রকমের তার ইয়ত্তা নেই! ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কেবল হাত পেতেই আছে। পিতৃমাতৃ দায়, স্বামীর কঠিন রোগ, ছেলের পৈতে, স্কুলের বই, মেয়ের বিয়ে—আরো কত কী! এক বিচিত্র বহুরূপী মেলা!

এই মেলার ভিড়ে মলিন ছিন্ন হেঁটো কাপড়ে উসকো খুশকো চুলে ধূলিধূসরিত কালিঝুলি মাখা এক ভিখিরি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাত তুলে ভিখ মাঙতে মাঙতে মাঠ পেরিয়ে দূরে প্রহরী ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বাররক্ষী সিপাহী বন্দুক উচিয়ে হৈহৈ করে উঠেছে। ভেতর থেকে লাল মুখো এক পুলিশ সার্জেন্ট তো এই মারি কি তেই মারি করে তেড়ে আসে। ভিখিরি কিন্তু ভয় পায় না, সে ডান হাত বাড়িয়েই আছে। আর বাঁ হাতে খালি পেট দেখিয়ে চোখের জল ফেলে ধুকতে ধুকতে শীর্ণ শুষ্ক কণ্ঠে বলে চলেছে—সাব বহুত ভুখা—সাব বহুত ভুখা। গোরা পুলিশ গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কটমট ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভিখিরিটাকে দেখে। তারপর এক অবাক কাণ্ড—মারধোর না করে সে থমকে দাঁড়ায়, হাফ-প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা উঠে তাই ভিখিরি-টার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—ভাগো বলে চীৎকার দিয়ে পেছন ফিরে সিঁড়ি বেয়ে নিজ কামরায় ঢুকে যায়। সিপাহীরা তো হতবাক! এমনটি তারা আগে কখনো দেখেনি। ভিখিরিটা ততক্ষণে পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে মনের আনন্দে কাচারীর দিকে দে-ছুট!

ভিখিরিটা আবার ফিরে এসেছে। ছেঁড়া কোঁচড়ে মুড়ি ছোলা নিয়ে অদূরে অশ্বত্থ গাছটার নিচে বসে মনের আনন্দে চিবোচ্ছে। সাহেবকে দেখাচ্ছে যে তার পয়সায় খাবার কিনে সে কেমন মজা করে খাচ্ছে! কিন্তু একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ভিখিরিটার আসল দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। সে খাচ্ছে আর হাত তোলার ফাঁকে ফাঁকে খাজনাখানাকে দেখছে। সেখানে মোটা লোহার গরাদের ভেতরে সঙীন চড়ানো বন্দুক কাঁধে সিপাহী কদম কদম পা ফেলে এধার থেকে ওধার, আবার ওধার থেকে এধার টইল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে এটেনশানের ভঙ্গীতে থমকে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা কাঁধ বদল করছে—আশ্চর্য, সম্মুখে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি একটি কলের মানুষ যেন একই ভাবে একই ভঙ্গীতে অবিরত পায়চারি করে চলেছে, একটুও বিশ্রাম নেই। পাশেই গার্ডরুম। তারই সামনে ঘোড়াব গাড়ি কিংবা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে এক সিপাহী বেড়িয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবুগোছের এক ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে তার দিকে একখণ্ড কাগজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সিপাহী কাগজ নিয়ে ভিতবে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সার্জেণ্ট বেরিয়ে আসা মাত্রই গাড়ি থেকে ইয়া গালপাট্টাওয়ালা লাঠি কিংবা বন্দুকধারী কোন ভোজপুরী অথবা ভোজালিধারী নেপালী থলে হাতে বাবুর সঙ্গে সার্জেণ্টকে অনুসরণ করবে। সার্জেণ্ট গরাদের ভেতব ঢুকতেই টহলদার সিপাহী এটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে লৌহ কপাটের দিকে এগিয়ে যায়। একপাট কপাট—আকাবে ছোট। উবু হয়ে ঢুকতে হয়। বন্ধ কপাটে মোটা লোহার শেকলে বিরাট এক তালা ঝুলছে। ওজনে যাই হোক আকারে প্রায় কুলোব মতো। তাতে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দেওয়া মাত্র ঝনঝন শব্দে শেকল খুলে যায়। সকলে ঢুকে গেলে কপাট আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছে—থলে ভর্তি টাকা আসছে আব যাচ্ছে।

ছোলা মুড়ি খেতে খেতে খাজনাখানায় প্রবেশ ও প্রস্থানের বিধিবিধান পর্যবেক্ষণের পর ভিখিরি গাছতলা থেকে উঠে আবার আগের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাত মেলে ভিক্ষা চাইতে চাইতে কাচারীর দিকে চলতে থাকে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে গাছের নিচে একটা চায়ের দোকানের নড়বড়ে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে। দোকানী হা হা করে উঠে—ওখানে নয়, ওখানে নয়, ঐ গাছের শেকরটার ওপব

পিছে বোস্। ভিখিরি কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা উষ্মা প্রকাশ না করে বলে —আহা মিঞা ভাই চটো কেন? এক কাপ চা আর একখণ্ড কুকিস তো দাও, যা ভুখা লেগেছে।

দোকানী হতবাক! হাবাতে বেটা বলে কি—চা কুকিস। বিক্রির প্রলোভন সত্ত্বেও দোকানীর বিরক্তি কমে না। কি ঝঞ্ঝাট, বেলা ১টা বাজতে চলেছে কোর্টের মধ্যাহ্ন বিরতি আসন্ন। খদ্দেররা সব এক্ষুনি এসে পড়বে। ঐ বেঞ্চিতে কালিঝুলি মাখা ভিখিরিটাকে দেখলে ঘেন্নায় ওটাতে কি আব কেউ বসবে, না চা বিস্কুট খাবে! রাগত স্বরে উত্তর দেয়—হুঁঃ, চা কুকিস? বেটা বাপের জন্মে কোনদিন দেখেছিস, না খেয়েছিস? তারপর গলা আরো চড়িয়ে বলে—বেশ, আগে পয়সা ফেল বেটা দেখি কত মুরোদ। ভেবেছিল এবার বেটা খুব জব্দ হবে, নিশ্চয়ই বেঞ্চি ছেড়ে শুরশুব করে সরে পড়বে। হায় খোদা! ভিখিরিটার উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। ববং গ্যাট হয়ে বসে আগের মতোই ধীরে ধীরে জবাব দিলে—বেশ ভাই, তাই নাও। বল কত দিতে হবে, বলেই সে ট্যাঁকে হাত দেয়।

ভিখিরি সত্যিই পয়সা বার করছে দেখে দোকানী অবাক না হয়ে পারে না। খানিক চুপ করে আপদটাকে তাড়াতাড়ি কি ভাবে বিদায় করা যায় ভেবে বলে—ফেল বেটা, তাড়াতাড়ি দশটা পয়সা ফেল। ওরে ও কোরবান, দে তো লাটের বেটাকে এক কাপ চা আর একটা কুকিস। জলদি কর। না খেয়ে বেটা নড়বে না। আমার লোকশান না করিয়ে ছাড়বে না।

পেছনে গাছ। তাব গা ঘেঁষে কয়েকটা হোগলা পাতা জুড়ে একটা চালা মত খাড়া করা হয়েছে। তারই নিচে একটা নড়েবড়ে ভাঙ্গা টেবিলের ওপর কলাই চটা কয়েকটা টিনের কাপ ডিস। তোবড়ানো একটা টিনের কৌটা—মুখটা ধাঁধানো, সামনের দিকটা কাচের বদলের মোটা কাগজের পিসবোর্ড আঁটা। তারপাশে কালিকুলি মাখা কিছু বাসনকোশন। নিচে উনুনের ওপর কেটলি চাপানো। সে কেটলি টিনের কি এলুমিনিয়ামের না অন্য কোন ধাতুর তা বোঝা দুঃসাধ্য। পুড়েপুড়ে কালি জমে জমে তার রূপ হয়েছে পোড়া-মাটি ভাতের হাঁড়ির মতো।

হুকুম শোনা মাত্র ছোকরা একটা কাপ নিয়ে একটা কালো ন্যাকড়া

—মনে হলো যেন আলকাতরা মাখা—দিয়ে ঢাকলে। তার ওপর কলাই ওঠা একটা টিনের চামচে দিয়ে পাশের কৌটো থেকে গুঁড়ো চা রেখে কেটলি তুলে গরম জল ঢেলে দিলে। তারপর দুধ চিনি মিশিয়ে কাপটা এবং কৌটো থেকে একটা কুকিস তুলে ভিখিরির দিকে এগিয়ে দেয়। পাওয়া মাত্র সে কুকিসে একটা কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে চায়ে চুমুক দেয়। সারা মুখে তার পরিতৃপ্তি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু মিঞার তর সইছে না। ভিখিরিটার ধীরে সুস্থে চা-পান পর্ব তাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এক্ষুনি ১টার ঘণ্টা বাজবে। দোকানী একবার কটমট করে ভিখিরিটার দিকে একবার কোর্টের দিকে চেয়ে আপন মনে বিড় বিড় করছে। সাইকেল চেপে একটি যুবককে দোকানের দিকে আসতে দেখে তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ থেমে যায়। দোকানের সামনে সাইকেল থেকে নেমে সে জিজ্ঞাসা করে—মিঞা ভাই এক কাপ চা হবে?

দোকানী উল্লাসিত কণ্ঠে জবাব দেয়—কেন হবে না বাবু, আলবৎ হবে। আর একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভিখিরিটার আগাপাছতলা নিরীক্ষণ করে পেছন ফিরে কোববানকে চা তৈরি করতে বলে। বাবুটি ততক্ষণে বেঞ্চির ওপর বসে পড়েছে। ভিখিরির ভ্রূক্ষেপ নেই সে একমনে চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে।

দোকানদার এতই বিব্রত যে তার আর সহ্য হচ্ছিল না। কি ভাবে ভিক্ষুকটাকে তাড়াবে! রেগে মেগে চিৎকার করে, না বাপ ভাই ডেকে নরম অনুরোধের সুরে! মতলব ঠিক করে বলবার মুহূর্তে পাশ ফিরে দেখে ভিখিরি কাপ হাতে বেঞ্চি ছেড়ে গাছের শেকরটার ওপর গিয়ে বসেছে। দোকানী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তার গোমড়া মুখে হাসি ফোঁটে। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে—না বেটার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে দেখছি। খুশি মনে জিজ্ঞাসা করে ফিরে কোরবান বাবুর চা কতদূর? কথা শেষ করে পেছনে তাকিয়েই উঠে পড়ে হা হা শব্দে ছুটে গিয়ে কোরবানের হাত থেকে চামচে খানা কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—কুষ্মাণ্ড, গর্ভস্রাব, কোন কাণ্ড জ্ঞান নেই! বলতে বলতে কৌটো খুলে এক চামচ চা কাপে ফেলে গরম জল ঢেলে ডিস দিয়ে কাপটাকে ঢেকে রাখে। ছোকরাকে কাছে ডেকে ফিস ফিস করে বলে—ঐ ভিক্ষুকটার কাপটা নিয়ে ধুয়ে রেখে দে। কেউ যেন না দেখে।

চা তৈরি হলে দোকানী জিজ্ঞাসা করে—বাবুসার চায়ের সঙ্গে কি দেব?

বাবুর দৃষ্টি তখন অন্য দিকে। দোকানীর ডাক কানে যেতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যমনস্কের মতো বলে—তোমার ভাঁড়ে যা আছে তাই দাও।

—কি নাই বলুন—চায়ের সঙ্গে টা, যা চাইবেন সব পাবেন। এ তল্লাটের সেরা জিনিষ। যোগা বৈরাগীর খাস্তা, কুকিস আর মশলা ছোলা ভাজা, কাদের মিঞার বন আর কেক। কেন বাবু, আপনে মেল টেন চড়েননি—চারটের টাইন। সদর থেকে টেন ছাড়লো তো বেবাক টেশনে ভেণ্ডা বগীর সামনে সে কি ভীড়! মিঠাপানি কেউ চায় না। কেবল শুনতে পাবেন- যোগার খাস্তা, কুকিশ--নয় তো কাদের মিঞার বন রুটি। গাড়ি ছাড়ে তো লোক ছাড়ে না, আঠার মতো লেগে থাকে। ভেণ্ডা কুট্টি মিঞার দিবার সবুর সয় না। ব্যস, চার টেশন যেতে না যেতেই সব ফক্কা—শেষ! সাধে কি আর কচি মোল্লার দোকানে ভিড় হয়, লোক ছুটে আসে! একবার চেখে দেখুন-না বাবু। যা তা মাল এ বান্দা রাখে না। বলুন কি অ নবো?

বাবু বুঝলো, এ নাছোড়বান্দা। একটা কিছু গছাবেই। সুতরাং নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে—ঐ যে খাস্তা না কি বলল, তারই একটা দাও।

দোকানীর বিস্কুট আনবার ফাঁকে ভিখিরিটা চট্ করে উঠে বাবুর হাতে কিছু একটা গুঁজে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। দোকানী বাবুকে চা বিস্কুট দিতে গিয়ে ভিখিরিকে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করে—কিরে আর এক কাপ চাই নাকি? তারপর বুঝি আপন মনেই বলে—বেটা যা চা রসিক—কেমন চুকচুক করে রসিয়ে রসিয়ে চা খাচ্ছিল! এদিক নেই ওদিক আছে—উঠোন নেই বেটার পাছ দুয়ার আছে!

দোকানীর কথা বুঝি ভিখিরির কানে গেল না। কোন দিকে দৃকপাত না করে পূর্বের মতো খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাত তুলে লোক দেখলেই ভিক্ষা চাইতে চাইতে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

দোকানী অবাক। ভিখিরির চলার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অপমানাহত স্বরে বললে—বেটা জাত ভিখিরি, তার আবার গুমোট কত! হুঁ, যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি!

সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তে অপস্রিয়মান। সঙ্গে সঙ্গে কাচারী প্রাঙ্গণের ভোল পাল্টে আর এক দৃশ্যের যবনিকা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। কোলাহল মুখর এত বড় চত্বরটা ক্রমে ক্রমে জনবিরল হয়ে ঝিমিয়ে

পড়ছে। এখানে ওখানে ভাঙ্গা টেবিল, বেঞ্চি, হাঁটু ভাঙ্গা দ-এর মতো কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ছেঁড়া কাগজ, জুতো, ভাঙা ডিস কাপ, মাটির খোড়া, শালপাতা, কলাপাতা, আলু পেঁয়াজ, কলা, বাদামের খোসা ইত্যাদি নানা বস্তু চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বড় বড় গাছগুলো শাখাপ্রশাখা মেলে দিনের শেষ আলোটুকু ঢেকে ফেলে অন্ধকারকে ঘনীভূত করছে। মাঝে মাঝে কাচারী দালানের বারান্দায় ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। সেখানে লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতে দেশোয়ালী চৌকিদার সিপাহী রাত্রির আহার তৈরিতে ব্যস্ত। কেউ বা কবীরের দোহা কিংবা তুলসী দাসী রামায়ণ পাঠে মগ্ন। দূরে খাজনাখানার ওদিক থেকে ঢোল করতাল সহযোগে জয় সীয়ারাম ধ্বনি ভেসে আসছে।

কাচারী প্রাঙ্গণে রাত্রিকালে লোক চলাচল নিষিদ্ধ না হলেও সরকারী কোষাগারের চতুর্দিকের নির্দিষ্ট এলাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাত্রে ভুলক্রমে কিংবা পথ হারিয়ে ঐ বে-আইনি গণ্ডির মধ্যে পা বাড়ালে সশস্ত্র প্রহরীর ভীতিকর কর্কশ কণ্ঠের হুঙ্কার-এর সম্মুখীন হতে হয়—"হুকুমদার"! নিথর নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার চিরে অশিক্ষিত সিপাহীর আকস্মিক এই অদ্ভুত অবোধ্য সতর্কীকরণ হুঙ্কার যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তাতে অজ্ঞ অবৈধ প্রবেশকারী দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে করে কোন অতিকায় নরঘাতক জীব বুঝি হঠাৎ মুখ-ব্যাদন করে হিংস্র কুটিল চীৎকার করে উঠলো। প্রহরী ঘরের উভয় দিকের লণ্ঠনের লাল আলো দুটোকে মনে হয় ঐ জানোয়ারের অগ্নি-বর্ষি গোলাকার দুই ডাবর রক্ত চক্ষু আর তারই রক্তিম আলোকচ্ছটায় প্রহরীর হস্তধৃত উদ্যত বন্দুকের অগ্রভাগে রক্ষিত সঙ্গীণকে মনে হয় রক্ত-লোলুপ জানোয়ারটার শাণিত লক্‌লকে জিহ্বা।

এমন সংকট মুহূর্তে হতভম্ব ব্যক্তি থমকে দাঁড়িয়ে ধরা দিলে বড় জোর হাজত বাস। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উর্ব্বশ্বাসে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত গুলি—পপাত ধরণী—মৃত্যু!

দিনের বেলা যে-সব ভিখিরি রুজি রোজগারের ধান্ধায় এখানে ভীড় করে তারা ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যাগমনের আগেই কাচারী চত্বর থেকে সরে পড়ে—পাছে সিপাহীরা ধরে নিয়ে হাজতে পোরে। এর ব্যতিক্রম ঘটে যখন কোন সাধু সন্ত ফকির এসে এখানের অতিকায় বটগাছের নিচে আস্তানা গাড়ে। তখন রাত্রেও ভিখিরি দল আহারের সন্ধানে সেখানে ঘুরঘুর করে। সাধু সন্ত ফকিররা সিপাহীদের জামাই আদর পায়। তারা

এঁদের অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আটা, ঘি, লকড়ি ইত্যাদি নানা ভোগ্য-পণ্য দান করে পুণ্যার্জনের সঙ্গে শারীরিক সেবা শুশ্রূষা দ্বারাও তারা সাধুদের তুষ্টি সাধন করে। হয়ত ভাবে মহাপুরুষদের পদ স্পর্শে তাদের পুলিশী জীবনের অনেক দুষ্কর্মজনিত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে পৌঁছবার সিঁড়ি উন্মুক্ত হবে।

এভাবে পুণ্যার্জন করতে ওধারের খাজনাখানার ও তার আশপাশের ব্যারাকের সিপাহীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের সম্মুখে ডালি রেখে হাতখানা বাড়িয়ে ধরে: খড়ি পেতে তাদের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ শুনবার আশায়। সাধু সন্ত সমাগম হেতু রামায়ণ পাঠের সঙ্গে কখন সখন যাগযজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে খুবই ধুম-ধারাক্কা হয়। ভোগ বিতরণ কালে গরীব দুঃখীরাও পাত পায়। ঐ সময়ে রাত্রিকালে কোর্টকাচারী প্রাঙ্গণে পাহারার শৈথিল্য ঘটলেও কোষাগারের চৌহদ্দির মধ্যে তা হয় না। লাল মুখো সাহেবরা নেটিভ-নিগারদের এ-সব নেষ্টি কাণ্ডকারখানায় বাধা না দিলেও খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। তবে সিপাহীদের আচার-আচরণে কিছু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিষিদ্ধ এলাকায় অনুপ্রবেশকারী পাহারাদার সান্ত্রীর হুঙ্কার শুনে পালাতে গিয়ে গুলি-বিদ্ধ না হয়ে ধরা পড়ে হাজতে ঢোকে। তবে মতিচ্ছন্ন, মাথা খারাপ কিংবা বদ্ধ উন্মাদ এ অঞ্চলে ঢুকে উৎপাত শুরু করলে সিপাহী সান্ত্রীদেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। দিনের বেলা যেমন তেমন রাত্রে এরা যাতে কোন প্রকার হামলা উপদ্রব করতে না পারে সেজন্য কড়া হুকুম আছে। দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাচারী যখন জন-শূন্য হয়ে যায় তখন সিপাহী চৌকিদার গাছতলা, ঝোপঝাড়, আড়াল আবডাল সর্বত্র তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে। বিকৃত মস্তিষ্ক দেখতে পেলে ধরে-বেঁধে সীমানার বাইরে বের করে দিয়ে কড়া নজর রাখে যাতে তার পুনঃপ্রবেশ না ঘটে।

এত সতর্কতা ও খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পাগলের উপদ্রব ঘটে। কোর্টকাচারীর প্রকাণ্ড চত্বর জুড়ে গাছপালা, ঝোপঝাড়, আড়াল আবডাল, দালান কোঠা আর উকিল, মোক্তার মুহুরীদের কবুতর খোপের মত ছোট্ট ছোট্ট ঘরের ভেতর কে কোথায় চিৎ হয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে কিংবা উবুড় হয়ে মাথা গুঁজে পেছনের পা তুলে নাচাচ্ছে আর বিড় বিড় করে বকছে তা অনেক সময় নজরে আসে না। এছাড়া পোষাকে আশাকে,

চাল চলতি, আচার আচরণে অনেক সময় ভিখিরি আর মতিচ্ছন্নের মধ্যে প্রভেদ বোঝা কঠিন।

বেশী দিনের কথা নয়। এক রাত্রে এক বিকৃত মস্তিষ্ক কি ভাবে যেন সিপাহী চৌকিদারের চক্ষু এড়িয়ে এখানে ঢুকে মহা তাণ্ডব শুরু করে। সিপাহী চৌকিদার বহু চেষ্টা করেও তার ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। সারা কাচারী চত্বর জুড়ে চলে ছুটোছুটি হাঁক ডাক। হঠাৎ এক ফাঁকে পাগলটা রাস্তা পেরিয়ে খাজানাখানার মাঠে ঢুকে লম্ফঝম্ফ ও চীৎকার শুরু করে। সিপাহীদের তাড়া খেয়ে সে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার দিতে দিতে রক্ষী ঘরের সম্মুখে লাল আলোর দিকে উল্কা বেগে ছুটে চলে। পাহারাদার সান্ত্রীর সতর্কীকরণ হুঙ্কার, টর্চের তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। পিপীলিকার পাখা হওয়া মাত্র আলো দেখে যেরূপ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সম্মোহিতের মতো মরণ ঝাঁপ দেবার জন্য ছুটে চলে ঐ হতভাগাও সেরূপ ঐ লাল আলোর দিকে ধেয়ে চলে। নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরীর উদ্যত রাইফেল থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে। মুহূর্তের মধ্যে হতভাগা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বৃটিশ আইনঃ বোমার আসামী, রাজদ্রোহী, জেলের কয়েদি, আইন-ভঙ্গকারী যেই হোক না কেন, হাজতে, জেলে কিংবা পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে গুলি, লাঠির আঘাতে অথবা বুটের ঠোক্করে যেখানে যেভাবেই মরুক না কেন অনুসন্ধান, বিচার আচার অবশ্যই হতে হবে। আইনকে ফাঁকি কিংবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো চলবে না, তা সে বিচার যদি প্রহসনও হয় তবুও তো বিচার!

এ হতভাগ্যের বেলাতেও লাশ কেটে পরীক্ষা অনুসন্ধান ইত্যাদি যথারীতি আইন মাফিক আচার অনুষ্ঠানের কমতি হলো না, ফল কি হলো তা প্রকাশ না হলেও সেই থেকে অনুরূপ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে জন্য উন্মাদের প্রবেশ সম্পর্কে প্রহরীরা সদা সতর্ক। কশ্চিৎ কখনো তাদের সাবধানী চক্ষু এড়িয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশকারী পাগল অনুমিত হলে গুলি না চালিয়ে যেভাবেই হোক ধরে বেঁধে হাজতে পুরে রাখার অলিখিত নির্দেশ রয়েছে।

কাচারীর ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করে। গভীর রজনীর নীরব নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমাণ পাহারাদার-এর লাঠির

খটাখট আর খাজানাখানার সম্মুখের বিনিদ্র টহলদার সিপাহীর বুটের থপথপ আওয়াজে বিঘ্নিত হচ্ছে। দূরে বৃক্ষশাখে নিশাচর পেঁচকের কর্কশ কণ্ঠস্বর নিথর নিস্তরঙ্গ অন্ধকার সমুদ্রে কিঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি করে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘোর ঘনঘুটি অন্ধকারে কাচারী বারান্দার ক্ষীণ আলোক রশ্মি অন্ধকার দূর না করে আরো ঘনীভূত করছে। ওধারে খাজানাখানা দিকের লাল আলো দুটো অন্ধকারে জ্বলন্ত গোলকের মতো রক্ত চক্ষু দেখিয়ে যেন সকলকে হুঁশিয়ার করছে—খবরদার এদিকে এসো না এখানে মৃত্যুর হাওয়া—যম-দূত ওঁত পেতে বসে আছে!

দূরে মাঠের ধারে এক কোণে নানা গাছপালা ও আগাছা মিলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন জঙ্গল। ঐ দিকটায় অন্ধকার আরো গাঢ়। অসংখ্য জোনাকি ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় রজনীর কালো আঁচলে রূপালী চুমকি চিক্‌চিক্‌ করছে। জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ খসখস শব্দ, পর মুহূর্তেই একটা কদাকার কালো বস্তু ঝুপ করে মাঠের মধ্যে পড়ে লাফাতে লাফাতে এগোতে থাকে। মাঝে মাঝে হাত তুলে সাপের মতো দুলছে আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। ঘন মসীলিপ্ত অন্ধকারে ততোধিক কালো বস্তুটাকে ঠাহর না হলেও বোঝা যাচ্ছিল একটা কিম্ভুত কিমাকার কিছু লাফাতে লাফাতে কোষাগারের দিকে চলেছে। ওটা যে নিশাচর কোন জন্তু জানোয়ার নয় তাও তার অঙ্গভঙ্গী থেকেই অনুমিত। মাঠের মাঝ বরাবর বটগাছের নিচে এসে ওটা ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফোঁস ফোঁস গর্জনে নিস্তরঙ্গ গভীর নিশুতিতে অস্থির আলোড়ন তোলে। গাছের আড়ালে তার দৃষ্টি কেবল কোষাগারের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানের লাল আলো দুটোকে মনে হচ্ছে এক যক্ষ বুঝি বিনিদ্র নয়নে ডাবর রক্ত চক্ষু মেলে ধনাগার আগলে বসে আছে। কাছে গেলে টেনে নিয়ে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে লৌহ ভীম-এর মতোই তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

টহলদার প্রহরীর বুটের আওয়াজ ভিন্ন আর কোন শব্দ নেই। প্রহরীর পার্শ্বদেশের ঘর থেকে দরজাখোলার ফাঁকে আলোর ঝলক লৌহ কবাটের ভিতর দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে। বোঝা গেল ঘরের মধ্যেও সিপাহীরা বিনিদ্র নয়নে সদা-সতর্ক।

গাছের আড়াল হেতু প্রহরীর দৃষ্টি এদিকে পড়েনি। তবুও অবিরাম তার নকল সাজোচিত অভিনয় একনাগাড়ে ত্রুটিহীন অবস্থায় চলেছে।

বলা তো যায় না যদি অলক্ষ্যে কারো দৃষ্টি এদিকে পড়ে! সুতরাং সতর্কতাই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

ভবিষ্যৎ জরুরী কর্ম-পন্থা নিরূপণের জন্য সরজমিনে তদন্ত আবশ্যক। সে উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে শ্রুতির উপর নির্ভর করেই অনুতোষ অভিমন্যুর মতো একাই শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য রচিত চক্র-ব্যূহ ভেদ করে অভিমন্যু ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নির্গমণের উপায় তার জানা ছিল না। কারণ মাতৃগর্ভে এক অসমাপ্ত চক্রব্যূহ বৃত্তান্তই তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। ফলে জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসকে ভেবেছিলেন অমোঘ কবচ—যার জোরে শত্রু নিপাত করে ব্যূহ থেকে নির্গত হতে পারবেন। কিন্তু হায়, সত্যবাদী স্থিতধী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসবাণী বিফল হলো। তপস্য লব্ধ ঐশী শক্তি বলে বলীয়ান কালরূপী জয়দ্রথ ব্যূহ মুখ রক্ষা করে পাণ্ডবদের বারংবার অভিমন্যু উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ করে দিল। সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অন্যায় সমরে ষোড়শ বর্ষীয় বীর বালক অভিমন্যু নিহত হলেন।

বর্তমানে ত্রেতাযুগের যুদ্ধ-পদ্ধতি, ব্যূহ-রচনা প্রণালী, আক্রমণ ও প্রত্যাবর্তন কৌশল ইত্যাদির বিস্তর রকমফের ঘটেছে। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে নবনব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন ও তাদের প্রয়োগ পদ্ধতির রদবদল হয়েছে। তদনুযায়ী রণ-কৌশল, সৈন্য-বিন্যাস, আক্রমণ প্রতিআক্রমণ প্রতিরোধ ইত্যাদির ধারা ভিন্নভিন্ন রূপ নিয়েছে। আধুনিক অস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল জানা সত্ত্বেও তা প্রয়োগ করা অনুতোষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে শুধু নিরস্ত্র নয় নিঃসঙ্গও। আর নির্গমনের পথ রুদ্ধ হলে যুধিষ্ঠিরের মতো ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ধারের আশ্বাসদানকারীও আশেপাশে কেহ নেই।

সুতরাং চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সে একাই শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেছে। এখানে সপ্তরথী না বহুরথীর সঙ্গে তার মোলাকাত মোকাবিলা হবে তা জানা নেই। তার তূণ একমাত্র আয়ুধ এই নকল রূপ-সজ্জা আর বল হলো নিখুঁত অভিনয় পারদর্শিতা। এ দুয়ে মিলেই তার বর্ম ও কবচ। এরূপ বর্মাবৃত হয়ে কার্য-সিদ্ধি অন্তে সে নির্গমন করতে সক্ষম হবে যদি তার শ্রুতির মধ্যে সত্য নিহিত থেকে থাকে। আর জয়দ্রথরূপী কোন বলী ব্যূহদ্বার আগলে না রাখে।

শেষ মুহূর্তে আর কিছু বাকী আছে কিনা অনুতোষ ভাবলে এবং মনশ্চক্ষে দেখে নিলে। স্বদেশকে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে না

এলে কিভাবে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে দেয়াল টপকে বেরিয়ে যাবে এবং রাত্রিশেষে কখন কোথায় তার জন্য অপেক্ষা করবে। অতঃপর স্বীয় কর্মকৌশল স্থির করে গাছের আড়াল হতে সামনের দিকে ছিটকে পড়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে হাত পা মাথা দুলিয়ে বিড় বিড় করতে করতে লম্ফঝম্ফ দিয়ে অনুতোষ সম্মুখে এগিয়ে চলে। নিঃশঙ্ক চিত্তে বাংলা মায়ের এক দামাল ছেলে মরণ খেলায় মেতে উঠেছে।

অদূরের লাল আলো দুটো ছাড়া আর কোনদিকেই তার দৃকপাত নেই। যতই এগিয়ে যাচ্ছে বাতি দুটো ক্রমেই আকারে বড় হচ্ছে। অলক্ষিতে অন্ধকারে অকস্মাৎ তীব্র কর্কশ কণ্ঠধ্বনি হলো—হুকুমদার! ঐ অবোধ্য কর্ণভেদী পিলে চমকানো চীৎকার চলন্ত জীবটির বোধগম্য হলেও তার বাহ্যিক কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না! সিপাহীর হুশিয়ারিতে কর্ণপাত না করে সে একইভাবে এগিয়ে চলেছে। পুনরায় কঠোর কণ্ঠের আদেশ এলো—হল্ট। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম কার্যকরী হচ্ছে কিনা দেখবার উদ্দেশ্যে সুতীব্র সন্ধানী আলোর তির্যক রশ্মি চলমান ব্যক্তির ওপর এসে পড়ে। প্রহরীর শেষ নির্দেশ উপেক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার অর্থ তার উদ্যত রাইফেলের শিকার হওয়া। এমন পরিস্থিতিতে অনুতোষের অবচেতন মনে কোন প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হলেও দৃশ্যত তার চলার গতিতে কোন পরিবর্তন প্রতিফলিত হলো না। নির্মম নির্ভীক চিত্তে সে একইভাবে আপন লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রহরী মনে মনে প্রমাদ গণলো! সন্ধানী আলোকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে উলঙ্গপ্রায় কালীঝুলি মাখা কিম্ভূত কিমাকার একটা মানুষ উদ্ভট রকমের ভঙ্গী করতে করতে এগিয়ে আসছে। ইতিপূর্বেকার এক মর্মন্তুদ ঘটনার ফলে কর্তৃপক্ষের সাবধান বাণী তার স্মরণে এলো। তবুও আর এগোতে দেওয়া যায় না। নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়লো যে! সুতরাং উদ্যত রাইফেলের মুখ ঊর্ধ্বে তুলে গুলি ছুঁড়লে। গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ দুই সিপাহী সন্ধানী আলো লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো। রিভলবার তুলে দুজনে লোকটার দুদিকে দাঁড়িয়ে তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। লোকটা নির্বিকার। থামার কোন লক্ষণ নেই। সিপাহীদের একজন সামনে গিয়ে বুটের ঠোক্কর মেরে চিৎ করে ফেলে দিলে। মুখে শাসালে—কুত্তা, কাঁহা যাতা—শুনতা নেই—রোকনে বোলা। ক্যা মরণে মাঙতা!

এত বড় আঘাতেও লোকটা যেন চেতনাবিহীন নির্বিকার। চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন কিংবা কোন বৈলক্ষণ্য নেই। সম্মুখে এগোতে না পেরে সে উবু হয়ে সাপের মতো দুলছে এবং ভয় জাগানো ফোঁস ফোঁস, হিস্ হিস্ শব্দ করছে। সিপাহীরা হতভম্ব। তারা এখন কি করবে? লোকটার চেহারা, অঙ্গভঙ্গী, আচার আচরণ, রক্তবর্ণ ঘোলা চক্ষু ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সে বিকৃত-মস্তিষ্ক। আইন বলে—নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশকারীকে প্রথমে সতর্কীকরণ। তারপর দাঁড়াবার আদেশ উপেক্ষা করে অগ্রসর হলেই (Shoot) গুলি। এই আইনের কঠোর বন্ধন এক অলিখিত আদেশ বলে অধুনা কিছুটা শিথিল হয়েছে। নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশকারী উন্মাদ অথবা বিকৃত-মস্তিষ্ক মনে হলে গুলি না করে ধরে বেঁধে রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হয়ে সীমানার বাইরে বের করে দেওয়া। এ ব্যাপারে আবার সিপাহীদের নিজের থেকে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। উপস্থিত উর্দ্ধতন অফিসারের নিকট ঘটনাটা পেশ করে তাঁর আদেশ মতো কার্য করাই হলো বিধি। তদনুযায়ী সম্মুখে অবরোধকারী সিপাহী সঙ্গীকে ডেকে বললে—মিশিরজী আপনি সার্জেণ্ট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করে জেনে নিন কি করতে হবে। আসবার সময় রশি নিয়ে আসবেন।

লোকটা হঠাৎ মাথা দোলা বন্ধ করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে গিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান সিপাহীর জোর বুটের ঠোক্কর খেলে। এবারের আঘাত আগের চাইতে গুরুতর। সে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ব্যথার চোটে কাঁপছিল। তারপর উঠে বসে মাথা দুলিয়ে আগের চাইতেও জোরে ফোঁস ফোঁস গর্জনে নিথর নিশুতি রাতের ঘোর অন্ধকারে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। লাঞ্ছিতের বেদনা ও অপমান বুঝি ঐ ধ্বনির ভেতর দিয়ে গর্জে উঠলো। তার মনের ক্রুদ্ধ রুদ্ধ আক্রোশ রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়ে স্ফুলিংগের মতো নির্গত হচ্ছিল। অন্ধকারে সিপাহীর চক্ষু তা এড়িয়ে গেল।

গার্ডরুমে পৌঁছে মিশির সার্জেণ্টকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছে। ডিউটি সেরে সাহেব সবে হ্যাভারস্যাক থেকে একটা বোতল নিয়ে কড়া গন্ধের তরল পদার্থ গলাধকরণ করে কোন প্রেয়সীকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বোঝা গেল সিপাহীর গুলির শব্দ তার কানে প্রবেশ করেনি। মিশিরের হাঁক ডাক ও জবানের যেটুকু সাহেবের কর্ণকুহরে ঢুকেছে তার উত্তরে বিরক্ত কণ্ঠে বললে—সাপ হ্যায় তো ডাণ্ডাসে মার ডালো।

মিশির ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলে—সাব বহুত জোরসে মারা—লেকেন কুছ হুয়া নেহি। তব ভি সাপকা মাফিক হিলতে জুলতে লাগা। বিলকুল ডরতা নেহি।

—ক্যা বোলা, ডর লাগা? তব গোলী সে মার দো।

—লেকেন সাব মালুম হোতা উহ পাগল হ্যায়।

সাহেবের বোধহয় এতক্ষণে হুঁশ হয়েছে। পাগল শুনেই চীৎকার দিয়ে বললে—ক্যা বোলা, পাগল, ঠারো ঠারো। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে।—গুলি মত করো। কবকে বাঁধকে অভি হিয়া লে আও। জলদি করো।

সাহেবের আদেশ মাত্র মিশির দৌড়ে গার্ডরুমের দেয়ালের হুক থেকে এক গাছা মোটা রশি নিয়ে বেরিয়ে যায়। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে উন্মাদ এখনো দুলছে আর ফোঁস ফোঁস করছে। রামদীন তাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মিশির এগিয়ে লোকটার পিঠে রশি দিয়ে সপা সপা কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। তারপর টর্চের আলোতে তাকে পরীক্ষা করলে। আঘাতের তীব্রতায় লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও মুখ দিয়ে গোঙলার সঙ্গে বিরামহীন ক্ষীণ ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরুচ্ছে। মুখাবয়বের কোন পরিবর্তন নেই। ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টি—কেবল চক্ষু দুটি বুঝি আরো রক্তিম!

মিশির লোকটার কোমরে দড়ি বেঁধে বুটের ঠোক্কর মেরে তাকে টেনে তুললে। তারপর হাতের দড়ি দিয়ে আবার পিঠে আঘাত করলে। লোকটার চলবার ক্ষমতা নেই। মিশির দড়ি ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে আর রামদিন পেছনে রিভলবার হাতে গুঁতো মেরে এগিয়ে দিচ্ছে। মুখে বলছে—চল বেটা চল—রাত দুপুরে যত জ্বালাতন! কিভাবে কোথা দিয়ে যে ঢুকে পড়েছে!

গার্ডরুমে পৌঁছে রামদিন সার্জেন্টের কামরায় ঢুকে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে বলে—সাপ আদমিকো লে আয়া সাব।

শোনামাত্রই সাহেব উঠে দাঁড়ালো। দেয়ালের হুক থেকে বেল্ট নামিয়ে পরে নিয়ে ছড়ি হাতে গার্ডরুমে প্রবেশ করলে। সাহেব লোকটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বসিয়ে দাঁড় করিয়ে নানা ভাবে আগাপাছতলা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো। তারপর হাতের ছড়ি দিয়ে লোকটাকে বেশ কয়েক ঘা এলোপাতাড়ি প্রহার করলে। এবার সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। শরীরের ওপর এত অত্যাচারের ধকল আর কত

সয়! সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। সার্জেণ্ট কিন্তু সেখান থেকে নড়লো না। ঠায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিছু সময় অতিবাহিত হলো। হঠাৎ লোকটা নড়ে উঠলো —সামান্য গোঙানির পরেই অস্পষ্ট ফোঁস ফোঁসের সঙ্গে মাথা-নাড়া শুরু হলো। সাহেব সম্মুখে থেকে তীব্র টর্চের আলো ফেলে লোকটার মুখের ভঙ্গী, রক্তাক্ত ঘোলাটে চোখের শূন্য দৃষ্টি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন থেকে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলে না। সুতরাং পাগলটাকে আপাততঃ বন্দী রেখে রাত্রি ভোরের আগেই সীমানার বাইরে বার করে দেবার আদেশ দিয়ে সাহেব নিজের কামরায় ফিরে গেল।

গার্ডরুমের পাশেই মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা জায়গায় রামদীন কোমরের দড়ি খুলে পাগলটাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিলে। সে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে নিশ্চুপ নিস্পন্দ হয়ে রইল। শরীরের ওপর এত অত্যাচার উৎপীড়ন তাকে বুঝি বিবশ বেহুঁশ করে ফেলেছে। সে আর উঠতে পারছে না। কতক্ষণ যে এভাবে সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে ছিল সে জানে না। হঠাৎ হুঁশ ফিরে আসতেই সে উঠে বসে। আড়াল থেকে এ অবস্থায় দেখলে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। ভাবামাত্রই সে তড়াং করে উঠে দাঁড়ায়। শরীরে যেন আবার আগের বল ফিরে আসছে। পূর্ববৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কসরৎ দেখাতে দেখাতে সে পায়চারি করে চলেছে। ঘরে বাইরে সর্বত্রই আলো —যেন আলোর বন্যা। কিন্তু একমাত্র প্রহরীর বুটের থপ থপ আওয়াজ ব্যতীত জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেই বিনিদ্র নয়নে অনুসন্ধিৎসু তার প্রয়োজনীয় যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার করেছে, যা কিছু দেখবার দেখেছে, যা কিছু বুঝবার বুঝে নিয়েছে।

তখনো অন্ধকার। হঠাৎ ঝনঝন শব্দে শেকল খুলে যায়। বন্দীকে বার করে মিশির তার কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে আর রামদিন রিভলবার হাতে পেছন পেছন যাচ্ছে। বন্দী ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে। অন্ধকার আকাশে তখনো উজ্জ্বল তারার ঝিকিমিকি। প্রভাত-অরুণের আলোর রেখা তখনো ঊর্ধ্বাকাশ চুম্বী তাদের ক্ষীণদ্যুতি নিষ্প্রভ করেনি। উৎকর্ণ হয়েও নিকট কিংবা দূরে বৃক্ষ শাখে কাকের কলরব কিংবা অন্য পাখীর কাকলীতে ভোরের আগামী শুনতে পায় না। বুঝলো প্রভাত হতে বিলম্ব আছে।

কাঁকর বিছানো পথে চলতে চলতে হঠাৎ অগ্রগামী সিপাহী বাঁয়ে বাঁক নিতেই বন্দীর কোমরে জোরে টান পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মিশির এক হেঁচকা মেরে মাঠে নেমে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে। বন্দী অবাক! এভাবে রাস্তা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি? সারা অঞ্চল বন্দীর নখদর্পণে। সদর রাস্তা ধরে না গিয়ে মাঠের শেষে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হবার নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তবে কি তার অভিনয়ে কিংবা ছদ্মবেশে কৃত্রিমতা ধরা পড়েছে! সেজন্য নির্জনে নিয়ে তাকে গুম করে ফেলাই এদের মতলব! নানা উদ্বেগ ও আশঙ্কাজনক প্রশ্ন এক সঙ্গে তার মনে ভীড় করে আসে। উদ্বিগ্ন চিত্তে কারণ অনুধাবন করতে গিয়ে তার স্মরণ হলো ঐ দিকের দেয়ালের কোণে মরচে-ধরা ছোট্ট একটা লোহার দরজা যেন দেখেছে। কথাটা মনে হতেই তার চিন্তা-স্রোত হঠাৎ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলো। অতি স্পষ্ট উজ্জ্বল এক আলোর শিখা তাকে ভিন্ন পথ দেখালো। অভাবিত এক পরম সুযোগ যেন সশরীরে তার সম্মুখে আবির্ভূত! এমন সুযোগ কশ্চিৎ কদাচিৎ আসে! সদর দরজার দিকে রাইফেল হাতে প্রহরী রয়েছে। এদিকটা লোক চলাচলের বাইরে প্রহরী বিহীন একেবারে ফাঁকা ও নির্জন! এ সুযোগের ফায়দা তুলতেই হবে। এ যেন এক মহা আবিষ্কার! যে অভিযান মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ সত্ত্বেও নিষ্ফল ভেবে সে কিছুটা মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল তাহাই এখন মহা ফলপ্রসূ ও পরম সার্থক ভেবে সে উল্লসিত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন শুধু চরম দুঃসাহসিকতা আর একান্ত তৎপরতার সঙ্গে ঘড়ির কাটারমত নির্ভুলভাবে এগিয়ে কর্ম সম্পাদন করা। একই সঙ্গে দু'জনকে ঘায়েল করতে পারলেই কর্ম ফতে! এতক্ষণ ধরে যে দুঃসহ অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ, আর সেই সঙ্গে মূল্যবান উপহার—দু' দুটো রিভলবার হস্তগত করা —যার জন্য তারা হন্যে হয়ে ধুঁকে মরছে।

সুতরাং প্রহরীদের অভীষ্ট ও অভিসন্ধি যাই হোক না কেন তা সিদ্ধির সুযোগ সে তাদের কখনো দেবে না। তার পূর্বেই সে চরম আঘাত হানবে। সংকল্প অনুযায়ী কার্যক্রম ও প্রয়োগ পদ্ধতি স্থির নিশ্চয় করে অনুতাপ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। উত্তেজনায় উন্মত্ত নৃত্য শুরু করে। মুখ দিয়ে ক্রুদ্ধ ফণীর ফোঁস ফোঁস গর্জনের সঙ্গে তীব্র গরল উদ্‌গীরণ করবার জন্যই বুঝি এগিয়ে চলে মিশিরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

পড়ে, পর মুহূর্তে পেছনে সরে সরে রামদীনের গায়ে পড়তে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। এভাবে অগ্রপশ্চাৎ হওয়ার ফলে মিশিরের হস্তধৃত দড়িতে বারংবার টান পড়ছে। মিশির একবার রেগেমেগে পিছন ফিরে তেড়ে-মেরে মারতে গিয়ে পাগলের তাণ্ডব নৃত্য দেখে হাত গুটিয়ে নেয়। পশ্চাদ্বর্তী রামদীনও নীরব। উভয়েই পাগলের অদ্ভুত নর্তন কুর্দন উপভোগ করছে। ফলে প্রহরীদ্বয়ের সতর্কতা বুঝি কিঞ্চিত শিথিল হয়ে পড়ে। অন্ধকারে তারা যদি পাগলটাকে নিরীক্ষণ করতো তা হলে ভয়ে শিউরে উঠতো। নর্তন কুর্দন রত পাগলের ঝুল কালি মাখা বিকট মূর্তির প্রতিটি অঙ্গের পেশী ফুলে ইস্পাত দৃঢ় হয়ে উঠেছে। বীর বাহু বীরভদ্রের মতো দীর্ঘ ভুজ বিস্তার করে শত্রু সংহারের জন্যই বুঝি তার এত অস্থির চঞ্চলতা, এত নাচন কুঁদন!

অগ্রগামী সিপাহী মিশিরের টর্চের আলো অদূরে কোণের দিকের দেয়ালের উপর কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে ছোট্ট একটা লৌহ কপাটের ওপর নিবদ্ধ হয়। উচু দেয়ালের সঙ্গে দরজাটা আঁটা—খিড়কীর আকার। একজনের যাতায়াতের মতো প্রশস্ত। বন্দী উত্তেজনায় অধীর কিন্তু অবিচলিত এবং একইভাবে উল্লসিত উল্লম্ফন রত। চক্ষু দুটি শিকারী ব্যাঘ্রের মতই জ্বলছে: যেন দুটি অগ্নি গোলক—শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যগ্র!

দরজার ধারে পৌঁছে মিশির টর্চের আলোতে তালাটা ভাল করে দেখে। বহুদিনের অব্যবহারে লোহার কপাটও তালা উভয়েই মরচে-ধরা। হাতের দড়িটা বুটের নিচে চেপে ধরে সে ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে এক গোছা চাবি বের করে। উঁবু হয়ে তালায় চাবি ঢুকিয়ে খটখট শব্দে তালা খোলার চেষ্টা করছে। পাগলের নর্তন কুর্দন আরো বেড়ে গেছে। চরম মুহূর্ত সমাগত! তালা খোলার আওয়াজ হওয়া মাত্রই পাগল নাচতে নাচতে রামদীনের নিকটবর্তী হয়। আর যে মুহূর্তে ঝন্‌ঝন্ শব্দে শেকল খুলে যায় সে ভীম বেগে লম্ফ দিয়ে দু'হাত তুলে রামদীনের ঘাড়ে প্রচণ্ড রদ্দা মারে। তারপর চোখের পলকে পেছনে সরে উঁবু হয়ে হেঁচকা টানে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে বাঁ হাতে গলাটা পিঠের সঙ্গে চেপে ধরে; সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা রামদীনের বগলে ঢুকিয়ে এমন কৌশলে হাতটা মুচড়ে দেয় যে তার রিভলবারটা অনায়াসে অমুতোষের হাতে এসে যায়। পরমুহূর্তে রামদীনের দু'হাত কাঁধের উপর এনে মাথাটা নিচু করে ডান

পাটা পেছন দিকে তুলে তাক করে ছুঁড়ে মারে। রামদীন ঘটোৎকচের মতো ছিটকে মিশিরের ওপর গিয়ে পড়ে। মিশির তখন মরচে-ধরা দরজাটা টানাটানি করে খোলার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছিল। রামদীনের ভারে মিশির হুমড়ি খেয়ে দরজার ওপর পড়ে। উভয়ের প্রচণ্ড চাপে দরজা আলগা হয়ে যায়। পাগল তৎক্ষণাৎ রশি টেনে নিয়ে নিজেকে মুক্ত করে তাদের উপর লাফিয়ে উঠে পাঁজর বরাবর সজোরে কয়েক ঘা লাথি কসিয়ে দেয়। তারপর পরস্পরের মাথা এমন বিষম জোরে ঠুকে দেয় যেন এক জোড়া বেল সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিশিরের কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবারটা বের করে নেয়।

দু'-দুটো রিভলবার! আশাতীতভাবে লব্ধ পরম এক অমূল্য সম্পদ! রিভলবার দুটো হাতে নিয়ে অনুতোষ যুগপৎ আনন্দে বিহ্বল ও উত্তেজনায় অধীর। ইচ্ছা হলো সিপাহী দুটোকে গুলি মেরে সাবাড় করে দেয়। কিন্তু দলীয় অনুশাসন—নিজের জীবন বিপন্ন না হলে অহেতুক নরহত্যা কদাপি নয়—স্মরণ করে নিবৃত্ত হয়। পরক্ষণে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত! এক বাজীকর যেন অদ্ভুত ভোজবাজী দেখিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল! অসাধারণ শারীরিক বলদৃপ্ত কলাকৌশল, দক্ষতা এবং বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই বিপজ্জনক দুরূহ কর্ম সমাধা হলো। আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় সিপাহীদ্বয় এমন বিমূঢ়, বিপর্যস্ত ও পংগু হয়ে গিয়েছিল যে তারা বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করবার অবকাশ পায়নি!



দেশ-বন্দনার পর দেশমাতৃকার নামে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শেষ অঙ্কে গীতা হস্তে—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপ্লবী জীবনের শুরু তা শুধু মাতৃভূমির উদ্ধার কল্পে নিয়োজিত ও স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত। সে জীবন কঠিন

নিয়মানুবর্তিতা ও কঠোর শাসন অনুশাসনের নাগপাশে আবদ্ধ। ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে প্রত্যাবর্তনের অন্য কোন পন্থা নেই। ত্রুটি বিচ্যুতি, শপথ ভঙ্গ ইত্যাদির জন্য মাত্রা ভেদে লঘু গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা বলবৎ। 'মাতৃবৎ পরদারেষু'—এর ব্যতিক্রম অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ক্ষমাহীন অতি গুরুতর অপরাধ। বিপ্লবী আইনে তার একমাত্র বিধান--মৃত্যু দণ্ড!

সুতরাং সে রাত্রির গোপন অধিবেশন স্থলে পুলিশের আবির্ভাব যেমনি অভাবিত তেমনি বিপ্লবীদের নিকট এক মহা বিপদের ইংগিত। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল যে সব বিদেশীয় রাষ্ট্র অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্যদানে ইচ্ছুক সে বিষয়ে এবং তৎসঙ্গে নৌজাহাজ মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ইত্যাদি অর্পণ সম্বন্ধে স্থান নিরূপণের আলাপ আলোচনার জন্য বিদেশ প্রত্যাগত সর্বভারতীয় এক প্রখ্যাত বিপ্লবীর উপস্থিতি হেতু ঐ বৈঠক ছিল নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকের কুটিল চক্রান্তে সব পণ্ড হলো! বিপ্লবীদের মধ্যে আত্মগোপনকারী লুকায়িত শত্রু পদলেহী এক বিভীষণের অস্তিত্ব প্রকাশ পেল!

দলের মধ্যে কে ঐ পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত? এ জিজ্ঞাসা নেতৃবৃন্দকে শঙ্কিত ও চিন্তিত করে তুললো। আম্রকাননের অভ্যন্তরে গোলপাতা-ছাওয়া ছোট্ট কুটিরের মধ্যে দু'জন মুখোমুখী বসে উক্ত জটিল প্রশ্নের জট-ছাড়ানো আলোচনায় নিবিষ্ট। উভয়ের চেহারা পোষাক পরিচ্ছদও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঘরের কোণে রক্ষিত লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতে তাদের অবয়ব অস্পষ্ট, কণ্ঠস্বর নিম্ন। বাইরে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষ ছায়ায় তমিস্রা আরো ঘন। চোখ মেলে ভাল করে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় কুটিরের অনতিদূরে গাছের গা ঘেঁষে ছায়ার সঙ্গে মিশে কেউ স্থাণুবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে। হয়তো কারো প্রতীক্ষারত কিংবা কুটির-স্থিত ব্যক্তিদের পাহারা রত।

কথা বলতে বলতে উভয়েই নিশ্চুপ নীরব হয়ে যান। হঠকারী বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হয়েও তাঁদের সন্দেহের বুঝি নিরসন হয় না! মনের কোণে সংশয় উঁকিঝুঁকি দেয়—সত্যি কি এ সম্ভব! যে যুবক তার আদর্শ চরিত্র আর একনিষ্ঠ কর্মগুণে সক্রিয় সদস্যপদে উন্নীত হয়েছিল তার এত দূর শোচনীয় ঘৃণ্য অধঃপতন! এ যে কল্পনার অতীত!

—সত্যই অবিশ্বাস্য! খাটো চুল গৈরিক বস্ত্রাবৃত পুরুষ সম্মুখে উপবিষ্ট স্কন্ধ-বিলম্বিত-কেশ, শুভ্র শ্বেত বসন পরিহিত সৌম্যদর্শন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করেই বললেন : প্রাথমিক রিপোর্ট তো আমি ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করিনি। সে-রাত্রে উপস্থিত অনুপস্থিত সদস্যদের গতিবিধি বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধান ও অনুসরণ কালে হঠাৎ দেবু না-পাত্তা। এ-পাড়া সে-পাড়া সর্বত্রই সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাকে খোঁজা হচ্ছে। দলের অগোচরে তার এই আকস্মিক রহস্যজনক অন্তর্ধানের ব্যাখ্যা পলায়ন ভিন্ন আর কি হতে পারে! আপনকৃত কর্মের জন্য জীবন সংশয় ভেবে হয়ত সে গা ঢাকা দিয়ে পুলিশের আশ্রয় নিয়েছে! সেখানে বিভীষণের মতোই সে আপন গোষ্ঠীর গুপ্ত তথ্য পুলিশকে সরবরাহ করছে! ঘটনাটা খুবই আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে!

জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অচিরেই বিশ্বাস-হন্তার সমুচিত শাস্তি বিধান অবশ্যই কর্তব্য। শেষ কথা উচ্চারণকালে বক্তার কণ্ঠস্বর বুঝি একটু কেঁপে উঠে।

—কিন্তু দাদা, চরম দণ্ড কার্যকরী করতে যদি পুলিশের সঙ্গে—বলেই প্রশ্নকর্তা সম্মুখে উপবিষ্ট নিশ্চল ধ্যানগম্ভীর মূর্তির প্রতি দৃকপাত করে কোন সাড়া পেলেন না। বুঝলেন তাঁর তূষ্ণীভাব এখন ভাঙবার নয়। এরূপ অবস্থার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সুতরাং কালক্ষেপ বৃথা। তার আননে স্পষ্ট চিন্তার বলি রেখা। তিনি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বাইরের ঘন অন্ধকারে খানিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যায়।

কুটিরের অভ্যন্তরে স্তিমিত আলোর অদূরে উপবিষ্ট পুরুষ তখনও নির্বাক নিশ্চল। কিছুক্ষণ আগে নির্মম চরম দণ্ডাজ্ঞা দেবার মুহূর্তে তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের অন্তরালে যে ব্যথার আভাষ ফুটে উঠেছিল তা বুঝি তিনি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কুশ ক্ষুরের মতো এক জিজ্ঞাসা তাঁর অন্তর অবিরত বিদ্ধ করছে—কেন, কেন এই শোচনীয় ঘৃণ্য অধঃপতন? বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মৃত্যু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোন মুহূর্তে তা বরণ করতে হতে পারে। মহৎ কর্ম সম্পাদনে মৃত্যু শ্লাঘার। 'হতো বা প্রাপ্স্যসী স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহী'—গীতার এই মহৎবাণী বিপ্লবীদের মহামন্ত্র। কিন্তু শপথ ভঙ্গ, বিশ্বাস ঘাতকতা কিংবা কৃতঘ্নতা জনিত মৃত্যু অপযশ আর অপমৃত্যু ব্যতীত কিছু নয়।

কিন্তু কেন? সেই একই প্রশ্ন বারংবার তাঁর হৃদয় মন মথিত করছে। স্বীয় কর্মগুণ ও দক্ষতা প্রমাণ করে যে ব্যক্তি দলের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছিল তার এতদূর সর্বনাশ। অধঃপতনের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন আর কোন বিধান বিপ্লবী অভিধানে নেই। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে ব্যক্তি একদিন অদ্ভুত প্রত্যুতপন্নমতিত্বের সঙ্গে ক্ষিপ্র সুনিপুণ নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে তাকে বিপদ-মুক্ত করেছিল আজ কিনা তার বিরুদ্ধেই এই চরম দণ্ডের আদেশ দিতে হলো! হৃদয়ের মায়ামমতার কোমল তন্ত্রীগুলোতে ব্যথার সুর বিপ্লবী বিধি নিষেধের বেড়াজাল, শাসন অনুশাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে অন্তরের অন্তস্তলে বুঝি গুমরে কাঁদে। অতীতের রোমহর্ষক স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে।

সে এক দারুন দুর্যোগের রাত্রি। গভীর, গাঢ়, নীরন্ধ্র অন্ধকার— অতি কাছের মানুষ পর্যন্ত দেখা যায় না। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি—মাঝেমাঝে দমকা হাওয়া! নদীতে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো। পাহাড়িয়া নদীর উন্মত্ত উদ্দাম স্রোতের টানে আর হাওয়ার জোরে নৌকা তীব্র বেগে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। দেড়ঘণ্টার দূরত্ব মাত্র আধঘটায় অতিক্রম করে নৌকা নদীর অপর পাড়ে খালের ভেতর প্রবেশ করে। কিছুদূর যেতেই এক গঞ্জ। তার থেকে খানিকটা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নৌকা রেখে আরোহীরা সব নেমে পড়ে। গ্রামের পথঘাট নিঝুম নিস্তব্ধ জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই, এমন কি শেয়াল কুকুরও নীরব। পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথ চলে তারা পৌঁছল এক ধনীর গৃহে। গঞ্জে তার বৃহৎ আড়ৎ—বাণীর কারবার। রমরমে ব্যবসা—প্রচুর অর্থের লেন দেন। পরিবারে মেয়েদের গায়েও না কত গয়না, কত অলঙ্কার— সৌখীনতা ও প্রাচুর্যের সাক্ষর! সুতরাং বিপ্লবীদের ভাণ্ডার প্রভূত অর্থ ও প্রচুর অলঙ্কারে পূর্ণ হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা! অগ্রগামী দল আগে থেকেই গৃহের আনাচে কানাচে অন্ধকারে আত্মগোপন করে সতর্ক পাহারা দিচ্ছিল। দলপতির উপস্থিতি মাত্রই তারা বেরিয়ে আসে। তিনি সকলকে আপন আপন কর্তব্য বুঝিয়ে তাদের হাতে একখানা রুমাল ও একটি করে টর্চ দিয়ে গৃহে দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করবার ফন্দিফিকির বাৎলে দেন। তারপর সকলকে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে তার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করতে বলে তিনি অন্ধকারে অন্তর্হিত হন।

সময় দ্রুত গতিতে বয়ে যাচ্ছে তবুও দলপতির দেখা নেই! যুবক দল অস্থির অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশক তাদের ঘিরে দংশন করছে। হাত পা নাড়বার হুকুম নেই। রাক্ষুসে জীবগুলি এই সুযোগে নিরুপায় মানুষগুলোর রক্ত চুষে খেয়ে সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত করছে।

হঠাৎ বাড়ির সম্মুখের সদর দরজা খুলে যায়। দলপতি বেরিয়ে আসেন। তিনি দেবুকে তার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে অভিযান পরিচালনার ভার তার ওপর ন্যস্ত করে সময়ের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধেও তাকে হুশিয়ারি দেন। কারণ নদীতে ভাঁটা শুরু হলেই খালের জল দ্রুত নেমে যাবে। তখন তাদের নৌকো ছাড়তেই হবে। সুতরাং ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যেই ঘড়ির কাঁটা ধরে সকল কর্ম নিষ্পন্ন করা চাই। একটি মুহূর্ত অপব্যয় করলে চলবে না। বিলম্বে বহু বিঘ্ন। পরক্ষণে সকলকে সম্বোধন করে বললেন—মেয়েদের গায়ে আমরা হাত দিই না। কোন অবস্থাতেই তার ব্যতিক্রম যেন না হয়। অতঃপর হাতের ইংগিতে তিনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেন।

উপদলপতির সুদক্ষ পরিচালনায় তরুণ দল বিনা ক্লেশে গৃহে প্রবেশ করে তৎপরতার সঙ্গে নিদ্রিত গৃহস্থদের চোখ শক্তিশালী টর্চের আলোতে ঝলসে দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পুরুষদের বুকের ওপর রিভলভার চেপে ধরে। মেয়েদের যার যার ঘর থেকে বের করে ভিন্ন ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে অতর্কিত আক্রমণাত্মক কৌশল প্রয়োগ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুবকেরা সিন্দুকের অর্থ ও অলঙ্কার হস্তগত করে।

অকস্মাৎ স্বয়ং দলপতি মেয়েদের ঘরে উপস্থিত হন। তিনি তাদের বললেন—মেয়ে মাত্রই বয়সের তারতম্য অনুসারে আমাদের মা কিংবা বোন। আমরা লুণ্ঠন করতে এসেছি সত্য কিন্তু আমরা খুনি অথবা ডাকাত নই—দেশের দশের সেবক মাত্র। দেশমাতৃকার উদ্ধার কল্পে আমাদের অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারের প্রয়োজন। মা, বোনেরা, আমরা আপনাদের গায়ে হাত দিচ্ছি না। দয়া করে অলংকারগুলো খুলে দিন। টর্চের তীব্র আলোকে মেয়েদের গায়ের অলংকার থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি ঠিকরে পড়ছিল।

একে একে সকলেই অলংকার খুলে দেয়। কিন্তু গোল বাঁধালো এক তরুণী—সদ্য বিবাহিতা। সারা অঙ্গে অলংকার ঝলমল করছে।

সে অলংকার না খুলে নিশ্চল নিস্পন্দ জড় পদার্থের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দলপতি কঠোর হলেন। তিনি তরুণীর আরো কাছে গিয়ে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করলেন—গহনা খুলে দিন। নচেৎ আপনার স্বামীর অমঙ্গল হবে—তাকে হত্যা করা হবে। স্বামীর নাম শোনা মাত্র তরুণীর ভাবান্তর ঘটে। ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে না, না, আপনারা আমার সব কিছু নিয়ে নিন—তাঁকে রক্ষা করুন। এই নিন, সব খুলে নিন বলেই তরুণী দু'হাত বাড়িয়ে দেয়।

কঠোর কণ্ঠধ্বনি—খুলে দিন।

কান্না জড়িত কণ্ঠে তরুণী বললে—আমার স্বামীকে এখানে নিয়ে আসুন, আমি খুলতে পারছিনা। উত্তেজনায় তরুণী হাঁপাচ্ছিল। তার পীনোন্নত স্পন্দিত বক্ষের ওপর বিলম্বিত সাতলহরীর হীরে, পান্না, চুনী-গুলো যেন কতগুলি কুণ্ডলীকৃত ফণিনীর রোষ কষায়িত চক্ষুব মত জ্বলছে।

এক অভাবিত দৃশ্য! দলপতি বুঝি কিছুটা বিচলিত। আত্মসংবরণ করে তিনি মেয়েটির স্বামীকে নিয়ে আসার হুকুম দেন। স্বামীকে নিয়ে আসা হলো। মুখ রুমালে বাঁধা। পৃষ্ঠদেশে উদ্যত রিভলবারের চাপ। স্বামীকে দেখেই তরুণী কান্নায় ভেঙে পড়ে। চিৎকার করে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—ওগো, নাও, সব খুলে নিয়ে এদের বিদায় কর। নচেৎ তোমাকে মেরে ফেলবে। সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নিরুপায় স্বামীর ইতস্তত ভাব পৃষ্ঠে রিভলবারের চাপ পড়তেই কেটে যায়। তিনি একে একে স্ত্রীব অঙ্গ থেকে গহনা খুলে দলপতির হাতে তুলে দেন। স্বামীকে ঘর থেকে সরিয়ে নেবার কালে তরুণী—না, না, বলে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে ছুটে স্বামীকে ধরতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী মহিলাদের একজন তাকে ধরে ফেলে।

দলের কেহই এরূপ নাটকীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সকলের একান্ত তৎপরতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যায় না। সকলকে একত্রিত করে দলপতি প্রত্যা-বর্তনের আদেশ দেন। সাফল্যে উৎফুল্ল যুবকদল বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে বাইরে হৈ হল্লা চিৎকার শুনে বিমূঢ় হয়ে যায়। এ কি করে সম্ভব? তখন আর ভাববার সময় নেই। দলপতি বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনতিবিলম্বে নূতন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য

প্রত্যাবর্তনের কৌশল ও পদ্ধতির পরিবর্তন করেন। দলকে দুভাগ করে একদলকে অর্থ ও অলঙ্কার সহ বাড়ির পশ্চাৎদিকে মলমূত্র আবর্জনা পেরিয়ে খালের দিকে অগ্রসর হতে এবং অন্য দলকে বাঁয়ে ডোবা অতিক্রম করে বাড়ির সম্মুখে জড় লোকদের পেছন দিকে এলোপাতাড়ি বোমা নিক্ষেপ করতে করতে অন্তর্ধান করবার আদেশ দেন যাতে কেহ তাদের গতিপথ সঠিক নির্ণয় করতে না পারে। দলপতির শেষ আদেশ কেউ ধরা দেবে না।

ততক্ষণে বাড়ির বাইরে লোকজনের চেঁচামেচি, হইচই ডাক চিৎকার আরো বেড়ে গেছে। বাড়ি ঘিরে ফেলে একজোটে ভেতরে ঢুকে ডাকাতদের মোকাবেলা করবার চেষ্টা চলেছে। দলপতি নির্ভীক ও অবিচল। স্বীয় আদেশ ঠিক ঠিক মত পালিত হয়েছে দেখে তার মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠে। তিনি হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি থেকে বার হবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। সেই মুহূর্তে গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ। ত্বরিৎ-গতিতে তিনি রিভলবার বার করে নিজেকে দরজার আড়ালে রেখে বাড়ির পেছন দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজার শেকল তুলে দেন। তারপর দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে গন্তব্যস্থল অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হন। দেয়ালের পরে খানিকটা জায়গা খোলা মেলা। তারপর আবার গাছ-গাছড়া কাঁটা ভরা ঝোপঝাড়। বন্দুকধারী কোথা থেকে কাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে তা দেখবার বা বুঝবার তাঁর সময় নেই। উন্মুক্ত স্থানটুকু কি ভাবে পার হওয়া যায় তা স্থির করে দেয়ালের পাশে জমান জঞ্জাল থেকে কলাপাতা, লতা ঘাস ইত্যাদি নিয়ে পৃষ্ঠদেশ আবৃত করে যেদিকে দেয়ালের ছায়ায় অন্ধকার আরো ঘন সেদিকে হামাগুঁড়ি দিয়ে অগ্রসর হন।

নৌকা অভিমুখে অগ্রসরমান দলের অণুগমনকারী দেবু অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। ঘোর ঘনঘুটি অন্ধকারে পেছন দিকে যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে দলপতিকে দেখতে পায় না। তার আশংকা ভয়ে পরিণত হয়। দলের সকলকে দ্রুত এগোতে বলে এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখলে কোথায় গিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে সেই নির্দেশ দিয়ে দেবু দলপতির খোঁজে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালায়। পুতিগন্ধ আবর্জনা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে অনেকদূর অগ্রসর হয়েও সে দলপতির সাক্ষাৎ পায় না। তবে কি তিনিই

বন্দুকের শিকার হলেন। সে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠে। চিৎকার দিয়ে একবার ডাকবার ইচ্ছা জাগে। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে দেবু তার গতি ত্বরান্বিত করে।

দূরে অন্ধকারাবৃত মাথা উঁচু করা বাড়িটা চোখে পড়ে। তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাড়ির ছাদের ওপর ইতস্তত ঘুরে ঘুরে দণ্ডায়মান একটি কালো ছায়ার ওপর নিবদ্ধ হয়। গাছের আড়ালে আড়ালে শিকারী শ্বাপদের মতো লঘু পদক্ষেপে সে দ্রুত এগিয়ে চলে বাড়ির আরো নিকটবর্তী হতেই দেবু স্পষ্ট দেখতে পায় ঐ ছায়ামূর্তি বন্দুক উঁচিয়ে জংগলের দিকে মুখ করে নিবিষ্ট মনে দাঁড়িয়ে আছে। উগ্র প্রতিশোধ স্পৃহা তার মধ্যে জেগে উঠে! পিস্তল তুলে আরও কিছুটা এগিয়ে নিশান স্থির করে ট্রিগারে চাপ দেয়। পর পর দুটো অগ্নি গোলক নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে যায়। সেই মুহূর্তে বাড়ির বাইরে সম্মুখ দিকে পরপর কয়েকটা বোমা বিস্ফোরণের কর্ণভেদী প্রচণ্ড শব্দে আর লোকজনের চেঁচামেচি ও চিৎকারে গুলির শব্দ ডুবে যায়।

দলপতির ধ্যান গম্ভীর মূর্তি স্মৃতির সলিলে অবগাহন করে উঠে এলো। টেঁক থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন। কারো আগমন প্রত্যাশায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে খানিকটা এগিয়ে আবার কি মনে করে পেছন ফিরে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন। স্বল্পালোকে তার মুখের ভাব বোঝা না গেলেও চলমান দীর্ঘ ছায়াতে প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যাশিত জনের বিলম্ব হেতু মনের উদ্বেগের চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হচ্ছে। চলতে চলতে আবার ঘড়ি বার করে হঠাৎ থেমে গেলেন। আবার ঘড়ি দেখলেন। তারপর লণ্ঠনের পলতেটা বাড়িয়ে আসনে উপবেশন করলেন। মনের উৎকণ্ঠা প্রশমনের জন্যই আসনের নীচ থেকে ছোট্ট নোট বইটি তুলে তাতে মনসংযোগ করলেন।

রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ। চতুর্দিক নিঝুম নিস্তব্ধ। বাইরে আম জাম বকুল বাগানে নিশাচর পাখীরাও নিশ্চুপ নিঃশব্দ। বাতাসে আন্দোলিত বৃক্ষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে দূর গগনে তারার আলোর ঝিকি-মিকি। এমনি সময়ে নিঃসাড়ে একজন কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। লঘু পায়ে উপবিষ্ট তন্মনস্ক পুরুষের সামনে এসে দাঁড়ায়। আগন্তুকের

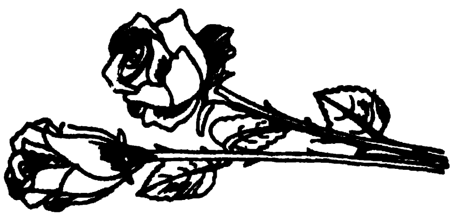
পদ শব্দে মনের উৎকণ্ঠা বিন্দুমাত্র ব্যক্ত না করে মুখ না তুলে জিজ্ঞাসু কণ্ঠে শুধু বললেন, এত দেরী হলো ?

দণ্ডায়মান যুবক সসংকোচে বিনম্র কণ্ঠে জানালেন আজই যাত্রা করবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে এলাম দাদা। শুভস্য শীঘ্রম। সে কারণে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারি নি। আপনি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন শহরের সর্বত্র কড়া পুলিশ মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে। সুতরাং শহরের চৌহদ্দির মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা রূপায়নে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সম্ভব নয়। পুলিশ অবশ্য এখন আগের মতো সর্বত্র পাগল খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে খোয়াড়ে পুরে ঠেঙাচ্ছে না। তারা বুঝতে পেরেছে সে-দিনের ঘটনা, আর যাই হোক সত্যিকারের কোন পাগলের কাণ্ড নয়। সেজন্য ট্রেজারি, বড় পোষ্ট আপিস ইত্যাদিতে ২৪ ঘণ্টা ঘড়ির কাঁটা ধরে পুলিশ ও মিলিটারির পাহারা চলেছে। তার ওপর আশপাশের রাস্তা-গুলিতে লোক চলাচলের প্রতি টিকটিকির দল তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং পুলিশ মিলিটারির সতর্কতা ও পাহারা শিথিল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা শ্রেয় বিবেচনা করেই পূর্ব পরামর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাকগাড়ি লুণ্ঠন করা স্থির করেছি। সে উদ্দেশ্যে আমি, স্বদেশ, প্রভাত ও অঞ্জন প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়েই রওনা দিচ্ছি। সকলেরই স্থান কালানুযায়ী ছদ্মবেশ। সপ্তাহান্তে ঐ অঞ্চলে শিব চতুর্দশীর বিরাট মেলা। এতে সাধু সন্ত, ভিখিরি ফকির, সঙ বাজীকর ইত্যাদির বহু বিচিত্র বিরাট এক জনসমাবেশ ঘটবে। উপলক্ষটা নিঃসন্দেহে আমাদের অভিযানের পক্ষে অনুকূল। আশীর্বাদ করুন, বলেই যুবক নতজানু হয়ে তাঁর পদস্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়ায়।

উপবিষ্ট পুরুষের ললাটে চিন্তার বলিরেখা অন্তর্হিত হলো। স্মিতাননে প্রণত যুবকের মস্তকে হাত রেখে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—আমার আশীর্বাদ তো ভাই নিরন্তর তোমাদের দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত করে রেখেছে। দলপতির যোগ্য শক্তি, সামর্থ্য, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, স্থিরবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা তোমার আছে। মধুকৈটভ হারী মুরারি দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনে আমাদের কর্মের সহায় হোন। সফলতা দান করুন। ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন—লুণ্ঠিত অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী যার হাতে অর্পণ করবে যথা সময়ে তার সাক্ষাৎ পাবে। চক্ষু কর্ণ মন একীভূত করে সাবধানে চলবে। যে কর্ম করতে যাচ্ছ তাতে বিন্দুমাত্র অনবধানতা এবং

সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির পরিণতি মারাত্মক। কথা শেষ করে তিনি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে পেছন ফিরে বললেন—হ্যাঁ, আর একটা বিষয়ে তোমাকে অবহিত করা দরকার। চুরি ডাকাতি ইত্যাদি প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে সরকার জোড়াদেওয়া কাগজের টাকা আইনত গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। ট্রেজারী ও পোষ্টআপিস পরস্পরের মধ্যে কাগজের টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রতি অর্ধাংশ বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হচ্ছে। অতঃপর খণ্ডিত অংশদ্বয় নম্বর মিলিয়ে জোড়া দিয়ে একত্রিত হলে পর পূর্ণ অংকের টাকা রূপে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং খণ্ডিত অর্ধাংশ কাগজের টাকার কোন মূল্য নেই যদি না ঐ একই সংখ্যার অপর অংশ হস্তগত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে প্রাপ্ত প্রতিটি খণ্ডিত নোটের বাণ্ডিল নম্বর মিলিয়ে দেখবে। নম্বরে গরমিল হলে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলবে।

—শুভমস্তু, বলে তিনি হাত তুলে যুবককে বিদায় দেন।



সে রাত্রে বিপ্লবীদের এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অকস্মাৎ পুলিশের আবির্ভাবে পণ্ড হয়ে যাওয়াটা দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও শিথিলতারই বহিঃপ্রকাশ। এমন গুরুত্বপূর্ণ গোপন সম্মেলনের দিনক্ষণ বিশেষ সভ্য ব্যতীত অন্য কারো জানার কথা নয়। সুতরাং দলের বিশেষ শ্রেণীর সভ্যদের মধ্যেই যে পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দলের মধ্য থেকে এই দুষ্ট ব্রণকে নির্মূল করা খুবই জরুরী। সেই সঙ্গে সভ্যদের প্রত্যেকেরই আত্মানুসন্ধান, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, আচার আচরণ কথাবার্তায় একান্ত সতর্কতা ও সাবধানতার প্রয়োজন।

পুলিশ আবির্ভাবের সংকেত বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ উপস্থিত সভ্যবৃন্দ গোপনে সরে পড়ে। পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে পলায়নে এঁরা সকলেই তৎপর ও সিদ্ধ-হস্ত। খানা খন্দ

ডিঙিয়ে, নালা খাত পেরিয়ে, ঝোপঝাড় এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেবব্রত নির্জন নিরালা পথে অন্যমনস্কের মতোই চলেছে। কিছুক্ষণ আগেকার আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাত জনিত বিমূঢ় ভাব বুঝি তখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আচম্বিতে পথিপার্শ্বে ঝোপের ভেতর খশ্ খশ্ শব্দে সচকিত হয়ে স্বভাববশতঃ কোমরবন্ধে হাত দিয়েই সে আপন সত্তায় ফিরে আসে। পরক্ষণেই সে রাস্তার বিপরীত দিকে নেমে পড়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। না, কিছুই চোখে পড়ছেনা। কেবল রাস্তার ওধারে ঐ ঝোপের মধ্যে ঝটাপটি যেন আরো বেড়ে গেছে—বোধ হয় শেয়ালে শেয়ালে ঝগড়া বাধিয়েছে। পুনরায় রাস্তায় উঠে চলতে চলতে দেবব্রত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিচার বিবেচনা করতে থাকে। মনের মধ্যে নিদারুণ এক অস্বস্তিভাব তোলপাড় করছে। কে সেই বিশ্বাসঘাতক পামর যে তাদের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক পণ্ড করে তাদের সকলকে ধরিয়ে দেবার মতলব করেছিল! পরিচিত সভ্যদের মুখ তার মানসপটে ভেসে উঠে। প্রত্যেকের নাড়ি নক্ষত্র তার জানা—বিপ্লবের অগ্নিময় রুদ্র ভয়াল রক্তাক্ত পথে তারা বহু পরীক্ষিত, অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া যাত্রী—তাদের মধ্যে কারো পক্ষে কি এই মারাত্মক বিশ্বাসঘাতক অপকর্ম কদাপি সম্ভব? তবে কি করে এটা ঘটলো? নাকি পুলিশ অন্য কোন উৎস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেছে! কি সেই উৎস? কেই-বা সেই উৎসের মূলে? এই সব নানা জিজ্ঞাসা তার মনের মধ্যে অতিশয় অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

অবশ্য এটা তার জানা যে পুলিশের গোয়েন্দারা নানা উৎস থেকে সংবাদ সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণ করে কাজে অগ্রসর হয়। কিন্তু আজ রাত্রেই যে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণকারী এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসবে তা তাদের গোচরে এল, কি ভাবে? আজ রাত্রির কথা স্মরণ হতেই হঠাৎ তার মনের মধ্যে যে সন্দেহের উদয় হয় ক্রমে তাহা এক বিরাট জিজ্ঞাসার রূপ নিয়ে তার অন্তরে তোলপাড় সুরু করে। তবে কি সে নিজেই ঐ সংবাদের উৎস? মনে সন্দেহের কুয়াশা অপসৃত হয়ে এক নিদারুণ প্রত্যয় যেন তার সম্মুখে দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। বিগত রাত্রে অঞ্জলির বাড়িতে উপস্থিতি কালে অঞ্জলি তাকে আজরাত্রে তার দিদির বৌভাতের নিমন্ত্রণে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যে অনুরোধ জানিয়ে-

ছিল তা সে প্রত্যাখ্যান করে। তখন কি অসাবধানবশতঃ নিয়ম বহির্ভূত এমন কিছু তার মুখ থেকে বেফাঁস বেরিয়েছে যা পুলিশের গোয়েন্দাদের কর্মের সহায়ক হয়েছে! তার চেয়ে বড় কথা ঐ সময়ে অঞ্জলিদের ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কে কে ছিল? অঞ্জলির মামাতো ভাই অনঙ্গের কথা স্মরণ হতেই সে যেন সম্মুখে এক কাল সাপ দেখতে পায়। অনঙ্গের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ সে কানাঘুষায় শুনেছে। আজ তা সত্যি ও বদ্ধমূল হলো। বুঝলো এই কালসাপই তাকে দংশন করেছে। তারই আশীবিষ তাকে তিলে তিলে গ্রাস করছে। দেবব্রত চলৎশক্তিহীন অবস্থায় একটা ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখ তার অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্দিকে স্তূপীকৃত অন্ধকারে শত সহস্র কাল সাপ তীক্ষ্ণ-কুটিল রক্ত-চক্ষু মেলে লকলকে জিহ্বা বের করে দংশানোদ্যত ফণা তুলে তাকে ঘিরে ধরেছে। তার শ্বাস বুঝি রুদ্ধ হয়ে আসছে! হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বিত ফিরে আসে। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়—ছিঃ ছিঃ সে কি এতই ভীরু! ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে দিয়ে পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করে।

ঘন তমসাবৃত জনমানবহীন নির্জন নিরালা পথে চলতে চলতে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলি দেবব্রতের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে। স্বাধীনতার বেদীমূলে শপথ গ্রহানুষ্ঠানের পর আত্ম বিশ্বাসে ভরপুর, শৌর্য বীর্যে বলীয়ান ও সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের গৌরবে গরীয়ান উন্নত শির নিয়ে ঈপ্সিত আলোকোজ্জ্বল স্বাধীনতার তোরণে পৌঁছবার কণ্টকাকীর্ণ শত সহস্র শহীদের রক্তঝরা পিচ্ছিল পথে একদিন তার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাই কিনা আজ মুহূর্তের অসাবধানতায় অখ্যাতির অবিশ্বাসের কলুষিত অতল পঙ্কে বিলীন হয়ে যাবে! নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

মনে পড়ে দলের মধ্যে গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে বিশ্বাসঘাতক নিবারণের মৃত্যুদণ্ড দলের নির্দেশে সে নিজ হাতে কার্যকরী করেছে। নিবারণের অনুরোধ উপরোধ অসহায় কাতর ক্রন্দন তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। তদরূপ নিষ্ঠুর কঠোরতা নিয়েই দলীয় বিধানানুযায়ী নিজ মৃত্যুদণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শহীদের মতো নিজেই সে কার্যকরী করবে। কারণ সে জানে যদিও সে বিশ্বাসঘাতক নয়

তবু দশচক্রে ভগবান ভূত-এর মতোই সে এক বিশ্বাস-হন্তায় পরিণত! স্বদেশ উদ্ধারে উৎসর্গিত-প্রাণ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পক্ষে এর চেয়ে বড় অপমান ও কলঙ্ক আর কি হতে পারে! অতএব মৃত্যু বরণ করা ভিন্ন তার তো অন্য গতি নেই! যে গুপ্তচরের জন্য গুপ্তচর অখ্যাতি নিয়ে এক স্বাধীনতার পূজারীকে অভীষ্ট স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই রূপ রস গন্ধে ভরা এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হচ্ছে সেই ঘৃণ্য কুকুরের স্বীকারোক্তি নিয়ে তাকেও চিরতরে সরিয়ে দিয়ে সে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দলের শীর্ষ দরবারে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তার এই শেষ বিদায়-ভাষণ ও আত্মবলি কেবল মাত্র দোষ প্রক্ষালনর কারণ স্বরূপ বিবেচিত না হয়ে যেন দলের ভবিষ্যৎ পরিচালন ব্যবস্থার হিত সাধনে নিয়োজিত হয়।

পিতামাতা ভাই বোনদের নিকট হতে বিদায় নেওয়ার প্রসঙ্গ অবাস্তব। যেদিন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন কল্পে শপথ নিয়েছে সে দিন থেকেই সে ঘর-ছাড়া। তাঁরাও তাকে নিশ্চয়ই খরচের খাতায় লিখে চির বিদায় দিয়েছেন। তার উপস্থিতি বরং তাঁদের নিকট বিস্ময়েব বস্তু এবং এক অশ্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তার চির অনুপস্থিতি তাই তাদের চিত্ত-বেদনার কারণ হলেও বিস্ময়ের উদ্রেক করবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম অঞ্জলি—তাব আবাল্যের খেলার সাথী এবং দেশোদ্ধার সংগ্রামে তাব অনুগামিনী। এযাবৎ কোনো দিন কোনো কিছুই সে চায়নি, কোন মান অভিমান, অভাব অভিযোগ কিংবা প্রতিবাদ জানায় নি। নিঃশব্দে নীরবে তাকে অনুসরণ করে সম্পূর্ণ নিরলস দেশ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তার সঙ্গে বিদায় পর্বটা নিঃসন্দেহে অতীব বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক হবে—কিন্তু উপায় কি!

নিজেকে বজ্রেব (বজ্রাদপি কঠোরেন) মতো কঠোর কঠিন করে অবিচলিত পদক্ষেপে দেবব্রত জীবন রঙ্গভূমির শেষ অভিনয়ে নিজ ভূমিকা নির্ণয় করে অগ্রসর হতে থাকে। কিছু দূর গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে সংকীর্ণ এক গলি পথে এগিয়ে শেষ বাড়িটার বৈঠকখানার দরজায় মৃদু করাঘাত করতেই একটি কিশোর ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে দেবব্রতকে দেখে অবাক হয়ে বলে—একি দাদা তুমি, এত রাত্রে? দেবব্রত মুখে আঙুল রেখে চুপি চুপি পরিতোষকে জামা গায়ে বেরিয়ে এসে তার অনুসরণ করতে ইশারা করে। পরমুহূর্তেই ফিরে গিয়ে তাকে তার খাতা

থেকে ছুখানা সাদা কাগজ একটা ফাউন্টেন পেন না থাকলে লেড পেন্সিল নিয়ে আসতে বলে। পরিতোষ ঘর থেকে কাগজ পেন্সিল এনে দেবব্রতের হাতে দিয়ে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিস্ময়াবিষ্টের মতো চলতে থাকে। গলি ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ে দেবব্রত পরিতোষেব হাত ধরে চলতে চলতে একটা মাঠের ধারে এসে দাঁড়িয়ে যায়। পরিতোষকে কাছে টেনে এনে দেবব্রত জানায়—তোমাকে আজ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেব পরি ভাই, করতে পাববে তো?

আচম্বিতে ঘুম ভাঙাব পর থেকেই পবিতোষেব নিকট দেবব্রতের কথাবার্তা চালচলন কেমন যেন হেঁয়ালীপূর্ণ অস্বাভাবিক অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছে। সে এতক্ষণ বিস্ময়াহত বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ কবেছে। দেবব্রতেব কথা কানে যেতেই সে প্রথমে থতমত খেয়ে পর-মুহূর্তেই বলে ওঠে—কি বললে, কাজ! এযাবৎ তোমাব নির্দেশ মত সব কাজই তো করে এসেছি সুতবাং নূতন করে জিজ্ঞাসাব কি কোন অবকাশ আছে দাদা? কাজ তো কোন ছাড়—তোমাব জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত। বলো তো এখুনি দেখিয়ে দি।

দেবব্রত অভিভূত হয়ে থমকে গিয়ে জবাব দেয়—বালাই, এমন কথা কি কখনো বলতে পাবি? তোমাকে হাবিয়ে আমি বাঁচবো কি করে? তুমি আমার চোখেব মণি, আমি তো তাহলে চক্ষুহীন হয়ে যাবো—বলেই পরিতোষকে কাছে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মাথা চুমোয় ভরিয়ে দেয়। আসন্ন বিদায় বেলায় তাব হৃদয় নিঙড়ানো তপ্ত অশ্রু আশীর্বাদ হয়ে পরিতোষেব মাথায় ঝরে পড়ে। পরিতোষ অবাক হয়ে দেবব্রতের মুখেব দিকে চেয়ে—অন্ধকারে অস্পষ্ট হলেও বলে—একি দাদা, তুমি কাঁদছো?

—না ভাই, এ আমার কান্না নয়—আনন্দাশ্রু তোমাকে আশীর্বাদ করছে—তুমি একজন মস্ত সাহসী বীর হবে—বড় হয়ে দেশোদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করবে। পরিতোষকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দেবব্রত তার হাত ধবে চলতে চলতে বলে- ভাই তুমি অঞ্জলিদিব দিদির যে বাড়িতে বিয়ে হয়েছে তা চেনো? সেখানে আজ বৌভাতের সমারোহ চলেছে।

—বলো কি দাদা, আমি না চিনি এ তল্লাটে এমন কোন ঘর বাড়ি আছে নাকি? ঐ তো দূরে চাঁদমারির মাঠ—বলো কি করতে হবে।

—প্রথমে খোঁজ নেবে অঞ্জলিদি ওবাড়িতে আছে না চলে গেছে।

অঞ্জলিদির দেখা পেলে তাকে বাইরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করবে অনঙ্গবাবু আছেন, না চলে গেছেন। থাকলে অঞ্জলিদিকে বলবে তিনি যেন দূর থেকে অনঙ্গবাবুকে দেখিয়ে দেয়। অনঙ্গবাবুকে চিনে তুমি অঞ্জলিদিকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি ঐ যে ল্যাম্পপোস্টটা দেখছো, তার নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকবো।

পরিতোষ চলে যেতেই দেবব্রত কাগজ পেন্সিল বার করে দলের প্রধানকে সম্বোধন করে লেখে :

দাদা, গুপ্তচর না হয়ে গুপ্তচরের নিকট ধরা পড়ে গিয়ে গুপ্তচরের সামিল হয়ে গেছি। আমার অতীতের সব ক্রিয়া কাণ্ড অখ্যাতির অতল পঙ্কে ডুবে গেল! সুতরাং দলের বিধানানুযায়ী ও দলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মৃত্যু বিনে গতি নেই। আর যে গুপ্তচর আজকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ভঙ্গের কারণ তাকেও খুঁজে বার করে চিরতরে সরিয়ে দিয়ে আপনাদের চিন্তা ভাবনার কিছুটা লাঘব করে গেলাম।

পরলোক, পুনর্জন্ম আছে কি না জানিনা। যদি থেকে থাকে তা হলে আশীর্বাদ করবেন জন্মান্তরে পুনরায় যেন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে দেশোদ্ধারের মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারি।

ভক্তিপ্রণতঃ চিত্তে প্রণাম জানিয়ে চির বিদায় নিচ্ছি।

ইতি আপনারই চিরকালের

দেব।

অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে পরিতোষ গাড়ি-ঘোড়ার মেলা, আলোর বন্যা আর কলকোলাহল শুনে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়। এত রাত্রেও গলিটা উৎসবে সরগরম। সম্মুখের খোলা প্রাঙ্গণে সামিয়ানার নিচে লোকজনের পাশ কাটিয়ে ভেতরে এগোতে গিয়ে একজন ভদ্রমহিলাকে দেখে সে অঞ্জলিদিকে খবর দিতে বলে। খবর পাওয়া মাত্রই উৎসব সাজে সজ্জিত অঞ্জলি বাইরে এসে পরিতোষকে দেখে চঞ্চল ও হতবাক হয়ে যায়। পরিতোষ দিদির অস্থির বিমূঢ়ভাব দেখে বিস্মিত হলেও সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করে—অনঙ্গবাবু আছেন?

—হ্যাঁ, ঐ তো চেয়ারে বসা ভদ্রলোকটির সঙ্গে যিনি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কিন্তু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কেন বলো তো? তাঁর সঙ্গেই তো বাড়ি যাবো বলে তৈরি হয়েছি।

—ওঃ, বলেই পরিতোষ আদেশের ভঙ্গিতে বলে—চলুন, আপনাকে ডাকছেন।

অঞ্জলির বিস্ময় বিমূঢ় ভাব বুঝি তখনো কাটেনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পরিতোষের পেছনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কে ডাকছে, কেন ডাকছে তা তো বললে না।

—দাদা ডাকছেন।

—দাদা! কোন দাদা?

—কেন আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার দাদা, দেবু দাদা।

ততক্ষণে তারা গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় উঠে এসেছে! চোখ ধাঁধানো আলো থেকে অন্ধকারে এসে অঞ্জলি আশে পাশে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না! তার উপর দেবুর নাম শোনা মাত্রই সে অস্থির ও আকুল হয়ে ওঠে। এ অসময়ে এত রাত্রে তার অকস্মাৎ আবির্ভাব! নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু অঘটন ঘটেছে!—কোথায় তিনি, বলেই অঞ্জলি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে। অন্ধকারে দিক ঠিক করতে না পেরে রাস্তা থেকে গড়িয়ে মাঠে পড়ে যায়। পরিতোষ দৌড়ে এসে তুলে ধরে বলে —অস্থির হবেন না—আমার সঙ্গে আসুন। নির্দিষ্ট ল্যাম্প পোস্টটার কাছে পৌঁছে দাদা বলে ডাকতেই দেবব্রত বেরিয়ে আসে। সেই মুহূর্তেই অঞ্জলি—কোথায় তুমি বলেই তীব্র বেগে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। এবং তারপর দু'হাত দিয়ে দেবব্রতের অঙ্গ প্রতঙ্গ অনুভব করতে করতে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

দেবব্রত এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। অঞ্জলি যে এভাবে ভেঙে পড়তে পারে তা তার ধারণার বাইরে। সেও কয়েক মুহূর্ত বুঝি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজেকে ভুলে সে-ও কি তবে অঞ্জলির মতোই ভাবাবেগে ভেসে যাবে! না, তা হয়না। এখনও যে অনেক কাজ বাকী। নিজেকে সংযত ও দৃঢ় করে অঞ্জলির হাত ধরতেই তারই দেওয়া বহুদিন পূর্বেকার খেলা ঘরের ডাক নাম আপন অজান্তে দেবব্রতের মুখ দিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে পড়ে—অলি কেঁদোনা। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। এখন কাজের সময়—সম্মুখে কঠিন কাজ অপেক্ষা করছে—অথচ সময় খুবই সংকীর্ণ। অতঃপর পরিতোষকে কাছে ডেকে এনে বলে—লক্ষ্মী ভাই, তোমার বাকী কাজের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে। এখন বিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। অনঙ্গ বাবুকে গিয়ে বলবে—অঞ্জলিদি বাড়ি যাচ্ছে তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। অঞ্জলিদি রাস্তার ধারে মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করবেন। অনঙ্গবাবুকে অঞ্জলিদির নিকট পৌঁছে দিয়ে তুমি সোজা মিশনের উপাসনা মন্দিরের পেছনের বাগানে বড় আমগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যত দেরিই হোক না কেন আমি না আসা অবধি অপেক্ষা করবে।

অঞ্জলি পরিতোষের প্রতি দেবব্রতের আজ্ঞার প্রতিটি শব্দ এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে শুনে তার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করছিল। পরিতোষ স্থান ত্যাগ করতেই সে দেবব্রতের উদ্দেশ্যেই স্বগতোক্তির মতোই বলতে থাকে—পরিতোষকে এতরাত্রে দেখেই কেমন যেন একটা ত্রাসের সঞ্চার হলো। নিদারুণ আতঙ্ক ও অমঙ্গল্ আশংকায় মন অস্থির হয়ে উঠলো। তারপর যখন শুনলাম তুমি ডেকেছ তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। মনে হলো তুমি বুঝি আর নেই। আমার সর্বনাশ হয়েছে। তাই দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। আছাড় খেয়ে রাস্তা থেকে মাঠে ছিটকে পড়লেও থামলাম না। তারপর দূর থেকে তোমার মূর্তি দৃষ্টি গোচর হতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে অনুভব করলাম একি তোমার ছায়া না সত্যিই রক্ত মাংসে গড়া তুমি! দলীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধাচারণ করে ফেলেছি বলে দুঃখিত—ক্ষমা করো।

অঞ্জলির স্বগতোক্তি দেবব্রত এতক্ষণ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হৃদয়ের ভাবাবেগকে বক্র চক্ষু দেখিয়ে দমন করে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—না, না, অন্যায় কিছু হয়নি—আর আমি তো এখন দল-ছুট—দলের বাইরে ও তার বিধি বিধানের ঊর্ধ্বে। যাক সে অন্য কথা। আশু কর্মে ভিতর দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। এখন আমার আর এক কঠোর কঠিন, নির্মম নিষ্ঠুর কাজ অবশিষ্ট। এতে তোমারও দায়িত্ব-পূর্ণ বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তোমাকে পাষাণবৎ নির্দ্বিধায় তা সমাধা করতে হবে। কোন প্রশ্ন কিংবা সন্দেহের অবকাশ নেই। কর্মের মধ্য দিয়েই তা সম্যক উপলব্ধি করবে। জীবন রঙ্গমঞ্চে তোমার ও আমার ভূমিকা আলাদা হলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ধ্রুবতারার মতো তাকেই আমাদের লক্ষ্য পথে রেখে অগ্রসর হয়েছি। সেখানে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন কোনো জিজ্ঞাসা কিংবা সন্দেহের উদয় হয়নি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আদেশ উপদেশ, অনুরোধ উপরোধের অবকাশ

ঘটেনি। স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে ও আমার কর্মধারাকে ছায়ার মতো তুমি অনুসরণ করছো। জীবন রঙ্গভূমির শেষ অঙ্কে যবনিকা পাতের পূর্ব মুহূর্তে উক্ত ধারাই নিশ্চয় অনুসৃত হবে এবং বলবৎ থাকবে। দেশোদ্ধারের মহতী যজ্ঞানুষ্ঠান সার্থক ও সফল করতে যে নিরলস কর্ম, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনা নিয়ে একাগ্র চিত্তে অগ্রসর হয়েছি তার এক উজ্জ্বল মহৎ ও নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে চাই যা বর্তমান সহকর্মীও অনাগত সতীর্থদের উৎসাহে উদ্দীপ্ত ও কর্মে প্রেরণা যোগাবে। চলো অন্তিম দৃশ্যের শেষ অভিনয় সফল করতে আগুয়ান হই, বলে দেবব্রত অঞ্জলির হাত ধরে চলতে থাকে। অঞ্জলি যন্ত্রচালিত-বৎ তার সহগামিনী হয়।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবব্রত অঞ্জলির হাত ছেড়ে দিয়ে তাকে নাম ধরে ডাকে। সাড়া না পেয়ে সে অবাক হয়ে যায়। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। আর দেরী করা যায় না। সে অঞ্জলির দু'হাত ধরে জোর ঝাঁকুনি দিতেই তার তূষ্ণীম্ভূত ভাব কেটে যায়। স্বপ্নোত্থিতের মতোই ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে—বলো কি করতে হবে।

দেবব্রত অঞ্জলির কথার ভঙ্গীতে আশ্বস্ত না হয়ে পুনরায় হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—শোনো—শুনতে পাচ্ছ ?

অঞ্জলি নড়ে চড়ে উঠে কণ্ঠস্বর কিছুটা স্বাভাবিক করেই বলে—হাঁ, পাচ্ছি—বলো।

—শোনো, দেবব্রতর কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস—শেষ দৃশ্যে তোমার পার্ট নিখুঁত হওয়া চাই। পরিতোষ অনঙ্গবাবুকে দূর থেকে তোমাকে দেখিয়ে দিয়েই চলে যাবে। তুমি অনঙ্গবাবুকে নিয়ে বাঁয়ে রাস্তায় না উঠে কোণা-কুণি মাঠ পেরবে। ডাইনে লোকালয় থেকে দূরে চাঁদমারী টিলাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াবে। অনঙ্গবাবুকে সন্দেহাতীত ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। আমি অলক্ষ্যে তোমাদের অনুসরণ করে যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হব। কথা শেষ হতে না হতেই দূরে রাস্তার আলোকে যুগল-মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। সঙ্গে সঙ্গেই দেবব্রত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এত রাত্রে পরিতোষের আবির্ভাবকে অঞ্জলি এক মহা বিপদের অশনি সংকেত বলেই ভেবেছিলো। সেই সঙ্গে তার মনের ঈশান কোণে যে কালো মেঘ সঞ্চারিত হয়েছিল তাহারই প্রবল প্রভঞ্জন তাকে উড়িয়ে নিয়ে

চলেছে। দেব-এর কথাবার্তা প্রথমে হেঁয়ালী ও এলোমেলো মনে হলেও পরিশেষে তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সে কী চায় এবং কী তার ইচ্ছা! পুলিশের সঙ্গে দাদার যোগাযোগ সে কানাঘুষায় শুনেছে—কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ তার জানা নেই। তবে আজকের মহা অঘটনের নায়ক যে দাদা তা বুঝতে তার আর বাকী নেই। তাব সম্মুখে এখন উভয় সংকট একদিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন অপরদিকে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন ও স্বাধীনতা অর্জন সেই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলা ও বিধান রক্ষণ ও আদেশ পালন। অঞ্জলির বৈকল্য দূরীভূত হয়ে অন্তরে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়ঃ

তয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি,

দূর থেকে অনঙ্গদাদাকে আসতে দেখেই অঞ্জলি—এসো দাদা, বলেই চলতে থাকে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন?

—কথায় কথায় একজনের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। আবাব ফিরে যেতে ইচ্ছা হলো না। খোকাকে দিয়ে খবর পাঠালাম।

—রাস্তায় উঠে আয়—মাঠে দাঁড়িয়ে কেন?

—না দাদা, রাস্তা দিয়ে বড্ড ঘুর হয়। মাঠ দিয়ে শর্টকাট করে একেবারে কালিতলা দিয়ে পৌঁছে যাব। রাত তো অনেক হলো।

—আচ্ছা চ' বলে অনঙ্গবাবু মাঠে নেমে পড়েন।

কনকনে শীতের রাত্রি—জোর উত্তুরে হাওয়া বইছে। নির্মল স্বচ্ছ আকাশে লক্ষকোটি তারার ঝিকিমিকি। তাদের ক্ষীণ দ্যুতি মাঠের ওপর অস্পষ্ট কোমল আভার ছটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। চলতে অসুবিধা হচ্ছেনা। অঞ্জলি দূরে ডাইনে কালো দৈত্যাকৃতি টিলাটার দিকে নজর রেখেই চলেছে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতেই বাজখাঁই কণ্ঠে হুঙ্কার শোনা গেল—হল্ট! নির্জন মাঠের মধ্যে আচম্বিতে কর্কশ কঠিন সিংহনাদে অনঙ্গবাবু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রতের মূর্তি যেন ভুঁই ফুঁড়ে তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়। ভূত দেখার মতোই অনঙ্গবাবু ভীত সন্ত্রস্ত অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে—একি আপনি!

—হাঁ, আমি, ভয় পেলেন নাকি? অন্ধকারে দেবব্রতর চক্ষু হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলছে!

অনঙ্গবাবু নির্জীব কণ্ঠে বলে—না না, ভয় পাব কেন। ভয় পাবার কি আছে?

—হুঁ, আপনি এগিয়ে আসুন—দেবব্রত তীব্র কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে বলে —দাঁড়াবেন না। আপনি নিশ্চয়ই এসময়ে আমাকে আশা করেন নি। হয়ত ভেবেছেন এতক্ষণে আমরা সব কয়েদে বন্দী! তাই না!

—না, না, তা কেন?

দেবব্রত কর্কশ কঠিন স্বরে ধমক দিয়ে বলে—চুপ করুন। আসুন, এগিয়ে আসুন—বলুন আমার সম্পর্কে আপনি পুলিশকে কি খবর দিয়েছেন—বলুন, দেরী করবেন না।

—এ আপনি কি বলছেন? পুলিশ, আমি পুলিশের কে? পুলিশের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

—সম্পর্ক? আছে বৈকি—আপনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কুকুর – ঘৃণ্য কুকুর—পুলিশের গুপ্তচর! সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গের গায়েব চাদরখানা টেনে নিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে বলে—বলুন, আপনি কি বলতে চান। গলাব ফাঁস ক্রমেই আঁট হচ্ছে—চক্ষু বড় হয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম। অনঙ্গ হাত তুলে গোঁ গোঁ শব্দে অস্পষ্ট উচ্চারণ করে—ব-ল-ছি। গলার ফাঁস ঢিলে হতেই দম নিয়ে একবার পিছন ফিরতেই গলায় টান পড়লো। সম্মুখ ফিরতেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেবব্রতেব ভীষণ কালান্তক মূর্তি দেখে সে বুঝলো তার আর নিস্তার নেই—সে এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে—অঞ্জলিও এতে লিপ্ত! গলার ফাঁসে আবার টান পড়তেই তার কণ্ঠ থেকে বিকৃত স্বর বেরিয়ে এল—আজ রাত্রে আপনাদের এক জরুরী বৈঠক বসছে। সেই মুহূর্তেই দেবব্রতের উদ্যত রিভলবার থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে পর পর তুটো গুলি অনঙ্গের ললাট ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তীব্র আর্ত চিৎকার দিয়ে সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো। এক বিশ্বাস ঘাতক দেশদ্রোহীর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো!

তারা ঝলমল আকাশের নিচে গভীর নিশীথে অঞ্জলির সম্মুখে ভয় ভীতিকব যে মর্মান্তিক শোচনীয় নাটক অভিনীত হচ্ছে তাতে একমাত্র উৎকণ্ঠিত ও সশঙ্কিত দর্শক হওয়া ভিন্ন তার আর কোন ভূমিকা নেই। নিঃশব্দে ভয় বিহ্বল চিত্তে অস্পষ্ট অন্ধকারে দূরে দাঁড়িয়ে উভয়ের কথোপকথন শুনছে এবং এক মর্মান্তিক শোণিতাক্ত যবনিকাপাতের প্রতীক্ষা

করছে। যে নিরুদ্ধ উত্তেজনা ও মানসিক চাপ নিয়ে অঞ্জলি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল গুলির শব্দে তার উত্তেজিত স্নায়ুতে জোর আঘাত লাগলো। ক্ষীণকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

অনঙ্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রতর উন্মত্ত জিঘাংসার পরিসমাপ্তি ঘটে। ভয়বন্ধন বিমুক্ত আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে সে আপন সত্তায় ফিরে আসে। ঊর্ধ্বাকাশে চেয়ে রজনীর শেষ যাম অনুমান করে চঞ্চল হয়ে ওঠে—এখনও তো অনেক কাজ বাকী! কিন্তু অঞ্জলি, অঞ্জলি কোথায়? অন্ধকারে যতদূব অবধি দৃষ্টি চলে তার মধ্যে কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে কিছুদূর এগোতেই অঞ্জলির ভূলুণ্ঠিত দেহ তার নজরে পড়ে। দৌড়ে গিয়ে সে মাটিতে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ নাড়ানাড়ি করেও অঞ্জলির অচৈতন্য দেহে সংজ্ঞা ফিরছে না দেখে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এখন উপায়? সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় দেবব্রত তখন অঞ্জলির অচৈতন্য দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগোতে থাকে। অঞ্জলির দেহ কাঁধে তুলে নিতেই তাব মধ্যে কেমন যেন এক অজানা আদিম বন্য উন্মত্ত উত্তেজনা জেগে ওঠে। মৃতা সতীর দেহ নিয়ে উন্মত্ত শঙ্করের মতোই বুঝি তার অন্তরে চঞ্চল নৃত্যেব স্পন্দন জাগে।

মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে মিশন প্রাঙ্গণে প্রবেশের মুহূর্তে অঞ্জলির দেহ নড়ে ওঠে—অস্ফুট কণ্ঠস্বব শোনা যায়—দেব এ··তারপর আর বোঝা যায় না। কাঁধ থেকে নামিয়ে অঞ্জলিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে কিন্তু সে ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছে না। ঢলে পড়ে যাবার আগেই অঞ্জলিকে ধরে দেবব্রত মাটিতে বসে অর্ধশোয়া অবস্থায় তার মাথাটা কাঁধের উপর রেখে বাঁ হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে। ডান হাত দিয়ে মাথায় চোখে মুখে হাত বুলিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—অলি একবার চক্ষু মেলে দেখ, এই তো আমি। অঞ্জলির আলুলায়িত কুন্তল, বিস্রস্ত বেশবাস ও উষ্ণ কোমল দেহের স্পর্শে এতদিনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার কঠিন নিগরে আবদ্ধ দেশোদ্ধার-ব্রতী ব্রহ্মচারীর সারা দেহে এক অনাস্বাদিত পুলক ও রোমাঞ্চের শিহরণ জাগে—রক্তে যেন তার আগুন ধরে যায়। এতদিনের বুভুক্ষু হৃদয়ের কামনা বাসনা নারীর ছোঁয়ায় আদিম বন্য লালসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দেবব্রত অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরে ললাট ও ওষ্ঠাধর অবিরত চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। দয়িতের সবল বাহু বন্ধনে আবদ্ধ সদ্য-চেতনা-লব্ধ অঞ্জলি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার

তৃপ্ত সলিলে ডুবে যায়। অদূরে বৃক্ষশাখে নিশাচর পাখীর কর্কশ চিৎকারে আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূর্তি আত্ম-বিস্মৃত বিহ্বলতার গহ্বর থেকে উঠে আসে। ক্ষণিকের মোহমাদকতা ঝেড়ে ফেলে উভয়ে উঠে দাঁড়ায়—পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে। উভয়েই নীরব—আত্ম-চিন্তায় মগ্ন। এক বিচিত্র অনুভূতির জোয়ারে তাদের হৃদয়ের আধার বুঝি কানায় কানায় পরিপূর্ণ! মিশন-এর সম্মুখে ল্যাম্প পোস্টটার নিচে দেবব্রত দাঁড়িয়ে পড়ে। অঞ্জলির হাতে এক খণ্ড কাগজ দিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বলে—অলি এই আমার Last Testament (অন্তিম ইচ্ছা) পড়ে দেখ। পত্রখানা পাঠ করে অঞ্জলির মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা বুঝি বন বন করে ঘুরছে—পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সীমাহীন অন্ধকারে সে বুঝি ডুবে যাচ্ছে—দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো আশ্রয়ের সন্ধান করছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটো মারাত্মক হৃদয় বিদারক আঘাত অঞ্জলি আর বুঝি সইতে পারলো না। চলৎ শক্তিহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বার মুহূর্তেই দেবব্রত হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে।

দেবব্রত অঞ্জলির ডান হাতটা নিজের কাঁধে নিয়ে তার মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে তাকে বারংবার নাম ধরে ডেকেও সাড়া না পেয়ে খুবই অস্বস্তি বোধ করে। এখনও যে অনেক কাজ বাকী। এদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আরও দেরী করাটা মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ওদিকে পরিতোষ তার জন্য গাছ তলায় অপেক্ষা করছে। এই অবস্থায় অঞ্জলিকে নিয়ে সে কি করবে! দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সে নিজেকে কঠোর করে অঞ্জলির দু'হাত ধরে জোর নাড়া দিতেই অঞ্জলি—মাগো বলে সাড়া দিয়ে একটু স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। দেবব্রত অঞ্জলির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—অঞ্জলি চোখ মেলে দেখ—এই তো আমি। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আত্মস্থ ও উপস্থিত পরিবেশে নিজেকে ধাতস্থ করে চক্ষু মেলে দেবব্রতকে সম্মুখে দেখে নির্জীব কণ্ঠে বলে—চলো। দেবব্রত বিনা বাক্য ব্যয়ে তার হাত ধরে অগ্রসর হতে থাকে। অঞ্জলি যন্ত্রচালিতবৎ তার অনুসরণ করে।

নির্দিষ্ট গাছতলাতে এসেই পরিতোষের নিকট দেবব্রত দৌড়ে গিয়ে জবাবদিহির মতোই বলে—বড্ড দেরী হয়ে গেল ভাই, জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম। কথা শেষে দেবব্রত পরিতোষকে বুকে জড়িয়ে

ধরে। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় পীড়িত ও ভাবাবেগে অভিভূত দেবব্রত কিছুক্ষণ রুদ্ধ-বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর আলিঙ্গন মুক্ত করে পরিতোষকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার হাতে চিঠি এবং বেল্ট সহ রিভলবারটি দিয়ে বলে—চিঠিখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় সুতরাং এটা গোপনই রাখবে আর এই আগ্নেয়াস্ত্রটি নির্ভুল লক্ষ্যে দেশের শত্রু নিধনে পারগ। যদি ইচ্ছা কর এবং অতি সাবধানে সযত্নে ও সংগোপনে রাখতে পার তাহলে এটা তুমি নিজের কাছেই রেখো নচেৎ আজ থেকে সাত দিন পরে আম্রকানন আশ্রমে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করো।

পরিতোষ এতক্ষণ অবধি মূক বিস্ময়ে দেবব্রতর কথাবার্তা শুনছিল এবং তার কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করছিল। দেবব্রতর উদ্দেশ্য পুরোপুরি না হলেও কিছুটা তার বোধগম্য হয়েছে। পরিশেষে দেবব্রত যখন পরিতোষের হাত থেকে চিঠিখান তুলে তার পকেটে গুঁজে এবং বেল্টশুদ্ধ রিভলবারটা তার কোমরে পরিয়ে দিয়ে বললে—চলো তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দি, তখন পরিতোষ আর নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। দেবব্রত নিজের উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে এবং মনের দুর্বলতা দমন করে রুমাল দিয়ে রোরুদ্যমান পরিতোষের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—চলো ভাই আর দেরি করলে বিপদে পড়বো। সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলিকে আহ্বান করে—এসো। ব্রাহ্ম মুহূর্ত আসন্ন। শীঘ্রই প্রভাতের আগমনী গাছে গাছে পাখীর কাঁকলিতে বেজে উঠবে। শুভ কর্মের এই প্রশস্ত সময়। অতীতে এই সময়েই মুনি ঋষিদের সামগান আর দেবতাত্মার উদ্দেশ্যে আবাহনী মন্ত্রোচ্চারণে দিগ দিগন্ত, আকাশ বাতাস মুখরিত হত।

দেবব্রতের লিখিত চিঠির মর্মোদ্ধার করে অঞ্জলি ইতিমধ্যেই স্বীয় কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। কঠিন আঘাতের পর আঘাতে তার সাময়িক মানসিক স্থৈর্য্যচ্যুতি এবং চৈতন্য-বিলুপ্তি ঘটলেও এতক্ষণে সে পূর্ণ আপন সত্তায় ফিরে এসেছে। চিত্রার্পিতের মতো অস্পষ্ট অন্ধকারে অদূরে দাঁড়িয়ে দেবব্রতের বিয়োগান্ত নাটকের অন্তিম দৃশ্যের অভিনয় লক্ষ্য করছে। দেবব্রতের আহ্বান কানে যেতেই অঞ্জলি বিনা বাক্য ব্যয়ে তার অনুগমন করতে থাকে। চলতে চলতে অকস্মাৎ পরিতোষের উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসা কানে আসে—দাদা আবার কখন আপনার দেখা পাবো? এই প্রশ্নে দেবব্রত বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অসীম ধৈর্যে নিজেকে সংযত

করে উত্তর দেয়—আমি তো তোমাদের সঙ্গেই আছি এবং অনুক্ষণ তোমাদের কাছেই থাকবো। দেশের মুক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমাদের শক্তি ও প্রেরণা যোগাবো। তবে যদি কখনো আমাকে তোমার উদাসী চিত্তে স্মরণে আসে তখন গভীর তিমির নিশীথে ঊর্ধ্বপানে তারা ঝলমল আকাশে আমাকেও ঐ নক্ষত্রমণ্ডলির মধ্যে দেখতে পাবে।

দেবব্রতের উক্তির মর্ম বুঝতে পেরে পরিতোষ কেঁদে ফেলে। দেবব্রত তাকে কাছে টেনে অশ্রু মুছিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলে—লক্ষ্মী ভাই, আর কেঁদোনা। তুমি আমাদের বীর—বীরের অশ্রুপাত সাজে না। তোমাকে যে গুরু দায়িত্ব ভার অর্পণ করলাম তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো আর দেশোদ্ধার কল্পে আমার অসমাপ্ত কর্মের ভার তোমায় দিয়ে গেলাম। অঞ্জলিকে রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে পরিতোষের বাড়ির গলির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বাড়ির দুয়ার অবধি পৌঁছে দেয়। তার মাথায় হাত দিয়ে "শুভমস্তু" বলেই দেবব্রত পেছন ফিরে দ্রুতপায়ে গলি ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠে এসে অঞ্জলির সঙ্গে মিলিত হয়। চতুর্দিকে বৃক্ষশাখে পাখীর কলতানে আসন্ন প্রভাত ঘোষিত হচ্ছে। উঁচু উঁচু টিলার বৃক্ষপত্রগুলো ক্রমেই প্রভাত অরুণের রক্তরাগে রাঙা হয়ে উঠছে। নিম্নে বিলীয়মান অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকের গাছপালা মাঠ ঘাট ঘন কুয়াশার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়। দেবব্রত অঞ্জলির হাত ধরে বলে—চল অলি তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দি। কেন তা বুঝতেই পারছ—অচিরেই আমার নিখোঁজ নিপাত্তা হেতু আমি দল-ত্যাগী বিশ্বাস ঘাতক এক শয়তান ও কালো দৈত্য রূপে চিহ্নিত হয়ে অবশ্যই বধ্য হিসাবে গণ্য হব। আর অনঙ্গ বাবুর হত্যা ব্যাপারে পুলিশ হয়ত আমার খোঁজে লিপ্ত হবে। সুতরাং দিনের আলোকে লোকালয় আমার পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেই আমি দায় মুক্ত। বন্ধন-বিহীন চির-মুক্ত—'মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গম সম' চির অসীম নীলিমায় বিলীন হয়ে যাবো।

অঞ্জলি দেবুর আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাত ধরে বলে—দাদার মৃত্যুর পর আমার নিকট বাড়ির দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ। ভেবে দেখ দাদার অনুপস্থিতি সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক দেরীতে আমার আকস্মিক উপস্থিতি আত্মীয় স্বজনের মনে কি ধারণার সৃষ্টি করবে। এটা একটা কারণ হলেও অবশ্য আসল কারণ অন্য। এতদিন কেবল ছায়াসঙ্গিনী হয়ে তোমাকে,

তোমার কর্ম ধারা ও পন্থাকে অনুসরণ করে এসেছি। আজ যখন দলের স্বার্থ রক্ষার্থেই আমরা দলীয় শাসন অনুশাসনের উর্ধ্বে আত্ম-বিসর্জনে উন্মুখ তখন আমার সম্মুখে শুধু তোমার সঙ্গিনী সহগামিনী নয়, তোমার সহধর্মিনী হওয়ার মহাসুযোগ ও এক পরম লগ্ন সমুপস্থিত। তোমার ও আমার পথ আর অভিন্ন নয়। আমাদের সম্মুখে মহামিলনের দ্বার উন্মুক্ত। আমাকে গ্রহণ কর দেব, বলেই অঞ্জলি দেবব্রতর পায়ের কাছে বসে পড়ে। আনন্দে অভিভূত দেবব্রত অঞ্জলিকে হাতধরে তুলে পরম পুলকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

আলিঙ্গন মুক্ত অঞ্জলিকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তার দুই হাত নিজের হাতে নিয়ে দেবব্রত কর-জোড় উর্ধ্বে তুলে উর্ধ্ব মুখীন হয়ে বরণীয় স্মরণীয় এবং আদরণীয়দের উদ্দেশ্যে বিদায় অভিবাদন ও সম্ভাষণ জানিয়ে উৎফুল্ল চিত্তে হাত ধরাধরি করে সল্লালোকে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ঊষা লগ্নে লোকালয় পরিত্যাগ করে মহা প্রস্থানের পথে শেষ বাসর শয্যা রচনা করে। এক বৃন্তে দুই কুসুমের মতো তারা পূর্ণ বিকাশে বিশ্বজীবনে আপন সুবাস সৌরভ ছড়িয়ে দেবার পূর্বেই বৃন্তচ্যুত হয়ে ধরিত্রীর কোলে ঝড়ে পড়ে মহাকালে বিলীন হয়ে যায়!

চাঁদমারি মাঠের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রথম দিকে পুলিশ নিজের স্বার্থেই বিশেষ করে হত্যার অনুসন্ধান কার্যের সুবিধার্থে চেপে যায়। কিন্তু মরণোত্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনের হস্তে অর্পণ প্রয়াসে পরের দিন প্রভাতী সংবাদ-পত্রে ফলাও করে হত্যার খবর প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শহরের নানা মহলে নানা রূপ গুঞ্জন-ধ্বনির এবং প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

এদিকে অমৃত কাননে মেয়েদের আখড়া থেকে অঞ্জলির অনুপস্থিতি প্রথম দিকে কারো নজরে না এলেও উপরুক্ত সংবাদ প্রকাশের পরে তার এক নাগাড় অনুপস্থিতি আখড়ার কর্তৃপক্ষের নজরে এসে এক বিরূপ মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যখন তার অভিভাবক মহল থেকে অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কোন ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায় না। বিপ্লবী দলের মধ্যেও এ নিয়ে কম্পন অনুভূত হয়। দেবু এবং অঞ্জলির একই সময়ে অন্তর্ধানের সঙ্গে ঐ হত্যাকাণ্ডের কোন যোগসূত্র আছে কিনা সে সম্পর্কে তাদের গুপ্তচর বিভাগ বিশেষ কোন আলোকপাত

করতে সক্ষম হয়নি। তাদের একমাত্র খবর এক বার্তাবহের মারফৎ জরুরী সংবাদ পেয়ে অঞ্জলি তার দিদির বৌ-ভাতের রাত্রে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি।

বিপ্লবীদের দুই গুরুত্বপূর্ণ সভ্য ও সভ্যা দেবু ও অঞ্জলির এরূপ আকস্মিক অন্তর্ধান এক ঘন রহস্যের কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে-রাত্রির গুরুত্বপূর্ণ সভা পুলিশের আবির্ভাবে পণ্ড হওয়ার সঙ্গে এরা কতটুকু জড়িত সেই জট খুলতে দলের প্রধান একান্ত উদ্‌গ্রীব। কেননা এই দুই আদর্শ চরিত্র যুবক যুবতীর কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্রের পরিচয় যতটুকু তিনি পেয়েছেন তার থেকে এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকার বীজ থাকতে পারে এমন ধারণা তাঁর আসে না। তথাপি গুপ্তচর প্রধান কর্তৃক ঘটনার পারস্পরিক কার্যকারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণের পর দলীয় বিধানানুযায়ী দেবুর মৃত্যুদণ্ড অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তচর বিভাগ ঐ ঘটনা সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করে নতুন কোন সুত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা তা জানার জন্যই গুপ্তচর প্রধানের সঙ্গে মহারাজ-এর ঘন ঘন আলোচনা হত।

সেদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে যখন অমৃত কাননের আম্রকুঞ্জের কুটিরের অভ্যন্তরে নিভৃত নিরালায় আলোচনা-রত তখন বাইরে আম্রকুঞ্জের অন্ধকার বুঝি ক্ষণেকের জন্য আলোড়িত ও চঞ্চল হয়ে উঠে। অন্ধকারে অলক্ষ্যে কুটির প্রহরীর দৃষ্টিপথে হঠাৎ এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়। শনৈঃ শনৈঃ সে কুটিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রহরী আড়াল থেকে বেরিয়ে তার পথ রোধ করে। অতপর তার নাম ধাম উদ্দেশ্য এবং দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এক অদ্ভুত রকমের শিস দিয়ে কুটিরের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়কে সতর্ক করে স্বয়ং কুটিরের দ্বারে উপস্থিত হয়ে আগন্তুকের নামোল্লেখ করে। নাম শুনেই মহারাজ উৎকণ্ঠিত হন। তিনি জানেন এ বালক দেবুর দক্ষিণ হস্ত। এমন কর্ম নেই যা এই দুঃসাহসী দুর্দান্ত বালক করতে না পারে! তিনি আলোচনা রত গুপ্তচর প্রধানকে পাশের কোঠায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে দুয়ারে দাঁড়ানো বালককে নাম ধরে ডেকে কাছে আসতে আহ্বান করেন। কিন্তু পরিতোষ কাছে না এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েই হাঁপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। মহারাজ বিস্মিত! ব্যাপার কি? মনে এক নিদারুণ আশংকা ও সংশয়ের উদ্ভব হয়। তিনি আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে হাত ধরে তাকে নিয়ে এসে কোলে বসিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে

—কেঁদোনা ভাই। তোমাকে তো একজন বীর বলেই জানি, বীরের কি কান্না সাজে! বলতে বলতে নিজেই বহির্বাসের প্রান্ত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেন। পরিতোষ কিছুটা শান্ত হয়ে কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কোমর থেকে বেল্ট শুদ্ধ ছোট্ট রিভলবারটি এবং পকেট থেকে দেবুর চিঠিখানা মহারাজের হাতে অর্পণ করে পরিতোষ উবু হয়ে তাঁকে প্রণাম করে। মহারাজ অবাক বিস্ময়ে তার প্রতিটি কাজ লক্ষ্য করছেন। কিন্তু সে গমনোদ্যত হতেই হাত ধরে পাশে বসিয়ে দেন। রিভলবারটা সরিয়ে চিঠিখানা পড়ে মহারাজ একেবারে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চক্ষুমুদে বসে বুঝি মনের আবেগ ও অস্থিরতা রোধ করে উঠে পাশের কামরায় চলে যান। গুপ্তচর প্রধানের হাতে চিঠিখানা দিয়ে তিনি নিস্তব্ধ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। চিঠিখানা পড়ে মহারাজ-এর হাতে ফেরৎ দিয়ে তিনিও বাক্যহীন হয়ে উঠে দাঁড়ান। উভয়েই চক্ষুমুদে দেবুর স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। চাঁদমারী মাঠের হত্যা দেবু ও অঞ্জলির নিপাত্তা রহস্যের কুয়াশা ভেদ করে দিনের আলোর মতো তাদের নিকট স্বচ্ছ হয়ে উঠে!

গুপ্তচর প্রধানকে বিদায় দিয়ে মহারাজ ফিরে আসেন। পরিতোষের আকস্মিক আগমন একটা অশুভ অস্বাভাবিক ঘটনার আভাস ধরে নিয়েও তিনি বুঝি তাহা যে এরূপ মর্মান্তিক শোচনীয়—আত্মহত্যায় পর্যবসিত হয়েছে সে ধারণা করতে পারেন নি! সুতরাং এই অভাবিত ঘটনার প্রচণ্ড আঘাত সামলে নিতে তাঁর কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। নিজ আসনে উপবেশ করে মহারাজ সম্মুখে উপবিষ্ট পরিতোষের দুঃখ ভারাক্রান্ত বিষাদঘন মুখের দিকে চেয়ে তার হৃদয় স্নেহ ও করুণায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তিনি তাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—এখন থেকে আমিই তোমার দেবুদার আসনে বসলাম। আমাকেই তুমি তোমার দেবুদার মত ভাববে এবং যখন ইচ্ছা আমার কাছে চলে আসবে। পাশের রিভলবারটি হাতে তুলে নিয়ে বলেন—এটি তোমারই, দেবু তোমাকেই দিয়ে গেছে।

পরিতোষ প্রতিবাদ করে—না, না, তিনি আপনাকে দেবার জন্যই এটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন—ইচ্ছা হলে তুমি নিজেই এটির রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং বড় হয়ে দেশের মুক্তি যুদ্ধে এটি ব্যবহার করো।

—উত্তম কথা, তাহলে বুঝলে তো, এ অস্ত্রটি আসলে তোমারই। তবুও

তুমি যখন চাইছ আমিই তোমার হয়ে এটির রক্ষণা বেক্ষণ করবো এবং যখন তুমি এখানে আসবে তখন আমরা এক সঙ্গে এ নিয়ে সুটিং প্র্যাকটিস করবো। এখন থেকে তুমি এ আখড়ার একজন নিয়মিত সভ্য রূপে গণ্য হবে এবং এখানে এসে নিয়মিত শরীর চর্চা করবে। চলো, তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

পরিতোষ বাধা দিয়ে বলে—না, না, আমি একাই যেতে পারব।

—তা জানি, তবুও চলো তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। কথা শেষে মহারাজ উঠে রিভলবারটি নিয়ে পাশের কামরায় চলে যান। তারপর ফিরে এসে পরিতোষের হাত ধরে কুটির থেকে বেরিয়ে পড়েন। চলতে চলতে আচম্বিতে জিজ্ঞাস করেন—দেবু তোমাকে তার শেষ ইচ্ছা কিছু জানিয়ে গেছে?

পরিতোষ খানিক চুপ করে থেকে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে কম্পিত কণ্ঠে বলে—হাঁ, তার শেষ কথা—আমি সর্বক্ষণ তোমাদের মধ্যে থেকেই দেশের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত থাকব। আর যদি কখনো আমাকে দেখবার ইচ্ছা জাগে তাহলে গভীর রাত্রে উর্ধ্বে তারা ঝলমল আকাশে-ই আমাকে তারা মণ্ডলের মধ্যে দেখতে পাবে। সেখান তোমাদের মঙ্গল কামনায় আমার আশীর্বাদ বিচ্ছুরিত আলোক ধারায় অহর্নিশি তোমাদের উপর ঝড়ে পড়বে। পরিতোষ আর বলতে পারে না ঝড় ঝড় করে কেঁদে ফেলে।

মহারাজ তাকে প্রবোধ দিয়ে বড় রাস্তা অবধি সঙ্গে সঙ্গে আসেন। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে যত দূর অবধি দৃষ্টি চলে তিনি পরিতোষের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকেন। দৃষ্টির অন্তরাল হতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে এ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে আপন সৌরভ ছড়াবে তো! নাকি দেবুর মতোই অকালে ঝড়ে পড়বে!

অবশেষে যেদিন কাগজে কাগজে বিষপানে আত্মঘাতী যুবক যুবতীর আবিষ্কৃত পচা গলা শবদেহের পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে পুলিশের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত এবং থানায় থানায় বিকৃত শবদেহের আলোক-চিত্র প্রকাশিত হলো তখন অনেকেই তপ্ত অশ্রুজলের সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের স্মরণ করলেও পুলিশ-পীড়ন ভয়ে পরিচয় দিতে কেউ এগিয়ে এসেনি। আর আম্রকুঞ্জের নিভৃত নিলয়ে বসে দলীয় প্রধান সেই স্থিতধী পুরুষ দীর্ঘশ্বাস

মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি দেশের মুক্তি সংগ্রামে দলীয় শক্তির এরূপ অপচয় নিরোধ কল্পে নব পরিকল্পনার আবশ্যকতা সম্পর্কে অবহিত হন।



শহর থেকে দূবে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পর পর কয়েকটি রেল ষ্টেশন। অদূরবর্তী পুণ্যতীর্থের অবস্থান হেতু প্রত্যেকটি ষ্টেশন আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে অসাধারণ। বিশেষ বিশেষ শুভ পুণ্য তিথি উপলক্ষে পুণ্যলোভাতুর অসংখ্য যাত্রীর সমাগমে প্রতিটি ষ্টেশন সরগরম হয়ে ওঠে।

তীর্থস্থানগুলি পর্বতে সানু ও নিম্ন দেশে দূর দূর দুর্গম অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ষ্টেশন থেকে নেমে লম্বা মেঠো রাস্তা ধবে এগোলেই পাহাড়ের পাদদেশ। তারপর পাহাড়ি চড়াই উৎরাই শুরু। পায়ে হাঁটা রাস্তার দু'ধারে নিবিড় বন, ঝোপ ঝাড়। কোথাও বা ছোট ঘাসের ঘন জংগল। তাতে অসংখ্য বিচিত্র ফুলেব সমারোহ, নানা বঙ বেবঙের মেলা। প্রকৃতি যেন বিভিন্ন রং দিয়ে কার্পেট বুনে বিছিয়ে রেখেছে। শিশির-সিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি যখন প্রভাত অরুণ কিরণে চিকমিক করে—মনে হয় লক্ষ হীরে মোতি চুনি পান্না থেকে আলোর ফুলকি ঠিকরে পড়ছে। এক অনির্বচনীয় শোভা! যাত্রীদল বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে থমকে দাঁড়ায়। সমবেত ভক্তের কণ্ঠ নির্গত হর হর মহাদেব ধ্বনি চতুর্দিকের গিরিকন্দর প্রকম্পিত করে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

আরো এগোলেই নজবে পড়ে ক্ষীণতোয়া এক স্রোতস্বিনী সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে অদূরে ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ পর্বতের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার বিশীর্ণ বিশুষ্ক বক্ষ শত সহস্র উপল খণ্ডে আকীর্ণ। বর্ষার দিনে এর ভীষণ রূপ এখন দেখে অনুমান কবা কঠিন। চলতে চলতে আরো উপরে উঠলে দৃষ্ট হয় এক নাঙা পাহাড়ের নিম্নদেশে গুহা মুখে শ্বেত শুভ্র এক মন্দির। ভিতরে প্রবেশ করে অবাক হতে হয়। অসংখ্য শিবলিঙ্গ পাহাড়ের গা ফুঁড়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। অগুণতি লিঙ্গ—তাই উনকোটি শিব নামে আখ্যাত। তারই অদূরে বিরাট এক বারি কুণ্ড—বিখ্যাত বাড়বানল। পর্বতগাত্র থেকে নির্গত বাষ্প বারি ও বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলে উঠে ক্ষণে ক্ষণে লেলিহান শিখা মেলে সারা কুণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পের চাপে

জলরাশি টগবগ করে ফুটছে। পর্বতের অপর দিকে রয়েছে প্রখ্যাত এক জল প্রপাত—সহস্রধারা। গভীর অরণ্যে ঘেরা শীর্ষদেশ থেকে প্রবল জলস্রোত শত সহস্র ধারায় পর্বতের পাদদেশে কর্ণ-বিদারী শব্দে আছড়ে পড়ছে। ফেনিল বারিরাশি থেকে উত্থিত বাষ্পে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। সূর্যের কিরণচ্ছটায় তাতে রঙ ধরে। সে রঙ ক্ষণে ক্ষণে নানা রঙের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে। কখনো মনে হয় অর্ধবলয়াকৃতি একখানা রামধনু যেন দৈত্যাকার কালো পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়ালেই বুঝি নাগাল পাওয়া যায়। যাত্রীগণ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে উচ্চ কণ্ঠে হর হর বোম্ বোম্ শব্দে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের বোম্ বোম্ ধ্বনি জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জনের সঙ্গে মিশে চতুর্দিকের পাহাড়ে আছড়ে পড়ে যে শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি তোলে তা দূর থেকে কামান-গর্জনের মতোই বোধ হয়।

এখানের সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গে রয়েছে এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান—প্রসিদ্ধ দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির—খ্যাতি তাঁর বহুদূর বিস্তৃত। ইহার স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কিত কিংবদন্তীও সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য :

বিষ্ণুচক্রে বিখণ্ডিত সতীদেহের নিক্ষিপ্ত অংশ হতে ভারতে একান্নটি মহাপীঠের উৎপত্তি। এই মহাপীঠ উক্ত একান্নটির একটি যাহা সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নিপতিত অংশ থেকে উদ্ভূত। কল্কি পুরাণের এক উপাখ্যানে শিব সতীকে বিনা-নিমন্ত্রণে যজ্ঞোপলক্ষে পিত্রালয়ে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু সতীর প্রতিজ্ঞা তিনি যাবেনই! বারংবার বাধা দানে তিত-বিরক্ত সতী পতিকে নিবৃত্ত করবার অভিপ্রায়ে আপন শক্তি প্রদর্শন করলেন—পরমা প্রকৃতি মহামায়া কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, জ্বালামুখী, ও মহালক্ষ্মী-রূপে দশবার দশমূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত হন। শিব ভীত, বিভ্রান্ত ও বিমোহিত। বাধ্য হয়ে তিনি সতীকে পিত্রালয়ে যাবার অনুমতি দেন। যজ্ঞস্থলে সমবেত রাজন্যবর্গের সম্মুখে সতী পিতা দক্ষের মুখে সর্ববরেণ্য দেবশ্রেষ্ঠ পতির নিন্দা ও কুৎসা সহ্য করতে পারলেন না। দুঃখে ম্রিয়মাণ সতী অবশেষে পিতার সম্মুখেই দেহত্যাগ করলেন।

সতীর মৃত্যু সংবাদে শিব শোকার্ত ও ক্রোধান্ধ হয়ে আপন শিরের জটা ছিন্ন করতে লাগলেন। ছিন্ন জটা থেকে আবির্ভূত হলেন মহাবীর বীরবাহু বীরভদ্র। অতপর শিব বীরভদ্র, নন্দী, ভিরিঙ্গী ভূত, পেত্নী

ইত্যাদি অনুচর সমভিব্যহারে দক্ষালয়ে উপনীত হলেন। দক্ষ যজ্ঞ লণ্ড-ভণ্ড করে বীরভদ্র দক্ষের শিরচ্ছেদ করলেন। কিন্তু শিবের শোক তাতেও প্রশমিত হলো না। সতী-বিরহে তিনি উন্মাদ। সতীর মৃত-দেহ স্কন্ধে নিয়ে যে নৃত্য শুরু করলেন তা ক্রমে ক্রমে প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড টলমল—বুঝি রসাতলে যায়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শংকিত হলেন। সৃষ্টি রক্ষার জন্য কোন উপায় স্থির করতে না পেরে তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। শোকাভিভূত শিব জ্ঞান-হারা। সতীকে স্কন্ধ-চ্যুত করবার সকল প্রার্থনা অনুরোধ উপরোধ তিনি উপেক্ষা করলেন। অনন্যোপায় বিষ্ণু তখন সৃষ্টি রক্ষার্থে সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীর দেহ একান্ন ভাগে খণ্ড বিখণ্ড করে শিবের স্কন্ধ-চ্যুত করলেন।

এমন জাগ্রত পীঠস্থানে সাধু সন্ন্যাসীর আগমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাঁদের উপস্থিতি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত স্থানীয় জন-মনে কৌতূহল বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। আগামী ভাদ্র চতুর্দশী উপলক্ষে পুণ্যার্থীরা দলে দলে পায়ে হেঁটে, রেলে, কিংবা গরুর গাড়িতে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

কৃষ্ণপক্ষেব রাত্রি—ঘনঘোর অন্ধকার। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা—চতুর্দিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ। অদূরে উঁচু নিচু পর্বত মালাকে মনে হয় অতিকায় কালো কালো দৈত্যগুলি যেন আদিম জঙ্গলে হাত পা ছড়িয়ে কুম্ভকর্ণের মতো গভীর নিদ্রা-মগ্ন। মাঝে মাঝে হরিণের কর্কশ কণ্ঠস্বর, নিশাচর অন্য কোন প্রাণী কিংবা পাখীর আর্ত কণ্ঠের চীৎকার নীরব নিথর নিস্পন্দ সমুদ্রে কিঞ্চিৎ আলোড়নের ঢেউ তুলে আবার মিলিয়ে যায়।

ঐ রাত্রে একদল সাধু ডাউন ট্রেন থেকে নেমে এলেন। স্টেশন প্লাটফরমে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে তাঁরা ত্বরিৎ-গতিতে সোজা রেল লাইন ধরে দক্ষিণাভিমুখী হেঁটে চললেন। রেল গুমটি পেরিয়ে তারা সড়ক ধরে পুব দিকে চলে একটা বটগাছের নীচে আস্তানা নিলেন।

রেল স্টেশনে পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীরা বিশ্রাম কক্ষের বেঞ্চিতে কিংবা মেঝেতে শয়ান। স্টেশনের জমাদার রঘুয়া এবং লাইনসম্যান হরকিষেণ স্টেশন মাস্টারের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে হাত লণ্ঠনটার আলো কমিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়েছে। এমনি সময়ে আচম্বিতে সাধুদের কণ্ঠ-নিসৃত হর হর বম্ বম্ ধ্বনি অন্ধকারের বুক চিরে যাত্রীদের কর্ণে প্রবেশ করে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আর

জমাদার রঘুয়া বিছানায় উঠে বসে। ধ্বনিটা কোন দিক থেকে এলো তা নিরূপণ করে হরকিষেণকে জিজ্ঞাসা করে রাতের শেষ গাড়ি থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের সে নামতে দেখেছে কি না। হর কিষেণের হ্যাঁ সূচক উক্তি শুনে রঘুয়া অবাক হলো এই ভেবে যে সাধুরা কিভাবে তার নজর এড়িয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে হরকিষেণকে বলে—তুই শুয়ে থাক, তবে খেয়াল রাখিস। আমি সাধুদের ভেট করে জলদি ফিরে আসবো। কথা সাঙ্গ করে হরকিষেণকে কিছু বলবার ফুরসৎ না দিয়ে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে রঘুয়া হন হন করে হেঁটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জমাদারের সাধুদর্শনের নেশা যে কিরূপ তীব্র তা হরকিষেণ ভাল ভাবেই জানে যদিও কারণ তার অজ্ঞাত। তবুও তার কৌতূহলী মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে—একি শুধু ধর্মানুরাগ, সাধু ভক্তি নাকি এর পশ্চাতে অন্য কোন গভীর রহস্য লুক্কায়িত।

স্টেশন থেকে রেল লাইন পেরিয়ে পর্বতের পাদদেশ অবধি বিস্তৃত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু প্রাচীন জটাকীর্ণ বট অশথ গাছ কালের অমোঘ বিধান অগ্রাহ্য করে সগর্বে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান। ঐসব গাছেব তলায় সাধু সন্তরা আস্তানা নেন। যাত্রীরাও বাসস্থানের অভাব হেতু কখনো সখনো গাছের নিচে বাসা বাঁধে। রঘুয়া সাধুদের কণ্ঠস্বর থেকে তাদের অবস্থান নিরূপণ করেই চলেছিল। তার হাতে রেল কোম্পানীর লণ্ঠনের সম্মুখের মোটা কাঁচের আবরণ ভেদ করে যে ক্ষীণ আলো বেরুচ্ছে দূর থেকে তা উজ্জ্বল দেখালেও কাছের অন্ধকার দূর না করে যেন আরো ঘনীভূত করছিল। সামনের কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর নয়। অবশ্য রঘুয়ার নিকট আলো আর আঁধারের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট মাঠবাট খানাখন্দ সব তার নখদর্পণে। মন্দিরে যেতে বড় রাস্তার ওপর কটা গাছ কি গাছ। তাদের মধ্যেকার দূরত্ব আর কোন গাছের তলায় সাধুরা আশ্রয় নেন—সব কিছুই তার মুখস্থ। দিনের বেলা কর্মব্যস্ততার মধ্যে সাধু সন্ত দর্শন তার ভাগ্যে ক্বশ্চিৎ কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু রাত্রির অবসর সময়ে তাদের সঙ্গ লাভ রঘুয়ার নিত্যকর্ম। ধুনির সম্মুখে গঞ্জিকাসেবনরত সাধুদের হর হর বম্ বম্ ধ্বনি যখন নিশীথ রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে তার কর্ণে প্রবেশ করে তখন সে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাধুদের কণ্ঠস্বর শুনেই তাঁদের অবস্থান নির্ণয় করে সে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়ে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ সে

একটানা এ কর্মই করে চলেছে। কোন দুর্ঘটনা দুর্যোগ তাকে এর থেকে নিরস্ত নিবৃত্ত করতে পারেনি। কিন্তু কেন? সে এক নিষ্ঠুর বেদনা-ময় অতীত ইতিহাস।

গাছতলাতে সদ্য-আগত সাধুরা ধুনির জন্য যখন কাঠ খড় খুঁজতে ব্যস্ত তখন দূর থেকে একটা আলো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে তারা যুগপৎ বিস্মিত ও ভাবিত। আলো হাতে কে এবং কেনই বা এত রাত্রে এদিকে আসছে। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য সাধুদের একজন দ্রুত আলোটাব দিকে এগিয়ে যায়।

রঘুয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ তাতে বাধা পড়লো। শুনতে পেল কে যেন তাকে দাঁড়াতে বলছে। কণ্ঠস্বর আদেশ ব্যঞ্জক ও কর্কশ। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। আগন্তুকের পদধ্বনি নিকটবর্তী হতেই লণ্ঠনটা তুলে ধরে সম্মুখে একজন সাধুকে দেখে সে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে গড় করে।

—মহাদেব তোর মঙ্গল করুন—আশীর্বাদ জানিয়ে সাধুজী জিজ্ঞাসা করেন—ধুনির জন্য কাঠ পাওয়া যাবে কিনা!

রঘুয়া আবার দণ্ডবৎ করে বলে—আমি আপনার দাসানুদাস এই রেল স্টেশনের জমাদার রঘুনন্দন। তবে সকলেই আমাকে রঘুয়া বলে ডাকে। কাঠ তো থোরা চিজ—চাউল, আটা ঘি যা কিছু আপনার সেবার জন্য প্রয়োজন তা যোগাড় হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি এক্ষুণি আসছি। কথা শেষ করেই রঘুয়া পেছন ফিরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রঘুয়ার ত্বরিত গতিতে সাধুজী অবাক হয়। তারা কোথায় আছে তা জানার প্রয়োজন পর্যন্ত সে বোধ করলে না, অবাক কাণ্ড! অন্ধকার সমুদ্রে রঘুয়া যেন ভুতুড়ে আলোর মতো ক্ষণিক জ্বলে উঠে নিবে গেল। সাধুজীর একবার তাকে ডাকবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু কি ভেবে যেন চুপ করে আস্তানায় ফিরে চললেন। হয়তো রঘুয়ার হাবভাব কথাবার্তা থেকে মনে মনে তিনি তার প্রত্যাগমন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে ডাহুক ডেকে উঠে। দূরে পাহাড়ে একসঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুয়া এক পাঁজা কাঠ নিয়ে উপস্থিত। সেগুলিকে মাটিতে রেখে সে উবু হয়ে সকলকে প্রণাম জানালে সাধুদের একজন—

আভি ধুনিকা বন্দোবস্ত কর বেটা, বলেই উঠে দাঁড়িয়ে কমণ্ডলু থেকে কাঠের ওপর জল ছিটিয়ে দেন।

—জী মহারাজ, বলেই রঘুয়া হৃষ্ট চিত্তে ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাই বার করে কাঠে অগ্নি সংযোগ করে। আগুনের অনুজ্জ্বল কম্পিত শিখায় নিরন্ধ্র অন্ধকারে সাধুদের প্রথম দর্শনে রঘুয়ার নিকট অদ্ভুত অলৌকিক বলেই মনে হচ্ছিল। কৌপীনধারী ভস্মাচ্ছাদিত যৌবনোদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ সুঠাম সুগঠিত নিরাবরণ দেহ, শিরে জটার আচ্ছাদন। প্রত্যেকের স্কন্ধ থেকে হরিণ চর্মে জড়ানো একটা পুঁটলি লম্বমান হয়ে ঝুলছে।

ধুনির আলোতে রঘুয়া চতুর্দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে। বহু বৎসর যাবৎ নিরলস ব্যাকুল আগ্রহে সে এভাবেই কি যেন খুঁজে চলেছে! রঘুযার উৎসুক অনুসন্ধানী দৃষ্টি লক্ষ্য করে সাধুরা চঞ্চল হলেন। একজন তাকে সম্বোধন করে বললেন—বহুত মদত দিয়া বেটা, বোল ক্যা মাঙ্‌তা ?

দ্রুত আশ রঘুনন্দন নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয়—আপলোগকো দর্শন মিলা—এটাই আমার বড় ধরম্। আমার আর কুছ চাই না। তবে বহুত জাড়া মালুম হোতা। শিবজীকা প্রসাদ মিলে তো বহুত আচ্ছা।

—জরুর মিলবে বেটা। তারপর বক্তা পাশের এক সাধুকে বললেন —উসকো এক ছিলিম পিলাদো।

—বড়ি কৃরপা—বলে রঘুয়া মনের আনন্দে কোঁচড় থেকে একটা কালো মিশমিশে কল্কি বার করে।

সাধুজী এক ছিলিম গাঁজা তৈরি করে রঘুয়ার দিকে হাত বাড়াতেই সে হাত সরিয়ে বলে—রাম রাম, হাম তো আপকো প্রসাদ মাঙতা।

—তোম পিয়ো বেটা—সাধুর কণ্ঠে আদেশের সুর।

রঘুর আর তর সইছিল না। সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাঁ হাতের ওপর ডান হাত রেখে ভক্তিভরে গাঁজাটুকু নিয়ে টিপে টিপে কল্কেতে ভরে। ধুনি থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার কল্কের মাথায় চাপিয়ে সাধুদের সমীহ করে অন্ধকারে একটু দূরে সরে বসে। অতঃপর বম্ ভোলানাথ বলে গাঁজায় টান দেয়। প্রথমে আস্তে, তারপর একটু জোরে —আরও জোরে। অবশেষে সুখ-টান সে এক বিষম টান। টানের চোটে কল্কের মাথাটা লাল হয়ে চট চট শব্দ করতে থাকে। সাধুরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

রঘুয়ার মেজাজ শরিফ। সাধুদের ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে বলে—আপনারা কিছুদিন এখানে থেকে যান—আমাকে আপনাদের সেবা করতে দিন। চাউল ঘি আটা যা কিছু দরকার সব বন্দোবস্ত করে দেব।

—শুন বেটা, সাধুসন্তকা আনা-যানা কোই ঠিক নেহি। এক সাধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—সবকুছ শিবজীকা মর্জি। রাত বহুত হুয়া অব ঘর চলা যা।

রাত্রি অনেক হয়েছে শুনে রঘুয়ার খেয়াল হয় যে সে অনেকক্ষণ স্টেশনের বাইরে আছে। সাধুদের গড় করে রঘুয়া উঠে পড়ে।—ভগবান করে তো কাল ভি দর্শন মিলেগি, বলে সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রঘুয়া স্টেশনের চত্বরে ঢুকে হরকিষেণের নাক-ডাকা শুনে আশ্বস্ত হয়। না, কোন মালগাড়ি পাস করাবার ঘণ্টা পড়েনি। লণ্ঠন হাতে চতুর্দিক ঘুরে দেখে রঘুয়া শুয়ে পড়ে। নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে। ঘুম আসছে না। রঘুয়ার মন হতাশায় আর অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। ১৫ বৎসর যাবৎ এভাবে দিনের পর দিন রাতের পর রাত একটানা সাধু সন্তের পেছনে সে ঘুরে মরছে। নেশাগ্রস্তের মতো আশা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে। ঈপ্সিতের সন্ধান এখনও মেলেনি। তার মুদ্রিত নয়নের পর্দায় ফেলে-আসা অতীতের ঘটনাবলী ছায়াছবির মতো একের পর এক ভেসে ওঠে :

সুখেই তার দিন কাটতো। মাঠে ঘাটে গরু ছাগল ভেড়া চরাতো আর মনের আনন্দে বাঁশি বাজাতো। খাওয়া পরা ছাড়া নগদ তিন টাকা মাস মাহিনা গাঁয়ের মাতব্বর চৌবের নিকট মিলতো। তবে মাঝে মাঝে তার ব্যাঘাত যে না ঘটতো এমন নয়। গরু ছাগল হারালে, হায়না কিংবা চিতার কবলে পড়লে সে নানা নির্যাতন ভোগ করতো। এভাবেই সে বড় হয়ে উঠেছে। বাবাকে সে দেখেনি—নাম শুনেছে মাত্র। মাকেই সে কেবল জানে—সেই তার সব। এই মার কাছেই একদিন সে অজানা এক নতুন আজব সংবাদ শোনে।

সে এক চিরস্মরণীয় সন্ধ্যা। মায়ের কথা এখনও যেন তার কানে বাজছে—মেরা বেটা, তু আভি নও-জোয়ান মরদ বন গিয়া। এই শব্দ কয়টির মধ্যে বুঝি কোন যাদু ছিল। মায়ের উক্তির পূর্ব মুহূর্ত অবধি তার

যে জীবন-বোধ ছিল তা যেন একেবারে উলটপালট হয়ে গেল। সারা শরীরে একটা নতুন সাড়া, নবীন চেতনা জাগলো। তার জীবনের গতিও একেবারে ভিন্ন-মুখী হলো।

তারপর আর একদিন। সারাদিন গুমট গরম। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। সাঁঝ-বেলা গোয়ালে গরুরপাল রেখে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বাড়ির দাওয়ায় এসে শুয়ে পড়েছে। পাশে তার প্রিয় বাঁশি আর লাঠি। ফুর ফুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চোখ বুঁজে এলো। মা কখন যে এসে শিয়রে বসেছিল টের পায়নি। কপালে মায়ের হাতের ছোঁয়ায় অনেক আরাম বোধ হলো। এমন স্নেহের পরশ বুঝি আগে কোন দিন পায়নি। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এলো। হঠাৎ মায়ের মমতা-মাখা কণ্ঠস্বরে —মেরা বেটা—তার তন্দ্রা টুটে গেল।—তুই এখন সোমত্থ ডাগর হয়েছিস —তোর শাদি ঠিক করেছি দূর গাঁয়ে এক লেড়কির সঙ্গে। শুনে সে এক নব অনুভূতি, আর অভূতপূর্ব হর্ষ ও শিহরণ অনুভব করলো। যৌবনো-দ্দীপ্ত শরীরের যে ইন্দ্রিয়গুলি এতদিন সুপ্ত অচেতন ছিল মায়ের কথায় তারা সব যেন এক সঙ্গে জেগে উঠে কোলাহল শুরু করে দিলো। মায়ের উক্তির কোন প্রত্যুত্তর তার মুখে যোগালো না। এক দুরন্ত কামনা বাসনা নিয়ে সে উৎফুল্ল চিত্তে শাদির অপেক্ষা করতে লাগলো।

অবশেষে সে শুভদিন এলো। তার পরের দিনগুলি স্বপ্নে-ভরা। গুল বুলবুলের নেশায় সে মশগুল-বেহুঁশ। মায়ের কথায় একদিন তার নেশার ঘোর ভাঙলো—স্বপ্ন টুটলো, হুঁশ ফিরে এলো। সত্যিই তো দুটির স্থলে এখন তিনটি প্রাণী। খাওয়া পরা কিভাবে জুটছে এতদিন তার খেয়ালে আসেনি। মা হিমশিম খাচ্ছে। খুবই অন্যায় হয়েছে। মাইনে বাড়াবার জন্য মনিবকে বলতে হবে। অনেক অনুরোধ উপরোধ, কাকুতি মিনতি করা হলো, চৌবে মাহিনা এক পয়সাও বাড়ালো না। অধিকন্তু ভয় দেখালে যে তাকে ছাড়ালে রাখালির জন্য কম তলবের অনেক উমেদার তার দুয়ারে ধর্না দিচ্ছে।

রঘুয়া মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এখন সে কি করবে? তবে কি বেশী রোজগারের জন্য তাকে গাঁয়ের বাইরে অন্য কোথাও যেতে হবে? এরূপ জিজ্ঞাসা আগে তার মনে কোনদিন জাগেনি। কিন্তু কোথায় যাবে? একমাত্র বিয়ের দিন ভিন্ন গাঁয়ের বাইরে সে কোনদিন যায়নি। এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ যত কিছু সবই সে তার এই ছোট্ট

গাঁ থেকে আহরণ করে বড় হয়েছে। গাঁয়ের সীমানার বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তার এই অজ্ঞতার সঙ্গে মেশানো আছে ভয়—দারুণ ভয়। কারণ সে শুনেছে তার বাবাও একদিন রুজি-রোজগারের ধান্ধায় গাঁয়েব বাইরে গিয়েছিলেন। একেবারে অগস্ত্য যাত্রা—তিনি আর ফেরেন নি। মা এখনও তা নিয়ে বিলাপ করেন।

ভয় ভাবনা প্রপীড়িত নিরুপায় নিঃসহায় রঘুয়া সেদিন গাছতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। অবশেষে গাঁয়ের মুদি শিউচরণের শরণাপন্ন হলো। রঘুয়া তার ফাইফরমাস খাটে। বিনিময়ে শিউচরণ বিড়ি খৈনি আর ২।১ পয়সার সওদাও ধার উধার দেয়।

রঘুয়া দৌড়তে দৌড়তে এসে শিউচরণের দোকানের সমুখের সরু বাঁশের মাচার ওপর বসে পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় গেলে নকড়ি মেলে, বলতো শেঠ!

শিউচরণ অবাক হয়ে বলে—সে কি রে! চৌবেজী কি তোকে জবাব দিয়েছে!

না, তা নয়। তবে হাঁ, একপ্রকার জবাব-ই বলতে পার। এত বছর ধরে মাসে তিন টাকা করে তলব দিয়ে এসেছে। গরু ভেড়া চরানো, গোয়াল পরিষ্কার তার উপর গেরস্থালি কাজের ফাইফরমাস তো লেগেই আছে। একটু ফুরসৎ নেই—খেটে খেটে জান কয়লা হয়ে গেল! এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু এখন দুজনেব স্থলে তিনজন হয়েছে। বলো, তুমিই বলো, তিন টাকায় কি এখন মাস গুজরান হয়? সব কিছুই আক্রা—দিন দিন দর কেবল বেড়েই চলেছে। বললুম, চৌবেজী মেহেরবানী করে দু'টাকা তলব বাড়িয়ে দিন। না হলে ভুখা মরে যাব। বাচপন সে কাম করছি—দয়া মায়া বলতে কিছু নেই। নিষ্ঠুর পাষণ্ড, মুখ উল্টে বলে কি জানো?—তুই গেলে ও গাঁয়ের দুখন ১ টাকা কম মাইনেতে কাম করবে। কত সাধাসাধি করছে। এখন বলো, আমি কি করি? কোথা যাই?

—তুই এখন যা। আমি ভেবে দেখি। সন্ধ্যার পর একবার আসিস।

শিউচরণের কথায় রঘুয়া আশ্বস্ত বোধ করে। সারাদিন আনমনা হয়ে কাজ করেছে। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই গোয়ালে গরু বাছুর রেখে সে বাড়ি ফিরে আসে। ঘরের দাওয়াতে উঠেই সে অবাক হয়ে যায়। ঘরের ভেতর তখনও পিদিম জ্বলেনি। অন্ধকার ঘরের মধ্যে কিছুই নজরে আসে

না। ভেতর থেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ আসতেই রঘুয়া দরজার ধারে এগিয়ে যায়। অন্ধকারে মনে হলো কেউ যেন আলুথালু হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে বুঝলো মোতিয়াই এমনি করে পড়ে আছে। আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গায়ে হাত দেওয়া মাত্র মোতিয়া ছিটকে আরো দূরে সরে যায়। রঘুয়া হতবাক। তার বিবাহিত জীবনে ঐরূপ তো আগে কখনো ঘটেনি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে মোতিয়ার হাসি মুখ দেখে তার সব শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হতো। কিন্তু আজ কি হলো? এমন কি অঘটন ঘটলো! এ জিজ্ঞাসা তাকে অস্থির করে তুললো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মোতিয়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই আলতোভাবে তার গায়ে হাত ছোঁয়ালো। মোতিয়া ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো মাথা তুলে ফোঁস ফোঁস করে বললে—খুব মরদ হয়েছো—মা ভিক্ষে করছে—পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, জেনানার আব্রু রক্ষা হয়না—পথে ঘাটে বে-ইজ্জতি, বে-সরম বাত। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, মাঠে মাঠে গরু ছাগল চরাচ্ছ আর মনের আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াচ্ছ। লজ্জা করে না? কথা শেষে মোতিয়া আবার লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

রঘুয়া হতবাক! মোতিয়া যে তাকে এমনি করে বলতে পারে এ তার কল্পনার বাইরে। তার বাঁশীর সুরের সে কতই না তারিফ করেছে। রোজই আব্দার করতো মাঠ থেকে সে যেন বাঁশী বাজাতে বাজাতে ঘরে ফেরে। না হলে বিষম আড়ি হবে। আর যে দিন মোতিয়া ভিন গাঁয়ে কলসী কাঁখে জল আনতে যেত সেদিন তো তাকে মাঠের সেই গাছটার আগডালে বসে বাঁশী বাজাতেই হতো। মোতিয়া যাতায়াতের পথে চটুল হেসে তার জবাব দিত। কতদিন বলেছে দাদীর কাছে রাধা-কৃষ্ণের সে কত গল্প শুনেছে। তারও খুব ইচ্ছা যে সেও তার সঙ্গে ঐরূপ রাধা-কৃষ্ণের খেলা করে। একদিন তো মোতিয়া তাকে বাঁশী হাতে ত্রিভঙ্গ ভাবে দাঁড় করিয়ে বাঁকা চোখ হেনে হাসতে হাসতে তার পায়ের কাছে লুটিয়েই পড়েছিল! এরূপ কত খেলাই না সে তার সঙ্গে খেলেছে! হায়, এ কি হলো! এখন সে কি করবে? মোতিয়া মিথ্যে কিছু বলেনি। মরদের মতো তো সে এযাবৎ কিছুই করেনি। অনুতাপে তার নিজের ওপর বিতৃষ্ণায় সে দিশেহারা হয়ে গেল। টাকা—টাকা রোজগারের জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠলো। আচম্বিতে তার মনে পড়লো শিউচরণ সন্ধ্যাবেলা

তাকে যেতে বলেছে। তৎক্ষণাৎ আর কোন দিকে না চেয়ে এবং কাঁউকে কিছু না বলে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে।

সে রাত্রির কথা রঘুয়ার স্মৃতিতে এখনও জ্বল জ্বল করছে। তার জীবনের মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত ঐদিন থেকেই। মনে পড়ে খুব উত্তেজিত অবস্থায় সে শিউচরণের দোকানে গিয়ে উপস্থিত। তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—ঠাকুরজী, দোহাই আপনার যে কোন একটা নকরি জুটিয়ে দিন, নয় তো ভূখা মর যায়গা।

শিউচরণ রঘুয়ার আচরণে হতভম্ব। বললে—করছিস কি—পা ছাড়্। চাকরি চাস তো আসাম চলে যা। নকরির অভাব কি সেখানে। চা বাগানে কাজের জন্য সাহেবদের লোক হন্যে হয়ে নওকর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের গোমস্তা সব রেল ষ্টেশনে রয়েছে। চা বাগানে কাজ করবি বললেই তোকে জামাই আদরে বরণ করে নিয়ে যাবে।

রঘুয়া শিউচরণের পা ছেড়ে দিয়ে তড়াং করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি বলছ ঠাকুরজী?

—সত্যি নয় কি মিথ্যে! ষ্টেশনে গিয়েই একবার পরখ করে দেখ না।

—টেশন, সে আবার কি, এবং কোথায়?

—হায় বুদ্ধু, তাও জানিস না? যেখানে কলের গাড়ি ধোঁয়ার কুণ্ডলী তুলে ঝিক ঝিক করতে করতে এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে লোকজন মালপত্র তুলে নিয়ে ফোঁস ফোঁস ভোঁস ভোঁস করতে করতে তুফান বেগে হাওয়া হয়ে যায়। টেশন গাঁ থেকে তিন ক্রোশ হবে। কেবল সকালে নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়বি। দুপুরের টাইন ধরবি।

নকবির নিশ্চিত সন্ধান পেয়ে রঘুয়া আশ্বস্ত হয়। তার মনের বল ফিরে আসে। শিউচরণের পায়ে ঢিপ করে একবার মাথা ঠুকে খুশী মনে বাড়ির দিকে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে চাকুরি পাবার পরে সে কি করবে মনে মনে তার একটা রঙিন ফিরিস্তিও তৈরি করে ফেলে। প্রথমেই মোতিয়াকে চৌবেজীর বাড়ির মেয়েদের মতো লাল টুকটুকে শাড়ি আর হাতভর্তি রেশমি চুড়ি দেবে। আর দেবে ফুলেল তেল। ও-বাড়ির মেয়েদেয় মতো মোতিয়া সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে হাওয়ায় গন্ধ ছড়িয়ে মন মাতাবে। কল্পনার গন্ধে মাতোয়ারা, ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্নে বিভোর রঘুনন্দন দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে। কতক্ষণে সে

মোতিয়া আর মাকে সুখবর দেবে যে তার নকড়ি নিশ্চিত হয়ে গেছে। তার আর তর সইছে না। অবশেষে নেশাগ্রস্তের মতো সে দৌড়তে থাকে অন্ধকারে ঝোপঝাড় সাপখোপ খানা-খন্দ ইত্যাদি কিছুর পরোয়া না করে।

বাড়ির সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ায়—জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই যেন শ্মশানের শূন্যতা ও নিস্তব্ধতা! বাইরের অন্ধকারের চেয়ে ঘরের অন্ধকার আরো গাঢ় আরো ঘন। দাওয়ার উপরে উঠতেই মনে হলো কে যেন শুয়ে আছে। মোতিয়া! না, কাছে গিয়ে দেখলে, মা। —মা, মা—বলে ডেকেই রঘুয়া তাকে আশ্বস্ত করবার মতলবেই বুঝি বললে—জান মা, আমি কালই নতুন চাকুরিতে চলে যাচ্ছি।

মা জেগেই ছিল। ছেলের কথার উত্তরে বললে,—সে কিরে কোথায় নওকরি পেলি?

—সে অনেক দূর মা, আসামে।

আশংকায় মায়ের বুক কেঁপে উঠলো। তা অত দূরে যাবি কেন? কাছেপিঠে কি আর নকরি মেলে না?

—তা আর হলো কৈ মা। গাঁয়ের কেউ তো চাকরি দিলে না। অতকরে সকলকে বললাম, সাধলাম, পায়ে পড়লাম। ভিন গাঁয়ের কাউকে চিনি না। তবু পথে ঘাটে যাকে দেখেছি তাকেই অনেক অনুনয় বিনয় করেছি। সকলেই নেই নেই বলেছে। কেউ আবার ঠাট্টার সুরে বলেছে—মর ছোঁড়া, তুই আবার কি নকরি করবি?

ভয়ে মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। ছেলেটাও কি নকরি করতে গিয়ে শেষে ওর বাপের মত না-পাত্তা হয়ে যাবে! আর সোমত্ত বউ নিয়ে সে ঘর আগলে থাকবে! পুরনো ব্যথা আবার নতুন করে চেগে উঠলো। তা প্রকাশ না করে মুখে শুধু বললে—বেটা, তুই অতদূরে গেলে আমাদের কে দেখ-ভাল করবে?

রঘুয়া অতি সরল বিশ্বাসেই মায়ের কথার জবাব দিয়ে বলে—কেন মা, গাঁয়ের কারো সঙ্গেই তো আমাদের দুশমনি নেই। সকলেই আমাদের চেনে জানে, যে যখন ডাকে তখনই তার বাড়ি যাই—ফাই ফরমাশ খাটি—তারা কিছু দিল বা না দিল তার তোয়াক্কা রাখি না। তারা কি তোমাদের দেখবে না!

ছেলের কথা শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তুই বুঝবিনা বেটা—

জমানা বহুত বদল গিয়া। আগে এই গাঁয়ের কেউ না খেয়ে থেকেছে, না মরেছে। আর এখন আমাদের মত কতজনই তো না-খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। কেউ খোঁজ খবর নেয় না। আগে কাজ করে দিলে আঁচল ভরে গেঁহু, চাল বাজরা, দিত। এখন এক মুঠো দিতেও কুণ্ঠিত। না-খেয়ে আছি শুনলে চোখ উল্টে বলে—কোত্থেকে দেব, আমাদেরই চলে না, সবই মাগগি। অথচ সে বাড়িতেই বিয়ে শাদি, শ্রাদ্ধশান্তিতে কি রোশনাই জলুস, ধুমধারাক্কাই না হচ্ছে! আগে তো এতটা দেখি নি। এই তো আজ সারাদিন ঘুরে কয়েক মুঠো বজরা ছাড়া আর কিছু পাইনি। আমি তুই হলে এতেই চলে যেত। কিন্তু এখন ঘরে রয়েছে সোমত্ত বহুড়ী। পবনের কাপড় শতচ্ছিন্ন—আব্রু রক্ষা করা দায়। ইঁদারা থেকে জল আনতে গেলে তাকে চরম বে-ইজ্জতি পোহাতে হয়। ও-পাড়ার কাল্লু আর ও-বাড়ির হরিয়া ওর যাতায়াতের পথে যেন ওকে গিলতে থাকে—বেলেল্লাপনা আর জঘন্য ঠাট্টা-মস্করা করে। আজ তো কাপড়ের কথা তুলে কাল্লুর অসভ্য আচরণ ও নোংরামি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে—যা উচ্চারণ করতেও ঘৃণা হয়। বউ রেগেমেগে ঘরে এসে পা ছড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

ক্রোধে রঘুয়া থরথর করে কাঁপছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। একবার শুধু—মা বলে চিৎকার দিয়ে ঘরের দিকে ছুটে গেল বাপের আমলের টাঙ্গিটা আনবার জন্য।

মা ও ছেলের কথা বার্তার মাঝখানে মোতিয়া কখন যে উঠে এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েছিল তা কারো নজরে আসেনি। রঘুয়া ঘরে ঢুকতে গিয়ে মোতিয়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মোতিয়া ছিটকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে দু'হাত দিয়ে রঘুয়াকে সজোরে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। অনুচ্চকণ্ঠে বললে—মুরোদ তো অনেক দেখিয়েছ—এখন এত রাত্রে রাগারাগি দাপাদাপি করে শেষে কি নিজেই খুন হবে।

মোতিয়ার বাহুবন্ধনে রঘুয়া কেমন যেন হয়ে গেল। সে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলে না। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। দাওয়ায় মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বহু কুপিটা জ্বাল।

মায়ের কথা শুনে মোতিয়া রঘুয়াকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণে রক্ষিত কুপিটা, জ্বালিয়ে সেটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ততক্ষণে মা এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েছে। মোতিয়াকে সম্বোধন

করে বললে—বহু হেঁসেলে বাজরা সেদ্ধ করা আছে। তুই আর রঘুয়া খেয়ে নিস। আমার শরীরটা ভাল নয়। আমি শুতে গেলাম।

রঘুয়ার চোখ ধাঁধিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠলো। সে আলোতে মরদ নামের অযোগ্য তার একান্ত নিরুপায় নিঃসহায় রূপ বুঝি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। ছেলেবেলা থেকেই সে মাঠে ঘাটে, বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটু বড় হতেই সে রাখাল হয়েছে। মাঠে ঘাটে গরু ছাগল ভেড়া চরিয়ে, ডাণ্ডগুলি খেলে আর মনের সুখে বাঁশী বাজিয়ে দিন গুজরান করেছে! সংসারের ঝড়ঝঞ্ঝাট, ছল চাতুরি, ঘোরপ্যাঁচ, ভাল মন্দ কিছুই বুঝতে বা জানতে শেখেনি। তাবপর হঠাৎ একদিন মায়ের নিকট এক নতুন কথা শুনলে যে, সে এখন নওজোয়ান হয়েছে, মা তার শাদি ঠিক করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক যাদুমন্ত্রে বুঝি সে জেগে উঠলো। সারা শরীরের শিবা প্রশিরায় প্রচণ্ড এক শিহরণ অনুভূত হলো। শরীরে ও মনে অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন ঘটলো। অকস্মাৎ এক অনাস্বাদিত স্বাদের লালসায় সে উন্মত্ত, এক অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অস্থির হলো। তারপর একদিন তার শাদি হলো। শাদির পরে সে এক মোহমদিরাময় ভিন্ন জগতে প্রবেশ করলো। সেখানে মোতিয়াই সকল সুখের আধার। দিনগুলি তার স্বপ্নে-ভরা মধুময় আনন্দে মশগুল!

এমনি সময় আচম্বিতে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! তার সুখের নীড় ভেঙ্গে চুরমার হলো—ধ্যানধাবণা সব ওলটপালট হয়ে গেল! সে এক নিদারুণ রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হলো। মা ভিক্ষে করে সংসার চালাচ্ছে। আর সে এমনই মবদ যে নিজের জেনানার আব্রু ইজ্জত রক্ষা করতে পারছে না। সংসার কি তার জানা নেই। তবুও অনুভব করলে সে মহা অপরাধী। ক্রোধেব চাইতে আত্মগ্লানি হলো অধিকতর। অনুশোচনায় পীড়িত হয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। হাত তুলে মাকে যেতে মানা করে বললে—এসব কথা তুমি আগে আমাকে জানাওনি কেন মা?

—কেন বলিনি? ভেবেছিলাম বেটা, আমার এই পোড়া পাঁজর ক'খানা দিয়ে যদ্দিন পারি তোদের আগলে রাখব যাতে তোদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগে। তার ওপর খুনখারাপির ভয়—হয় তুই খুন হতিস—নয় তো খুন করে ফাঁসি যেতিস। বহুকেও সাবধান করেছিলাম ওসব কথা তোকে যেন ঘুণাক্ষরেও না-বলে। কিন্তু পোড়া কপাল আমার সব উল্টো হলো।

—যাক বেটা, তুই এসব নিয়ে মাথা ব্যথা করবি না—আমি যদ্দিন আছি। আমি কোন বাপের বেটী আর কার বউ এ তল্লাটে কারো অ অজানা নয়। আমি থাকতে বছুর কোন ভয় নেই। তবে কিনা টাকা হচ্ছে আসল ওঝা। সেটা হাতে এলে দেখবি এসব দৈত্য দানো, ভূতপ্রেত সব ঝেঁটা মুখে নিয়ে চিঁচিঁ করতে করতে পালিয়ে যেতে পথ পাবেনা। টাকা রোজগারের চেষ্টা এখানেও তো কম করলি না। চশমখোর চৌবে মাত্র ছুটো টাকা বাড়াতেও রাজী হলো না। অদৃষ্টে কি আছে জানিনা। বিদেশ বিভুঁইয়ে টাকা রোজগার করতে যাচ্ছিস—বাধা দেবনা। হয়ত ভালই হবে। রামজী তোকে নিরাপদে রাখুন, তোর মঙ্গল করুন। এখানের জন্য আদৌ ভাবনা চিন্তা করবি না। রাত অনেক হয়েছে এখন খেয়ে শুয়ে পড়।

কথা শেষে মা চোখের জল মুছতে মুছতে চলতে গিয়ে পেছন ফিরে ড'কলে—বছু পিদিমটা নিয়ে আয়তো।

মোতিয়া এতক্ষণ ঘরের কোণে নিশ্চুপ নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। মায়ের ডা'ক শুনে মোতিয়া আলো হাতে রঘুয়ার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মায়ের উক্তির কোন প্রত্যুত্তর রঘুয়ার কণ্ঠে যোগাল না। সে নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাতি হাতে মোতিয়াকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে কিছু বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। বাতির আলোকে ছিন্ন বস্ত্রের আবরণের ভেতর থেকে উদ্ভিন্ন যৌবনা মোতিয়ার নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিটি রেখায় ফুটে বেরুচ্ছে। তার চোখে ধাঁধাঁ লাগলো। মোতিয়ার কোমল উদ্ধত যৌবনোদ্দীপ্ত দেহের এ রূপ লাবণ্য আর লাস্য-ভরা চলন ভঙ্গী আগে কোনদিন বুঝি তার চোখে এমন প্রখরভাবে ধরা পড়েনি। কিছুক্ষণ পূর্বে মায়ের মুখে শোনা মোতিয়ার বে-ইজ্জতি কাহিনী হয়তো ক্রোধের সঙ্গে তার মনের গোপনে কামনার ইন্ধন যুগিয়েছে। না হলে স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে সেও কেন কাল্লু ও হরিয়ার পর্যায়ে নেমে গিয়ে মোতিয়ার গমন পথে লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে!

আসন্ন বিরহ কাতর রঘুয়ার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো। সে অন্ধকার মেঝেতে শুয়ে পড়লো। কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিল মনে নেই। হঠাৎ অনুভূত হলো মোতিয়ার উত্তপ্ত আলিঙ্গনে সে নিষ্পেষিত হচ্ছে। আর তপ্ত অশ্রু তার বক্ষ সিক্ত করছে। রঘুয়া মোতিয়াকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উভয়ে বিনিদ্র

রজনী কাটিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করলো। ছু'জনে কতই না অনুরাগ আনুরক্তির শপথ নিলো! আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জীবনের এক রঙ্গীন মধুর চিত্র আঁকলো! হায়, তখন কি সে জানতো যে সে সব এভাবে বিফল ব্যর্থ হয়ে যাবে আর ঐ ছিল তাদের জীবন রঙ্গমঞ্চে শেষ রজনী!

রঘুয়ার পাঁজর ভেঙ্গে অন্তরের আর্তনাদ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। সে পাশ ফিরে শুলো, কিন্তু ঘুম এলো না! বেদনা ভরা স্মৃতির গুরুভারে তার হৃদয়ের মুক হাহাকার ধ্বনি বুঝি অদূরে কতগুলি নিশাচর পাখীর হঠাৎ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো। শূন্যে দৃষ্টি মেলে সে মেঘাচ্ছন্ন তিমিরাবৃত আকাশের পানে চেয়ে রইল। তার সঙ্গে সে তার ছুঃখভরা ছুর্ভাগ্য জীবনের বুঝি কিছুটা মিল খুঁজে পেলো। এত বছর পেরিয়ে গেল তবু এখনো সে সেই শেষদিনের বিদায় মুহূর্তের দৃশ্য ভুলতে প্যারে না।

মনে পড়ে রাত্রি ভোর হতেই শিউচরণের নির্দেশ মতো চাকুরির উদ্দেশ্যে অপরিচিত অজ্ঞাত পথে মায়ের দেওয়া পিতৃ-পরিত্যক্ত বহুদিনের জীর্ণ একটি ফতুয়া গায়ে জড়িয়ে আর একটা লোটা ও একখণ্ড ছিন্ন চট সম্বল করে তার সেদিনের যাত্রা শুরুর করুণ মর্মন্তুদ দৃশ্য। রোরুদ্যমানা জননী ও জায়া তার সঙ্গে গ্রামের শেষ প্রান্ত অবধি তাকে বিদায় দিতে এসেছে। পেছনে না তাকিয়ে রঘুয়া দৃঢ়চিত্তে এতক্ষণ নিঃশব্দেই চলেছিল। বিদায় মুহূর্তে সে পেছন ফিরে মা ও স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়ালো। মায়ের কান্না আর স্ত্রীর অশ্রুজল ও আলুথালু বেশ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। কোন সান্ত্বনার বাণী উচ্চারিত হলো না। সেও তাদের মতোই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মায়ের কান্না ও স্ত্রীর অশ্রুজলে বুঝি তার বিদেশ যাত্রার সংকল্প ভেসে যায়! আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে মা এগিয়ে এসে রঘুয়ার মাথায় হাত দিতেই সে উবু হয়ে মাকে প্রণাম করে। তারপর মুখ তুলে কিছুক্ষণ মোতিয়ার দিকে চেয়ে থাকে। মোতিয়া আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার ছু'নয়নে বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগলো। রঘুয়া অস্থির হয়ে উঠলো—বিদায়ের অন্তিম মুহূর্তে সে আর একবার মা ও স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সম্মুখে ফিরে দ্রুত হাঁটতে থাকে। আর পেছন পানে

তাকালে না। পশ্চাতে মাতা ও পত্নীর কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চলতে চলতে বারবার সে থেমে যাচ্ছে। তারা চুম্বকের মতো তাকে কেবল পেছন থেকে টানছে। কিন্তু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—টাকা তাকে রোজগার করতেই হবে। যাদের সে ছেড়ে যাচ্ছে তাদের দুঃখ মোচন করতেই হবে। এই বিচ্ছেদ বিরহ যত কঠিন পীড়াদায়ক হোক না কেন তা সহ্য করা ভিন্ন গতি নেই।

বহু ঘোরাঘুরি, খোঁজাখুঁজি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর রোদে ভাজা পোড়া হয়ে যখন রঘুয়া স্টেশনে পৌঁছলো তখন তার দম একদম নিঃশেষ—হাঁটবার কিংবা কথা-বলার ক্ষমতা রহিত। ঝুপ করে শান বাঁধানো মেঝেতে বসে পড়লো। হাতের পোটলাটা রেখে তার ওপর মাথা গুঁজে চক্ষু বুঁজে পড়ে থাকে। কিছুক্ষণ পব মাথা তুলে উঠে বসলো। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এদিক ওদিক চেয়ে পুকুর অথবা ইঁদারা কোথাও দেখতে পেলে না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করে করে এক পানি-পাড়ের নিকট হতে এক লোটাভর্তি জল চেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেললে। জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত সুস্থ সবল অনুভব করতেই সে শিউচবণ কথিত সাহেবের লোকের অনুসন্ধান আরম্ভ করে। জনেজনে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে সারা স্টেশন চযে ফেললে। কিন্তু সাহেবের লোকের কোন হদিশ পায় না। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে নানা জনের নরম, গরম কটু ইত্যাদি বহুরকম মন্তব্য শুনে সে হতাশ হয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাকে।

সেখানে বসে তার নজরে পড়লো সামনের ঘরের একটা জায়গা জাল দিয়ে ঘেরা। তার নিচের দিকে মাঝ বরাবর একটা ফোকড়। মাঝে মাঝে সেখানে লোকজন এসে কিছু জিজ্ঞাসা করে চলে যায়। কেউ কেউ আবার টাকা পয়সা বের করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে খটাখট আওয়াজ শোনা যায়। তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কি একটা নিয়ে চলে যায়। এভাবেই লোকের পর লোকের মিছিল চলেছে।

রঘুনন্দন কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে। তারপর এক সময়ে নিরালা হতেই জালের কাছে গিয়ে সাহস করে ভেতরের বাবুকে তার বক্তব্য জানায়। ভেতর থেকে বাবুটি প্রশ্ন করে—কি বললে—আসামে নকরি করতে যাবে? দাড়াও বলেই বাবুটি অন্তর্হিত হয়।

রঘুয়ার মনে এতক্ষণে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। অধীরভাবে সে সাহেবের লোকের প্রতীক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে ভেতরের বাবুটির সন্ধানে তার আশেপাশে আরো কয়েকজন এসে জড়ো হয়েছে। একটু সরে দাঁড়াতেই তার নজরে পড়ে একজন তাকে হাতের ইংগিতে ডাকছে। চলবার মুহূর্তে রঘুয়া দেখলে জালের ভেতরের বাবুটিও তার জায়গায় এসে বসেছে। রঘুয়া লোকটির নিকটবর্তী হতেই সে তার হাত ধরে বললে—এস। রঘুয়া হাতে চাঁদ পেল আর সাহেবের চা বাগিচার দালালের আর একটি নতুন শিকার জুটলো। লোকটা রঘুয়ার নাম ধাম, সাকিন ঠিকানা সব টুকে নিয়ে টেঁক থেকে বার করে গুণে গুণে পাঁচটা রূপোর টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—যা, হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে ঐযে দূরে অশথ গাছটা দেখছিস সেখানে গিয়ে বোস। ওখানে তোর মতো আরো অনেক নকরির উমেদার রয়েছে।

রঘুয়া হতবাক! জীবনে সে এযাবৎ একসঙ্গে এতটাকা দেখেনি। নিজের চোখকে বুঝি সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এরূপ আকস্মিক আশাতীত পাওয়াটা তাকে বিমূঢ় বিহ্বল করে দিল। অজ্ঞাতসারে তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গিয়ে সে টাকাগুলির স্পর্শ সুখ অনুভব করতে থাকে।

যে সামান্য ক্ষুদ্র পরিবেশে সে বড় হয়েছে, যে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চলাফেরা করেছে তার বাইরে এসে সে একেবারে দিশে-হারা। সব কিছুই যেন গোলক ধাঁধা। বিস্মিত বিমূঢ় ভাবটা কেটে যেতেই মনে পড়লো সাহেবের বাবুকে তো প্রণাম করা হয়নি। চৌবেজীর নিকট হতে যখন সে টাকা নিত তখন সে তাঁকে প্রণাম করতো। কিন্তু লোকটা ততক্ষণে সেখান থেকে সরে পড়েছে। এদিক ওদিক চেয়ে তাকে আর কোথাও দেখতে পেলে না। টাকা কয়টা শক্ত করে কোমরের ভাঁজে রেখে সে খাবারের সন্ধানে চলে।

চলতে চলতে তার মনে যে ভাবনার উদয় হলো তাতে তার সদ্য আত্মজন বিচ্ছেদ-বেদনার কিছু উপশম হলো। টাকাগুলি মায়ের নিকট পৌঁছে দিতে পারলে তার ও মোতিয়ার অনেক কষ্টের লাঘব হবে। এক্ষুনি রওনা দিলে মাকে টাকা দিয়ে বেলাবেলি অবশ্যই ফিরে আসতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা দুর্ভাবনায় পরিণত হলো। মনে প্রশ্ন জাগলো—যে টাকা দিয়েছে তাকে না বলে যাওয়াটা সঙ্গত হবে কিনা।

যদি কোন কারণে আজ ফিরে আসতে না পারে তখন কি হবে? সুতরাং আবার জালে ঘেরা জায়গার দিকে পা বাড়ালো। এমনি সময়ে একটা বিশ্রী হুঁশ হুঁশ, ভোঁস ভোঁস শব্দ তার কানে বাজলো। সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। শব্দটা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে এবং তার দিকেই ধেয়ে আসছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সেটা যখন তার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলো তখন তার মনে হলো ভীষণ শব্দে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে একটা অদ্ভুত দর্শন পাগলা জানোয়ার বুঝি তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। প্রাণভয়ে সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হোঁচট পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

এখন সে একজন রেল কোম্পানির জমাদার। প্রতিদিন কমপক্ষে তাকে ১৫।২০ বার দূরের ও নিকটের রেলগাড়ি সবুজ আলো দেখিয়ে সবুজ নিশান উড়িয়ে পাশ করাতে হয়। অথচ সে-দিন কি কাণ্ডই না ঘটেছিল!

তার পরের ঘটনার এটুকুই মনে আছে যে চেতনা ফিরে এলে সে দেখলো অনেক লোক তাকে ঘিরে রয়েছে। তাদের চোখে মুখে কৌতূহল। তার মাথা আর গায়ের ফতুয়াটা জলে ভেজা। অতিকষ্টে সে উঠে দাঁড়ালো এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঐ গাছতলায় গিয়ে বসে পড়লো। লোকগুলো তাকে দেখে ছুটে এসে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলো। তাদের জিজ্ঞাসার সে কি উত্তর দিয়েছিল মনে নেই। তবে বসে থাকতে না পেরে সে যে শুয়ে পড়েছিল এবং ক্লান্তিতে চক্ষু মুদেছিল তা স্মরণে আছে।

ঐ অবস্থাতেই বুঝি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নচেৎ হঠাৎ শরীরে ঝাকুনি লাগতেই সে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠতে গিয়ে কোমরে টান লেগে শুয়ে পড়েছিল কেন? ঘুমের ঘোর কাটতেই চোখ রগড়ে রগড়ে প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি যে কোথায় শুয়ে আছে। অভ্যাস মতোই ভেবেছিল যে গরু চরাতে চরাতে মাঠের কোন গাছ তলাতেই বুঝি সে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু কোমরে এবং হাঁটুর ব্যথা অনুভূত হতেই তার আদ্যোপান্ত সব মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসলো। কিন্তু একি! এদিক ওদিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। গাছতলা জনশূন্য। সূর্য

ডুবু ডুবু—দিনের আলো নিবু নিবু। ঘনায়মান অন্ধকারে মনে হলো তার বয়সী একজন লোক নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো অদূরে সাব সার অনেকগুলি বাতি জ্বল জ্বল করছে। লোকটাকে কিছু বলবার আগেই তার মনে যে প্রশ্ন জাগলো তাতে সে খুবই বিচলিত বোধ কবলো। সকলেই কি তাকে ফেলে চলে গেছে! তাও বা কি করে সম্ভব? এতগুলো কড়কড়ে টাকা গুণে দিয়েছে। টাকার কথা মনে পড়তেই ট্যাঁকে হাত পড়লো। না সেগুলো যথাস্থানে আছে। কিন্তু ঘবে তো টাকা পৌঁছে দিতে পারলো না। বাড়িব কথা মনে পড়তেই তার হৃদয় ব্যথায় টন টন কবে উঠলো। অস্থিব চিত্তে সে উঠে দাঁড়াল এবং আলোর দিকে পা বাড়ালো। কয়েক পা যেতেই সে পেছনে আকর্ষণ অনুভব করলো। পাশ ফিরে দেখে সেই লোক—যাকে সে দেখেও দেখেনি—কি যেন বলতে চাইছে।

রঘুয়া দাঁড়াতেই সে বলে—সর্দাব তোমাকে নেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে—এসো।

লোকটিকে অনুসবণ কবে রঘুয়া দলেব সঙ্গে মিলিত হলো। তাব মনে হলো দলটা আগের চাইতে মাথায় ভারি। সকলেবই ব্যাজারমুখ। বাড়ি ঘর, আত্মজন, দেশ গাঁ ছেড়ে এক অজানা অচিন দেশে চলেছে টাকা কামাবার আশায়। সকলেই তাব মতো উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ। রঘুয়ার মনে তার বাবার কথা উদয় হলো। সেও বিদেশে নকড়ি করতে গিয়ে না পাত্তা, আর ফেরেনি। তার অদৃষ্টেও বা কি আছে কে জানে! গভীর বেদনা-ভরা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে এল।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো। স্টেশনে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য ও ব্যস্ত সমস্ত ভাব পরিলক্ষিত হলো। তাদেব ডাকা-ডাকি হাঁকা হাঁকিতে স্টেশন চত্বর সরগরম। কাঁচেব ভেতরের বাতিগুলিও যেন আরও উজ্জ্বল হয়েছে। দূব থেকে যে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমেই তা নিকটবর্তী হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আলোর রেখায় স্টেশন প্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত। দেখতে দেখতে ছকছক ঝকঝক করতে কবতে অতিকায় দৈত্যের মতো গাড়িটা এসে থমকে দাঁড়ালো। ওটার মাথার উপর থেকে রাশিকৃত কালো ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে আলোগুলোকে ঢেকে ফেলছে। রঘুয়ার মন ইতিপূর্বেকার মতোই আতঙ্কে ছেয়ে গেল। ভয়ে বিস্ময়ে সে বজ্রাহতের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ কালো তক্‌মা পরা একটা লোক এসে তাদের রাম, দুই, তিন করে গুণতে শুরু করলে। গুণতি শেষ হলে পর তিরিক্ষি মেজাজে কটু ভাষায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গরু ভেড়ার মতো হুট হুট করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট একটা কামরায় পুরে দিলে এবং বাইরে থেকে দরজায় চাবি এঁটে দিয়ে চলে গেল। কামরাটা এতই ছোট যে তার মধ্যে সকলের সংকুলান হলো না, তবুও অনেক কষ্টে তারা মেঝেতে বেঞ্চিতে গাদাগাদি করে বসলো।

আবার ঢংঢং করে ঘণ্টার শব্দ হলো। গাড়িটা প্রথমেই একটা জোব ধাক্কা দিয়ে নড়ে উঠলো। কামবাটাব মধ্যে সকলে ভয়ে চিৎকার দিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলে। কিছুক্ষণ ধীর গতিতে চলে গাড়িটা শব্দের তুফান তুলে ছুটে চললো। রঘুয়াব ভয়েব ধকল তখনো কাটেনি। জড়সড় ভাবে জানলা দিয়ে দেখলে গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন দূরবর্তী গাছপালাগুলো পর্যন্ত পাগলেব মতো ছুটছে। মায়ের স্নেহ ও পত্নীর প্রেম-পাশ থেকে নিজেকে ছিন্ন কবে অনভিজ্ঞ অবজ্ঞাত রঘুয়ার অকরুণ অপবিজ্ঞাত অচেনা পৃথিবীতে এক আশা-মরীচিকার পেছনে ধেয়ে চলার যাত্রা শুরু হলো।

তার পরেব দিনগুলি দুঃস্বপ্নে ভরা। সে নরকবাসেব স্মৃতি মনে এলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রঘুয়া পাশ ফিরে। কতদিন হয়ে গেছে এখনো সে মোতিয়াকে ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে ফিরছে। অতীতের সেই শেষ রজনীর সুখস্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছে যাচ্ছে না। প্রতিবাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে চক্ষু বুজলেই মোতিয়া যেন চুপিসারে এসে হাজির হয়। মনে মনে তাব উষ্ণ কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে রঘুয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত না পোহাতেই ষ্টেশনের তারে ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠলো। জংশন থেকে গাড়ি ছেড়েছে—তারই সংকেত ধ্বনি। রাতে রঘুয়ার ভাল ঘুম

হয়নি। রাত আড়াইটায় একবার মালগাড়ি পাশ করাবার জন্য উঠতে হয়েছিল। তার ওপর মাঝে মাঝে সাধুদের কণ্ঠ নিঃসৃত হর হর বম্ বম্ ধ্বনি নিশীথরাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গাঢ় তমিস্রার বুক চিরে ষ্টেশন ও তার আশপাশের লোকজনের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

রঘুয়া ক্ষণিক ঝিম মেরে থেকে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে। হরকিষেণকে জাগিয়ে তুলে ছোটবাবুকে কোয়ার্টার থেকে ডেকে আনতে বলে আপন নিত্যকার বাধাধরা কর্মে লিপ্ত হয়।

স্টেশনটি আকারে ছোট। দূর থেকে মনে হয় যেন পাহাড়ের কোলে লেপ্টে বসে আছে। রেল লাইনের একধারে বিরাট এক জলা ভূমি—পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। চার পাশে হোগলা বন আর জানা আজানা বহু রকমের জলজ উদ্ভিদ। ডাহুক, তিতির বুনোহাস, মরাল, বক ইত্যাদি নানা জলচর প্রাণীর ক্রীড়া ক্ষেত্র। মাঝখানে পদ্মবন—অজস্র শ্বেত পদ্মের সমারোহ। এখানে ওখানে লাল শাপলা উঁকি দিচ্ছে—যেন শ্বেত শুভ্র মালিকায় পদ্মরাগ মোতি শোভা পাচ্ছে!

স্টেশন থেকে খানিক দূর এগোলেই ডাকঘর, তারপর হাইস্কুল, বাজার ইত্যাদি। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম পরিবেশ। ছোট্ট জনপদ। এত ছোট স্টেশনে ডাকগাড়ি থামবার কথা নয়—তবুও দাঁড়ায়। কারণ এখানে বিভিন্ন স্থানের ডাকের থলি ওঠা নামা করে। পাহাড় ডিঙিয়ে ওধারের অধিকাংশ পোস্ট আপিসের ডাক এখান দিয়ে যাতায়াত করে। সকাল সন্ধ্যায় ডাকের থলি নিয়ে হরকরারা যখন দল বেঁধে লোহার আঙটায় ঘুঙুর আঁটা বল্লম কাঁধে রাস্তা দিয়ে দৌড়তে থাকে তখন এক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ঘুঙুরের শব্দে যেমন জন্তু জানোয়ার দূরে পালায় তেমনি আকৃষ্ট হয়ে ছেলে ছোকরারা রাস্তায় ছুটে আসে। বুড়োরাও থমকে দাঁড়ায়—আর গৃহস্থ ঘরের বধুরা ঘোমটার আড়াল থেকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। ডাক হরকরাদের জন্য পোস্টআপিস সংলগ্ন আড্ডাঘর রয়েছে।

ডাকঘর ছাড়িয়ে রেল লাইন পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই বন বিভাগের আপিস—লোক লস্করে জমজমাট। সেখান থেকে আরো কিছুদূর এগোলেই ছোট্ট টিলার ওপর এ অঞ্চলের এক নাম-করা ডাকবাংলো—লাল টালির ছাউনি, চতুর্দিকে বাগান দিয়ে ঘেরা আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

টিলার ওপর প্রচুর আমলকি হরিতকি ও বহেরা গাছের সমারোহ—এক মনোরম শান্ত গম্ভীর পরিবেশ। পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করলে অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্যের শেষ রশ্মি-স্নাত দূরবর্তী সমুদ্র আর তার বালুকা-বেলা বিস্তীর্ণ এক মরুভূমির মোহময় মরীচিকা বলেই ভ্রম হয়। পুবদিকে ঢেউ খেলানো ছোট ছোট পর্বতশ্রেণী—নিবিড় সবুজ অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। রুক্ষতা কচিৎ পরিদৃষ্ট। সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে শ্বেত শুভ্র এক মন্দিরের উপরিভাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রভাত সূর্যের প্রথম রাঙা তির্যক রশ্মি মন্দিরের চূড়ায় অবস্থিত ধাতুর কলসীর ওপর পড়ে শত সহস্র ফুলঝুরি হয়ে ঝরে পড়ছে—এক অভাবনীয় অদ্ভুত মনোরম দৃশ্য।

স্টেশনটি বৃষ্টি-ধোয়া রৌদ্রে ঝলমল করছে। দু'জন তরুণী গাড়ি থেকে নেমে এলো। উভয়েরই পোষাক অতি সাধারণ আট-পৌরে। সঙ্গে মোটঘাটও তেমন কিছু নেই। দুটো ছোট হোল্ডল মাত্র। একজনের হাতের সুটকেসটি চামড়ার অন্যের হাতেরটি টিনের। এত ছোট্ট স্টেশনে সচরাচর নীল-কোর্তা-পরা রেল-কুলি থাকার কথা নয়। মালপত্র যাত্রীদেরই গাড়ি থেকে ধরাধরি করে নাবাতে হয়। স্থানীয় দিন-মজুরদের কখনও সখনও গাড়ির সময় স্টেশনের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যাত্রীরা তখন রেল-কর্মীদের ধরে তাদের ডেকে আনে। তাতে অবশ্য রেল কর্মীরাই লাভবান কেননা তাদের পকেট ভারী হয় মজুরের মজুরী থেকে বখরা নিয়ে। তবে স্টেশনে আত্মীয় স্বজন উপস্থিত থাকলে যাত্রীদের অত হাঙ্গাম হুজ্জত পোহাতে হয় না কারণ তারাই আগে থেকে মজুর ঠিক করে রাখে।

বয়োজ্যেষ্ঠা যুবতীটি প্লাটফরমের এদিক ওদিক ঘুরে কোন মজুর দেখতে পায়না। অগত্যা তিনি স্টেশন মাষ্টারের ঘরে ঢুকে পড়েন। কর্মব্যস্ত ছোটবাবু তাঁকে দেখেই—সুদেষ্ণাদি যে, বলে উঠে দাড়ান। নমস্কার জানিয়ে বললেন—বসুন, বসুন, কখন এলেন? এই গাড়িতে বুঝি? তা একা, না সঙ্গে কেউ আছে?

তিনি হেসে জবাব দিলেন- না, একা নই সঙ্গী আছে। *যে প্রয়োজনে এমন অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি যদি কিছু মনে না করেন তো* বলি।

—ছিঃ ছিঃ একি বলছেন আপনি! শুধু শুধু লজ্জা দিচ্ছেন। আপনাদের সাহায্য করা তো আমাদের কর্তব্য। বলুন, কি করতে হবে?

—কিছুই না, কুলির দরকার। প্লাটফরমে জমাদার, লাইনসম্যান কাউকে দেখতে পেলাম না। দয়া করে যদি ব্যবস্থা করে দেন। ছুটো না পেলে একটা হলেও চলবে।

—ও, এই ব্যাপার! হাতি ঘোড়া এমন কিছু নয়। এক্ষুণি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—বসুন। ছোটবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বহুদিন পরে দেখা। তা এখানে হঠাৎ কি মনে করে?

—কয়েকটা কেস হবে—এমন আশ্বাস পেয়ে হঠাৎ ছুটে এলাম। যাই হোক এবার কিন্তু আপনাকে আর রেহাই দিচ্ছি না। অনেকদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এদিকে বয়সটা তো আর থেমে নেই। সে খেয়াল আছে! ভাল কথা, ডাক বাংলোতে হোমরাচোমরা কেউ কেটা গোছের দিশী বিলিতি সায়েবসুবা কেউ আছে নাকি?

—আপনার বরাত ভালই বলতে হবে। গত রাত্রেই আমাদের রেলের এক বড় আর মেজ সাহেব বাংলো ছেড়ে গেছেন। তাঁরা শিকার করতে এসেছিলেন মেম সাহেব সঙ্গে নিয়ে। তিন দিন মানু মিঞার হাতি চড়ে লোক লস্কর নিয়ে ঘুরে ঘুরে হরিণ, শূয়োর আর বুনো মোরগ ছাড়া আর কিছু জোটে নি। একদিন এক নালার ধারে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বন বাদার, ঝোপ-জঙ্গল, নালা খাল চষে ফেলে হয়রান। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ নালার ধারে হরিণের ডাক শুনে কাছে পিঠে বাঘ আছে ভেবে অদূরে অতি সন্তর্পণে গাছে উঠে মাচায় চড়ে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ দাতু মিঞার হাত থেকে বিরাশী সিক্কা ওজনের মগি দা'খানা ফস্কে নিচে পড়ে যায়। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর হয়ত তার ঢুলুনি এসেছিল। ব্যস্—আর যায় কোথায়—সব ফাক্কা। হরিণটা একটা কর্কশ চিৎকার দিয়ে দূরে সরে যায়। সাহেব তো রেগে মেগে আগুন—গাছ থেকে নেমে—এই মারি কি তেই মারি করে ছুটে দাতুকে মারতে যায়। দাতু পালিয়ে বাঁচে। রাত বারোটা নাগাদ দলবল নিয়ে সাহেব শূন্য হাতে বাংলোয় ফিরে আসে। যাক্ গে কি যেন বলছিলাম—ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে ফেললাম। কিছু মনে করলেন না তো! তবে হাঁ, গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাক বাংলোতে কেউ উঠেছে কিনা জানি না। স্টেশনে তো ওখানে থাকবার মত কাউকে নামতে দেখিনি। তবে শহর থেকে মোটরে কেউ এসেছে কিনা বলতে পারব না। যাক্ আমি রঘুনন্দনকে বলে আপনার কুলির

ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বলেই—রঘুয়া রঘুয়া বলে হাঁক দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই—জী হুজুর বলে রঘুয়া হাজির।

—মাইজীর জন্য দুটো কুলি নিয়ে আয় তো। রঘুয়া চলে যেতেই ছোট বাবু সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে বললেন—বসুন ও এক্ষুনিই আসবে।

ধন্যবাদ দিয়ে সুদেষ্ণা বললে— না, আর বসবো না। প্ল্যাটফর্মে আমার সঙ্গী একা দাঁড়িয়ে আছে। আমি বরং ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করছি। দুঃখিত, আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম।

—না, না, এখন তেমন কোন জরুরী কাজ নেই। পরের ট্রেন তো সেই সাড়ে দশটায়। আচ্ছা যান, আমি কাগজ পত্র সামলে আসছি।

সুদেষ্ণা বাইরে এসে দেবযানীকে কাছে ডাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোট বাবুও এসে হাজির হন।

দেবযানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে সুদেষ্ণা বললে—ইনি এখানের এসিস্টেন্ট স্টেশন মাস্টার, অতি সজ্জন, আমার অনেক উপকার করেন।

ছোটবাবু একটু লাল হয়ে বললেন—এ কিন্তু আমাকে খালিখালি লজ্জা দেওয়া। আমি আপনার এমন কি উপকার করতে পেরেছি!

রঘুয়া এসে জানালে স্টেশনের আশে পাশে কোন মজুর নেই। বাইরে বাজার থেকে ধরে আনতে পারে।

—যা, তাই নিয়ে আয়।

—দাঁড়াও। সুদেষ্ণা তাকে বাধা দেয়। —বড্ড দেরী হয়ে যাবে না কি!

—না, না, দেরী হবে না। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আয়। ছোটবাবু হুকুম করেন।

—আমি বলছি—অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না হয়, বেডিং দুটো আপনার হেপাজতে রেখে যাই। তারপর ডাক বাংলো পৌঁছে চৌকিদারকে পাঠিয়ে ওগুলো নেবার ব্যবস্থা করবো।

—না, আমার আবার অসুবিধা কি? অসুবিধা হবে আপনাদের। বেডিং ছাড়া ওখানে গিয়ে কষ্টে পড়বেন। তবে হ্যাঁ, চৌকিদারের কথা যা বললেন তা খুবই সত্যি। বলা মাত্রই সে দৌড়ে এসে মোট নিয়ে যাবে। তার কথাবার্তা হাবভাবে মনে হয় সে আপনার কেনা গোলাম, দেখা হলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে আর আপনি যে তার কত উপকার করেছেন তা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে—বলার আর শেষ হয় না।

—সে কি, গোলাম টোলাম আবার কি কথা! ওটা ঠিক বলা হলো না। সুদেষ্ণা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে।

মাস্টারের মুখের ভাব পাল্টে গেল—বুঝিবা ক্ষুণ্ণ হলেন। সুদেষ্ণার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বলেই চলেছে—জানেন, ওরা হচ্ছে এই দুর্ভাগা দেশের আদি অকৃত্রিম সহজ সরল ছলনাচাতুরী বিহীন মূক জন জীবনের মূর্ত প্রতীক। ওরা আমাদের মতো ভদ্রলোক, বিত্তবান সমাজের উচুতলায় অবস্থিত ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত শোষিত, নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। বলেই সুটকেশটি তুলে চলবার ভঙ্গী করে—তার চোখ মুখ লাল।

এরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দেবযানীও দিদির অনুসরণে পা বাড়ায়। এমনি সময়ে রঘু দৌড়ে এসে জানায় দুটো কুলি পাওয়া গেছে।

কুলিরা এসে দাঁড়াতেই সুদেষ্ণা তাদের দিকে তাকিয়ে হোল্ডল দুটি তুলে নিতে বলেই চলতে শুরু করে। পেছন ফিরে ছোটবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলে শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

—দেখা তো অবশ্যই হবে। কিন্তু ধরুন, বলা তো যায় না, গিয়ে যদি দেখেন যে, ডাক বাংলোতে জায়গা নেই, তখন কি করবেন?

—কি আর করবো। তখন ঐ আপ্ত বাক্যই অনুসরণ করবো—ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে। আপনি বললে আপনার ডেরাতেও আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি। লজ্জা পাবেন না। আমার মনের কথাই ব্যক্ত করলাম।

ছোটবাবু কি জবাব দিলেন তা শোনা গেলেও বোঝা গেলনা। সুদেষ্ণা ও দেবযানী তখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

বলা বাহুল্য সুদেষ্ণা এ অঞ্চলে বহুল পরিচিতা—এক বিখ্যাত বিলেতি বীমা কোম্পানির এজেন্ট—সুদক্ষ এবং অতীব জনপ্রিয়। গ্রামে, হাটে বাজারে শহরে বন্দরে সর্বত্র তার অবাধ গতি। কোম্পানিকে বৎসরে বহু টাকার জীবন বীমার কাজ দেয়। আয় করে প্রচুর ব্যয়ও করে তদরূপ। অসুখে বিসুখে, অনাহারে অনশনে কেউ সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে বিমুখ করে না। গায়ে গতরে খেটে কিংবা অর্থ দিয়ে যে ভাবেই হোক সাধ্যমত সাহায্য করে। তার এই পরোপকার ও পরসেবা প্রবণতা কতটা সহজাত প্রবৃত্তি আর কতটাই বা

ব্যবসা-বৃত্তি প্রভৃতি তা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে এটা ঠিক হৃদয়ে পরের জন্য অনুভূতি, পরের দুঃখে মন প্রাণ না কাঁদলে, হৃদয় বিগলিত না হলে নিজেকে বিপন্ন করে শরীর দিয়ে আর্তজনের সেবা-শুশ্রূষা কখনই সম্ভব নয়। বিশেষত যাদের সঙ্গে তার মেলা মেশা, কাজ কারবার, তাদের চাইতে দৃশ্যত তার সহানুভূতি যখন নিচু মহলের দিকেই প্রকট।

যুবতী সুদেষ্ণা আর কিশোরী দেবযানী রূপসী নয়, কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। মুখাবয়ব কচি স্নিগ্ধতা মাখা হলেও তাতে কাঠিন্যের ছাপ সুপরিস্ফুট। দৃষ্টি বুদ্ধি-দীপ্ত, চলনে বলনে দৃপ্তভঙ্গী। সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য-ভরা মসৃণ দেহ তাতে যৌবনের উগ্রতা না থাকলেও আবেদন রয়েছে। শরীরে রেখার প্রখরতা আছে কিন্তু উৎকটতা নেই, রিপুর চিহ্ন না থাকলেও উত্তাপ রয়েছে। সব মিলে শুচি শুভ্র একান্ত ঘরোয়া আটপৌরে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মতো প্রীতিমতী, শ্রীমতী, তবে কলসি কাঁখে গ্রামের পুকুরঘাটে ভালো লাগে, না, হাইহিল জুতো, পায়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে এলো খোঁপায় নগরের রাজপথে ভালো লাগে—তা অবশ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

সুদেষ্ণা ও দেবযানী কুলি সমভিব্যাহারে রেল স্টেশন পিছনে রেখে সম্মুখে এগোচ্ছিলো। খানিকদূর গিয়েই পোষ্টআপিস—একেবারে রাস্তার ধারে। আপিস প্রাঙ্গণে ঢুকে মোট সহ কুলিদের অপেক্ষা করতে বলে তারা ভিতরে ঢুকে গেল। ঢেউ টিনের ছাউনি দিয়ে বিরাট চারচালা ঘর। উপরে কাঠের পাটাতন—কাঁচা মাটির দেয়াল। সিমেন্ট করা মেঝে—অতিব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত। কোথাও ইট বেরিয়ে পড়েছে—যেন দগদগে ঘা। আপিস সংলগ্ন পিছনের দিকে কোয়ার্টার-এ পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় থাকেন। আপিসের কাজ তখনও শুরু হয়নি। মাষ্টার মশাই সবে ভেতর থেকে এসে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছেন। কর্মের প্রারম্ভে হয়ত ইষ্ট নাম জপছিলেন। এমনি সময়ে সুদেষ্ণা—সুপ্রভাত—জানিয়ে এগিয়ে এল।

অত ভোরে আকস্মিক বামা কণ্ঠের সম্ভাষণে মাষ্টার মশাই হকচাকয়ে যান। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পেছন ফিরে সুদেষ্ণাকে দেখেই বৃদ্ধবয়সে রসিকতার লোভ সংবরণ করতে না পেরে পাল্টা সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন —অরি মরি প্রভাতে উঠিয়া কি মুখ দেখিনু দিন যাবে মোর ভাল। পেছনের উনি আবার কে? ও বাবা, এ যে দেখছি হর গৌরী

—হলো না, স্যার, হলো না, লিঙ্গ ভেদে বাক্য ভুল। গঙ্গা যমুনা, বিন্দে বিশাখা আর তাতে রুচি না হলে ভৈরবী জ্বালামুখী বলতে পারেন। প্রভাতে দেবকুল অসুরকুল—উভয়কুল স্মরণে ফাঁড়া গর্দিশ কাটবে, সিদ্ধি লাভ হবে।

—স্বস্তি, স্বস্তি—তা দেবীদের আকস্মিক আবির্ভাব··· !

—খবর দেবার আর ফুরশত পেলাম কোথায় ? কোম্পানীর কাজে বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে আপনার চিঠি পেলাম। এখানে আরো কয়েকজনের খবর আছে। তার উপর অনেকদিন এমুখো হইনি—বিলম্বে 'বহুনি বিঘ্নানি' স্মরণ করে সটান চলে এলুম। যাক, এখন আর আপনার সময় নষ্ট করবো না— শুধু পৌঁছ খবর দিয়ে গেলাম, মাসীমা এখানেই আছেন এবং নিশ্চয়ই ভাল আছেন। ছেলে পুলেরাও কুশলে আছে আশা করছি। আমরা ডাক বাংলোতেই উঠতে যাচ্ছি। টেলিগ্রাম চিঠিপত্র এলে দয়া করে মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠাবেন—শুধু আমার নয়, দেবযানীরও, সব কিছু আপনার কেয়ারে আসবে। ভাল কথা, ডাক বাংলোতে এখন কেউ নেই তো ?

—আমার জানা নেই, দাঁড়ান ষষ্ঠীকে জিজ্ঞেস করছি।

ষষ্ঠী তখন বোধ হয় চিঠি সর্ট করবার খোপের মধ্যেই ছিল। নিজের নাম শুনে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—আজ্ঞে, আমাকে কিছু বলছেন ? তারপর সুদেষ্ণা ও দেবযানীকে দেখে নমস্কার করে বললে,-ওমা, দিদিমণিরা যে, কখন কোন গাড়িতে এলেন ?

সুদেষ্ণা দেবযানী সমভিব্যাহারে পোষ্ট আপিস থেকে বেরিয়ে আসে। কুলিকে অনুসরণ করবার ইংগিত দিয়ে উভয়েই পূর্বদিকে চলতে থাকে। পথের মাঝে মাঝে তখনও জল কাদা। কখনও ডিঙিয়ে কখনও বা পাশ কাটিয়ে চলতে হচ্ছে। ফলে তাড়া থাকা সত্ত্বেও চলার গতি এমনিতেই শ্লথ হয়ে যাচ্ছে।

রেল লাইন পেরিয়ে মসজিদ সংলগ্ন পুকুরটা বাঁয়ে রেখে কিছুদূর এগোতেই রাস্তার ডান পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বন-আপিস। এদিকের রাস্তা আরও খারাপ। কাপড় চোপড় সামলে অতি সন্তর্পণে চলে চলে অবশেষে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের রাস্তা ধরে তারা টিলার

পাদদেশে পৌঁছে। সকলেই চুপচাপ চলছিল। মাঝখানে দেবযানী একবার কি প্রসঙ্গ যেন উত্থাপন করেছিল। কিন্তু সুদেষ্ণার ইংগিতে চুপ করে গেল।

এখন উপরের দিকে ওঠা শুরু। টিলার উচ্চতা খুব বেশী নয়। মোটর চলাচলের জন্য টিলার পেট কেটে রাস্তা বার করা হয়েছে। সে রাস্তা সাপের মত তিন পাক দিয়ে একেবারে বাংলোতে গিয়ে পৌঁচেছে। বাংলোটির অবস্থান এমন চমৎকার যে উপর থেকে দৃষ্টিপাত করলে টিলার পাদদেশ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। রাস্তাটা খুব প্রশস্ত না হলেও ছোট নয়। দু'ধারে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং নাম না-জানা অনেক গাছের সারি। নানা পাখীব কূজনে সর্বক্ষণ মুখরিত। নির্জন, নিরালা— প্রেমিক প্রেমিকাদের স্বর্গ!

সুদেষ্ণা সঙ্গিনী সহ বিনা ক্লেশে উপরে উঠে আসে। কুলিরা পিছিয়ে পড়েছিল। এটা তাদের ইচ্ছাকৃত না অবসাদ জনিত বোঝা গেল না। বাংলোর সামনে এসে সুদেষ্ণা অবাক, প্রত্যেকটি ঘর বন্ধ! এমন কি রসুই-খানা, বাবুর্চি, খানসামা এবং চৌকিদারের ঘব সুদ্ধ তালা আঁটা! এমন তো বড় একটা ঘটে না! শুধু গ্যারেজটা খোলা পড়ে আছে। সামনে এসে দেখে ১৩।১৪ বৎসরের একটি ছেলে গামছা পেতে ঘুমিয়ে আছে। অনেক ডাকাডাকির পর ছেলেটা উঠে চোখ রগড়াতে থাকে। তারপর চোখ মেলে মহিলাদের দেখে একেবারে হতভম্ব! সেলাম ঠুকে সামনে এসে দাঁড়ায়।

সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করলে—চৌকিদার, বাবুর্চি, খানসামারা সব গেল কোথায়? তুই কে, নাম কি?

—আজ্ঞে, আমার নাম শহুর। গফুর চৌকিদার আমার ফুফা লাগে। কেবল ভোরে নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছে। বলেছে বাড়ি হয়ে বাজার ঘুরে জলদি ফিরবে। সাহেব সুবা কারোবই আসবার খবর নেই—তবু যদি আচমকা কেউ এসে পড়ে বাগানের বেঞ্চিঘরে বসতে দিবি। ভাল করে তদবির তদারক আর খিদমত করবি। তা আমি আগেই বেঞ্চিঘর ঝাড়পোছ করে রেখেছি। কাজকর্ম সেরে এখানে এসে বসেছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। গেল ক'দিন হাড় ভাঙা খাটুনি গেছে কিনা। মেমসাহেবরা এক দণ্ডও বসতে, জিরোতে দেয়নি—হরদম ফাই ফরমাশ লেগেই ছিল। আপনারা ওখানে গিয়ে জিরোন। বলেন তো

আমি একটু এগিয়ে দেখি ফুকা আসছে কিনা। আর যদি কিছু দরকার থাকে তো আনতে পারি।

—আচ্ছা তুই যা, আর দেখিসতো কুলি দুটো মোট নিয়ে এলো কিনা!

সুদেষ্ণা ও দেবযানী বাগানের মধ্যে ছোট ঘরখানাতে ঢুকে পড়ে। নানা লতাপাতা ঘরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুখোমুখি দুখানা বেঞ্চি। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় বাগানটি সযত্নে লালিত পালিত। চামেলি, যুঁই, সূর্যমুখী, গন্ধরাজ ইত্যাদি নানা পুষ্পবৃক্ষে শোভিত। তাতে বিচিত্র পুষ্প সম্ভার—রূপে গন্ধে ও বর্ণে অতুলনীয়। অদূরে এক বৃক্ষশাখে দুটো ঘুঘু পাখী পাল্লা দিয়ে ডেকে চলেছে। বউ কথা কও বলতে বলতে আর একটা পাখী সুমুখের কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে উড়ে গেল। ঘরের চারদিকে লতানো গাছে ছোট ছোট নানা রঙের ও রূপের পাখী কণ্ঠের বিচিত্র কাকলি। মনোমুগ্ধকর পরিবেশে হৃদয় উদাস হয়ে যায়। মনের নিভৃত কোণে কার মুখ যেন উঁকিঝুঁকি দেয়—কানে কানে বলতে ইচ্ছে করে কোন কথা।

সুদেষ্ণা দেবযানীকে বলে—নে, বসে পড়, একটু জিরিয়ে নে। যা ধকল চলেছে, তোর শরীর এত সইবে কেন? শেষে না আবার একটা অসুখ বিসুখ বাধিয়ে আমাকে বিপদে ফেলিস!

—আচ্ছা আমি না হয় বসলাম। কিন্তু তুমি? নাকি এক্ষুণি দড়ি নিয়ে চৌকিদার খুঁজতে বেরোবে?

—নারে না, সে ভয় করিস না—বলেই সুদেষ্ণা হেসে বেঞ্চিতে বসে পড়ে।

—ভরসাও পাই না—তবুও মন্দের ভালো যে কথাটা বললে। তুমি কাউকে ভয় ভাবনা কিংবা ভরসার অবকাশ দাও? দেবযানীর কণ্ঠে অনুযোগের সুর।

সুদেষ্ণা নিরুত্তর—মুখ ভাবগম্ভীর, দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ। তবে কি [illegible] প্রভাতের এমন মনোলোভা প্রকৃতির প্রভাব তার কট্টর হৃদয়ের [illegible] তারে কোন সুরের ঝঙ্কার তুলছে!

[illegible] দেবযানী! সেও সুদেষ্ণার দেখাদেখি দৃষ্টি বাইরে রেখে চুপচাপ [illegible] পালিত কোন এক ব্যক্তির [illegible] বিভোর—[illegible]

সুদেষ্ণা হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করে বলে—দেখলি কেমন কাজের ভণ্ডুল হচ্ছে। চৌকিদারটার কাণ্ড দেখ, আর কুলি ছুটোর বা কি আক্কেল! বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল চৌকিদার গফুর হন্ত দন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। দূর থেকেই সেলাম ঠুকে দোষীর মতো দাঁড়িয়ে বলে—বড্ড দোষ হয়েছে, অপরাধ নেবেন না গো দিদিমণি। খুবই হেনেস্তা ভোগান্তি হলো তো! একটা চিঠি দিয়ে এলে এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না। বাজারে ইষ্টিশানের জমাদার রঘুর সঙ্গে দেখা। তার কাছে জানলাম আপনিরা এসেছ। সঙ্গে সঙ্গে দে ছুট। কতদিন থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছি—দিদিমণি আসবে। সেই যে গেলে কত যুগ হয়ে গেল!

গফুরের থামবার কোন লক্ষণ নেই—কেবল ইনিয়ে বিনিয়ে বকেই চলেছে। তার অনুপস্থিতির জন্য সুদেষ্ণার মনে যেটুকু বিরক্তি জমেছিল তা অনেক আগেই কেটে গেছে। হেসে বললে—ঠিক আছে গফুর, এখন আমাদের ঢুকতে দাও।

গফুরের খেয়াল হয় যে সে অনেকক্ষণ দিদিমণিদের বসিয়ে রেখেছে। —তোমরা এসো বলেই সে জোর কদমে চলতে থাকে। চলতে চলতেই শহরকে লক্ষ্য করে বলে—যাতো বাবা, ছুটে গিয়ে রাস্তার প্রথম বাঁকের ধারে যে বড় জামগাছটা সেখানে দাঁড়া, দিদিমণিদের বিছানা ছুটো সেখানে পড়ে আছে। আমি এক্ষুণি আসছি।

এ অঞ্চলে ডাকবাংলোটার যেমন নাম ডাক তেমনি তার কৌলীন্য। অবস্থান বৈশিষ্ট্য ছাড়াও থাকা এবং স্নানাদির সুব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আধুনিকতার ছাপ। মোজায়িক করা মেঝে। দেয়ালে সবুজ সিমেন্টের স্কার্ট, ইটালিয়ান মার্বেলের স্নানাগার, সেনিটারি প্রিভি। তার উপর আছে কলের জলের সুব্যবস্থা—এ অজ জঙ্গলে যা অভাবনীয় বললে অত্যুক্তি নয়। পাহাড়ের উঁচু জায়গায় ঝরনায় বাঁধ দিয়ে পাইপ সহযোগে জল আনার ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অতি আধুনিক যান্ত্রিক কলা-কৌশল। বহু দূর দূর থেকে সাদা কালো সাহেব সুবারা এখানে এসে অবস্থান ক[illegible] শুধু বিশ্রামের জন্য নয়—শিকারের প্রলোভনেও।

ঘরে প্রবেশ করে সুদেষ্ণা ও দেবযানী [illegible] যে প্রশ্ন দেবযানীর মনে এতক্ষণ ধরে [illegible]

রাখতে পারলে না। হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো। —ব্যাপার কি বলতো দিদি, কুলি দুটো মালপত্র এভাবে ফেলে রেখে পয়সা কড়ি না নিয়ে পালিয়ে গেল।

—ঘটনাটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের তাতে উদ্বিগ্ন হবার কি আছে? দেখা যাক না গফুর ঘটনাটার উপর আলোকপাত করে কিনা। তখন দেখবি ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেবার মতো কিছু নেই। তুই অল্পতেই বড্ড ঘাবড়ে যাস। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাস। আমাদের শপথ সংকল্প মনে রাখিস। আমাদের চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ —ভয় ডর থেকে মুক্ত এবং বজ্রের মতো কঠোর হতে না পারলে সেপথ পরিক্রমা সম্ভব নয়। বলতে বলতে সুদেষ্ণা উত্তেজিত হয়ে ওঠে—চোখে মুখে কাঠিন্যের সুস্পষ্ট আভাস ফুটে উঠে। সে অবস্থাতেই সুদেষ্ণা হয়ত আরো কিছু বলতো কিন্তু বাধা পেল। গফুর দুই কাঁধে দুই বেডিং নিয়ে উপস্থিত। পেছনে মুর্গী হাতে শহর। বিছানা দুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে গফুর শহরকে বলে—যা। বিছানা খুলে ঝেড়েপুছে খাটে পেতে দে। তারপর সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে বলে—একটা কথা জানাতে ভুলে গেছি দিদিমণি। বাবুর্চি খানসামা আজকের জন্য ছুটি নিয়েছে। গত কয়েকদিন ওদের ওপর বড্ড ধকল গেছে। সেজন্য ভাববে না— আমিই চালিয়ে নিতে পারবো। আপনাদের খবর পেয়ে বাজার করে এনেছি। আসবার কালে বন-আফিসের রমজানকে দুটো মুর্গী দিতে বলেছিলাম। এই মাত্র দিয়ে গেছে। আমি আপনাদের নাস্তার যোগাড় করছি। আপনারা ততক্ষণে গোছল সেরে নিন।

গফুর চলে যেতেই সুদেষ্ণা ও দেবযানী উঠে পড়ে। নিজ নিজ কামরায় ঢুকে সুটকেশ খুলে জিনিষপত্র নিয়ে স্নানের ঘরে প্রবেশ করে। স্নানের পর সিক্ত এলায়িত কেশে সুদেষ্ণা যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন কে বলবে যে, স্নানাগারে ঢুকে যে বেরিয়ে এলো সে একই নারী। শুচি শুভ্র ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন যেন এক পূজারিণী—স্বমহিমায় দীপ্ত উজ্জ্বল—চাইতে গেলে দৃষ্টি ফিরে আসে—শির নত হয়।

সুদেষ্ণাকে দেখে শহর তার হাতে একটা ছোট্ট খাম দিয়ে বললে, বিছানার মধ্যে পেয়েছে। খামটা হাতে নিয়ে সুদেষ্ণার মুখের ভাব পাল্টে গেল। সামলে নিয়ে শহরকে বললে—যা, ফুফাকে নাস্তা নিয়ে আসতে বল।

শহর অদৃশ্য হতেই সুদেষ্ণা খামটা ছিঁড়ে ফেলে—একখণ্ড সাদা কাগজ বেরিয়ে আসে। সুটকেশ থেকে দেশলাই বার করে তাড়াতাড়ি খা[illegible] কাগজখানা নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দেয়। তারপর খামটাতে অগ্নি সংযোগ করে। তার উত্তাপে সাদা কাগজখানা ধরতেই সাংকেতিক লিপি ফুটে বেরোয় কি ভাবে খামটা তার বিছানায় এলো তা বুঝতে আর বিলম্ব হয় না।

অতি সংক্ষিপ্ত এক জরুরী বার্তা পেয়ে সে এখানে ছুটে এসেছে। আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য তার জানা নেই। এরূপ আকস্মিক অনির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে সে পরিচিত। এসব ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয়। কুলি ছুটোকে দেখেই তার কেমন যেন মনে হয়েছিল! যাক রথের চাকা চলতে আরম্ভ করেছে! সুদেষ্ণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে এই ভেবে যে, তাকে অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না।

চিরকুটখানা হাতে নিয়ে সাংকেতিক লিখনের অর্থ অনুধাবনে মগ্ন সুদেষ্ণার গভীর চিন্তা দেবযানীর আকস্মিক আগমনে বাধা পেল। সদ্য-স্নাতা মুক্তকেশ নিরাভরণা দেবযানীর আটপৌরে শাড়ির আবেষ্টনে তার প্রতি অঙ্গের রেখা পরিস্ফুট। চোখের সজল রেখায় স্বপ্নের ঘোর। সুদেষ্ণা দেবযানীকে চেয়ে দেখলো। কাগজখানা হাতের আড়ালে রেখে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে—কিরে, ভয় ভাবনা, কামনা বাসনা, সব স্নানের জলে ধুয়ে মুছে পুত পবিত্র হয়ে এলি তো!

—তা আর পারছি কৈ দিদি! কতভাবেই তো তোমাকে অনুকরণ অনুসরণের চেষ্টা করছি। স্বামীজীর সেই উদাত্ত আহ্বান, গীতার শাশ্বত বাণী এবং দেশ বিদেশের বরেণ্য স্বাধীনতা পূজারী বীরযোদ্ধৃবৃন্দের অগ্নি-মন্ত্র নিয়তই স্মরণ করে চলেছি; কিন্তু তুমি যেমনটি চাও তেমনটি হতে পারছি কৈ?

—খুব ভাল কথা। চেষ্টা কর—মনপ্রাণ দিয়ে একাত্ম হয়ে চেষ্টা কর, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেইরে, বুঝলি। এখন শোন, যে কারণে হঠাৎ এখানে এসেছি তার একটা হদিশ মিলেছে। উত্তরে দেবযানী কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হলো না। গফুর প্রাতরাশ নিয়ে হাজির। একটা ট্রে সুদেষ্ণার টেবিলে রেখে দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করে—কি গো, ছোট্‌দিমণি আপনার ট্রে ও ঘরে দেব না এখানেই রাখবো?

—এখানেই রাখ, বলে দেবযানী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসা করে—তোমার খবর কি গফুর? ছেলে কেমন আছে, মা, বিবি—সব ভাল তো?

—ভালো আর কোথায় দিদিমণি? মা তো গেল আঘনে এন্তেকাল হয়েছে। বিবি বছর খানেক যাবৎ পেটের বেমোয় ভুগছে। ভুগে ভুগে হাড্ডিসার। তবে আপনাদের দোয়ায় বেটা ভাল আছে। মাদ্রাসায় দিয়েছি। লায়েক হচ্ছে।

—মা কিসে মারা গেলেন?

—সান্নিপাতিক জ্বরে। হেকিম কিছু করতে পারলে না।

—বিবিকে ঔষধ পত্র খাওয়াচ্ছ তো?

—কত ঝাড়ফুক, কত জল পড়া, হেকিমি দাওয়াই—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এখন আল্লা ভরসা।

—ডাক্তার দেখাও নি?

—না গো দিদিমণি। অতো টাকা কোথায় পাব? খগেন ডাক্তার এখন তার ভিজিটের কড়ি ডবল করেছে। গেলেই বলে—জানিস তো, আমার দাম বেড়ে গেছে।

—ওর জন্য ভেবো না। এদিকের ব্যবস্থা করে শহরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তুমি বাজার থেকে ডাক্তার নিয়ে বাড়ি যাও। বিবিকে দেখিয়ে ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে সাবুকে নিয়ে একবার এসো। সেই কবে দেখেছি। কখন কোথায় থাকি কোথায় যাই ঠিক ঠিকানা তো নেই। আর কোন দিন দেখা হবে কিনা তারও বা নিশ্চয়তা কি। আমি বিকেলে বেরিয়ে যাব। ফিরতে রাত্রি হবে।

—তোমার হুকুম অমান্য করবার ক্ষেমতা আমার নেই। তারপর শহরকে বলে—নাস্তা খাওয়া হলে সব নিয়ে চটপট চলে আসবি। আমি দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করছি। মেনু সে আগেই ঠিক করে রেখেছে। এখন শুধু তৈরি করা।

শহর প্রাতরাশের ট্রে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই সুদেষ্ণা দেবযানীকে বলে যা, তুই গিয়ে এখন একটু বিশ্রাম কর। আমি কেসগুলির কাগজপত্র সব ঠিক করে রাখছি।

—আমিও থাকি না দিদি, দেখি তুমি কি ভাবে কি কর। কাজ শেখাবে বলেই তো সঙ্গে নিয়ে ঘুরছো।

—কেন অনেক তো শিখেছিস। এসবে শেখবার মতো কিছু নেই। তা ছাড়া এবারের যাত্রার উদ্দেশ্য ভিন্ন ধরনের। কথা শেষে সুদেষ্ণা সুটকেশটি কাছে টেনে নেয়।

অধিক বাক্যব্যয় বৃথা। দেবযানী চেয়ার ছেড়ে উঠে অভিমানাহত কণ্ঠে বলে—যেতে বলছো—যাচ্ছি। কিন্তু তোমারও তো বিশ্রামের দরকার। হয়তো অনধিকার-চর্চা বলে মুখ চাপা দেবে। কিন্তু তোমার এই দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটুনি আমি সত্যিই আর চোখে দেখতে পারছি না। একটু বিশ্রাম করো দিদি—কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

—তুই আমার হাড়ভাঙা খাটুনি আবার কোথায় দেখলি? এখন তো চাকুরি করছি।

দেবযানী হঠাৎ টেবিলের দিকে ঝুঁকে বলে—যদি কিছু মনে না কর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

—বল না, কি বলবি।

—তখন যে আদেশের উল্লেখ করলে, তা কখন এলো, তা তো বললে না।

সুদেষ্ণার দৃষ্টি ঈষৎ কঠোর হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত কণ্ঠে বলে—তুই তো জানিস। এসব প্রশ্ন আমাদের করতে নেই। অহেতুক কৌতূহল চরিত্রের দুর্বলতার লক্ষণ—যা দলের ডিসিপ্লিন শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমতুল্য আর গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য। আমাদের কর্তব্য শুধু আদেশ পালন। তাতে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই।

—মাপ করো দিদি, আর কখনো এমন ভুল হবে না—বলেই দেবযানী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দেবযানী চলে যেতেই সুদেষ্ণা গম্ভীরভাবে একপাশে রক্ষিত ব্যাগটা কাছে টেনে আনে। মনে মনে বলে দেবযানীদের মতো মেয়েদের পুড়িয়ে ইস্পাত কঠিন করে গড়ে তোলা খুবই কঠিন ব্যাপার। পুড়ে পুড়ে হয়তো ওরা আপনিই একদিন ক্ষয় হয়ে যাবে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাগজ পত্রের মধ্যে সুদেষ্ণা কাজে ডুবে যায়। কাজ করতে করতে হঠাৎ নজরে পড়ে গফুর দাঁড়িয়ে আছে। কলমটা নামিয়ে রেখে মাণিব্যাগটা খুলে বলে—এই নাও ডাক্তারের ফি, ওষুধ পত্রের দাম। বাজারে ফলটল পেলে নিও। আরো দরকার হলে বলো। আর এই টাকাটা রাখো—মেস ভাড়া বাবদ।

গফুর কাতর কণ্ঠে বলে—ও আমি নিতে পারবো না, দিদিমণি। ওতো কুলিদের প্রাপ্য।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমিও তো অনেকটা বয়ে এনেছো।

—সে অতি অল্প। কতটুকুই বা দূর। তা ছাড়া ও-কাজ আমার ডিউটির মধ্যেই পড়ে।

— কুলিদের ছেড়ে দিয়ে তুমিও বা মোট বয়ে আনতে গেলে কেন ?

—তাড়াহুড়ায় বলতে ভুলে গেছি। সে আর এক কাণ্ড দিদিমণি! আমি ত হন্তদন্ত হয়ে জোর কদমে চলেছি। রাস্তার শেষ বাঁকটা ঘুরতেই দেখি দুটো লোক জামগাছটার নিচে পাথরের ওপর বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে একজন হেঁকে বলে—চৌকিদাব ভাই, হোঁচট খেয়ে আমার সাথীর হাঁটুতে বড্ড লেগেছে। উপরের দিকে একেবারেই উঠতে পারছে না। মেহেরবানি করে মোট দুটো মেম সায়েবদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন তো খুব উপকার হয়। আমার জবাবের অপেক্ষা না করে কিছুদূর গিয়ে ডেকে বলে যে মজুরিটা যেন আমি চেয়ে রাখি। একদিন এসে নিয়ে যাবে।

—বেশ তো, এই নাও ওদের মজুরী বলে আরো দুটো টাকা গফুরের হাতে তুলে দেয়।

ওজর আপত্তি বৃথা বুঝে গফুর বলে—আমি তা হলে একবার ঘুরে আসছি। শহরকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। সময় মত খানা দেবে। সেলাম ঠুকে গফুর বেরিয়ে যায়।

টেবিলের কাগজপত্র সব গুছিয়ে ব্যাগে পুরে সুদেষ্ণা বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্তিতে চক্ষু মুদে আসে। কতক্ষণ এভাবে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ শহরের ডাকে তন্দ্রা টুটে যায়, তৎক্ষণাৎ উঠে বসে। শহরকে খাবার দিতে বলে সুদেষ্ণা স্নানের ঘরে ঢোকে। সেখান থেকে খাবার ঘরে এসে দেবযানীকে অনুপস্থিত দেখে সুদেষ্ণা দেবযানী [illegible] প্রবেশ করে। সে তখনও নিদ্রামগ্ন। ভয় ভাবনা-হীন আনন—সদ্য-[illegible]র মতো নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। দেখে মায়া হলো। ও কেন এপথে [illegible] পথে যে অনেক কাঁটা—এ যে মৃত্যুর পথ!

[illegible] এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ-বিগলিত [illegible] দেবযানী, দেবযানী ওঠ। সুদেষ্ণার হাতের মমতামাখা [illegible] দেবযানীর ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে অবাক হয়ে

সুদেষ্ণার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। তার পর অতি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, তুমি ডাকছিলে দিদি?

—হ্যাঁ, আমিই তো ডাকছিলাম, কেন?

—কিন্তু, এমন ডাক তো কখনো শুনিনি।

—কেন, ভয় পেলি নাকি?

—না, না, ঠিক ভয় নয়। একটা স্বপ্ন দেখছিলাম—দুঃস্বপ্নই বলা যায়। আশ্চর্য, স্বপ্নে দেখলুম, তোমার চোখে জল। তুমি ডাকছ,—দেবযানী শোন, কথা শোন, ফিরে আয়। হঠাৎ তোমার হাতের স্পর্শে জেগে গেলাম। আশ্চর্য, সবটা দেখা হলো না—খুবই খারাপ লাগছে।

—দূর পাগলী, এতে মন খারাপের কি আছে। স্বপ্ন, স্বপ্নই—তা আবার কখনো সত্যি হয় নাকি! এতো মনের ভাবনা চিন্তার বিকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কি লিখে গিয়েছেন জানিস—স্বপ্ন সত্য নহে; তাই যদি না হতো—আমি রোজ রাত্রে একবার করে মারা যেতাম। ঘুমোলে তো আমার স্বপ্ন দেখার অন্ত নেই। সে যে কত রকমের স্বপ্ন! —কখনো দেখি—চতুর্দিক থেকে ইয়া ইয়া কিম্ভূত কিমাকার দৈত্য দানো সব উদ্যত খড়্গ হস্তে শিরচ্ছেদ করতে ছুটে আসছে। আবার কখনো বা বিরাট বিরাট কাল-সাপ সব আমাকে ঘিরে কিলবিল করছে— আর ইয়া বড় বড় ফণা তুলে দংশন করতে ছুটে আসছে। কৈ, আমার তো মন আদৌ খারাপ হয় না। বরং ভাল লাগে। দারুণ উত্তেজনা অনুভূত হয়।

দেবযানী গম্ভীর কণ্ঠে বলে— কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো দিদি। হঠাৎ যে তুমি একেবারে মাতৃরূপে আবির্ভূতা হলে— বরাভয় দায়িনী করুণাময়ী, কল্যাণী, প্রসন্নময়ী অন্নপূর্ণা। একটু আগে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছে।

সুদেষ্ণা হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—কেন সেদিন তোকে বলিনি জীবনে সফল হতে হলে বজ্রের মতো কঠোর আর কুসুমের মতো কোমল হতে হবে। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।' নে, আর পাগলামো করিস না, ওঠ, হাত মুখ ধুয়ে খেতে আয়। শঙ্কর এতক্ষণে ডাইনিং রুমে নিশ্চয়ই লাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আহারে পর সুদেষ্ণা ও দেবযানী উভয়েই বিশ্রামের জন্য ড্রয়িং রুমে

গিয়ে বসে। অল্পক্ষণ পরেই সুদেষ্ণা উঠে পড়ে। দেবযানীকে বলে—তুই বোস আমি আসছি।

সুদেষ্ণার কথা মতো দেবযানী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ে। ঘুরে ঘুরে হল ঘরটা দেখতে থাকে। বেশ বড় ঘর—রঙীন পাথর বসানো মেঝে। উপরের দিকে ছাদের নিচে কাঠের পাটাতন—হাল্কা নীল রঙ করা। দেয়ালের মাঝখানে একখানা বড় রাজারানীর ছবি। তার দু'পাশে দু'জন ইংরেজের ফটো, ফ্রেমে বাঁধানো—কালের ছায়া পড়ে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এঁরা নিশ্চয় কোন হোমরাচোমরা কেউকেটা ব্যক্তি। নচেৎ রাজারানীর পাশে স্থান পাবেন কেন। দূর থেকে নাম পড়া গেল না। হয়ত এ ডাক-বাংলোর কিংবা ভারতবর্ষের এ-সীমান্ত অঞ্চলের পরাধীনতার নাগপাশ আঁটার ইতিহাস আর শ্বেতাধিপত্যের বহু কীর্তি কলাপের সঙ্গে এঁদের স্মৃতি বিজড়িত। জানালাগুলিতে সুন্দর রঙীন পর্দার আবরণ। মাঝে মাঝে কাঁচের দেয়াল আলমারি। দেয়ালের কোণে কোণে রক্ষিত বিলিতি চীনে মাটির ফুলদানিতে সদ্য-ফোটা নানা রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ মনোলোভা ফুলের বাহার। একটা আলমারিতে কতগুলি বিলিতি ম্যাগাজীন। সেখান থেকে একটা তুলে নিয়ে দেবযানী পুনরায় কৌচে গিয়ে বসে পাতা ওল্টাতে থাকে।

সুদেষ্ণা এসে পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে কি পড়ছিস—স্ট্রাণ্ড। হাত বাড়িয়ে তিনখানা চিঠি দিয়ে বলে—শহরকে দিয়ে বাজারের ডাক্তার বাবু, কাসেম সর্দার আর সুধন্য সরকারের নিকট পাঠিয়ে দিবি। আমি বিকেল ৪টা নাগাদ বেরিয়ে যাব। ফিরে না আসা পর্যন্ত সাবধানে থাকিস। মাঝে মাঝে টিলাটার চারদিক ঘুরে দেখিস কেউ আমাদের গতিবিধি আর ডাক বাংলোটার উপর নজর রাখছে কিনা। টেলিগ্রাম কিংবা চিঠিপত্র এলে চৌকিদারকে দিয়ে তক্ষুনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিস। আমি সন্ধ্যা অবধি বাজারে হয় ডাক্তারবাবু, কাশেম সর্দার কিংবা সুধন্য সরকারের ঘরে থাকবো। তারপর পোষ্টআপিস যাব। এই টাকাটা রাখ, শহরকে দিস। যা, এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম কর রাত্রি বেলার কথা বলা যায় না।

সুদেষ্ণা নিজের কামরায় এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। দেবযানীও সঙ্গে আসে। সে আর কোন কথা না বলে দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে বেরিয়ে যায়।

সুদেষ্ণা কতক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই হঠাৎ খুট করে দরজা খোলার আওয়াজে তার নিদ্রা টুটে যায়। চোখ মেলেই দেবযানীকে দেখতে পায়।

দেবযানী অপ্রস্তুত হয়ে বলে—যা তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো! খুবই অন্যায় হলো।

—না, ভালো করেছিস। তুই না এলে হয়তো আরো ঘুমোতাম। কাজ ভণ্ডুল হতো—বলেই সুদেষ্ণা উঠে পড়ে।

বাধা দিয়ে দেবযানী বলে—বোসো। যে জন্য এসেছি তা তো এখনো বলিনি। শোন, তোমার কথা মতো শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম এলো না। বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। বাগানে ঢুকতেই তোমার কথা মনে এলো। কৌতূহলী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একবার নিচের রাস্তাটার দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। মনে হলো সদর রাস্তা থেকে বাংলোর রাস্তাটা যে দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে বড় গাছটার নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছে। আমি যেন দেখেও দেখিনি এমন ভাবে আস্তে আস্তে হাঁটছি। কিন্তু লোকটা আমাকে দেখা মাত্রই সটকে পড়েছে। ফেরবার সময় নিচের দিকে চোখ ফেরাতেই নজরে এলো—একটা লোক দেখতে ডাক বাংলোর চৌকিদারের মতো—একটি ছেলে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দিয়ে না এসে কোনাকুনি মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছে।

—যে লোকটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল সে দেখতে কেমন রে? সুদেষ্ণার গলার স্বরে বিষয়টা যে খুব গুরুতর কিছু তা বোঝা গেল না।

দেবযানী একটু হতাশ হলো। বললে—অতদূর থেকে ঠিক ঠাহর করা মুশকিল। তবে ভদ্রলোক যে নয় তা নিশ্চিত। পোষাকে আশাকে কুলি কামিন বলেই তো মনে হলো।

প্রসঙ্গের মোড় ফেরাবার উদ্দেশ্যে সুদেষ্ণা বললে—ঠিক আছে, এভাবেই সব দিকে লক্ষ্য রাখিস। টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ঘড়িটা, দেখতো কটা বেজেছে।

—তিনটে পনের।

—আচ্ছা তুই একটু বোস। চৌকিদার বোধহয় ছেলেকে নিয়ে এখুনি এসে পড়বে। ওদের অপেক্ষা করতে বলিস। আমি বাথরুম থেকে আসছি। হ্যাঁরে, শঙ্কর কি ফিরেছে?

—না।

—ওঃ, বলেই সুদেষ্ণা উঠে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই গফুর বাইরে থেকে—দিদিমণিরা কৈ গো—হাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে। দেবযানীকে দেখে জিজ্ঞেস করে কি গো ছোটদিমণি বড়দিমণি কোথায় ?

—তিনি এইমাত্র স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। তোমাকে বসতে বলেছেন। এই বুঝি তোমার ছেলে ? বা, বেশ তো বড়সড় হয়েছে। এদিক এসো-তোমার নাম কি ?

—যা বেটা সেলাম কর—বলেই গফুর ছেলেকে হাত দিয়ে ঠেলে দেয়। তারপর দেবযানীকে শোনাবার উদ্দেশ্যেই বলতে থাকে—তুমি তো জানো না ছোটদিমণি, সেবার এই বেটাকে নিয়ে কি দারুণ বিপদ বিপাকে পড়েছিলুম। যমে মানুষে টানাটানি। ২৫ দিন এক নাগাড়ে জ্বর চলেছে, সঙ্গে পেটের বেমো। কত ঝাড়ফুক, লতাপাতা, হেকিম বৈছ্য আব ওষুধ পত্র! কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তখন ওর দাদী বেঁচে। দিন রাত্রি কান্নাকাটি। আমি তো পাগলেব মতো—ডাকবাংলা পাহারা দেব, না, বাড়ি ঘরদোর সামলাব। এদিকে ছেলের হাল খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে। আল্লার দোয়া আর আমার জোর বরাত—একদিন সকালে বড়দিমণি এসে ডাকবাংলায় উঠলেন। এত বৎসর এখানে আছি কোনোদিন তাকে দেখিনি। কি করি। সে দিন আবার খানসামা অনুপস্থিত। কিভাবে সবদিক সামাল দেব! অথচ বাড়ি না গেলেই নয়। রাত্রে ছেলের অবস্থা খারাপ দেখে এসেছি। আল্লারসুলের নাম নিয়ে বড়দিমণির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি তখন বোধহয় কুলিকে পয়সা দিয়ে বিদায় দিচ্ছিলেন। কি বলবো দিদিমণি তাকে দেখেই মনে হলো যেন আমাদের বিবি ফতেমা! মা—বলে কেঁদে উঠলাম।

—আমার কান্না শুনে তিনি তো অবাক! জানা নেই শোনা নেই, জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে কেনই বা কাঁদছ!

—আমি কাঁদতে কাঁদতে তাকে সব খুলে বললাম। শুনে তিনি আমার হাত ধরে বললেন,—তুমি কেঁদোনা চৌকিদার। তোমার ছেলে ভাল হবে, নিশ্চয়ই ভাল হবে। টাকা নিয়ে গিয়ে একজন ভাল ডাক্তার দেখাও এবং ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা কর। এখানের জন্ত কিছু ভেবো না। এই নাও টাকা। কথা শেষ করে তিনি টাকা দেবার জন্ত হাত বাড়ালেন।

—আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। টাকা নিয়ে সেলাম ঠুকে পাগলের মতো জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়তে লাগলাম। একেবারে খগেন ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে গিয়ে হাজির হলাম। সেখান থেকে তাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। ডাক্তারবাবু রোগী দেখেই বললেন—এ তুই কি করেছিস গফুর! ছেলেটাকে যে শেষ অবস্থায় এনে ফেলেছিস! তারপর যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—তোর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। শীগগির মাথায় জল দেবার ব্যবস্থা কর আর কপালে জল-পট্টি লাগা। বুকের অবস্থা একটু ভাল আছে। খুব সাবধান, বুকে পিঠে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। হিসেব মতো আজ আর আগামীকালের রাত্রিটা যদি টিকিয়ে রাখতে পারিস তা হলে ফাঁড়া কেটে যেতে পারে।

—ডাক্তারবাবু ওষুধপত্র সব লিখে দিলেন। তার সঙ্গে গিয়ে ডিস-পেনসারি থেকে সব নিয়ে এলাম। কিন্তু রোগীর শুশ্রূষা করবে কে? ওর মা, দাদী এতদিন ধরে খেটে খেটে হয়রান হয়ে পড়েছে। বেহুঁশ মত অবস্থা! কি করি পাশের গাঁয়ে এক বোন থাকে। ছুটলুম সেখানে। তাকে নিয়ে এলাম।

—বেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে সাবুর অস্থিরতা বাড়তে থাকে। আমি নিরুপায়! বড়দিমণিকে মনে পড়লো। তাঁর সান্ত্বনা—গফুর তোমার ছেলে ভাল হবে। মনে জোর বাড়লো। বিবিকে বললাম—ভাবিস না, তোর ছেলে নির্ঘাত ভাল হবে। সাক্ষাৎ বিবি ফতেমা বলেছেন। আমি বার হচ্ছি। ডাক্তারবাবুর কাছ হয়ে বাংলো যাব। রাত্রিবেলা সম্ভব হলে একবার আসব।

—সন্ধ্যার আগেই ডিসপেনসারি পৌঁছলাম। ডাক্তারবাবুকে রোগীর অবস্থা জানালাম। তিনি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ওষুধপত্তর ঠিক মতো খাওয়াচ্ছো তো? আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। সেখান থেকে বাংলোতে এলাম। এসে দেখি বড়দিমণি নেই। আসগরের কাছে সারা দিনের খবর শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। সে বললে—গফুর তুমি বাড়ি যাও। যতদিন থাকবার দরকার থাকবে। এখানের কাজকর্ম আমি ও হাশেম সামাল দেব। কোন সাহেব সুবার তো আসবার খবর নেই। তবু হঠাৎ এসে পড়লেও ভাবনার কিছু নেই।

—আসগরের কথা শুনে মনে শান্তি পেলাম। সবই আল্লারসুলের দোয়া! নচেৎ সকলে আমাকে এভাবে সাহায্য করছে এগিয়ে আসবে,

কেন! কিন্তু বড়দিমণিকে না জানিয়েও বা যাই কেমন করে। আবার ভাবলাম সারাদিন পর খেটেখুটে আসবেন তখন আমার দুঃখের পাঁচালি তাকে শোনানো কি ঠিক হবে? বসে বসে সাতপাঁচ ভাবছি। এমনি সময়ে বড়দিমণি এলেন। শংকা ও সংকোচ ঘিরে ধরলো। তাঁর সম্মুখে যাব কি যাব না। কিন্তু আর তো দেরী করা যায় না। বাড়ির জন্য মন ছটফট করছে। খোদার নাম নিয়ে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—আমাকে দেখে বড়দিমণি বললেন—এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁর কাছে তোমাব ছেলের অবস্থা জেনেছি। আর দেরী নয়। আসগরকে খাবার দিতে বলো তুমিও দুটি খেয়ে নাও সারাদিন তো পেটে দানা পানি পড়েনি। আজ আর আগামীকাল আমি তোমার ছেলের কাছে থাকব। এই সময়টাতেই শুশ্রূষা ও সতর্ক থাকা বিশেষ দরকার।

—নিজের কানকে বিশ্বাস কবতে পারলাম না—একি শুনছি! এত দয়া এত করুণা কি মানুষ মানুষকে কবে! আর সামলাতে পারলাম না। চক্ষু ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কেঁদে বললাম—এ তুমি কি বলছ মা! আমি মুসলমান—ভিন্ন জাত, তার ওপর একেবারে গরীব—ভাঙা ঘর, ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা জায়গা। তুমি কেন যাবে মা, তোমাকে বসাবো কোথায়!

—বড়দিমণি গম্ভীরভাবে বললেন—যা বলেছি—ঠিক বলেছি। ওসবে আমার অভ্যাস আছে গফুর। সেজন্য কিচ্ছু ভেবোনা। জাতপাতের কথা বলছো—সে বালাই আমার নেই। তুমি হয়তো বুঝবে না। আমার নিকট বসাই মানুয—সবার উপর মানুষ সত্য—তাহার উপর আর কিছু নেই। বসবার জন্য একখানা ছেঁড়া চাটাই হলেই হবে। না পেলেও ক্ষতি নেই। যাও আর দেরী করো না।

—এতদিন ধরে ছেলের অসুখ-জনিত দুর্ভাবনা। শরীরের উপর অত্যাচার, অভাব অনটনের জ্বালার সঙ্গে এ অভাবিত আকস্মিক করুণা-ধারায় আমি যেন ভেসে গেলাম দিদি—বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেল—জবান বিলকুল বন্ধ। মাতালের মতো দিশেহারা হয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম।

—বাংলো থেকে বেরলাম। বড়দিমণি আমার হাতে ছোট্ট একটা সুটকেশ ও টর্চ দিলেন। বাইরে শরতের হিমের চাপে মাটির খানিক উপরে

কুয়াশার আবরণ ভেসে আছে। টর্চ থেকে নিক্ষিপ্ত আলো বেশীদূর যায় না। ঘন ঘোরঘুট্টি অন্ধকার—সাঁঝের তারা আশমানে মিলিয়ে গেছে। রাতের আঁধারে অপরিচিত উঁচু নিচু ঝোপ ঝাড় মাঠঘাটের পথ বেয়ে বড়দিমণিব চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার মাথা আরো খারাপ হয়ে গেল। ছেলের অস্থিবতা বেড়ে গেছে—আরও বেশি ভুল বকছে, মেয়েছেলের কান্নাকাটি, লোকজনের হট্টগোল!

—ছেলেকে দেখে বড়দিমণি গম্ভীর হয়ে গেলেন। সুটকেশ থেকে থারমেটার নিয়ে ছেলেব জ্বর দেখে তাঁর মুখ আরো গম্ভীর হলো। আমাকে বললেন—গফুব সবাইকে চলে যেতে বলো। এখানে গণ্ডগোল রুগীর পক্ষে খুব খাবাপ—বলেই তিনি সুটকেশ থেকে একখণ্ড রবারের কাপড় বের কবে ছেলেব মাথাব নিচে পেতে দিলেন। তারপর শুরু হলো মাথায় জলেব ধারা আর কপালে জল-পট্টি দেওয়া। অনেকক্ষণ অবধি একনাগাড়ে এভাবেই জল দেওয়া চললো। তখন লক্ষ্য করলাম বেটার অস্থিরতা এবং ভুল-বকা যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বড়দিমণি আবার থারমেটার দিয়ে জ্বর দেখে আমাকে বললেন—গফুব তুমি শুয়ে পড়—চৌপব দিন তো কেবল ছুটোছুটি করেছ। এখন আমি একলাই রোগী সামলাতে পারবো।

—জানি প্রতিবাদ কবা বৃথা। তবুও করলাম। ফল হলো না। শুয়ে পড়লাম, যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি সূর্যের আলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে পড়েছে। উঠে বসলাম। বেটা নির্জীবের মতো চক্ষুবুজে পড়ে আছে। বড়দিমণি বললেন আমি এখন যাচ্ছি। মনে হয় তোমার ছেলের জ্বর আর বাড়বে না। তবু যদি জ্বর বাড়ে, ভুল বকে এবং অস্থিরতা বাড়ে তা হলে আবার রাতের মতো মাথায় জলের ধারা এবং কপালে জল-পট্টি দেবে। আব যদি বোঝ শরীর ক্রমেই ঠাণ্ডা হচ্ছে তা হলে কাঁথা দিয়ে ভাল করে বুক পিঠ জড়াবে। হাত পা মালিশ করবে, ডাক্তার এনে দেখাবে। ডাক্তারের ফী, ও ওষুধ পত্রের জন্য ভেবো না, আমি বলে রেখেছি। মনে বল রাখবে—ছেলে তোমার ভাল হবেই।

—বড়দিমণি চলে গেলেন। আমি ছেলের শিয়রের পাশে হাঁটুগেড়ে পশ্চিমমুখো হয়ে আল্লার দোয়া মেগে হাতখানা ছেলের বুকে মাথায় বুলিয়ে দিলাম। বিবি এসে দাঁড়ালো। বললাম আল্লারসুলের দোয়া

দাড়া। 'তাঁর বহুত মেহেরবাণী আর তোর জোরবরাত সাবুর মা। না হলে এমন আশ্চর্য ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে শুনেছিস, না কেউ দেখেছে !!

—রোগীর ব্যবস্থা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে গেলাম। সেখান থেকে খগেন ডাক্তারকে নিয়ে এলাম। পরীক্ষা করে তিনি বললেন খুব সাবধানে রাখবি। আজকে রাতটা যদি ওকে টিকিয়ে রাখতে পারিস বুঝবি বিপদ কেটে গেল। ছেলে তোর নিশ্চয়ই ভাল হবে। তুই ভাগ্যবান! না হলে এমন দেবীর সাক্ষাৎ পেলি কি করে! তবে ওষুধপত্র ঠিক মতো খাওয়াতে হবে। এ বিষয়ে গাফিলতি করলে চলবে না। সময় মতো গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসবি। আমি যোগীন কম্পাউণ্ডারকে বলে যাব। সন্ধ্যার পর ইন্‌জেকশ্‌ন নিয়ে তোর বাড়ি এসে থাকবে। অবস্থা বুঝে দরকার হলে ইন্‌জেকশ্‌ন দেবে।

—ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। ছেলেব দিকে চেয়ে দেখি সে নির্জীবেব মতো পড়ে আছে। আগের মত ছটফটানি কিংবা ভুল-বকা নেই। খোদাতাল্লার নাম নিয়ে বেবিয়ে পড়লাম। ডিসপেনসাবি থেকে ওষুধপত্র এনে বিবি আর বহিনকে সব বুঝিয়ে দিলাম। তারপর বাড়িব কাজকর্ম সেরে যখন ফুরশত হলো তখন দুপুর গড়িয়ে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ভাবলাম একবার ডাকবাংলায় গিয়ে বড়দিমণিকে সব বলে আসি। তিনি হয়ত খুব ভাবছেন। ওখানে গিয়ে দেখি তিনি নেই। কখন ফিরবেন কেউ জানে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। অপেক্ষা করা বৃথা ভেবে বাড়ি ফেরার পথে ডাক্তারবাবুকে সাবুব অবস্থা জানিয়ে কম্পাউণ্ডার বাবুকে তাড়াতাড়ি পাঠাতে অনুবোধ কবলাম। শবতের বেলা—সূর্য ডুবুডুবু। হাটবার ছিল বলে কিছু বেসাতি কিনে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

—বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কান্নার রোল শুনতে পেলাম। আমার কলিজা ছ্যাঁক করে উঠলো। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে রোগীর ঘরে হাজির হলাম। দেখি সাবু কেবল ঘামছে। গায়ে হাত দিলাম—শরীর ঠাণ্ডা। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মনে পড়লো। তৎক্ষণাৎ একটা শিশি থেকে ১৫ ফোঁটা ওষুধ জলে গুলে খাইয়ে দিলাম। কাঁথাখানা দিয়ে বুকপিঠ ভাল করে ঢেকে দিলাম। তারপর হাত আর পায়ের তেলো ঘষতে লাগলাম। এমন বিপন্ন মুহূর্তে আর কি করবার আছে ভেবে পাচ্ছিলাম না।

—ওদিকে মেয়েদের কান্নাকাটি, চেঁচামেচি বেড়েই চলেছে, আর

এদিকে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি কাঁদলে সবাই আরও ভেঙে পড়বে। এই ভয়ে কান্না চেপে ধমকের সুরে সকলকে চুপ করতে বললাম। ফল হলো না। কতক্ষণ যে এরূপ নিরুপায় অসহায় ভাবে কেটেছে মনে নেই। হঠাৎ দেখি বড়দিমণি যোগীন কম্পাউণ্ডারকে নিয়ে উপস্থিত। অকূল দরিয়ায় যেন কূল পেলাম। লক্ষ্য করলাম ছেলের অবস্থা দেখে বড়দিমণির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ছেলের হাত ধরে নাড়ি পরীক্ষা করে যোগীন কম্পাউণ্ডারকে কি যেন বললেন। কম্পাউণ্ডার ব্যাগ থেকে ছুঁচ আর ওষুধ বার করে ছেলেকে ইন্‌জেকশান্ দিলেন। তারপর হাতের শিরা ধরে বসে রইলেন। বড়দিমণি সাবুর হাত ও পায়ের তেলো কেবল ঘষেই চলেছেন। তাঁর মুখের উদ্বেগ ও শঙ্কার ভাব দেখে আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। যে কান্না এতক্ষণ ধরে কলিজার মধ্যে গুমরে মরছিল তা ফেটে বেরিয়ে এল। আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা—হুঁশ ফিরে আসতে চোখ মেলে দেখি বড়দিমণি সাবুকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। তাঁর স্নেহ, মায়া মমতা ভরা মুখখানা দেখে অভিভূত হলাম। মনে বল এলো, উঠে এসে ছেলের পাশে বসলাম। গায়ে হাত দিয়ে মনে হলো হিমের ভাবটা কমেছে—শরীর একটু উষ্ণ হয়েছে।

—গফুর তোমার ছেলের ফাঁড়া কেটে গেছে। বড়দিমণি আশ্বাস দিলেন। শোনামাত্র আমার যে কি হলো, আমি সাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই বড়দিমণি আমার হাত চেপে ধরে বললেন—ও কি করছ? যতক্ষণ অবধি রোগীর পূর্ণ জ্ঞান ফিরে না আসছে ততক্ষণ অবধি ওকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। নাড়াচাড়া কিংবা ওর কানের কাছে হাঁক ডাক দোহাই চিৎকার একদম চলবে না। তোমরা অন্য ঘরে গিয়ে শোও। আমি আর যোগীনবাবু ওর কাছে থাকব।

গফুর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে অক্লান্ত ভাবে একমনে কেবল বলেই চলেছে, বলেই চলেছে। আর দেবযানী নিঃশব্দে তন্ময় হয়ে যেন এক বিস্ময়কর রূপ কথা শুনছে। হঠাৎ গফুরের কথায় ছেদ পড়লো—গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। দেবযানী চেয়ে দেখে গফুরের চোখ কান্নায় কান্নায় জলে ভরে গেছে। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। সমবেদনায় দেবযানীর চক্ষুও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে—একি গফুর ভাই—তুমি কাঁদছো।

সামলে নিয়ে গফুর হাসি কান্না মেশানো স্বরে বললে—কাঁদবো না ! এ যে কাঁদবারই কথা দিদি। এখনও সেদিনের ঘটনা মনে পড়লে কান্না আসে—আনন্দে, দুঃখে না কৃতজ্ঞতায় তা বলতে পারবো না। তবে কাঁদলে মনে শান্তি পাই—আর এ-দুনিয়ার ঘরে ঘরে, জনে জনে এ কাহিনী শোনাতে চাই। তাতে আনন্দ পাই। তারপর শোনো ঃ

—বড়দিমণির ঐকথা শুনে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলুম না। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। এত দয়া, এত মায়া মমতা স্নেহ, এত মেহেরবাণী কি মনুষ্য জীবে সম্ভব ! আমি যেন বিহ্বল বে-হুঁশ হয়ে গেলাম। মা বলে পায়ে পড়ে ডুকরে কাদতে মন চাইলো। পাছে কিছু অঘটন ঘটে এই ভয়ে কান্না চেপে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

—তারপর কি ঘটেছে— কখনই বা ভোর হয়েছে জানিনা। বিবির ডাকে চোখ মেলে দেখি দিনের আলোতে ঘর ছেয়ে গেছে। ধরমড়িয়ে উঠে দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকলাম। দেখি সাবু চক্ষু মেলেছে। মনের খুশীর জোয়ার আর রুখতে পারছিলাম না। ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে সাবুকে বুক জাপটে ধরি। বড়দিমণি বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। হাত নেড়ে আমাকে এগোতে নিষেধ করে বললেন, তোমার বিবিকে এখানে এসে বসতে বলো। তোমাকে যে-ভাবে সাবধান করেছি তাকেও সে ভাবে সাবধান করে দেবে। আবার বলছি রোগীর সামনে এমন কিছু করবে না বা বলবে না যাতে তার উত্তেজনা বাড়ে। খুব সাবধান !! আমি যাচ্ছি। তুমি একবার বাইরে এসো—বলেই তিনি অপার স্নেহ মমতায় সাবুর মাথায় ও কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে উঠে পড়লেন। কম্পাউণ্ডারকে দেখতে পেলুম না। বোধ হয় তিনি আগেই চলে গেছেন।

বিবিকে বুঝিয়ে পড়িয়ে সাবুর কাছে বসিয়ে বাইরে এলাম। হাঁটতে হাঁটতেই বড়দিমণি বললেন—ডাক্তারবাবুকে এনে আজ অবশ্য একবার রোগী দেখাবে। তার নির্দেশ মতো ওষুধ পথ্য দেবে। একটু অবহেলা অযত্নে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওকে খুব সাবধানে ও যত্নে রাখবে। আবার সাবধান করছি ওর সামনে এমন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে ওর উত্তেজনা আবার বাড়তে পারে। আমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্ছি।

ডাক্তারবাবুকে সব বলে যাবো। তুমি কিচ্ছু ভেবোনা। পার তো বিকেলের দিকে একবার এসো।

বড়দিমণি চলে গেলেন। আমার চোখের জ্যোতি যেন দপ করে নিভে গেল। মনেব মধ্যে যে বল ফিরে এসেছিল তা যেন উবে গেল। বড় অসহায় বোধ হলো। অবাক লাগলো দিদি—চেনা নয়, জানা নয় —ভিন্ন জাত গোত্র। অথচ আপন জনের চাইতেও অনেক অধিক আপন হয়ে স্নেহ, দয়া মায়া মমতা ঢেলে অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষা করে সাবুকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে দিয়ে গেলেন। অর্থের কথা আর নাই বা বললাম তাতে এত বড় দিলকে খাটোই করা হবে। ইনি মানবী নয় সাক্ষাৎ দেবী !!

—ঘরে ফিরে গেলাম। সাবুর শিয়রে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে আল্লার দোয়া মাগলাম। সাবু গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিবিকে বললাম আর ভয় করিস না, লালন ফকিরের দরগায় শিন্নি মানত কর।

—দুপুরের দিকে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলাম। তিনি ভাল করে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—তোর জোর বরাত গফুর, ছেলের বিপদ কেটে গেছে। এখন খুব যত্নে ও সাবধানে রাখবি। নচেৎ অঙ্গহানির আশংকা আছে। ওষুধপত্র পথ্য ইত্যাদি ঠিকমতো খাওয়াবি দেখবি ছেলে শীঘ্রই চাঙা হয়ে উঠবে।

—ডাক্তারখানা থেকে ওষুধপত্র এনে বিবিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বেলা-বেলি বেরিয়ে পড়লাম। বড়দিমণি আজ চলে যাচ্ছেন। মনটা খুবই আনচান করছে। জানিনা আর কোনদিন দেখা হবে কিনা। ডাক-বাংলোতে এসে পৌঁছলাম, ভেতরে ঢুকলাম না, ভাবলাম সারারাত সাবুর খিদমত করেছেন—চোখের পাতা এক করেননি। এখনো হয়ত ঘুমোচ্ছেন বারান্দায় উঠে সসঙ্কোচে একবার মা বলে ডাক দিলাম।

—সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া এল—কে গফুর, ভেতরে এসো। ঢুকে দেখি টেবিলে বসে কি লেখা পড়া করছেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—সাবু কেমন আছে ?

—আজ্ঞে, ডাক্তারবাবু বলেছেন ফাঁড়া গর্দিশ সব কেটে গেছে আর ভয় নেই। তবে খুব সাবধানে রাখতে হবে—নচেৎ অঙ্গহানি ঘটতে পারে।

—হাঁ, ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন। ছেলেকে খুব সাবধানে এবং যত্নে রাখতে হবে—খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করাতে হবে। কোন ত্রুটি যেন না হয়। আরও কয়েকদিন ডাক্তার দেখাতে হবে। এই টাকা কয়টা রাখো। কিছু ভেবোনা ডাক্তার আর দাওয়াইর ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

—বিনা ওজর আপত্তিতে হাত পেতে টাকা নিলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি না। বড়দিমণি দেখে বললেন—একি গফুর, তুমি কাঁদছ!

—আমার মুখে জবান ফিরে এল। বললাম আমাকে কাঁদতে দিন মা! আমার দিল কাঁদতে চাইছে। খানিক চুপ করে থেকে বললাম —আপনার তুলনা নেই। কত খিদমত করে সাবুকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে দিয়ে গেলেন। আপনার দয়া আপনার ঋণ কখনো শোধ করতে পারব না—এমনকি জীবন দিয়েও না।

—কি যে বলো গফুর! মানুষ হয়ে জন্মেছি—একের বিপদে আপদে, শোকে দুঃখে অন্যে এসে পাশে দাঁড়াবে না! একে অন্যের উপকার করবে না, সেবা করবে না! না হলে মানুষ আর পশুতে তফাৎ কোথায়? মনে রাখবে—পর-সেবা পরম ধর্ম। আল্লাই বলো আর মানুষই বলো, এমন কি বনের নরখাদক পশুও—সকলেই সেবায় তুষ্ট! আর একটা কথা গফুর—মা বলে আমাকে ডেকো না। ঐ নাম আমার মনে শান্তি আনে না—বরং দুঃখ দেয়। আমাদের দুর্গা ঠাকুরকে দেখেছো—তাঁর দশটা হাত প্রত্যেক হাতে এক একরকম অস্ত্র ধরে অসুর বিনাশ করছেন। যেদিন ওরকমভাবে অসুরকুল ধ্বংস করতে পারব—দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে দেশকে এবং তোমাদের মতো দশজনকে সুখী করতে পারবো সে দিনই ঐ-নাম প্রিয় মনে হবে।

এভাবে বড়দিমণি কতক্ষণ ধরে ভাল ভাল কথা বললেন। তার অর্থ ঠিক মত বুঝতে না পারলেও তাঁর জবানের গুরুত্ব দমকা হাওয়ার মতো উপলব্ধি করছিলাম, চেয়ে দেখি তার চোখমুখ উজ্জ্বল টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। ভয় পেলাম, শঙ্কিত কণ্ঠে বললাম—তুমি যা বলছো—কেন জানিনা, আপনি আর মুখে এলো না—তাই হবে। কিন্তু যে দয়া মায়া তোমার নিকট পেয়েছি, তা কেবল মায়ের কাছেই পাওয়া যায়। মা ভিন্ন অন্য নামে ডাকলে আমারও মন ভরবে না—জেনো।

—বড়দিমণি উঠে দাঁড়ালেন, মুখ গম্ভীর করে বললেন—যাও গফুর, কুলি ডেকে আনো।

—বাংলো থেকে বের হতেই আসগরের সঙ্গে দেখা। সে জানালে কাশেম কুলি ডাকতে গেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কাশেম কিংবা কুলির দেখা মিলল না তখন বড়দিমণির সামনে হাজির হয়ে বললাম আমিই মোট বয়ে নিয়ে যাবো। বেশী সময় নেই দেখে বড়দিমণি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন।

—সারাটা পথ মুখ বুজেই চলেছি। আমার মন ভারী। কিন্তু বড়দিমণির! একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার তো বাড়ি ফিরতে দেরী হবে। সাবুর ওষুধ পথ্যের সব ব্যবস্থা করে এসেছো তো!

—আমি—আজ্ঞে, বলে চুপ করে গেলাম। স্টেশনে পৌঁছলাম। মোট নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছি। বড়দিমণি টিকিট কাটবার জন্য ছোট মাষ্টারের ঘরে ঢুকলেন। খানিক বাদে বেরিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালেন, তারপর এদিক ওদিক পাইচারি করতে লাগলেন। সূর্যি তখন পাটে বসেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। স্টেশনের ক্ষীণ আলোতে তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, গাড়ি আসবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা হুহু করে উঠলো। ক্রমে গাড়ির শব্দ যত এগিয়ে আসছে আমার বুকের ধুকধুকানি ততই বেড়ে চলেছে—যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে। গাড়ি এসে দাঁড়াল। কলের পুতুলের মত মোট গাড়িতে তুলে দিয়ে নেমে এলাম। বড়দিমণি গাড়িতে উঠলেন। মনে হলো এক অতি পরম আত্মজন চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। জবান আমার বন্ধ হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। ছেলাম জানাতে ভুলে গেলাম। শেষ কথা কানে এলো—সাবুকে সাবধানে রেখো।

—আর সহ্য করতে পারলাম না। কেউ যেন কলিজাটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। লজ্জা সরম ভুলে কেঁদে ফেললাম। সব ঝাপসা হয়ে গেল। সেই ঝাপসা চোখে রেলগাড়ির পেছনের লাল বাতিটাকে মনে হলো যেন আমার রক্ত মাখা কলিজাটা গাড়ির পেছন পেছন ছুটে চলেছে।

—সেই যে বড়দিমণি গেলেন আর পাত্তা নেই। এতদিনেও এমুখো হলেন না। ছেলেটা আছে না গেছে সে খোঁজও করলেন না। আমি তো হা পিত্যেশ করে বসে আছি কখন তিনি আসবেন। শেষে খোদাতাল্লা আমার আর্জি শুনলেন।

—ডাকার মত ডাকতে পারলে খোদা সকলেরই আর্জি শোনেন, বলেই সুদেষ্ণা ঘরে ঢোকে। সাবুকে দেখেই কাছে ডাকে—বা বেশ তো বড়সড় হয়েছে।

গফুর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে—বেটা সেলাম কর। ইনিই তোকে যম দুয়ারে কাটা মেরে ফিরিয়ে এনেছেন।

সুদেষ্ণা ধমকের সুরে বলে—তুমি থামো তো গফুর। ছেলেপুলের সামনে এসব বলতে নেই।

দেবযানী হেসে বলে—এতক্ষণ ধরে গফুর ভাই তো একনাগারে কেবল তোমারই আখ্যান শোনালে।

সুদেষ্ণা সাবুকে কাছে টেনে তার হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে বলে—গফুর শীত এসে পড়েছে ওকে একটা গরম সোয়েটার কিনে দিও। তারপর সাবুর চিবুক ধরে বলে—ভাল করে লেখা পড়া করো, আব্বা আম্ম র কথা শুনো—মানুষ হও, বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

কথা শেষ করে সুদেষ্ণা উঠে পড়ে বলে—আমি বেরুচ্ছি গফুর। সাবুকে বাবুর্চিখানা থেকে খাইয়ে নিও। গফুব আর সাবু সেলাম করে বেরিয়ে যায়।

দেবযানীও উঠে পড়ে। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে—কেউ যদি এখানে এসে তোমার খোঁজ করে তখন কি জবাব দেব?

—এরূপ ঘটনা স্বাভাবিক নয়, তবে হাঁ, ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। বলিস, আমি বাজারে গেছি। দেখ তো শহর ফিরে এসেছে কিনা। না এলে বলে যাস।

প্রসাধন সেরে সুদেষ্ণা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ে। শরতের শেষ বেলা—প্রকৃতিতে একটা জড়ভাব। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ—সূর্যালোকে নানা রঙে রঙিন—কোনোটা রক্তিম, কোনোটা তামাটে কোনোটা বা পাঁশুটে। ডাক বাংলোর চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়বার মুখেই দেবযানী এসে জানালে—শহর ফিরে এসেছে। হৃষ্ট চিত্তে সুদেষ্ণা রাস্তা বেয়ে নিচে নামতে থাকে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের রশ্মি পাহাড় গাছপালা রক্ত রাগে স্নান করিয়ে সুদেষ্ণার চূর্ণ কুণ্ডল চুম্বন করে সারা মুখ রাঙিয়ে দিয়েছে। বাজারে এসে যখন সে পৌঁছে দিনের আলো তখন অন্ধকার গ্রাস করেছে। দোকানীরা ধূপধুনো দিয়ে আপন আপন ব্যবসায়

শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছে—আগামীদিন যাতে আরো শুভ হয়, রুজি-রোজগার তেজি হয়। আজ হাটবার নয়। দোকানে দোকানে লোকজনের ভীড় নেই। সুদেষ্ণা প্রথমেই সুধন্য সরকারের গদিতে ঢোকে। সুধন্য তখন তার কালো কুচকুচে বিশাল বপুখানা নিয়ে একাই গদি জুড়ে বসে আছে। সুদেষ্ণাকে দেখে আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, বসুন বলে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তারপর জিজ্ঞাসা করে—একা যে, আর কাউকে সঙ্গে আনেন নি বুঝি।

—এসেছে। সে ডাকবাংলোতেই রয়েছে। আমার চিঠি পেয়েছিলেন তো?

—হাঁ, তা পেয়েছি, এবং ঠিক সময়েই পেয়েছি। তবে কি জানেন, এদেশের লোক তো! যতই ওদের বোঝান না কেন যে, এটা কর, এভাবে চল—এতে উপকার হবে, মঙ্গল হবে, ভাল হবে, আখেরে সুখে থাকবে। ভাবে, বেটা নিশ্চয়ই কোন মতলব হাসিলের তালে আছে, কু-আর যোগ নাই বা করলাম! তা না হলে অন্যের ভাল আর উপকার নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন! দেখছেন না—গান্ধী মহারাজ, মৌলানা ভাইরা এত করে বলছেন—ওরে তোরা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা দ্বেষ ভুলে, হানাহানি ছেড়ে দিয়ে এক হ', স্বদেশী জিনিষ কেন, বিলিতি বর্জন কর, দেখবি ইংরেজ বেটারা—বলেই চারিদিক চেয়ে দেখে কেউ কান পেতে আছে কিনা—সব সাগরের হে-পাড় পালিয়ে যেতে কূল পাবে না। তা নয় আরম্ভ করে দিল লুটতরাজ আর খাণ্ডব দাহন। আরে বিলেতি বর্জন মানে কি আগুনে পোড়ানো! দেশের লোকের জিনিষপত্র পোড়ালে আর লুটতরাজ করলে ক্ষেতিটা হবে কার! সেটা কি একবারও ভেবে দেখেছিস। তবে হাঁ, পুরনো ছেঁড়া খোঁড়া বিলিতি জিনিস পত্তর চেয়ে চিন্তে নিয়ে যত পারিস দাহ কর। তাতে দেশোদ্ধারের কাজও এগোবে আর আমাদের দোকানের বিলেতি মালেরও একটা হিল্লে হবে—কি বলেন।

—আবার দেখুন, এই দেশের আর দশের উপকারের জন্যই তো গান্ধী মহারাজ সব ছেড়ে ছুড়ে দিলেন। ব্যারিস্টারিতে ইস্তফা দিলেন, কোট-প্যান্ট, জুতা মুজা ছেড়ে কাপড় পরলেন; চপ্পল ধরলেন। তারপর তাও ছেড়ে খালি পা আর নেংটি সার করলেন। গরীব দেশ—লোক, অনপেট ভরে খেতে পায় না বলেই তো তিনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে কেবল ছাগলের দুধ খেয়ে থাকছেন। মৌলানা ভাইয়েরা, এত বড় ব্যারিস্টার

চিত্তরঞ্জন দাশ—সব বিলিয়ে দিয়ে ফকির বনেছেন। এই সব ত্যাগী মহাপুরুষরা দেশোদ্ধারের জন্য যা করতে বলছেন দেশের লোক তা শুনছে না—ঠিক উল্টো বুঝছে আর উল্টোটাই করছে! এদিকে আবার তাদের সাধু সন্ত পীরপয়গম্বর ভেবে দর্শন লাভের জন্য ছুটোছুটি হুটোপুটি করছে। সেবার যখন তারা শহরে এলেন লক্ষ লক্ষ লোকের সে কি ভীড়। পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ি, নৌকায়, রেলে স্টিমারে—যে যেভাবে পারে ছুটছে শহরে দিকে। কেবল এক লক্ষ্যে—তাদের দর্শন করতে। সে এক অভাবনীয় অদৃষ্ট-পূর্ব দৃশ্য—যেন লোকের জোয়ার চলেছে—এক অফুরন্ত জনতার মিছিল!

—একত্রে এত লোকের মেলা দেখার সৌভাগ্য কারও জীবনে কচিৎ কদাচিতে ঘটে! কিন্তু ঐ দেখাটাই সার—কাজেব বেলা সব অষ্টরম্ভা! দেখলেন না, মারামারি হানাহানি লুটতরাজের ফলে শেষ কালে গান্ধী মহারাজকে পর্যন্ত আন্দোলন বন্ধের ডাক দিতে হলো! এ কত বড় লজ্জা, কি ভীষণ ব্যর্থতা—সব ওলট পালট হয়ে গেল না! আমি সকলকে এত করে বলি আরে জীবনবীমা কর—করলে আখেরে তোদেরই উপকার হবে—ছেলেপুলে নিয়ে তোরাই সুখে শান্তিতে থাকবি। তা নয়, ঠিক উল্টো বুঝলি রাম। ঘেন্না ধরে গেছে। আপনিই বলুন, এই সামান্য কমিশনের জন্য কি এত অনুরোধ, উপরোধ তোষামোদ আর ঝকমারি পোষায়! ভাল কথা, আমার গেলবারের হিসেবে বোধ হয় কিছু বাকী রয়েছে, দেখেছেন নাকি?

—হাঁ, কিছু পাওনা আছেন। এবার সব মিটিয়ে দিয়ে যাবো।

—যাক, কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। যারা যারা কথা দিয়েছে—সব বেটাকে ধরে আনবো—তবে না, আমার নাম সুধন্য! আজ হাটবার ছিল না বলে কেউ আসেনি—কাউকে খবর দিতে পারিনি। দেখুন এমনই কপাল—যাকে পাঠিয়ে খবর দেব সে বেটাও আজ অনুপস্থিত। যাক, কাগজ পত্র সব এনেছেন তো? ওসব রেখে যান। কালকের মধ্যে যাতে সব হয় সে ব্যবস্থা করবো। ওরে ও গোবর্ধন, দিদির জন্য একপেয়ালা চা, আর নন্দ ময়রার দোকান থেকে দু'টো গরম রাজ ভোগ নিয়ে আয়। দেরি করিস নি।

—না, না, ওসব আবার কেন। বড্ড অবেলায় খেয়েছি। তাছাড়া খুব তাড়াও আছে।

—তাতে কিছু ক্ষেতি হবে না, কোন দিন আপনাকে না খাইয়ে ছেড়েছি! বসুন, আপনারা শহরের লোক—এবার বলুন শহরের খবর কি? জোর গুজব—বড় জেলখানার মধ্যে এক বিপ্লবী কয়েদি নাকি কোন এক বড় দারোগাকে খুন করেছে। সে ছিল মুসলমান, তাই নিয়ে নাকি মুসলমান মহলায় খুব উত্তেজনা চলেছে। খেলার মাঠে নাকি গোল-যোগও হয়েছে। পরিস্থিতি এমন—যে কোন মুহূর্তে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যেতে পারে। সত্যি নাকি এসব?

সুদেষ্ণা উত্তেজনা অনুভব করলেও কণ্ঠে নির্বিকার শান্ত গম্ভীর ভাব বজায় রেখে বলে—আপনি যা শুনেছেন, আমার কানেও তাই এসেছে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। ধর্মের নামে জাতপাত নিয়ে পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে। তার উপর ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশে যে গরল ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাতে সুস্থ সবল শুভ বুদ্ধি ও মানবিকতা বোধ নষ্টও ভস্মীভূত হয়ে যায়। হিন্দু মুসলমানকে ঠাঁই ঠাঁই রেখে, একেকে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে যখন শাসন কর্তারা রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইছেন তখন বিভেদ বিবাদ জিইয়ে রাখবার যত রকম হাতিয়ার—ছলা-কলা, কূট-কৌশল—সবই তারা প্রয়োগ করছে ও করবে। একসঙ্গে বিলেতি বর্জন এবং স্বদেশী আন্দোলনের কবর খোঁড়ার এমন সুযোগ কি তারা হাতছাড়া করতে পারে!

—কিন্তু এসব খবর যখন নানা রঙচঙ মেখে উড়ে এসে কানে পৌঁছয় তখন মন অস্থির ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে? আপনিই বিবেচনা করুন। সেবার হাটের দিন কি কাণ্ডটাই না ঘটলো। আরো কত সাংঘাতিক হতে পারতো; কোথাকার জল কোথায় গড়াতো তার কি কোন ঠিক ঠিকানা ছিল। মনে হলে শিউরে উঠি। ওদের কয়েকজন মাতব্বরকে হাতে রেখেছিলাম বলেই না এত বড় ফাঁড়াটা কাটাতে পেরেছিলাম। আমাদের আশংকার কথা থানার দারোগাকে জানিয়েছিলাম। সে বেটা প্রতি রোধের কোন ব্যবস্থাই করেনি। আপদকালে সেপাই পুলিশের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায়নি। বেটা নিজেও একেবারে গা ঢাকা দিয়েছিল।

সুদেষ্ণা কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললে—একটা কথা সরকার মশাই, এবার যেন প্রথম প্রিমিয়ামের টাকা কারো বাকি না থাকে। দয়া করে দেখবেন। আর আপনার মেজ ছেলের জীবন বীমাটাও করে ফেলুন। বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন, সেবার আপনারটা একরকম জোর করে

করেছিলাম বলেই না আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বোনাসশুদ্ধ সব পেয়ে যাবেন। কোম্পানী এবার আরো বেশী বোনাস ঘোষণা করেছে, ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। কোম্পানী যে কত বড় হয়েছে তা এবারে কার্যক্রমের তালিকা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। কিন্তু মুশকিল হলো বেটাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছি না। বলে কিনা টাকা লাগিয়ে যেখানে টাকায় আট আনা সুদ আসে সেখানে অন্যভাবে টাকা লগ্নি করা বোকামী। কি জবাব দিই বলুন?

—কিন্তু সরকার মশাই, দেশের এই মারাত্মক তেজারতি কারবার গরীব চাষী, স্বল্পবিত্ত আর ভূমিহীনদের বুকে জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে আছে। এভাবে গরীবের রক্ত বেশী দিন চুষে খাওয়া চলবে না, চলতে পারে না। এর থেকে মহা অনর্থ ঘটবে, আপনাকে বলে রাখছি। লাট সাহেবের আইন সভাতে সেদিন এক মন্ত্রী এ বিষয়ে কি বলেছেন কাগজে দেখেন নি? সুতরাং এখনো সাবধান হোন। বিলম্বে সর্বনাশ ঘটবে। যাক, আপনি ছেলেকে কাল আসতে বলবেন। আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে রাজী করাবো। আচ্ছা, এখন উঠি!

সুদেষ্ণার কথায় সুধন্য সরকার বুঝি এক মহা বিপদের ইংগিত দেখতে পেয়ে খুবই চিন্তা-বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে কোন কথাই সরে না। স্বনামে বেনামে তেজারতিটাই যে তার কারবারের একটা প্রধান অঙ্গ!

সুদেষ্ণা চিন্তা ভারাক্রান্ত চিত্তে সরকারের গদি থেকে বের হলো। অতি সাধারণ এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে এরূপ অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা কল্পনায় আসে না। নিজের কানে না শুনলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির যে কতখানি অবনতি হয়েছে আর পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা ও সন্দেহের উগ্রতা যে কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে তা আঁচ করা সম্ভব হতো না। হাঁটতে হাঁটতে সুদেষ্ণা কাশেম সর্দারের দোকানে এসে উপস্থিত। গদিতে এক বৃদ্ধ ছাড়া কেউ নেই। তাকে কাশেমের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বলে—আপনি বসুন, কাশেম আপনাকে বসতে অনুরোধ করেছে। একটা জরুরী ব্যাপারে তাকে যেতে হয়েছে, এখনিই আসবে।

সুদেষ্ণা গম্ভীর মুখে বসে পড়ে। সুধন্য সরকারের মনের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বুঝি তাতেও সংক্রমিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক তিক্ততা, উত্তাপ

উত্তেজনা ও হাঙ্গামা তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও সকল প্রচেষ্টা যে যেনো জলের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে তার এ সময়ে এখানে আসবার কারণও পণ্ড করতে পারে। মনে উদ্বেগ ও জড়তা ঝেড়ে ফেলে সুদেষ্ণা হঠাৎ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে—এখানের সব খবর ভাল তো মিঞা সাহেব? গেল মাসের ঝড় তুফানের তাণ্ডব, ক্ষয় ক্ষতি সবাই কাটিয়ে উঠেছে তো?

—বেটি, ওকি আবার একটা তুফান! ওতো ছিল শুধু একটা দমকা হাওয়ার খেল! ঝড় হয়েছিল সেবার—সেই কার্তিক মাসে! আপনরা তখন হন নাই। শোঁও শোঁও শব্দে ঝড়ের সেকি দাপাদাপি—যেন লক্ষ লক্ষ কালনাগিনীর ফোঁস-ফোঁসানি। ক্ষণেকের মধ্যে গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষ গরু সব খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে একেবারে ছাপ ছুতরো নিশ্চিহ্ন করে দিলে! আমি তখন জোয়ান মরদ—শুকনো পাতার মতো তুলে নিয়ে এক পুকুরে ফেললো। বোধহয় সেই জন্যই জানে বেঁচে গেলাম। ঝড়ের দাপটে কালাপানি ডাঙ্গায় উঠলো। ঝড়ের দম ফুরোতেই শুরু হলো দৈত্যদানোর মতো আসমান ছেয়ে কালো কালো মেঘগুলির হুড়মুড়ানি—তারপর বৃষ্টি—সে কি বৃষ্টি, যেন আসমান জমিনে ভেঙ্গে পড়লো। ক্ষেত খামার, জমি জিরাত ডুবে বিলকুল দরিয়া হয়ে গেল। আমি তো একটা মরা গরুর ওপর আধমরা হয়ে ভেসে ভেসে পাহাড়ের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে ডাঙায় উঠলাম। কিভাবে যে জানে বাঁচলাম তা একমাত্র খোদাতল্লারই মালুম—মনে হলে এখনো শরীর শির শির করে ওঠে গায়ে কাঁটা দেয়। কাল নাগিনীরা সব চতুর্দিকে কিলবিল করছে—গাছের ডালে ডালে মানুষ আর সাপের বাসা কিন্তু কেউ কাউকে মারেনি বা কাটেনি। খোদার কুদরতই বলতে হবে!

—তারপর আরম্ভ হলো মড়ক—প্রথমে ঝড়, পরে বন্যা আর শেষে মড়ক। কত জন মনুষ্য যে মরল তার লেখাযোখা নেই। আত্মজন বলতে কেউ ছিল না। সেই ভয় ভীতিকর ভয়ঙ্কর দিনগুলি এখনো মনে জাগে। এই বুড়োকালেও রাত্তিরে খোয়াব দেখে চিৎকার করি।

—তাই বলছিলাম বেটি, ঝড় তুফানের তাণ্ডব জিন দানোর খেল! কালে দিনে মানুষ ভুলে যায়—সামলে নেয়। কিন্তু আদমির মনে শয়তানের বাসা—একেবারে খোদার গজব! ফলে হানাহানি মারামারি কাটাকাটি—সংসার ছারেখারে যায়। দেশের ঘরে ঘরে জনমনিষ্যির মনে

এখন শয়তান কায়েম হয়েছে। ছেলেপুলের ধ্যানধারণা, কথাবার্তা সব উল্টে দিয়েছে! বুড়োদের কথায় কেউ কান দিচ্ছে না। মোগল পাঠান আমলেও এত নৈরাজ্য ছিল না। সর্বনাশ হবে বেটি! সর্বনাশ হবে!!

সুদেষ্ণা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কাশেমের উপস্থিতিতে বাধা পড়লো। কাশেম নম্র স্বরে বললো—অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম বহিন, খুবই অন্যায় হয়েছে। কি করব, নিরুপায় হয়েই আপনার খত পেয়েও থাকতে পারিনি। একটা জরুরী মজলিস ছিল—না গিয়ে উপায় ছিল না। সেজন্য চাচাকে আপনার খিদ্‌মতের জন্য বসিয়ে রেখে গেলাম।

—আপনার সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই। আমি কিছুক্ষণ আগেই এসেছি। চাচার সঙ্গে কথাবার্তায় সময় ভালই কাটছিল।

—কি বলবো বহিন, চতুর্দিকে যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে তার কিছুরই খেই ধরতে পারছি না। সব যেন ভুতুরে কাণ্ড—সব কিছু লণ্ডভণ্ড করবার জন্য যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হচ্ছে সব কিছুই ফন্দিবাজ দালালের কাবসাজি—নচেৎ কেই বা টাকা যোগাচ্ছে —আর কেই-বা কুমতলব দিচ্ছে। এলেমকেও তোবা দিই। লেখাপড়া শিখে ছেলেগুলো এক একটা শয়তানের বাচ্চা হয়ে উঠেছে! মৌলবি মোল্লাদের গোঁড়ামিকেও হার মানিয়েছে। আবো অবাক কাণ্ড—কি ভাবে সবাইকে এরা বোকা বানাচ্ছে। বুদ্ধিমান বলে যাদের জানতাম তারাও একেবারে পাঁঠা বনে গেছে। মুসলমান দারোগাকে খুন কবেছে তো কি হয়েছে! স্বদেশীওয়ালাদের আবার জাতগোত আছে নাকি! ওরা হিন্দু দারোগাকে মারে নাই? ইংরেজদের কোতল করে ফাঁসীতে লটকে নাই? পুলিশকে বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে না! বোমা মেরে ছোটলাট বড়লাটকে জখম করছে না; গাড়ি বাড়ি উড়িয়ে দিচ্ছে না? খুন রাহাজানি করছে না? কিন্তু কেন? তা একবারটি ভেবেছিস? যা কিছু করছে, উদ্দেশ্য ইংরেজ হটাও, দেশ স্বাধীন কর। যাতে তোরা সকলে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—খেয়ে পরে সুখে বাঁচতে পারিস, নিজের দেশকে নিজেই শাসন করতে পারিস

—আমি স্রেফ বলে দিয়েছি—এসব মামদোবাজী আমাদের এ তল্লাটে চলবে না। আমি তো বাধা দেবই আর যে বেটারা উস্কাবে, গুণ্ডামি বদমাসি করবে তাদের দেখে নেবো। আল্লারসুলের নামে কসম ভয় দেখিয়েছি, শাসিয়ে এসেছি। আসবার পথে সুধন্য সরকার,

শ্যাম পণ্ডিত, গণি, ওসমান আর ইউসুফ মোল্লাকে আপন আপন জন সামলাতে এবং হাটবারে ঢেঁড়া পিটিয়ে সকলকে সাবধান করে দিতে বলেছি। বলবো কি বহিন এসব ঐ লালমুখো বাঁদরদের শয়তানি আর তাদের ঘুষখোর দালালদের কাণ্ড! যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে বসবাস করে আসছে—কৈ বাপ দাদার আমলে কারো মুখে তো এসব হানাহানির কথা শোনা যায়নি। যত ভাবছি, যত বলছি—রাগে ততই গা জ্বলছে।

—যাক গে, আপনাকে আর দেরী করাবো না। কাগজ পত্র সব রেখে যান। আগামীকাল দুপুরের দিকে ডাক্তারবাবুকে আসতে বলবেন। তবে যতগুলোর নাম পাঠিয়েছি তাদের সকলকে হয়তো পাওয়া যাবে না। বলে কিনা বীমা করা গুনা! শরিয়ৎ-এ মানা! বেটারা যেন সব পীর পয়গম্বর! আপনি কাল ঠিক এসময়েই আসবেন।

সুদেষ্ণা মনের অস্থিরতা গোপন করে মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে কাশেম সর্দারকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দেবার ফাঁকে বলে—আপনি ঠিকই বলেছেন কাশেম সাহেব। স্বার্থান্বেষী মহল এভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে এবং হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে লড়িয়ে আখেরে শাসককুলের ফায়দা করে দিচ্ছে। এতে ক্ষতিটা হচ্ছে কার? আমাদেরই। অথচ আমাদের বড় পরিচয় আমরা মানুষ—একই দেশের জলবায়ুতে বর্ধিত—একই দেশ-মাতার সন্তান। আমাদের ধর্ম—ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে মিশে থেকে পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হওয়া; আর কর্ম হলো দেশের দশের মঙ্গল সাধন ও হিত চিন্তা করা। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা আমাদের ধর্ম ও কর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে বয়ে চলেছে। বিবেচনা করুন কাশেম সাহেব এ আমাদের ভারতবাসীর জীবনে কত বড় অভিশাপ!

—যে শক্তি আবহমানকাল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটিয়ে চলেছে তাঁকেই মানুষ আল্লা, হরি, যিশু ইত্যাদি নানা নামে ডেকে মন্দির মসজিদ ও চার্চ বানিয়ে পূজা-আর্চা করছে এবং স্বর্গ ও মোক্ষলাভের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে। ক্রমবিবর্তমান জগতে মানুষ আদিম যুগ থেকে লক্ষ কোটি বৎসর পেরিয়ে বিরাট সভ্যতা ও কৃষ্টির পত্তন করে বর্তমান যুগের এই উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। যে সকল জ্ঞানী বিজ্ঞানী মহৎ ব্যক্তির অবদানে, চিন্তা কর্ম ও প্রেরণায় তা সম্ভব হয়েছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সমাজ ব্যবস্থা নব নব রূপে উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে; মানুষের সুখ সমৃদ্ধি ও

নিরাপত্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁদের আমরা স্মরণ করছি না! যে সকল মহাপ্রাণ মনীষী, মহাপুরুষ, পীর পয়গম্বর অহর্নিশ আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, মানবতা বোধকে জাগ্রত করতে বলছেন তাদের কথা আমরা শুনেও শুনি না। অধিকন্তু তাঁদের আদেশ অনুজ্ঞা ও আদর্শের বিপরীত কর্ম করে চলেছি। পরস্পরকে ভালোবেসে পরস্পরের সুখে দুঃখে সমভাগী হয়ে, গরীব দুঃখীর দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে আমরা এই পৃথিবীতেই মহানন্দময় এক পরম রমণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বর্গ রচনা করতে পারি।

—আজ বিদেশী শাসকের দুষ্ট কূট চক্রান্তের বলি হয়ে আমরা ভাই হয়ে ভাইকে ভুলে একে অন্যের বুকে ছুরি মারবার, একে অন্যের ঘরে আগুন লাগাবার জন্য যে সর্বনাশা নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছি তা এখনও সংযত না হলে আমাদের হিন্দু-মুসলমানকে অশেষ দুঃখ ক্লেশ ভোগ এবং অনেক আপশোষ করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের এই মূর্খতার জন্য অনপনেয় কলংকের ভাগী হতে হবে এবং অপরিসীম মূল্য ও খেসারত দিতে হবে।

—আপনার কথা শুনে আশার সঞ্চার হলো। মনে বল পেলাম। দৃঢ় মনোভাব দেখে সুখী হলাম, আনন্দ পেলাম। এরূপ না করলে দেশের সর্বনাশ হবে, সব কিছু উচ্ছন্নে যাবে। আপনার মঙ্গল হোক। খোদা হাফেজ, বলেই সুদেষ্ণা উঠে পড়ে।

পোস্টআপিসের দিকে যেতে যেতে সুদেষ্ণার চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে কেবলই খানিক আগেকার উক্তিরই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। রাস্তা জনবিহীন নির্জন নিঝুম পোস্টআপিসের কাছে এসেও লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আপিস ঘরে ঢোকবার মুখে দেখা গেল অদূরে অড্ডা ঘরে টিম টিম করে একটা কুপি আর অপিস ঘরে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে—তার অর্ধেকটাই কালি পড়ে ঢেকে গেছে। ঐ স্তিমিত আলোতে পোস্টমাষ্টার বাবু আর এক ব্যক্তির সঙ্গে স্তূপীকৃত ডাকের থলি পরীক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখছেন। পায়ের শব্দে—কে, বলে মাথা তুলে সুদেষ্ণাকে দেখেই মাষ্টারবাবু বললেন—দেরী দেখে ভাবলাম, আজ বুঝি আর এলেন না।

—তা কখনো হয়! আমার সময়ের কত অভাব তা তো জানেন। কালকের মধ্যে এখানের কেস-গুলো সমাধা করতেই হবে।

—বেশ, বেশ। ভেতরে যান—মাসীর সঙ্গে বসে একটু গল্প করুন। আমার হয়ে এসেছে। তা ছাড়া ব্যাপারটা তো তারই। আমি কে? নিমিত্ত মাত্র! ভয় নেই, আপনাকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখবো না।

—আচ্ছা, বলে সুদেষ্ণা অন্দরের দিকে পা বাড়ালো।

পোষ্টমাষ্টারের সংসার খুবই ছোট—শুধু স্বামী আর স্ত্রী। ছেলে মেয়েরা কেউ সঙ্গে থাকে না। বদলির চাকুরি—কখন কোথায় যায়, কোথায় থাকে—ঠিক তো নেই। তিন মেয়ে—সকলেই বিবাহিতা। দুই ছেলে—একটি বি. এ. পাশ করে পোষ্টআপিসেই ঢুকেছে। অন্যটি শহরে থেকেই পড়াশুনা করছে। সুখের সংসারই বলতে হবে। মাষ্টার গিন্নী নিত্যকালী দেবী লণ্ঠনের সামনে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। সামনে পানের বাটা, হাতে যাঁতি। পায়ের শব্দে পাশ ফিরে সুদেষ্ণাকে দেখেই বললেন —ওমা, কখন এলে। কর্তার কাছে শুনলাম সকালে এসেছিলে, তা একবার এদিক হয়ে গেলে কি ক্ষেতিটা হতো বাছা। বিদেশ বিভুঁই—জন মনিষ্যিহীন হয়ে একা পড়ে আছি—একবার ভাবলেও না?

—কি যে বলেন—ভাববো না কেন? সর্বদাই আপনাদের কথা ভাবি। তবে কি জানেন, ভোরে স্টেশন থেকে যাবার পথে একবার মাষ্টার মশাইকে কেবল আসার খবরটা দিয়ে গেলাম। লটবহর নিয়ে অত ভোরে ভেতরে ঢুকে আপনাকে বিরক্ত করতে মন চাইল না।

—কি বললে, বিরক্ত; আমি বিরক্ত হবো! হায় আমার পোড়া কপাল! এই বুঝি তুমি আমাকে চিনেছ!

সুদেষ্ণা মহা ফাঁপড়ে পড়ে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করে—সুপরি কাটছিলেন বুঝি? বা, বেশ তো নারকেল কুঁচির মতো মিহি! বড্ড লোভ হচ্ছে!

নিত্যকালী দেবী পূর্ব প্রসঙ্গ ভুলে উৎসাহিত হয়ে বলে—খাবে? আমার হাতের কাটা সুপুরি খেয়ে যখন যেখানে গেছি—অনেকে প্রশংসা করেছে। এ সুপুরি দিয়ে আমার হাতের পান খেয়ে আরো বেশী প্রশংসা পেয়েছি। একটা পান বানিয়ে দিচ্ছি—খেয়ে দেখ না। আবার চেয়ে খেতে হবে।

—কি যে বলেন মাসীমা! আমি আবার পান খাই নাকি!

—তাই নাকি! ওমা, বলে কি গো! মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছ—পান খাবে না! পান না খেয়ে থাকো কি করে বাছা। এয়োতি হলে পর পান

না খেলে যে সোয়ামীর অকল্যেণ হবে। আর এও বলি, কয়দিন এভাবে ধিঙ্গিপানা কার কাটাবে বাছা! ঘর সংসার কি করতে হবে না? আরও একটা কথা বলি, এই যে রেতে বিরেতে বেটা ছেলের মতো নেচে কুঁদে বেড়ানো—এর ফল কি কখনো ভাল হয়! ভয় নেই! দেশ কালের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা নিশ্চয়ই জান এবং শোন। তার উপর এই নেড়ের দল, হিন্দুর মেয়ে পেলে তো আর কথা নাই। পাঠান মোগল আমল থেকে একই ভাবে চলে আসছে। মনে নেই সেবার কি কাণ্ডটাই না ঘটলো! মেয়েটাকে জোর করে ধরেনে গেল! তারপর শুরু হলো মামলা মোকদ্দমা—অবশেষে দাঙ্গা হাঙ্গাম লুটতরাজ। এতো আকছার ঘটছে। বলিহারি রাজত্ব!

সুদেষ্ণা হেসে বলে—তা তো বুঝলুম মাসীমা। যত দোষ সব ঐ নন্দ—খুড়ি নেড়ে ঘোষের। আর আমরা হিন্দুরা সব ধোয়া তুলসী পাতা! খুন, রাহাজানি, বলাৎকার চুরিচামারি আমরা করি না! উপন্যাস আর খবরের কাগজটাগজ নিশ্চয়ই পড়েন। কলকাতায় সেবার ভদ্র উঁচু নামি মহলে কি কেচ্ছাটাই না ঘটলো! শেষে মেয়েটা কিনা আত্মহত্যা করে বাঁচলো! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—এক এক করে হিসেব করুন। সুন্দ উপসুন্দ থেকে শুরু করে সীতা, শুভদ্রা, সংযুক্তা প্রভৃতির হরণ উপলক্ষ কত লঙ্কা কাণ্ডই না ঘটলো সে সবের কি কোন লেখাযোখা আছে! আর রামায়ণ মহাভারত ঘাটলে কেচ্ছাকেত্তনের তো অন্ত নেই! শেষ কালে এলো ঠগী বর্গীর দল। তারা তো বুল বুলির ধান খাওয়ার মতন লুণ্ঠন কম্ম করেই চলেছিল। তখন কিন্তু এক নেড়ে বাদশাহ—শেরশাহ সুরী—ঠগী বর্গীদের দমন করে আমাদের মান ইজ্জৎ রক্ষা করেছিলেন। লুণ্ঠন হরণ, অপহরণ তো ছিল সে কালের রাজ রাজাদের অঙ্গের ভূষণ, শৌর্য বীর্যের লক্ষণ, গৌরব, শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। আর এখন কলির রঙ্গ তো নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করছেন।

—বাব্বা, তোমার যে দেখছি বড্ড নেড়ে-প্রীতি।

—না মাসীমা, এ প্রীতি নয়—এ হলো প্রতীতি—খাঁটি সত্যি কথা—ইতিহাস আর পুঁথি পুস্তকে যা লেখা আছে। এখনকার কথা যা বলছেন সে তো কেবল ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বিদ্বেষ বহ্নি জাগাবার ফন্দি—শয়তানের উস্কানি আর ধূর্তদের হাতছানি! ধর্মের নামে কতগুলি অজ্ঞ মূর্খ চাষাভুষোকে লেলিয়ে দিয়ে কায়েমি স্বার্থের যূপকাষ্ঠে তাদের বলি দিয়ে দেশের ও দশের সর্বনাশ সাধন।

উত্তেজিত সুদেষ্ণা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পোষ্টমাষ্টার মশাইর আবির্ভাবে বাধা পড়লো। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—আপনার সব কথা শুনতে না পেলেও কিছু কিছু কানে এসেছে। তবু বলি—সত্য হলেও যা অপ্রিয় তা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। আপনার দরাজ-দিল আর বদান্যতার কীর্তিকাহিনী একান সে-কান হয়ে আমাদেব কানেও এসে পৌছয়। আপনার কাছে রাম রহিম আলাদা কিছু নয় সুদেষ্ণা দেবী। গান্ধী মহারাজও তো "রাম রহিম কো জুদা না কর ভাই" বলে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন কিন্তু ফলটা কি হচ্ছে—বিভেদ বিবাদ আরো বাড়ছে। আমার কথাই বিবেচনা করুণ—ছাপোষা মানুষ। ছেলেটা বি. এ. পাশ করার পর বহু কাঠখড় পুড়িয়ে পোষ্টআপিসে ঢুকিয়েছি। কতদিন হলো এখনো অবধি কনফারমড্-ই হলো না। রিজার্ভ পিরিয়ডই চলেছে—কেননা প্রতি তিনজন মুসলমানের পর একজন হিন্দু (Confirmed) পাকা হবে। বলুন একি কোন কাজের কথা, না জাষ্টিস! এক সঙ্গে ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিভেদ, তোষামোদ জিইয়ে রাখবাব, এর চাইতে সুচতুব অভিনব ফন্দি আব চাটুচাতুর্যপরায়ণ ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? বুঝলেন, এসব ব্যাপার স্যাপার বলতে গেলে কলিব এক মহাভারত হয়ে যাবে। বিশেষ করে যার নুন খাই…। যাক গে, সে সব কথা। এখন কাগজপত্র সব দিয়ে যান। আগামীকাল শেষ বেলার দিকে ডাক্তার নিয়ে আসবেন। তারপব স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন—সুদেষ্ণা দেবীকে মিষ্টিমুখ করাওনি বুঝি!

—না, তার আর সময় পেলাম কোথায়? হাসতে হাসতে বলে—এসেই অবধি যেভাবে কোমব বেঁধে কোন্দল শুরু কবলে!

—তা মুখে যখন মিষ্টি দাওনি তখন তেতো কথা শুনতেই হবে।

—না, না, মাসীমা, ওর জন্য ব্যস্ত হবেন না। সুধন্যবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। এখন উঠি মাসীমা। রাত্রি অনেক হয়েছে। মাষ্টার মশাইকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সুদেষ্ণা—আসি, বলেই ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যায়।

আপিস প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গেটের মুখেই ষষ্ঠীর সঙ্গে দেখা। সেও বোধহয় বাইরে বেরুচ্ছিলো—হাতে লণ্ঠন। সুদেষ্ণাকে দেখেই বলে দিদি যে, এখন আবার অন্য কোথাও যাবেন নাকি?

—না, এখন একেবারে সোজা ডাকবাংলো। ভেবেছিলাম একবার স্টেশন হয়ে যাব। তা আর হলো না। দেরী হয়ে গেছে।

—তা চলুন, আমার বাড়িও তো ওদিকেই। আপনাকে বাংলো অবধি পৌঁছে দেব। যা ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর আকাশ মেঘে ঢাকা। লণ্ঠন ছাড়া পথ চলা দায়।

—না, ষষ্ঠী, আমার কোন কষ্ট হবে না। আমার নিকট টর্চ রয়েছে। তুমি যাও, তোমার নিশ্চয়ই তাড়া আছে।

—না, দিদি, আমার কোন তাড়া নেই। ডাকগাড়ি সেই রাত সাড়ে এগারোটায়। খেয়ে দেয়ে সাড়ে দশটার মধ্যে আড্ডা ঘরে পৌঁছলেই হলো।

সুদেষ্ণা চলতে চলতেই বলে—বেশ চলো। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাড়ি কোন দিকে বলছিলে?

—আজ্ঞে, ফরেষ্ট আপিস ছাড়িয়ে সদর রাস্তার ডানহাতি মাঠটা পেরলেই আমাদের গাঁ, একেবারে মাঠের লাগোয়া। গফুর চৌকিদারের পাশের গ্রাম।

—বুঝেছি। অনেকদিন আগে ওদিকে গিয়েছিলাম বটে। তা গাঁয়ের লোকজন সব ভালো তো? অসুখ-বিসুখ নেই, সকলে মিলে মিশে আছে তো?

—তা আছে। আপনার আশীর্বাদে আমাদের তল্লাটে সেটি হবার যো নেই। আপনি গফুরের জন্য যা করেছেন গ্রামের লোক এখনো ভোলেনি। গফুর তো সুযোগ পেলেই আপনার উপকারের কথা পাঁচালির মতো ইনিয়ে বিনিয়ে সকলকে শোনায় আর শাসায়—বেইমানি করলে খোদার গজব পড়বে, উচ্ছন্নে যাবি!

সুদেষ্ণা ও ষষ্ঠী কথা বলতে বলতে হাটের রাস্তা বাঁয়ে রেখে সদর রাস্তা ধরেই চলেছে। হঠাৎ জনকোলাহল কানে আসতেই তারা থমকে দাঁড়ায়। ঠাহর করবার চেষ্টা করে কোন দিক থেকে শব্দ আসছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ষষ্ঠী বলে—মনে হচ্ছে হাতিচরা দীঘির পাড়ে বুড়ো বটগাছের দিক থেকেই কোলাহল আসছে। এমন অসময়ে অমন জায়গায় লোকজনের কোলাহল—উদ্বেগ আশংকার কথাই বটে! সাঁঝের সঙ্গে সঙ্গে সারা তল্লাট ঝিমিয়ে পড়ে!

শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে ষষ্ঠী বলে—অনুমতি দেন তো, ব্যাপারটা নিজ চক্ষে দেখে আসি।

—না, তোমার তাড়া আছে। বরং আমিই যাই। শব্দ অনুসরণ করে আমি ঠিক যেতে পারবো। সুদেষ্ণা রাস্তা থেকে নেমে পড়ে।

ষষ্ঠী মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে থাকে। পরক্ষণেই দৌড়ে সুদেষ্ণার পথরোধ করে বলে—না, দিদি, আপনাকে ওখানে আমি একেলা যেতে দেবনা। সুদেষ্ণার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ষষ্ঠী সামনের দিকে চলতে থাকে।

বাক্যব্যয় বৃথা ভেবে সুদেষ্ণা ষষ্ঠীর অনুসরণ করে।

রাস্তা থেকে কয়েক মিনিটের মাত্র পথ। হাজামজা প্রকাণ্ড এক জলাশয়। উঁচু পাড়, এখানে ওখানে ধ্বসে গিয়ে উঁচু নিচু ঢিবির মতো দেখায়। মাঝখানে ভগ্ন-দশা-গ্রস্ত বিরাট এক শান বাঁধানো ঘাটলা। উপরের চত্তরে চারদিকে বেঞ্চির মতো শান-বাঁধানো যায়গা—শত ফাটলে জীর্ণ। মাঝে মাঝে পলস্তারা খসে ইট সুরকি বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও ফাটল গভীর হাঁ করে আছে। তার ভেতর থেকে নানা রকম গাছগাছড়ার শিকর বেড়িয়ে ঝুলে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় আদ্যিকালের এক বদ্যি বুড়ি বুঝি জটা জাল মেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার হাড় পাঁজর সব বেরিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির নিচের দিকে কয়েক ধাপ ভাঙা-চোরা অবস্থায় এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়ে গিয়েছে। তার পরে আর ইহার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই—কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে।

এ অঞ্চলে এত বড় দীঘি নাকি আর একটিও নেই। দীঘির নাম হাতিচরা। অতীতের কোন এক সময়ে এক কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে মদমত্ত এক জোড়া শ্বেত হস্তী নাকি পাহাড় থেকে নেমে এসে এর কমল বন মথিত করেছিল। তাদের কেউ চোখে দেখেনি। কিন্তু এখনো নাকি কোন কোন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে জলাশয়ের মধ্যখানের কমল বনে হস্তী দ্বয়ের শুঁড় থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রবল জলরাশি পরিদৃষ্ট হয়। আর মত্ত হস্তীর ক্রীড়ার দাপট শ্রুতিগোচর হয়। এরূপ কত আশ্চর্য আর ভয়-ভীতিপূর্ণ লোক-কথাই যে এ জলাশয়কে ঘিরে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে! জলাশয়ের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। সাপখোপের ভয় তো আছেই, মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে এসে ডোরাকাটাও নাকি অত্যাচার উপদ্রব শুরু করে।

রাত্রিবেলার তো কথাই নেই, দিনের বেলাও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এর

কাছেপিঠে ঘেঁষতে কেউ সাহস করে না। ঘাটের সন্নিকটে অতিবিস্তৃত বিশাল এক বট গাছ। বহু প্রাচীন—কত বয়স কেউ বলতে পারে না। ঠাকুর্দা থেকে নাতি পর্যন্ত এই বটবৃক্ষকে একই অবস্থায় দেখে আসছে। ছোট, বড়, সরু ও মোটা অনেক ঝুড়ি গাছের ডাল থেকে নেমে মাটিতে প্রবেশ করেছে। দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় প্রকাণ্ড এক সবুজ চাঁদোয়া বুঝি অসংখ্য খামের ওপর বিন্যস্ত রয়েছে। গাছের গোড়াটার চারদিকে মাটির বেদি। তার উপর ছোট বড় নানা আকারের পাথরের নুড়ি—অধিকাংশই তেল-সিঁদুর লিপ্ত। তাদের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ফুল বেলপাতা। একটা সিঁদুর-মাখা ত্রিশূলও গাছের গোড়ায় পোঁতা—মাথায় একখণ্ড ময়লা জীর্ণ লাল শালু ঝুলছে। আশ-পাশ এবং দূর দুরান্ত থেকে লোকজন এসে মাঝেসাঝে পুণ্য তিথিতে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বাবা বটেশ্বরকে মানত করে পূজা দিয়ে চলে যায়।

এই বট গাছের নিচে বিগত রাত্রে কয়েকজন সাধুপুরুষের হঠাৎ আবির্ভাব ঘটেছে। কি ভাবে যেন খবর রটেছে সাধুবাবারা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। হস্ত আর ললাট-রেখা দেখে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও ইষ্টি-গোষ্ঠির খবরাখবর নির্ভুল বলতে পাবেন। খড়ি পেতে গুণে সবাইকে তাক লাগিয়ে আর কপালে আঙুল ছুঁইয়ে ত্রাটক করে লোকের ভিরমি ধরিয়ে দিচ্ছেন! তা ছাড়া আদিব্যাধির ওষুধ, জল-পড়া, কবচ, মাদুলি, লতাপাতা, শেকড়, জপমালা ইত্যাদি অকাতরে বিলোচ্ছেন। আশ্চর্যের কথা সাধুজীরা কারো কাছে কিছুই চায় না, যার যা খুশী টাকা পয়সা ফল মূল যে যা পারে দিচ্ছে। তাঁরা গ্রহণ করে পরক্ষণেই অন্যকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। এরূপ সাধু-সমাগম দর্শনের জন্যই লোকে লোকারণ্য! গাছ-তলায় মেলা বসেছে। পান সিগ্রেট থেকে শুরু করে খই, মুড়ি মুড়কি, ফল মূল তেলে-ভাজা এমনকি খেলনা বেলোয়ারী চুড়ির দোকানীরা শুদ্ধ পশরা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

সুদেষ্ণা যতই বুড়ো বটের দিকে এগোচ্ছিল ততই তার মনের আতংক উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয়ে আসছিল। চলতে চলতে বহুলোক দেখতে পেল যারা রাত্রি সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে চলেছে। তাদের জিজ্ঞাসা না করেও সে বুঝলে লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত নির্জন বিপদসংকুল দীঘির ধারে সমবেত জনতার কোলাহল আর যাই হোক দাঙ্গা হাঙ্গামা কিংবা ঝগড়া বিবাদ জনিত নয়। জন সমাগমের কারণ

অন্য কিছু। তার আশংকা কৌতূহলে রূপান্তরিত হলো। ব্যাপারটা সরজমিনে তদারক করবার গভীর আগ্রহে সে দ্রুত পদক্ষেপে এগোয়। ষষ্ঠী কিন্তু পথচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে সে সুদেষ্ণার অনুগমন করে।

গাছতলায় তখনো প্রচুর লোক—যদিও সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। নিবিড় অন্ধকারে কাছে পিঠের লোকও ঠাহর করা দুঃসাধ্য। চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে গাছের শেকরের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে হচ্ছে। দোকানী-দের সম্মুখে কেরোসিনের কুপি টিমটিম করে জ্বলছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের সংখ্যা নগণ্য—তাও আবার পলতের ধোঁয়ায় কালিতে অর্দ্ধেক আচ্ছন্ন। সম্মিলিত এই আলোর অভিযান গাছতলার অন্ধকার দূরীভূত না করে বুঝি আরো ঘনীভূত করছে। লোকজন তাতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। চোর ছেঁচোর বদমাশ, পকেটমার তো জুটেছেই তার ওপর সাপখোপ, দেখা অদেখা শারীরী অশরীরী অনেক কিছুর ভয়। স্বজনেরা একে অন্যকে না পেয়ে হৈহল্লা ডাক চিৎকার করছে।

সুদেষ্ণা টর্চের আলো ফেলে যেখানে অনেক লোকের ভীড় সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে। ষষ্ঠীও তার পেছন পেছন সেখানে উপস্থিত। বটগাছের ক্ষয়প্রাপ্ত বেদিটাকে পেছনে রেখে সাধুজীরা বসেছেন। সম্মুখের খানিকটা জায়গা জুড়ে ধুনি জ্বলছে। মাঝে মাঝে তা উস্কে দিতেই চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠছে। আগুনের উজ্জ্বল শিখায় কয়েক মুহূর্তের জন্য বটের মোটা মোটা জটাগুলিকে মনে হয় বহু শতাব্দী জীর্ণ অতিকায় কংকাল সব ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আর জটাজুট ভস্মাচ্ছাদিত চীরধারী মুদ্রিত-নেত্র নবীন সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত অলৌকিক বলেই ভ্রম হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা দর্শনার্থীদের কাউকে হাত তুলে, কাউকে বা ঝোলা থেকে কিছু একটা বার করে আবার কাউকে ফলমূল দিয়ে—জয় মহাদেব বলে আশীর্বাদ করে বিদায় দিচ্ছে। এভাবেই চলেছে অবিরাম জনস্রোত।

সুদেষ্ণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাধু এবং ভক্তজনদের মধ্যে আদান প্রদান অসীম কৌতূহলে লক্ষ্য করছিল। আচম্বিতে এক সাধুর আহ্বান—বেটি ক্যা মাঙতা—কানে যেতেই সে অবাক না হয়ে পারলো না। এ কণ্ঠস্বর যেন তার চেনা। পূর্বে কোথাও শুনেছে। বিষয়টার জট ছাড়াবার আগ্রহে সুদেষ্ণা উত্তেজনা অনুভব করে। এগিয়ে চলে সে একেবারে সাধুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদের মতোই অর্ঘ রেখে প্রার্থনার

ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে হাত বাড়ায়। সাধু ঝোলা থেকে কি একটা বার করে সুদেষ্ণার হাতে দেবার কালে হঠাৎ ধুনি থেকে নির্গত উজ্জ্বল আলোকে সে সাধুকে স্পষ্ট দেখতে পায়। সাধু হাত তুলে সুদেষ্ণাকে আশীর্বাদ করে—সদগুরুসে ভেট হোগী বেটি, সফলতা মিলেগী।

কিছু মাত্র বিলম্ব না করে সুদেষ্ণা সাধুর সম্মুখ থেকে সরে এলে পর ষষ্ঠী এগিয়ে গিয়ে সাধুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। কিছু ফল মূল তুলে সাধুজী তার হাত দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলে—হুঁশিয়ার রহো বেটা—শিবজী তেরা ভালা করে।

সাধুর প্রথম সম্ভাষণে সুদেষ্ণা চমকে উঠেছিল। তার মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয় ধুনির ক্ষণিক উজ্জ্বল আলোকে ভস্মমাখা নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে তা দৃঢ় হয়। সে তার এখানে আগমনের আকস্মিক নির্দেশ এবং এই সন্ন্যাসীদের এখানে আবির্ভাবের মধ্যে যেন এক রহস্যজনক যোগসূত্র আবিষ্কার করে। সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলিটি ঐ গোপন যোগসূত্র নিরূপণের চাবিকাঠি হতে পারে বলে তার ধারণা জন্মে।

ষষ্ঠী ফিরে দাঁড়াতেই সুদেষ্ণা চলতে থাকে। তার মন উদ্বেগে অধীর এবং চাঞ্চল্যে অস্থির। ডাক বাংলোতে ফিরে মাদুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে কিছুদূর এগোতেই ষষ্ঠীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর সুদেষ্ণার কানে আসে—আমাকে সাধুমহারাজ হুঁশিয়ার থাকতে বললেন কেন দিদি? বড্ড ভাবনা হচ্ছে।

ষষ্ঠী যে খুব ভয় পেয়েছে তার গলার স্বরেই তা বোঝা যায়। তাকে অভয় দেবার উদ্দেশ্যেই সুদেষ্ণা বলে—হুঁশিয়ার করেছেন তো কি হয়েছে? সাধু সন্ন্যাসীরা মানুষের মনের কথা জানেন ও বোঝেন। তুমি যে হুঁশিয়ার লোক তোমাকে দেখেই তিনি বুঝেছেন। সেজন্যই তোমাকে আরো সাবধান করে দিলেন। আর এতো সত্যি কথা—তোমার অতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজ। তাতে এত ভয় ভাবনা ও ঘাবড়ে যাবার কি আছে?

—হুঁ—বলে ষষ্ঠী চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বলে—রাত্রি অনেক হয়েছে, এখন আর বাড়ি যাবো না। সুদেষ্ণা ঘড়ি দেখে বলে—রাত্রি বেশী হয়নি। সবে পোনে নয়টা। তোমার ডাক গাড়ি তো অনেক রাত্রে—সাড়ে এগারোটায়।

—না দিদি, খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে যেতে সময়ে কুলোবে না।

তার চেয়ে বরং আপনাকে ডাকবাংলো অবধি পৌঁছেদি। ঐ রাস্তায় তো প্রায় এসে গেছি। রেতে বিরেতে টিলায় উঠবার রাস্তাটা ভাল নয়। এসময়ে লোকজনের চলাচল কম বলে বুনো শূয়ার, বনবেড়াল এমন কি কখনো সখনো ডোবাকাটারও উপদ্রব হয়। তাকে ডাকবাংলো পৌঁছে দেওয়াটাই যে ষষ্ঠীর বাড়ি না যাওয়ার প্রধান কারণ তা বুঝেই সুদেষ্ণা বলে—ও আর কতটুকুই বা পথ। আমি একলাই অনায়াসে যেতে পারবো। এ পথে তো আমি নতুন নই। তাছাড়া রাস্তায় এখনো লোকজন চলছে—ভয়ের কিছু নেই। তুমি নির্ভাবনায় বাড়ি চলে যাও। এভাবে সুদেষ্ণা তার নিরাপত্তা সম্পর্কে ষষ্ঠীকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে ততই সে সোচ্চারে তার প্রতিবাদ জানায়—একেবারে নাছোড়বান্দা। অবশেষে তার প্রতিবাদ বিলাপে পরিণত হয়—আপনি আমাকে আপনার জন্য কিছুই করতে দেন না। অথচ আপনি এখানে এলে কত ভাবেই না এ গরীবকে সাহায্য করেন!

সুদেষ্ণা বুঝলো ষষ্ঠীর খেদোক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বই কমবে না। তখন এক মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে—তুমি বাড়ি না গেলে তোমার বউ ছেলে মেয়ে তোমার জন্য ভাববে এবং তোমার অমঙ্গল আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন ও শংকিত হবে। তোমার স্ত্রী না খেয়ে সারা রাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে।

এ দাওয়াই খুবই কাজ করলো। ষষ্ঠী অনেক নরম হলো। অভিযোগের সুরে বলে—আচ্ছা, আপনি যখন চাইছেন না তখন আপনার কথাই থাক—আমি যাবো না। তবে যাবার সময় আবার বলছি—সাধুবাবা বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। ওভারশিয়ার বেটা আমার উপর ভয়ঙ্কর খাপ্পা।—কখন যে কি বিপদে ফেলে। কথা শেষ করে ষষ্ঠী বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সুদেষ্ণা দূর থেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি কিচ্ছু ভেবো না—ভয়ের কিছু নেই। একটা কথা মনে রেখো—সাবধানের মার নেই। সাধুবাবা হয়ত একথাটাই তোমাকে ওভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বাংলোর পথে চলতে চলতে সুদেষ্ণা সারা দিনের কাজ ও ঘটনাবলীর হিসাব নিকাশ করছিল। 'সকাল বেলা মুটেদের এবং কিছুক্ষণ পূর্বে দেখা সন্ন্যাসীদের ক্রিয়া কর্মের তুলনাও পর্যালোচনা করে অজ্ঞাত অভিযানের

গুরুত্বটা অনুধাবন, উপলব্ধি ও ঘটনা পরম্পরার মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ডাক বাংলোর রাস্তাটা বড়রাস্তা থেকে যেখানে বাঁক নিয়েছে দূর থেকে টর্চ ফেলে দেখে নিয়ে সে অগ্রসর হতে থাকে।

এত রাত্রে এ অঞ্চলের রাস্তাঘাটে জনমনুষ্যের চলাচল বিরল হয়ে পড়ে। কিন্তু বুড়ো বটের তলায় জন সমাগম হেতু তখনও রাস্তার আগে পিছে লোকজনের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসছে এবং লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো চোখে পড়ছে। অন্ধকার রাত, রাস্তার দু'পাশের বড় বড় গাছের ছায়া সে অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত, আরো নিবিড় করে তুলেছে। বাঁকের মুখে যেখানটায় বড় একটা অশত্থ গাছ দাঁড়িয়ে আছে তার তলা দিয়ে চলা কালে সুদেষ্ণার মনে হলো কেউ যেন সমুখ থেকে সট করে গাছটার আড়ালে চলে গেল! কালোর মাঝে ততোধিক কালো একটা আবরণ ছায়ার মতো মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো। সুদেষ্ণা মনে মনে ছায়ামূর্তির ক্ষিপ্রতার তারিফ না করে পারলো না। সে সঙ্গে এ-ও বুঝলো যে ডাক-বাংলো এবং সেখানে যাতায়াতকারীদের ওপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

টিলার রাস্তা বেয়ে উপরে উঠবার প্রথম বাঁক ছাড়াতেই সুদেষ্ণার নজরে এলো উপর থেকে লণ্ঠন হাতে দ্রুতপায়ে কেউ নামছে। কাছে আসতেই বোঝা গেল গফুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। গফুর বোধহয় সুদেষ্ণাকে দেখতে পায়নি।—কোথায় চলেছ গফুর, হাঁক শুনেই সে থমকে দাঁড়ায়। লণ্ঠনটা উঁচুতে তুলে সুদেষ্ণাকে দেখেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—এত রাত অবধি কোথায় ছিলে দিদিমণি? ভেবে ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না। শেষে আর থাকতে না পেরে ছোটদিমণির কথা অগ্রাহ্য করে লণ্ঠন নিয়ে ছুটলুম। তিনি তো কিছুতেই আসতে দেবেন না। বলে কিনা আমি খামোকা অস্থির হচ্ছি। বড়দিমণির অনিষ্ট করতে পারে এ তল্লাটে এমন কেউ নেই।

—তা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। আমার অনিষ্ট কে করবে বলো? আমি তো কারো ক্ষতি করি না। থাক ওসব কথা। রাত্রি বেশী হয়নি, সবে ন'টা।

ডাকবাংলোতে ফিরে আসতেই দেবযানী হেসে গফুরকে জিজ্ঞাসা করে—কি গফুর ভাই, যা বলেছিলুম তা মিলে গেল তো?

—হাঁ, তোমার কথাই বড়দিমণি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললেন। কিন্তু তোমাকে কি করে বোঝাই দিদি, যে, মন অস্থির হলে চুপ করে বসে থাকা যায় না—অন্তত মরদরা তা পারে না। যাক, তোমরা তৈরি হও, আমি শহবকে খানা টেবিল গোছগাছ করতে পাঠাচ্ছি।

গফুর চলে যেতেই সুদেষ্ণা দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করে—এবার তোর খবর বল।

—বলবার মতো তো কিছু নেই দিদি। সন্ধ্যা পর্যন্ত যতক্ষণ অবধি দৃষ্টি চলে টিলার চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখেছি। সন্দেহ জনক কিছুই নজরে পড়েনি। কেবল দু'একজন কাঠুরিয়া বাঁকে করে কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ধরেছে।

—আচ্ছা যা, খানা দিলে ডাকিস। কথা শেষ করে সুদেষ্ণা স্নানের ঘরে ঢোকে। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রসাধন সেরে একটা চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা কোলে নিয়ে সেটা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলিটি বের করে আনে। দলা পাকানো কাগজ সুতো দিয়ে জড়িয়ে মাদুলিব মতো করা। সুতো ছাড়িয়ে কাগজের ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর মেলে ধরে। সাধারণ একখণ্ড সাদা কাগজ আপাত দৃষ্টিতে পড়বার মত কিছু নেই। কাগজটা হাতে নিয়ে টেবিল ল্যাম্পটার চিমনির কাছে ধরে। এমনি সময় দেবযানীর ডাক শোনা যায়—দিদি খেতে এসো।

—তুই গিয়ে বোস। আমি আসছি, বলেই সুদেষ্ণা পুনরায় কাগজটা ব্যাগের ভেতর রেখে খানা কামরার দিকে পা বাড়ায়। খাবার টেবিলে কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয় না। সুদেষ্ণার গম্ভীর আননে চিন্তার সুস্পষ্ট বলি রেখা। আজ সারাদিন যা ঘটেছে তা আগামীদিনের কিসের ইংগিত! মাদুলির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সব কিছু অজ্ঞাত অস্পষ্ট। সুদেষ্ণা একবার গফুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলো তার বিবি কেমন আছে—ডাক্তার দেখিয়েছে কিনা। গফুর পরিবেশনে ব্যস্ত, উত্তর দেবার ফুরসৎ পায়নি। শুধু—হ্যাঁ, বলে রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেছে।

খাওয়া-দাওয়াব পব সুদেষ্ণা ও দেবযানী ড্রয়িংরুমে বসে। কথা প্রসঙ্গে দেবযানীকে কি একটা বলতে গিয়ে সুদেষ্ণা বাধা পেল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে গফুর হাজির। চায়ের বদলে ওভালটিন দেখে উভয়েই খুশী। ওভালটিন পরিবেশনের পর গফুর হেঁট মুখে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

সুদেষ্ণা গফুরের মুখের দিকে চেয়ে কারণ বুঝতে পেরে হেসে বলে—রান্না-বান্না উত্তম হয়েছে গফুর। বাবুর্চি তোমার চেয়ে কিছু ভাল রাঁধে না। গফুরের মুখে হাসি হাসি ভাব—রান্নার প্রশংসাতে খুশী। তাকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুদেষ্ণা জানায় আর কিছুর দরকার নেই। বাড়ি যেতে চাইলে যেতে পার—ভয়ের কিছু নেই। তবে শহরকে রেখে যাবে—যদি রেতেবিরেতে কিছুর দরকার হয়।

—না দিদিমণি, সেটি হবে না। রেতে ডাকবাংলো ছেড়ে যাওয়া কড়া বারণ। বিশেষ করে আসগর কিংবা কাশেম যখন নেই। তার উপর শুনলুম ওদিকে আবার এক হৈ হৈ রৈ-বৈ কাণ্ড—বুড়ো বটের থানে নাকি সাধু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। সকাল থেকেই জনমনিষ্যির সে কি ভিড়, হৈ হুল্লোর—এলাহী কাণ্ড! মেলা বসে গেছে—যেন একেবারে কাতলা-মারীর হাজি পীরের মেলা! সঙ্গে সঙ্গে চোর ছেঁচ্চোর, গুণ্ডা বদমাসেরও নিশ্চয় আমদানি ঘটেছে। শেষকালে এখানে যদি কোন চুরি-চামারি ঘটে—বলা তো যায় না—এ গরীবের সর্বনাশ হবে। তবে আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন কাজকর্ম শেষ করে একবারটি বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো।

—আচ্ছা তুমি যাও। আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই। শহরকে দিয়ে শোবার ঘরে এক জাগ জল ও গেলাস পাঠিয়ে দিও।

গফুর চলে যেতেই সুদেষ্ণা বললে—এবার ওঠা যাক, রাত্রি অনেক হয়েছে। দেবযানী বাধা দিয়ে বললে—দিদি, তখন আমার নিকট যেন কি জানতে চাইছিলে। গফুর এসে পড়ল বলে আর মুখ খুললে না। সুদেষ্ণা ভ্রু কুঁচকে স্মরণ করবার চেষ্টা করে। পরক্ষণেই উত্তর দেয়—ও হাঁ, তেমন কিছু নয়। আমাদের জনসংযোগ রক্ষাকারী সেবা দলের অনুতোষকে তো চিনিস। ওর ডান কানের নিচে গালের ওপর একটা ছোট্ট কালো জড়ুল আছে না!

বিষয়টা এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে অনুতোষের নাম শোনা মাত্রই দেবযানী থতমত খেয়ে যায়। তার হৃদয়ে যুগপৎ শংকা ও শিহরণ জাগে। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠে। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে—কি বললে তিল? ওঃ হাঁ, মনে হচ্ছে যেন আছে। পর মুহূর্তেই তার কণ্ঠ থেকে এক অসাবধানী প্রশ্ন বেরিয়ে

গেল—কিন্তু কেন বলো তো দিদি? এতো শুধু প্রশ্ন নয়—এর মধ্যে যেন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা লুকায়িত।

সুদেষ্ণা দেবযানীর কণ্ঠস্বর ও পাল্টা প্রশ্নে বিস্মিত। তা চেপে গিয়ে জবাব দিলে—আগেই তো বলেছি—ও কিছু নয়। হঠাৎ তাকে মনে পড়লো। তাই বললাম। তারপর একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—তাতে তোর নার্ভাস হবার কি আছে! যা, এখন শুতে যা। আগামীকাল হাতে অনেক কাজ, অনেক খাটুনি—এমন কি রাত্রে বিশ্রাম না-ও জুটতে পারে। অবশেষ পরিবেশটা হাল্কা করবার উদ্দেশ্যেই বুঝি স্মিত-কণ্ঠে বললে—কাল সকালে চায়ের পেয়ালায় প্রোগ্রামের তুফান উঠবে, বুঝলি! নে, এখন উঠে পর। সুদেষ্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের দিকে চলে যায়।

দেবযানী গভীর চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে শোয়ার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। সুদেষ্ণার ঐ এক প্রশ্ন যেন শত প্রশ্ন বাণে রূপান্তরিত হয়ে অনুক্ষণ তাকে বিদ্ধ করছে। হঠাৎ অনুতোষ সম্পর্কে দিদির এই অদ্ভুত প্রশ্ন কেন! তবে কি তার কোন বিপদ ঘটেছে, নাকি কোন দুঃসাহসিক অভিযানে সে লিপ্ত—মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত ও অবধারিত! কিংবা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত! ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো। দুরু দুরু বক্ষে সে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চক্ষু বুজে পড়ে রইল। ঘুম এলো না। চোখ জ্বালা করছে। বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ ফিরে ছটফট করছে। একবার ইচ্ছা হলো লজ্জা ভয় ছেড়ে, সব বাধা তুচ্ছ করে দৌড়ে গিয়ে সুদেষ্ণার নিকট বিষয়টা স্পষ্ট করে জেনে নেয়। কিন্তু সে যে বড় লজ্জা, অধিকন্তু বে-আইনি! দলীয় বিধি নিষেধের অক্টোপাশে তারা আবদ্ধ। দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ বিদ্রোহের সামিল। সে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। তার জন্য যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে তা অতীতের এক বিষন্ন বিষাদ সন্ধ্যায় কোনো এক চরম মুহূর্তে তার নিকট ব্যক্ত হয়েছিল। বর্তমান ভুলে দেবযানী ঝিল্লি-রব মুখর নিশুতি রাতে বিগত দিনের সুখ দুঃখ বিজরিত স্মৃতির অরণ্যে বিচরণ করতে থাকে ঃ

বেশী দিনের কথা নয়, অথচ মনে হয় বহু যুগ পেরিয়ে এসেছে। সে-দিনের স্মৃতি-বিজড়িত ঘটনাবলী স্মরণে এলে হৃদয় উদ্বেগে উদ্বেল আর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

শহরে সংক্রামক ব্যাধির আকারে টাইফয়েড দেখা দিয়েছে। নগর বাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত। সেকালে এ রোগ ছিল ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো।

সত্যিকারের কোন প্রতিষেধক ছিল না বলেই জন সাধারণ নিতান্ত অসহায়ের মতোই এ রোগের শিকার হতো। দীর্ঘস্থায়ী যত্ন-সেবা শুশ্রূষাই ছিল রোগ নিরাময়ের প্রধান উপায় আর তৎসহ অন্যান্য উপসর্গ দমনের জন্য যৎসামান্য ওষুধের ব্যবহার।

লোকের দুঃখ দারিদ্র্য নিবারণ, ত্রাণ এবং রোগ-সেবা এই তিন মহৎ কর্ম সাধনে তখন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল নানা ধর্মীয় ও আশ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক সংস্থা এবং বিপ্লবী সেবাদলের। ঐ সকল সেবা সংঘ, প্রতিষ্ঠান ও দলের ভাণ্ডার তখন সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্তের প্রদত্ত মুষ্টিভিক্ষা ও দানে ভরে উঠতো। আশ্রমিকদের বসবাস ছিল কুটিরে। জীবনযাত্রার মান ছিল অতি সাধারণ গরীবী চালে--বিদুরের ন্যায় খুদান্ন গ্রহণে। আজকালের মতো দেশী বিদেশী ধনী আর সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা কিংবা দানে তাদের ধনকোষ উপচে পড়তো না আর তাক লাগানো পেল্লায় পেল্লায় সুরম্য অট্টালিকার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বাছাই করা ধনীব দুলাল পরিবৃত হয়ে পলান্ন পরিপাকান্তে কালচাব উদ্গারণ করতেন না।

শহরের পাড়ায় পাড়ায় নানা সেবা প্রতিষ্ঠান রোগীদের তত্ত্বতালাস এবং সেবা শুশ্রূষার ভারগ্রহণ করলো। দেবযানীদের পাড়াব ভার নিলো বিপ্লবী সবাদল। পাড়ায় তখন ইতস্তত দু'এক ঘরে এ রোগের আক্রমণ হলেও মাবাত্মক রূপে দেখা দেয়নি। হঠাৎ দেবযানীদের পাশেব বাড়ী গিন্নী এবং তার ছোট ছেলে এ রোগে আক্রান্ত হলো এবং মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে রোগের কবলে উভয়ে গতাসু হলো। পাড়ায় মহা ভীতির সঞ্চার হলো। সকলে সন্ত্রস্ত ও শংকিত।

একদিন বিকেলে কলেজ থেকে এসে দেখে মামাতো ভাই সুদেব স্কুল থেকে ফিরে শয্যা নিয়েছে। অবিরাম জ্বরের সঙ্গে নানা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার এলেন, দেখে রায় দিলেন টাইফয়েড, এবং অত্যন্ত খারাপ রকমের। খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মামা মামীর মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে তারা দিশে হারা। পিতৃমাতৃ হীন দেবযানী মামা মামীর আশ্রয়েই লালিত পালিত। তাঁরাই তার সব। দেবযানী মামা মামীদের অভয় দিলে। কলেজ কামাই করে নিজের চেয়েও প্রিয় ভাইয়ের সেবা শুশ্রূষার ভার আপন হাতে তুলে নিলে। মামা মামীর অত করে বলা সত্ত্বেও সেবা দলকে সে ডাকতে দিল না।

তার ঐকান্তিক যত্নে আর অপরিসীম পরিশ্রমে ভাইয়ের যম দুয়ারে কাঁটা পড়লো। পাড়ার সকলে হতবাক! মামা মামী হাঁটুগেড়ে গৃহ দেবতার নিকট উভয়ের কল্যাণ প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু সুদেবকে ভাত পথ্য দেবার পূর্বেই এক সন্ধ্যায় দেবযানী শয্যা নিলে। সারাদিন শরীরটাকে অতিকষ্টে—পাছে মামা-মামী চিন্তিত হয়ে পড়েন এই ভয়ে—কোনরকম করে দাঁড় করিয়ে রাখে। বেলা শেষে আর পারলে না। অপরিসীম ক্লান্তিতে তার চক্ষু বুজে এলো। মামী ভাবলেন এতদিনের একটানা পরিশ্রমে মেয়েটা এতটুকু হয়ে গেছে। আহা অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে—ঘুমোক। ডাকাডাকি করে রাত্রে আর তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালেন না। পরদিন ভোর বেলাও দেবযানীর সাড়া নেই! ব্যাপাবখানা কি! এমন তো ঘটে না। মামী অবাক হলেন। বিছানাব কাছে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। দেবযানী যেন বধির হয়ে গেছে! এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে কোন সাড়া শব্দ নেই! মামী শংকিত হলেন। তাড়াতাড়ি মশারি তুলে গায়ে হাত দিতেই বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মতো হাতটা টেনে আনলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে দেবযানী অচেতন হয়ে পড়ে আছে। মামী চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। মামা ছুটে এলেন। দেবযানীর অবস্থা বুঝে উভয়েই চোখে অন্ধকাব দেখলেন। এখন উপায়! লোকজন সহায় সম্বল বলতে কিছুই নেই। অর্থ সম্বল যৎ সামান্য যা কিছু ছিল সুদেবের চিকিৎসায় পূর্বেই নিঃশেষিত। সরকারী আপিসের এক সাধারণ কেরাণী—কিই বা রুজি রোজগাব! ছেলের জন্য এত দীর্ঘদিন ব্যাপী দিবারাত্র পরিশ্রম চিন্তাভাবনা আর উৎকণ্ঠায় স্বামী স্ত্রী একেবারে অবসন্ন। তার উপর আবার নতুন করে বিপদ উপস্থিত! তা বলে মেয়েটাকে তো মেরে ফেলা যায় না। দেবযানী না থাকলে সুদেবকেই তারা ফিরে পেতো নাকি! মামা ছুটলেন। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন—কয়েকদিন না গেলে সঠিক কিছু বোঝা যাবে না, তবে লক্ষণ ভালো নয়। সাবধানে রাখবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্বরের বিরাম নেই এবং ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে। নিরুপায় মামা সেবাদলের শরণাপন্ন হন। বয়স্কা মেয়ে—বাড়িতে অপরিচিত ছেলে ছোকরাদের আসা যাওয়া মামীর মনঃপুত নয়। কিন্তু মামার পীড়াপীড়িতে মামী একান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দেন।

রোগগ্রস্তা দেবযানীর সেবা শুশ্রূষা উপলক্ষ করেই অনুতোষের এ গৃহে আগমন। নব আষাঢ়ের এক প্রভাতে অনুতোষ সহকারী সহ দেবযানীর সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করে। আকাশ জুড়ে নবীন মেঘের ঘনঘটা—মুহুর্মুহু গুরু গম্ভীর গর্জন আর ধারা বর্ষণের রিম ঝিম ধ্বনি শরীরে এক অজানা অলস পুলক সঞ্চার করে। বিরহী যক্ষের মতোই বুঝি দয়িতার অদর্শন জনিত বেদনায় মন হয় উচাটন। প্রিয়ার অধর লালসায় হৃদয় আকুল! রোমাঞ্চকর আবেশ-বিহ্বল এক মন-কেমন-করা পরিবেশ!

এমন দিনে এমন পরিবেশে অনুতোষ জ্বরের প্রকোপে বিকার-গ্রস্তা রুগ্না আলুলায়িতা দেবযানীকে প্রথম দেখে। সেদিন দলীয় বিধি নিষেধের নিগড়ে নিবদ্ধ সেবাধর্মে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত আদর্শ-চরিত্র যুবক অনুতোষের হৃদয়ে হয়ত কেবলমাত্র করুণারই উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু দিনে দিনে সে করুণা বুঝি আপন অলক্ষিতে মায়া মোহে রূপান্তরিত হয়ে শতবাহু বিস্তার করে অক্টোপাশের মতো তাকে জড়াতে থাকে। একনিষ্ঠ সেবাব্রতী, কট্টর সদাচারী অজ্ঞাতসারে বুঝি ক্রমশঃ মোহাবিষ্ট ও প্রথম রিপুর শরে বিদ্ধ হয়! নিজের নিকট স্বীয় আচার আচরণে ত্রুটী বিচ্যুতি সেবা ধর্মের অনুশাসনের বৈপরীত্য পদে পদে অনুভূত হয়। পরহিতব্রতী ব্রাত্য দোষে দুষ্ট হলো। আপন দুর্বলতা দৃঢ়চিত্তে দমন করে অনুতোষ মানব হৃদয়ের কোমল অনুভূতি—স্নেহ প্রেম ভালবাসা সব কিছু নিঙড়ে দেবযানীর পরিচর্যা করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। এ যেন পার্বতীর জীবনদানে কৃতসংকল্প কঠিন তপশ্চর্যারত এক শঙ্কর! না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দেবযানীর মামা মামী অপরিচিত যুবকের এই অদ্ভুত একনিষ্ঠ অক্লান্ত সেবাপরায়ণতায় একান্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ।

দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর দেবযানী প্রথম যেদিন চক্ষু মেলেছিলো সেদিন সে কি দেখেছিলো তা তার স্মরণে নেই। জন্মান্ধের হঠাৎ দৃষ্টি লাভের মতোই হয়ত অবাক বিস্ময়ে সে শুধু চতুর্দিক নিরীক্ষণ করেছিলো। চার দেয়ালে ঘেরা তার সেদিনকার ছোট্ট পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ কিছুই হয়ত স্নায়ুর দুর্বলতা হেতু গ্রহণ করবার সামর্থ্য ছিলো না। রোগক্লিষ্টা অপরিণতা বয়স্কা কিশোরী তার রোগশয্যা পার্শ্বে অপরিচিত এক যুবকের সেবা শুশ্রূষা শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতো। তার সকৃতজ্ঞ অনুভূতি বুঝি শরৎ প্রভাতে বৃন্তচ্যুত শিউলির মতো আপন অন্তরে

নীরবে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে ঐ সেবাপরায়ণ মূর্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতো।

রোগ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষের সেবা ও যত্নের পরশ দেবযানীর কুমারী হৃদয়ে এক অভাবিত অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগালো। মুদ্রিত চক্ষে সে সারাক্ষণ অনুতোষের দৃষ্টির ছোঁয়া আর তার হৃদয়ের নির্বাক উত্তাপ উপলব্ধি করে। সে উত্তাপে তার দুর্বল হৃদয় ক্ষণেক্ষণে উত্তেজনায় অগ্নিশিখার মতো থরথর করে কেঁপে ওঠে। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে অশ্রুতপূর্ব এক মধুর সুরের ঝঙ্কার লাগে। সে সুরের অনুরণন সে অনুক্ষণ শুনতে পায়। তার নিভৃত অন্তরে সদ্য প্রস্ফুটিত কোমল কমল কলির ওপর যেন অবিরত অলির গুঞ্জরণ শোনা যায়।

এমন এক দুর্বল মুহূর্তে একদিন দেবযানী অনুতোষকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। সেদিনের স্মৃতি দেবযানীর মনে এখনো স্পষ্ট জাগরূক। কানপাতলে এখনো অনুতোষের উত্তর যেন শুনতে পায়। এবং চক্ষু বুজলে তাকে দেখতে পায়।

ধীর গম্ভীর স্বরে অনুতোষ বলেছিলো—তুমি আমার ছোটই হবে দেবযানী। সেজন্য নাম ধরে তুমি বলেই সম্বোধন করলাম। আমার একমাত্র পরিচয় পরহিতে উৎসর্গীকৃত সেবকবৃন্দের এক দীন প্রতিনিধি। এ ভিন্ন আমার আর অন্য পরিচয়ের কি-ই বা প্রয়োজন! বলা শেষে অনুতোষ ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় পাছে এই মুহূর্তে তার দুর্বলতা দেবযানীর চোখে ধরা পড়ে। দেবযানী হতাশায় মুষড়ে পড়ে শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে। অভিমানে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

তারপর যেদিন ডাক্তার এসে রায় দিয়ে গেলেন যে তার জীবনের আর আশঙ্কা নেই সেদিন দেবযানীর অন্তরে অদ্ভুত এক ব্যথা-ভরা বিদায়ের সুর বেজে উঠলো। বেঁচে ওঠার আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে মলিন হয়ে গেল। নিভৃত অলক্ষ্যে কেঁদে কেঁদে উপাধান ভিজিয়ে একান্তভাবে কামনা করেছিলো সে যেন আর সুস্থ হয়ে না ওঠে। অনুতোষের পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হবার পূর্বেই যেন তার জীবন অবসান হয়। হায় নারীর মন! জীবন দেবতা বুঝি সেদিন প্রচ্ছন্নে হেসেছিলেন! দেবযানীর তৎকালীন দুর্বল হৃদয়ের এই করুণ বিলাপ, ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা তার পরবর্তী জীবনের চলার পথের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। তার ধ্যান ধারণা ভিন্নরূপ

পরিগ্রহণ করলো। তার জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক এক করুণ বেদনাময় অশ্রুসজল দৃশ্যে পরিসমাপ্তি ঘটলো।

অবশেষে দুরু দুরু বক্ষে দেবযানী যে-দিনের প্রতীক্ষায় ছিল সেদিন সমুপস্থিত। অনুতোষের বিদায়ক্ষণ আসন্ন। শ্রাবণের এক শেষ বেলায় অনুতোষ বিদায় নিতে দেবযানীর ঘরে এসে দাঁড়ালো। গত দু'দিন অনুতোষ আসেনি। কেননা আগের মতো দেবযানীর আর পরিচর্যার প্রয়োজন নেই। তার আরোগ্য-লাভ-কালীন অবস্থায় ঘন ঘন যাতায়াত কিংবা শয্যা পার্শ্বে অধিকক্ষণ অবস্থান শোভন নয়। ইতিপূর্বে কথাচ্ছলে অনুতোষ দেবযানীকে তার ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের অনুরাগ তো আর খড়ির দাগ নয় যে ইচ্ছা মতো মুছে ফেলে আবার নতুন করে রেখাপাত চলে! বোঝাতে চাইলেও মন বোঝে না। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনুরাগের উত্তাপে হৃদয়ে মান অভিমান, অনুযোগ অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বেদনা-পীড়িত, অভিমানাহত উদ্বেলিত বক্ষে দেবযানী অনুক্ষণ অনুতোষের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তেই দেবযানী তার উপস্থিতি অনুভব করলো তখনি সে পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে চক্ষু মুদে পড়ে রইলো। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, শ্রাবণের কান্না পাওয়া উদাসী সন্ধ্যা! ভিতরে আসন্ন বিদায়ের বিষাদ-ঘন এক নাটকীয় মুহূর্ত। অনুতোষ নির্বাক নিস্পন্দ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে শায়িতা দেবযানীকে অপলক দৃষ্টিতে দেখছে। বিগত দিনের স্মৃতি একের পর এক রূপালী পর্দার মতো হৃদয় পটে ভেসে উঠছে। আশ্চর্য, জীবনে এ যাবৎ সে এরকম কত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেছে! কিন্তু কখনো তো এরূপ চিত্ত-বৈকল্য ঘটেনি! আজ এ কি হলো! অত্যাসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় তার হৃদয় উদ্বেলিত, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, বাকরুদ্ধ!

আর অপেক্ষা কর সমীচীন নয়। স্বীয় দুর্বলতাকে অনুতোষ কঠোর রক্ত চক্ষু দেখিয়ে শাসন করলো। মনকে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে এগিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ালো। গলার স্বর অনেকটা স্বাভাবিক করে জিজ্ঞাসা করলে—দেবযানী কেমন আছ? অতি ছোট্ট এক জিজ্ঞাসা। তার সমুদয় জিজ্ঞাসা বুঝি ঐ ছোট্ট দুটি শব্দেই প্রকাশ পেল। তার না-বলা সব যেন ঐ একটি কথায় বলা হলো।

দেবযানীর সাড়া নেই। হৃদয়ের নিঃস্বতা রিক্ততা সর্বশক্তি দিয়ে চেপে রেখে নিঃসাড়ে পড়ে রইলো। অনুতোষ বিমূঢ় বিহ্বল। এখন সে কি

করবে? দ্বিধা দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত, অনুরাগে অনুরক্ত মনকে বিধি নিষেধের নিগড়ে আর কতক্ষণ বেঁধে রাখা যায়! আপন অজ্ঞাতে কখন যেন তার ডান হাত দেবযানীর ললাট স্পর্শ করলো। অনেক কথাই হয়তো তার বলার ছিল, কিন্তু কিছু বলা হলো না। সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। আপন অন্তরের সমুদয় শক্তি সংহত করে অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে অনুতোষ শুধু ছোট্ট একটি কথাই উচ্চারণ করলে—দেবযানী আমি যাচ্ছি।

হঠাৎ কি যে ঘটে গেলো! দেবযানী দুই হাতে অনুতোষের হাত খানা টেনে নিয়ে আপন চক্ষুর ওপর চেপে ধরলো। বেদনা জর্জরিত হৃদয়ের নির্গলিত তপ্ত অশ্রু অনুতোষের হাত ভিজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দেবযানীর রুগ্ন পাণ্ডুর কপোল বেয়ে টপটপ করে উপাধানে ঝরে পড়লো।

অনুতোষ হতবাক, সমবেদনায় অভিভূত! এতটা তার আশার অতীত। সমস্ত শরীরে মৃদু কম্পন অনুভূত হলো। পুনরায় চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হলো। নিজেকে একান্ত নিরুপায় অসহায় বোধ করলো। আর বুঝি সে নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না। তার সংযমের বাঁধ বুঝি খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে—হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেবযানীই সেবাব্রতী যুবককে তার বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করলো।

অনুতোষের হাত ছেড়ে দিয়ে দেবযানী উঠে বসলো। চক্ষু মুছে একদৃষ্টে অনুতোষের দিকে চেয়ে বললে—যে অপরিসীম ধৈর্যে আর ঐকান্তিক যত্নে সেবা শুশ্রূষা করে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তার তুলনা নেই। আপনার ঋণ জীবনে কখনো পরিশোধ করতে পারবো না। আপনাব নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা আমাকে আপনাদের সেবাদলে ভর্তি করে নেবেন। সেখানে আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে কখনো অন্তরায় সৃষ্টি করবো না। কাঁটা হয়ে দাঁড়াবো না। যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, আপনার সেবা দলকে সাহায্য করতে পারবো এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে নিজেকে গড়ে তুলবো। আমার ঋণের বোঝা লাঘবের এই সুযোগ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না, শুধু এই কথা আমাকে দিন।

প্রথম রিপুর উত্তেজনা অনুতোষের ততক্ষণে প্রশমিত এবং মন ক্লেদ মুক্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অনাবিল কণ্ঠে বললে—এ তুমি কি বলছো দেবযানী? আমার নিকট তোমার কোন 'ঋণ' নেই কিংবা

থাকতে পারে না। সেবা করা আমার ধর্ম—আমি স্বাভাবিক ভাবে সে ধর্মই কেবলমাত্র পালন করেছি। ঋণের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সেবা দলে যোগ দেবার যে ইচ্ছা তুমি ব্যক্ত করলে তাহা খুবই সাধু ও সৎ যদিও তা সম্পূর্ণ তোমার উপরই নির্ভরশীল। নিজেকে উপযুক্ত করে গড়তে পারলে ঐ পথ আপনা থেকেই তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তোমার ইচ্ছা তখন অবশ্যই পূর্ণ হবে।

—কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।

—ইচ্ছা থাকলে সময়ে সব কিছুই জানতে পারবে। নবাগতদের দলে আহ্বানের প্রথম সূত্র অনুতোষের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে কান্না জড়িত কণ্ঠে দেবযানী জিজ্ঞাসা করে—আবার কখন আপনার দেখা পাব! শুধু এই কথাটি বলে যান।

—তা তো সম্ভব নয়—কোনদিন আর দেখা হবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। একটা কথা মনে রেখো দেবযানী—দলের নির্দেশ কিংবা অত্যাবশ্যক কর্ম ব্যতীত অনাত্মীয় নারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, মেলামেশা, এমন কি কথাবার্তা বলাও আমাদের বারণ। এ নিয়ম ভঙ্গে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র নিরাময় হয়ে ওঠ। শুভমস্তু, বলেই অনুতোষ ত্বরিৎ পদে গৃহত্যাগ করে। দুর্বল শরীরে দেবযানী আর সহ্য করতে পারলো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজলো। সমবেদনায় প্রকৃতিরও চোখে শ্রাবণ-বরষা অজস্র ধারায় নেমে এলো।

আচম্বিতে অদূরের পাহাড়ে গহন অরণ্যে বন্য পশুর কান-ফাটা আর্তনাদ গভীর রজনীর নিথর নিস্তব্ধতা ভেঙে দেবযানীর স্মৃতি জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো। ডাকবাংলোর বাইরে ঝিঁঝি পোকার মজলিসে একটানা সুরের তালভঙ্গ ঘটলো। কতগুলি নিশাচর পাখী একসঙ্গে চীৎকার করে থেমে গেল।

দেবযানী বর্তমানে ফিরে এলো।

শিয়রের দিকে টেবিলের বাতিটা নিবিয়ে দেবযানী জোর করে চক্ষু বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে কিন্তু ঘুম আসে না। অনুতোষ সম্পর্কে সুদেষ্ণার হঠাৎ জিজ্ঞাসা সে কিছুতেই অহেতুক বলে ভাবতে পারছে না। শঙ্কাকুল চিত্তে দেবযানী ছটফট করতে থাকে। অতঃপর বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার তপ্ত শ্রান্ত

ভালে শীতল চামর ব্যজন করে। উড়ন্ত চুল সরিয়ে গরাদে মাথাটা ঠেকাতেই নজরে পড়ে সুদেষ্ণার ঘরে তখনও বাতি জ্বলছে। অদ্ভুত চরিত্র—ক্লান্তি বলে যেন কিছু নেই! বজ্রের মতো কঠোর আবার তৃণের মতো কোমল! দিদির জন্য কেমন যেন তার মায়া হয়, সহানুভূতি জাগে। রাত্রি তখন কত অনুমান করবার জন্য দেবযানী বাইরের দিকে তাকায়। ঘন তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনী। ঝোপে ঝাড়ে গাছের মাথায় জোনাকিরা সব মেলা বসিয়েছে—যেন অসংখ্য ফুল-ঝুরি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি করছে! শরতের নির্মল আকাশে শতকোটি যোজন উর্ধ্বে ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি যেন অনিমেষ নয়নে তার বিনিদ্র চোখের পানে তাকিয়ে আছে। তার হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার স্পর্শে সহানুভূতিতে কম্পিত বিগলিত ঐ নির্মল উজ্জ্বল ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের করুণা বুঝি ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নীরবে ধরিত্রীর বুকে ঝরে পড়ছে! দেবযানী আর তাকাতে পারছে না। চক্ষু জ্বালা করছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে বারান্দায় পড়া মাত্রই দেবযানী সচকিত হলো। সুদেষ্ণা দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। তার ডান হাতে টর্চ। বারান্দার শেষ প্রান্তে পৌঁছে বাঁ হাত থেকে কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর টর্চ জ্বেলে বাগানে কি দেখলে। অদূরে কোন বৃক্ষ থেকে পেচকের তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। অতঃপর সুদেষ্ণা টর্চ ঘুরিয়ে বারান্দায় ফেলতেই দেবযানী ঘাবড়ে গেল। যদি দিদি তার জানালার ধারে এসে তাকে খোঁজে! ভয়ে ভয়ে দেবযানী বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। অনেকক্ষণ চক্ষু কর্ণ সজাগ রেখে পড়ে রইলো। না দিদি এলেন না। এতক্ষণ যার কথা ভেবেছে তার ভাবনা আবার ফিরে এলো। তার মুখ আর অতীতের তিক্ত মধুর স্মৃতি-ভরা ঘটনাগুলো মনের মণিকোঠা থেকে পরপর ভেসে উঠলো তার বোজা চোখের অন্ধকারে।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস গত হয় তবুও সেদিনের বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যার সুখ স্পর্শ দেবযানী ভুলতে পারে না। স্মরণ মাত্রই তার হৃদয়ে এক অজানা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, শরীরে পুলকের শিহরণ লাগে। কলেজে যাতায়াত পথে দেবযানী উৎকর্ণ উচ্চকিত হয়ে থাকে—এই বুঝি বা পথের বাঁকে তার দেখা পেলো কিম্বা কেউ তাকে নাম ধরে ডাকলো। না, প্রত্যাশিত তেমন কিছু ঘটে না। প্রতিদিন সকালের যে

আশা নিয়ে তার যাত্রা শুরু হয় অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে নিরাশায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এভাবেই তার সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা বিফলে যায়। অভিমানে আহত দেবযানী অনুতোষের স্মৃতি ভুলতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এতদিনের তিলেতিলে গড়া তার অন্তরের মোহনীড় ভাঙতে গেলে হৃদয় ব্যথায় টন টন করে।

এই একঘেয়ে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দেবযানী যখন ক্ষত বিক্ষত তখন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক চৈত্র দিনের গুমোট গরমে পৃথিবী ধুঁকছে। অপরাহ্ণ বেলা, ঈশান কোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিয়েছে। দেবযানী কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছে। দেখতে দেখতে ঐ মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রবল প্রভঞ্জন—দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে কুণ্ডলীকৃত কালো কালো দৈত্যাকৃতি মেঘগুলো যেন দাপাদাপি জড়াজড়ি করে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। সঙ্গে খড়কুটো, ধুলোবালি, ডালপাতা সব উড়িয়ে নিচ্ছে। লাল মাটির ধুলোর আবরণ ঘন কুয়াশার মতো চতুর্দিক ঢেকে দিয়েছে। সম্মুখে আশেপাশে দৃষ্টি চলে না—অগ্রসর হওয়া দায়। অতিকষ্টে খানিকটা এগিয়ে দেবযানী রাস্তার ধারে টিলাটাব আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। আশেপাশে কেউ নেই। সুদেবের জন্য তার মন উৎকণ্ঠিত। ঝড়ের আগে সে বাড়ি ফিরতে পেরেছে তো? বাড়িতে মামামামী নিশ্চয়ই তাদের জন্য খুব ভাবছেন। দেবযানীর দুশ্চিন্তায় বাধা পড়লো—একটি ছেলে ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। ধুলোর অন্ধকাবে দেবযানী তাকে সুদেব ভেবে ডাকতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে ছেলেটি আরও কাছে ঘেঁষে—তার নাম দেবযানী কিনা জানতে চায়। দেবযানী অবাক হয়ে—হাঁ, বলতেই ছেলেটি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার হাতে একটা বাণ্ডিল গুঁজে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হয়। দেবযানী কিছু বলবার অবকাশ পায় না—বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝড়ের প্রকোপ ক্রমে কমে আসছে। সেই সঙ্গে ধুলোর আস্তরণও পাতলা হচ্ছে। আশা করা সত্ত্বেও বৃষ্টি না হয়ে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষণেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা ফের শুরু হয়েছে। কিন্তু দেবযানী তখনও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। আত্মস্থ হতেই হাতে গুঁজে দেওয়া প্যাকেটটা শক্ত হাতে চেপে ধরে হাঁটতে শুরু করে। বাড়ি যখন পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা।

মামামামীর উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবযানী ঘরে ঢুকে বইপত্র রেখে সুদেবের নাম ধরে ডাকে। সাড়া না পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে মামীকে জিজ্ঞাসা করে। মামী তখন উঠোনের তুলসী মঞ্চে দীপ জ্বেলে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে। দেবযানী নেমে এসে মামীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রণিপাত করে আপন অন্তরের ব্যাকুলতা অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে।

প্রণাম সেরে মামী বললেন—সুদেব তো তুই আসবার কিছু আগে বেরিয়েছে—সুরেশের নিকট কয়েকটা অঙ্ক বুঝে নিতে। তা তুই ওকে ডাকছিলি কেন ?

—এমনিই। ঝড়ের সময় ওর জন্য খুব ভাবনা হচ্ছিল—যদি আমারই মতো কোথাও আটকে পড়ে থাকে।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে। দুরুদুরু বক্ষে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে খুলতে গিয়ে মাথাটা ঝিম ঝিম করে। বহু প্রতীক্ষিত কোন বার্তা বয়ে এনেছে ভেবে হৃদয় যুগপৎ আশা আশংকায় দুলে উঠে। কিন্তু সেটা খুলে হতাশায় ম্রিয়মান—কয়েকখানা বই মাত্র, আর কিছু নেই। তাদের আবার এমন সব নাম যে একমাত্র বিবেকানন্দ ভিন্ন আর কোনো নামের সঙ্গে সে পরিচিত নয়—ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, বিসমার্ক, আইরিশ বিদ্রোহ—ম্যাকস্নুইনি প্রভৃতি অজানা বইগুলি তার মনে কোন দাগ কাটে না বা কৌতূহল উদ্রেক করে না। অনেক আশা নিয়ে দেবযানী প্রত্যেক পুস্তক পুস্তিকার পৃষ্ঠা প্রথম থেকে শেষ অবধি উল্টে দেখে যদি অনুতোষের বিশেষ কোন বার্তা তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বৃথা, কিছুই নেই—এমন কি প্রেরকের নাম ধাম ঠিকানা পর্যন্ত নয়। দেবযানীব বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এগুলি তবে কে পাঠালো ? উদ্দেশ্যই বা কী ? এরূপ নানা জিজ্ঞাসা, নানা প্রশ্ন তার মন ক্ষণে হর্ষে উৎফুল্ল, ক্ষণে বিষাদে মলিন হয়ে উঠে।

সারাদিনের ঘটনা পর্যালোচনার পরে দেবযানী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ঘরের বাইরে তার গতিবিধি নিশ্চয়ই কেউ সতর্ক দৃষ্টিতে অনুসরণ করছে। না হলে এরূপ নাটকীয় ভাবে ঝড় তুফানের মধ্যে তার হাতে বই-এর প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু কে সে ? যে গুপ্তচরের মতো অনুক্ষণ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। সে কি তবে অনুতোষ ? দেবযানী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। যদি তাই হয়, সে কি

ক্ষণেকের জন্তও দেখা দিতে কিংবা কয়েক অক্ষর লিখতে পারে না ? দলের অনুশাসন কি এতই কঠিন—কোন কারণে কি এতটুকু ব্যতিক্রম করা চলে না !

দেবযানী বইগুলোর দিকে চেয়ে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে। কতক্ষণ সে এভাবে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরে পাঁচিলের ধারে বড় আমগাছটা হতে নিশাচর পাখীর কর্কশ কণ্ঠস্বর তাকে সচেতন করে। সুপ্তোত্থিতের মতো শূন্য দৃষ্টি মেলে সে জানালা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির গাছের ফাঁকে ফাঁকে তারা ঝিলমিল দূর আকাশের পানে চেয়ে থাকে। মন অনুভূতিবিহীন—ফাঁকা। চেয়ার ছেড়ে দেবযানী উঠে পড়ে। আপাতত বইগুলো অন্যের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং সেগুলিকে আবার কাগজে মুড়ে বিছানার নিচে রেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দার বালতি থেকে জল নিয়ে চোখে, মুখে মাথায় দিয়ে শান্ত শীতল হবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পাইচারির পর—দূর ছাই, কিছুই ভালো লাগছে না, বলে উঠোন পেরিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির হয়।

মামী তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করে—কিছু চাস ?

—চাইবো আবার কি ? তুমি ওঠো তো মা—বলেই চুপ করে যায়। পরমুহূর্তেই বলে—আমি এ বেলা রান্না করবো। একা একা ভালো লাগছে না। সুদেবটারও পাত্তা নেই। বলি, মামাও বা গেল কোথায় ?

—কেন, তোর মামা তো তুই আসবার পরেই বেরিয়ে গেলেন। বললেন, ক্লাবে জরুরী কাজ আছে, ফিরতে রাত্রি হবে। আমার তো রান্না হয়ে এলো। একা একা ভালো না লাগে তো আমার কাছে এসে বোস। যা, পিঁড়েটা নিয়ে আয়।

দেবযানী চুপ চাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। মামীর কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মামী ঊর্মিলা পেছন ফিরে দেখে দেবযানী নেই। অবাক হয়ে দরজার বাইরে উঠোনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখে। দেবযানী ততক্ষণে উঠোন পেরিয়ে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঊর্মিলা আবার কাজে মন দেয়।

ঘরে ফিরে দেবযানী টেবিল ল্যাম্পটার আলো বাড়িয়ে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে বসে। এলোমেলো চিন্তাভাবনা দূরে সরিয়ে বইতে

মন সংযোগের চেষ্টা করে। বৃথা, কিছুতেই মন বসছে না। অতঃপর পড়ার বইখানা মুড়ে রেখে বিছানার তলা থেকে সদ্য পাওয়া বই-এর বাণ্ডিলটা বের করে আনে। তার মধ্যে থেকে 'বিবেকানন্দ' বইখানা তুলে নিয়ে চোখের সম্মুখে মেলে ধরে। বইটির শুরুতেই লেখা—'মাতৃভূমি ভারত', তারপর 'স্বদেশ সেবা', সবশেষে 'ভাবী ভারত'। পড়তে পড়তে বই-এর লেখা মনে মনে আবৃত্তি করে—এ সীতা সাবিত্রীর দেশ পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায় পৃথিবীর···।

—কী পড়ছো দিদি—বলেই সুদেব দেবযানীর পিছনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ায়।

সুদেবের আকস্মিক আবির্ভাবে দেবযানী অপ্রস্তিভ। বইখানা বন্ধ করে বলে, পড়ছিলাম।

—অমন একমনে কি বই পড়ছিলে? নিশ্চয়ই পাঠ্য পুস্তক নয়। দেখি বলেই সুদেব হাত বাড়ায়।

ক্ষণেকের জন্য দেবযানী ইতস্তত করে—বইখানা দেবে কি দেবে না, কিংবা দেওয়া উচিত কিনা। পরক্ষণেই মন স্থির করে বলে—তোর কি আর এ-বই ভালো লাগবে? স্বামী বিবেকানন্দের লেখা—বুঝতেই পারবি না। আমি পাতা উল্টে দেখছিলাম। আচ্ছা নে, দেখ।

সুদেব বইখানা নিয়ে পাশের চেয়ারে বসে পড়ে। দেবযানী অন্য বইগুলি চোখের আড়ালে রেখে একখানা পাঠ্য বইতে মন সংযোগের চেষ্টা করে।

বইখানা দেখতে দেখতে সুদেব জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা দিদি, বইখানা দেখে মনে হয় যেন সদ্য কেনা হয়েছে—নতুনের গন্ধ লেগে আছে—কোন দাগ নেই, এমন কি হাতের আঙুলের ছাপ পর্যন্ত পড়েনি।

দেবযানী মনে মনে ভাইয়ের দৃষ্টি শক্তির প্রশংসা না করে পারে না। কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে—তাই নাকি? কি জানি হয়তো তাই।

—বইখানা কি তুমি কিনে এনেছ? সুদেব আবার প্রশ্ন করে।

দেবযানী বিরক্ত বোধ করে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয়—কি যে বলিস—আমি কিনতে যাব কেন? একজন পড়তে দিলেন। বইখানা ভাল দেখে নিয়ে এলাম। কথাটা বলে ফেলেই সে অস্বস্তি বোধ করে।

পাছে বইখানা কে দিলো, কেন দিলো ইত্যাদি স্বদেবের জেরার কবলে পড়ে তাকে নাজেহাল হতে হয়।

স্বদেব কিন্তু ওদিকেই গেলো না, বরং কণ্ঠে মিনতি মেখে বলে—একটা কথা বলবো দিদি ?

—বল না।

—আগে বলো কথা রাখবে।

—রাখবার মতো হলে অবশ্যই রাখবো। তুই আবার এত ভনিতা শিখলি কবে থেকে রে ?

—তোমার পড়া হয়ে গেলে বইখানা কিন্তু আমাকে পড়তে দিতে হবে। দেখলাম শেখবার মতো অনেক ভালো ভালো কথা এতে আছে।

—দেবযানী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—ওমা, এই কথা, আমি ভাবলাম, না জানি হাতি ঘোড়া কত কি। বেশ, এতো ভালো কথা। আমার পড়া হয়ে গেলেই তোকে দেবো। তারপর একটু শাসনের ভঙ্গীতে বলে,—নে অনেক হয়েছে। এখন পড়তে বোস—বড্ড দেরী করে ফিরছো।

দিদির আশ্বাসে খুশী হয়ে স্বদেব আর কথা বাড়ায় না। বিনা প্রতিবাদে বই নিয়ে বসে।

দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন—কালের চাকা নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে! দেবযানীর বৈচিত্রহীন জীবনের এক একটি দিন বৃন্তচ্যুত পত্রের মতো তার আয়ু থেকে খসে পড়ে বয়োবৃদ্ধি ঘোষণা করছে। তথাপি তার ঈপ্সিতের দর্শনলাভ ঘটে না।

কলেজে বিদ্যাভ্যাসের ফাঁকে অবসর মুহূর্তগুলো দেবযানী ঐ দিনের পাওয়া বইগুলো আগ্রহের সহিত পাঠ করে। কোন কোন বই দু-বার করেও পড়ে। এরূপ স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতা পূর্ণ রচনাবলী এই অপরিণত কিশোরীর মনে যে দুর্জয় ভাবাবেগের সঞ্চার করে তা তার অন্তরের শূন্যস্থানে প্রবল বাতাবরণের সৃষ্টি করে। প্রেমাসক্ত হৃদয়ে ভাব-প্রবণ প্রেরণা মিশে এক অদ্ভুত জারক রসের সৃষ্টি করে তাকে নব বলে বলবতী করে তোলে, তার স্বভাব চরিত্র এক নূতন রূপ ধারণ করে।

চলা ফেরায় আচার আচরণে দেবযানী এখন অনেক মার্জিত ও সপ্রতিভ। তার কথাবার্তা ভাব ও ব্যঞ্জনায় সংযম ও দৃঢ়তা, বেশভূষায়

শালীনতা শুচি শুভ্রতা সুপরিস্ফুট। আপন অজ্ঞাতে তার মধ্যে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। স্বামীজীর সেই অগ্নি মন্ত্র—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত···, তাঁর অভয়বাণী : অভিঃ—নির্ভীক হও; ওঠ জাগো, মাতৃভূমি এই মহাবলী প্রার্থনা করিতেছেন—এক মহৎ শপথ বাক্য পাঠের মতো অহর্নিশ তার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডির অপূর্ব সংগঠন শক্তি, অদ্ভুত কর্মতৎপরতা, ঐকান্তিক সুদৃঢ় আদর্শ-নিষ্ঠার ফলস্বরূপ লম্বার্ডি রণাঙ্গণে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় দেবযানীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে কারান্তরালে টেরেন্স ম্যাকসুইনির ঐতিহাসিক দীর্ঘ অনশনে জীবনাবসান তাকেও কঠিন ইস্পাত দৃঢ় করে তোলে।

মানসিক এত পরিবর্তন সত্ত্বেও দেবযানী বিগত দিনের তার জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে সেই সেবাব্রতী তরুণের একনিষ্ঠ দরদমাখা সেবা পরায়ণতার স্মৃতি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারে না। অবসর মুহূর্তে তার চিন্তায় মনে আনন্দ জাগে, তার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের আশায় মন উন্মুখ হয়ে ওঠে।

এক শনিবার কলেজের কমন রুমে বিদেশ প্রত্যাগত এক বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তৃতা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে মিটিং শেষ না হওয়ায় দেবযানীর কলেজ থেকে বেরোতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। রাস্তাটা ছোট ছোট টিলার গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। দূরে দূরে উঁচু খুঁটির মাথায় টিম টিম করে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বের গাছের শাখা প্রশাখা ও পাতার ছায়াচ্ছন্ন ক্ষীণ আলো রাস্তার অন্ধকার দূর না করে আরো গাঢ় করে তুলেছে। শহরের এ দিকটায় বিরল বসতি হেতু রাস্তায় লোক চলাচল কম। অপ্রত্যাশিত দেরীর জন্য দেবযানী দ্রুত হেঁটে চলেছে। সুমুখেই একটা পুল। নিচে জল নিকাশের নালা। পুলটায় উঠবার মুখে রাস্তার দুদিকে ঘন ঝোপঝাড়। ফলে অন্ধকারটা আরো গভীর। আচম্বিতে পেছন থেকে এসে কেউ একজন তার গা ঘেঁসে বাঁ হাতে বুকের ওপর চেপে রাখা বই-এর মাঝখানে কি একটা গুঁজে দিয়ে ত্বরিৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্ধকারে একটা কালো ছায়া ভিন্ন আর কিছু বোঝা গেল না। লোকটার আশ্চর্য নির্ভুল লক্ষ্য আর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা! দেবযানী ত্রস্ত ও বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার চলার গতি শ্লথ হয়ে যায়। ডান হাত দিয়ে বুকের ওপর গুঁজে দেওয়া জিনিসটা অনুভব করে—এক খণ্ড

কাগজ : হৃদয়ে দ্রুত স্পন্দন আর চিত্তে প্রবল চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। চিরকুট-খানা কি অভিসারের বার্তাবহ না অন্য কিছু। কম্পিত হস্তে সেটা নিয়ে ব্লাউজের মধ্যে রেখে দেবযানী পুনরায় চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। অদ্ভুত অনাস্বাদিত এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা!

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মামীর উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা কানে আসে—এত দেরী হ'লো কেন রে যানী?

—আর বলো কেন, বলে তো গেলাম বেলাবেলি ফিরবো কিন্তু বক্তৃতা শুরু আর শেষ হতে বিলম্ব হলো। হল ঘর থেকে যে একা বেরোব তারও জো ছিল না।

—যা, তাড়াতাড়ি খেতে আয়। বিকেলে তো কিচ্ছু খাসনি। সুদেব তোকে ডাকাডাকি করছিল। দেখ আবার কি হলো। বয়সের সঙ্গে বাহানা বায়না ওর বেড়েই চলেছে।

দেবযানীর গায়ে যেন এক অজানা খুশীর হাওয়া লেগেছে! ঘরে ঢুকেই হালকা সাধু ভাষায় জিজ্ঞাসা করে—ভ্রাতঃ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে কেন স্মরণ করিয়াছ? কি বারতা তব? কিন্তু সুদেবের নিকট থেকে কোন সাড়া আসে না। পা টিপে টিপে পেছনে পৌঁছে দেখে সে একমনে স্বামীজীর বইখানা পড়ছে। আরো একটু এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে বইখানা চেপে ধরে উপদেশের সুরে বলে—এ ভাল কথা নয় ভ্রাতঃ, এখন পাঠাভ্যাসের সময়, তুমি পাঠে অবহেলা করিতেছ!

সুদেব যেন ধরা পড়ে গেছে—এমনি ভাবে মুখখানা কাচুমাচু করে বললে—কেন দিদি, তুমিই তো সেদিন বইখানা দিয়ে বলেছিলে—নে, মনোযোগ দিয়ে পড়িস, ভালো বই। আমি তো পড়ায় অবহেলা করিনা। স্কুলের পড়া হয়ে গেছে—শুধু ইংরেজিটা বাকী—কবিতাটা বুঝতে পারছি না—সেজন্যই তো তোমাকে খুঁজছিলাম।

—আচ্ছা খেয়েদেয়ে এসো বুঝিয়ে দেবোখন—এখন পড়ো। দেবযানী উঠে পড়লো। ব্লাউজের ভেতর থেকে চিরকুটখানা বের করে সন্তর্পণে একটা বই-এর মধ্যে রেখে দিলো তারপর বেশ পরিবর্তন করে হাতমুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে। বইখানা হাতে নিয়ে খুলতে গিয়ে উত্তেজনায় হাতটা কেঁপে উঠে, মন আশা নিরাশায় আন্দোলিত। সুদেবের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে বইটি খুলতেই চিরকুটখানা বেরিয়ে পড়ে। সাদা কাগজে কালো কালিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা, কয়েকটি শব্দ লণ্ঠনের

আলোতে চিকচিক করে উঠে—শনিবার কলেজের পর আখরায় এসো।
ব্যস, সাক্ষর বিহীন একটুকরো কাগজ!

আখরাটা কি বস্তু এবং কোথায় দেবযানীর জানা নেই। যে জন অনুক্ষণ তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে সে জনের কাছ থেকে এবিষয়ে যথাসময়ে যথাযথ নির্দেশ আসবে এটা দেবযানী নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়। আর সে একজন অনুতোষ ভিন্ন কেই বা হবে? কে-ই বা তাকে চেনে জানে, কারই বা তার সম্পর্কে এত গরজ। বিদায় মুহূর্তে অনুতোষের শেষ কথার প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পায়—ইচ্ছা থাকলে কর্মপন্থা আপনা থেকেই আবিষ্কৃত হয়। বিশেষ করে উদ্দেশ্য মহৎ, পন্থা সৎ এবং ভাবনা চিন্তা ঐকান্তিক হলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই তাকে রোধ করতে পারে।

হৃষ্ট চিত্তে দেবযানী পড়তে বসে। সুদেবের কণ্ঠস্বর কানে আসতেই বই থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকায়।

—খেতে যাচ্ছি। চলো।

—যাও, খাবার দিলে আমাকে ডেকো, বলেই দেবযানী আবার পাঠে মন দেয়। কিছুক্ষণ পরেই সুদেবের আহ্বান শুনে বই মুড়ে উঠে পড়ে। হাতের চিরকুট খানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়।

দেবযানী খেতে বসতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন,—তোদের কলেজে কার বক্তৃতা ছিলো রে আজ?

—আমেরিকার সিকাগো রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আগত এক স্বামীজীর। নামটা মনে করতে পারছি না। ওদের সকলের নামের শেষে 'আনন্দ' থাকায় ঘুলিয়ে যায়। তিনি তো এখানে অনেক ক্লাবে, ইস্কুলে বক্তৃতা দিয়েছেন। কি চমৎকার যে বলেন। গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সহজ সরল ইংরাজিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—শাশ্বত ভারতের মর্ম-কথা—সহজ সরল ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকক্ষণ ধরে শুনিয়েছেন। বড় ভালো লাগলো। স্বামীজী দেখতেও তেমনি, শুদ্ধ সাত্ত্বিক চেহারা, ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে।

ভাগ্নীর চিন্তাধারা, অনুভূতি ও স্বামীজীর বর্ণনায় মামা সত্যই প্রীত হন। তাকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যেই বললেন—ভাল করে লেখাপড়া করে সৎ পথে চললে তুমিও একদিন দেশের দশের মধ্যে এরূপ নামী ও দৃষ্টান্তের স্থল হতে পারবে।

—আশীর্বাদ করো মামা তাই যেন হতে পারি।

অনাবিল সহজ সরল কণ্ঠে ভাগ্নীর আশীর্বাদ যাচ্ঞা মামার নিকট অপ্রত্যাশিত। তিনি যুগপৎ উৎফুল্ল ও অভিভূত হলেন। মামী কিন্তু মুখে কিছু না বললেও দেবযানীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে একই সঙ্গে বিস্মিত ও চিন্তিত হন। ভাবলেন কলেজে পড়ছে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু মন বলে—না এতটা—অস্বাভাবিক!

ঘরে ফিরে দেবযানী সুদেবকে জিজ্ঞাসা করে—কি যেন বুঝে নিবি বলেছিলি—নিয়ে আয়। আমার অনেক পড়া বাকী।

সুদেবকে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে দেবযানী আপন পাঠে মনোনিবেশ করে।

প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে উর্মিলা ছেলেমেয়ের ঘরে এসে তদবির তদারক করে। অভ্যাস মতো ঘরে ঢুকে বিছানা পত্র ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে দিয়ে যাবার সময় বললেন—রাত্রি দশটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে—এবার তোমরা শুয়ে পড়ো।

দেবযানী পড়া নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো। উর্মিলা বাধা দিলে—না যানী তোর শরীর এখনো সারেনি। রাত্রি জেগে পড়ার দরকার নেই।

সুদেব টেবিলের বইপত্র সব গুছিয়ে বললে—চলো দিদি। শুয়ে পড়ি।

দেবযানী সুদেবকে বললে—তুই শো'গে যা—আমার একটু দেরী হবে। ইংরেজি কবিতাটা আর একবার পড়তে হবে।

—না দিদি তা হবে না। মা কি বলে গেলো শুনলে তো। কথা না শুনলে মা ভীষণ রাগ করবে।

—আচ্ছা চলো, দেবযানী বাতিটা কমিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরেই সুদেবের ডাক শোনা গেলো—দিদি।

—ওমা, তুই এখনো জেগে আছিস? কেন ডাকছিস?

—স্বামীজীর বই-এর কথা ভাবছিলাম—কিছু লেখা বুঝতে পারছি না—তাই তোমাকে ডাকছি।

—আমিই কি সব বুঝি নাকি? ওসব উচ্চাঙ্গের কথা পড়তে পড়তেই বোধগম্য হয়। তবুও বল শুনি।

—কথাগুলো *শিক্ষা সংক্রান্ত কিনা*—তাই বুঝতে চেষ্টা করছি। যেমন: যদি পর্বত মহম্মদের নিকট নাই আসে তবে মহম্মদকেই পর্বতের

নিকট যাইতে হইবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছতে না পারে তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় পৌঁছে দিতে হবে।

ক্ষণেক চিন্তার পর দেবযানী বলে—মহম্মদ কে ছিলেন জানিস ?

—তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় পয়গম্বর—মুসলমান ধর্মের প্রবর্ত্তক।

—উত্তম, তিনি ছিলেন পয়গম্বর—ঈশ্বর বলো, আল্লাই বলো—তাঁর প্রতিনিধি। অনেক শক্তির আধার। পর্বত হলো আয়তনে বিশাল, স্থাণু ও অচল। সুতরাং এতবড় শক্তিধর পয়গম্বর মহম্মদের আহ্বানে বিশাল পর্বত যদি তাঁব নিকট না আসে তবে স্বকার্য সাধনে তাঁকেই পর্বতের নিকট যেতে হবে। এটা হলো আক্ষরিক অর্থ। অন্তর্নিহিত অর্থে দরিদ্র জনসাধারণকে পর্বত এবং শিক্ষাকে মহম্মদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বুঝলে। আমাদের দেশে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকই শিক্ষা পায়। এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। শিক্ষাকে দরিদ্র জনগণেব নিকট—ক্ষেত মজুব, দিন মজুব, লাঙ্গল কাঁধে কাস্তে হাতে নিয়ে যারা চাষ করছে, শস্য কাটছে, যে মজুর হাতুড়ি পিটিয়ে কারখানায কাজ করছে—সর্বত্র সবার নিকট পৌঁছে দিতে হবে।

—আচ্ছা দিদি, আমাদের দেশের লোক এত গরীব আর অশিক্ষিত কেন বলো তো ? শুনেছি বিলেত টিলেতে নাকি সকলেই শিক্ষিত এবং গরীব বলতে কেউ নেই। ওদেশের মুটে মজুর চাষাভুষো সবাই কোট প্যাণ্ট পরে। আমাদের দেশের লোকের শুধু ছেঁড়া কাপড় আর ছেঁড়া কাঁথা সম্বল! স্কুলে যেতে পুল পেরিয়ে নর্দমাব ধারে ধারে যদি ধোপা, মেথব মজুব আর গাড়োয়ানদের বস্তিগুলি দেখতে তা হলে বুঝতে।

দেবযানী মনে মনে ভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি ও অনুভূতির প্রশংসা না করে পারলো না। দুঃখিত কণ্ঠে বললো—কারণ আমরা যে পরাধীন ভাই! মুকুন্দ দাসের কথা মনে নেই তোর ? যিনি সেবার ইস্কুলের সরস্বতী পূজার মাঠে যাত্রার আসরে কত রকম স্বদেশী গান গাইলেন—আমার সোনার বাংলা—ছেড়ে দে রেশমী চুড়ী বঙ্গ নারী—সব পাগল করা মন মাতানো গান! নিজে কাঁদলেন এবং সবাইকে কাঁদালেন। মামী তো কাঁদতে কাঁদতে কাঁচের চুড়ী খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কেউ কেউ কাঁচের চুড়ীর সঙ্গে সোনার চুড়ীও খুলে দিলেন। আমি আর তুই তো চিৎকার করে কাঁদলাম। চারদিকে সে কি কান্নার রোল!

—কিন্তু দিদি, কান্না, সে তো বড় লজ্জার ব্যাপার। ভীরু দুর্বল এবং অক্ষমরাই তো কান্নাকাটি করে—ঘেন ঘেন পেন পেন করে! সুদেবের কথা শুনে দেবযানী হতবাক। তবুও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলে—তা কেন? দুঃখে, শোকে, যাতনায়, সহানুভূতিতে কত ভাবেই তো কান্না আসে। এতে ভীরুতা দুর্বলতা কোথায়? দেখছিস না, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য সবাই কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে। দিকে দিকে সাড়া জেগেছে—কত আয়োজন, কত রকম আন্দোলন—কেউ করছে অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন অহিংস আন্দোলন—ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগ—ওদের কোর্ট কাচারি, স্কুল কলেজ, বিলেতি কাপড় চোপড়, জিনিষপত্তর—এক কথায় সব কিছু বর্জন বয়কট। আবার কেউ করছে সশস্ত্র বিদ্রোহ বিপ্লব—বোমা, পিস্তল, বন্দুক, তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ।

—বোমা পিস্তল নিয়ে ইংরেজকে আক্রমণের একটা গল্প বলে না দিদি।

—না, আর কথা নয়! মামী কথা শুনতে পেলে উঠে আসবেন। লক্ষ্মী ভাইটি, এখন ঘুমোও। আর একদিন বলবো। দেবযানী চুপ করে গেলো। চক্ষু বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

রাত্রি অনেক হয়েছে। সুদেবের আর সাড়া নেই—নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠানের রান্নাঘরের পাশে বড় জামগাছটার উপর একসঙ্গে কয়েকটা পেঁচা চিৎকার করে ওঠে। দূরে জেলখানার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। ঘুম আসছে না। কেবল এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে এসে ভিড় করছে। আজকের পাওয়া চিরকুটে 'আখড়ার' অর্থ ডিকশনারি দেখে আগেই জেনে নিয়েছে। আশ্চর্য সেটা তো কুস্তি কসরৎ-এর জায়গা—সেখানে যাবার জন্য আহ্বান কেন! তাকে সেবাদলে নিতে সে-ই তো অনুতোষকে অনুরোধ জানিয়েছিল যদিও ঐ সেবাদল সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান সেদিন ছিলো না, এখনও নেই। দেবযানীর সেদিনের এই অনুরোধ কতটা কৃতজ্ঞতা-বোধ-জনিত আর কতটাই বা অনুতোষের সঙ্গ লাভের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রসূত তা বিদায়ের সেই মুহূর্তে ভেবে দেখবার মতো তার মনের অবস্থা ছিলো না।

তারপর বর্ষাশেষে হেমন্তের কুয়াশা কুহেলিকার অবসানে শীতের আড়ষ্টতা বসন্তের প্রাদুর্ভাবে অন্তর্হিত হয়। গাছে গাছে পত্র-পুষ্প শাখে মঞ্জরিত দেখন-হাসি দেবযানীর মনে পুলকের শিহরণ জাগায়, আনন্দ

দোলা দেয়। দিন ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বয়োবৃদ্ধি ও ভাবান্তর ঘটতে থাকে। তার অধীর প্রতীক্ষা কাল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয় তবু ক্ষণেকের তরেও তার আকাঙ্ক্ষিত জনের সাক্ষাৎ মেলে না। যেরূপ আকস্মিক নাটকীয় ভাবে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা পরপর ঘটেছে তাতে বিস্ময়জনক ও রোমাঞ্চকর অনুভূতির সঙ্গে নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয় তার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ কি রকম সেবাদল! এদের গতিবিধি কি সবই লোক লোচনের আড়ালে অন্তরালে! কিন্তু কেন, কি এদের উদ্দেশ্য! এদের কার্যকলাপ যেন বইতে-পড়া বিদেশী গুপ্তদলের অনুরূপ—যাদের সম্বন্ধে তার জ্ঞান অধুনা-লব্ধ এবং সীমিত। তবে কি অনুতোষ কোন গুপ্ত সমিতির সভ্য! তাকেও কি সে শনৈঃ শনৈঃ ঐ দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে?

এই দুটি প্রশ্ন দেবযানীর মনে নানা ভাবনা চিন্তার উদ্রেক করে। এতে অনুতোষেরই বা দোষ কতটুকু? সে নিজে থেকেই তো তাকে তাদের দলে নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। তবে হাঁ, অনুতোষ তাকে সাবধান করতে পারতো, বলতে পারতো—তুমি আমাদের দলে আসতে চেয়ো না, এসো না দেবযানী। এ বিপ্লবী দল—এরা আগুন নিয়ে খেলায় মত্ত—স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ, দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। দেশের শত্রু নিধনে এরা কৃতসংকল্প—বোমা, পিস্তল, বন্দুক নিয়ে এদের কারবার। এরা নির্ভয়ে মারে ও মরে—হাসতে হাসতে ফাঁসীর রজ্জু গলায় মালার মত পরে উৎফুল্ল হয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ইত্যাদি দেশী বিদেশী বীর বিপ্লবী শহীদদের কথা দেবযানীর স্মরণে আসে—মনে পড়ে সেদিন এ শহরেই জেলখানাতে এক অতি অত্যাচারী জুলুমবাজ দারোগাকে খুন করে এক নির্ভীক কিশোর কি ভাবে হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চে উঠে গেল!

নির্জন নিশীথ রাত্রির স্বল্পালোকিত ঘরে দেবযানীর উগ্র চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক প্রসূত গলায় ফাঁসীর রজ্জু-পরা এক অজানা শহীদের মূর্তি বেরিয়ে তার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে—সে ভয়ে চক্ষু বন্ধ করে। পরক্ষণেই তার বোজা চোখের অন্ধকারে জানা অজানা অনেক শহীদ যেন মিছিল করে চলছে! চলতে চলতে তাঁরা দেবযানীকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—এসো এসো—ভয় কি, মা ভৈঃ—আমরা আছি। মৃত্যু জয় করে আমরা কালজয়ী অমরত্ব লাভ করেছি। পরমুহূর্তে তাঁদের গম্ভীর কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি শোনা যায়:—

'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ
প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ।'

এই শাশ্বত বরাভয় বাণী দেবযানীর অন্তরে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনে। তার ডর ভয় ভাবনা চিন্তা সব দূর হয়ে গেল। অনুভব করলো সেও যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক বজ্রকঠিন শহীদে রূপান্তরিত। হঠাৎ পাশের বিছানা থেকে স্বপ্নঘোরে সুদেবের অবোধ্য চাপা কণ্ঠস্বরে তার সম্বিত ফিরে আসে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—না ফিরে যাবার আর কোন পথ নেই।

'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'! বিপ্লবীদের মাকড়সার জালে সে জড়িয়ে পড়েছে! আপন সত্তা স্বীয় অভীষ্ট দেবতার পায়ে বিলিয়ে যুক্ত করে প্রণাম জানিয়ে উচ্চারণ করে

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক
হে করুণাময় স্বামী।"

পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নির্ভয়ে শান্ত সমাহিত চিত্তে দেবযানী নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়।

একের পর এক প্রতীক্ষিত শনিবার গত হচ্ছে। প্রত্যাশিত কিছু ঘটছে না। প্রতি শনিবার দেবযানী বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলেজ পর্যন্ত সারাটা পথ চক্ষুকর্ণ সজাগ রেখেই চলে। ঐ দিনটি কলেজে শেষ পিরিয়ড অবধি ভাল করে ক্লাস করতে পারে না। সর্বক্ষণই উদ্বেগ উত্তেজনা—এই বুঝি কোন সংকেত কিংবা বার্তা এলো! না, প্রতীক্ষিত কিছু ঘটে না। তবে কি তার বোঝার মধ্যে কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে, না কোথাও কোন ব্যতিক্রম ঘটেছে!

অবশেষে এক শনিবার ক্লাশ শেষ হতেই দেবযানী বেরিয়ে পড়ে। কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়েই সে সতর্ক হয়। চক্ষুকর্ণ খোলা রেখে চলতে থাকে। রাস্তার ধারে বড় টিলাটার পাশ কেটে ডাইনে বাঁক নিয়ে কিছুদূর এগোতেই একটা অস্বাভাবিক শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেবযানী একটি ছেলেকে দৌড়ে তার দিকে আসতে দেখে। ইতিপূর্বে অনুরূপ এক ঘটনা মনে পড়তেই তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। হয়ত এই সেই অপেক্ষিত দূত। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি তার সম্মুখে পৌঁছে গতি শ্লথ করে দিয়ে নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে

সমান দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটতে থাকে। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। দেবযানীর মনে হলো সুদেবের বয়সী এই ছেলেটিকে পূর্বে কোথাও দেখেছে কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না। ততক্ষণে দেবযানীও তার খুব কাছে এসে পড়েছে। সেই মুহূর্তে ছেলেটি চতুর্দিক চেয়ে হাত ইশারায় তাকে অনুসরণের ইংগিত দিয়ে ডানদিকের গলি মতো ঢালু রাস্তা দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে যায়। ছেলেটির আচার আচরণে বিস্মিত হলেও দেবযানীর আর বুঝতে বাকী রইলো না যে এই আখড়ার পথ প্রদর্শক। ইতস্তত না করে নির্ভীক চিত্তে সে ছেলেটির অনুগমন করে।

হাড় গোড় বের করা সংকীর্ণ রাস্তা—এখানে ওখানে খোয়া সরে ইট বেরিয়ে প'ড়ছে। কোথাও বা ইট উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত হাঁ করে আছে। রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড় গাছপালা। মাঝে মাঝে লতাপাতার আড়ালে জীর্ণ মেঠো ঘর—লোক চলাচল কম, যেন একেবারে অজ পাড়াগাঁ। শহরের বুকের ওপর যে এরূপ গেঁয়ো পরিবেশ থাকতে পারে তা দেবযানীর জানা ছিলনা। হাঁটতে হাঁটতে নিজের ছোট-বেলাকার গ্রামের চিত্রখানি তার স্মৃতি-পটে ভেসে উঠে। মৃত পিতা মাতাকে মনে পড়ে। বিষণ্ণ চিত্তে দেবযানী একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যায়। গাইড ছেলেটি পিছন ফিরে দেবযানীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত-ইশারায় তাকে অনুসরণ করবার ইংগিত করে। দেবযানী ছেলেটিকে ডাকে। কিন্তু সে সারাক্ষণ এমন দূরত্ব—হয়ত ইচ্ছাকৃত ভাবে—বজায় রেখেছে যে দেবযানীর আহ্বান তার কর্ণকুহরে পৌঁছলো কিনা বোঝা গেল না। বিরক্তি চেপে দেবযানী আবার চলতে শুরু করে।

খানিক দূর যেতেই দেবযানী লক্ষ্য করে তার গাইড রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়া আর সযত্নে পালিত মেহেদি গাছ ঘেরা এক চত্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো তারই জন্য অপেক্ষা করছে। দেবযানী নিকটে আসতেই আদেশের সুরে বললে—একটু তাড়াতাড়ি করুন বড্ড দেরী করিয়ে দিচ্ছেন।

দেবযানী এই প্রথম ছেলেটির গলা শুনতে পায়। বয়স অনুপাতে স্বর গম্ভীর পাকা ও বেশ মুরুব্বীর মতো বলেই মনে হয়। অনুনয়ের সুরে বলে —দাঁড়াও ভাই। এতটা পথ একটানা চলে হাঁপিয়ে পড়েছি।

—না, পথ মোটেই বেশী নয়। তবে হাঁ, আপনি এ পথে নতুন বলেই বেশী মনে হচ্ছে। পরিচয়ে দূরত্ব হ্রাস পায় কিনা।

দেবযানী ছেলেটির সপ্রতিভ জবাবে অবাক। খুশী না হলেও হেসে জিজ্ঞাসা করলে—তোমাকে কি আগে কোথাও দেখেছি ভাই।

—দেখতে পারেন। আমি এ পথ দিয়ে হামেশা যাতায়াত করি। তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে ছেলেটি বলে—আপনি পা চালিয়ে আসুন। বড্ড দেরী হচ্ছে—এদিকে বেলাও পড়ে আসছে। আর কথা না-বাড়িয়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের চেঁচাড়ির দরজাটা খুলে ধরলো। দেবযানী ভেতরে প্রবেশ করতেই সেটা পুনঃ বন্ধ করে দিয়ে চলতে থাকে।

ভেতরে ঢুকে চতুর্দিকে চেয়ে দেবযানী অবাক হয়ে যায়। মেহদি ও অন্যান্য গাছপালার আড়াল হেতু ভেতরে কি আছে তা রাস্তা থেকে বোঝা দুষ্কর। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সযত্নে রোপিত ও পালিত নানা ফল ফুলের গাছ, শাক সব্জীর বাগান আর দূরে দূরে অবস্থিত একই ঢং-এর ছোট বড় চালাঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সম্মুখে আবার ছোট্ট ঘেরা জায়গায় নানা রকম ফুলের বাগান। দেবযানী কোনদিন আশ্রম দেখেনি। মনে হলো বইতে পড়া বর্ণনার সঙ্গে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে। সর্বত্রই শ্রীমণ্ডিত রুচি ও শৃঙ্খলাবোধ সুপরিস্ফুট—নির্জন, শান্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গম্ভীর নয়ন মুগ্ধকর এক পরিবেশ! কিছু দূর যেতেই একটা বড় পুকুর—পুকুর না বলে দীঘি বলাই সঙ্গত। উত্তর দক্ষিণ উভয় পাড়েই শান বাঁধানো ঘাটলা। উত্তর ধারে একটু দূরে বড় বড় দুটো দোচালা ঘর। প্রথম ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেবযানী অবাক হয়ে দেখে ঘরের মধ্যে অনেক এবং বাইরে খোলা যায়গায় কিছু ছেলে নানা রকম অদ্ভুত প্রণালীতে ব্যায়ামাভ্যাস করছে। দ্বিতীয় ঘরটার নিচের অর্ধেক চাঁচাড়ি দিয়ে ঘেরা। ভেতরে কি হচ্ছে তা দূর থেকে বোঝা না গেলেও দেবযানী অনুমান করলো যে ভেতরে ব্যায়ামাদির চর্চাই চলেছে। ডান দিকে আম, জাম, কাঁঠাল, বকুল, চাঁপা, কিংশুক ইত্যাদি নানা বৃক্ষ শোভিত একটি উপবন। দেখলে মনে হয় প্রতিটি বৃক্ষ সযত্নে রোপিত লালিত ও বর্ধিত—ঘন সবুজের মেলা। যতই দেখছে দেবযানীর বিস্ময় ততই বেড়ে যাচ্ছে। বাগানের মধ্যে আরও কিছুটা এগোতেই গাছের নিচে পর পর কয়েকটি ছোট ছোট কুটির তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাইড প্রথম কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবযানীকে ইশারায় ডেকে ঘরে ঢুকে যায়।

দেবযানী কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছে। এমনি সময় এক বলিষ্ঠকায় সৌম্যদর্শন পুরুষ কুটির থেকে বেরিয়ে—

এসো দিদি, বলে হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। দেবযানী এতটা সহৃদয় সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। অপরিচিত এই সদাশয় ব্যক্তির স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর, অতি আপনজনের মতো আচার আচরণ ও কথাবার্তা তাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। তাঁর পরিধানে গেরুয়া বহির্বাস, গায়ে ফতুয়া আর মাথার চুল কাঁধ অবধি বিস্তৃত। দেখা মাত্রই হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধায় ভরে গেল, মাথা নত করে পায়ে পড়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু লজ্জা এসে তাকে ঘিরে ধরে। দেবযানী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—বসো দিদি, বসো। আমি এক্ষুনি আসছি, বলেই গাইড ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান।

এতোক্ষণে দেবযানী কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। ঔৎসুক্যের সহিত ঘরের ভেতরটা দেখছে—আসবাব পত্র বলতে একটা ছোট্ট টেবিল, খানকয়েক চেয়ার আর গোটা তিনেক আলমারি। ঘরের পরিধি ছোট হওয়ার দরুণ একে অন্যের গা ঘেঁষে যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। আলমারিগুলির প্রথমটার মধ্যে রয়েছে কেবল বই আর খাতাপত্র। দ্বিতীয়টার মধ্যে নানারকম ওষুধের শিশি বোতল আর তৃতীয়টার মধ্যে হরেকরকম কাঁচ, চীনে মাটি, এনামেলের পাত্র, ছুঁরি, কাঁচি, রবারের লম্বা নল ইত্যাদি। ঘরের মধ্যে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধি প্রভৃতির প্রতিকৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলায় সুন্দর বড় বড় অক্ষরে সাদা তুলট কাগজে লেখা বাছাই করা শ্লোক ও মহাপুরুষের বাণী:—ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত: প্রাপ্যবরান্নিবোধত:, মাভৈ:, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইত্যাদি টাঙানো।

—দেরী করে ফেললাম না তো দিদি, বলেই একটু আগে যিনি গাইড ছেলেটিকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই ফিরে এলেন।

দেবযানী সলজ্জ কণ্ঠে বলে—না, আপনি এই তো গেলেন।

চলো তোমাকে আমাদের আখড়ার কিছুটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। বেলা শেষ হয়ে আসছে, দেরী করে বাড়ি ফিরলে হয়তো মামী রাগ করবেন।

এবার দেবযানীর অবাক হবার পালা। মনে মনে ভাবলে ইনি তো দেখছি আমার ইষ্টিগোষ্ঠীর খবর জানেন। মুখে বললে—মামী আমাকে খুব ভালোবাসেন কিনা।

—উত্তম, এবার চলো। গুরখাকে বলেছি আমিই তোমাকে বড় রাস্তা অবধি পৌঁছে দেবো। হাঁ, আর একটা কথা তোমার জেনে রাখা ভালো—এখানের সকলে আমাকে মহারাজ নামে সম্বোধন করে।

গুরখার নামোল্লেখে দেবযানী অনুমান করে যে এ নাম ঐ ছেলেটির যে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে—অদ্ভুত নাম তো।

দেবযানীকে এখানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে মহারাজ বললেন—ঐ যে ছোট্ট চালাঘর দেখছো ওটা আমার ডেরা। তার কিছুদূরে গাছগুলির আড়ালে বড় ঘরটি হলো বিদ্যালয়। ওখ'নে নানা রকম ক্লাশ বসে, হাতে কলমে ফার্স্ট এইড শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের মিটিং-এর জায়গাও ওখানে। ডান দিকে মোড় ঘুরতেই দেখা গেল গাছে ঘেরা একটা খোলা চত্বরে কয়েকটি মেয়ে ছোরা খেলা শিখছে। পাশেই আর এক জায়গায় লাঠি খেলার মহরা চলছে। দেবযানী দাঁড়িয়ে পড়তে মহারাজও থেমে যান। একটি মেয়ে একা এক জায়গায় লাঠি ভাঁজছিলো। মহারাজ তার কাছে গিয়ে বললেন—ঠিক হচ্ছে না দীপ্তি। মেয়েটির হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে কি ভাবে দাঁড়াতে হবে, কোন পা আগে এবং কোন পা পিছে থাকবে। কি ভাবে লাঠি ধরতে ও ঘোরাতে হবে—সব কায়দা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর কি ভাবে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করার জন্য এগোতে হবে এবং নিজেকেও রক্ষা করতে হবে তাও তিনি তিন চক্কর ঘুরে হাতে কলমে বুঝিয়ে দিলেন। কি অদ্ভুত তেজোদ্দীপ্ত কঠিন ভাবভঙ্গী আর ক্ষিপ্রতা! কদম কদম পা ফেলে চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে আর মাঝে মাঝে লম্ফ দিয়ে যখন লাঠি ঘোরাচ্ছিলেন তখন আর সেটাকে লাঠি বলেই বোঝা যাচ্ছিল না। যেন একটা সুবৃহৎ চক্র বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দেবযানী বিস্ফারিত, চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। লাঠি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ যেন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করলেন। একটু আগের দেখা মানুষটির সঙ্গে লাঠিয়ালের কোন মিল নেই! মাঝে মাঝে উল্লম্ফনের সঙ্গে যখন স্কন্ধ বিলম্বিত কেশ রাশি ছড়িয়ে পড়ে মুখ চোখ ঢেকে দিচ্ছিলো তখন মনে হচ্ছিলো ভীষণ দর্শন এক ক্রুদ্ধ বৃকোদর ঘূর্ণিত গদা-হস্তে শত্রু নিধনে উদ্যত। দেবযানী শিউরে উঠে চক্ষু বন্ধ করে।

দীপ্তির হাতে লাঠি ফিরিয়ে দিয়ে মহারাজ দেবযানীর কাছে এসে

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—কি দিদি, ভয় পেলে নাকি? আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটির নাম অমৃতকানন। পুরাকালে মুনি ঋষিদের লোকালয় থেকে দূরে, গভীর অরণ্যে যোগ-সাধনা ধর্মচর্চা ও আরাধনার মতো আমরাও এই উপবনের গভীরে শরীর-চর্চা, শক্তি সাধনা ও আরাধনা করছি। এর সঙ্গে যোগাভ্যাসও যে না হয় তা ভেবো না। 'অমৃতস্তঃ পুত্রাঃ'—অমৃতের পুত্র মানুষ। তাকে অমৃত আহরণ করে অমিত বলশালী হতে হবে। দেবাসুরের যুদ্ধ চলেছে। প্রাচীন যুগে দেবতারা হীনবল, বীর্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত আহরণ করে দেবতারা বলশালী হয়ে অসুরদের পরাভূত করলেন। একালের দেবতাদের ব্যায়ামাভ্যাস যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর মন্থন করে অমৃত পানান্তে শৌর্যশালী, বীর্যবান ও তেজোময় হয়ে দানবকুলের মোকাবেলা করতে হবে। আমার কথার অর্থ এখানে যাতায়াত করলেই বুঝতে পারবে।

আরো অগ্রসর হতে দেখা গেলো মেয়েদের মতো ছেলেরাও এদিকে দলে দলে ছোরা খেলছে আর লাঠি ভাঁজছে। এক জায়গায় আবার কুস্তীও চলেছে, ওপরে একটা একচালা খড়ের ছাউনি। কানন থেকে বেরিয়ে এসে মহারাজ প্রথম ব্যায়াম ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। সেখানে তেপায়ার ওপর একটা ব্ল্যাক বোর্ড এবং তার ওপর খড়ি দিয়ে মিটিং-এর বিষয়, দিনক্ষণ, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি লেখা রয়েছে।

—চলো এবার তোমাকে মেয়েদের ব্যায়াম ঘরটা দেখিয়ে দি। মহারাজ অর্ধাবৃত ঘরটার দিকে অগ্রসর হন। কৌতূহলী দেবযানী দেখলে মেয়েদের ব্যায়াম ঘর ছেলেদেরই অনুরূপ তবে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। গুটি কয়েক মেয়ে নানা রকম শরীর চর্চায় ব্যস্ত—সকলেরই সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা।

—আজ আর নয় দিদি। এখানে অনেক কিছু দেখবার ও বুঝবার আছে—চলো বড় রাস্তা অবধি তোমাকে এগিয়ে দি।

যেতে যেতে দেবযানী লক্ষ্য করলো যে গুর্খা তাকে যে রাস্তা দিয়ে এনেছিলো এ সে রাস্তা নয়। পুকুর বাঁয়ে রেখে মাঠ বরাবর মেঠো পথ ধরে তারা যাচ্ছে। মাঠ পেরিয়ে তারা একটা বস্তিতে ঢুকলো। বড় বড় গোয়াল ঘর এবং ছোট ছোট চালা ঘর—গরু বাছুর লোকজনে ভর্তি। মহারাজকে দেখে সকলেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালো। বস্তির পরে অনেক-

খানি জায়গা জুড়ে কলা, পেয়ারা জামরুল সরবতি লেবু ইত্যাদি নানা ফলের বাগান। বাগানের মাঝ দিয়ে পায়ে হাঁটবার সরু একফালি রাস্তা। বাইরের দিকটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের এক জায়গায় ছোট্ট একটু দরজা একজন অতিকষ্টে কাঁত হয়ে যেতে পারে। এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে তারা ছোট একটা গলির মধ্যে পড়ে। মহারাজ হঠাৎ বললেন—এখানের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য দেখলে তো? তোমাকেও তাদের মতো স্বাস্থ্যবতী হতে হবে। শরীর অসুস্থ বলহীন হলে মনও রুগ্ন নির্জীব হয়ে পড়ে, অলসতা এসে গ্রাস করে। তখন শরীরে ও মনে শয়তান আর কুমতি কুরুচি এসে বাসা বাঁধে শরীর সুস্থ হলে মনও সুস্থ সবল সতেজ ও নিরলস কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। জোয়ারে উচ্ছল নদীর খরস্রোত যে রূপ তৃণ কুটা সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় কর্ম চাঞ্চল্যও তদরূপ প্রবাহের মতো মানুষের নীচতা, হীনতা দীনতা ইত্যাদি মনের ক্লেদ সব ঝেটিয়ে দূরে সরিয়ে তাকে নব নব মহান কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। অসুখের ধকল তুমি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারোনি দেখছি। সেজন্য তোমাকে কিছু মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা দিচ্ছি। রোজ সকালে প্রথমে আধ গেলাস চিরতার জল খাবে। তারপর দু'মুটো ভিজে ছোলা আদা নুন কিংবা আখের গুড় দিয়ে খাবে। অঙ্কুর গজানো ছোলা হলে আরো ভালো। ভিজে ছোলা ভিজে নেকড়া দিয়ে কয়েক ঘণ্টা ঢেকে রাখলেই দেখবে অঙ্কুর গজিয়েছে। রোজ সকাল বিকাল দৌড় ঝাপ, যেভাবে ইচ্ছা শরীর চর্চা করবে। সাঁতার দিতে পারলে আরো ভালো। এভাবেই শরীর ক্রমে সুস্থ সবল, সতেজ হয়ে উঠবে—মনে স্ফূর্তি পাবে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে মহারাজ বললেন—এখানে থেকে যেতে তোমার আর কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বড় রাস্তাটা নিশ্চয় দেখতে পেয়েছ। এখানে যাতায়াতের রাস্তাঘাট সবই তোমার দেখা হয়েছে। যখন খুশী চলে আসবে—শুভমস্তু, বলেই মহারাজ মুহূর্তমাত্র দেরী না করে হন হন করে হেঁটে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন।

দেবযানী পেছন ফিরে তাঁকে আর দেখতে পেলো না! বিদায় জানাবার অবকাশটুকু পর্যন্ত তার মিললো না। অদ্ভুত লোক—কোমল, কঠিনের বিচিত্র সমাবেশ।

বড় রাস্তায় পড়ে দেবযানী যেতে যেতে কিছুক্ষণ আগের দেখা সব

কিছুই মনে মনে পর্যালোচনা করে। সে যেন বইয়ে পড়া বালিকা এ্যালিসের মতো এতক্ষণ এক [Wonder Land] আশ্চর্য পুরীতে ঘুরে বেড়িয়েছে। যা কিছু দেখেছে জেনেছে সবই তার নিকট চমকপ্রদ, বিস্ময়-কর আর নতুন। কিন্তু এতে বুঝি তাব চিত্ত ভরলো না। কোথাও যেন কিছুর অভাব ঘটেছে। অন্তরের সেই শূন্যস্থান থেকে বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেবিয়ে আসে। যাব দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ও সান্নিধ্য লাভের আশায় তার প্রতিটি অলক্ষ্য নির্দেশ দেবযানী পালন করে চলেছে সে তার ধবা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। অভিমান মনেব মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। আবার ভাবে হয়তো এ সবের মধ্য দিয়েই তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে—এ ভাবেই সে তাকে মনোমত কবে গড়ে তুলতে চাইছে। এই আশা নিবাশার দ্বন্দ্ব, কঠিন কোমলেব এক বিচিত্র ভাবের খেলা প্রতি নিয়ত তার মধ্যে ঘটছে। যাব কথা ভাবতে ভ লো লাগে, যার কথা স্মবণে শবীরে পুলক আর সলাজ শিহবণ জাগে, মনে মনে তাকেই তার অন্তরেব সমুদয় প্রেম প্রীতি ভালবাসা উৎসর্গ করে। অমোঘ অন্ধ নিয়তি দেবযানীকে টেনে নিয়ে চলেছে! এর শেষ কোথায় তা তার জানা নেই!

চলতে চলতে দেবযানী উর্ধ্বে চেয়ে দেখে! অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের আভায় আকাশের রঙ লালে লাল হয়ে গেছে। অদূরবর্তী টিলার উপরে গাছেব কচি পাতায় যেন আগুন লেগেছে। তার মনের অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির বেশ ভূষাও যেন অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে। দেবযানী বিনম্র চিত্তে যুক্ত করে উর্ধ্বলোকের অদৃশ্য শক্তিকে প্রণাম জানিয়ে তার পায়ে ভয় ভাবনা, ভালো মন্দ, সব কিছু সমর্পণ করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেবযানীর মনে আরেক প্রশ্ন জাগে—শনিবার এত দেরী করে বাড়ি ফেবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মামীকে সে কি উত্তর দেবে? তার বর্তমান গতিবিধি কাউকে বলা যায় না। এটা সে বুঝতে পেরেছে। বলাতে বিপদ বিভ্রান্তির অবকাশ তো আছেই এমন কি তার আশা ভরসা এবং আপন লক্ষ্যে পৌছতেও বিঘ্ন ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। তবে কি তাকে মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে হবে? কিন্তু এ ছাড়া অন্য কি পন্থা আছে? মনে মনে এর সমর্থনে দেবযানী একটা যুক্তি খাড়া করে—সে তো কোনো অন্যায় করছে না। মহান

সেবা-ধর্ম সে গ্রহণ করতে যাচ্ছে—প্রিয়জনের সঙ্গে একত্রে এই দুর্ভাগা পরাধীন দেশের দুর্গত দুস্থ জনগণের সেবা। তার এই উদ্দেশ্য ও পন্থার মধ্যে অন্যায় বা পাপ কর্ম কিছু তো নেই। তবে কি উদ্দেশ্য মহৎ হলে মিথ্যার আশ্রয় নিলে কোন পাপ নেই। ছেলেদের মহাভারতে পড়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা তার মনে পড়ে। তিনিও তো এক মহৎ উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে—অশ্বত্থামা হত—ইতি গজ, বলে কপটতার আশ্রয় নিয়ে গুরুদেব দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হলেন! সেও সে-পন্থাই অবলম্বন করবে। সঠিক কিছুই বলবে না। আবার মনে পড়লো সত্য লুকোবার এবং সত্যকে বিকৃত করবার জন্য ধর্মপুত্রকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিলো! সুতরাং তাকেও এই সত্য গোপনতার আশ্রয় জনিত অপরাধের জন্য শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। এভাবেই সে মনকে প্রবোধ দেবার জন্য প্রশ্ন ও উত্তর খাড়া করে। তবুও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে ভেবে একটা অপরাধ বোধ তার অন্তরে অনুক্ষণ কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে।

বাড়ি পৌঁছে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় পা দিতেই মামী জিজ্ঞাসা করেন—কে, যানী? আজ শনিবারেও ফিরতে এতো দেরী হল কেন রে?

—আর বলো কেন, সামনে পরীক্ষা, পড়ার ঝামেলা বেড়ে গেছে। পাছে আরো কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এই ভয়ে কথার মোড় ঘোরাবার জন্য দেবযানী সুদেবের কথা জিজ্ঞাসা করে।

—ওতো রেল মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গেছে।

আবার দেবযানীর প্রশ্ন—মামা কি এখনো ফেরেন নি।

—না বলে গেছেন, ফিরতে দেরী হবে।

আর বাক্যব্যয় না করে দেবযানী ঘরে প্রবেশ করে। বই খাতা টেবিলের ওপর রেখে হাত মুখ ধুয়ে মামীর ঘরে উপস্থিত হয়। তিনি দুয়ারের ধারে বসে কি একটা সেলাই করছিলেন। দেবযানীকে দেখেই বললেন—রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

—না এখন আর খাবো না।

মামী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? দেবযানী মামীর সামনে বসে পড়ে বলে—না, সন্ধ্যেবেলায় খাবো না। সুদেব আসুক, তখন একত্রে খেতে বসবো। শরীরের কথা যখন তুললে তখন বলছি, আমার শরীর তো ভালই আছে—কিন্তু তোমরা লক্ষ্য

করছ কিনা জানি না, সুদেবের শরীর মোটেই সারছে না। আমি দেখছি ও দিন দিনই রোগা হয়ে যাচ্ছে। ওর প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আরো যত্নের প্রয়োজন। মামাকে বলো তো ভালো দেখে আস্ত ছোলা কিনে আনতে। রোজ সকালে ও এবং আমি আদা নুন কিংবা আখের গুড় দিয়ে ভেজা ছোলা খাবো। তা ছাড়া শরীরে জন্য কিছু কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করাও উচিত। সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

—আচ্ছা তোর মামাকে বলবো'খন—বলেই হাতের কাজ সরিয়ে রেখে মামী উঠে পড়েন। দেবযানীও নিজের ঘরে ফিরে আসে।

বাইরে সূর্যের আলোকচ্ছটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। বাড়ির চারিদিকের গাছপালার দীর্ঘ ছায়া ভেতরের ছোট্ট উঠোনটুকু ঢেকে ফেলেছে। ঘরের অন্ধকার ক্রমেই জমাট বেঁধে উঠছে। দেবযানী হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে দেশলাইটা নিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ টেবিলের ওপরের বইগুলি নাড়াচাড়া করে! না, কিছুতেই মন বসছে না। খানিক চুপ করে বসে থাকে। অতঃপর বিছানার নিচ থকে স্বামী বিবেকানন্দের বইখানা বার করে। পাতার পর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় :—

—এস আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন···। উঠোনের তুলসী মঞ্চ থেকে মামীর শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। দেবযানী বইখানা শুদ্ধ যুক্ত-কর কপালে ঠেকিয়ে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

কিছু দিন নীরবে কাটে। কোথাও কোনরূপ উত্তেজনা উদ্দীপনার কারণ ঘটে না। স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য দেবযানী আহারে বিহারে মহারাজার নির্দেশ সাধ্যমতো পালন করে চলেছে। যৌবনোচ্ছল রোমান্সের স্বাদপ্রাপ্ত দেবযানীর রূপ-রস-গন্ধ-বিবর্জিত দিনগুলির একঘেয়েমি আর ভালো লাগেনা।

এমন দিনে কলেজের একজনের মৃত্যু উপলক্ষে দুটো ক্লাসের পরেই একদিন কলেজ ছুটি হয়। এত সকালে দেবযানীর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হলো না। গুমোট গরম, তার ওপর বাইরে মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তাণ্ডব। কলেজের কমনরুমে বসে কিছুক্ষণ পড়া শোনার ইচ্ছা নিয়ে ঢুকে দেখে তার মতো অনেকেই সেখানে ভিড় জমিয়েছে। গালগল্প আর কথাবার্তার

গুঞ্জরণে কমনরুম মশগুল। গোল বড় টেবিলে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। প্রথমে 'প্রবাসী' তারপর 'সন্দেশ' সেটা রেখে 'উদ্বোধন' নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে দেখে। পড়বার মতো অনেক কিছু থাকলেও কিছুতেই মন-সংযোগ করতে পারছে না। আরো কিছুক্ষণ এটা সেটা এবং সব শেষে শনিবারের চিঠিটা দেখে দেবযানী উঠে পড়ে। বেরোবার মুখে সহপাঠিনী স্বাতী জিজ্ঞাসা করে—বাড়ি যাচ্ছিস ?

—হাঁ, তুই যাবি তো আয়।

—না ভাই, তোর সঙ্গে ও-পথ দিয়ে গেলে বড্ড ঘুর হয়।

কোন জবাব না দিয়ে দেবযানী বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় পড়ে একপাশ দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে চলেছ। অমৃত কানন যাবার রাস্তাটার ধারে এসে তার চলার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। অমৃত কানন যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে। সঙ্গে সঙ্গেই সে ঐ দিকেই এগোতে থাকে। মন স্থির করার আগেই একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চলেছে। কিছুদূব এগিয়ে ভাবনা হলো—যদি সে ভুল পথ ধরে থাকে ? তা হলে খুবই লজ্জার কথা হবে। মহারাজা যদি অনুপস্থিত থাকেন তখন সে কি করবে ? অমৃত কাননেব অন্য কেহ কিংবা মহাবাজই যদি তার আগমনের কারণ জানতে চান তখন সে কি জবাব দেবে ? যদিও মহারাজ তাকে যখন ইচ্ছা আসবার অনুমতি দিয়েছেন।

মনে মনে এরূপ সাত পাঁচ ভেবে সে এগোচ্ছিলো। দূর থেকে বাঁ দিকেব চেঁচাবি আর মেহেদি ঘেরা জায়গাটা তার নজরে পড়তেই সে যে ভুল পথে আসেনি সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়। এতক্ষণ এই রাস্তায় অন্য কোন জনপ্রাণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ লাভ হয়নি। রাস্তার দু'দিকের ঝোপঝাড় গাছপালা থেকে একমাত্র বিচিত্র পাখীর কূজন ভিন্ন অন্য কিছু তাকে স্বাগত জানায় নি। আচম্বিতে অদ্ভুত একটা দুপ দাপ শব্দ তার কানে এলো। শব্দটা কিসের এবং কোথা থেকে আসছে তা ঠাহর করবার আগেই পেছন থেকে একটা লোক এসে প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। দেবযানী চমকে সট্ করে একপাশে সরে যায়। লোকটার মতলব কি তা বোঝার আগেই সে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে দেবযানীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে ক্ষিপ্রপদে পাশে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়। ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে দেবযানী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয়। লোকটার চেহারা ও দৃষ্টি থেকে

তার মতলব যে ভাল নয় তা বুঝতে দেবযানীর দেরী হলো না। এ তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা! হাঁটা শিখতে যেমন আঁছাড় খেতে হয় একেলা চলতে গেলেও এরূপ উৎপাত ও প্রতিবন্ধ-এর মোকাবেলা করতে হবে—ঘাবড়ে গেলে চলবে না—সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

ততক্ষণে দেবযানী অমৃত কাননে প্রবেশের দরজার ধারে এসে গেছে। হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিছুদূর গিয়ে মনে পড়ে যে দরজাটা বন্ধ করে নি। সুতরাং ফিরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। কৌতূহলবশতঃ পরিত্যক্ত সম্মুখের রাস্তাটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে—সেটা একেবারে ফাঁকা—জন-মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র নেই! দেবযানী অবাক হয়।

অমৃত কাননের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে হাঁটতে থাকে। গুরখার সঙ্গে প্রথম যেদিন সে এখানে আসে মাঠঘাট অনেক ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়েছিলো। আজ কিন্তু তার বিপরীত চিত্র—লোকজনের ভিড়—ছেলে বুড়োরা কর্মব্যস্ত। দেবযানী পুকুরের দিকে মুখ করে মাঠ বরাবর না গিয়ে ইট বিছানো সরু রাস্তা ধরে এগোতে থাকে। রাস্তার ধারে একটা ঘরের ভেতরে এবং বারান্দায় অনেক লোকের জটলা। পুকুরের দক্ষিণ ঘাটে ছেলেরা এবং উত্তর ঘাটে মেয়েরা দল বেঁধে সাঁতার কাটছে—স্নান করছে। পুকুর ছাড়িয়ে ব্যায়াম ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে ভেতরে কেউ নেই। তারপর ডান দিকে মোড় নিয়ে বাগানের দিকে এগোয়। আগের দিনের মতো লোকজন এখানেও দেখতে পায় না। হাঁটতে হাঁটতে দেবযানী অবশেষে মহারাজের কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খোলা দেখে ভাবলো মহারাজ ভেতরেই আছেন। লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—আসতে পারি?

ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে জবাব এলো—এসো। দেবযানীর নিকট এরূপ কণ্ঠস্বর অপ্রত্যাশিত। ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ইতস্ততঃ করে—যাবে কি যাবে না!

পুনঃ একই কণ্ঠের আহ্বান শোনা গেলো—এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আর ফিরে যাবার উপায় নেই। অগত্যা দেবযানী কুণ্ঠার সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে।

একজন মহিলা টেবিলের ওপর একটা বড় খাতার পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন আর পেন্সিলে আঁচর কাটছেন। তিনি মুখ তুলে দেবযানীকে দেখেই বলে—একটু বসো ভাই, আমার হয়ে এসেছে।

দেবযানী সসংকোচে একটা চেয়ারে আলগোছে বসে পড়ে। মনে মনে এই ভেবে কিছু স্বস্তি অনুভব করে যে অল্পক্ষণের জন্য হলেও এই অপরিচিতার অবাঞ্ছিত জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পেলো।

কিছুক্ষণ নীরবে নিঃশব্দে কাটে। একমাত্র টেবিলের ওপর পাতা ওল্টাবার খস্‌খস্‌ শব্দ আর বাইরে গাছের ডালে পাতার ছায়ায় ছায়ায় পাখীর কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছু শ্রুতি গোচর নয়। কর্মব্যস্ত মহিলা হঠাৎ সশব্দে খাতাটা বন্ধ করে চোখ তুলে দেবযানীকে ভালো করে দেখে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করে—তুমি বলেছি, তার ওপর এতক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছি বলে রাগ করোনি তো? প্রথমতঃ তুমি আমার ছোট, দ্বিতীয়ত ঐ খাতার কাজটাও ছিল বড্ড জরুরী। ওটা শেষ করতে না পারলে আমাকে আবার জবাবদিহি দিতে হতো। যাক্‌গে, এখন বলো আমি তোমার কি কাজে লাগতে পারি?

দেবযানী কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলে—আমার কাজ তো কিছু নেই। এমনিই চলে এলাম। সকাল সকাল কলেজে ছুটি হলো—বাড়ি ফিরছিলাম। ভাবলাম একবার এখানটা ঘুরে যাই।

—তুমি এখানে হামেশাই আসো বুঝি?

দেবযানীর সহজ সবল জবাব—না, আমি মাত্র একদিনই এসে-ছিলাম। এখানে কিছুই আমাব জানা নেই। এমন কি রাস্তাঘাটও চিনি না।

প্রশ্নকর্ত্রী পুনরায় উৎসুক কণ্ঠে বললেন—ওঃ, তাই বুঝি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছো এবং আমাকে দেখে ভেতরে আসতে চাইছিলে না?

দেবযানীর নিকট প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হলো। প্রশ্নকর্ত্রীর ভুল শোধরাবাব উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—না, আপনাকে তো আমি দেখিনি—ভেবেছিলাম মহারাজ ভেতরে আছেন। সেদিন গুরখা নামের একটি ছেলে আমাকে এই ঘরে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। বাড়ি ফেরার সময় তিনিই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তা অবধি পৌঁছে দিয়েছিলেন। চলে যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন—এখানে অনেক কিছু দেখব.র, জানবার ও শেখবার আছে। যখন খুশী এসো—তাই তো আজ ইচ্ছা হওয়া মাত্র চলে এলাম।

'প্রশ্নকর্ত্রী দেবযানীর সহজ সরল ও অকপট উক্তিতে বোধ হয়

প্রভাবিত হলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে অন্তরঙ্গ সুর—ওমা, তাই নাকি, এত কাণ্ড! গুর্খা তোমাকে এনেছে! পরিচয় তো তা হ'লে আগেই হয়ে গেছে। আমার নাম সুদেষ্ণা। আমিও এখানে মাঝে মাঝে আসি—যতসব বাপ তাড়ানো মা খেদানো ছেলের দল এখানে এসে জুটেছে কিনা। তাই সময় পেলেই এসে খবরদারি করি—মোড়লিও বলতে পার। আর এঁদের কাজ কর্মে একটু আধটু সহায়তা করি।

দেবযানী লক্ষ্য করলো সুদেষ্ণার শেষের কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে যেন তাঁর অন্তরের মায়া মমতা স্নেহ ও দরদ ফুটে বেরোল। দেবযানীর হৃদয়ে এই অপরিচিতার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত মমত্ববোধ ও আকর্ষণ অনুভূত হলো। দিদি বলে ডাকতে ইচ্ছা করলো।

সুদেষ্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আলমারি খুলে খাতা পত্র সব রেখে দিলেন। তারপর টেবিল গুছিয়ে দেবযানীর পাশে এসে তার চিবুক তুলে ধরে সহাস্যে বলেন—বা, বেশ তো মিষ্টি মুখখানি! নামটি কি বলতো ভাই, শুনি।

দেবযানী উঠে দাঁড়ায়। লাজুক কণ্ঠে বলে—দেবযানী।

—বা, চমৎকার—চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিলে গেছে! এখন একটা কাজের কথা বলি, শোনো—মহারাজ-এর আজ (off day) ছুটি। মিটিং-এর পরে তিনি এখানে আসছেন না। এই পরিস্থিতিতে আমার দ্বারা যদি কিছু হয় তো বলো।

সুদেষ্ণার কথাবার্তায় ও আচারব্যবহারে দেবযানী খুবই প্রভাবান্বিত। তার লজ্জা সংকোচ অনেকটা দূর হয়েছে। সে সহজ সরল ভাবে সুদেষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে বলে—আমার আসার কারণ তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি। এই অবস্থায় আর কি-ই বা করবার আছে?

—করবার মতো নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে। তোমার যখন অমৃত কানন ভালো লেগেছে এবং আমার হাতেও যখন কিছু উদ্বৃত্ত সময় আছে তখন চলো তোমাকে এই প্রতিষ্ঠানের যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই।

দেবযানী খুশী। সুদেষ্ণার সমভিব্যাহারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বাগান পেছনে রেখে তারা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ে। আরো কিছুটা এগোতেই একটা পুকুর। তুলনায় ওদিককারটার চেয়ে ছোট। পুকুরের চার দিকে ছোটবড় নানা রকম চালা ঘর। কিছু দূরে একটা খোলা মাঠ—দুদিকে গোল পোস্ট খাড়া করা দেখে মনে হলো খেলার

মাঠ—ফুটবলও খেলা হয়। পুকুরের ধারে ইট বিছানো নাতিপ্রশস্ত রাস্তা। তার উপর দিয়ে যেতে যেতে সুদেষ্ণা সব কিছুর সঙ্গে দেবযানীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন—এটা ছেলেদের হোস্টেল, ওটা মাস্টার মহাশয়দের বাস-গৃহ, ঐ দিকে কিচেন আর তার পাশেই কর্মীদের বাসস্থান। ঐ যে নারকেল গাছের আড়ালে বড় দোচালা ঘরখানা দেখছো ওটা তাঁতশালা, তার দু-পাশে দুটো ঘরের একটাতে ডাই (রং) করা এবং আর একটাতে সূতো কাটা হয়। এখানের সব কিছুই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। রান্নাবান্না, বাসন মাজা, কাঁচাকুচি সব কিছু নিজেদেরই করতে হয়। তাঁতশালে যে সব কাপড় তৈরী হয় তাও নিজেদের ফেবি করে বিক্রি করতে হয়। তাঁতশালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটানা খটাখট শব্দ দেবযানীকে আকৃষ্ট করে। সে কৌতূহলী হয়ে সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করে—শব্দটা কিসের।

—ওটা কাপড় বোনার মাকুর আওয়াজ।

—চলুন না, ভেতরে গিয়ে দেখি, দেবযানীব কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

—বেশ, চলো। সুদেষ্ণা তাঁতশালার গেটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। ভেতরে ঢোকার মুখে বাঁশের অর্গল থেকে শুরু করে লোকজনের কর্ম-ব্যস্ততা—সুতোয় টানা দেওয়া, প্যাঁচ খোলা, মাজন মাখা, রঙ কবা, তাঁত চালনা, কাপড় বোনা, চড়কায় সুতো কাটা ইত্যাদি সব ইলাহী কাণ্ড দেবযানী অবাক বিস্ময়ে দেখছে এবং মাঝে মাঝে এটা সেটার খুঁটিনাটি সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা আখ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা খোলা চালাঘরের নিচে কয়েকটা বড় বড় লোহার কড়াই ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখে কৌতূহলী দেবযানীর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—ঐগুলি কি দিদি? কথাটা বলেই দেবযানী বুঝি অপ্রস্তুত। সুদেষ্ণা বুঝতে পেরে বলে—এতে লজ্জা পাবার কি আছে? আগেই তো বলেছি—আমি তোমার দিদির মতো। এখন থেকে তাই বলে আমাকে ডেকো। ঐ যন্ত্রপাতি গুলো আখমাড়াই কল আর ঐ লোহার কড়াগুলোতে আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হয়। এখানের দুধ, তৈরি ঘি, গুড়, বাগানের ফল ফলারি, মাঠের শাক সব্জি ইত্যাদির চাহিদা বাইরে খুব বেশী।

বাঁক ঘুরতেই অমৃত কাননে ঢুকবার মুখে বড় মাঠটা দেখা গেলো।

মাঠের এধারে পর পর চারটে কুটির—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, সম্মুখে ফুল এবং পেছনের দিকে শাক সব্‌জির বাগান। দেবযানী প্রশ্ন করে—এখানে কারা থাকেন ?

—ঐ দিকের বড় ঘর দুটোর একটা অতিথিশালা—পর্যটক, পর্যবেক্ষক অতিথিবিথিতি এবং ব্যবসা উপলক্ষে কেউ এলে থাকেন। আর একটা এখানের উৎপন্ন দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও প্রদর্শনী ঘর। এপাশের ঘর দুটোতে কর্তাব্যক্তিদের বাস। অবশ্য দেখে কিছুই বুঝবে না—এখানে কারা কর্তা আর কারাই বা কর্মচারী! সকলেই যার যারটা নিজেরাই করে। খাওয়া দাওয়া একই রকমের—প্রভেদটা শুধু কর্মের ভেতর দিয়ে ধরা পড়ে।

দেবযানী এবার এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে—যে সব মেয়েদের এখানে দেখছি তারা কি এখানে থাকে না ?

সুদেষ্ণা হেসে বলে—না। কর্মী, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি মেয়েরা সকলেই বাইরে থেকে আসে।

—ছেলেদের মতো এখানে মেয়েদের হোস্টেল নেই কেন দিদি ? দেবযানীর প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে সুদেষ্ণা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে—অনেকক্ষণ হাঁটা হয়েছে বোন, চলো পুকুরের ঐ দিকটায় জলের ধারে সিঁড়িতে বসে একটু জিরিয়ে নি। দেবযানী ঠিক বুঝতে পারলো না যে, তার প্রশ্নের এভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়াটা সুদেষ্ণার ইচ্ছাকৃত না অনবধানতা প্রসূত! তাই সে ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললে—চলুন।

পুকুরের উভয় তীরের স্নানার্থীদের ভিড় ততক্ষণে অনেক হাল্‌কা হয়ে এসেছে। সুদেষ্ণাকে দেখেই যে সব মেয়েরা স্নান সেরে উঠেছে তারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নৃত্য শুরু করেছে। কয়েক চক্কর ঘুরেই থেমে গেলো। তারপর নানা প্রশ্নবানে তাকে জর্জরিত করে—তা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়ঃ কেমন আছ, এতদিন দেখা হয় নি কেন, কোথায় ছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো তারা আরো কিছুক্ষণ সুদেষ্ণাকে ঘিরে এভাবে চেঁচামেচি হৈ হল্লা করে তাদের ভালোবাসা ব্যক্ত করতো কিন্তু দেবযানীকে সঙ্গে দেখে সংকোচ অনুভব করে নিবৃত্ত হলো।

সুদেষ্ণা কাউকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, কাউকে বা চিবুক ধরে আদর করে, আবার কাউকে বা কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরে স্নেহ-

বিগলিত কণ্ঠে বলে—তোমরা তো জানো আমাকে কত রকমের কাজ করতে হয়! এতদিন বাইরে ছিলাম। আপাতত কয়েকটা দিন একটানা থাকবো। মাঝে মাঝে দেখা হবে। আশা করি তোমরা সবাই কুশলে ছিলে। এই যে নন্দা, ভালো করে সাঁতার শিখছো তো? এতদিনে নিশ্চয়ই আর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। শর্মিষ্ঠা কোথায়? তাকে দেখছি না যে। একজন জানালে শর্মিষ্ঠাদি আজ অনুপস্থিত। আজকের ইন-চার্জ জয়াদি। সুদেষ্ণা চারদিকে চোখ বুলিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে—সে কোথায়? নন্দা বলে যে মেয়েটি তার কাছ ঘেঁষে বসেছিলো সেই জবাব দিলে—জয়াদি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন, এলেন বলে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই জয়া এসে উপস্থিত। দূর থেকে সুদেষ্ণাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলে—ওমা, তুমি কখন এলে দিদি?

—এসেছি তো অনেকক্ষণ, তবে তোমাদের এখানে এই এলাম। এসো আমার এই বোনটির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি। এর নাম দেবযানী, তোমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে খুব ভালো লেগেছে।

দেবযানী সলজ্জ দৃষ্টিতে জয়ার মুখের দিকে তাকাতেই সুদেষ্ণা তাকে সম্বোধন করে বলে—এর নাম জয়া—মেয়েদের সর্দার-মনিটার। ছোরা লাঠি খেলা, যুযুৎসু, সাঁতার ইত্যাদিতে যেমন কৃতী ও পারদর্শী লেখা-পড়ায়ও তেমন তীক্ষ্ণধী। আর……।

লজ্জায় জয়া লাল হয়ে উঠে। বাধা দিয়ে বলে—আর কিছু না। এই তোমার দোষ দিদি, সব কিছুতেই সুপারলেটিভ, এক্সট্রিম—মধ্য পন্থা বা মাঝামাঝি বলে কোন শব্দ তোমার অভিধানে নেই। তুমি নিজে যা, সকলকে তাই ভাবো কিনা।

সুদেষ্ণা হাসতে হাসতে বলে—বেশ আর কিছু বলবো না। যাও খবরদারীটা সেরে এসো। সময় হয়ে গেছে। সুদেষ্ণা হাত ঘড়ির দিকে তাকালো। পুকুরে তখনো কয়েকজন মেয়ে রয়েছে। জয়া তাদের হাতছানি দিয়ে উঠে আসতে বলে, তারপর সুদেষ্ণার গা ঘেঁষে বসে পড়ে। জয়ার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসা করে—তোদের সব খবর কি?

—খবর তো অনেক দিদি। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবো ভাবছি।

সুদেষ্ণা হেসে বলে—কেন চ্যারিটি বিগিনস্ এ্যাট হোম-এর মতো

—বেশ, তোমার কথাই সই। পেন্সন নিয়ে বাবার শরীর এখনও অবধি ভালই—মার শরীর আদৌ ভাল যাচ্ছে না। ভাই বোনে ক্ল্যাশ বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই আছে—মাঝে মাঝে ব্রেকিং পয়েন্ট—ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে এসে যায়। এর সঙ্গে আবার গোদের উপর বিস্ফোট—বাবা মা বিয়ে দেবার জন্য অস্থিব হয়ে পড়েছেন।

—খুবই স্বাভাবিক। বাঙালী ঘরেব লেখা-পড়া জানা সোমত্ত মেয়ে দেখতে শুনতেও যখন আউছি গোছের নও তখন মায়ের গলার আল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

—বাজে বকোনা দিদি, বাবাকে তবু বোঝাবার চেষ্টা কবছি কিন্তু মা একেবারে নাছোড়বান্দা। বলেন কবে মরে যাবো, তখন তোকে কে দেখবে? তাঁকে কতভাবে বোঝাচ্ছি—দেখ মা, তোমার মেয়ে তো ফেলনা নয় যে যেখানে সেখানে ফেলে দেবে। ভালো ঘর বর পেতে হলে অর্থেব দরকার, তা তো বোঝো। সে সম্বল যখন নেই তখন ঐ কর্মটি আমার ওপরই ছেড়ে দাওনা কেন? মা তো শুনেই অবাক এবং ক্ষেপে একেবারে লাল—তুই এসব কি বলছিস! সাত জন্মেও তো এমন কথা শুনিনি। ওমা, কি ঘেন্নার কথা! লোকে শুনলে বলবে কি! এই হলো হোম—ঘরের খবর, বুঝলে দিদি!

দেবযানী জয়ার এই ঘরোয়া আলাপের মধ্যে এতক্ষণ উস্‌খুশ্‌ করছিলো। তার কেবলই মনে হচ্ছিলো এখানে তার অবস্থান এখন শোভনীয় ও বাঞ্ছিত নয়। সুদেষ্ণা কিংবা জয়া হয়তো তাকে লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না। সেও পাছে তাদের কথা বার্তায় ছেদ পড়ে সে ভয়ে কিছু বলছে না—চুপ করে আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে জয়া একটু থামলো অমনি দেবযানী উঠে পড়ে বলে—আমি এখন চলি দিদি। বেলা পড়ে এলো, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।

—তোমার যখন খুশী চলে আসবে। আমাকে না পাও জয়া তো আছে।

—ওকে কোথায় পাবো?

—ওর নাম ধরে খোঁজ করলেই পাবে। ও এখানে সর্বঘটে বিরাজমানা!

—আচ্ছা, চলি জয়াদি।

—এসো ভাই, জয়া স্মিত আননে দেবযানীকে বিদায় জানায়।

দেবযানী চলে যেতেই জয়া জিজ্ঞাসা করে,—একে কোথায় পেলে দিদি ?

—পাইনি, ও নিজেই এসেছে। আমি ওকে জানতাম না। কোনদিন দেখিওনি।

—তাই নাকি ! ভেরী ইণ্টারেষ্টিং। জয়া গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করে।

ঘটনাটা জয়াকে ওয়াকিবহাল করবার উদ্দেশ্যেই সুদেষ্ণা বলে—আমি জিমনাসিয়ামের আপিস ঘরে বসে হিসাব দেখছিলাম এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন বললে—আসতে পারি। আমি উত্তর দিলাম—এসো। কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর ও এলো। দেখে তো অবাক ! জিজ্ঞাসা করলাম —কাকে চাই ? বললো—মহারাজ। বিস্ময় আরো বাড়লো, জানতে চাইলাম—মহারাজকে তুমি চেনো নাকি ? —হ্যাঁ, আগে একদিন এসেছিলাম, জায়গাটা ভালো লেগেছে। মহারাজ বলেছিলেন—যখন খুশী এসো। তাই আজ আবার এলাম। বসতে বললাম। তারপর হাতের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম এবং এখানের যতটা পারলাম দেখিয়ে দিলাম। বয়স অল্প, কলেজে পড়ে। বাবা মা নেই, মামা মামীর কাছে থাকে। কথাবার্তায় সহজ সরল, সহজেই মন জয় করে নিতে পারে। কিন্তু দৃঢ়চেতা এবং মাঝে মাঝে কেমন যেন উন্মনা হয়ে পড়ে বলেই মনে হয়। হয়তো অসুখের কারণে, নাকি অন্য কিছু, কে জানে !

—কি রকম, জয়ার কণ্ঠে ঔৎসুক্য !

একবার কঠিন অসুখ হয়েছিলো। যাক দেখিস, কাজে লাগলেও লাগতে পারে—নরম মাটি। ইচ্ছা মতো আবাদ করা চলে। আর কুশলী চাষীর কৃতিত্ব তো ওখানেই। ভালো কথা, আরো বলতে গিয়ে তখন হঠাৎ থেমে গেলি !

—কেন যাবার আগে তুমি কিছু শুনে যাওনি ? অঞ্জুদির আকস্মিক অন্তর্ধানে অমৃত কানন তোলপাড়—গরল উঠছে ! মেয়েদের ওপর কর্তৃপক্ষের নেকনজর পড়ছে বলেই মনে হয়। কানাঘুষোয় শুনছি তাঁতশালা আর ইঞ্জিনিয়ারীং-এর দেশলাই তৈরী বিভাগের মেয়েদের মধ্যে কিছু অদল বদল আসন্ন। জিমনাসিয়ামে নতুন নতুন আইন কানুন প্রবর্তন করা হচ্ছে—হয়তো শেষে মেয়েদের বিভাগই না তুলে দেয় ! তা হলে আমাদের ক্ষতিটা বিবেচনা কর ! তার ওপর অধুনা টিকটিকির

অত্যাচার—যা এখানে মোটেই ছিলো না—খুবই বেড়েছে। এখানে ঢুকতে বেরতে সন্দেহ-ভাজন লোক আকছার চোখে পড়ছে। সেদিন ময়না যখন আসছিলো তখন কলাবাগ-এর গলির মুখ থেকে বেরিয়ে একটা লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখতে দেখতে চলে গেলো। এরূপ ঘটনা আরো ঘটেছে। শুনলাম ছেলেদের মধ্যেও নাকি একই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

সুদেষ্ণা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে—এমন হলে তো খুবই চিন্তার বিষয়। তবে এমনও তো হতে পারে—এসব স্রেফ গুণ্ডামি। গুণ্ডারা মেয়েদের জ্বালাতন করবার তালে আছে।

—কিন্তু দিদি আগে তো এমন কখনো ঘটেনি।

—আগে ঘটেনি বলে এখন ঘটতে পারবেনা—এ কোন যুক্তি নয়। আগে ক'টা মেয়ে এখানে যাতায়াত করেছে?

শংকা জড়িত কণ্ঠে জয়া বলে—তা হলে তো আবার এক নূতন উপদ্রব শুরু—খুবই ভাবনার কথা। বিশেষ করে গুণ্ডারা যদি মুসলমান হয়!

সুদেষ্ণা হাসতে হাসতে বলে—সে কিরে? গুণ্ডাদের আবার ক্লাশ, জাতগোত আছে নাকি? আমি তো জানি গুণ্ডা, গুণ্ডাই—তা সে হিন্দু কিংবা মুসলমান যাই হোক। উভয়েরই এক পদ এক গোত্র—কোন তফাৎ নেই।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে জয়া উত্তর দেয়—তা হয় তো নেই। কিন্তু বিপদ কি জানো দিদি—গুণ্ডা মুসলমান হলে যে কোন গণ্ডগোলের অজুহাতে একটা দাঙ্গা বেধে যাবার আশংকা থাকে। তা কি তুমি অস্বীকার করতে পারো? পুলিশ তো সর্বদা ঐ রকম সুযোগেরই সন্ধান করছে।

সুদেষ্ণা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে—তোর কথাও সত্যি আর সে কারণেই আমাদের আরো সাবধান এবং সংযমী হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের অহেতুক প্রকাশ করা মোটেই সংগত নয়। তা এরা পুলিশের গুপ্তচরই হোক অথবা গুণ্ডাই হোক!

দেবযানী পুকুর পাড় থেকে মাঠে নেমে গেট বরাবর কোনাকুনি হাঁটতে থাকে। এ জায়গাটার প্রতি তার আকর্ষণ ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। অন্য মেয়েদের মতো শরীর চর্চা, খেলাধুলো, সাঁতার কাটা ইত্যাদির জন্য তার প্রবল ইচ্ছা জেগেছে। এখানের নিয়ম কানুন, কর্তৃপক্ষের সম্মতি

ইত্যাদি বিষয় কিছুই তার জানা নেই। সর্বোপরি মামা মামীর অনুমতি —তা না পেলে কিছুই হবে না। সব বিফল হবে কিন্তু তারা কি সম্মতি দেবেন।

এরকম নানা ভাবনা চিন্তা করতে করতেই দেবযানী অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলছিলো। যে অল্প কয়েকটি মেয়ে তার আগে আগে যাচ্ছিলো রাস্তায় পৌঁছে তাদের আর দেখতে পেলো না। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, ঘন ঝোপঝাড় আর গাছপালার জন্য দিনের আলো আন্দাজ করা কঠিন। সন্ধ্যা ঘনাবার আগেই এদিকটা ঘোর হয়ে আসে। সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি পৌঁছবার উদ্দেশ্যে সে চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। কিছুদূর এগোতেই রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে দুটো সরু গলি। গলি-মুখে পৌঁছবার আগেই সে পেছনে, কারো দ্রুত আসার পদধ্বনি শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তার ইতিপূর্বেকার অমৃতকাননে ঢোকবার মুখের ঘটনাটা মনে পড়ে। সে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়ে রাস্তা করে দেয়। কিন্তু বৃথা, লোকটা হুড়মুড়িয়ে তার গায়ের উপব এসে পড়ে। দেবযানী ছিটকে রাস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়তে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কোন রকমে নিজেকে বাঁচায়।

মুহূর্তের মধ্যে দেবযানী মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়ায়। সামনের দিকে চাইতেই নজরে পড়ে একটা কিম্ভুত কিমাকার লোক বাঁয়ে গলি মুখে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কুৎসিত ভঙ্গীতে তার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছে। তার সারা শরীর শিরশির করে উঠে বুঝি হিম হয়ে গেলো। তারপরে কি ঘটেছে—আতংকে চিৎকার দিয়ে সে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়েছিলো, নাকি ক্রোধে ফেটে রুখে দাঁড়িয়েছিল—তা স্মৃতির পর্দা উল্টে পাল্টে শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না। হঠাৎ কয়েকজনের ডাকাডাকি শুনে তার সম্বিত ফিরে আসে। দু'টি মাঝবয়সী ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কি ব্যাপার বলুন তো? অনেকক্ষণ ধরেই আপনাকে ডাকছি অথচ আপনি সাড়া দিচ্ছেন না! দূর থেকে দেখলাম আপনি রাস্তায় পড়ে গেলেন—হোঁচট খেয়ে পড়েছেন, নাকি অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছে?

দেবযানী খুবই বিব্রত বোধ করে—এদের প্রশ্নের কি জবাব দেবে? এরা যদি ঐ লোকটারই সাঙাত হয় কিংবা কোন বদমতলব হাসিল করবার তালে এসে থাকে! কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে

বলে—ও কিছু নয়। একটা লোক দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলো। তারই ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছিলাম—হয়তো আমারই অসাবধানতা!

ছেলে দু'টি চিৎকার দিয়ে উঠলো—কি বললেন? সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখের ভাব আশ্চর্য রকম পাল্টে গেল—চক্ষু রক্তবর্ণ এবং চোয়াল কঠিন দৃঢ় হলো। উভয়ে পুনরায় একই সঙ্গে যেন কৈফিয়ৎ নেবার সুরে বললে—ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েছিলেন? আশ্চর্য! পরমুহূর্তেই একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করে—কিরে ভব, কিছু বুঝতে পারছিস? তা হলে যা শুনেছি তা সত্যি এবং তার চাক্ষুষ প্রমাণ মিললো! কিন্তু আমরা তো কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখতে পাই নি? লোকটা ধাক্কা দিয়ে কোন দিকে গেল, বলুন তো?

ছেলে দু'টির হাবভাব ও কথাবার্তায় দেবযানীর প্রত্যয় হয়েছে যে এরা যেই হোক ঐ বদ-লোকটার দলের নয়। সুতরাং সে জবাব দিলে—কেন ওখানে দাঁড়িয়েই তো বিশ্রী ভঙ্গীতে হাসতে দেখেছিলাম।

—তাই নাকি! বলেই যে ছেলেটি এতক্ষণ কথা বলছিলো সে আদেশের সুরে তার সঙ্গীকে বলে—ভব তুই পিছিয়ে গিয়ে ঐ দিকটা দেখ আমি গলির ভেতরটা দেখছি। সাবধান, আপনি এখান থেকে এক পা-ও নড়বেন না। বলতে বলতে উভয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটা হাঙ্গাম হুজ্জত আশংকা করে দেবযানীর আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে হলো না। সে দ্রুত হেঁটে বড় রাস্তায় পড়ে হাঁপ ছাড়লো। চলতে চলতে দেবযানী কিছুক্ষণ পূর্বের ঘটনাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দেখে এক অজানা আশংকায় শংকিত হলো—এক অশুভ শক্তির ছায়াপাত দেখতে পেলো। একই পথে পরপর দু'দিনই ঐ কদাকার দুর্বৃত্ত লোকটার আবির্ভাব এবং একই ভাবে তাকে লাঞ্ছিত করার পেছনে স্রেফ গুণ্ডামি ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তার কুৎসিৎ ভাবভঙ্গী ইতর চাহনি ও ইংগিতই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেও এর প্রতিবিধানের পন্থাই বা কি সে চিন্তা তার মনে কেবল পাক খেতে থাকে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যার নির্দেশে এক অজানা অচেনা পথে চলতে গিয়ে সে এই অভাবিত বিপদের সম্মুখীন সে কিন্তু এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবে কি সে কেবল এক মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে? কি জানি—কি তার ইচ্ছা! এরূপ নানা প্রশ্নের নানা সন্দেহের ভারে দেবযানীর অন্তর নিরন্তর প্রপীড়িত হতে থাকে।

বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে কাউকে দেখতে না পেয়ে দেবযানী অবাক হয়ে যায়। উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় পা দিতেই পাশের ঘর থেকে মামার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—কে, যানী এলি ?

—হাঁ মামা, আমি, বলেই দেবযানী মামার ঘরে ঢোকে। এমন অসময়ে মামাকে শুয়ে থাকতে দেখে সে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—মামা, সুদেব ওরা কোথায় ?

—তোর মামী ও পাড়ায় পিসির বাড়ি গেছে। সুদেব স্কুলের খেলা দেখে ফিরবার পথে তোর মামীকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যা, রান্না ঘরে তোর খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

দেবযানী বেশ পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে আসতে আসতেই সন্ধ্যার ঘোর তাদের ক্ষুদ্র উঠোনটুকু ঢেকে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি উনুনে আঁচ দিয়ে বাইরে এসে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ঘরে এসে বাতি জ্বালিয়ে দেয়। তারপর মামার ঘরে বাতি নিয়ে এসে দেখে মামা তখনো শুয়ে আছেন। শিয়রে দাঁড়িয়ে—মামা, বলে ডাকতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেন—যা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে দেখছি। তুই চলে যেতে কখন যে চক্ষু বুজে এলো। তোর মামী এখনো ফেরেনি বুঝি ?

—না, তুমি বারান্দায় এসে বসো মামা, বলেই দেবযানী চেয়ারটা তুলে নিয়ে বারান্দায় রেখে রান্না ঘরে চলে যায়। উনুনে চায়ের জলের কেটলি বসিয়ে চাল ধুয়ে হাড়িতে রেখে দিয়ে মামার কাছে ফিরে আসে। তাঁর মাথায় আঙুল চালাতে চালাতে বলে—তুমি কিন্তু আজ ক্লাবে যেতে পারবে না। বুঝতে পারছি তোমার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

—আমার শরীর আবার খারাপ দেখলি কখন ?

—না, তুমি আর চাপাচাপি করোনা তো মামা। আমি কি কচি খুকী, কিছুই বুঝিনা! সারাদিন আপিসের খাটুনির পর আবার রাত্রি দশটা অবধি ক্লাবের কাজ—এতো ধকল কখনো মানুষের শরীরে সয়! আগে তো খাতাপত্র কিছু কিছু বাড়িতে আনতে আমি বড় বড় আঁক কষে দিতুম। এখন আনো না কেন মামা? আগের মতো খাতাটাতা নিয়ে আসবে। তাতে তোমার পরিশ্রমের কিছু লাঘব হবে। বসো, চা নিয়ে আসছি।

কিছু সময়ের মধ্যেই দেবযানী তু'কাপ চা নিয়ে আসে। এক কাপ মামাকে দিয়ে আর এক কাপ নিজের জন্য রাখে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে—কয়েকদিন যাবৎ তোমাকে একটা কথা বলবো বলবো ভাবছি, মামা। কিন্তু বলবার অবকাশ পাচ্ছি না। মামীকেও ভয়ে বলতে পারছি না। অভয় দাও তো বলি!

হাসতে হাসতে মামা বলেন—বা, বেশ তো কথা বলতে শিখেছিস আজকাল! আমাকে আবাব তোর ভয় হলো কবে থেকে? কেন, ভয় পাবার মতো কিছু কবেছি, নাকি কিছু ঘটেছে?

—না, তা নয়। তবে বিষয়টা খুব সিরিয়াস কিনা! তুমি হয়তো লাইটলি (হ'ল্কা ভাবে) নিয়ে সব ভেস্তে দেবে।

—তবুও বলে ফেল না। দেখি কি এমন ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার!

—তুমি আগে কথা দাও মামা, লক্ষ্মী মামা, যে আমার কথা রাখবে।

—বিষয়টা না জেনেই কথা দিতে বলছিস? মামার কণ্ঠে কৌতুকের আভাস।

– দেবযানী গম্ভীর স্বরে বলে—তোমাকে কোন অন্যায় অনুরোধ নিশ্চয়ই করবো না—সে বিশ্বাস আমার ওপর অবশ্যই তোমার আছে।

—আচ্ছা, বলে ফেল।

—দাঁড়াও, রান্না ঘবটা একবার দেখে আসি, উনোনে ভাত চাপানো আছে। দেবযানী দৌড়ে রান্না ঘরে যায়। ভাত নেড়ে দিয়ে সেদ্ধ হতে আর কত বাকী তা টিপে দেখে ফিরে এসে মামার পাশে দাঁড়ায়। অন্ধকারে মামার মুখ ঠাওর করতে পারছে না। একবার ছোট্ট করে মামা বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে দেবযানী অবাক হয়ে যায়। আবার জোরে ডাকতেই মামার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। দেবযানী এবার রাগত স্বরেই বলে—এখনো তুমি বলছো তোমার শরীর ঠিক আছে! ওঠো, ঘরে গিয়ে শোবে, চলো। দেবযানী মামার হাত ধরে।

মামা মৃদু হেসে বললেন—নারে পাগলী, তুই ভাবিস না, আমার শরীর ভালো আছে—সত্যিই ভালো আছে—ভাবছিলাম তোর কথা।

—সে আবার কি? আমি কি তোমাদের ভাবনা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালাম, নাকি গলার আল হয়ে উঠলাম? দেবযানীর কণ্ঠে বিষণ্ণ সুর।

—তা নয় রে, তা নয়। তোকে ঘিরেই আমার সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। তোর কথাবার্তা, চাল চলন, ভাব ভঙ্গী হুবহু আর একজনের সঙ্গে মিলে যায়। ব্যতিক্রম হলো সে ছিলো আরো অভিমানিনী, রাশভারী আর জেদি। বলতে বলতে তাঁর স্বর ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি বুঝি স্মৃতির আবর্তে তলিয়ে গেলেন।

মামার এই ঝিমিয়ে পড়া ভাব এবং আকস্মিক তুলনাত্মক এলোমেলো অসংলগ্ন উক্তি দেবযানীর মনে একই সঙ্গে বিষাদ, বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। তিনি কার সঙ্গে তার তুলনা করছেন? কে তিনি? নাকি এসব মামার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অস্বাভাবিক উক্তি—নাকি প্রলাপ? সংশয়-বিজড়িত দেবযানী মামার কপালে ও বুকে হাত দিয়ে দেখে। না, শরীরের উত্তাপ অস্বাভাবিক কিছু তো মনে হলো না। অধীর আগ্রহে দেবযানী মামার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করে—তুমি একটু আগে কার কথা বলছিলে?

দেবযানীর হাতে ঝাঁকুনিতে মামা বুঝি আত্মস্থ হলেন। নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলছিস?

—ঐ যে আমার সঙ্গে তুলনা করে কার কথা বললে?

—ওঃ হাঁ, সে তো মাত্র আরম্ভ! তার পরে আখ্যান—আবার তার একটা পরিশিষ্টও আছে। না, না, তোর সে সব শুনে কাজ নেই মা, কষ্ট পাবি।

দেবযানী বুঝলো মামার শরীর ঠিক নেই। তার উপর একা গৃহে মন-খারাপ করা সান্ধ্যকালীন নির্জনতা তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করেছে। তাই তিনি এতোক্ষণ অতীতের কোনো এক বেদনাময় স্মৃতির গভীরে ডুবে ছিলেন। তাকে দেখামাত্র এক অসতর্ক মুহূর্তে তার জীবনের এক অবিদিত অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যত বেদনাদায়ক হোক না কেন তাকে তা জানতেই হবে। সুতরাং আবদারের সুরে বলে—না মামা, আমার কোন কষ্টই হবে না। তুমি বলো।

মামা নীরব। হয়তো ভাবছেন কোথা থেকে শুরু করবেন। কিন্তু দেবযানীর তর সইছিলো না। সে মামার হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে আবদারের সুরে বলে—কি হলো মামা, বলছো না যে?

অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মামা শুরু করলেন:

—তিন ভাই এক বোন—যেন পারুল বোনটি। মা ছোট বেলাতেই গত হয়েছেন। বাবা স্কুল-মাষ্টার—শান্তশিষ্ট নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটি। ভাইবোনদের লালন পালনের ভার ছিলো বাবার এক বালবিধবা খুড়ীর ওপর। সবাই তাঁকে ডাকতো সোনাদিদি। অপত্যহীনা সেই বৃদ্ধা তাঁর অন্তরের সমুদয় মায়া মমতা স্নেহ ঢেলে আপন সন্তানের ন্যায় সকলকে প্রতিপালন করছিলেন। স্নেহ প্রবণ সেই বৃদ্ধার ওপর তিন ভাইবোন মিলে কি অত্যাচারই না করতো! মনে হলে চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। মাতৃহীনা ছোট্ট চঞ্চলা বোনটির উপর তাঁর স্নেহ অবিরল ধারায় ঝরে পড়তো। পক্ষপাত-দুষ্ট এই স্নেহ-প্রবণতার জন্য তিন ভাই মিলে তাঁকে যে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিতো এবং উৎপীড়ন করতো! সর্ব-সহা ধরিত্রীর মতো তিনি সব কিছুই সহ্য করেছেন। হয়তো তাঁরই অত্যধিক স্নেহ আর আহ্লাদে বোনটির মধ্যে দ্বিতীয় রিপুব ও মান অভিমানের আধিক্য ঘটে।

বোনটি সেবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। মেঝ ভাই কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বোনটির পাশ উপলক্ষেই একদিন সকলে মিলে আনন্দ করে বারান্দায় খেতে বসেছে। ওদিক থেকে বড়দা ওর পাশ করা নিয়ে আচমকা কি যেন বেফাঁশ কথা উচ্চারণ করে ফেলেছেন। ঐ কথা নিয়ে কথার পর কথা কেবল বেড়েই চলেছে। শেষে কথা কাটাকাটি! বোন এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে ভাত শুদ্ধ থালা বাসন সব উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে। বাবা তো হতবাক! তিনি কিছু না বলে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন! ভাইরা সকলে স্তম্ভিত। এই অতি সাধারণ কথায় যে এতবড় তুফান উঠতে পারে তা ধারণা করতে পারেনি। তারা রেগেমেগে এক সঙ্গে সোনাদি সোনাদি বলে চেঁচাতে থাকে। তিনি তখন রান্না ঘরে। হাঁক ডাক শুনে ছুটে এলেন। মেঝভাই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—নাতনীর কীর্তিকলাপ নিজের চোখে দেখো। এ-তো সাংঘাতিক সর্বনাশা এক রণচণ্ডী মেয়ে—সব আনন্দ পণ্ড করে দিলে! তখন ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিলো। তা স্মরণ করেই মেঝ ভাই বোনটিকে শুনিয়ে বললে—কোন দিন না জানি ও বরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে—এক মারাত্মক উপমা!

সোনাদি তখন বোনটির পাশে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এবং ভাইদের গালমন্দ করছিলেন—সবদোষ ভাইদের। তারা বোনটিকে অযথা যা-তা বলে উৎপীড়ন ও জ্বালাতন করে। সোনাদি আবার ভাত বেড়ে আনলেন। ভাইরা তখন বোনটিকে নানা প্রবোধ বচন শোনালে, কিন্তু ফল কিছু হলো না। আশ্চর্য মেয়ে এতকরে বলা ও বোঝানো সত্ত্বেও সে কিছুতেই আর খেলে না। পাত ফেলে উঠে যাবার সময় শুধু একটি কথাই বললে—তুমি তাই ভেবেছ নাকি মেজদা আত্মহত্যা করবো আমি? এমন মূর্খ আমি নই। তোমার অমন আশায় ছাই পড়বে! সবাইকে মেরে খুন করে তবে আমি ফাঁসি চড়বো। নিয়তি কেন বাধ্যবে! সেদিনের উত্তেজিত অবস্থায় অসতর্ক মুহূর্তের এক মর্মান্তিক বাণী অশ্রু যে তার নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করবে তা কে জানতো!

এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে মামা বুঝি হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। মামার স্মৃতি পরিক্রমার মধ্যে তার মায়ের নামোচ্চারণে দেবযানীর সম্মুখে তার স্বর্গতা জননীর জীবনের এক অজ্ঞাত অনধীত অধ্যায় উন্মোচিত হলো। মাকে দেবযানীর মনে নেই। মাতৃ-স্নেহ কাকে বলে তার কণামাত্রও দেবযানী উপলব্ধি করেনি। মামীকেই সে মা বলে জেনেছিলো এবং এখনো তাঁকে মা বলে ডাকতে তার প্রাণ আনচান করে। তবুও পরলোকগতা জননীর জন্য সহানুভূতি ও করুণায় তার চোখ আর্দ্র হলো। উদ্গত অশ্রু অতিকষ্টে রোধ করে দেবযানী বললে—একটু থামো মামা আমি রান্না ঘর থেকে আসছি।

—না, যানী আজ আর নয়, মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। নিজেকে আমি আর সামলাতে পারবো না। তার ওপর শরীরটা সত্যই ভাল যাচ্ছে না রে।

দেবযানী নিরাশ কণ্ঠে বললে—আচ্ছা, কিন্তু আমার কথা তো তোমাকে বলা হলো না মামা।

—শুনবো, তোর কথা নিশ্চয়ই শুনবো, ভয় নেই। তোর কথাও ফুরোচ্ছে না আর আমিও পালাচ্ছি না।

—তাই হবে মামা, বলেই দেবযানী দ্রুত রান্না ঘরের দিকে প্রস্থান করে।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খিল খুলে দিতেই মামী এবং সুদেব

ভেতরে আসে। সুদেব ঘরের দিকে এগোতেই মামী হেঁকে বললেন —যাও হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসোগে। এ বয়সেই এতো আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছ, আশ্চর্য! বলেছি সন্ধ্যের আগে ওবাড়ি যেতে। না একেবারে ভর সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির। গেরস্থ বাড়ি থেকে ও সময়ে কেউ কাউকে যেতে দেয়! উত্তেজিত মামী তারপর দেবযানীকে লক্ষ্য করে বলে—তুই রান্না ঘরে কি করছিস?

—কেন চা করলাম—মামাকে দিলাম, নিজেও খেলাম। তারপর ভাত চাপালাম। এই তো ভাত নামিয়ে এলাম, এখন বলো কি করবো? তোমার জন্য চায়ের জল চাপাই!

—না, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। আমি চা খেয়ে এসেছি। যাও, তুমি তোমার নিজের কাজে যাও। মামীর কণ্ঠে আদেশের সুর।

দেবযানী আব্দার করে বললে—না, এ বেলার বাকী রান্নাটা আমাকে করতে দাও। এতটা পথ হেঁটে এলে! শুধু বলো কি রান্না হবে! আমি ঠিক করতে পারবো। মামার শরীরটা ভালো নেই—তুমি যাও।

—তোর মামা কোথায়?

—ঐ তো বারান্দায় বসে আছেন।

রান্নার সব বলে দিয়ে মামী চলে গেলেন।

দেবযানী রান্নাবান্না সেরে ঘণ্টাখানেক বাদে ঘরে গিয়ে হাজির। দিদির উপস্থিতি টের পেয়ে সুদেব বই থেকে মুখ তুলে খুশি ভাবে বললে —তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে দিদি।

—সেসব বলবার আগে বলো—কেন তুমি মায়ের অবাধ্য হলে?

—বারে, আমি কি ইচ্ছা করে হয়েছি নাকি? অথচ ঘটনাটা তো মাকে বলতেই পারলাম না।

অমন হাতি ঘোড়া কি ঘটেছে যা তুমি বলতে পারলে না। অদ্ভুত ছেলে তো?

—তুমি বুঝছো না দিদি। মা তো আমার দেরী দেখে আগে থেকেই খচে ছিলেন। আমাকে দেখা মাত্রই ফেটে পড়লেন! সে জন্য কারণটা তাকে জানাবার ফুরসৎ পেলাম কোথায়!

যাক্, এবার বিষয়টা কি, শোনাও দেখি।

সুদেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। হয়তো মনে মনে তার বক্তব্য

গুছিয়ে নিচ্ছিলো। তারপর ভারিক্কী চালে বললে—আজ আমি স্কুলের জিমনাষ্টিক ক্লাশে ভর্তি হলাম। উঃ, আমার যে কি খাতির সে কথা তোমাকে কি বলবো দিদি! জিমনাষ্টিক মাষ্টার অজয়বাবু—ইয়া গাল পাট্টা দাড়ি, লম্বা কোঁকড়া চুল কাঁধ অবধি বিস্তৃত—সাঁওতালের মতো কালো ইস্পাত চেহারা—গায়ে সে কি জোর! খালি গায়ে নেঙোট পরে যখন তিনি মাংস পেশির খেলা দেখান তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য—মনে হয় যেন আমাদের ইংরেজি বই-এর ছবির অবিকল এক হারকিউলিস দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই আমাকে ঘুরে ঘুরে রিঙ, বারবেল, মুগুর, হরাইজণ্ট্যাল বার ইত্যাদি দেখালেন আর বললেন তাঁর মতো তিনি আমাকেও শক্তি-শালী করে দেবেন! কি মজা বলো তো দিদি!

—তা যাই হোক, তুমি দুম করে এভাবে জিমনাষ্টিকে ভর্তিই বা হতে গেলে কেন, আর এমন কেউ কেটার মতো হঠাৎ তোমার এতটা খাতির যত্নের কারণটাই বা কি?

—সে এক মজার ঘটনা—তার কথাই তো তোমাকে শোনাতে যাচ্ছি। শুনে তুমি যে খুশী হবে এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

দেবযানী রূঢ় মেজাজে জানালে—তোমার এ ব্যাপারে আমার অসুখী হবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ তুমি মায়ের অবাধ্য হয়ে দেরী করে ফিরেছো, দ্বিতীয়ত গার্জিয়ানদের বিনা অনুমতিতে হঠাৎ জিমনাষ্টিক ক্লাবে ভর্তি হলে! সবই তোমার বেয়াড়া বখাটেপনা—অস্বাভাবিক অশোভন আচার আচরণ! যাক, যা তোমার বলার আছে চট করে ভণিতা না করে বলে ফেল। সব শুনে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হবে। তাড়াতাড়ি বলো, আমার অনেক পড়া আছে।

—ওরে বাবা, তুমিও দেখছি মা'র মতোই শাসাচ্ছো! আমার আর বলে দরকার নেই—আমার কথা আমাতেই থাক দিদি। কথা শেষ করে সুদেব গুম হয়ে বসে থাকে। মুখে তার এক অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে উঠে।

দেবযানী সুদেবের কথার ঢঙ শুনে এবং অস্বাভাবিক আচার আচরণে একেবারে থ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সংযত ও শান্ত কণ্ঠে বলে—লক্ষ্মী ভাই, বড়োদের অবাধ্য হতে নেই। কি ঘটেছে বলো।

—কিন্তু তুমি যে বললে শাস্তির ব্যবস্থা করবে?

—অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হয় না ?

সুদেব দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলে—তা হলে আমিও বলবো না—কিছুতেই বলবো না।

সুদেবের অবাধ্যতা আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচার আচরণ অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব ! দেবযানী কিংকর্তব্য বিমূঢ় ! অমৃত কানন থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেই ঘৃণ্য দুর্ঘটনা, বাড়ি এসে মামার নিকট শ্রুত স্বর্গত জনকজননীর অসমাপ্ত কাহিনী—সব মিলে তার মনে আগে থেকেই প্রচুর উত্তাপ, উত্তেজনা ও বেদনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। সুদেবের গোঁয়ারতমি ও ধৃষ্টতা তাতে ইন্ধন যোগালো। আপন অন্তরে সঞ্চিত উত্তেজনা, বেদনা ও বিস্ময় উত্তপ্ত ক্রোধে রূপান্তরিত হলো। কর্কশ কণ্ঠে বললে—সুদেব তোমাকে আবারও জিজ্ঞেস করছি—বলবে কিনা ?

সুদেব ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দিলে—না, বলবো না !

দেবযানীর আর সহ্য হলো না। ক্রোধে ফেটে পড়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো—কি এতবড় আস্পর্ধা—মুখের ওপর কথা ! সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে সুদেবের গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

দিদির নিকট হতে এতবড় কঠিন রূঢ় আঘাত সুদেব কখনও কল্পনা করেনি। যদিও বাহ্যিক আঘাত অতীব সামান্য তথাপি তার অন্তরে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। কিশোর বালকের জীবনে সেদিনই বোধ হয় প্রথম মোহভঙ্গ ঘটলো। হতভম্বের মতো ফ্যালফ্যাল করে দিদির দিকে তাকিয়ে রইল—সে দৃষ্টিতে ক্রোধের লেশ মাত্র ছিলো না। তার মুখ দিয়ে শুধু হতাশ করুণ কণ্ঠে একটি কথাই ধ্বনিত হলো—দিদি, তুমি আমাকে মারলে—মারতে পারলে ! পর মুহূর্তেই সুদেবের দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ কি যে ঘটে গেলো ! ক্রোধে আত্মহারা দেবযানী অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্বিত ফিরে পেলো। অনুশোচনায় তার সারা অন্তর ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো। সুদেবের চোখে জল দেখে সে বুঝি আর স্থির থাকতে পারলো না। তার মনের ক্রোধ ক্ষোভ, অনুযোগ অভিযোগ ও অভিমান নিমেষে সব যেন উবে গেলো। সেও সুদেবকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। অনেকক্ষণ অবধি ভাইবোন এভাবেই কাঁদে।

ওদিকে ঊর্মিলা দু' দু'বার তাদের খেতে আসবার জন্য ডেকেও যখন কোন সাড়া পেলেন না তখন তিনি উঠে এলেন। তাদের ঘরের সামনে

এসে উঁকি দিয়ে দেখেন ভাইবোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। তিনি একেবারে থ হয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে উভয়কে নাম ধরে ডাকলেন। উর্মিলার আকস্মিক উপস্থিতি ও ডাকাডাকিতে উভয়ের কান্না থেমে গেলো। দেবযানী আপন অঞ্চল দিয়ে ভাইয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিলে। ভাইবোন কেহই এমনটা আশা করেনি। উভয়ের দৃষ্টিতেই অপ্রস্তুত সংকোচ ভাব—যেন ধরা পড়ে গিয়েছে। উর্মিলার বিস্ময় এতে আরো বেড়ে গেলো। বিমূঢ় কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার যানী তোরা দু'জনে এভাবে কাঁদছিলি কেন?

দেবযানী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ক্ষীণ হেসে জবাব দিলে—ও কিছু নয়, মা। পরমুহূর্তে পাছে মামী জেরা করে তাকে নাজেহাল করে এই ভয়ে বললে—বিকেল থেকেই মনটা খারাপ। বাড়ি এসে দেখলাম তোমরা নেই। মামার শরীর খারাপ—তিনি শুয়ে আছেন। তারপর চা খেতে খেতে তাঁর অতীত জীবনের এক দুঃখের কাহিনী শোনালেন। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। রান্নাবান্না সেরে ঘরে এলাম। ভাইবোনে কথাকাটি ফলে উত্তেজিত হয়ে হাতাহাতি—শেষে কান্নাকাটি!

মায়ের নিকট নালিশ না করে দিদি যে ভাবে ঘটনা বর্ণনা করলো তাতে সুদেবের মনের অস্বস্তির ভার অনেক লাঘব হলো। দিদির ওপর অভিমানের মাত্রা হ্রাস পেল।

দেবযানীর জবাবদিহি মামী কি ভাবে গ্রহণ করলেন তা তাঁর মুখের ভাব থেকে কিছুই বোঝা গেলো না। আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে—তোমরা খেতে এসো, বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সুদেব ও দেবযানী নিজেদের যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে হাত মুখ ধুয়ে খেতে গেলো। মামা তখনো পিঁড়ির ওপর বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেবযানী রান্না ঘরে ঢুকে মামাকে প্রশ্ন করলে—তুমি বসে কেন? এখন কেমন আছো?

—আমি খারাপ ছিলাম কখন? তারপর—ভাত আনো, বলে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন।

সে রাত্রির আহারের পরিবেশটা অন্যদিনের মতো সহজ ও স্বচ্ছন্দ ছিলো না। সর্বক্ষণ একটা নীরব নিষ্প্রভ থমথমে ভাব—কেউ যেন

স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। অন্যদিন দেবযানী ও সুদেব অনবরত বকরবকর করে রাতের খাবার-আসর সরগরম করে রাখতো। সারাদিনের জমানো কথা তারা ঐ সময়ে উগরাতো। আজ তারা উভয়েই নির্বাক। মামী একান্ত রুটিন মাফিক পরিবেশন করছিলেন। মামা একবার মাঠের ফুটবল খেলার প্রসঙ্গ তুলে হাওয়া কেড়ে নিয়ে পরিবেশটাকে সজীব ও সরব করে তুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জমলো না। এমন মুখরোচক আলাপও সুদেবের মনমরা ভাব ও নিরুৎসাহের কারণে বেশী দূর এগলো না। প্রত্যেকেই যেন নিজনিজ চিন্তা ভাবনার কোটরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সুদেবের নিরস বিষণ্ণ ভাব পিতার নিকট খুবই অস্বাভাবিক মনে হলো। কারণ জানবার ইচ্ছা জাগা সত্ত্বেও কি ভেবে তিনিও চুপ করে গেলেন।

খাওয়া শেষ হতেই সুদেব উঠে গেলো। দেবযানী রান্নাঘরের কাজে মামীকে সাহায্য করে ঘরে ফিরে দেখে সুদেব শুয়ে পড়েছে। লণ্ঠনটা উস্কে দিয়ে দেবযানী পড়তে বসে সুদেবের দিকের আলোটা একটা খাতা দিয়ে আড়াল করে দেয়। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেবযানী লক্ষ্য করলো সুদেব কেবল উশখুশ এবং মাঝে মাঝে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে। বুঝলো তার ঘুম আসছে না। অন্যদিন ঘুম না এলে দিদিকে গল্প বলার জন্য কত তোষামোদ ও আবদারই না করত! বই বন্ধ করে দেবযানী তার বিছানায় এসে বসলো। মাথায় হাত বুলোতেই সুদেব ভিন্ন দিকে পাশ ফিরলো। দেবযানী এবার আরো একটু কাছে ঘেঁষে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আদর করে বললে—লক্ষ্মী ভাইটি আর রাগ করে থেকো না। আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পড়তে পারছি না। মন বসছে না। সামনে পরীক্ষা, তুমি জানো। এমন হলে নির্ঘাৎ ফেল করবো। ফেল করলে তুমি কিন্তু আর আমাকে দেখতে পাবে না।

সুদেব কি বুঝলো কে জানে! পাশ ফিরে দেবযানীর কোলের কাছে মুখ গুঁজে রইলো। দেবযানী বুঝলো পাষাণ গলতে শুরু করেছে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে—আজ তোমাকে এমন এক গল্প বলবো যা আগে কোনদিন বলিনি। সুদেব দিদির আরো কাছে ঘেঁষে এলো। দেবযানী ভাইয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আরম্ভ করলে—

—এক যে ছিলো বালক, নাম তার ধ্রুব। আজ হতেই দেখে যা

দুঃখিনী সন্ন্যাসিনীর বেশে বনে বাস করছেন। মায়ের দুঃখে বালকের প্রাণ কাঁদে। মাকে পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলো যে সে রাজার ছেলে, বিমাতার প্ররোচনায় রাজা তার মাকে বনে নির্বাসন দিয়েছেন। পিতার সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে ধ্রুব একদিন রাজদরবারে উপস্থিত। পিতা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট— তাঁর ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভাই। ধ্রুবরও পিতার কোলে বসবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু বিমাতার গঞ্জনা, কটুবাক্য ও তিরস্কারে মনের দুঃখে বালক রাজসভা পরিত্যাগ করে। মায়ের নিকট এসে সবিস্তারে বিমাতার অপমানের কথা বলে। মা সব শুনলেন। অবোধ বালককে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—হরি-ই একমাত্র বিপদ ভঞ্জন—তিনিই গরীব দুঃখীর দুঃখ মোচন, সন্তাপ হরণ এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

সেই থেকে ধ্রুব শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল হরিনাম জপ করে। পথে ঘাটে সর্বত্রই তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে এক গভীর রজনীতে ধ্রুব তার দুঃখিনী মাকে পরিত্যাগ করে হরির অন্বেষণে বেড়িয়ে পড়লো। গভীর বনে রাজ পুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করে—তুমি কে? —আমি বাঘ। এখানে কেন? —তোমাকে খাবো। ধ্রুব বলে—বেশ আমাকে খাও কিন্তু হরির সন্ধান দাও। রাক্ষস খোক্কস সিংহ ভাল্লুক ইত্যাদি জন্তু জানোয়ার যার সঙ্গেই তার দেখা হচ্ছে সবাইকে নির্ভীক বালক কেবল একই প্রশ্ন করছে—হরি কোথায়—হরির সন্ধান দাও। এইভাবে ধ্রুব হরি-দর্শন-লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলো। স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবতারা বালকের কঠিন তপশ্চর্যায় ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। পেল্লায় পেল্লায় জন্তু জানোয়ারের রূপ ধরে ভয় দেখিয়ে তারা বালকের তপোভঙ্গ আর অপ্সরা বিদ্যাধরী পাঠিয়ে তাকে যাদু করবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের সকল প্রচেষ্টাই বিফল হলো। অগত্যা দেবতারা শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তাদের আশ্বাস দিলেন এবং চতুর্ভুজ রূপে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে বালককে দর্শন দিয়ে তার অভীষ্ট পূরণ করলেন।

ধ্রুবের উপাখ্যান শেষ হলো। সুদেবের চক্ষুও ঘুমে জড়িয়ে এলো। দেবযানী তার নিদ্রাজড়িত অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো—আমিও ধ্রুবের মতো হবো দিদি। তারপরেই চুপ হয়ে গেলো। দেবযানী যখন বুঝলো ভ্রাতা সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন তাকে ভালো করে শুইয়ে দিলো।

টেবিল ল্যাম্পের আলোটা স্তিমিত করে দিয়ে সে আপন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

রাতের আহার ও রান্নাঘরের কাজ কর্মের শেষে ঊর্মিলা দরজায় তালা দেবার সময়ে দূরে জেলখানাব ১১টার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। বাবান্দা দিয়ে যেতে যেতে সে অন্যদিনেব মতোই সুদেব ও দেবযানীর ঘবেব জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভেতবটা দেখলে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে ঘরের মধ্যটা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও উভয়ে যে আপন আপন শয্যায় শুয়ে আছে তা বুঝলো। এই রাত্রে ভাইবোনের কান্নাকাটি এবং মান অভিমানের মধ্যে ঊর্মিলা এক অতি অস্বাভাবিক ঘটনাই প্রত্যক্ষ কবেছে এবং তা এক গুরুতর অনাগত অমঙ্গলের সূচনা বলেই তার মনে হযেছে। সেই থেকে নানা অশুভ চিন্তা ভয় ভাবনা তাকে প্রতিক্ষণ পীড়া দিচ্ছে।

নিজেব শোবার ঘবের দিকে যেতে যেতে ঊর্মিলার আরো ধারণা হলো যে, ভাইবোনেব কান্নাকাটিটা শুধু ব'হ্য, কারণ আরও গভীরে। সুতবাং বিষযটা আনুপূর্বিক স্বামীব গোচবে আনাই সমীচীন। সেই সঙ্গে দেবযানীকেও বা সে কি বলেছে তাও জানা প্রয়োজন। স্বামীর জন্য ঊর্মিলার দুঃখ হয়। নির্ঝঞ্ঝাট নেহাৎ ভাল মানুষটি। কিই বা বোজগার! দিবাবাত্র প্রাণপাত পরিশ্রম করে, ছেলে মেয়ের গায়ে যাতে অভাবেব আঁচ না লাগে। সেও স্বামীর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। আয় বুঝে ব্যয় কবে। তবুও নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—এমন অবস্থা!

শোবাব ঘরে ঢুকেই ঊর্মিলা বুঝতে পারলো স্বামী শুয়ে আছে বটে, কিন্তু নিদ্রিত নয়। টেবিলেব ওপব বাতিটাকে উস্কে দিয়ে পান বানিয়ে একটা নিজ মুখে দিলো এবং আর একটা নিয়ে বিছানার পাশে এসে স্বামীর দিকে হাত বাড়ালো।

স্বাভাবিক স্বরেই রমেশ বললে—না, পান খাবো না—ভালো লাগছে না। আমি লবঙ্গ মুখে দিয়েছি।

—কেন, কি হলো, বলে ঊর্মিলা স্বামীর ললাটে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে।

রমেশ ঊর্মিলাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে—না জ্বরটর কিছু নয়, তুমি ভেবো না।

ঊর্মিলা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবে কথাটা পাড়বে তা স্থির করে। তারপর যেন কতকটা আচম্বিতেই জিজ্ঞাসা করে—কিছু যদি মনে না করো তো একটা কথা বলি।

রমেশ স্ত্রীর কথা শুনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—এ আবার কেমন ধ রার কথা! তোমার কথায় কবে কখন আমি কিছু মনে করেছি এমন কোনো দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারো!

—সে ভরসা আছে বলেই তো এই ভণিতাটুকু করলাম।

রমেশ ঊর্মিলার হাত ধরে হাসি মুখে বলে—বেশ তো—যা তোমার বলার আছে বলো। তবে না বসে শুয়ে-শুয়েও তো তা বলা যেতে পারে!

ঊর্মিলা মশারি ফেলে টেবিলের ওপরের বাতিটা কমিয়ে দিয়ে স্বামীর পার্শ্বে শয্যা গ্রহণ করে। স্বামীর গায়ের ওপর ডান হাতখান আলতো রেখে জিজ্ঞাসা করে—যানীকে আজ তুমি কি বলেছ?

রমেশ বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—কেন বলো তো?

—সে কথায় পরে আসছি।

—ওকে ওর মা বাবার গল্প বলেছিলাম। বিকেলে তুমি বাড়ি ছিলে না। শরীরটাও ভালো লাগছিলো না। যানীও কলেজ থেকে দেরী করে ফিরেছে। নিতান্ত একা একা বোধ করছিলাম। মন তো আর স্থির হয়ে বসে থাকার পাত্র নয়—বর্তমান ছেড়ে সে অতীতের স্মৃতির অতলে ডুব দিলে। যানী এলো, আমাকে অবেলায় শুয়ে থাকতে দেখে ওর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার বাহ্যিক প্রকাশের রকমসকম এবং কথাবার্তার ধরণ-ধারণ ঠিক ওর মায়ের মতোই—ওর মায়েরই হুবহু প্রতিমূর্তি মনে হলো। সেই মুহূর্তে ওকে তুলনা করতে গিয়ে মুখ দিয়ে অতর্কিতে ওর মা, অশ্রুর নাম বেরিয়ে গেলো। কিন্তু সবটা তো ওকে বলা হয় নি। যানী তো নিজ থেকেই আমাকে থামিয়ে রান্না ঘরে ছুটে গেলো। তার পরেই তুমি এলে।

স্বামী চুপ করতেই ঊর্মিলা সুদেব ও দেবযানীর কান্নার দৃশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করলে। সেই সঙ্গে কান্নার হেতু সম্পর্কে দেবযানীর উত্তর যে তার মনের খটকা দূর করতে পারেনি তাও জানালে।

রমেশ নিরুত্তর নিঃশব্দ। কোনো সাড়া না পেয়ে ঊর্মিলা স্বামীর গায়ে ঠেলা দিয়ে প্রশ্ন করে—ঘুমোলে নাকি?

—না, ভাবছি।

—কি ভাবছো?

—ভাবছি এ সামান্য ব্যাপারে তুমি এত অস্থির, উতলা ও বিচলিত হলে কেন?

—কি বললে? এটা সামান্য ব্যাপার! আমার মন বলছে না, মোটেই সামান্য নয়। একজনকে পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু কোলে পিঠে করে আপন গর্ভজাত সন্তানের মতো আদরে যত্নে লালন পালন করেছি। আর একজনকে পেটে ধরেছি। এদের নাড়ী-নক্ষত্র আমার সব জানা। যারা কোনোদিন মারামারি দূরে থাক এ বয়স অবধি একে অন্যের গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত দেয়নি, কটু কথা বলেনি, তারা আজ খামকা পরস্পর কথা কাটাকাটির পর মারামারি করে কান্নাকাটি করছে এ তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো! তোমার কথায় আমার মন সায় দিচ্ছে না। আমি আবারও বলছি—এ সামান্য নয়—এ ভবিষ্যতের এক মহা অশুভ ও বিপদের ইংগিত। উত্তেজনায় উর্মিলা উঠে বসে। চক্ষু ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে রমেশও উঠে বসে স্ত্রীর হাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলে—না উর্মি, তোমার কথা আমি বুঝেছি—তোমার যুক্তিও ফেলবার নয়। কিন্তু এ কথাও কি একবার ভেবে দেখেছ যে, ওরা দিনে দিনে বড় হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের স্বাধীন সত্তার ক্রমবিকাশ ঘটছে! হয়তো দু'জনের মধ্যে কোন কারণে মনের অমিল ঘটেছে। ফলে এরূপ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়! এ ছাড়াও কঠিন রোগে ভুগে ওদের মানসিক গঠনেও কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এদের মধ্যে রয়েছে এ-বংশের রক্তের ধারা। ঐ রক্তে একগুঁয়েমি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত! বাবাকে তুমি দেখনি। তিনি যেমন নিরীহ মানুষটি ছিলেন তেমনি আবার জেদি ও কঠিন দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। অন্যায় একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। ছিলেন স্কুল মাষ্টার—যাঁরা ছাত্র শোধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে সমাজের অন্যায় অবিচারের শোধক ও প্রতিকারক ভেবে মনে মনে মাত্রাতিরিক্ত গর্ব ও অভিমান বোধ করেন। বড়দা আর নরেশকে তো জানোই। আমার কথা আর নাই বা বললাম—তা তো তুমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ। শুনেছি আমার ঠাকুর্দাও ছিলেন এক জাঁহাবাজ ব্যক্তি—যেমন

[illegible] চেহারা তেমনি বলশালী। সেকালের এক প্রতিপত্তিশালী বড় জমিদারের দুর্ধর্ষ নায়েব। প্রজাদের উপর যেমন অত্যাচার করতেন তেমনি অভাব অভিযোগ আপদে বিপদে অকাতরে সাহায্যও করতেন। অথচ প্রজাদের এক পয়সাও খাজানা মকুব করতেন না। একেবারে তুঘলকী মেজাজ। সেই ঠাকুর্দা একদিন আবাদ থেকে লাটের কিস্তিব জন্য খুঁতি ভর্তি টাকা নিয়ে ফিবছিলেন। সঙ্গে ছিল পাইক পেয়াদা ও ববকন্দাজ। গহনার নৌকায় আরো যাত্রী ছিলো। মাঝ দরিয়াব ডাকাতি হলো। পরে জানা গেলো যে ডাকাতরাও যাত্রী সেজে ঐ নৌকোয় যাচ্ছিলো। শুরু হলো মারপিট। পাইক ববকন্দাজবা মাব সহ্য করতে না পেরে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো। ঠাকুর্দার বক্ত তখন মাথায় উঠেছে—চক্ষু বক্ত-বর্ণ। হুংকাব দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—তবে রে! এক ডাকাতের হাত থেকে রামদা ছিনিয়ে নিয়ে সেই প্রৌঢ় বয়সেও অমিত বিক্রমে লড়লেন। দুটো ডাকাতকে খুন কবলেন। শেযে নিজে এক ডাকাতের বল্লমেব খোঁচায় মারাত্মক আহত হলেন। ডাকাতরা তাঁব লাশ গুম কবে ফেলেছিলো। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি!

—যাক গে, যত সব অপ্রাসঙ্গিক কথা—ধান ভানতে শিবের গীত শোনালাম! মোদ্দা কথা তুমি এ জন্য ভেবে ভেবে মন খারাপ করে থেকো না। দেখ, যানী নিজের থেকে কিছু বলে কিনা। তবে এটাও ঠিক জেনো ওদের নিকট যদি এখনও আমরা ছোটবেলাকার আচার-আচরণ কথাবার্তা আশা করি তা হলে আমরা মস্ত বড় ভুল করবো।

স্বামীর প্রবোধ বচন ঊর্মিলার মনে বিশেষ রেখাপাত করলো না। তার মন কেবলই বলছে—এ সামান্য ঘটনা নয়—ইহা এক ভাবী বিপদের সূত্রপাত মাত্র! কান পাতলেই সে যেন তার নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনছে আর চক্ষু বুজলেই তার অশুভ কালো ছায়া দেখছে! এখন সে কি করবে? অথচ দেবযানী—যাকে সে আপন হৃদয়ের সমস্ত মায়া, মমতা, স্নেহ ঢেলে এতটুকু থেকে লালন পালন করেছে; যার প্রাণ এখনও এই বয়সেও তাকে মা বলে ডাকবার জন্য আকুপাকু করে এবং ডাকতে না পেরে লুকিয়ে নীরবে কাঁদে—তার নিকট সত্য গোপন করছে এমন ধারণাও সে মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারছে না।

অতীতের মায়াঞ্জন এখনও তার চোখে লেগে আছে। ঊর্মিলা স্বামীর

থেকে আলগা হয়ে শুয়ে স্মৃতির পাখায় চড়ে সুখ দুঃখ বিজড়িত বিগত দিনগুলোতে বিচরণ করতে থাকে।

ষোড়শী বধূরূপে সে এ সংসারে প্রবেশ করেছিলো। যৌবনের প্রবল উদ্দাম উচ্ছলতা শান্ত ধীর স্থির স্বামীর হৃদয়ে উত্তাল ঢেউ তুলতে না পারলেও কখনো সখনো তার তটে আঘাত করে মৃদু কম্পন ও শিহরণ তুলতে সক্ষম হয়েছে। উর্মিলা তাতেই তুষ্ট থাকতো আর নিজেকে সার্থক মনে করতো। সেদিনের একান্নবর্তী পরিবারে বিশেষ করে ভাসুর, জা, দেবর ইত্যাদি আত্মীয় পরিজন পরিবৃত সংসারে আহারে বিহারে নববধূর পক্ষে স্বাধীনতা সম্ভোগ কতটুকুই বা সম্ভবপর ছিলো! কিন্তু বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভাসুর জা অন্যত্র চলে গেলেন। দেবরও বিয়ের পর দ্বিরাগমন উপলক্ষে সেই যে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উঠলো আর ফিরলো না! নানা অছিলায় অজুহাতে কালক্ষেপ করে করে শেষে অন্যত্র বাসা বাড়ি করে সেখানে উঠলো। একান্নবর্তী সংসার ভেঙ্গে তিন টুকরো হলো। এতো বিপর্যয়ে স্বামীর স্থৈর্যের বাঁধ ভাঙেনি। তারপর হঠাৎ কি যে ঘটলো! স্বামীকে অস্বাভাবিক বিরস, গম্ভীর এবং অত্যন্ত বিচলিত বোধ হলো। কারণ জানতে চেয়েও উর্মিলা কোন সদুত্তর পায়নি। এক রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে লক্ষ্য করলো স্বামী কিছুতেই ঘুমোচ্ছে না—কেবল এ-পাশ ও-পাশ আর উশখুশ করছে। সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বললে—কী ব্যাপার, এরকম ছটফট করছো কেন?

রমেশ কিছু না বলে এড়িয়ে গেল এবং অন্য পাশ ফিরে শুলো। সে রাত্রির পরের ঘটনা উর্মিলার মনে এখনো জলজ্বলন্ত আছে। অস্বস্তি ও দুর্ভাবনা নিয়ে কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এক দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। হাত বাড়িয়ে স্বামীকে খোঁজে। দেখে একটু দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। দুঃস্বপ্নের ঘোর তখনো উর্মিলার কাটেনি। স্বামীকে স্পর্শ করেই তাকে জড়িয়ে ধরে নিবিড় হতে চাইলো। কিন্তু তার নিকট হতে কোন সাড়া পেলো না। আশা ভঙ্গে উর্মিলা খুবই আহত হলো। দুর্জয় অভিমানে বাকী রাতটুকু নিদ্রাহীন চোখে ছটফট করে কাটালো।

পরদিন ছিল রবিবার। সকালে চা জল খাবার খেয়েই রমেশ বললো—আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে রাত্রি হতে পারে। সে জন্য ভেবো না।

রুদ্ধ কণ্ঠে উর্মিলা বলে—সে কি! ভাত না-খেয়ে সারাদিন কোথায় টোটো করবে! কোথায় যাচ্ছ বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে!

উর্মিলার কথার ঝাঁঝে তার ভেতরের উষ্মা যেন ফেটে পড়লো। রমেশ বিস্মিত না হয়ে পারলো না। সংযত কণ্ঠে বললে—না, তা নয়। বিষয়টার সঙ্গে তুমি জড়িত নও বলেই বলিনি। তবু যখন জানতে চাইছো বলছি—আমি কুটুম্ব বাড়ি যাচ্ছি, যেখানে বিয়ের পরে তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম। আর অধিক বাক্য ব্যয় না করে রমেশ ছাতা হাতে বেড়িয়ে পড়ে।

স্বামীর এই আকস্মিক অস্থির মনোভাবের কারণ উর্মিলার নিকট অজ্ঞাত। সুতবাং তার জবাবে সে পরিষ্কার কিছুই বুঝলো না। অথচ অভিযোগ করবাব মতোও কোন কারণ খুঁজে পেলো না। কিন্তু মন বলে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। সে বোকার মতো স্বামীর প্রস্থানের দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রে স্বামী ফিরে এলো বটে কিন্তু পূর্বের তুলনায় অধিক চিন্তা-ক্লিষ্ট ও বিষাদপূর্ণ। মুখাবয়ব যেন ঘন কালোমেঘে ঢাকা! খেতে বসার পরে উর্মিলা একবাব স্বামীকে কুটুম্ব বাডির কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলো। রমেশ সে প্রশ্ন যেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই এড়িয়ে গেল। শুতে এসে দেখে স্বামী অস্থিবভাবে ঘরময় পাইচারি করছে। পানের ডিবে থেকে এক খিলি পান নিয়ে স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—নাও।

রমেশ উর্মিলাকে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। পানটা হাতে না নিয়েই বলে—না, ভালো লাগছে না। পরক্ষণেই টেবিলের ধারে চেয়ারটায় বসে পড়ে অপলক দৃষ্টিতে উর্মিলার দিকে চেয়ে থাকে। সে যেন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—মনে হলো স্বামী যেন তার হাড় পাঁজর ভেদ করে অন্তরের সব কিছু রঞ্জন রশ্মির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখছে। উর্মিলার আর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এ কি পাগলামি না আর কিছু! ভেবেছিলো স্বামীর এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা চলাকালীন এমন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে তা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলো না। উদগত অশ্রু অতি কষ্টে সংবরণ করে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—তোমার কি হয়েছে বলো তো? কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি তুমি খাচ্ছো না ঘুমোচ্ছো না, ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছো না—কি এক

যন্ত্রণায় দিবারাত্রি ছটফট করছো। তুমি কি বুঝতে পারছো না এতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে? ঊর্মিলার অশ্রু আর বাঁধ মানলো না—বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

স্ত্রীর কান্না দেখে রমেশ হতবাক! চেয়ার ছেড়ে স্ত্রীকে ধরে খাটে বসিয়ে তার পাশে বসে পড়ে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কাঁদছো কেন? আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি।

ঊর্মিলা নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয়—মুখের ভাষাই কি সব? হাবভাব আচার-আচরণ কি মনের অভিব্যক্তি নয়?

রমেশ স্ত্রীর অনুযোগে খুবই বিব্রত বোধ করে। উত্তর দেবার মতো হঠাৎ কিছু খুঁজে না পেয়ে খানিক চুপ করে থেকে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই ধীরে ধীরে বলে—না না ঊর্মি, তোমাকে অপমান অবহেলা করবার মতো মনোভাব আমার নয়। বিষয়টা জটিল তার উপর আত্ম-জনের আচার ব্যবহার কথাবার্তা ইহাকে এতই জটিল করে তুলেছে যে কিছুতেই জট ছাড়াতে পারছি না। নিজের ভাবনা ও চিন্তা-জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছি। তা ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারছি না। একথা তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

—সে বিশ্বাস আছে বলেই তো এখনো অবধি সহ্য করে আছি। কিন্তু তোমার এ কয়দিনের হাবভাব দেখে আমার ধ্যান ধারণা সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। আমি কি তোমার কেহ নই? আমাকে কি তুমি তোমার মনের কথা খুলে বলতে পারো না? তাতে এমনও তো হতে পারে যে আমি তোমার মনের ভার লাঘব করতে পারি!

স্ত্রীর বাক্যে রমেশ বুঝি ঘন অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলো। আচম্বিতে ঊর্মিলার হাত দু'খানা ব্যাগ্রভাবে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি বলছো?

—সত্যি নয় কি মিথ্যে? তুমি কি আমাকেও বিশ্বাস করতে পারছো না? কি যে তোমার হয়েছে! তোমার নিকট আমি কখনও মিছে কথা বলেছি, না বলি! তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে সব খুলে বলো। তোমাকে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করতে পারবো।

স্ত্রীর এত আশ্বাসেও বুঝি রমেশের মন সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে ঊর্মিলার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হতাশ কণ্ঠে বলে—

না, পারবে না। তুমিও যে বৌদির মতোই বিমুখ করবে না তার নিশ্চয়তা কি! আজকের মতোই একদিন নিরুপায় হয়ে বৌদিকে সাধ্যসাধনা করেছিলাম। তিনি আমার আবেদন নিবেদন এক কথায় খারিজ করে দিলেন! আপন স্বার্থ বুঝতে মেয়েরা অদ্বিতীয়! সেখানে নারী মাত্রই বুঝি এক! প্রেম, ভালবাসা, দান খয়রাত—ওসব হৃদয়ের কারবার নিয়ে বোকারাই কেবল মাতামাতি করে! সুযোগ মতো দাদাকেও একদিন বললাম। তাঁর মনোভাব বৌদির মতো কঠোর। বিদ্রূপ না করেও প্রকারান্তরে তিনিও বৌদির কথারই প্রতিধ্বনি করেন।

হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো রমেশ বিছানা ছেড়ে ঘরময় পাইচারি শুরু করে এবং আপন মনে কথা বলতে থাকে ঃ অন্তিম মুহূর্তে তার একমাত্র অনুরোধ প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখতে পারছি না। বিবেকের দংশন জ্বালা আমাকে অহর্নিশ দগ্ধ করছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ঠিক করলাম বিয়ে করে এর প্রতিবিধান করবো। চিরকুমার থাকবো বলে একদিন যে সংকল্প করেছিলাম তা ভঙ্গ হলো। তুমি এলে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিয়ে করলাম তা সিদ্ধির পথে নানা বাধা বিঘ্ন দেখা দিলো। বিয়ের মুখ্য কারণটাই যেন গৌণ হয়ে দাঁড়ালো! একটা স্বার্থপর মনোভাব মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠলো। সময় সময় বৌদির ঘৃণ্য ও একান্ত স্বার্থপর কথাগুলো কানে বাজতে থাকে—পরের ভূত কাঁধে নিয়ে সংসারের শান্তি ভঙ্গ করোনা ঠাকুরপো। আশ্চর্য যে কথাগুলো স্মরণে এলেই শরীর ঘৃণায় রিরি করতো তা যেন গা-সহা হয়ে এলো! ঐ কথাগুলো যেন পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হলো! নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বে আমি অহর্নিশ ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি। কখনো কখনো অলক্ষিতে অসতর্ক মুহূর্তে অন্তরে যেন বৌদির কথারই সমর্থক সূচক প্রতিধ্বনি শুনছি—কি অধিকার আছে তোমার আমাদের শান্তি-ভঙ্গ করার? অবস্থাটা নিজের মনে বিশ্লেষণ করে অবাক হলাম! কি অদ্ভুত পরিবর্তন! দুর্বলতা ও মোহের পাঁকে নিমজ্জিত হতে লাগলাম। কত রাত্রি তোমার মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছি সত্যিই কি আমার ইচ্ছা পূরণ করলে তোমার শান্তি ভঙ্গ হবে? দাদা বৌদিকে যে কারণে দোষারোপ করেছি, নিজেও কি সমদোষে দোষী হচ্ছি না! কি ভীষণ শোচনীয় অধঃপতন!

কিন্তু রেহাই পাচ্ছি না। অনুক্ষণ একটা অপরাধ বোধ আর বিবেক দংশনে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিলাম। বারংবার অশ্রুর কথা স্মরণ হতে লাগলো।

মরবার পূর্ব মুহূর্তে তার অদ্ভুত জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। নিবে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে দীপ শিখার দপ করে জ্বলে ওঠবার মতো। তার শেষ কথাগুলো স্মৃতির কোঠায় জোর আঘাত হানতে থাকে—মেজদা, অনেক জ্বালিয়েছি ক্ষমা করো। ও চলে গেছে ভালই হয়েছে—না হলে অনেক দুঃখ কষ্ট পেতো। মনে আমার আর কিছু মাত্র ক্ষোভ নেই। শুধু একটা দুঃখ কোলের শিশুটাকে একান্ত অসহায় ফেলে যাচ্ছি। সত্যিকারের ওকে কেউ দেখবার নেই। তোমার বিবেক যা বলে করো। সোনাদির কথা মনে পড়ছে। চিরকালেব মতো চলে যাবাব আগে আমাকে কাঁদতে দেখে মাথায় হাত রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিলেন—কাঁদিস না ভাই, মানুষ মরবার জন্যই জন্মে। বেঁচে থাকলে তোকে যে আরো কত জ্বালাতন করতাম, কষ্ট দিতাম! তোকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু বিবেক কারো কাছে বাঁধা দিসনা দিদি—সে বড় যন্ত্রণা, তুই তা সহ্য করতে পারবি না।

রমেশ কথা বলতে বলতে বুঝি হাঁপিয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করে—আব আমি কিনা পুরুষ হয়ে নিজের বিবেক বাঁধা দিয়ে বসেছি! স্বার্থপরেব মতো কাণ্ডজ্ঞান হীন হয়ে চক্ষু বুজে চলেছি! অবোধ শিশু, মা কাকে বলে জানে না। ভাই বোনদের দেখাদেখি জ্যেঠাইকে একদিন মা বলে ডেকেছে—সব ভাইবোন মিলে বাচ্চাটাকে সে কি হেনেস্থা!—আমাদের মাকে তুমি কখনো মা বলে ডাকবে না—ডাকলে ভালো হবে না। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে সারা। অথচ যাঁকে মা ডাকার জন্য তার পীড়ন চলছিলো তিনি একবারটি তাকে কাছে ডেকে একটু সান্ত্বনা পর্যন্ত দিলেন না—আদর করা তো দূরের কথা। খাওয়া পরার কষ্ট তো আছেই—অভাবের সংসার সেজন্য অভিযোগ করার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে কি স্নেহ মায়া মমতাটুকু পর্যন্ত শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে!

রমেশ হাঁটার গতি কমিয়ে দিলে। তারপর বুঝি উর্মিলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলে—যাক্ আর ভাববার কিছু নেই। মন স্থির করে ফেলেছি। ওকে মিশনারিদের চ্যারিটি হোমে দেবো। ধর্মান্তরিত হোক ক্ষতি নেই। তবুও তো খেয়ে পরে মানুষের মতো বেঁচেবর্তে থাকবে। কথা সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রমেশ সশব্দে দরজা খুলে বার হয়ে গেলো।

উর্মিলা এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে স্থাণুর মতো নিশ্চল নিঃশব্দে স্বামীর আত্মবিলাপ শুনছিলো। তার বিস্ময়ের কারণ এমন উর্মিলার নিকট

দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ। কিন্তু যেই মুহূর্তে দরজা খুলে রমেশ বাইরে বেরলো উর্মিলা অস্থির হয়ে পিছু পিছু ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বললে—এ তুমি কি করছো? এত রাতে কোথায় চলেছ? তোমার পায়ে পড়ি—তুমি স্থির হও, ঘরে চলো।

স্ত্রীর কথা কানে যেতেই উত্তেজিত রমেশের সম্বিত ফিরে এলো। না না, আমি কোথাও যাচ্ছি না। ঘরের ভেতরটা গুমোট তাই খোলা হাওয়ায় বাইরে এসেছি। তুমি গিয়ে শোও। আমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসছি।

স্বামীর আশ্বাস সত্ত্বেও উর্মিলা অনেকক্ষণ অবধি বারান্দায় অপেক্ষা করলো। মৃতা ঠাকুরঝির শিশু কন্যা অযত্নে অবহেলায়, অভাব অনটনের মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছে। ইহাই স্বামীর বিষাদ ও মনোবেদনার কারণ। ভাগনীকে ঐ নোংরা পরিবেশ থেকে মুক্ত করে এনে নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করাই স্বামীর একান্ত ইচ্ছা। তার এই ইচ্ছাকে রূপদান করে তাকে সুখী করতে উর্মিলা ব্যগ্র ও বদ্ধপরিকর হলো। স্বামীর নিকট তার সেই ইচ্ছাকে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই বুঝি উর্মিলা এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু রমেশ স্ত্রীকে দেখেও যেন দেখতে পেলে না। আপন মনের অন্ধ ভাবাবেগে সে কেবল বারান্দার এধার থেকে ও-ধার পাইচারি করছে।

নিরাশ হৃদয়ে উর্মিলা ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। স্বামী ঘরে না ফেরা পর্যন্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কেবল বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে। স্বামীর উপেক্ষা অবজ্ঞা উর্মিলাকে রূঢ় আঘাত করে। এই পরিস্থিতিতে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য নিজের কর্মপন্থা স্বামীর নিকট অব্যক্ত রেখেই উর্মিলা অগ্রসর হতে সংকল্পবদ্ধ হয়।

হঠাৎ খুট করে একটা আওয়াজ হতেই উর্মিলার নজরে পড়ে স্বামী দরজা বন্ধ করছে। বিছানায় এসে বালিশটা নিয়ে সে খানিকটা সরে শোয়। রমণীর মন—হয়তো আশা করেছিলো স্বামী শয্যা গ্রহণ করে [illegible] করে তাকে কাছে টেনে না নিলেও পাশে শুয়ে এমন কিছু [illegible] যাতে তার সব অভিমান অভিযোগ ধুয়ে মুছে যাবে। হায়, তার [illegible] অপেক্ষা বৃথা। রমেশ বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মতো [illegible] দিকে পাশ ফিরে পড়ে থাকে। দুরন্ত অভিমানে আহত উর্মিলার [illegible] চাপা দীর্ঘশ্বাস গভীর রজনীর নীরব নিস্তব্ধতা মথিত করে নিঃশব্দে

অশ্রুমোচন করতে থাকে। দূরে জেলখানার ঘন্টাধ্বনি রাত্রি একটা ঘোষণা করে। শ্রান্ত ও চিন্তা-ক্লিষ্ট উর্মিলা নিজের অজ্ঞাতেই কখন যেন নিদ্রাবিষ্ট হয়।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠেছে—গাছে গাছে পাখীর কলকাকালী শুরু হয়েছে। অভ্যাস মতো উর্মিলার ঘুম ভেঙে যায়। চেয়ে দেখে স্বামী একই অবস্থায় শুয়ে আছে। নিদ্রিত কিনা বোঝা গেলো না। উর্মিলা বিছানা ছেড়ে নেমে এলো। স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। তবুও উর্মিলাকে খুব ভোরেই উঠতে হয়। কেননা রমেশ সকাল সাড়ে আটটায় আপিসে চলে যায়। প্রভাতের নিত্য কর্মের মধ্যে উর্মিলা তার ভাগনীকে কিভাবে জ্যেঠা জেঠীর হেপাজত থেকে ফিরিয়ে আসবে সারাক্ষণ সে চিন্তায় ব্যস্ত। চা খেয়ে রমেশকে বেরিয়ে যেতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করে—আপিস যাবে না?

—হাঁ, বলেই রমেশ দ্রুত পদে বেরিয়ে যায়।

বাড়ী ফিরতে রমেশের দেরী হয়ে যায়। গোগ্রাসে দুটি ভাত গিলেই সে হন্তদন্ত হয়ে আপিসে ছোটে। উর্মিলা কিছু জিজ্ঞাসা করার অবসর পর্যন্ত পায় না।

ইতিমধ্যে উর্মিলা তার পরিকল্পনা রূপায়ণের কর্মসূচী স্থির করে ফেলেছে। তদনুযায়ী রমেশ বেরিয়ে যেতেই সে স্নানাহার সমাধা করে, এবং ঝি আসা মাত্রই বাড়িতে তালা দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে।

দেবর নরেশের বাড়ীর দুয়ারে এসে উর্মিলা ডাকে—ছোটো বাড়ি আছিস? ভেতর থেকে কোন সারা না পেয়ে উর্মিলা কড়া ধরে নাড়া দেয়। ছোটজা বেরিয়ে আসে। উর্মিলাকে দেখে অবাক হয়ে বলে—ওমা, মেজদি যে, এসো এসো। উর্মিলা ঘরে গিয়ে বসে। এই অবেলায় শুয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করতে অলকা মুচকি হেসে বলে—শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

উর্মিলা অলকার হাসির কারণ অনুসন্ধানের জন্য তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বলে,—ওমা, তাই নাকি? সুখবরই দিলি। [illegible] থাকিস। এ সময়টা মায়ের কাছে থাকাই ভালো। [illegible] ঠাকুরপোকে বলবো'খন।

—যাক, ওসব কথা ছাড়ো। এখন বলো, হঠাৎ কিবা হেতু তব আগমন?

—কেন কারণ ছাড়া কি আসতে নেই? ঊর্মিলা হেসে ফেলে।

—তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে? কবে সেই তুর্গোপুজোর পর একদিন এসেছিলে। তোমার শরীরও তো দেখছি ভালো নয়।

—আমার শরীর এর থেকে ভালো দেখেছিস কবে? যাক্ আর বসতে পারছি না—অনেকটা দূর যেতে হবে। তোর মেজভাশুর আপিস থেকে এসে পড়বে। ঘরে তালা দেওয়া। ঠাকুর পোর সঙ্গে দেখা হলো না। তুই ভাই তাকে সন্ধ্যার পর একবার অবশ্যই আমার নিকট পাঠাবি, ভুলিস না যেন। জা অলকার কাছ থেকে কথা আদায় করে মুখে একটা পান পুরে ঊর্মিলা উঠে পড়ে।

ঊর্মিলা বাড়ি পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই রমেশ আপিস থেকে আসে। চাটা খেয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঊর্মিলাকে বলে যে তার ফিরতে দেরি হবে। ক্লাবের কাজ সেরে সে একবার দাদার কাছে যাবে।

শুনে ঊর্মিলা ভালোমন্দ কিছুই বলে না। বুঝলো দাদার বাড়ি যাবার উদ্দেশ্য ভাগনীকে মিশনারিদের হাতে সঁপে দেওয়া বিষয়ে সলা পরামর্শ করা। সুতরাং তার নিজের মতলব যাতে ফাঁস হয়ে না পড়ে। স্বামী যাতে ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও টের না পায় সে জন্য তাকে আরো গোপনতার আশ্রয় নিতে হবে এবং হুশিয়ার হতে হবে। কিন্তু দাদার ওখান থেকে স্বামী যদি আবার ছোট ভাইয়ের কাছে যায় তা হলেই তো চিত্তির! ঠাকুর পো এলে তাকে সাবধান করে দিতে হবে।

অন্যমনস্ক হয়ে ঊর্মিলা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলো। কখন যে সন্ধ্যা দিনের আলো গ্রাস করতে করতে এসে তার ছোট্ট উঠোনটুকুতে জাঁকিয়ে বসেছে তা নজরে পড়েনি। খেয়াল হতেই ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে শঙ্খ প্রদীপ ধুনোচি হাতে তুলসী মঞ্চের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। দীপ জ্বেলে ধুনো দিয়ে শঙ্খ ধ্বনি করে ঊর্মিলা হাঁটু গেড়ে গলবস্ত্র হয়ে তিনবার মাটিতে মাথা ঠুকে ঈপ্সিত দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ মাঙেন।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খিল খুলে দিয়ে আগন্তুককে দেখেই ঊর্মিলা বলে—এসো ঠাকুর পো।

নরেশ ভেতরে পা দিয়েই চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করে—এত জরুরী

তলব কেন? অলকাকে প্রশ্ন করলাম। সে কিছু বলতে পারলো না। তা তুমি এতটা পথ কষ্ট করে কেন গেলে বলো তো? একটা খবর পাঠালেই আমি চলে আসতাম।

—সে সৌভাগ্য কি আমার হবে? আর আমি লোকই বা পাবো কোথায়, বলো? কে আছে যাকে তোমার নিকট পাঠাতে পারি। তুমি তো সেই যে কয়েকমাস আগে এলে তারপর আর তোমার টিকিটির দেখা নেই। তাই ভাবলাম—পর্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যেতে হবে। গরজ বড় বালাই কিনা!

—মেজদাকে বললেই পারতে।

—হুঁ, বলেছ ভালো। ঐ আপিসের চাকরি করে লোকটা হিমশিম হচ্ছে তার উপর…যাক, ওসব আলোচনা না করাই ভালো, তুমি গিয়ে ওঘরে বসো। অনেকটা পথ এলে। আমি চা করে আনছি।

এক কাপ চা সেই সঙ্গে একটা প্লেটে হালুয়া আর দু'খানা লুচি নিয়ে উর্মিলা উপস্থিত।

নরেশ হাত বাড়িয়ে চা-এর কাপটা নিয়ে বলে—এসব আবার কেন?

—চ-এর সঙ্গে টা না দিলে অতিথি খুশী হবে কেন? আর গেরস্থের-ই বা মান ইজ্জত বজায় থাকে কি করে? বিশেষ করে তুমি তো অতিথিরও বাড়া। উর্মিলা হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

—বাড়িতে ডেকে এনে খুব বলছো বটে! নরেশ হেসে ফেলে। তারপর চা-এ চুমুক দিয়ে কি জন্য জরুরী তলব তা জিজ্ঞাসা করে।

– তা বলবো বলেই তো ডেকেছি। কিন্তু তোমাকে হলফ করতে হবে ঠাকুরপো যে বিষয়টা যেন অন্যের কানে না যায়। উর্মিলার কথায় মিনতির সুর।

নরেশ বিস্মিত! মুখে বলে—কিন্তু তোমার বক্তব্য অপ্রকাশিত রেখে তুমি আগের ভাগেই আমার জবান বন্ধ করতে চাইছো! এও একপ্রকার মেয়েলি জুলুম! নরেশের কণ্ঠে কাতর ভাব ফুটে ওঠে।

—তোমার উপর কোনদিন কোন জুলুমবাজি করেছি এমন অপবাদ নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দিতে পারো না। তোমাকে কোন অন্যায় অনুরোধ আমি করবো না, কিংবা তুমি পারবে না এমন সাংঘাতিক কিছুও তোমাকে করতে বলবো না। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার এবং আমাকে হলফ-নামা পড়িয়ে নিতে পারো।

নরেশের কৌতূহল ততক্ষণে তুঙ্গে উঠেছে। বিষয়টা ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য সেও উদ্‌গ্রীব। সুতরাং অগত্যা বলে ফেলে—আচ্ছা, তুমি যখন এত করে বলছো তখন কথা দিচ্ছি—কিন্তু অলকা সম্পর্কে তোমাকে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবো না। তোমার গমন এবং তোমার সকাশে আমার আগমনের কারণ অবহিত হবার জন্য ইতিমধ্যে ওর পেটে প্রচুর বায়ু জম্মেছে। সুতরাং বাড়ি ফিরে ওর প্রশ্নের উত্তর তাইরে নাইরে করে এড়িয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারলে যে বাতাবরণের সৃষ্টি হবে তার ধাক্কা সইবার মতো তাগাত আমার নেই মেজবৌদি।

উর্মিলা হেসে ফেলে বলে,—বেশ বেশ, অলকা সম্পর্কে তোমার যা অভিরুচি করো। কিন্তু অন্যের নিকট একেবারে স্পিকটি নট—এমনকি তোমার মেজদাকেও নয়। মনে থাকে যেন।

মেজদার নামোল্লেখে নরেশের মনে সন্দেহ দোলা দেয়। তবুও মুখে বলে—কথা যখন দিয়েছি নিশ্চিন্ত থেকো। আর ধানাইপানাই ভালো লাগছে না বাপু। এখন আসল কথাটা বলে ফেলো দেখি। তবে লক্ষণ ভালো মনে হচ্ছে না—তোমাকেও আবার কত্তাব মতো বাতিকে ধরেছে কিনা কে জানে!

—সে আবার কি?

—এই ধরো, প্রয়োজন অপ্রয়োজনে অন্যের ব্যাপারে মাথা গলানো—সেধে অন্যের উপকার ইত্যাদিকে রোগ ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া যায় বলো?

—না ভাই, ওসব বালাই টালাই আমার নেই। তোমার কথার জের টেনেই বলছি—তোমার মেজদা রাম কিনা জানি না। তবে তুমি যে দেবর লক্ষণ নও আর আমিও জনক তনয়া সীতা নই তা বিলক্ষণ জানি। ত্রেতা যুগে ভ্রাতৃজায়া সীতাকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য দেবর লক্ষণ গণ্ডী এঁকে দিয়েও তাকে রক্ষা করতে পারে নি। আর এ ঘোর কলিতে ভ্রাতৃজায়া দেবরকে তার গণ্ডীর বাইরে যেতে প্রলুব্ধ করেও তাকে সর্বরকম মুশকিল আসানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সুতরাং—'মাভৈঃ'। আমার অনুরোধ এতই ক্ষুদ্র ও সামান্য যে তা না রাখবার মতো কিছু নয় কিংবা তোমার অসাধ্য নয়। বিষয়টা—আমি ঠাকুরঝির বাড়ি যাবো—সঙ্গে যাবে তুমি। এতে সাপ ব্যাঙ, হাতি ঘোড়া কিছু নেই।

মেজবৌদির কথা শুনে নরেশের এবার সত্যিই অবাক হবার পালা।

তার মনে যে সন্দেহের ছায়া পড়েছিলো তা ঘনীভূত হলো। কতকটা জেরার মতোই জানতে চাইলে—হঠাৎ ও-বাড়ি যাবার এমন কি প্রয়োজন ঘটলো, বলো তো? তাও আবার মেজদার অজ্ঞাতে অগোচরে?

বিয়ের পরে তোমার দাদা একবার ও-বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলো। তারপর আর যাওয়া ঘটেনি। ও বাড়ীর বাচ্চাগুলোর জন্য কিছু খেলনা ও জিনিষ পত্তর কিনেছি। সেগুলি ওদের দেবো আর দেখে আসবো ওরা সকলে কেমন আছে। তাছাড়া অনেকদিন বাড়ির বার হইনি। আমারও তো একটু আধটু বেরোবার শখ হতে পারে। কি বলো? তাই ভাবলাম কুটুম্ব বাড়ি থেকেই বেড়িয়ে আসি—রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। আর তুমি হবে সাথী। তোমার মতো সঙ্গী দ্বিতীয় কোথায় পাবো!

নরেশের সন্দেহ মেজবৌদির জবাবে উপশম হলো কিনা বোঝা গেলো না। সে হাসতে হাসতে বললে—সবই বুঝলাম। তবুও বলছি মেজদাকে নিয়ে যাও। তাতে তোমার ভ্রমণের আনন্দ মধুর হতো না কি!

—আমার পোড়া কপাল! তা আর হলো কোথায়! কারণ তো তোমাকে আগেই বলেছি ঠাকুরপো। ঊর্মিলার কণ্ঠে হতাশা ধ্বনিত হলো।

—কিন্তু আমার ঝামেলা তো কম নয়। অনেক দূরের পাল্লা। যেতে আসতে পাক্কা একটা দিন পুরো লাগবে। আমার অতো সময় কোথায়?

—তুমি পেছপা হচ্ছো ঠাকুরপো। আমাকে তুমি জবান দিয়েছো। এখন তোমার ওজর আপত্তি আমি কিছুই শুনবো না। তুমি সাফ সাফ জবাব দাও যাবে কি যাবে না? ঊর্মিলা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আত্মসমর্পণের সুরে বলে—কথায় আছে না—পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। জানতাম তোমার হাতে যখন পড়েছি এমন একটা বিভ্রাট ঘটবেই। যাকগে, কথা যখন দিয়েছি তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বলো কবে যেতে চাও।

—আগামী কালই, ঊর্মিলার কণ্ঠে স্পষ্ট দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

—ওরে বাবা, এত তপ্ত গরজ! কিন্তু তা কি করে হয়? আপিস থেকে ছুটি নিতে হবে, তবে তো!

—শ্বশুরের আপিস—সেখানে আবার ছুটির দরকার হয় নাকি ? আহা, আমি যেন আর জানি না ! চাকরকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিও তাতেই হবে।

—তোমার কথায় গলদ আছে মেজবৌদি। শ্বশুরের আপিস বলেই তো আমাকে আরো ভীষণভাবে আইন কানুন মেনে চলতে হয়। না হলে অন্যেরা প্রশ্রয় পাবে না ? যাক, ওসব আলোচনা থাক, সে আমি ম্যানেজ করে নেবো'খন। তোমার যখন ইচ্ছা, বেশ কালই যাওয়া হবে। কখন রওনা হবে বলো ?

—সে তুমি বলবে—আমি তার কিবা জানি ! তোমার মেজদা তো ঘড়ির কাঁটা ধরে বেলা সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যায়। তার পরেই আমার ছুটি। সুতরাং তুমি বলো, কখন আসবে। এখানে খাবে তো ?

—না না। খাওয়াদাওয়ার পাট করো না। ওতে অনর্থক দেরি হয়। আমি ঠিক বেলা সোয়া ন'টায় একেবারে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে হাজির হবো। তা হলেই দশটার গাড়ি ধরা যাবে। তারপর আবার ঠিকমতো ফেরাও সম্ভব হবে। আমি এখন যাচ্ছি। নরেশ উঠে দাঁড়ায়।

—আচ্ছা এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। অনেক ধন্যবাদ। ঊর্মিলা দরজা পর্যন্ত নরেশকে এগিয়ে দেয়।

নরেশ বেরিয়ে যেতেই ঊর্মিলার সারা মুখে একটা গর্বমিশ্রিত তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে ! তার অভিনয় নিখুঁত হচ্ছে—কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটছে না তো ! স্বামীর মতলব বানচাল করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাঁসিল করবার জন্য সে উঠে পড়ে লেগেছে। তাকে বুঝি অদ্ভুত এক নেশায় পেয়েছে ! এযেন এক মান সম্মানের লড়াই-এ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর জয়মাল্য তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। স্বামীকে সে দেখিয়ে দেবে- সেও কিছু ফেলনা নয়—যত্র অপবাদ অবহেলা মেয়েমানুষ বলে করা হোক না কেন।

ঊর্মিলা রান্না সেরে ঘরে এসে বসে। লণ্ঠনটা উস্কে দিয়ে টেবিলের ধারের র‍্যাক্ থেকে একখানা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। মন বসলো না। পাশের বাড়ির মেয়েটি অর্গান বাজিয়ে গাইছে···নীপ বনে ছায়া বীথি তলে···। অন্যদিনের চাইতে এখন যেন মেয়েটির গলা অদ্ভুত মিষ্টি মনে হলো। মনটা উদাস হয়ে যায়। আপন হৃদয়ের শূন্যতা যেন বড় বেশি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিন যাবৎ কি যে হয়েছে

—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর বাধা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। অন্য কিছু দূরে থাক মন খুলে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

অথচ এরূপ পরিস্থিতির জন্য সে মোটেই দায়ী নয়! স্বামীর অবিশ্বাস, একগুঁয়েমি ও অস্থির মনোভাবের জন্য ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। কেন, নিজের কথা একবার মনখুলে স্ত্রীকে বললে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো! না, এ অবস্থা আর কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না। যাক্, আর তো মাত্র একটা রাত্রি! আপন গৃহে ভাগ্নীকে হঠাৎ আবিষ্কার করে স্বামী যুগপৎ হর্ষ আর বিষাদে কতখানি অভিভূত হবে সে দৃশ্য যেন ঊর্মিলা মনশ্চক্ষুতে এখনি উপভোগ করছে।

কতসময় এরূপ চিন্তা-নিমগ্ন অবস্থায় ঊর্মিলার কেটেছে তা তার খেয়াল নেই। হঠাৎ টেবিলের উপর ছোট টাইমপিস ঘড়িটার টিক টিক শব্দ তার কানে বেজে তাকে সচকিত করে। চেয়ে দেখে ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে ন'টায়! স্বামীর ফিরতে তো এতো দেরী হবার কথা নয়। বিশ্বাস নেই, এতো ভাবপ্রবণ ও একগুঁয়ে স্বামী হয়তো দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে ইতিমধ্যে আবার এক লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসেছে! উৎকণ্ঠিত ঊর্মিলা আর চুপ করে থাকতে পারেনা। ডিজ লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দেয়—জনমানবের চিহ্ন নেই। পাড়াটা একেবারে নিঝুম! পাশের বাড়ির রান্না ঘরের হাতাবেড়ির ঠুং ঠাং আর ঝাটার শব্দ অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। ঊর্মিলা এখন কি করবে? খোলা দরজার সামনে এভাবে স্বামীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে, না বেরিয়ে বড় রাস্তা অবধি যাবে? কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে? সে যে বড় লজ্জার কথা হবে। দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কিছু সময় অতিবাহিত হয়। ঊর্মিলা এবার লণ্ঠন হাতে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। রমেশ এসে সামনে দাঁড়ায়। ঊর্মিলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এত রাত্রে স্ত্রীকে লণ্ঠন হাতে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমেশ বিস্মিত। জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছিলে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

কেন, তা আবার জিজ্ঞেস করছো? এতরাত্রে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে এসো—তোমার কথার জবাব দেবো। রমেশ ভেতরে

আসতেই উর্মিলা দরজায় খিল এঁটে দিয়ে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে আসে। হাতের লন্ঠনটা নামিয়ে রেখে একটু ঝাঁঝালো সুরেই বলে—ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখো কটা বেজেছে। আমি ভেবে ভেবে আর বাঁচিনা। অবশ্য আমাকে যদি হৃদয়হীন আবেগ অনুভূতি বিহীন একটা জড় পদার্থ কিংবা মাটির পুতুল মনে করে থাকো তবে স্বতন্ত্র কথা! ঘরে টিঁকতে না পেরে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিলাম।.

রমেশ নিরীহ কণ্ঠে বলে—পাড়াটা ভালো নয় জানো তো। সেদিন ওবাড়ির বউটিব গলার হারছড়া কিভাবে ছিনিয়ে নিলে! তাই বলছিলাম রেতে বিরেতে এভাবে একা বেরোনো ঠিক নয়।

—গবজ বড় বালাই। এতো শুধু বাড়ির চৌহদ্দিব মধ্যে বেরিয়েছি! প্রয়োজনে হলে আরো অনেক দূর যেতাম—এমন কি তোমার দাদার বাড়ি অবধি ধাওয়া করতাম!

উর্মিলার এরূপ আত্মম্ভরি উক্তি বমেশের নিকট একেবারেই নতুন ও অভাবিত। হতবাক হয়ে সে কিছুক্ষণ উর্মিলাব মুখেব দিকে চেয়ে থাকে! সে কি জবাব দেবে? উর্মিলার উত্তরেব মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই। কিন্তু তবুও তার মনে হলো এমন তো আগে কখনও শোনেনি। উর্মিলার বক্তব্যের মধ্যে যেন অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয় ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কিছুক্ষণ আগে দাদার বাড়িতেও এমন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে—সবাই যেন তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে! তাকে বুঝি আর কেউ সহ্য করতে পারছে না!

উর্মিলা বুঝলো তার জবাব স্বামীর মনঃপুত হয়নি—অধিকন্তু তাকে আঘাত দিয়েছে। আবহাওয়া লঘু করবার উদ্দেশ্যে সে মুচকি হেসে বলে—কি ব্যাপার, হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো! সেই পরিচিত অতি পুরাতন মুখ—তালগোল পাকানো একটা কাদা মাটির ডেলা। যাও আর দেরী করোনা—রাত্রি অনেক হয়েছে।

স্বল্পবাক উর্মিলার আজ এ কি রূপ এবং প্রগলভ উক্তি! রমেশের চোখে মুখে অসহায় কাতর ভাব ফুটে ওঠে। সে নীরবে কলঘরেব দিকে প্রস্থান করে।

স্বামীর অসহায় নিষ্প্রভ ভাব উর্মিলার করুণার উদ্রেক করে। সে এক-দৃষ্টে তার যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে। কলতলা থেকে ফিরে আসার

পরে স্বামীকে কিছুটা সজীব মনে হয়। তার মনের উত্তাপ হয় তো শীতল জলের স্পর্শে কিছুটা প্রশমিত হয়েছে।

খেতে বসে উর্মিলা হাসতে হাসতে বলে—কিছু যদি মনে না করো তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

রমেশ গম্ভীর কণ্ঠেই জবাব দেয়—অবশ্যই।

—বলছি, বঠ্ঠাকুরের ওখানে ঝগড়াঝাটি হয় নি তো ?

রমেশ ম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয়—ঝগড়াঝাটি করতে হয় না। ও আপনা থেকেই হয়। পরস্পরের স্বভাব, মনের ভাব আর চিন্তাধারা যেখানে বিপরীত-ধর্মী, স্বার্থ যেখানে প্রবল আর একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক সেখানে উভয়ের সান্নিধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য। তা সত্ত্বেও আমরা একে অন্যকে জানি চিনি এবং বুঝি। আমাদের মধ্যে মতান্তর হলেও মনান্তরের অবকাশ অল্পই।

উর্মিলা বুঝলো স্বামীর বক্র উক্তির মধ্যে কিছুক্ষণ পূর্বেকার তার ভাষণ ও আচরণের প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষ রয়েছে। মনে মনে রুষ্ট হলেও স্বামীকে আর আঘাত দেবে না বলেই সে স্থির করেছে! সুতরাং হঠাৎ খিল খিল হেসে বলে—যাক্ তবুও মন্দের ভালো!

উর্মিলার সে হাসিতে বুঝি মাদকতার সঙ্গে ছিলো আঁখির আকর্ষণ! চিরন্তন নারী পুরুষকে যে ভাবে নিয়ত চুম্বকের মতো কাছে টানছে—না হলে রমেশ উর্মিলার উত্তরে কিসের ইংগিত রয়েছে তা না বুঝেই হাসলে কেন!

স্বামীর হাসির আমেজ থাকতে থাকতেই নিজের কথা পাড়বার উত্তম সুযোগ বুঝেই উর্মিলা বলে—আগামী কাল আপিস যাবার সময় তোমার সঙ্গে টিফিন দিয়ে দেবো। আপিসের পরে টিফিন খেয়ে ক্লাবে যেও এবং সেখানের কাজ সেরে বাড়ি এসো। আমি একটু বেরবো। যদি ফিরতে দেরী হয় সে জন্যই এই ব্যবস্থার কথা বললাম।

সে রাত্রে একই শয্যায় শায়িত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর কোন বাক্য বিনিময় হয়নি। উভয়েই আপন উদ্দেশ্য সাধনের চিন্তায় সমাহিত। স্বামীর ভাবনা কি ভাবে ভাগ্নীকে সংসারের অযত্ন অবহেলা আর স্বার্থপরতার কলুষ থেকে সরিয়ে নিয়ে মিশনারীদের হাতে সঁপে দিয়ে অবোধ শিশুকে রক্ষা করবে। আর স্ত্রীর চিন্তা স্বামীর অগোচরে কিভাবে শিশুটিকে নিয়ে

এসে স্বামীর প্রচেষ্টা ধানচাল করবে এবং আপন সন্তানের মতো তাকে লালন পালন করে স্বামীর প্রকৃত ইচ্ছা ও বাসনাকে ফলবতী করবে।

ভোর হতে না হতেই ঊর্মিলা উঠে পড়ে। যথারীতি রান্না বান্না সেরে স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে হাতে টিফিন কৌটো দিয়ে আপিস রওনা করিয়ে দেয়। এত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও ঊর্মিলার মনের মধ্যে সারাক্ষণ কেবল জল্পনা কল্পনা চলেছে—উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হলে কি ভাবে তা অতিক্রম করবে!

স্বামী চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ঝি আসে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে ঊর্মিলা প্রস্তুত। ঘড়ির কাঁটা তখন সোয়া-নটায়। এখনো ঠাকুর পো আসছে না কেন? ঊর্মিলার ভয় হলো। তবে কি সে কথার খেলাপ করলে? উদ্বিগ্না ঊর্মিলা অস্থির হয়ে ঘরবার করছিলো। অবশেষে তার সকল ভাবনা চিন্তার অবসান করে নরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

ঊর্মিলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার ঠাকুরপো, এত দেরী যে?

—আর বলো কেন? আপিসের সময় ঘোড়ার গাড়ির কদর বাড়ে। সব বাবুরা তখন মনে হয় যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি—গাড়ি চড়ে আপিস যাবে! আর গাড়োয়ান প্রলেতারিয়া বেটাদের সে কি দেমাক! এক এক জন যেন রাশিয়ার জার হয়ে কোচবাক্সে বসে আছে। না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন—কথাই বলতে চায় না! ডবল ভাড়া কবুল করে তবে না একটা গাড়ি পেয়েছি! চলো, আর দেরী করলে কিন্তু রেলগাড়ি ধরতে পারবো না—সব ভেস্তে যাবে!

নরেশের হাতে একটা পোঁটলা গুঁজে দিয়ে ঊর্মিলা বেরিয়ে পড়ে। স্টেশনে পৌঁছে গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। ঊর্মিলা আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে—উঠোন সমুদ্র তো পার হলাম ঠাকুর! সম্মুখের অকূল অচেনা দরিয়া যেন ভাল ভাবে পাড়ি দিয়ে পারে ভিড়তে পারি। সঙ্গে সঙ্গে বাধা বিপত্তি কিভাবে অতিক্রম করবে মনে মনে তারও একটা রিহার্স্যাল দেয়। হঠাৎ পাশে-বসা নরেশের উপর দৃষ্টিপাত করতেই ঊর্মিলা বিস্মিত! উদাসভাব নরেশ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। গাড়ি তখন রেল কলোনীর ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে। দূরে রেলের বড় বড় কারখানা গুলোর ইটের তৈরি মোটা মোটা চিমনিগুলি আর তাদের শীর্ষে অবস্থিত ত্রিশূলাকৃতি লৌহশলাকা যেন আকাশ ফুঁড়ে

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে কিংবা দূরে টিলার উপর রৌদ্রস্নাত সাদা ধবধবে বাড়িগুলি ঊর্ধ্বে শরতের স্বচ্ছ নির্মল গগনে শ্বেতশুভ্র খণ্ডখণ্ড মেঘ-গুলোর দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে। আশে-পাশের ঘাট বাট মাঠ সব পুষ্পবিহীন কৃষ্ণচূড়া গাছে ছেয়ে আছে—নিবিড় সবুজের মেলা। গাড়ির বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন সবুজ-বন্যা ঢেউ তুলে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। বাঁয়ে দৃষ্টি ফেরাতেই হঠাৎ একফালি নীল সমুদ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঝাঁ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। সব মিলে এক অবর্ণনীয় মায়াময় মনোমুগ্ধকর সুন্দর পরিবেশ। ঊর্মিলার অন্তরের অন্তস্থলে বুঝি কিসের গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যায়। শরীরে বিনা কারণে পুলক সঞ্চারিত হয়।

গাড়ির ফাঁকা বেঞ্চিতে ঠাকুরপো বৌদি নির্বাক। উভয়ের দৃষ্টিই বাইরে নিবদ্ধ—বুঝি নৈসর্গিক দৃশ্যে মশগুল। ঊর্মিলাই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে—কি ঠাকুরপো ব্যাপারখানা কি? এত উদাসী হয়ে কি দেখছো? শেকলে টান পড়েছে নাকি? না, অন্য কিছু!

তুমিও তো কিছু কম যাওনা! যদি জিজ্ঞাসা করি ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর মতো অচঞ্চল দৃষ্টিমেলে এতক্ষণ কি দেখছিলে?

ঊর্মিলা একটু লাল হয়ে হেসে বলে—দৃষ্টিটাই শুধু বাইরে নিবদ্ধ দেখেছো। মনের খবর তো জানো না। এমনও তো হতে পারে চিন্তার সঙ্গে দৃষ্টি সম্পর্ক-লেশ-হীন!

—আমি কিন্তু ভাবছি তোমার আসল মতলবখানা কি? তোমার যাবতীয় কথাবার্তা একসূত্রে গেঁথে কিছু হদিশ করতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে—এহ বাহ্য—আসল কথা নয়! তোমার মনে গভীরে অন্য কিছু খেলছে!

—তুমি পণ্ডশ্রম করছো ঠাকুর পো। গাঁথবার মতো কিছু থাকলে তো দিশে পাবে!

—তবু তোমাকে সাবধান করছি—তোমার মনে যদি অন্য কোন মতলব থেকে থাকে তা পরিত্যাগ করো।

ঊর্মিলা হেসে ফেলে!—তুমি অত সিরিয়াস হয়ে কি বলছো বা বলতে চাইছো বুঝলাম না। তথাপি তোমার বিজ্ঞজনোচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। সুকৌশলে কথার মোড় ঘোরাবার উদ্দেশ্যে ঊর্মিলা খিল খিল করে হেসে ফেলে বলে—তুমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছো ঠাকুরপো! মিষ্টি খাওয়াবার ভয়ে তুমি অমন একটা সুখবর আমায়

নিকট চেপে গেছো। বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক হলেও তোমার হিতের জন্যই বলছি—অলকাকে মায়ের কাছে রেখো। একে নতুন তার ওপর বয়স হয়েছে। তুমি এ ঝক্কি সামলাতে পারবে না।

মেজবৌদির হিতোপদেশ শুনে নরেশের কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলো না। সে মুচকি হেসে করুণ দৃষ্টিতে বৌদিকে নিরীক্ষণ করে তারপর জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি তখন তেপান্তর মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে।

নির্দিষ্ট স্টেশনে যখন গাড়ি থামলো ছায়ায় সূর্যদেব তখন প্রায় মাথার ওপর। গ্রাম্য পথে খানিকটা দূর যেতে হবে। নরেশ গরুর গাড়ির প্রস্তাব করে। ঊর্মিলা তা নাকচ করে দিয়ে আগে আগে হাঁটতে থাকে। তার মন তখন অত্যুগ্র উৎসাহে উদ্দীপিত। সুতরাং হেঁটে যাওয়াটা তার নিকট কোন বাধ'ই নয়। রাস্তার দু'ধারে মাঠে মাঠে পাকা ধান। যেদিকেই দৃষ্টি যায় শুধু দিগন্তব্যাপী সোনালী রঙের মাতামাতি। মাঝে মাঝে হরিৎ গাছপালা ছাওয়া ছোটো ছোটো গ্রাম—পীত সমুদ্রে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ! মৃদুমন্দ বাতাস নাতিপ্রখর সূর্যকিরণে ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে যেন খেলা করছে। পাকা ধানের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে। এ পরিবেশে বুঝি নেশা আছে! ঊর্মিলা নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে সুখী মনে হেঁটে চলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কুটুম্ব বাড়িতে পৌঁছে।

নরেশ ও ঊর্মিলার অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আগমনে কুটুম্ববাড়িতে সাড়া পড়ে যায়। অল্পবয়স্করা তাদের চতুর্দিকে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। গৃহকর্ত্রী তখন অন্যত্র ব্যস্ত। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—ওমা, কুটুম্ব যে, কি সৌভাগ্য! ঊর্মিলার হাত ধরে বলেন—আগে থেকে একটা খবর দিয়ে এলে না কেন বোন!

ঊর্মিলা প্রণাম করে বলে—তার আর সময় পেলাম কোথায়! কতদিন ধরেই তো আসবো আসবো করছি। কিন্তু কে নিয়ে আসবে? কারুর সময় নেই। শেষে ঠাকুরপোকে পাকড়াও করলাম। একরকম জোর করেই ধরে বেঁধে নিয়ে এলুম—জিজ্ঞাসা করুন—ঠিক কিনা!

গৃহকর্ত্রী নরেশের দিকে চাইতেই সে এগিয়ে এসে তাকে প্রণাম করে কুশল জিজ্ঞাসা করে। কথার ফাঁকে ফাঁকে নরেশ চারদিকে চেয়ে যাকে খুঁজছে তাকে দেখতে পায় না। একবার ভাবলে ভাগ্নী সম্পর্কে

গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু কি ভেবে চুপ করে যায়। গণ্ডগোল শুনে গৃহকর্তার দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ জানতে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দায় এসে নরেশকে দেখে উচ্চকণ্ঠে হাঁকলেন
—আরে নরেশ যে, এসো এসো, কখন এলে ?

নরেশ প্রণাম করে বলে—এই তো এলাম, আপনি ভালো আছেন তো !

—আমাদের এই বয়সে থাকা না থাকা সমান হে ! তোমাদের খবর সব ভালো তো ?

নরেশের দেখাদেখি উর্মিলাও এসে প্রণাম করে। কর্তা তার মাথায় হাত দিয়ে—চিরায়ুষ্মতী হও বলে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর নরেশকে নিযে ঘবে চলে যান।

গৃহকর্তা চলে যেতেই কর্ত্রী উর্মিলাকে বলেন—চলো বোন, আর কতক্ষণ বাইবে দাঁড়িয়ে থাকবে ? ছেলে পুলেব দিকে তাকিয়ে বলেন —এই তোবা সব এখানে ভিড় করছিস কেন ? দুপুর রোদে আবার কোথায় টো টো করতে বেরুবে। যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

মায়েব কথা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। উর্মিলার পিছুপিছু ঘবে ঢুকলো। মা চোখ রাঙাতেই উর্মিলা বাধা দেয়—থাকনা দিদি, আমি যতক্ষণ আছি, ওরা আমার কাছেই থাক। আমার কোন অসুবিধাই হবে না। এসো তোমরা আমার কাছে সরে এসো। তারপর হাতেব পুঁটলিটা খুলতে খুলতে কর্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে—আমাদের কিন্তু সাড়ে তিনটাব গাড়িতেই 'ফরতে হবে দিদি।

—ওমা, সে কি কথা ! কেন, আমরা এমন কি অপরাধ করলাম যে এতদূর এসে একটা রাত্তির বাস করতে পারবে না ?

—ছিছি, কি যে বলেন দিদি ! জানেন তো আমার একার সংসার। অনেক বলে কয়ে এবং বকশিষ কবুল করে ঝিকে বাড়ি রেখে এসেছি। সন্ধে হলেই সে আর এক মুহূর্ত থাকবে না। তার উপর উনি আপিস থেকে ফিরে দরজা বন্ধ দেখলে মহা ফাঁপরে পড়বেন।

গৃহকর্ত্রী বেজার মুখে জবাব দিলেন—সবই বুঝলুম—কিন্তু এমনি করে আসা কেন ভাই ? তুমিই বলো এভাবে কেউ কুটুম্ব বাড়ি আসে ?

—এ ভাবে না এলে আমার তো কিছুতেই আসা হতো না দিদি। উর্মিলা গৃহকর্ত্রীকে প্রবোধ দেয়।

—আচ্ছা, তোরা সব মামীমার সঙ্গে বসে গল্প কর। কেউ দুষ্টুমি করিসনি। তারপর হঠাৎ সকলের দিকে চেয়ে বলেন—হারে, রাধা কোথায়? ওকে যে দেখছি না। এই নন্দু, দেখতো ও কোথায়? আমি আসছি, বলেই তিনি বেরিয়ে যান।

বাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যে কয়টি ছেলে মেয়ে উর্মিলাকে ঘিরে ধরেছে তাদের মধ্যে যাকে সে খুঁজছে সে কোনটি? একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে সে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু অনেকদিন আগের দেখা সে-মুখ উর্মিলা কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছে না। বিয়ের পরে রমেশ একদিন উর্মিলাকে কুটুম্বদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য নিয়ে এসেছিলো। সেদিন কিছু সময়ের জন্য যে শিশুটিকে স্বামীর ভাগিনেয়ী বলে জেনেছিলো সে তখন নিতান্তই শিশু—সবে হাঁটতে শিখেছে। আর উর্মিলা ছিলো নবাগতা সদ্য-বিবাহিতা। সে দিনের ষোড়শী বধূর সঙ্গে আজকের পরিণত-বয়স্কা গৃহস্থ বধূ উর্মিলার পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

উর্মিলা লক্ষ্য করে ছেলেমেয়েদের পোশাকআশাক ও শ্রীতে সচ্ছলতার আতিশয্য না থাকলেও দারিদ্র্যের দৈন্যে লাঞ্ছিত নয়। তার হাতে লজেন্স ও বিস্কুটের কৌটো দেখা মাত্র বাচ্চারা সকলেই হৈ হৈ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। উর্মিলা একে একে সকলকে বিস্কুট আর মুঠো ভরতি লজেন্স দেবার সময় লক্ষ্য করে একটি শীর্ণকায়া বালিকা অদূরে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভীরু নয়নে একদৃষ্টে তাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি সট্ করে আড়ালে চলে যায়। উর্মিলা অবাক—এ কে? তবে কি একেই সে খুঁজছে? আশ্চর্য মেয়েটির চোখের চাউনি! অদ্ভুত এক আকর্ষণ আছে তাতে। কাছে টেনে আদর করতে ইচ্ছা করে। উপস্থিত বালক বালিকাদের মধ্যে যেটি বড় উর্মিলা তাকে ডেকে আদর করে বলে—ঐ যে মেয়েটি দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলো সে কে হয় তোমাদের?

সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি হাত মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়—ও তো আমাদের খুড়তুতো বোন রাধা—বড্ড হ্যাংলা, আমাদের মাকে মা ডাকতে চাইবে —আমাদের সব কিছুতেই ভাগ বসাবে—সবই তার চাই। দেখতে পারিনা বাবা, বলে সে এমন অদ্ভুত এক মুখ-ভঙ্গী করে যে হাসি চেপে রাখা দায়।

উর্মিলা বুঝলো তার অনুমান সত্যি। মনের আবেগ আর চাঞ্চল্য সামলে নিয়ে সে হেসে বলে—তাই নাকি—আচ্ছা দুষ্টু তো! ওকে ধরে নিয়ে এসো দেখি, তোমাকে আরো লজেন্স দেবো।

বলার সঙ্গে—আমি যাবো, আমি যাবো বলতে বলতে সকলেই বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে রাধাকে যখন টেনে হিঁচড়ে চ্যাংদোলা করে উর্মিলার সামনে এনে হাজির করে তখন সে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ক্রন্দন-রত রাধার করুণ অসহায় দৃষ্টি উর্মিলার হৃদয় সহানুভূতি ও অনাস্বাদিত এক স্নেহরসে আপ্লুত হয়। অপত্য-স্নেহ নিঃসন্তান উর্মিলার বোঝা বা জানার কথা নয়। কিন্তু ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে আপন অন্তরের সমস্ত স্নেহ-সুধা ঢেলে রাধাকে কোলে তুলে নিয়ে তার অশ্রু আপন আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। পাছে আর সব ছেলে-পুলের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এই ভয়ে নিজেকে সংযত করে। উদ্বেলিত আবেগ রুদ্ধ করে রাধাকে হাত ধরে কাছে নিয়ে আসে। মৌখিক সান্ত্বনা দিয়ে ওর হাতে লজেন্স বিস্কুট গুঁজে দিতে চায়। কিন্তু রাধার কান্না তাতে থামে না আর তার হাতের মুঠোও খোলে না। উর্মিলা মহা ফাঁপরে পড়েছে। কতক্ষণ আর নিজেকে চেপে রাখা যায়! হঠাৎ সে রাধাকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে। তারপর আপন অঞ্চল দিয়ে চোখ মুছে তাকে নানাভাবে আদর করতে থাকে। এতক্ষণে তার কান্না থেমেছে যদিও হেঁচকি তখনো রয়েছে।

উর্মিলা যে ভাবে রাধাকে আদর করছিলো তা দেখে ভাই বোনেরা অবাক। মাকে কখনো ওদের এভাবে আদর করতে দেখেনি। রাধার সৌভাগ্যে ওদের দৃষ্টিতে হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধ ফুটে ওঠে। রাধাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই সর্বকনিষ্ঠটি এসে রাধার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অন্য সকলে তখন রাধাকে ঘিরে বলছে—নে বাবা নে, হয়েছে, আর কাঁদতে হবে না। ছিঁচ কাঁদুনে—খালি খালি আদর খাবার জন্য কান্না-কাটি।

গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকে সবাইকে একত্র দেখে জিজ্ঞাসা করে—তোরা সব গোল হয়ে ওখানে কি করছিস্? মাকে দেখেই নালিশ করবার জন্য তারা রাধাকে ছেড়ে দৌড়ে মায়ের কাছে আসে। তিনি সকলকে হাত দিয়ে থামিয়ে বলেন—বুঝেছি। আর বলতে হবে না, কেবল নালিশ আর নালিশ—দিবারাত্রি এক কথা। অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর মেয়েটাও দিন দিন কেমন জানি গোঁয়ার, জেদি আর রাগী হয়ে উঠছে আরো কিছু বলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ থেমে যান। উর্মিলার সামনে এতটা বলা ঠিক হয় নি।

জ্যেঠাইকে দেখেই রাধার চোখের দৃষ্টি যেন পালটে গেলো। একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব তার চোখে মুখে প্রকট হলো। সঙ্গের বাচ্চাটার হাত ধরে রাধা আস্তে আস্তে এসে ঊর্মিলার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়। ঘটনাটা ঊর্মিলার চোখ এড়ালো না! সে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করে বললে আমাদের যাবার সময় হয়ে এলো দিদি। চলুন, কর্তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

ঊর্মিলা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাধাও তার আঁচল ধরে চলতে থাকে। দেখাদেখি অন্যেরাও গৃহকর্ত্রী ও ঊর্মিলার অনুসরণ করে। কর্তার ঘরে ঢুকতেই দেখা গেলো নরেশ বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, তার পাশে রাখা বাটাভরা লাড্ডু মোয়ার সদ্ব্যবহার করছে। তার যে উঠবার কোন তাড়া আছে তা তার হাবভাব দেখে মনে হলো না। ঊর্মিলাকে দেখেই কতকটা যেন দায়সারা গোছের বললে—চটপট সেরে ফেলো মেজবৌদি। আর কিন্তু বেশি সময় নেই।

ঊর্মিলা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে কর্তাকে প্রণাম করে।

কর্তা দুঃখিত কণ্ঠে বললে—এলেই যখন মা, তখন একরাত্রি থেকে গেলে আরো খুশী হতাম। যাক্ নরেশের মুখে সব শুনেছি। তবু মাঝে মাঝে এভাবেই এসো, তাতেই খুশি হবো। গিন্নীর দিকে চেয়ে বললেন—কিছু খেয়েছে তো? অভুক্ত অবস্থায় অতিথি বিদায় দিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

এবার বিদায়ের পালা। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের শেষ অঙ্ক আসন্ন। তার অভিনয়ে যাতে ত্রুটী বিচ্যুতি না ঘটে এবং অস্বাভাবিক কিছু ধরা না পড়ে সে সম্পর্কে ঊর্মিলা আরো সচেতন ও সতর্ক হলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে সকলে উঠোনে এসে জড়ো হয়েছে। কর্তা এবং নরেশও এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলে পুলেরা সব ঊর্মিলাকে ঘিরে রয়েছে। নরেশ হঠাৎ আবিষ্কার করলো বাচ্চাদের মধ্যে রাধা নেই। খোঁজ খোঁজ রাধা কোথায়! নরেশ বললে একটু আগেই তো যেন ওকে তোমার কাছে দেখেছিলুম বৌদি। এর মধ্যে গেল কোথায়?

ঊর্মিলা মনের চাঞ্চল্য গোপন করে নির্বিকার স্বরেই জবাব দেয়—কি জানি কখন সরে পড়েছে টের পাইনি।

কর্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমরা একটু অপেক্ষা করো আমি দেখছি কোথায় গেলো।

উর্মিলার সামান্য আদর যত্নই বুঝি রাধার হৃদয়ে অদ্ভুত অনাস্বাদিত ভালোবাসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করেছিলো। যে মুহূর্তে সে তার শিশুসুলভ মনোবৃত্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছে যে স্বল্পপরিচিত প্রিয় অতিথি চলে যাচ্ছে তখন সে তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছে।

রাধার কতগুলি প্রিয় পলায়নের স্থান জ্যেঠির জানা। একে একে সে-সব স্থানে হানা দিয়ে তিনি অবশেষে রাধাকে ঢেঁকি ঘরের পেছনে সুপুরি পাতার ছাওয়া বেড়ার আড়ালে আবিষ্কার করেন। জ্যেঠিকে দেখেই রাধা আবার পলায়নের উদ্যোগ করতেই তিনি তাকে ধরে ফেলেন। রাগ করলে ফল বিপরীত হবে। সুতরাং তিরস্কারের পরিবর্তে রাধাকে সান্ত্বনা দিয়েই জ্যেঠি উঠোনে নিয়ে আসেন। কিন্তু উর্মিলাকে দেখেই রাধা জ্যেঠির হাত থেকে ছিটকে পড়ে আবার ছুট দেয়। এবার নরেশ পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে। এ-দৃশ্য উর্মিলা আর সহ্য করতে পারলো না। নরেশের পেছন পেছন সেও গিয়ে হাত বাড়িয়ে রাধাকে কোলে তুলে নেয়। এবার রাধা আর কোন বাধা দেয় না। সবেগে উর্মিলাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। উর্মিলা বুঝি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। এতক্ষণ ধরে আপন অন্তরের রুদ্ধ অশ্রু বিগলিত ধারায় দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

এ দৃশ্য যেমনি আকস্মিক তেমনি অভাবিত। এত স্বল্প পরিচয়ে রাধা ও উর্মিলার মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ ও ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ও আকর্ষণ দেখে উপস্থিত সকলেই হতবাক। এমন কি বাচ্চাগুলোর মুখে পর্যন্ত রা নেই। তারাও ছুটে এসে কেউ রাধার হাত কেউ বা পা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যে ছোট বাচ্চাটা তখন রাধার গা ঘেঁষে ছিল সেও এসে হাত বাড়িয়ে উর্মিলার কোলে উঠতে উদ্‌গ্রীব হয়। উর্মিলা হাত বাড়িয়ে তাকেও অপর কোলে তুলে নিয়ে চুমো দিয়ে গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। নরেশ ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এ দিকে গাড়ির সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আরো দেরী হলে গাড়ি ফেল অনিবার্য। কিন্তু বহু চেষ্টা চরিত্র ও নানা প্রলোভন সত্ত্বেও যখন রাধাকে উর্মিলার কোল থেকে নাবানো গেলো না তখন নরেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর্তা গিন্নীকে সম্বোধন করে বলে—এখন একমাত্র উপায় রাধাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। রোববার মেজদা ওকে নিয়ে আসবে। কর্তা গিন্নীর

মৌনতার সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে নরেশ মেজবৌদির দিকে চেয়ে একই কথার পুনরুক্তি করে।

আপন অন্তরের কামনা বাসনা ফলবতী হতে চলেছে। ঊর্মিলার মনে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তার বহিপ্র্রকাশ না করে একটু রুক্ষ কণ্ঠেই জবাব দেয়—না হলে তুমি কি বলতে চাও ঠাকুর পো, ওকে আমি ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবো। তা আমি কিছুতেই পারবো না— তুমি যাই ভাবো তাই ভাবো।

—আমি তো তা বলছি না। বলছি ওকে নিয়েই চলো। কিন্তু আর দেরী করলে গাড়ি পাবে না— সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

বিদায় কালে গৃহকর্ত্রী কিছু বলতে চেয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা রাস্তা এলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর বললেন না। রাধাকে একটু আদর করে ফিরে গেলেন।

রাধার সেদিনকার ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠালিঙ্গন নিঃসন্তান ঊর্মিলার যুবতী হৃদয়ে যে মাতৃস্নেহ সঞ্চার করেছিল সেই স্মৃতি এতদিন পরেও তার বক্ষ মথিত করে বিগলিত অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করলো। মনে পড়ে গাড়ি ছাড়ার কালে ইঞ্জিনের কর্কশ চীৎকারে রাধা আঁৎকে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলো। তারপর গাড়ির চলার ঝকাঝক শব্দে আরো ভয় পেয়ে তার কোলে নিরাপদ ভেবে কুঁকড়ে শুয়েছিলো।

বাড়ি যখন পৌঁছলো অস্ত গমনোন্মুখ রবির শেষ রশ্মি বৃক্ষ-চূড় ছুঁয়ে বিদায় নিচ্ছে। সন্ধ্যাবেলার অপরিস্ফুট দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হয়ে বাড়ির ছোট্ট উঠোনে নেমে এসেছে। রাধাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নতুন ফ্রক পরিয়ে চোখে কাজল আর কপালে টিপ লাগিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে যখন ঊর্মিলা তাকে কোলে তুলে নিলে তার হৃদয় তখন কানায় কানায় মাতৃস্নেহে ভরপুর। রাধাও ঊর্মিলার স্নেহের স্পর্শে অভিভূত হয়ে মা বলে তাকে জড়িয়ে ধরে। সেদৃশ্য ঊর্মিলার হৃদয়পটে সদ্য-আঁকা ছবির মতো লেগে আছে। তারপর দীর্ঘকাল রাধা মা, মা করে ছায়ার মতো তার পেছনে ঘুরঘুর করে বেড়িয়েছে—সুদেবের আগমনেও তা ব্যাহত কিংবা তাহার স্নেহের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি। ঊর্মিলার বিনিদ্র চোখে জ্বালা ধরলো সে বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করলো।

মনে পড়ে সে-দিনে স্বামী অধিক রাত্রে বাড়ি ফেরে। তাকে আরো চিন্তামগ্ন ও গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। খেতে বসে কতকটা আকস্মিক ভাবেই

স্বগতোক্তি করে—শনিবার আপিসের পর আর বাড়ি ফিরবো না। একেবারে কাজ সেরে তারপর দিন আসবো। রমেশের উক্তির উপলক্ষ্য যে উর্মিলা তা বুঝেও সে কোন জবাব দেয় না।

রমেশ আপন মনেই বলে চলেছে—রাত্রিটা কুটুম্ব বাড়ি কাটিয়ে পর দিন ওকে নিয়ে মিশনারিদের হাতে সমর্পণ করে দেবো। বেয়াইকে এভাবেই চিঠি লিখেছি। দাদা বৌদির কারোই এই ব্যবস্থায় সায় নেই। অথচ তাঁরা বিকল্প কোনো ভালো পন্থাও বাৎলাতে পারছেন না। অগত্যা নরেশের নিকট গেলাম। তার হেঁয়ালী কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। সুতরাং আমাকে একাই সিদ্ধান্ত নিতে হলো। মেয়েটার অযত্ন অবহেলা অশিক্ষা কুশিক্ষার কথা যখন কানে আসে নিজেকেই তখন অপরাধী মনে হয়। মনের শান্তি আমার একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। রাত্রি বেলা চক্ষু বুঁজলেই যেন অশ্রুর আত্মার আর্ত-ক্রন্দন কানে বাজে—মেজদা ওঁরা মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। দেবের সঙ্গে আমার বিবাহ বন্ধন—অসবর্ণ মিলন—ওঁরা কোন দিনই প্রীতির চক্ষে দেখেনি। রমেশ পিঁড়ে ছেড়ে উঠে গেলো।

স্বামীর অসহায় আত্মনিপীড়ণ ও বিলাপ উর্মিলাকে কষ্ট দেয়। ইচ্ছা হলো সব কিছু ব্যক্ত করে তাকে নিশ্চিত সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু অভিমান এবং স্বামীকে অকস্মাৎ বিস্মিত করে দেবার প্রলোভন একসঙ্গে পথরোধ করে দাঁড়ায়। রান্না ঘরের কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে দেখে স্বামী মুখ ব্যাজার করে চেয়ারে বসে আছে। সহানুভূতিতে বিগলিত উর্মিলার মান অভিমান বুঝি খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো। আপন হাতখানা স্বামীর ললাটে বুলিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে—তুমি কিছু ভেবোনা—সব ঠিক হয়ে যাবে।

উত্তপ্ত ললাটে উর্মিলার শীতল করস্পর্শ রমেশের মানসিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত করে। উর্মিলার আশ্বাসের মধ্যে যেন নির্ভর যোগ্য কোন অভয়বাণী শুনতে পায়। রমেশ বুঝি আশ্রয়ের সন্ধানেই উর্মিলার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে।

উর্মিলা বুঝলো স্বামী একটা অবলম্বন চাইছে। সে নিঃশব্দে চেয়ারের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তার হাতখানা ছাড়িয়ে দিয়ে বলে—একটা পান খেয়ে শুয়ে পড়ো গে—শান্তি পাবে। কথার শেষে উর্মিলা খুক করে হেসে ফেলে।

চাপা হাসির শব্দে রমেশ অবাক হয়ে উর্মিলার মুখের দিকে তাকায়। মুখ দেখা গেলো না। পেছন ফিরে উবুড় হয়ে উর্মিলা পানের বাটার কাছে বসে আছে। তার তৎকালীন মানসিক অবস্থায় উর্মিলার হাসি তার কানে বিদ্রূপ বর্ষণ করলো। খুবই আঘাত পেলো। আবার ভাবলে, না, উর্মিলার কোন দোষ নেই। সে তো তার মনের অবস্থা জানে না। মনের উষ্মা চেপে পান না নিয়েই রমেশ মশারি তুলে বিছানায় উঠে বসে। বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে নজরে পড়ে উর্মিলার বালিশের পাশে ছোট্ট মতো কেউ নিদ্রিত। রমেশের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না! উর্মিলার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে তার জানা মতে এমন ছোট তো কেউ নেই যে তার কাছে রাত্রিবাস করতে পারে! তবে এ কে? মশারির বাইরে দূরে রাখা লণ্ঠনের আলোতে ভেতরটায় স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না।—তার উপর সর্বাঙ্গ কাঁথায় ঢাকা। রমেশ হঠাৎ অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে —তোমার বালিশের পাশে কে শুয়ে আছে উর্মি?

উর্মিলা বিছানার পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। স্বামীর কণ্ঠস্বরে বুঝলো যে তিনি নিদ্রিতা শিশুর পরিচয় লাভের জন্য আগ্রহে অধীর এবং উত্তেজনায় অস্থির। তথাপি সে চুপ করেই থাকে।

রমেশের কণ্ঠস্বর আরো উচ্চগ্রামে ওঠে—তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন? কেন বলছো না ওখানে কে শুয়ে আছে?

উর্মিলা লঘুকণ্ঠে জবাব দেয়—আহা তুমি অতো চেঁচামেচি করছো কেন? অজানা অচেনা জায়গায় মেয়েটা ভয়ে আঁৎকে উঠে কান্না কাটি করবে না! না চেঁচিয়ে কাছে নিয়ে দেখলেই পারো কে শুয়ে আছে।

স্ত্রীর হেঁয়ালী রমেশের উত্তেজনার আরো ইন্ধন যোগালো। তার মনের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেলো। ধৈর্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে কাছে গিয়ে কাঁথা সরিয়ে নিদ্রিতাকে দেখে চিৎকার করে উঠলো—একে তুমি কোথায় পেলে উর্মি? কে একে এখানে নিয়ে এলো? এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে রমেশ হতভম্ব! তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা সরলো না। রাধার পাশে শুয়ে ডান হাতখানা তার গায়ের উপর আলতো ভাবে রেখে চুপ করে পড়ে থাকে।

এতখানি বিহ্বলতা উর্মিলা আশা করেনি। সে পাথর প্রতিমার মতো নিশ্চল মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার শুধু ভয় স্বামীর অত্যুগ্র স্নেহের ধকলে মেয়েটা না জেগে উঠে কান্নাকাটি শুরু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রমেশ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসে। উত্তাপ উত্তেজনাহীন স্বভাব সুলভ নিম্ন কণ্ঠেই সে জানতে চাইলে—তোমার মনে যখন এতই ছিলো তখন আমার নিকট তা প্রকাশ করলে না কেন?

স্বামীর কথায় উর্মিলার মনের রুদ্ধ ক্ষোভ ও অভিমান আবার জেগে ওঠে। স্বামীকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যেই বলে—কেন, তোমাকে বলতে যাবো কেন? তুমি আমাকে কোন কথাটা বলেছ? কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন কল্লে তুমি মন গুমরে এতদিন ধরে অসহ্য এক পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজে জ্বলেছ আর আমাকে পুড়ে মেরেছ? এখন তো আরো ভালো হলো। তোমাকে আর কষ্ট করে অত দূরে যেতে হবে না। এখান থেকেই সাজা ওকে তুলে নিয়ে মিশনারিদের হাতে সঁপে দিয়ে আসতে পারবে। কিছুক্ষণ থেমে থেকে উর্মিলা আবার যোগ করে—তবে ঐ সঙ্গে দয়াকরে আমাব জন্য ওখানে কিংবা অন্য কোনখানে একটু ঠাঁই-এর ব্যবস্থা করো। তবেই তোমার ইচ্ছা ষোলোকলায় পরিপূর্ণ হবে এবং গার্জিয়ান-গিরি পালাব শেষ অঙ্ক ভালো ভাবে জমবে।

ঘটনাব আকস্মিতায় এবং আপন পরিকল্পনার এরূপ অচিন্ত্যনীয় পবিণতিতে রমেশের বিমূঢ়ভাব তখনো কাটেনি। উর্মিলার রুক্ষ আর চোখা চোখা বাক্যবাণ তাকে বিদ্ধ না করলেও তার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের শেষ কথাগুলো রমেশের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দেব ঢেউ তোলে।

রমেশ খাট থেকে নেমে এলো। উর্মিলার হাত ধরে মিনতিভরা কণ্ঠে বললে—আমার অন্যায় হয়েছে। তোমাকে আমি বুঝতে পারিনি। একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে এতোদিন নিজে জ্বলে মরেছি, তোমাকেও কষ্ট দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো উর্মি। ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনো হবে না। উর্মিলার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে রমেশ তাকে বক্ষে টেনে নেয়। উর্মিলার ক্ষীণ প্রতিরোধ রমেশের উত্তপ্ত বক্ষের আশ্রয়ে উবে গেলো। এতদিনের মান অভিমান ভুল বোঝা বুঝির পালা সাঙ্গ হলো। সে রাত্রে বুঝি আবার তাদের নতুন করে বাসরশয্যা রচিত হলো—উভয়েই উভয়কে নতুন করে জানলো—পরিপূর্ণরূপে পেলো। রাধাকে নিয়ে দম্পতীর মধ্যে নতুন এক জীবন শুরু হলো—সুখের নীড় গড়ে উঠলো।

বিগত দিনের সেই একরাত্রির স্মৃতি এতদিন পরেও এই গভীর রজনীতে একই শয্যায় শায়িতা উর্মিলার অন্তরে পুলক-শিহরণ জাগালো।

অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত স্বামীর শরীরের ওপর আলতো ভাবে হাতখানা রেখে স্পর্শ-সুখ অনুভব করলো।

উর্মিলার দিনগুলো রথের চাকার মতোই গৃহকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে গড়িয়ে চলেছে। তার অবসর মুহূর্তগুলো সে রাধার পরিচর্যা দিয়ে ভরিয়ে তোলে। আর ভাবে এত তৃপ্তি বুঝি আর কিছুতেই নেই। পাড়া-প্রতিবেশীদের অভিযোগের উত্তরে উর্মিলা হেসে বলে—দেখছেন তো কি রকম দুষ্টু হয়েছে—সারাক্ষণ কেবলই মা মা করে ঘুবঘুর করছে। এটা ওটা করতেই সময় বয়ে যায়। কখন বের হই! ইতিমধ্যে স্বামী স্ত্রী মিলে রাধার স্বর্গত পিতা-মাতার নাম একত্র করে অনেক গবেষণার পর তার নব নামকরণ করেছে—দেবযানী।

তারপর একদিন উর্মিলা সন্তান-সম্ভবা হয়ে হাসপাতালে গেলো। দেবযানীর কান্না আর থামে না। নবাগত শিশু মায়ের কোল জুড়ে বসলো। কিন্তু আশ্চর্য, উর্মিলা বাড়ি ফিরে আসতেই দেবযানী ভাইকে পেয়ে গত কয়েকদিনের কান্নাকাটি, বিচ্ছেদ বেদনা, মান অভিমান সব কিছু ভুলে গেলো।

বিনিদ্রচোখে উর্মিলার মনে পর্দায় দেবযানী সুদেবকে ঘিরে অতীত দৃশ্য ছবির মতো ভেসে ওঠে। উর্মিলার স্নেহের ভাণ্ডার উভয়ের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত। কোনদিনও পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার সুদেবকে উর্মিলার আদর যত্ন স্নেহের ভাগীদার হতে দেখেও দেবযানী কোনদিন হিংসা কিংবা ঈর্ষা করেনি। অধিকন্তু নিজে না খেয়ে ওকে খাইয়েছে আর সর্বক্ষণ অসুখে বিসুখে আপদে বিপদে কোলে পিঠে করে আপন বুক দিয়ে ওকে আগলে রেখেছে। খাওয়া বসা শোওয়া স্কুলে যাওয়া উভয়েই এক সঙ্গে করেছে। রাত্রিবেলা ভাইকে পাশে না পেলে ভাইয়ের গায়ে হাত রেখে না শুলে দেবযানীর ঘুম আসতো না। বড় হয়ে দু'জনে এখন আলাদা বিছানায় শুলেও দেবযানী রাত্রিবেলা উঠে ভাইকে দেখে—বিস্রস্ত কাঁথা খানা গায়ের উপর ঠিক মতো দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আপন বিছানায় গিয়ে শোয়। এই দৃশ্য উর্মিলা বহুরাত্রি জানলা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে। উভয়ের মধ্যে এমন যে স্নেহ প্রীতি ভালোবাসার বন্ধন হঠাৎ কি কারণে চিড় খেলো! কি এমন অঘটন ঘটলো!

না, উর্মিলা আর ভাবতে পারছে না। অস্থির হয়ে কেবল বিছানায়

এপাশ ওপাশ করছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। চিন্তা ভাবনা গুলোকে যতই সে দূর করে দিতে চাইছে ততই তারা তার বিনিদ্র চোখের সম্মুখে এসে ভিড় করছে! রাধাকে নিয়ে আসার দিন গাড়ির ঘটনা ঊর্মিলার মানস পটে ভেসে ওঠে—তার কোলে মাথা রেখে রাধা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ নরেশের উচ্চ কণ্ঠ—তোমার গোড়ে পেন্নাম বৌদি, শুনে ঊর্মিলা হকচকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—অকস্মাৎ এতো ভক্তি! ভালো লক্ষণ নয়—অতিভক্তি চোরের লক্ষণ—জানো তো? যাক্‌গে, আসল ব্যাপার খানা কি?

—চোর বাটপার যে অভিধায় আমাকে ভূষিত করোনা কেন, আমি শুধু অবাক হয়ে দেখছি তোমার অভিনয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা। স্কুলেটুলে কোনোদিন থিয়েটার টিয়েটার করেছ? না হলে, এমন নিখুঁত অভিনয় কোথায় কি করে শিখলে! স্কুল কলেজে অভিনয়ের জন্য আমার কিছু নাম ডাক ছিলো। কিন্তু দেখলাম আমার সে-ক্ষমতা তোমার তুলনায় নস্যি! যে অভিনয় আজ তুমি দেখালে তার উপমা ভূভারতে বিরল!

ঊর্মিলা বুঝলো ঠাকুরপো কি বলতে চাইছে। আপন সাফল্যের আনন্দ বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে—না-বোঝার ভান করে জিজ্ঞাসা করে—ওমা, তুমি আমার অভিনয় আবার কোথায় কিসে দেখতে পেলে! অবশ্য স্বাভাবিক সব কিছুতেই অস্বাভাবিকত্ব আরোপ করাটা অভিনেতাদের একটা রোগ বিশেষ! তোমার যে এ রোগ আছে জানতাম না! এমন হলে তো অলকার স্বাভাবিক আচার আরচণ—যেমন ধরো নারীহৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস, আবেদন নিবেদন এমন কি কণ্ঠালিঙ্গনেও বুঝি তুমি অভিনয় দেখতে পাও—হায় বেচারা!

নরেশ মনে মনে ঊর্মিলার বাকচাতুর্যের তারিফ না করে পারে না। মুখে বলে—তোমার সঙ্গে কথায় কোনোদিন পারিনি, পারবোও না, আর পারতেও চাই না। তবে আমি যা বুঝেছি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি তাই বলেছি। আমার বোঝায় এবং কথার মধ্যে যে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি নেই তা নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করো। মুখে তুমি যতই চাতুরি খেল না কেন! যাক্‌, ও-প্রসঙ্গ থাক। তারপর নিদ্রিতা রাধার করুণ অসহায় মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে—ভালো হলো না মেজবৌদি! ওকে নিয়ে এসে তুমি ভালো করলে না! ওর আকর্ষণ আর তুমি কাটাতে

পারবে না। দেখা মাত্রই ও তোমাকে যে ভাবে পেয়ে বসেছে তাতে ও তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারবে না। এটা নিশ্চিত জেনো।

ঊর্মিলা নরেশের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঘুমন্ত শিশু রাধার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকে।

নরেশ কিছুক্ষণ থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করে—রাধা সুখে থাক এই কামনা ও আশীর্বাদই আমি করছি তবু কেন জানি মন বলছে তুমি কষ্ট পাবে বৌদি, কষ্ট পাবে। অশ্রুকে তুমি দেখোনি। আমি আর বড়দা ওকে যে কি ভয় করতুম তা বলে বোঝাতে পারবো না। হয়তো আমরা ওকে বুঝিনি কিম্বা বোঝার চেষ্টাও করিনি। একমাত্র মেজদাই বোধ হয় ওকে বুঝতো। বাবার কথা আর নাই বা বললাম। কি অত্যাচারটাই না অশ্রু মেজদার ওপর করেছে। কিন্তু আশ্চর্য একদিনও ওকে একটা কটু কথা বলতে শুনিনি। যেদিন অশ্রু ঘোষণা করলো সে দেবকে বিয়ে করবে সেদিন আমরা সবাই হতভম্ব। একে অসবর্ণ বিবাহ তার ওপর ওর চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ ও করতে চলেছে। আমি, বড়দা, বড়বৌদি খুবই রাগারাগি করলাম এবং এ বিবাহে আমাদের অসম্মতি জোর গলায় জানালাম। একমাত্র মেজদা চুপ করে রইলো। ওঁর মৌনভাবই বুঝি সেদিন অশ্রুকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় যোগালো। কিন্তু তার পরিণতি কি হলো!

ঊর্মিলা অমঙ্গল আশংকা করে শিউরে উঠলো। তারপর আবার মনকে চক্ষু রাঙালো। হয়তো তার ভয় অহেতুক—ভাইবোনে কি মারা-মারি ঝগড়াঝাটি হয় না! সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু পর মুহূর্তেই মন বলে—কৈ আগে তো কোনোদিন এমনটি হতে দেখিনি।

অনেকদিন আগের আর এক ঘটনার কথা তার স্মরণে এলো। তার থেকে অত অল্প বয়সেই দেবযানীর চরিত্রের একদিক—অনমনীয় দৃঢ়তা আর কষ্ট-সহিষ্ণুতা অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রকটিত হলো। এক শারদীয়া দুর্গাপূজার শেষে দেবযানী মামার সঙ্গে জ্যেঠার বাড়ি গিয়েছে ৺বিজয়ার প্রণাম জানাতে। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসে। কিন্তু যানীর মুখের ভাব আষাঢ়ের মেঘ-ভারানত আকাশের মতো থমথমে। কোন কথাবার্তা নেই—জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। অনেক ডাকাডাকির পর খেতে এলো বটে কিন্তু একরকম না-খেয়েই উঠে গেলো। ঊর্মিলার বিস্ময়ের অবধি নেই। কারণ সম্পর্কে স্বামীকে প্রশ্ন করেও যখন কোনো সন্তোষ-জনক উত্তর

পেলে না তখন বুঝলো ও-বাড়িতে এমন কিছু ঘটেছে যা ওর মনে নিদারুণ আঘাত করেছে। কিন্তু সেটা কি! ঊর্মিলার মন দুশ্চিন্তার কাঁটায় বিদ্ধ হতে থাকে। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ঘরে এসে দেখে যানী মামার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মামা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ঊর্মিলা কাছে গিয়ে বসে এবং যানী বলে ডাক দিতেই কান্না আরো বেড়ে যায়। অনন্যোপায় ঊর্মিলা তখন ওর গায়ে হাত দিয়ে বলে—চল, শুতে চল।

দেবযানী অভিমানে ফেটে পড়ে।—না আমি তোমার কাছে যাবো না, শোবো না—তুমি আমার মা নও। আমি তোমার কেউ নই, কিছু নই, বলে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

দেবযানীর কথা শুনে ঊর্মিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মুখ দিয়ে কোন কথা সরলো না। এসব কথা যে যানীর নিজের নয় তা বুঝলো। ও-বাড়িতে নিশ্চয়ই এরূপ কথা শুনেছে যার জন্য ও দারুণ আঘাত পেয়েছে। দেবযানীকে কোলে নিয়ে ঊর্মিলা আদর করতে করতে বলে—চুপ কান্নাকাটি করোনা লক্ষ্মী সোনা আমার। তোমার কান্না শুনতে পেলে ভাইটি জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করবে। তখন কি হবে!

সুদেবের কথা বলতেই দেবযানীর কান্নার বেগ অনেক কমে যায়। তারপর অনেক আদর, প্রবোধ ও তোষামোদের পরে দেবযানী কান্নার সুরেই বলল—সুভা, কেষ্টদা, জ্যেঠাইমা—সবাই তো এককথা বলেছে। কেষ্টদা আরও বলেছে—দূর বোকা, উনি তোর মা হতে যাবে কেন? তোর মা তো কবেই মরে গেছে। উনি তোর মামী।

ঊর্মিলা দেবযানীকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়েছে—না না যানী, ওদের কথা ঠিক নয়। ওরা সব ভুল বলেছে। আমিই তোর মা—ঊর্মিলা আর কিছু বলতে পারে না। উদ্গত অশ্রুতে বাক-রোধ হয়ে গেছে। তপ্ত অশ্রুর কয়েক ফোঁটা দেবযানীর রোরুদ্যমান কপোলে ঝরে পড়ে। দেবযানী মামীর মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে কান্না থামিয়ে ঊর্মিলাকে জোরে জড়িয়ে ধরে।

দেবযানী কি বুঝেছিলো তা কোনদিনও আর মুখে প্রকাশ করেনি। কিন্তু সেই থেকে সে আর কোন দিন ঊর্মিলাকে মা বলে ডাকেনি। পূর্বাভ্যাস মতো কখনো সখনো মা বলে ফেলেই সে দৌড়ে আড়ালে গিয়ে কেঁদেছে, না হয় মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। বড় হয়ে মুখ দিয়ে মা

বেরিয়ে গেলেই রেগে উঠতো। তখন আপন মনে বকর বকর করতো—কি যে ছাই মামী, মামী! কেন বাবা, 'মী'-টা কেটে ফেলে মা বল, কতো সহজ, কতো ভালো! শুনে উর্মিলা মনের দুঃখ চেপে হেসে ফেলেছে—তা মা ডাকলেই পারিস। কেউ তো তোকে বারণ করেনি। মামীর কথা শুনে দেবযানী যেরূপ বিষাদঘন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতো তাতেই ওর অন্তরের মা-ডাকার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠতো। তারপর নির্গলিত অশ্রু প্রাণপণে চেপে রেখে উর্মিলার সমুখ থেকে সরে যেতো। কিন্তু উর্মিলা তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারতো না। দেবযানীর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে কতদিন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। এই তো সে-দিন এতোবড় অসুখ গেলো। প্রলাপের মধ্যে কেবলই মা মা বলে চিৎকার করেছে।

না, উর্মিলা আর ভাবতে পারছে না। এ-ভাবনার যেন আর শেষ নেই। এক বিষম দুশ্চিন্তার বেড়াজালে সে জড়িয়ে পড়েছে! এর থেকে বুঝি তার মুক্তি নেই। ক্লান্ত, শ্রান্ত অবসন্ন উর্মিলা চক্ষুবুজে পড়ে থাকে। তারপর আপন অজ্ঞাতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

সে রাত্রির ঘটনার পরে ভাইবোনের আচার আচরণে কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না। হয়ত উভয়ের চোখের জলের মধ্যে তারা একে অন্যের মনোভাবকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছে। পরস্পর পরস্পরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে মনে মনে বুঝি এমন এক অলিখিত সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেছে যা তারা সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। মনের বিপরীত অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ কখনো ঘটতে দেয় নি। ফলে সেদিনের প্রকৃত ঘটনা যেমন দেবযানীর অগোচরে থেকে গেলো, সুদেবেরও তেমনি দিদির নিকট তা ব্যক্ত করবার আর অবকাশ হলো না। উভয়েই বিগত রাত্রির ঘটনার পুনরুল্লেখ একান্তভাবে পরিহার করে চললো।

এদিকে সুদেব ও দেবযানীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের খবর দিন দিন উর্মিলার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে সুদেব প্রথম যেদিন যে-কারণে মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলো তাও উর্মিলার অগোচরে থেকে গেলো।

যদিও ভাইবোনের পারস্পরিক ব্যবহার থেকে উর্মিলা তার মনের ভয়

ভাবনার বিন্দুমাত্র কারণ খুঁজে পায়নি ; তথাপি তার কর্মহীন নির্জন অবসর মুহূর্তগুলো কেন জানি তাদের সম্পর্কে এক অশুভ অমঙ্গল আশংকা নিয়ত তার অন্তরের অন্তস্তলে ক্ষীণ কুশাঙ্কুর-সম বিদ্ধ হতো।

এক অতি সামান্য ছোট্ট এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ক্ষুদ্র পরিবারের ভার-সাম্য টালমাটাল খেলো আর এই অপরিণত দুই কিশোর কিশোরীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেলো। উভয়েই বুঝি আপন অলক্ষ্যে এক নিশ্চিত পরিণতির দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললো !

দেবযানীর ক্লাশ সেদিন প্রথম পিরিয়ড ১০টা থেকেই শুরু। সুতরাং ভাইবোন খেয়ে দেয়ে এক সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। পথে যেতে যেতে সুদেব বললে—তোমাদের কলেজে যাবার রাস্তাটা কিন্তু ভালো নয় দিদি—একটু সাবধানে যাতায়াত করো।

সুদেবের কথা শুনে দেবযানী অবাক ! বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কেটে গেলে প· জিজ্ঞাসা করে—কেন বল তো ?

—ঐ রাস্তায় গুণ্ডারা নাকি মেয়েদের একা পেলে সুযোগ বুঝে অপমান ও লাঞ্ছনা করে। এইতো কয়েকদিন আগে কয়েকটা গুণ্ডা নাকি একটি মেয়েকে একা পেয়ে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। এ-নিয়ে সব ক্লাবে ক্লাবে মহা জটলা চলেছে !

দেবযানী গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোমাকে এসব কথা কে বলেছে ? বলার সঙ্গে সঙ্গে দেবযানীর মুখাবয়ব কঠিন হয়ে ওঠে। হয়তো সুদেবকে কিছু রূঢ় কথা বলে শাসন করবার ইচ্ছা হয়েছিলো। কিন্তু কি ভেবে চুপ করে যায় !

—কেন, ও-পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা আমাদের স্কুলের ড্রিল মাষ্টারের নিকট এসেছিলো এর প্রতিবিধান জানতে—কি ভাবে গুণ্ডাদের শায়েস্তা করা যায়। সুদেব উৎসাহের সঙ্গে বলতে থাকে—জানো না তো আমাদের ড্রিল মাষ্টার মশাই কি রকম ভীমের মতো শক্তি-ধর বলশালী পুরুষ ! তিনি আবার আমাদের জিমন্যাস্টিক ক্লাবের মাস্টারও বটে। কি যে তার গায়ের জোর যদি দেখতে দিদি ! দু'হাতে দুটো মোটর গাড়ি ধরে রাখেন ! বুকের ওপর দিকে মোটর গাড়ি চালানো দেখান—আরো কত কি ! তিনি এ শহরের আরো কতো ক্লাবের যে মাষ্টার আর উপদেষ্টা, তা জানো !

—তাই নাকি ? বলেই দেবযানী চুপ করে থাকে। ভাইয়ের সংবাদ-এর সঙ্গে ঘটনাচক্রে সে-ই জড়িয়ে আছে কিনা কে জানে! তাহলে তো খুবই ঘৃণা ও লজ্জার কথা। অমৃতকানন থেকে ফেরবার পথে সে-দিনের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়তেই তার মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তার উপর তার অজ্ঞাতে ভাই-এর জিমন্যাস্টিক ক্লাবে যোগদান সমাচারও তার নিকট প্রীতিকর বোধ হলো না। সুতরাং কিছু না-বলে দেবযানী গম্ভীর মুখে হাঁটতে থাকে।

দিদির নিকট উৎসাহ-ব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে স্কুলের ড্রিল মাষ্টারের প্রশংসায় সুদেব আর এগোলো না। বিশেষত দিদির গুরু গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে সে চুপসে হঠাৎ থেমে গেলো। হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই দিদির শুষ্ক কঠিন মুখ সুদেবকে সে-রাত্রির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই সে একেবারে বোবা হয়ে গেলো।

একসঙ্গে আরো খানিকদূর চলে সুদেব স্কুলের দিকের বাঁয়ের রাস্তা ধরে টিলার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর কলেজ অবধি বাকী রাস্তা একা চলতে চলতে দেবযানীর মনের মধ্যে কেবল একই চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। সুদেবের কথা সত্যি হলে স্বীকার করতে হয় যে সেদিন সে প্রকৃতই গুণ্ডার কবলে পড়েছিলো। মনে পড়ে হঠাৎ জোর ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে সে খুবই হতবুদ্ধি হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। তবু ঘটনার আকস্মিকতা তার মনে বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া বা কোন নোংরা ধারণা সৃষ্টি করেনি। গুণ্ডা কিংবা গুণ্ডামির কথা সে বইতে পড়েছে এবং শুনেছে। কিন্তু সে কি বস্তু সে বিষয়ে তার সম্যক কোন জ্ঞান ছিলো না। সুতরাং সুদেবের কথা শুনে দেবযানী শুধু বিস্মিত নয় খুবই বিচলিত। স্থির বুদ্ধিতে বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে বুঝলো ব্যাপারটা কতদূর অবধি গড়াতে পারতো এবং তার পরিণতি কিরূপ সাংঘাতিক হতো। সেই সঙ্গে এও মনে হলো যে তার মতো এ-পথ দিয়ে যাতায়াতকারী অনেক মেয়েই হয়তো প্রতিদিন এভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছে। ভয়ের সঙ্গে দেবযানীর মনের মধ্যে অদ্ভুত এক সাহসিকতা ও তেজস্বিতা জেগে উঠলো। ঐসব ঘৃণিত পিশাচদের মোকাবিলা করবার জন্য সংকল্প-বদ্ধ হলো। সে উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আপন কর্মপন্থা স্থির করে অন্তরের গুরুভার কিছুটা লাঘব করলো।

কলেজের শেষ ক্লাশ প্রফেসরের অনুপস্থিতির জন্য হলো না। সুতরাং

দেবযানী তড়িঘড়ি কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়লো। ইচ্ছা করেই লাইব্রেরিতে গেলো না। জন-বিরল পথে চলতে চলতে আপন অজ্ঞাতে দেবযানী যেন সুদেবের সাবধান বাণীর প্রতিধ্বনি শুনলো। শংকিত না হলেও সে সাবধান হলো।

অমৃত কানন যাবার পথ যেখানে বড় রাস্তা থেকে ঢালু হয়ে নেমেছে সেখানে পৌঁছে দেবযানী একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে ডান দিকে বাঁক নিয়ে নেমে যায়। জন-বিরল পথে যাতে পূর্বদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-ঘটে সে জন্য সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে সতর্ক দৃষ্টিমেলে পথ চলছিলো। সেদিন লোকটা যেখানে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলো দূরথেকে সেখানটাতেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এগোচ্ছিলো। নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হতে সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যে পাশের ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ একটি ছেলে ক্ষিপ্রতার সহিত তার আগে আগে চলছে। পরমুহূর্তে সামনে বাঁয়ের গলি থেকে আর একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটি তার দিকে এগিয়ে এসে পাশ কেটে চলে গেলো।

এভাবে একই সময়ে পরপর তুটি ছেলের ভিন্ন দিক থেকে আবির্ভাব ও বিপরীত মুখী গমন পূর্বপরিকল্পিত না স্বাভাবিক দেবযানী তা ঠিক বুঝতে পারলো না। হয়তো তার মনের তুর্বলতার জন্যই এরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের উৎপত্তি। যে ছেলেটি আগে আগে যাচ্ছিলো তাকে পেছন থেকে ঠিক গুরখার মতোই দেখাচ্ছিলো। কিন্তু সে যদি গুরখা না হয়ে অন্য কেহ হয় সেজন্য দেবযানী তাকে না ডেকে নীরবে পথ চলছিলো। কৌতূহল বশতঃ সেএকবার পেছন ফিরে যে ছেলেটি তার পাশ কেটে গেছে তাকে দেখবার জন্য মুখ ফেরালে। কিন্তু তাকে দেখতে পায় না। পরক্ষণেই সুমুখ পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দেখে অগ্রগামী ছেলেটিও ইতিমধ্যে অদৃশ্য। এ যেন এক ভোজবাজী! তবে কি তার ধারণাই সত্য—ছেলে তুটির হঠাৎ আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান উদ্দেশ্য প্রসূত!

চিন্তাভারাক্রান্ত দেবযানী চলে চলে অমৃতকাননের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। চতুর্দিকে চেয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে। কাননের মাঠে ঘাটে পুকুরে—আখড়ার সর্বত্রই পূর্বের মতোই কর্মচাঞ্চল্য। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম দৃষ্ট হলো না। আখড়া বাঁয়ে রেখে দেবযানী বাগানের রাস্তা ধরে সরাসরি মহারাজ-এর কুটিরের সামনে এসে উপস্থিত। বাগানের ভেতরের দৃশ্যও পূর্বদিনেরই অনুরূপ। কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে

কিছুক্ষণ ইতস্তত করবার পর দেবযানী অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—আসতে পারি ?

খানিক বাদে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি মহারাজ নন। এক নবীন যুবক—স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত যৌবনোদ্দীপ্ত বলশালী শান্ত সুবোধ চেহারা। ছেলেটি দেবযানীকে দেখেই নম্রভাবে জিজ্ঞাস্য করে—কাকে চ'ন ?

বিস্মিত দেবযানী উত্তরে জানায়—মহারাজকে।

—একটু দাঁড়ান, বলেই যুবকটি ভেতরে ঢুকে যায়।

পরমুহূর্তেই মহারাজ বেরিয়ে আসেন। দেবযানীকে দেখে কণ্ঠস্বর একটু উচ্চগ্রামে তুলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন—দিদি যে, এসো এসো। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? আমার নিকট আসতে তোমার তো কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। তোমাকে তো বলেইছি—যখন ইচ্ছা আসবে।

দেবযানীর হাত ধরে মহারাজ ভেতরে প্রবেশ করতেই যুবকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়।—বসো বলেই মহারাজ তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে দেবযানীকে বসতে ইশারা করেন। তারপর ছেলেটির দিকে চেয়ে বলেন—আমাদের কথাবার্তা তো একরকম হয়েই গেলো। সুতরাং সেভাবেই অগ্রসর হবে। প্রয়োজন কিংবা অসুবিধা বোধ করলে, জানাবে।

যুবকটি চলে যেতেই মহারাজ দেবযানীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার খবর কি দিদি ? স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ইত্যাদি ভালোই চলছে। বাড়িতে মামা মামী, আদরের ছোট্ট ভাইটি নিশ্চয়ই কুশলে আছে।

দেবযানী মহারাজ এর কথা শুনে অবাক। তার এতো খবর তিনি জানেন কি করে ? তাঁর সঙ্গে পরিচয় মাত্র একদিনের এবং তাও অতি অল্প সময়ের জন্য। সে সময় নিজের সম্পর্কে সে তো তাঁকে কিছু বলেনি। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে দেবযানী গলার স্বর স্বাভাবিক করে বলে—মাপ করবেন মহারাজ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

মহারাজ গম্ভীর হলেন। পরক্ষণেই হেসে বললেন—একটা কেন, তোমার যতটা ইচ্ছা কর।

দেবযানী লজ্জা পেলো। তবুও কৌতূহল দমন করতে না পেরে সহজ সরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—আপনি আমার এত খবর জানলেন কি করে ?

মহারাজ-এর মুখে তখনো হাসি লেগে আছে। বললেন—ও হরি, এই কথা ! আমি তো ভাবলাম না জানি কত কি ! তা তোমাকে যখন দিদি ডেকেছি তখন তোমার খোঁজ খবর নেওয়া, শুভা-শুভ, ভালো মন্দ জানা,

তদবির তদারক করা তো আমার কর্তব্য। যাক, এখন বলো, আমি কি করতে পারি ?

মহারাজ-এর গলার স্বরে দেবযানী বুঝলো তিনি এ প্রসঙ্গ আর দীর্ঘতর করে চান না। সেই সঙ্গে তার আরো ধারণা হলো যে তিনি তার আগমনের উদ্দেশ্যও বুঝে ফেলেছেন। সুতরাং তার মনের কথা এখনই ব্যক্ত করা সঙ্গত হবে কিনা দেবযানী তা বুঝে উঠতে পারছে না। কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর সে হঠাৎ বলে ফেলে—এমনিই এলাম, আগে আরো একদিন এসেছিলাম, জানেন তো ? শেষের কথা বলে দেবযানী অপ্রস্তুত।

মহারাজ মিটিমিটি হেসে বললেন—হলো না দিদি, ঠিক বলা হলো না। হাঁ, এসেছিলে বটে। সেই সঙ্গে এমন কিছু জেনেছি—। মহারাজ আর বলতে পারলেন না। তার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হলো।

দেবযানী মহারাজের এরূপ আকস্মিক উত্তপ্ত উগ্রমূর্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে এতটুকু হয়ে গেলো। তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরলো না।

নিজেকে সামলে নিয়ে মহারাজ হো হো করে হেসে উঠলেন—কি দিদি ভয় পেলে নাকি ?

দেবযানী মাথা নিচু করে বিনম্র কণ্ঠে বলে—যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন।

—তুমি আবার কখন অন্যায় করলে ? না, না, তুমি ভুল বুঝেছ দিদি। পৃথিবীর অবিচার, অত্যাচার, অনাচার, ও বুভুক্ষার কথা মনে হলে মাঝে মাঝে আমার মনের স্থৈর্য হারিয়ে যায়। ওর জন্য তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। এখন বলো আমাকে কি করতে হবে।

দেবযানী সহজ সরল কণ্ঠে অনুনয় করে—আমাকে আপনাদের আখড়ার সভ্য করে নিন।

—অতি উত্তম কথা দিদি—খুবই খুশীর কথা। কিন্তু প্রশ্ন, তুমি কি পারবে ?

মহারাজ এমন কথা বলছেন কেন! দেবযানীর উৎসাহ দপ করে নিবে গেলো। কিন্তু না, দমে গেলে চলবে না। তার সংকল্প তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনের বিষণ্ণ ভাব কাটিয়ে জোরের সঙ্গে বললে—পারবো না কেন—নিশ্চয় পারবো বলেই তো এসেছি।

—না দিদি, আমি কথাটা সে অর্থে বলিনি। আমার কথার উদ্দেশ্য

হলো এখানেও নিয়ম কানুন সম্পর্কে তোমাকে ওয়াকিবহাল করা। হালে এখানে এমন সব ব্যবস্থা চালু হয়েছে যা পূর্বে ছিলো না। তার মধ্যে অর্থও এখন একটা বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেমন ধরো চাঁদা। এখন প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হবে। তার-ওপর ভর্তি হবার সময় এটা সেটা মিলে এককালীন কিছু অর্থ দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। অবশ্য ব্যত্যয় যে নেই তা বলছি না—তবে সেটা নিয়ম বহির্ভূত।

দেবযানী এবার সত্যই দমে গেলো। অর্থদেবার ক্ষমতা তার নেই। নিরাশ কণ্ঠে বললে—তা হলে কি হবে! আমার উদ্দেশ্য ও শপথ—সবই যে বিফলে যাবে!

মহারাজ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—সেকি দিদি, তুমি আবার কিসের শপথ নিলে—কার বিরুদ্ধেই বা জেহাদ ঘোষণা করলে!

দেবযানীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে। তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—অন্যায়ের প্রতিবিধান আর অত্যাচারীর শাস্তি—কিছুই হলো না। একজন অন্যায় করে ক্ষমতার জোরে পার পেয়ে যাবে আর একজন দুর্বল বলে সে অন্যায় হজম করবে—ক্ষীণ প্রতিবাদটুক পর্যন্ত জানাতে পারবে না—উত্তম!

যেন এক জ্বলন্ত অঙ্গার—আস্তে আস্তে মিইয়ে গেলো! মহারাজের বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না! নির্বাক হয়ে দেবযানীর বিস্ফুরিত আত্মবিলাপ শুনছিলেন! দেবযানী থেমে যেতেই—সাধু সাধু বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। তারপর—সাবাস সাবাস—আমার দিদির মতোই কথা হয়েছে! মহারাজ দেবযানীর কাঁধে হাত রেখে তাকে উৎসাহিত করলেন।

দেবযানী বুঝি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মহারাজ হাত তুলে বাধা দিলেন! তিনি দেবযানীকে আশ্বাস দিলেন—হতাশ হয়ো না দিদি, তোমার অভীষ্ট অবশ্যই পূর্ণ হবে। আখড়ায় ভর্তি হবার ব্যাপারে আমি সুদেষ্ণা দেবীর সঙ্গে কথা বলে দেখি। তিনি অনেককেই চাকরি-বাকরি, টিউশনি এমন কি বীমার কাজকর্ম দিয়েও সহায়তা করেন—কাজেই বিশ্বাস হারিওনা। ভাল কথা তোমার চাকুরিতে আপত্তি নেই তো!

—না, আমার আপত্তি হবে কেন? আমি তো বহুদিন থেকেই একটা

অর্থকরী কিছু করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। তবে সবই মামা মামীর সম্মতি সাপেক্ষ। তাঁদের অনুমতি ভিন্ন যে কিছুই হবে না।

—বেশ, বেশ—তা হলে মামা মামীর অনুমোদন নিয়ে এসো। তখন একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। মহারাজ উঠে পড়লেন। দেবযানী মহারাজের অনুগমন করে। বাইরে এসে মহারাজ আর কোন কথা বললেন না। কোনো দিকে দৃকপাত না করে গম্ভীর আননে আপন কুটিরাভিমুখী হলেন।

দেবযানী বিপরীত পথ ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে গেট বরাবর হাঁটতে থাকে। তার তখনকার একমাত্র চিন্তা মামা মামীকে চাকুরির ব্যাপারে কি ভাবে রাজী করাবে। মামাকে একদিন বলতে গিয়েও বলা হয়নি। সুতরাং এখন সুযোগ পাওয়া মাত্র আগে মামাকে বলবে। তাঁর সম্মতি পেলে পর মামীকে জানাবে। চাকুরি করাটা তো অন্যায় কিছু নয়। আজকাল তো মেয়েরা অনেকেই চাকুরি করছে। পাশের বাড়ির যূথিকাও তো গানের মাষ্টারি করে। ওর বাবা মা তো কিছু বলেন না। সুতরাং তার চাকুরির ব্যাপারেও বা মামা মামী আপত্তি করবেন কেন? মামার সামান্য চাকরি—সংসারের ব্যয়, তার ওপর ওদের দু'জনের পড়ার খরচ যোগাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। খেটে খেটে মামার হাড়মাস কালি হয়ে গেলো! মামার জন্য সহানুভূতিতে দেবযানীর চক্ষু সজল হলো—এমন ভালো মামা কারো হয়! চাকুরি হলে নিজের আর সুদেবের পড়ার খরচ তো অন্তত পক্ষে সে মেটাতে পারবে। তাতে করে মামার তো কিছু সাহায্য হবে!

সারাটা পথ দেবযানী এসব ভাবতে ভাবতেই চলেছিলো। রাস্তায় কে তার আগে গেলো আর কে-ই বা তার পাছে এলো তা সে কিছুই খেয়াল করে নি। নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছবার একটা সু-সম্বদ্ধ সুস্থির ধারণা নিয়ে সে হৃষ্ট চিত্তে জোর কদমে চলে একেবারে বাড়ির দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে। মামী এসে দরজা খুলে দিতেই সে জিজ্ঞাসা করে—মানদা কোথায়? সে আসেনি?

মামী জানালেন—না আসেনি, ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে—অসুখ, আসতে পারবে না।

দেবযানী দুম করে দরজায় খিল দিতে দিতে বললো অসুখ না হাতি। ওর তো একটা না একটা অজুহাত বাহানা লেগেই আছে—আজ

মাথাধরা, কাল পেট কনকন, পরশু জ্বর---যত সব বজ্জাতি! উঠোন পেরতে পেরতে মামীকে শুনিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে—পই পই করে বলছি অন্যলোক দেখো—না তা নয়, সস্তায় অমন লোক কোথায় পাবো! এখন বোঝো সস্তায় কেমন পস্তাতে হয়! এর একটা বিহিত না করলেই নয়। এই শরীরে এত খাটুনি আর কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না। এ আমি আর বরদাস্ত করবো না। আজ মামা এলে এর একটা বিহিত করে তবে ছাড়বো। গজ গজ করতে করতে দেবযানী ঘরে ঢোকে।

বই খাতা রেখে গোছ গাছ সারা হতে না হতেই মামীর ডাক আসে —যানি খেতে আয়, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

দেবযানী হাতের কাজ সেরে পা দিয়ে দুম দাম শব্দ করতে করতে ন্না ঘরে গিয়ে হাঁক দেয়—দাও, কি দেবে গিলে ফেলি।

উর্মিলা দেবযানীর রাগের কারণ বুঝতে পেরে নিঃশব্দে খাবার দিয়ে াপন কাজ করতে থাকে। খেতে খেতে দেবযানী হঠাৎ চিৎকার করে ঠে—শোনো মা,···ধেৎ যত সব···। খানিক চুপ করে থেকে আবার শুরু করে—তুমি কি সত্যি চাও যে আমি লেখা পড়া ছেড়ে দিই।

—এ আবার কি কথা—তুই কি ক্ষেপে গেলি!

—যা বলছি, ঠিকই বলছি। একটা ঝি রেখেছ, মাসে ১৫ দিন কামাই। ফলে হেঁসেল থেকে ঘর নিকানো—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু একা হাতে তোমাকে করতে হচ্ছে। তোমার এই শরীরের অবস্থা তাব ওপর এ'তো খাটুনি আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। তুমি যদি অন্য ঝি না দেখো তা হলে আমি অনর্থ করবো। নির্ঘাত কলেজ ছেড়ে ঘরে এসে বসবো—তখন দেখো।

উর্মিলা হেসে ফেলে—কিন্তু লোক পাই কোথায় বল? তার উপর···।

দেবযানী মামী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—তার উপর যা—তাকি বুঝছি না? মামা আর কত পারবেন—খাই খরচ, আমাদের দু'জনের পড়ার ব্যয়, বাসাভাড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে কি থাকে। সেই জন্যই তো ভাবছি···। দেবযানী কথা বন্ধ করে উঠে পড়ে। মামীর হাত ধরে বলে—চলো বারান্দায় চলো। তোমার চুল বেঁধেদি।

উর্মিলা বাধা দেয়—তুই কি পাগল হলি? এই ভর সন্ধ্যায় আমি বাঁধবো চুল! যা।

বেশ, তা হলে সন্ধ্যা উতরে যাক, তারপর বসবে'খন। তোমাকে আর ঘরের কাজ করতে যেতে হবে না। ওসব আমি সেরে ফেলছি। দেবযানী ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘর গুছনো শেষ করে বাতি-জ্বালিয়ে বেরোবার মুখেই সুদেবের সঙ্গে দেখা। সে যে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরেছে তাতে দেবযানী স্বস্তি পেলো—নিশ্চিন্ত হলো। উঠোনে তুলসী মঞ্চ থেকে শঙ্খধ্বনি কানে আসতেই সে দৌড়ে গিয়ে মামীর কাছে দাঁড়িয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে। তারপর হঠাৎ মামীকে তার দিকে ফিরে দাঁড়াতে অনুরোধ করে।

উর্মিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কেন, বল তো! তোর আজ হয়েছে কি!

দেবযানী গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—আহা, একটু দাঁড়াও না বাপু, তোমার সব কিছুতেই আদিখ্যেতা! দেখোনা কি করি।

উর্মিলা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই দেবযানীর দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াতেই সে উবু হয়ে ঢিপ করে তার পায়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়।

—এ আবার কি পাগলামি! উর্মিলার স্বরে পুলক মিশ্রিত অপ্রতিভ ভাব ফুটে ওঠে।

—কেন, কিছু অন্যায় করলুম নাকি! তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যখন অদৃশ্য দেবতার পায়ে প্রণাম জানাচ্ছিলাম তখন আমার মুদিত চোখের সামনে তুমি এসে সশরীরে দাঁড়ালে! উভয়েই তখন একাত্ম হয়ে গেলো! মনে হলো অদেখা, অচেনা, অজানা দেবতাই বুঝি-বা তোমার রূপ ধরে আবির্ভূত হলেন। আর সত্যই তো, তুমিই বা কম কিসে বলো! যিনি আমাকে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত মায়া মমতা ঢেলে মায়ের মতোই আদর যত্নে লালন পালন করেছেন ও করছেন। মা কাকে বলে জানিনা—তোমাকেই আমি মা বলে জানি—তাই তোমাকে প্রণাম করবার ভীষণ ইচ্ছা জাগলো।

উর্মিলা দেবযানীর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো। মুখ দিয়ে কোন কথা সরলো না। বাৎসল্য রসে তার হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ—চক্ষু ফেটে স্নেহ-বিগলিত অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। কম্পিত কণ্ঠে উর্মিলা ডাকলে—যানী, আয় কাছে আয়।

হঠাৎ কি যে ঘটলো! ডাক শুনে দেবযানী মা মা বলে উর্মিলার বক্ষে ঝাপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। উর্মিলা দু'বাহু বাড়ায়ে দেবযানীকে আপন বক্ষে চেপে ধরে আদর করতে থাকে।

ঘনায়মান অন্ধকারে তুলসীমঞ্চের সন্ধ্যাদীপের স্বল্পালোকে যে-অপূর্ব ভক্তি আর স্নেহ-বাৎসল্য-রসের দৃশ্য অভিনীত হলো তার বুঝি তুলনা নেই। অসীম আকাশে লক্ষ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে সন্ধ্যা-তারা তার নীরব সাক্ষী হয়ে রইলো।

সেই মুহূর্তেই সুদেব ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে বোধহয় কলতলার দিকে যাচ্ছিলো। আকস্মাৎ তার দৃষ্টি সম্মুখের অন্ধকার প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ হতেই সে আঁৎকে উঠলো। সন্ধ্যা-দীপের কম্পিত মৃদু আলোকে সে দেখতে পেলো মা পিছনে ফিরে কাকে যেন জড়িয়ে ধরে আছে। সুদেব মা বলে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে সম্মুখে এসে এক অভাবিত দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। মা ও দিদি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। তাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মা বলতে গিয়ে সুদেবের বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো। পরক্ষণে আবার মা ডাকতেই উভয়ের সম্বিত ফিরে এলো।

দেবযানী সুদেবকে দেখেই বোধ হয় কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সে মামীকে ছেড়ে দিয়ে চোখের জল মুছে সুদেবের হাত ধরে মাকে প্রণাম করতে আজ্ঞা করে। বিস্ময়াবিভূত সুদেব দিদির অনুজ্ঞার তাৎপর্য বুঝতে না পারলেও সেটা যে অমোঘ তা বুঝে মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মা তাকে আপন বক্ষে টেনে নেয়।

সে-রাত্রে দেবযানী মামীর চুল বেঁধে দেবার সময় তার চাকরি করার ইচ্ছাটা তাঁর নিকট ব্যক্ত করে। মামী শুনে প্রথমে বিস্ময় তারপর বিশেষ উষ্মা প্রকাশ এবং সবশেষে কান্নাকাটি করেন। পরিশেষে অনেক কাকুতি মিনতি করে দেবযানী মামীর নিকট থেকে দুটি শর্ত আদায় করে —মামাকে যেন এখন এ সম্পর্কে কিছু না বলেন এবং তিনি যেন বিষয়টা আরো ভালো করে ভেবে দেখেন। কেননা চাকুরি তাকে করতেই হবে এবং সেটা ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে টিউশনি যাই হোক না কেন! তবে পড়াশোনায় যাতে ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে দেবযানী মামীকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছে।

কিন্তু দেবযানীর প্রত্যাশা কিছুতেই ফলবতী হচ্ছে না। সে মহা-ঝাঁপড়ে পড়েছে। কলেজ যাতায়াতের পথে অমৃত কাননে যাবার রাস্তাটা চোখে পড়লেই সেখানে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে। অথচ যাবার

উপায় নেই। মামা মামীর নিকট থেকে চাকুরির অনুমতি না পেলে সেখানে যাওয়া নিরর্থক। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেবে। বহু চেষ্টা করেও দেবযানী মামার নিকট কথাটা পাড়বার সুযোগ পাচ্ছে না। মামীও হাঁ, না কিছু বলছেন না। তার সংকল্প, আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে চলেছে! দেবযানী মরিয়া হয়ে ওঠে। আগামী রবিবার যেমন করেই হোক মামার নিকট প্রস্তাবটা উত্থাপন করতেই হবে এবং তার জন্য সে বদ্ধপরিকর হলো! সে-উদ্দেশ্যে শনিবার রাত্রে খেতে বসে দেবযানী মামাকে আগামীকাল রবিবারের কর্মসূচীর কথা জিজ্ঞাসা করে।

মামা উত্তর দিলেন—সকালে ক্লাবের কাজে বেরুতে হবে। তারপর সারাদিন বিশ্রাম! কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?

—এমনিই। আগে আগে তো ছুটির দিনে তুমি আমাদের নিয়ে কত বেড়াতে। এখন তো তোমার সময়ই হয় না।

—এই কথা! বেশ কাল বিকেলে তোদের অনেকদূর বেরিয়ে নিয়ে আসবো।

মামার কথা শুনে দেবযানী আশ্বস্ত হয়ে সুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করে। সে মাথা নেড়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—চোখে মুখে মিনতি ও কাতরতা ফুটে উঠে। দেবযানী বুঝলো সুদেবের যাবার অনিচ্ছা। মামার নিকট সে তা চেপে গেলো। হয়তো মনে মনে এটাই সে চেয়েছিলো। কারণ সুদেবের উপস্থিতিতে মামাকে সব বলা যাবে না।

রবিবার সামান্য দিবা নিদ্রার পর উঠেই মামা হাঁক ডাক শুরু করেন—যানী, সুদেব—তোরা সব কোথায়, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। আজ তোদের এক নতুন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো।

উর্মিলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে—এত রৌদ্রে কোথায় বেরুচ্ছ?

—ভাবছি আজ ওদের পাহাড়ের উপরকার মন্দিরটি দেখিয়ে আনবো। কোনদিন তো ঐ দিকে যায় নি।

—এতদূর কি ওরা হেঁটে যেতে আসতে পারবে? উর্মিলা প্রশ্ন করে।

—দেখা যাক না। আসবার সময় না হয় একটা ঘোড়ার গাড়ি নেবো। দুপুরের আহারের পর থেকেই দেবযানী উদ্‌গ্রীব হয়ে মামার আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলো। মামার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে অবিলম্বে তৈরি হয়ে এসে উপস্থিত হয়।

দেবযানীকে একা দেখে মামা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তুই একা যে? সুদেব কোথায়, সে যাবে না?

—আর বলো কেন। ওদের স্কুলে আজ স্পোর্টস—ওকে উপস্থিত থাকতেই হবে। প্রতিযোগী হিসেবে নাম উঠেছে। চ্যাম্পিয়ান হবে।

—তাই নাকি? আচ্ছা চল, ওকে নিয়ে না হয় আর একদিন যাবো

বড় রাস্তায় পড়ে দেবযানী মামাকে বলে—কোন দিকে যাবে?

—ভেবেছিলাম তো তোদের নিয়ে পাহাড়ের উপরের দেবী মন্দিরটা দেখিয়ে আনবো।

—আমি বলছি কি মামা, আজ ওদিকটা থাক। ওখানে সুদেবকে না নিয়ে যাবো না। বরং চলো জেটির দিকে নদীর পাড়ে গিয়ে কোথাও বসি।

ভাগ্নীর কথা মতো মামা ওদিকেই চললেন। নদীর তীরে জেটির দিকটা সদাই কর্মচঞ্চল। লোকজন গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত অনবরত লেগেই আছে তার ওপর দর্শনার্থীর সমাগমও কম নয়। এ স্থানটা নগরের একটা প্রধান আকর্ষণ। নদীর বাঁকে বাঁকে জাহাজের পথ নির্দেশক বিচিত্র রকমের আড়কাটি। আরো এগোলেই নদীর মোহনা। এদিকটায় দেশী নৌকার আগমন বিরল। কশ্চিৎ কদাচিৎ সমুদ্রে চলাচল উপযোগী নানা পণ্যসম্ভারবাহী বজরা জাতীয় বড় বড় নৌকা দৃষ্ট হয়। ভাটার খরস্রোতে মাঝিরা দু'তিনজন মিলে নদীর তীর ধরে পায়ে হেঁটে নৌকোকে উজানে গুণ ধরে টেনে নিয়ে চলে। বাম-তীরে বহুদূর ব্যাপী এক পর্বতমালা—মনে হয় যেন সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে নাঙা দাঁড়িয়ে আছে। গভীর নীলাম্বুর তরঙ্গরাশি ফুলে ফুলে উন্মত্ত দুরন্ত দৈত্যের মতো তার গায়ে আছড়ে পড়ছে।

রবিবার বলেই আজ ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় বেশী। সর্বত্রই ভিড়। নিরিবিলি একটু ঠাঁই খুঁজে পাওয়া ভার। নদীর তীর ধরে এগিয়ে বালিয়াড়ি মতো একটু উঁচু জায়গায় মামা-ভাগ্নী বসে পড়ে। এখানটায় নদী অনেক চওড়া। মাথার উপর বৃক্ষ-আচ্ছাদন না থাকলেও সূর্যের উত্তাপ তেমন প্রখর মনে হচ্ছিল না। একে পড়ন্ত বেলা তার ওপর বাতাসের বেগও মৃদুমন্দ নয়। দেবযানী সোৎসাহে বলে—প্রতি রোববার মামীকে নিয়ে এখানে এসো মামা। কেমন লক্ষ্মী মামা? যা তোমার

খাটুনি! মামীরও সেই অবস্থা—খেটে খেটে হাড়-মাস কালি হয়ে গেল। দেখবে, এখানে এলে তোমাদের শরীর অবশ্যই ভালো হবে। অসুবিধার মধ্যে দূরত্বটা একটু বেশী—সে এমন কিছু নয়। আমার কিন্তু জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। আগেও তো এসেছি—তখন কিন্তু এতো ভালো লাগেনি।

মামা হেসে বলেন—পাগলী কোথাকার!

দেবযানী নিরুত্তর। তার চিন্তাধারা তখন হয়তো অন্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে কেবলই ঘুবপাক খাচ্ছে—কি ভাবে সে মামার নিকট চাকুরির প্রস্তাব উত্থাপন করবে! কি কথা দিয়ে আরম্ভ করবে? তা ছাড়া তার মনের মধ্যে পিতামাতার শেষ প্রসঙ্গ জানবার এক অদম্য বাসনা লুক্কায়িত।

ভাগ্নীর নিশ্চুপ নিরানন্দ ভাব লক্ষ্য করে মামা জিজ্ঞাসা করেন—কি রে, হঠাৎ আবার কি হলো? একেবারে চুপ করে গেলি যে!

—বলবার অবকাশ দিচ্ছ কোথায়! কিছু বললেই হয় উড়িয়ে দেবে, না হয় চুপ থাকতে বলবে!

রমেশ অবাক হয়ে যায়—সেকি, কখন এমন বললুম?

—কেন, এই তো একটু আগে বললুম, তুমি ও মামী এখানে স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াতে আসবে। তা শুনলে? হেসেই বিষয়টা উড়িয়ে দিলে! অথচ আমি চাক্ষুষ দেখছি তোমার ও মামীর অত্যধিক খাটা খাটুনির ফলে শরীর দিন দিনই ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থায় আমারও তো কিছু করণীয় আছে। আমি এখন বড় হয়েছি। না কি বলতে চাও আমি চোখ-মুখ বুজে ধ্যানী বুদ্ধ হয়ে বসে তোমাদের এই অবস্থা কেবল অবলোকন করতে থাকবো? সেটি আমার দ্বারা হবে না বাপু, তা তোমরা যাই বলো আর তাই বলো। এ আমি বলে রাখছি। মামীকেও সেদিন আমি নোটিশ দিয়েছি—যদি অন্য ঝিব ব্যবস্থা না করেন তা হলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে বসে ঝিয়ের কাজ করবো। আর আজ তোমাকেও একটা কথা বলছি—যা আগেও একদিন বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু বলা হয়নি।

দেবযানী দম নেবার জন্য চুপ করে গেলো। তারপর—লক্ষ্মী মামা—বলে তার মুখের দিকে চেয়ে দেবযানীর আর বাক-স্ফূর্তি হলো না। মামা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে! এত নৈকট্য সত্ত্বেও মামা যেন

তাকে অনেক দূর থেকে নিরীক্ষণ করছেন! তাঁর সে দৃষ্টিতে বিস্ময় বিষাদ, আতঙ্ক ইত্যাদি নানা ভাবের স্ফুরণ হচ্ছে। দেবযানী ভয় পেয়ে—মামা মামা ডেকে হাত ধরে নাড়া দিতেই রমেশ আত্মস্থ হয়ে সাড়া দেয়। ছল ছল চোখে দেবযানী বলে—তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে কেন মামা? আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিলো।

রমেশ এই প্রথম ভাগ্নীর সম্বন্ধে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা অনুভব করলো। দেবযানীর বাচনভঙ্গী ও হাবভাবে যেন তার গতাসু প্রিয় ভগ্নীর প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। রমেশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলো। নিজেকে সামলে নিয়ে ভাগ্নীকে আশ্বাস দেয়—না মা, ভয়েব কিছু নেই—আয় কাছে আয়। তোর কি বলার আছে বল।

দেবযানী নিস্তেজ কণ্ঠে বলে—কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল, মামা! তোমাকে বলতে আর ভরসা পাচ্ছি না।

—ও কিছু নয় যানী। তোর যা বলবার আছে নির্ভয়ে বলে ফেল। তোর কথা আমি কোন দিন ফেলেছি?

—সত্যি? বেশ দাঁড়াও, আগে তোমাকে একটা প্রণাম করেনি। তারপর আশীর্বাদ চাইবো।

ভাগ্নীর কথা শুনে রমেশ হকচকিয়ে গেলো। মনেব মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা আবার তোলপাড় শুরু করলো। নানা সন্দেহের উদ্রেক হলো। কিন্তু আর তো পেছপা হবার উপায় নেই। কথা রাখবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। তার ওপর যানীর পরলোকগতা জননীর স্বভাব, চরিত্র, হাবভাব, মেজাজ এমনকি কথাবার্তার ধরণধারণ পর্যন্ত ওর মধ্যে ক্রম-বিকাশ ঘটছে। সুতরাং ওর ইচ্ছাকে বাধা দেওয়া বিড়ম্বনার সামিল হবে—হিতে বিপবীত হবে। মনের চাঞ্চল্য দমন করে রমেশ মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—নিঃসঙ্কোচে তুই মনের কথা বল যানী। আমি বিশ্বাস করি তুই এমন কিছু বলবি না যা আমি রাখতে পারবো না।

—সত্যি বলছো তো? তবে আশীর্বাদ করো মামা—যেন একটা চাকরি পাই।

—কি বললি, চাকবি? তুই করবি চাকরি?

—হাঁ, কেন মামা, চাকরি করাটা কি অন্যায়, না অপরাধ? পাশের বাড়ির অনীতা কি চাকরি করে না। তবে বলতে পারো তোমার মতো

আপিসে যায় না। দশটা পাঁচটা আপিসে না গেলেও কি আর চাকরি হয় না? টিউশনিও কি একরকম চাকরি নয়?

—বুঝলাম, কিন্তু তুই এই বয়সে কি চাকরি করবি আর কেই বা তোকে চাকবি দেবে মা? বেকারিতে দেশ ছেয়ে গেছে! শিক্ষিতরা ফ্যা ফ্যা করে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। কুড়ি টাকার একটা চাকরি যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। সেদিন আমাদের ক্লাবে সামান্য বেতনের কেশিয়ারের পোস্ট-এব জন্য এম. এ., বি. এ. থেকে শুরু করে কত লোকের দরখাস্ত পড়েছে জানিস? তার ওপব আবাব দুই হাজার টাকা ক'শন মানি জমা রাখতে হবে।

—সেজন্য তুমি ভেবো না মামা। তুমি অনুমতি দাও, তারপব দেখো কি চাকরি কবি। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি এমন চাকরিই নেবো যাতে পড়াশোনাব ক্ষতি না হয।

খানিক চুপ কবে রমেশ কি যেন ভাবলে, তাবপর বললে—আমি না হয় তোকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু তোব মামী—তার কথা কিছু ভেবেছিস?

—সে ভাব তোমার। আমি তাঁকে বলেছি। কিছুতেই রাজী করাতে পারিনি। তোমাব পায়ে পড়ি মামা—তুমি তাঁকে বুঝিয়ে পড়িয়ে মত করাও! তাঁব অনুমতি না পেলে আমি যে কিছুই করতে পারবো না। আমার আশা আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়ে যাবে। সে আমি সহ্য করতে পারবো না—আমি তা হতে দেবো না।

দেবযানীর শেষেব কথায় রমেশ আবার এক জোর ধাক্কা খেলো। বহুদিন পূর্বে শ্রুত আর একজনেব কণ্ঠস্বরের হুবহু প্রতিধ্বনি বুঝি শুনতে পেলো—যেদিন অশ্রু সকলেব অমতে সিতাংশুকে বিয়ে কববার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছিলে—তুমি কি বলতে চাও মেজদা অতীত যুগের উৎপীড়ক শাসক পুরোহিত শ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রোদ্ভূত বিধিবিধান, পক্ষপাত-দুষ্ট সংকীর্ণ এক সামাজিক অনুশাসনের নাগপাশে আমার আশা আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রেখে নিজের জীবন বিফল করে দেবো? নিজেকে এক বহু যুগ ব্যাপী কুআচার কুসংস্কারের যূপকাঠে বলি দেবো! তা হবে না। আমি হতে দেবো না। আমি মন স্থিব করে ফেলেছি। সকলকে বুঝিয়ে রাজী করাবার ভার তোমার।

রমেশ হতবাক! দেবযানীর সব যেন কেমন অদ্ভুত আশ্চর্যজনকভাবে

একই ছন্দে একই সূত্রে ওর মৃতা মায়ের সঙ্গে গাঁথা এবং মিলে যাচ্ছে! উর্মিলার মনের যে আশঙ্কাকে এতদিন সে অহেতুক বলে উড়িয়ে দিয়েছে আজ তাকেই বুঝি তা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে! যে-অনুজা-দুহিতাকে তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হৃদয়ের সমস্ত মায়া মমতা স্নেহ উজার করে ঢেলে দিয়ে লালন পালন করছে তার ভবিষ্যৎ কি তার মায়েরই মতো এক শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটকে পর্যবসিত হবে? এক অনাঘ্রাত কুসুম প্রস্ফুটিত হতে না হতেই অকালে ঝরে পড়বে! কে জানে ইহা কিসের ইঙ্গিত!

এক অজানা আশঙ্কায় সে আতঙ্কিত হলো। ভাগ্নীর চরিত্রে বয়স অনুপাতে তার মায়েরই মতো অস্বাভাবিক চিন্তাধারার উৎপত্তি ও বিকাশ দেখে রমেশ কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলো। তারপর আচম্বিতে প্রশ্ন করেন —যানী ইতিহাস আমরা কেন পড়ি এবং তার থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি, বলতে পারিস?

মামার এরূপ আকস্মিক অসংলগ্ন প্রশ্নে দেবযানী বিস্মিত। তার মুখে তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর যোগালো না। অবাক দৃষ্টিতে মামাকে নিরীক্ষণ করে মনে মনে তার জিজ্ঞাসার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করে।

কিন্তু মামার আর তর সইলো না। ভাগ্নীকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে তিনি নিজেই স্বীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যা শুরু করেন:

—ইতিহাস কি জানিস? ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তন-ধারার আলেখ্য। সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি ইতিহাসের মুকুরে প্রতিফলিত। ইতিহাসের ভাণ্ডার থেকে পূর্বপুরুষকৃত ভুল ত্রুটি, চ্যুতি বিচ্যুতির আবর্জনা সরিয়ে উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাল মশলা সংগৃহীত হয়। এ-ভাবেই অতীতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নব নব সমাজ সভ্যতা শিক্ষা কৃষ্টি আর বিকশিত হচ্ছে সুন্দর সরল, সুস্থ সবল সফল চিন্তাধারা। যুগ যুগ ধরে মানুষ এমনি করেই বুঝি পূর্বপুরুষের ঋণ শোধবোধ করে চলেছে! মানব ইতিহাস এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মতোই বিশাল রহস্যপূর্ণ আর বৈচিত্র্যময়। সুবৃহৎ এর নানা অধ্যায় বলে কয়ে শেষ করা যায় না। আমাদের জীবনকে সুন্দর শিবময় করে গড়ে তুলতে হলে অতীতকে জানতে হবে বুঝতে হবে—তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে এগিয়ে যেতে হবে। অতীতকে না জানলে না বুঝলে কিছু জানা বা বোঝা যায় না এবং পূর্বপুরুষদের না জানলে নিজেকেও জানা যায় না, বুঝলি?

দেবযানী তখনো মামার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিঃশব্দে তার কথা শুনছে, এবং তিনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝবার চেষ্টা করছে।

মামা ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনরায় শুরু করেন—যানী, তুই এখন বড় হয়েছিস, ভালো মন্দ, হিত অহিত বিচার বিবেচনা করবার বুদ্ধি ও শক্তি অর্জন করেছিস এবং সব চাইতে বড়ো কথা নিজেকে বুঝতে শিখেছিস। এখন তোর অতীতকে চেনা দরকার। স্বর্গত পিতা মাতাকে জানা প্রয়োজন, তবেই না নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার বুনিয়াদ শক্ত করে গড়ে তুলতে পারবি। সেদিন তোকে তোর বাবা মার কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম। অনুক্ষণ মনে সন্দেহ সংশয় জাগছিলো—ভালো করলুম কি মন্দ করলুম। কিন্তু আজ আমি নিসংশয় তোর পিতামাতার জীবন ইতিহাস তোর জানা একান্ত উচিত।

মামার শেষের কথায় দেবযানী উৎসাহিত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো—বলো না লক্ষ্মী মামা, সেদিন তুমি বলতে বলতে যেখানে থেমে গেলে সেখান থেকেই শুরু করো।

মামা চুপ করে আছেন। তার মনের গভীরে বুঝি তখন স্মৃতিচারণ চলেছে। দূরে নদীর অপর পাড়ে পাহাড়ের অন্তরালে অপরাহ্ন বেলার শান্তবাগ নিদাঘ সূর্য অন্তর্হিত। খরস্রোতা নদীর গৈরিক জলে তার কালোছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নিষ্প্রভ সূর্যের শেষ রশ্মি ঊর্ধ্বাকাশে বিচিত্র রঙের মেলা বসিয়েছে আর নদীর এপাড়ে ধরণীর ওপর ধীরে ধীরে একখানা ধূসর অবগুণ্ঠন টেনে দিচ্ছে। অদূরে বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। দূরে সমুদ্রের কল-কল্লোল স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সব মিলে এক বিষাদ-ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেবযানী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ মামার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—শ্রান্ত ক্লান্ত অতীব ক্ষীণ, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে—তোর বাবার কথা কি বলবো! বর্ণ-শিক্ষার প্রথম-ভাগ-বর্ণিত শান্ত, সুবোধ, লেখা পড়ায় উত্তম এবং নির্মল আদর্শ চরিত্রবান ছেলে! স্নাতক হয়ে বাবার এককালের প্রিয় ছাত্র তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য আমাদের বাড়ি এলো। বাবা তখন মাষ্টারি থেকে অবসর নিয়েছেন। শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিলো না। পিতার অবসরপ্রাপ্ত নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে প্রিয় ছাত্রের আবির্ভাব যে পরম পরিতোষের কারণ হয়েছিলো এবং তার সাহচর্য যে নিঃসন্দেহে তাঁকে আনন্দ দিতো তা

আমরা অনুভব করতাম। বাবার সুপারিশে জিলা স্কুলে সিতাংশুর শিক্ষকের চাকরি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমোদন লাভ করলো। কর্মের অবসরে সিতাংশু বাবার নিকট যাতায়াত করতো এবং তাঁর নিভৃত নিরালা সন্ধ্যাগুলো নানা আলাপ আলাপনে উৎফুল্ল করে তুলতো।

—কতদিন আগের কথা অথচ মনে হয় যেন সেদিন! আমিও তখন সবে চাকুরিতে ঢুকেছি। একদিন আপিস প্রত্যাগত বাড়ি এসে শুনি বাবার ঘরে জোর তর্ক বিতর্ক চলেছে। ঘরে প্রবেশ করে দেখি বাবা নির্বাক শ্রোতা। বক্তা সিতাংশু আর অশ্রু—বিষয় স্ত্রী শিক্ষা। অশ্রুর বক্তব্য—মেয়েদের যদি কেবল বিয়ে করে সংসারধর্ম পালন করতে হয় তাহলে শিক্ষার মান ম্যাট্রিক পর্যন্তই যথেষ্ট। তাদের উচ্চ শিক্ষা সময় এবং অর্থের অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু নয়। তবে হাঁ, স্বাধীন ভাবে চলতে ফিরতে ও নিজের জীবিকা উপার্জন করতে হলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অশ্রু ম্যাট্রিক পাশ করে আর কিছুতেই পড়লো না! লেখাপড়ায় ছাত্রী হিসাবে খারাপ ছিলো না। কিন্তু তার শর্ত—উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে দিতে হবে এবং বিয়ের প্রস্তাব স্থগিত রাখতে হবে।

—আশ্চর্য ব্যাপার, ম্যাট্রিক পাশের পর থেকেই ওর একটা না একটা বিয়ের প্রস্তাব আসছিলো। একবার এক প্রস্তাব এলো—ছেলে এম. এ. বি. টি. এক স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক—বি. সি. এস.-এর মনোনয়নের সম্ভাবনা আছে। ঘর বর সবই ভালো। কিন্তু অশ্রু বেঁকে বসলো—যতই হোক ইস্কুলের মাষ্টার তো! ও-কলঙ্ক ঘুচাবে কি দিয়ে? ইস্কুলের মাষ্টারের প্রতি ওর যে কি বিদ্বেষ আর ঘৃণা ছিল। শুনে আমরা সকলে রাগারাগি করলুম। বৌদি কুপিত কণ্ঠে বললে—ঠাকুরঝি, অত ঠেকার ভালো নয়! তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে! ফল হলো না। অশ্রু অনড় অটল—সেই সঙ্গে বাবাও। অদ্ভুত, বাবাকে কোনদিনও অশ্রুর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে শুনিনি!

—সেই অশ্রু যেদিন রাত্রে আহারের সময় তার অন্য এক সম্বন্ধের প্রস্তাবের উত্তরে সিতাংশুকে বিয়ে করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো তখন আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অশ্রু বলে কি! কি আছে সিতাংশুর? আচার আচরণে, কথাবার্তায়, জ্ঞানে গুণে সাধারণের চাইতে উর্ধ্বে হলেও ইস্কুলের এক সাধারণ শিক্ষক, অস্বচ্ছল অবস্থা এবং সব

চাইতে বড় কথা হলো অসবর্ণ। রাগে সকলেই ফেটে পড়লো। ভাত পাতেই দাদা ও নরেশ লাফালাফি শুরু করলো। খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবার উপক্রম। বৌদি মুখ বেঁকিয়ে অন্তর্হিত। অবশেষে সোনাদি অশ্রুকে বুঝিয়ে পড়িয়ে নিবৃত্ত করবার প্রতিশ্রুতি দিতেই উভয়ে আহার শেষ করে। বিস্ময়েব ঘোব কাটিয়ে অশ্রুকে কিছু বলতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গেলাম। তার মুখে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার অভিব্যক্তি নেই—প্রশান্ত ধীর স্থিব ভাব, তার অচল অটল সংকল্পই ঘোষণা করলো। আমার আব তাকে কিছু বলা হলো না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র কবে সংসাবে মহা অশান্তির সূত্রপাত হলো। বাবা বোগ শয্যায় চলচ্ছক্তি-রহিত। বুঝতে পারছিলাম তার জীবনদীপ নির্বাণোন্মুখ। মাঝে মাঝে দাদার ভিন্ন বাসাবাড়িতে উঠে যাবার আস্ফালন এবং নবেশেব ক্রোধ উগ্ররূপ ধারণ কবে এক বিশ্রী পবিবেশের সৃষ্টি করলো। কিন্তু যাকে নিয়ে সংসাব এতো বড় ঝড় ঝাপটায় আর অশান্তি'ত উদ্বেল তাব এসবে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই! সে একেবাবে নির্বিকার ও নিজেব ভাবে সমাহিত এবং একান্ত চিত্তে রুগ্ন পিতার পরিচর্যায় ব্যস্ত। আশ্চর্য পরিবর্তন! যে অশ্রু বর্ষণ-স্ফীত পার্বত্য স্রোতস্বতীর মতো সদা চঞ্চল উচ্ছল ও উদ্ধত তাব মধ্যে যেন হেমন্তের সমতল ভূমিব গঙ্গা প্রবাহেব গভীর প্রশান্তি নেবে এসেছে!

—বিষয়টা বাবার নিকট ব্যক্ত কবে তাঁর মতামত জানবার অবকাশ খুঁজছিলাম। সে-সুযোগ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে গেলো। আপিস থেকে ফিবে বাবার ঘরে প্রবেশ করে দেখি তিনি একা এবং বিনিদ্র। অন্য দিনেব তুলনায় তাঁর মুখের ভাবে রোগ-জনিত ক্লিষ্টতাও কম বলেই অনুমিত হলো। আমাকে দেখেই তিনি ইশারায় কাছে ডাকলেন।

—কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করতেই পিতায় শুষ্ক বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তাঁর পাশে উপবেশন করবার ইংগিত দিয়ে তিনি চক্ষু মুদে রইলেন। মনে হলো তিনি যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন। উৎকণ্ঠায় কয়েকটি মুহূর্ত কাটলো। হঠাৎ তিনি চক্ষুমেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন তারপব অতি ক্ষীণ স্বরে বললেন—হয়তো আর বলবার অবকাশ আমার হবে না। অশ্রুকে দেখো। তুমি ভিন্ন ওকে বুঝবার আর কেহ রইলো না। বলতে বলতে বাবার শিথিল কুঞ্চিত কপোল

রেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাঁর চোখের জল মুছতে গিয়ে আমারও চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'লো। পাছে বাবার কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায় এই ভয়ে আপন উদ্বেলিত অশ্রু রুদ্ধ করে কান্না দমন করলাম।

—বাবা একদৃষ্টে তখনো আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাঁকে আশ্বাস দিলাম—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা, অশ্রুর সব ভার আমি নিলাম। ওর সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। বাবা উৎকর্ণ হলেন। অশ্রু তার বিয়ে সম্পর্কে যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে আমি আনুপূর্বিক তাঁকে তা বললাম।

—বলা শেষ হলে বাবার দিকে চেয়ে দেখি তার রোগ-কাতর-বিশুষ্ক মুখ মণ্ডলে এক নিশ্চিন্ত প্রশান্তির ভাব বিরাজ করছে। তাতে সংস্কার জনিত বিতৃষ্ণা বিক্ষোভের লেশমাত্র পরিদৃষ্ট হলো না। সত্যই অবাক হলাম। তবে কি পিতারও তাই ইচ্ছা? এবং তাঁরই প্রচ্ছন্ন পক্ষপুটে এই অসবর্ণ মিলন পুষ্টি-লাভ করেছে এবং এই দুই বিপরীত-মুখী চরিত্রের একই সূত্রে গ্রন্থন সম্ভব হয়েছে? পিতার তুষ্ণীম্ভাব তাঁর সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলেও আমার মন সন্দেহ-মুক্ত হলো না। আজীবন যিনি বর্ণাশ্রম সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন, নিষ্ঠাবান আর গোঁড়া বলে খ্যাত ছিলেন শেষ জীবনে তাঁর এই বিচ্যুতি—প্রিয় ছাত্র এবং প্রিয়তর আত্মজার মধ্যে অসবর্ণ মিলনের স্বীকৃতিদান যে একেবারেই অসম্ভব ও অচিন্ত্যনীয়! কিন্তু কি ভাবে এমন অঘটন সম্ভব হলো! তাই তাঁর মৌখিক অনুমোদন শুনবার আশায় তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে—বাবা বাবা, ডাক দিলাম। সেই মুহূর্তেই সিতাংশু এসে সামনে দাঁড়াতেই আমি চুপ হয়ে গেলাম। তাকে পাশে বসতে বলে আমি বাবার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলাম। আমার আহ্বান নিশ্চয়ই বাবা শুনেছেন এবং তার কারণ তিনি ধরতে পেরেছেন। না হলে তিনি চক্ষু-মেলে আমার দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন কেন? তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসির স্পষ্ট আভাষ দেখতে পেলাম। আমার প্রশ্নের সমাধান হ'লো—সিতাংশু এবং অশ্রু বাবার আশীর্বাদ লাভ করলো। পরম নিশ্চিন্ত নির্ভর চিত্তে ও হৃষ্টমনে বাবার নিকট থেকে উঠে এলাম।

—তারপর থেকে বাবার স্বাস্থ্যের অবস্থার আরো অবনতি ঘটলো। অবশেষে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার আমাদের সকল প্রচেষ্টা, সেবা শুশ্রূষা ব্যর্থ

করে দিয়ে একদিন তার জীবন-দীপ-শিখা কাঁপতে কাঁপতে দপ্ করে নিবে গেলো। জ্ঞান হবার পর অশ্রু এই প্রথম এক অতি আত্মজনের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলো। বিগত ছয় মাস কাল দিবারাত্রি মূর্তিমতী ধাত্রীর মতো অপরিসীম ধৈর্যে আর পরম যত্নের সঙ্গে যাঁর পরিচর্যা করেছে তাঁর চির-অন্তর্ধান ওর বুকে কঠিন আঘাত দিয়েছিলো। অশ্রু খুবই মুষড়ে পড়লো। কিন্তু আশ্চর্য ওর অন্তরের শূন্যতার ও কান্নার বাহ্যিক প্রকাশ হলো না। সকলেই অবাক। আর সিতাংশু বাবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সেই-যে বেরিয়ে গিয়েছিলো তারপর বহুদিন তার দর্শন মেলে নি।

মামা হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। বিগত জীবনের এক বেদনা-বিজড়িত কাহিনী যখন ভাগ্নীর নিকট বলে চলেছিলেন স্মৃতির সলিলে তখন তিনি ডুবে ছিলেন। এক অসাবধান মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ের গভীরে ব্যথায় টান পড়লো—চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলো। নির্গলিত অশ্রু রোধ করতে গিয়ে আচম্বিতে কাহিনীতে ছেদ পড়লো।

দেবযানী চমকে মামার দিকে তাকালো। দেখলো তাঁর চোখে জল। বুঝলো উদগত অশ্রু রুখতে গিয়ে মামা বাক-রুদ্ধ হয়ে গেছেন। ইচ্ছা হলো আদর করে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। পাছে মাতুলের স্মৃতির অনুবর্তন ব্যাহত হয় এই ভয়ে দেবযানী চোখ ফিরিয়ে নেয়।

সূর্য তখন দিগ্বলয়ে অন্তর্হিত। ঊর্ধ্বাকাশ তার বিলীয়মান আলোক-চ্ছটায় উদ্ভাসিত। নদীর তরঙ্গে তার প্রতিচ্ছবি এক অপরূপ মোহময় রূপ ধারণ করেছে। অন্ধকার চতুর্দিক গ্রাস করে আসছে। এক মন-খারাপ-করা নিস্তব্ধ বিষাদ-ঘন সন্ধ্যা।

নীরবতা ভঙ্গ করে মামা বললেন—যানী সন্ধ্যে নেমেছে, চ'বাড়ি চ'।

—না মামা, রাত্রি হতে এখনো দেরী। তুমি রোজ রোজ খালি একটু একটু করে বলো। আজ তোমাকে ছাড়ছি না। হোক রাত্রি, সবটুকু আমাকে শুনতেই হবে।

—আর একদিন বলবো মা। এখন বলতে গেলে বাড়ি ফিরতে দেরী হবে। তার ওপর রেতে বিরেতে এসব জায়গা ভালো নয়। জেটির এসব অঞ্চল রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোর গুণ্ডা বদমাইসের উপদ্রব হামেশাই বাড়ে।

গুণ্ডা বদমাইসের নাম শুনেই দেবযানীর মনের গুপ্ত আক্রোশ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। অমৃত কানন থেকে প্রত্যাগমনের পথে

সেদিনের ঘটনা তার মনে পড়ে। রাগে তার রক্তে যেন আগুন লাগে। অত্যুগ্র এক প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে। তার গলার স্বর কেঁপে ওঠে। পারিপার্শ্বিক ভুলে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে—কি বললে গুণ্ডা বদমাস! দেখি কোথায় তারা—বলেই বালিয়াড়ি থেকে নামবার জন্য পা বাড়ায়।

ভাগ্নীর এই আকস্মিক উত্তেজনায় মামা বিস্ময়ে বিমূঢ়। দেবযানী নামবার মুহূর্তে বসা অবস্থাতেই তিনি খপ করে তার হাত চেপে ধরে প্রশ্ন করেন—কি করছিস, কোথায় চলেছিস?

হঠাৎ হাতে টান পড়তেই দেবযানী নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মামার জিজ্ঞাসাব জবাব না দিয়ে আচম্বিতে ভূত দেখার মতো তার অভিভূত দৃষ্টি সায়াহ্নে স্বল্পালোকিত অন্ধকারে অপসৃয়মান এক কুৎসিত মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ হয়।. দেবযানীর মনে হলো লোকটা এতক্ষণ তার দিকেই চেয়েছিলো। চোখে চোখ পড়তেই দ্রুত পদে অন্তর্হিত হয়। আশ্চর্য, পিতা-মাতার কাহিনীতে সে এতক্ষণ পারিপার্শ্বিক ভুলে ডুবে ছিলো। কোনো দিকে দৃক্‌পাত করে নি। কিছুক্ষণ পূর্বে দেখা ঐ কদাকার লোকটাকে কেন জানি এক অশুভ ঘটনার বার্তাবহ বলে তার মনে শংকা জাগলো।

বিস্ময়াহত রমেশ ভাগ্নীর হাত-ধরা অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ালো, এবং দেবযানীর দৃষ্টি অনুসরণ করেও কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হলো না। ভাগ্নীকে প্রশ্ন করেন—তুই হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে কোথায় চলেছিলি এবং পরমুহূর্তে খোলা মাঠের দিকে চেয়ে কি দেখছিলি?

—ও, কিছু নয় মামা। হয়তো তোমার কথারই প্রতিধ্বনি শুনছিলাম এবং তার অশরীরী রূপ দেখছিলাম। যাক, ওকথা ছাড়ো, চলো জেটির কাছে পিঠে কোথাও গিয়ে বসি।

যানীর হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় রমেশের মনের অজানা আশংকা দূরীভূত না হয়ে বুঝি আরো ঘনীভূত হলো। তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে কিছুটা জোরের সঙ্গে বললেন—না যানী আর কোথাও বসা উচিত হবে না। দেরী হলে তোর মামী চিন্তা করে সারা হবে।

মামীর কথা বলতেই দেবযানী নরম হলো। নিম্ন কণ্ঠে বলে—তা হলে চলো মামা। কিন্তু কথা দাও আগামী রোববার তোমার অসমাপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করবে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করলে পাছে দেবযানী বেঁকে বসে এই কথা ভেবে মামা বললেন—সে তো বটেই। তবে কিনা চাকরিটা তো বজায় রাখতে হবে। ঐদিন ক্লাবে যদি কোন জরুরী কাজ পড়ে তখন কি করবো বল।

দেবযানী মামার কথার অর্থ কি ভাবে নিলো বোঝা গেলোনা। দ্বিরুক্তি না করে সে হাঁটতে থাকে।

অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। বাতাসও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। দূরে সমুদ্র-গর্জন স্পষ্টতর হয়ে ভেসে আসছে। উর্ধ্বাকাশের ক্ষণস্থায়ী পাংশু বর্ণ কৃষ্ণাভায় রূপান্তরিত হলো। আকাশ জুড়ে ছোট বড় তারা গুলি উকিঝুঁকি দিয়ে ক্রমশঃ তাদের আসর ঝাঁকিয়ে তুলছে। পশ্চিমাকাশে লাল সন্ধ্যা তারাটি সীমন্তিনীর ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করছে। নদীর বুকে ভাসমান জাহাজের বিজলী বাতিগুলির প্রতিবিম্ব নিস্তরঙ্গ জলে স্রোতের টানে দীর্ঘাকৃতি হয়ে এক মনোহর আলোর নাচন তুলেছে। দূরে চলমান নৌকাগুলোর অনুজ্জ্বল আলোর রেখা অন্ধকারে জোনাকি বলেই ভ্রম হচ্ছে।

মামা ভাগ্নী নদীর তীর ডাইনে রেখে হেঁটে চলেছে। উভয়েই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন। আশেপাশের লোক চলাচলের দিকে খেয়াল নেই। দেবযানী হঠাৎ তার ডান হাতে আকর্ষণ অনুভব করলো। চমকে উঠে চাইতেই মনে হলো একটি ছেলে পাশ কেটে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অদূরবর্তী জেটির অস্পষ্ট আলো জায়গাটার অন্ধকার যেন আরো গাঢ় করে তুলেছে। ছেলেটিকে অন্ধকারে হঠাৎ দেখলেও তার অস্পষ্ট আকৃতিও চলার ঢং গুরখার সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল আছে বলেই দেবযানীর মনে হলো। তবে কি গুরখা-ই! অবাক কাণ্ড, এখানেও এ সময়ে গুরখার আবির্ভাব! ধূম দেখলে বহ্নির উপস্থিতির মতো গুরখা তার জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনারই অগ্রদূত। এ যাবৎ সে তা কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু আচমকা তার হাত আকর্ষণ করে সে কিসের ইংগিত দিলো? কি সে বোঝাতে চাইলো? তার মনে এক অজানা অস্বস্তিকর ভাব ও অশুভ ভাবনা সঞ্চারিত হলো। দেবযানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারে আবরণ ভেদ করে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করলো। ঘটনাটা মামা লক্ষ্য করেছেন কিনা তা বোঝা গেলো না। তাঁর কোন সাড়া নেই। দেবযানী তার কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞাসা করে—তুমি যে একেবারে চুপ হয়ে গেলে। আমার ভালো লাগছে না মামা।

—কেন, তুই তো জানিস হাঁটতে হাঁটতে আমি কথা বলতে পারি না। চলতে আরম্ভ করলেই আমার বাক রুদ্ধ হয়ে যায়। চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করে। কথা বলতে অরুচি হয়। একটু পা চালিয়ে চল মা। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। তা, তোর ভালো না লাগার কি কারণ ঘটলো!

—তুমিই বলো, এরকম চুপচাপ হাঁটতে ভালো লাগে? যাকগে, আমরা যখন জেটির দিকে নদীর ধারে আর বসছি না তখন এখান দিয়ে না গিয়ে চলো না মাঠ বরাবর কোণাকুণি জেটির পেছন দিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় পৌঁছি। তাতে সময়ের সাশ্রয় হবে, কি বলো?

—নেহাৎ মন্দ বলিস নি। কিন্তু শুনেছি রাত্রি বেলা মাঠের ঐ দিকটা ভালো নয়—ছিনতাই, রাহাজানি, খুনোখুনি হামেশাই ঘটে। তবে হাঁ, অনেকটা সময় বাঁচে বটে।

দেবযানীর মন আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে—তোমার যেমন কথা। এই তো সবে সন্ধ্যা। চেয়ে দেখো কতলোক চলা ফেরা করছে! তোমার কেবল অহেতুক ভয়!

ভগ্নীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে তিনি একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মাঠের দিকে পা বাড়ালেন। কিছুটা এগোতেই জেটির মাল গুদামের বাইরের দিকে উঁচু পাঁচিল। তার ছায়া বিরাট এক কালো দৈত্যের মতো সারা জায়গাটা জুড়ে আছে! ফলে এখানের অন্ধকার আরো নিবিড় আরো ঘন।

ওখান দিয়ে চলতে গিয়ে দেবযানী সম্মুখের মাঠের দিকে চাইতেই আবছা দেখতে পায় কতগুলো লোক একসঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে যেন তাদের দিকে এগোচ্ছে। দেবযানী অবাক হলো! পর মুহূর্তে কি যে ঘটলো—শুরু হলো দারুণ মারপিট! হৈ-হল্লা, চিৎকার, গালাগালি হানা-হানি, গোঙানি ইত্যাদি মিলে এক বীভৎস ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হলো। দেবযানী ভয় পেলো। মামার হাত ধরে টান দিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—চলো মামা দৌড়ে পালাই। বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কে যেন পেছন থেকে বাম হাত ধরে টান দিয়ে তার চলা থামিয়ে দিলো। দেবযানীর সব গোলামাল হয়ে গেলো। সে এখন কি করবে? কোন দিকে যাবে, মামার কোন সাড়া শব্দ নেই। তিনি নিশ্চল নিস্তব্ধ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে [illegible] এক সাবধান বাণী কানে এলো—এক্ষুণি সরে

ঘটনার আকস্মিকতায় রমেশ স্তম্ভিত আর দেবযানী বিস্ময়ে বিমূঢ়। তবু হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষের অবচেতন মন যেভাবে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচবার তাগিদে তৎপর হয়ে ওঠে, তাদেরও তাই হলো। নেপথ্য কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই মামা আশু বিপদ বুঝতে পেরে দেবযানীকে নিয়ে ছুটলেন এবং একেবার দেয়ালের আশ্রয়ে গিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবযানীর বিস্ময়েরও অন্ত নেই। দৌড়োবার মুহূর্তে কে তাকে বাধা দিলো? তার ওপর ঐ সাবধানী কণ্ঠস্বরই বা কার? মনে হলো পূর্বে কোথাও শুনেছে। আর এই অন্ধকারে মুহূর্তের জন্য দেখা ছেলেটিই বা কে? গুরখা ভিন্ন আর কে হতে পারে! এই সব রহস্যাবৃত জিজ্ঞাসা তার মনে দারুণ তোলপাড় তুললো।

দেবযানো মামার একপাশে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারে কি ঘটছে তা দেখবাব চেষ্টা করে। নজরে এলো শুধু কতকগুলো কালো ছায়ার ছুটোছুটি, তাদের চিৎকার আর কণ্ঠ-পাকড়ি লড়ালড়ির গোঙানি। তারপর হঠাৎ দু'বার কান-ফাটা আর্ত কণ্ঠের চিৎকার। দেবযানী চমকে উঠে শক্ত করে মামার হাত চেপে ধরে। পরমূহূর্তে অশান্ত প্রান্তরের বুক চিরে তীব্র কর্কশ ক্ষণস্থায়ী শিষে চতুর্দিক প্রকম্পিত। চাবুকের মতো সে-ধ্বনি দেবযানীর কর্ণে প্রবেশ করে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। তার পর সব নিঝুম নিস্তব্ধ! এমন কি দেয়ালের ভেতরে রেল ইয়ার্ডের মালগাড়ির ঘরঘর কিংবা রেল ইঞ্জিনের হুশ্ হুশ্ ভোঁস ভোঁস শব্দ পর্যন্ত বন্ধ।

রমেশ এতক্ষণে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। কিছু দৃষ্টি গোচর না হলেও এই তমসাবৃত তেপান্তরের মাঠে যে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে সে অনুভূতিতে তার ইন্দ্রিয়গুলি বুঝি নিস্তেজ হিমশীতল হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ভূত দেখলেও বোধ হয় সে এতটা নিঃসাড় ও অসহায় বোধ করতো না। গণ্ডগোল থেমে যেতেই তিনি চাপা কণ্ঠে দেবযানীকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন—কিরে খুব ভয় পেয়েছিস তো?

—পাইনি বললে মিছে কথাই বলা হবে মামা। তবে সেটা ঠিক আমার জন্য নয়—হয়েছিলো তোমার জন্য। তুমি যে ভাবে আমাকে আগলে দাঁড়িয়েছিলে তাতে গুণ্ডাদের আক্রমণটা যদি তোমার উপর এসে পড়ে সেই ভয়েই মুষড়ে পড়েছিলাম। যাক্ এখন চলো—কি যে ঘটলো কিছুই বুঝলুম না।

অতঃপর অন্ধকারে দিক নির্ণয় করে তারা চলবার জন্য যখন পা বাড়িয়েছে সেই মুহূর্তেই এক অদেখা কণ্ঠে গুরুগম্ভীর আদেশ হলো— আপনারা জেটির ভেতর দিয়ে রেল-ইয়ার্ড পেরিয়ে যান। কথা সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই শিষ—এবার ভিন্ন রকমের। কেঁপে কেঁপে লহরে লহরে দুবার বেজেই থেমে গেলো। সব যেন এক রহস্যময় ভূতুড়ে ব্যাপার!

মামা ভাগ্নী অদেখা-কণ্ঠ-নির্ঘোষিত বাণী অনুসারী চলে বড় রাস্তায় এসে ওঠে। হেঁটে গেলে দেরী হবে ভেবে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে উঠে বসে। উভয়েই আপন আপন চিন্তায় নিমগ্ন। দেবযানীর কর্ণে এখনো অলক্ষ্যে শ্রুত সেই কণ্ঠস্বরের রেশ লেগে আছে। চেনা চেনা অথচ ঠিক স্মরণে আনতে পারছে না, তবে কি ঐ কণ্ঠস্বর তারই যে একদিন অপরিসীম যত্নে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা দারুণ রোগের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে তাকে নিরাময় করে তুলেছিলো! এ যেন পুরাণ উপাখ্যানের এক যযাতি যিনি অসাবধানতা বশতঃ কূপে নিপতিতা শুক্রাচার্য কন্যা দেবযানীকে অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। দেবযানীর সারা শরীরে বিস্ময়কর এক শিহরণ অনুভূত হয়। আশ্চর্য গুরখা যেন অনুতোষের দোসর—অদ্ভুত যোগাযোগ! কিন্তু এই মারাত্মক হামলার লক্ষ্য কি তবে সে! নিদারুণ এক অশুভ ঘৃণ্য প্রশ্ন তাকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তোলে। যুগপৎ ক্রোধ এবং ক্ষোভে সে জ্বলতে থাকে।

ঘোড়ার গাড়ি রাস্তার কাঁকরের কড়্ কড়্ ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে চলেছে। গাড়োয়ান গাড়ির গতি বাড়াবার জন্য ঘোড়াকে সপাং সপাং চাবুক মারছে। গাড়ির সুমুখ ভাগে কোচোয়ান বাক্সের দু-ধারে লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোকে মামার মুখের দিকে দেবযানী চেয়ে দেখে। সে-মুখ দুর্ভাবনার ঘন মেঘে আবৃত। পিতার মতো যিনি তাকে এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও লালন পালন করছেন তাঁর জন্য দুঃখে দেবযানীর হৃদয় বিগলিত হলো অথচ তাঁকে আপন মনের কথাও খুলে বলতে পারছে না। নিরুপায় দেবযানী মামার ভাবনা দূর করে তাঁর মনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বলে—সত্যি মামা, তোমার কথা মতো মাঠ বরাবর না গিয়ে জেটির ভেতর দিয়ে যাওয়াই উচিত ছিলো। এই গুণ্ডাদের হাঙ্গামা হুজ্জত-এর মধ্যে পড়ে গেলে কি ভীষণ অঘটন ও

কেলেঙ্কারিই না হতো, বলো। যাক, তুমি কিন্তু মামীকে এসব বিশ্রী ঘটনার কথা বলতে যেওনা, তাহলে তাঁর আর দুর্ভাবনার অন্ত থাকবে না।

মামা দেবযানীর উক্তি কি ভাবে গ্রহণ করলেন তা বোঝা গেলো না। ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর মনেও নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একি স্রেফ দু'দল গুণ্ডাষণ্ডাদের মধ্যেকার মারামারি? নাকি অন্য কিছু! কে তাদের বারংবার সাবধান করে গুণ্ডাদের মারামারি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রক্ষা করলো? এসব প্রশ্নের সমাধান তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না—জটিল এক আবর্তের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছেন। তবুও দেবযানীর কথার উত্তরে বলেন—না, এসব মারাত্মক রকমের বিশ্রী ঘটনার কথা বলে তোর মামীর ভাবনা বাড়িয়ে তোলা ঠিক নয়। কিন্তু তোকে একটা কথা না বলে পারছিনা মা,—তুই এখন বড় হয়েছিস, চলাফেরা সাবধানে করিস।

সে রাত্রির ঘটনা দেবযানীর মনে গভীর উদ্বেগ ও দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ রেখে গেলো। অমৃত কানন থেকে ফেরবার পথে যা ঘটেছিলো তার সঙ্গে এ-ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে কিনা তা বুঝতে না পারলেও এক বিষয়ে তার ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, সে অনেকেরই লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের সম্পর্কে এই উপলব্ধি তাকে খুবই আত্ম-সচেতন করে তুললো এবং অজ্ঞাতসারে তার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে লাগলো।

পরের দিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেবযানী অমৃতকাননে পৌঁছে একেবারে মহারাজের ঘরে গিয়ে হাজির। অমৃতকাননের সর্বত্রই কর্ম চাঞ্চল্যের কোন বৈলক্ষণ্য নেই কিন্তু মহারাজার ঘরে তার ব্যতিক্রম দেখা গেলো। আগের মতো অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে ঘরে ঢুকে বিস্মিত। ঘরের জিনিষপত্র অবিন্যস্ত—টেবিলের ওপর কাগজপত্র এলোমেলো, চেয়ার গুলি এদিক-ওদিক ছাড়ানো। একটা আলমারি হা-পাট খোলা, ব্যাপার কি! এই অবস্থায় তার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত কিনা সে সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় কেটে গেলো। দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করা স্থির করলো। কিন্তু সময় কাটাবে কি করে? একবার ইচ্ছা হলো বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করে। পরক্ষণেই ঘরটাকে গুছিয়ে রাখবার ইচ্ছা জাগলো। ইতস্ততঃ

ছড়ানো চেয়ারগুলো ঠিকভাবে রেখে, খোলা আলমারিটা বন্ধ করে টেবিল গোছাবার জন্য হাত বাড়ায়। প্রথমেই তার দৃষ্টি টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় রাখা স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র "শঙ্খ নাদ"-এর একটা শিরোনামার উপব তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়—সোনাখালির মাঠে জোড়া খুন। এক নিশ্বাসে সবটা পড়ে দেবযানী ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। একজন নামকরা গুণ্ডার লাশ পাওয়া গেছে, আর একজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত বলে ঘোষণা কবা হয়েছে। মাঠেব মধ্যে ইতস্ততঃ রক্ত চিহ্ন দেখে অনুমিত হয় যে মারামাবিব সময় অনেকে দারুণভাবে জখম হয়েছে। পুলিশ জোর অনুসন্ধান শুরু কবেছে। এই বীভৎস ঘটনাব ওপর আলোক-পাত-এব জন্য জেলা-শাসকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

দেবযানীর মন সংশয়ে প্রপীড়িত হতে থাকে—ঘটনাটা কি স্রেফ গুণ্ডাদের পরস্পরের মধ্যে মারামারি! তাহলে ঐ কুৎসিৎ মুখটা কার যাকে সে তখন সন্ধ্যার আলো আঁধাবে হঠাৎ দেখেছিলো? আর সেই বা কে যে তাদের মাঠের মধ্যে ঐ সাবধান বাণী উচ্চারণ করলো এবং দৌড়ে পালাতে যাবার মুখে বাধা দিলো! এই সব নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা এক সঙ্গে মনের মধ্যে এসে তাকে উতলা কবে। অবসন্নের মতো দেবযানী একটা চেয়ারে বসে পড়লো। কতক্ষণ সে এভাবে বসেছিলো খেয়াল নেই। হঠাৎ পায়ের শব্দে পেছন ফিরে দেখলো মহারাজ। দেবযানী ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো।

মহারাজ সহাস্যে তার স্বভাব সুলভ উচ্চ উদার কণ্ঠে বললেন—দিদি যে, বসো বসো, কখন এলে, সব কুশল তো?

মনের অস্থিব ভাব চেপে উত্তর দিতে গিয়ে দেবযানীর দৃষ্টি অকস্মাৎ মহারাজ-এব অনুসরণকারীর ওপব নিবদ্ধ হতেই তার কণ্ঠে আর কথা সরলো না। যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গের তীব্র স্পর্শে তার শরীব অবশ হয়ে গেলো। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

মহারাজ-এর সমভিব্যাহারী অনুতোষও দেবযানীকে দেখে কম অবাক হয় নাই। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত—পরক্ষণেই মনের চাঞ্চল্য কাটিয়ে অনুতোষ স্বাভাবিক কণ্ঠে দেবযানীর কুশল জিজ্ঞাসা করে।

অনুতোষের কুশল-প্রশ্নোত্তর দেবযানী অতিকষ্টে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখেই দেয়। কিন্তু তার সঙ্গে পুনঃ চোখোচোখি হতেই দেবযানী মুখ মণ্ডল অনুরাগে আরক্ত হয়ে ওঠে। চক্ষু লজ্জা-ভারে অবনত হয়।

পরক্ষণেই আবার চুম্বকের আকর্ষণের মতো দেবযানীর দৃষ্টি অনুতোষের দিকে ধাবিত হয়ে তাকেও বুঝি আনমনা করে।

দীর্ঘ অদর্শনের পর এই দুই যুবক যুবতীর ভাবোদ্বেল দুর্বল মুহূর্তে যে নাটক অভিনীত হলো তা মহারাজের দৃষ্টি পথে পড়েছিলো কিনা তাঁর হাবভাবে তা বোঝা গেলো না! মহারাজ চেয়ারে বসেই বলেন—তোমার খবর বলো দিদি।

আপন অন্তরের আবেগ উত্তেজনার অভিব্যক্তি যাতে মহারাজার চোখে ধরা না পড়ে দেবযানী সর্বক্ষণ সে বিষয়ে সচেতন। সুতরাং হাবভাব কথাবার্তায় যতদূর সম্ভব স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে জবাব দেয়—খবর বলবো বলেই তো অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছি।

—উত্তম কথা, চলো আমরা না হয় বাইরে গিয়ে কোথাও বসি। কি কারণে মহারাজ একথা বললেন তা অনুমান করা গেলো না। বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠে পড়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। দেবযানীকে কিছু বলবার অবকাশ মাত্র দিলেন না! চলতে চলতে মহারাজ অনুতোষকে সম্বোধন করে বললেন হাতের কাজ শেষ করে নাইট ডিউটির চার্টটা তৈরি করে ফেলো আর ওরা এলে পর যথাযথ নির্দেশ দিও।

অনন্যোপায় দেবযানী একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই বুঝি মহারাজের অনুগমন করে। যেতে যেতে দেবযানী অপলক দৃষ্টিতে অনুতোষকে আর একবার চেয়ে দেখলো, তার সে দৃষ্টিতে বুঝি যাদু ছিলো। না হলে অনুতোষই বা কেন তার চোখে আটকা পড়ে নিষ্ক্রান্ত দেবযানীর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকবে! দৃষ্টির অন্তরাল হবার পূর্ব মুহূর্তে উভয়ের বক্ষ বিদীর্ণ তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বুঝি বা মদনের পঞ্চশরের মতো পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলো এবং তাদের প্রতি অঙ্গে দহন-জ্বালার স্পর্শ রেখে গেলো।

মহারাজ দেবযানীকে নিয়ে উদ্যানের এক নিভৃত কোণে গিয়ে বসেন। চতুর্দিকের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন নিরালা —নিবিড় ছায়াঘন মনোরম। অন্য দিনের তুলনায় মহারাজকে গম্ভীর দেখালেও তার আননে চিন্তার ক্ষীণ রেখা কিম্বা বিষণ্নতার আভাস মাত্র নেই। প্রসন্ন কণ্ঠে সহজ সরল প্রশ্ন করলেন—মামা মামীর অনুমতি পেয়েছো তো দিদি?

বিগত রজনীর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা এক নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মতো অনুক্ষণ

অনুসরণ করে দেবযানীকে যেরূপ প্রপীড়িত উৎকণ্ঠিত অবসাদগ্রস্ত করছে কিছুক্ষণ পূর্বে অনুতোষের আকস্মিক সাক্ষাৎলাভেও সে তদরূপ উত্তেজিত ও মোহগ্রস্ত। উভয়েই তার স্নায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। নিঃশব্দ ভারাক্রান্ত মনে সে যন্ত্রচালিতের মতোই এতক্ষণ মহারাজ-এর অনুসরণ করছিলো। সুতরাং তাঁর আকস্মিক প্রশ্নে দেবযানী বাস্তবে ফিরে এলো। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে—হাঁ, এবার দয়া করে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিন যাতে আপনাদের আখড়ায় প্রবেশ লাভ করতে পারি।

—উত্তম কথা দিদি। সুদেষ্ণা দেবী টুরে বেরিয়েছেন। তিনি ফিরে এলেই একটা কিছু ব্যবস্থা হবে—তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। কথা সাঙ্গ হতেই মহারাজ উঠে পড়ে কুটিরের দিকে অগ্রসর হন। দেবযানী তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে বলে—আবার কখন আসবো মহারাজ ?

—যেমন আসছো তেমনিই আসবে। অবশ্য না এলেও ক্ষতি নেই। সময় মতো খবর অবশ্যই পাবে। কথা শেষে মহারাজ অকস্মাৎ তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দেবযানীর নাগালের বাইরে চলে যান।

দেবযানী মহারাজ-এর ত্বরিৎ গতি লক্ষ্য করে থ' হয়ে যায়। আর কিছু বলবার অবকাশ পায় না। ক্ষুণ্ণ-মনে সে পেছন ফিরে চলতে থাকে। মহারাজের আপিস ঘরের সম্মুখস্থ পথ অতিক্রম কালে দেবযানীর হাঁটার গতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এক সম্মোহিনী শক্তি যেন তার পদদ্বয় চেপে ধরে মন্ত্র মুগ্ধের মতো ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে টেনে নিচ্ছে। কিন্তু কুটিরে অভ্যন্তরস্থ কথাবার্তা কানে যেতে বোধ হয় তার হুঁশ ফিরে আসে। দ্রুত পদে উদ্যান থেকে বেরিয়ে গৃহের পথ ধরে।

মোহগ্রস্তের মতোই দেবযানী পথ বেয়ে চলেছে। বহুদিন পরে প্রিয় সন্দর্শন তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। তার অন্তরের অন্তঃপুরে নানা নব নব সুরের গুঞ্জরণ আকাশে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে। অনুরাগ-রঞ্জিত তার নয়নের অঞ্জন ধরিত্রীকে বুঝি নতুন রাগে রাঙিয়ে তুলেছে। যে পথ দিয়ে সে যাতায়াত করছে সে-পথ যেন আজ এক ভিন্ন রূপ নিয়ে তার সম্মুখে উদ্ভাসিত। আসন্ন সন্ধ্যায় রাস্তার উভয় পার্শ্বের ঝোপেঝাড়ে নাম না-জানা নানা ফুল সব মিষ্টি মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে রাতের আসর মাতিয়ে তুলবার মহড়া দিচ্ছে। অদূরে টিলার উপর নিদাঘ-সূর্যের শেষ

শান্ত রশ্মি মৃদুমন্দ বাতাসে নবোদগম বৃক্ষপত্র ছুঁয়ে হাসির লহর তুলে বুঝি সোনা হয়ে গলে পড়ছে। সন্ধ্যাকাশে কুলায় প্রত্যাগমনরত পাখীরা সব আসঙ্গ লিপ্সায় বিচিত্র কলরবে পরস্পরকে ডাকাডাকি করে অস্থির আগ্রহে ছুটে চলেছে।

খুশীভরা মনে চঞ্চল গতি আর লঘুপায়ে হেঁটে দেবযানী যখন বাড়ী পৌঁছলো চতুর্দিকের গাছপালা বিলম্বিত দীর্ঘ ছায়া মেলে ক্ষুদ্র অঙ্গনের দিনের আলোর শেষ আভাটুকু মুছে দিয়েছে। সদর দরজা খোলাই ছিলো ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে পেছন ফিরতেই দেবযানী দেখে মামী দাওয়ার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সম্মুখ পানে তাকিয়ে আছেন। দেবযানী বিস্মিত! কাছে এসে মামীর মুখের দিকে চেয়ে তার বিস্ময় ভয়ে রূপান্তরিত। মনের হালকা খুশীর ভাব উবে যায়। উঠোনের ম্লান আলোকে দেবযানী স্পষ্ট দেখতে পায় মামী নিষ্পলক উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর সে-দৃষ্টি চিন্তা-ভাবনা-ভয়-লেশহীন—একেবারে ফাঁকা নিষ্প্রাণ নির্জীব। মনে হলো বজ্রপাতে আহতের মতোই তাঁর কাঠামোটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে, ছোঁয়া মাত্র পড়ে যাবে! দেবযানীর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হলো। পাছে কোনো অঘটন ঘটে এই ভয়ে নিজেকে সামলে নিলো। হাতের বইগুলো মেঝেতে রেখে বাঁ হাতে মামীকে বেষ্টন করে অন্য হাতে তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে—মা, মা, বলে ডাকতে থাকে।

—মা ডাক শুনেই উর্মিলা নড়ে উঠে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বলে—দাঁড়া যাচ্ছি।

দেবযানী আরো ভয় পেলো। উর্মিলাকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে—মা, মা ডাকতে ডাকতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

দেবযানীর ডাকাডাকি কান্নাকাটি শুনে বুঝি উর্মিলার সম্বিত ফিরে আসে।—যানী এলি, বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। উর্মিলার রুদ্ধ তপ্ত অশ্রু দু'নয়ন বেয়ে দেবযানীর মাথায় আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়ে।

—হাঁ মা, এই তো আমি, বলে আঁচল দিয়ে উর্মিলার চোখের জল মুছিয়ে জিজ্ঞাসা করে—তোমার কি হয়েছে বলো তো মা? তুমি আজকাল বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছো। এতো ভয় পাইয়ে দিচ্ছো যে বলবার নয়। সারাক্ষণ এত কি ভাবো? শরীর তোমার দিন দিনই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আর এতো খাটাখাটি করলে কারো শরীর থাকে! মানুষ তো দূরের কথা পাথর শুদ্ধ ক্ষয়ে যায়! চলো, শোবে চলো। বিছানা থেকে উঠছে কি আজ আমি অনথ করবো। দেবযানী একরকম জোর করেই উর্মিলাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

উর্মিলা ক্ষীণ কণ্ঠে হেসে বলে—কি যে ছেলে মানুষি করছিস? এই ভর সন্ধ্যে-বেলা শুয়ে থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে না! ছাড়, আমি উঠে বসি।

—বেশ বসো, কিন্তু কোন কাজে হাত দিতে পারবে না। এমন কি এখানের কুটো ওখানে সরাতে পারবে না। চুপটি করে বসে থাকবে। আমি যাচ্ছি।

—একটা কথা শোন যানী।

—না এখন আর কোন কথা নয়। সন্ধ্যে উৎরে যাচ্ছে। কাজ কর্ম সেরে তোমার কাছে এসে বসবো'খন—তখন বলো।

—না যানী, এখানে, এসময়ে এভাবে আমি বসে থাকতে পারবো না।

—বেশ, এখানে ভালো না লাগে তো দাওয়ায় গিয়ে বোসো—আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি।

—তবে তাই কর।

বারান্দায় মামীকে বসিয়ে বইগুলি তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে সুদেব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। টেবিলে বই রেখে কৌতুহল বশত মুখ বাড়িয়ে বইখানার দিকে তাকিয়ে নামটা পড়ে দেবযানী অবাক—'অগ্নিবীণা'! এই বই তো সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ! ও পেলো কোথায়? মনের মধ্যে সন্দেহের অশুভ কালো ছায়া নেমে এলো। কিছু বলতে গিয়ে কি ভেবে যেন দেবযানী থেমে গেলো।

দিদির উপস্থিতি টের পেয়ে সুদেব বইখানা একটা খাতার আড়ালে রেখে বলে—তোমাকে যে কতো কথা বলবার আছে দিদি—তাই তো ক্লাব থেকে সকাল সকাল চলে এলাম।

—বেশ তো বোলো, কিন্তু এখন তো ভাই আমার অবসর নেই। ভালো কথা মায়ের শরীরটা যে খারাপ তুমি দেখোনি? আমি যে এতক্ষণ কান্নাকাটি করলাম তুমি শোনো নি?

—সে কি! কান্নাকাটি! কৈ, আমি তো কিছু শুনিনি। স্কুল

থেকে এসে পরে মা খাবার দিলেন—আমি খেয়ে চলে এলাম। আমাকে তো মা কিছু বলেন নি।

—হুঁ, দেবযানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাইয়ের কাছে সরে গিয়ে বললে—কাজকর্ম সেরে রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে তোমার গল্প শুনবো'খন!

সুদেব হতাশ হলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে,—গল্প! তুমি বলছ কি! এ গল্প নয় দিদি—একেবারে নির্ভেজাল জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা! যেমনি অসম সাহসিক তেমনি বিস্ময়কর এক অভিযান—একেবারে যেন রবীন-হুডের কাহিনী! কথা শেষ করে সুদেব বই খুলে মন সংযোগ করে।

সুদেবের কথা শুনে দেবযানী থ' হয়ে গেলো—কি জবাব দেবে ভেবে পেলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ছেড়ে যেতে যেতে কিছুটা আদেশের সুরে বললে—মা বারান্দায় একা বসে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে একটু বোসো।

দেবযানী সন্ধ্যাকালীন ঘরকন্নার কাজ সেরে তুলসীমঞ্চে দীপ জ্বালিয়ে ধুনো দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে যখন রান্না ঘরে ঢুকলো সন্ধ্যা তখন উতরে গেছে। ছোট্ট অন্ধকার উঠোনটুকুতে জোনাকির আলোর নৃত্য ও ঝিঁঝিপোকার ঐকতান শুরু হয়েছে। কাজ করতে করতে দেবযানী একবার পেছন ফিরতেই দেখে মামী দুয়ারের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার খুবই রাগ হলো, কিন্তু কেরোসিন কুপির ধোঁয়াটে আলোতে মামীর মুখখানা যেন একান্ত করুণ অসহায় দেখালো। উদ্যত ক্রোধ সহানুভূতিতে গলে গেলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—তুমি আবার এখানে এলে কেন বলো তো মা? বারান্দায় কি একটু চুপ করে বসে থাকতে পারলে না? উনোনের আঁচে তেল কালির মধ্যে না এলেই কি নয়?

—না বলে দিলে তুই রাঁধবি কি?

—কেন, আমি কি রান্নাবান্না করিনি, না, করতে জানি না? আমাকে কিছু বলতে হবে না। দোহাই তোমার, তুমি বারান্দায় গিয়ে বসো, না হয় ঘরে গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকো। কাজ সেরে আমি তোমার কাছে আসছি।

—ওখানে বড্ড গুমোট। এখানটায় খোলা মেলা ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে।

—বেশ, আমি মোড়া নিয়ে আসছি। ওখানে বাইরে বসবে, ভেতরে তেলকালির মধ্যে নয়। দেবযানী দৌড়ে একটা মোড়া নিয়ে এসে উর্মিলাকে বসিয়ে দেয়। তারপর কাজ করতে করতে দেবযানী যেন আপন মনে বলতে থাকে—ডাক্তার না দেখালেই নয়। আজই মামাকে ডাক্তারের কথা বলতে হবে। দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে।

উর্মিলা সখেদে হেসে বলে—আমাকে ডাক্তার দেখাবি? বেশ দেখাস। তবে শরীরে কোন ব্যাধি খুঁজে পাবেনা। যতো ব্যাধি বাসা বেঁধেছে মনে—তা সারাবার ঔষধ একমাত্র তোর আর সুদেবের হাতে।

দেবযানী অবাক হয়ে বলে—সে কি?

—হাঁ, সে তোরা বুঝবি না, মা। মা না-হলে সন্তানের জ্বালা বোঝে না।

—তবুও বলো না শুনি—যদি শোধরাতে পারি।

—বলবার আবার কি আছে? উর্মিলার স্বরে চাপা উত্তেজনা।—তুই কি জানিস না, না, বুঝতে পারছিস না? দিন দিন তোরা আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিস! সুদেব যেমন উচ্ছৃঙ্খল গোঁয়ার হয়ে উঠছে তুইও তেমনি অবাধ্য একরোখা হয়ে উঠছিস। তোর মামার খবর তুই নাকি চাকরি করবি। অথচ এ বিষয়ে তোকে সেদিন কত করে বুঝিয়েছি—আমার অনিচ্ছা তোকে জানিয়েছি। তাছাড়া আজ ক্লাবে যাবার কালে তোর মামা যে আর এক সাংঘাতিক খবর দিলে তা শোনা অবধি আমার বুক কাঁপছে।

—কি বললে? মামা বলেছেন—কি বলেছেন? দেবযানী উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

—সহরে গুণ্ডা বদমাশের উপদ্রব ভীষণ বেড়েছে। খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে গতরাত্রে দু'-দুটো গুণ্ডা খুন হয়েছে। তোকে রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করতে এবং সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে বলে গেছে। একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে উর্মিলা হাঁপিয়ে পড়ে চক্ষু বুজে।

দেবযানী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বুঝলো মামা আসল ঘটনা কিছু প্রকাশ করেন নি। মুখে বলে—ওমা, এই কথা! তা আমার সঙ্গে এ ঘটনার কি সম্পর্ক? সহরে এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটে। এ আবার নতুন কি! বলো, সত্যি কিনা? কণ্ঠে তার উর্মিলাকে প্রবোধ দেবার সুর। তা বলে, এসবের ভয়ে কি লোকজন রাস্তায় চলাফেরা ছেড়ে দেবে,

নাকি কাজ কারবার বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে? তবে হাঁ, চাকরির ব্যাপারে আমি তোমার অনুমতি চেয়েছি। কিন্তু তা করবো কিনা ঠিক কি? চাকরি করব বললেই তো তা জোটে না। কারণ তার সঙ্গে পছন্দ অপছন্দ, বেতন ভাতা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জড়িত। এবিষয়ে তুমি মনে অনর্থক অভিযোগ পুষছো এবং বাজে ভাবনা চিন্তায় শরীর খামকা নষ্ট করছো। তবে হাঁ, আজ হোক, কাল হোক চাকরি আমাকে করতেই হবে ' ঘরে বসে তোমাদেব দুঃখ দুর্দশা দেখতে পারবো না, তা তোমাকে বলে দি'চ্ছি। চলো, আমার হয়ে গেছে।

উর্মিলা দেবযানীর কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে উঠে চলে যায়। দেবযানী বুঝলো তাব কথা মামীর মনঃপুত হয়নি। তাই অভিমানে আহত দুঃখ-বেদনা-ভারাক্রান্ত মনে তিনি নীরবে প্রস্থান কবলেন।

সে-বাত্রে কর্ম অন্তে দেবযানী নিভৃতে দাওয়ায় বসে মামীর মনো বেদনা অনুভব ও অনুধাবনের চেষ্টা করে। তাঁর মনোকষ্ট দূর করতে হলে তাকে আখড়ায় ভর্তি এবং চাকবিব চেষ্টা থেকে বিরত হতে হবে। ফলে তাব আশা আকাজ্ক্ষা সব কিছু নিষ্ফল হবে এবং জীবনটা বিফলে যাবে! অধিকন্তু সে মামার উপর বোঝা হয়ে থাকবে। এই অবস্থায় সব দিক বজায় রাখতে হলে মামীকে বুঝিয়ে পড়িয়ে তাঁব মনের দুঃখ লাঘব করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পন্থা তো সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সুদেব, তাব সম্পর্কে মামীর অভিযোগ নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। অবাধ্যতার জন্য ভাইকে শাসনের কথা মনে পড়লো। তারপর থেকে সুদেব সম্পর্কে আবো সাবধান ও সজাগ হওয়া তার উচিত ছিলো। মামীর অভিযোগের পর এখন সে ভাইকে নিয়ে কি করবে? ব্যাপারটা যেমনি জটিল তেমনি উদ্বেগপূর্ণ!

এইসব দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে দেবযানী ঘরে এলো। ক্লান্তিতে শরীর একেবারে অবসন্ন। চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো। আড়চোখে দেখলো সুদেব পড়ছে। সেও একখানা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলো। বৃথা, কিছুতেই মনোনিবেশ কবতে পারছে না। কেবল আলস্য জনিত হাই উঠছে। দূর ছাই, বলে বই বন্ধ করে দেবযানী বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। সুদেব অধৈর্য হয়ে বোধ হয় এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিলো। দিদি শুয়ে পড়ার পর সেও বাতিটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ

করে থাকার পরও যখন দিদির কোন সাড়া পেলো না তখন সে অধৈর্য হয়ে—দিদি দিদি—বলে ডাকতে থাকে।

—কি, বলে দেবযানী পাশ ফিরে।

—তুমি তো আচ্ছা! তখন বললে, শুয়ে শুয়ে ঘটনাটা শুনবে, অথচ শুয়ে পড়ে একেবারে চুপ হয়ে গেছো। একবারটি ডাকলে না পর্যন্ত—কি, ঘুমোলে নাকি?

—বেশ এখন বল, শুনি।

ক্লাবে শোনা যে খবর এতক্ষণ ধরে দিদিকে বলতে না পেরে সুদেবের ভেতরে দারুণ উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিলো তা দিদির অনুমতির সঙ্গে সঙ্গে লাভা স্রোতের মতো নির্গলিত হয়ে তাকে ভাসিয়ে নিলো।

দেবযানী বিস্ময়ে বিমূঢ়, উদ্বেগে উদ্বেল এবং উৎকণ্ঠায় আর্ত। সুদেব-কথিত সামাচার থেকে অনুপ্রাস বাদ দিলেও আনুপূর্বিক ঘটনা প্রবাহ যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি অদ্ভুত ও জটিল! বিগত রাত্রিব মারামারিতে শহরের তুই কুখ্যাত গুণ্ডা নিহত এবং ক্লাবের কয়েকজন সদস্য আহত। তাদের মধ্যে তু'জনের আঘাত গুরুতর। তাদের হাসপাতালে না পাঠিয়ে গোপনে চিকিৎসা চলছে। সকলেই পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ গুণ্ডাদের আড্ডায় হানা দিয়ে কয়েকজন জখমী গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরো কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেছে!

সব চাইতে উদ্বেগ জনক খবর হলো যে এই গুণ্ডা নিধন যজ্ঞে অনুতোষই একজন বড় হোতা। তারই মারণ অস্ত্রে এক বড় গুণ্ডার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্লাবের অন্য এক সদস্যের লোহার রড-এব আঘাতে গুণ্ডাটার উদ্যত ছোরা লক্ষ্যচ্যুত না হলে উহা হয়তো আমূল অনুতোষকেই বিদ্ধ করতো! উঃ, কি সাংঘাতিক! দেবযানী আর ভাবতে পারছে না। আতঙ্কে তার চক্ষু মুদে এলো। তার চেতনা যেন বিলুপ্ত হলো। সে নিঃসাড়ে পড়ে রইলো।

এক নাগারে কাহিনী শেষ করে সুদেব দম নেবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও যখন দিদির কোন সাড়া পেলে না তখন দিদি দিদি বলে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে। তবুও দিদির কোন উত্তর নেই—সুদেব অবাক-ই হয়। দিদির তুষ্ণীম্ভাব-এর কোন ব্যাখ্যাই সে করতে পারলো না। তার ধারণা ছিলো এতবড় একটা ভয়ংকর ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে

দিদি কত ভাবেই না তাকে জেরা করবে। আর সে বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়ে দিদিকে তাক লাগিয়ে দেবে। হায়, সে সব কিছুই হলো না। সুদেব নিরাশ হলো। মনের খেদে নিজের অজ্ঞাতেই সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

নিঝুম নিস্তব্ধ পৃথিবী যেন সুষুপ্তি জড়ানো। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। এমন কি নিশাচর পাখীরাও বুঝি নিশ্চুপ তন্দ্রাচ্ছন্ন। দেবযানীর চোখেই কেবল ঘুম নেই। অনেক চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না। নানা ভয় ভাবনা আর চিন্তায় তার হৃদয় অস্থির ও উদ্বেল। তবে কি সে-ই গুণ্ডাদের হামলার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো। এই চিন্তাই তাকে সব চাইতে অধিক পীড়া দিলো। অমৃতকাননের যাতায়াতের পথে যে কদর্য ঘৃণার্হ ঘটনার সূত্রপাত তার কি এখানেই পরিসমাপ্তি! না, তার জের আরো চলবে! আশ্চর্য, গুণ্ডারা কি তবে সেই থেকেই তাকে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে নিয়ত অনুসরণ করে চলেছিলো! কি ভয়ংকর ব্যাপার! না হলে অনুতোষই বা নিজের জীবন এভাবে বিপন্ন করবে কেন? তার এই বীরত্বপূর্ণ অভিযান কি কেবল এক অসহায় বিপদগ্রস্তাকে রক্ষা করা, নাকি তার নিদারুণ প্রতিশোধ স্পৃহার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! কিসের প্রতিশোধ—তার অপমান ও নির্যাতনের! নাকি এর ভেতর আরো কিছু আছে যার থেকে এতবড় দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো! এই মারণ-যজ্ঞে অনুতোষের মুখ্য ভূমিকা দেবযানীকে ছেলেদের মহাভারতে যাজ্ঞসেনীর উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দেয়—এ যেন হুবহু দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে দুঃশাসনের বক্ষ-চিরে বৃকোদরের রক্তপান ও দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন! দেবযানীর বিষাদঘন অন্তরে ক্ষণেকের জন্য রোমাঞ্চের শিহরণ জাগে, উত্তেজনায় সে উঠে বসে। ঘরের মৃদু নরম আলোতে পাশের শয্যায় নিদ্রিত সুদেবের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিছানা ছেড়ে দেবযানী উঠে পড়ে। টেবিলের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে ভাইয়ের শিয়রে গিয়ে বসে। অবিন্যস্ত চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে গভীর নিদ্রামগ্ন কচি মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। তার প্রাণ-প্রতিম ছোট ভাই—নিষ্পাপ শ্বেতশুভ্র মুখে কালিমার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ও এতসব খবর জানলো কি করে? সেও কি তবে বিপ্লবীদের অনুমোদিত কোন ক্লাবের সভ্য হয়েছে। তা না হলে [illegible]

খবর বিশদ ভাবে ওর পক্ষে জানা কি করে সম্ভব? প্রথম যেদিন তাকে শাসন করতে গিয়েছিলো তখন যা ঘটেছে এবং তারপর থেকে যে সন্দেহ ও আশংকা দেবযানীর মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে তা আজ বদ্ধমূল হলো। সুদেব সম্পর্কে মামীর অভিযোগের উৎপত্তির কারণও হয়তো তাই। এখন উপায়! কি ভাবে ওকে ঐ আগুনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়! কি ভাবে ওকে আগলে রাখা যায়? সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মামা মামীর গোচরে আনলে তাঁরা ভেবে ভেবে সারা হবেন। দেবযানী আর ভাবতে পারে না। গভীর উদ্বেগে ছটফট করতে থাকে। বিছানা ছেড়ে ঘরময় পাইচারি শুরু করে। মনের জ্বালা তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মাথা ও কান গরম হয়ে ওঠে। পায়ের দিকের খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শীতল হাত বুলিয়ে তার সারা শরীর জুড়িয়ে দেয়।

দেবযানীর বিক্ষিপ্ত চিন্তাক্লিষ্ট বেদনা প্রপীড়িত মনে অনুতোষের মূর্তি ভেসে উঠে। এত বড় ঘটনা ও এতদিন অদর্শনের পর অমৃত কাননে তার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ মুহূর্তে অনুতোষের হাবভাব আচার আচরণে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়নি! আশ্চর্য, নাকি তার দৃষ্টি বিভ্রম! তার অপরিণত মনের চোখে তা ধরা পড়েনি! অনুতোষের প্রশান্ত মুখচ্ছবির অন্তরালে তার অন্তরের অস্থিরতা, আবেগ উচ্ছ্বাস হয় তো অচঞ্চল বারিধির বুকে প্রবল কলকল্লোলের মতো লুক্কায়িত! দেবযানী আর ঘরে থাকতে পারে না। ঘরের গুমোট ভাব তাকে যেন চতুর্দিক থেকে চেপে ধরেছে—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সন্তর্পণে দরজা খুলে সে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। কৃষ্ণপক্ষের রজনীর ঘোর তমিস্রা ভেদ করে কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়। অদূরে গাছপালার আশেপাশের অন্ধকার যেন আরো ঘন আরো নিবিড়। তারি ফাঁকে ফাঁকে ঊর্ধ্বাকাশে লক্ষ কোটি তারার আলোর ঝিকিমিকি। দেবযানীর মনে হলো যুগ যুগ ধরে তারই মতো কত শত সহস্র নরনারীর বেদনা-বিধুর হৃদয়-মথিত বিগলিত অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে আকাশের গায়ে জমে জমে বুঝি তারা হয়ে ফুটে আছে। তারাই যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হৃদয়ের গুরুভার প্রপীড়িত দেবযানীর চক্ষু ফেটে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। অনেকক্ষণ সে এভাবে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। তারপর স্বীয় ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সে ঘরে ফিরে

বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। মনের অস্থির অশান্ত ভাব অনেক প্রশমিত। অন্তরের অন্তস্তল থেকে এক গম্ভীর আশ্বাসবাণী শ্রুত হয়—ঘুম এসে স্নেহময় জননীর মতো তাকে কোলে তুলে নেয়।

৪

দিদির আনুকুল্যে ইতিমধ্যে দেবযানী আখড়ায় ভর্তি হয়েছে। সেখানে এখন সে নিয়মিত যাতায়াত এবং শরীর চর্চা ইত্যাদি করে। তা ছাড়া জীবনবীমা কাজে হাতে খড়ি দিতে তাকে নিয়ে দিদি কয়েক জায়গায় ঘুরেওছেন। কিন্তু এবার না বলে কয়ে হুম্ করে বেরিয়ে পড়াটা তার নিকটে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছে। এযাত্রায় জীবনবীমা কার্য ভিন্ন অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য যে আছে তা দিদির কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

রাতের আহার শেষে দেবযানী ডাকবাঙলোয় নিজের কামরায় এসে শোবার তোড়জোড় করছে এমনি সময়ে হঠাৎ একটা ভারী জিনিস পতনের শব্দে সে চমকে ওঠে। শব্দটা কোথায় হলো এবং এত নিকটেই বা কেন মনে হলো? রাত্রি এখন কত, দিদি কি এখনো জেগে আছেন? এইসব নানা প্রশ্ন তার মনে জাগে। পরমুহূর্তেই তার বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো যখন দরজা খোলার শব্দ তার কানে এলো। সে আর শুয়ে থাকতে পারলো না। উঠে বসলো। ইচ্ছা হলো দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কোথায় কি ঘটলো একবার দেখে আসে। কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলাবোধ এবং অহেতুক কৌতূহল সম্পর্কে দিদির হুঁশিয়ারি তাকে নিবৃত্ত করলো।

উদ্বিগ্ন অশান্ত চিত্তে একান্ত অসহায়ের মতো দেবযানী বিছানায় গা এলিয়ে দেয় এবং জোর করে চক্ষু বুজে পড়ে থাকে। অতীত স্মৃতি, বর্তমান পরিস্থিতি আর ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা সব যেন তার বিনিদ্র নিমীলিত নয়নের সম্মুখে একত্রে অতিকায় কতগুলি পোকার মত জট পাকিয়ে কিলবিল করছে।

অতিশয় চিন্তা-জনিত মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত। বিছানায় শুয়ে যখন কিছুতেই ঘুম আসছে না, কেবল ছটফট এবং এপাশ ওপাশ

করছে তখন দেবযানী জানালার ধারে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াতে মনস্থ করে। বাইরের শীতল হাওয়ার স্পর্শে যদি মাথাটা ঠাণ্ডা হয়। বিছানা ছেড়ে উঠবার মুহূর্তে খট করে একটা শব্দ কানে আসে। মনে হলো কেউ যেন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। বিস্রস্ত পরিধেয় সংযত করে দেবযানী শক্ত হয়ে বিছানা থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মশারি ভেতর দিয়েই খাটের চারিধার দেখে—কিছুই নজরে পড়ে না। মাথার এবং পায়ের দিকে জানালা খোলা। তবে কি সে ঘরের দরজা বন্ধ করেনি? নাকি বাথরুমের দরজা খোলা ছিলো—কিছুই সে স্মরণে আনতে পারছে না।

ঘাবড়ে গেলেও দেবযানী মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে অবস্থার মোকাবেলা করতে কৃতসংকল্প। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে একটা বিশ্রী পরিবেশ সৃষ্টি করতে তার মন সায় দিলো না। ঘরের কোনে টিপয়ের ওপরে বাতির ক্ষীণ রশ্মি ঘরের ভেতরে যেন স্বচ্ছ কুয়াশার কুহেলিকা ছড়িয়ে রেখেছে—কিছুই স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর নয়। বাতিটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘরটা একবার ভালো করে দেখবার জন্য সে উঠে বসে। সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শ্বাপদের মতো কেউ যেন শিয়রের দিক থেকে এগোচ্ছে। এবার আর অনুমান নয়—সুস্পষ্ট পদধ্বনি! আখড়ায় শেখা যুযুৎসু প্যাঁচ ও ছোড়ার আঘাতে শত্রুকে ঘায়েল করা কৌশলটা মনে মনে ভেঁজে নিয়ে ত্বরিৎ গতিতে উঁবু হয়ে—অধুনা তার নিত্যসাথী—বালিশের নিচে রক্ষিত খাপসুদ্ধ ছোরার বাঁটে হাত দেয়। মূর্তিটা ক্রমেই তার বিছানার দিকে আসছে। যে ক্রুদ্ধ আক্রোশ ও বিদ্বেষ দেবযানী এতদিন যাবৎ গুণ্ডা বদমাশদের বিরুদ্ধে মনে মনে পোষণ করে আসছে আজ তার শোধবোধ-এর মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। উত্তেজনায় শরীর ঘেমে উঠেছে। হাত কাঁপছে। আর মাত্র অল্প দূরত্বের ব্যবধান। কিন্তু একি, মূর্তিটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কেন? পরক্ষণেই ঘুরে ভিন্ন দিকে হাঁটতে হাঁটতে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেলো। দেবযানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ঘরময় খুঁজলো কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলে না। আচম্বিতে ভোজবাজীর মতো লোকটা আবার তার দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হলো। অবাক হয়ে দেবযানী দেখে এবারে তার গতি ঘরের কোণের বাতিটার দিকে। ঐ দিকটা আলোর নিষ্প্রভ দ্যুতিতে কিছুটা উজ্জল। মূর্তিটা বাতি আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

প্রমাদ গণলো। তবে কি সে বাতিটা নিবিয়ে ঘরের ক্ষীণ

আলোটার মাঝে মাঝে তার রদ মতলব হাসিল করবার আগে আছে। না, আর খানিকা ভুল প্রতিপন্ন করে পর মুহূর্তে আভিজাত্য বিকল শিকার হলে উঠে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি সবসময় জড়িয়ে পড়ে। এ আলোতে দেবযানী দেখে লুঙ্গি পরা গায়ে রঙিন ফতুয়া আর গামছা কাঁধে বাড়িটার একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে—সে তখনো পেছন ফিরে আছে। দেবযানীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো—চোর ডাকাত বদমাশ কি কখনো ঘরে ঢুকে আলোর আশ্রয় নেয়? দুর্বৃত্তদের কর্মকাণ্ড সবইতো অন্ধকারের আড়ালে আবডালে হয়ে থাকে বলেই সে শুনেছে।

তার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। আচম্বিতে লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর তার দিকে শনৈঃ শনৈঃ এগোতে থাকে। আর মুহূর্তমাত্র দেরী নয়। আপন কর্তব্য স্থির করে দেবযানী উঠে বসে। বাঁ হাত বালিশের তলায় ঢুকিয়ে ডান হাতে ছোরাটা খাপ থেকে বের করে শক্ত করে ধরে। তারপর বাঁ হাতে বালিশটাকে এমন ভাবে রাখে যে প্রয়োজন বুঝে শত্রুর প্রথম আক্রমণ রুখতে সেটাকে ঢালের মতো ব্যবহার করতে পারে। দেবযানীর তখন একমাত্র লক্ষ্য লোকটার হাত এবং পায়ের ভঙ্গি ও গতির প্রতি। এগোতে এগোতে লোকটা আবার থেমে গেলো। আর সেই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে দেবযানীর নজরে পড়ে লোকটা নিরস্ত্র; অধিকন্তু ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটে চেপে ধরে কি যেন বোঝাতে চাইছে। দেবযানীর শংকা তৎক্ষণে বিস্ময়ে পরিণত—এ কে, এবং কেনই বা এত রাতে এখানে? আর অঙ্গুলি সংকেতেই বা সে কি বলতে চায়? একসঙ্গে দেবযানীর মনে অনেক প্রশ্ন অনেক জিজ্ঞাসা ভিড় করে এলো। লোকটাকে অস্ত্রবিহীন বুঝে সাহসের সঙ্গে সঙ্গে তার কৌতূহলও উদ্রিক্ত হলো। তবুও অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতার প্রয়োজন ভেবে ডান হাতে-ধরা ছোরাটা বালিশের আড়ালে রেখে বাঁ হাত দিয়ে মশারিটা একটানে সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ কৌতূহলমিশ্রিত নেত্রে তার দিকে তাকায়। পেছনে বাতি থাকার কারণে আর [illegible] লোকটার মুখাবয়ব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো না। [illegible]

[illegible] একটা [illegible]

[illegible]

[illegible]

লাফ দিয়ে নেমে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন দৌড়ে গিয়ে তক্ষুনি ছোরাটা লোকটার বুকে আমূল বসিয়ে দেবে। কিন্তু যাকে দেবযানী আক্রমণ করবে সে তখনো নির্বিকার চিত্তে ঠায় দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে দেবযানীর মনে পড়লো এই লোকটাকেই তো আজ সকালে স্টেশন থেকে বেরোবার মুখে দেখেছে। আশ্চর্য লোকটার অঙ্গভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ কিংবা অস্থিরতার অভিব্যক্তি নেই। অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে দেয়ালের দিকে পিছু হটছে। দেবযানীর অস্বস্তি চরমে উঠলো। কর্কশ কণ্ঠে কিছু বলতে গিয়েও কি ভেবে যেন থেমে গেলো।

কয়েকটি উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত নীরবে অতিবাহিত হলো। হঠাৎ অনধিকার প্রবেশকারীর গুরুগম্ভীর নিম্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—সাবাস, তোমার সাহসের প্রশংসা করি দেবযানী।

দেবযানী বিস্ময়ে হতবাক! এ কার কণ্ঠস্বর! এ স্বর যে তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে! আশা নিরাশায়, পুলকে বেদনায় তার শরীর প্রবল ভাবে দুলে উঠলো। দেবযানী বুঝি মুহূর্তের জন্য সম্বিত হারিয়ে ফেলে। হাত থেকে ছোরাটা মেঝেতে পড়ে ঝনাৎ শব্দ হতেই তার চেতনা ফিরে আসে। আগন্তুক তখনো স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে তার দিকে একই ভাবে তাকিয়ে আছে। এ দৃশ্য যেমনি অসম্ভব তেমনি অভাবিত ও অবিশ্বাস্য। তবে কি সে ভুল শুনেছে? সংশয় দ্বন্দ্বে পীড়িত আর আগ্রহে আকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি করে বলুন আপনি কে? কেনই বা এই ছদ্মবেশ? এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা। দেবযানী অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অগন্তুককে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

দেবযানীর চোখে চোখ রেখেই আগন্তুক আগের মতোই নিম্ন কণ্ঠে বলে—আমার পরিচয়ের আর কিবা প্রয়োজন? তোমার পরিচিত জনের প্রেতাত্মা এই মুহূর্তে তোমার সম্মুখে উপস্থিত। কিসের তাড়নায় নিজের শিক্ষা দীক্ষা, শালীনতা, রীতি নীতি, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে, দলের কঠোর শাসন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সাধারণ এক তস্করের ন্যায় আমার এই নৈশ যাত্রা—এই তিমিরাভিসার। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এর কূল কিনারা পাওয়া যাবেনা। বিবেকের শাসন ও রক্ত চক্ষু দেখে চলে যাচ্ছিলাম—কিন্তু পারলাম না। ফিরে এলাম। আশ্চর্য মানুষের মন [illegible] নিয়ে এত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করেছি সে আমি আ

হৃদয় বৃত্তির কর্দমাক্ত পাঁকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তার কণ্ঠস্বরে অনুতাপ ও অনুশোচনার আভাস।

—যাবার আগে তোমার নিকট বিদায় না নিয়ে যেতে পারলাম না, দেবযানী। যদি আর ফিরতে না পারি। ঐ প্রশ্নটা বিরাটাকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সব কিছু গোলমাল করে দিলো। দুর্বলতার পিচ্ছিল পথে আঁছাড় খেলাম। এক যাদুকর যেন কোন বশীকরণ মন্ত্রে আমাকে মুগ্ধ অভিভূত করে আমার আপন সত্তা ডুবিয়ে, আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। এ বুঝি এক মহা অপরাধের পূর্বাভাস। নইলে কেন এত আকর্ষণ আর কেনই বা এ অঘটন। আব সময় নেই দেবযানী। বিদায়ের লগ্ন সমুপস্থিত। পুরাণে কচ গুরুকন্যা দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিলেন। এখন ঘোর কলি—সব কিছুই বিপরীত-ধর্মী। তাই এ-যুগের দেবযানীর নিকট কচ নিজের সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটন করে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছে। ভালো মন্দ, পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এসবের হিসেব নিকেশের অবসর আর নেই, হয়তো আর কোন দিনই হবে না। ফিরি কি নাই ফিরি, এজীবনে তোমার সঙ্গে আর দেখা হোক কি না হোক এক অভ্রান্ত সত্য যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাই—আমি তোমায় ভালোবাসি। শেষ কথাটি উচ্চারণ করতে গিয়ে বক্তার গলা ধরে এলো। দুর্বলতা ঢাকবাব জন্য দেবযানীর সুমুখ থেকে ত্বরিৎ গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

দেবযানী এতক্ষণ নীরব নিস্পন্দ, নিশ্চল পাথব-প্রতিমার মতো দাঁড়িয়েছিলো। হস্তচ্যুত ছোরাটা পর্যন্ত তুলে নিতে ভুলে গেছে। অভাবিত অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার আঘাতে দেবযানী বুঝি এক অনুভূতি বিহীন জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। অনুতোষের সব কথা তার কানে গিয়েছে কি যায়নি—মনে করতে পারলো না। শুধু তার শেষ কথাটুকুতে দেবযানীর সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেলো। উহা যে তারই অন্তরে সযত্নে রক্ষিত গোপন কথার প্রতিধ্বনি। ভূলোক দ্যুলোক সর্বলোক-ব্যাপী সে কথার অনুরণন সে শুনতে পেলো—আমি তোমায় ভালোবাসি। সমস্ত অন্তর দিয়ে দেবযানী অনুভব করলো তার আর অনুতোষের মধ্যে আর যেন কোন প্রভেদ নেই—নেই কোন ব্যবধান কিংবা দূরে রাখবার মতো কোনো আবরণ। উভয়ে এক—একাত্ম হয়ে গেছে।

দেবযানী আর স্থির থাকতে পারলো না। হৃদয়ের সমুদয় প্রেম প্রীতি ভালোবাসা জড়ানো অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—ভালোবাসি। তোমায় আমি ভালোবাসি অনুতোষ। পরমুহূর্তে—একটু দাঁড়াও—শোন, বলেই সে দুয়ারের দিকে ছুটে যায়। অনুতোষ ততক্ষণে দরজার বাইরে অন্তর্হিত—ক্ষণেকের জন্যও ফিরে দাঁড়ালো না। দেবযানীর বুক ভেঙে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। হায়, তার যে অনেক কিছু বলার ছিলো, অথচ কিছুই বলা হলো না। তার মনে হলো সে যেন একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার চোখের মণি কেউ বুঝি উপড়ে নিয়েছে। হাঁ করা কপাট ধরে দেবযানী নিঃসীম অন্ধকারের দিকে শূন্য কোটর নিয়ে চেয়ে রইলো। তার শুষ্ক কণ্ঠ হ'তে আর কোন ধ্বনি নির্গত হলো না। উত্তপ্ত চক্ষু থেকে এক বিন্দু অশ্রুবারি ঝরে পড়লো না।

কতকক্ষণ দেবযানী এভাবে নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে-খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ গভীর অন্ধকারের বুক চিরে ক্ষীণ আলোর রেখা ফুটে ওঠে। মনে হলো একটা সচল আলো এদিকে এগিয়ে আসছে। এত রাত্রে এতক্ষণ ধরে একাকী দাঁড়িয়ে থেকে থেকে নিরন্ধ্র নিশুতিতে প্রকৃতির সঙ্গে অজান্তে তার রিক্ত নিঃস্ব অন্তরের যে হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা ছিন্ন হলো। বাতিটা যখন এদিকেই আসছে তখন বাতিধারী নিশ্চয়ই ডাক বাংলোর লোক—গফুরও হতে পারে—এতক্ষণে বাড়ি থেকে ফিরছে। সুতরাং হাঁপাট-করা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। যাবার মুহূর্তে তার শেষ কথা ক্ষণিকের জন্য হলেও অনুতোষকে ফিরিয়ে আনার যে ক্ষীণ আশা দেবযানী এতক্ষণ মনের কোণে পোষণ করছিলো তা বৃথা হলো। তার বুকের পাঁজর ভেদ করে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আঁধারে মিলিয়ে গেলো।

দরজা বন্ধ করে দেবযানী স্নানের ঘরে প্রবেশ করে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে মস্তিষ্কের উত্তাপ উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়। ঘরে ফিরে বাতিটা কমিয়ে দিতে গিয়ে তার শরীরে মৃদুমন্দ শিহরণ খেলে যায়—মোটা চিমনির কাঁচের বাতির চাবিটাতে হাত দিতেই বুঝি অনুতোষের হাতের ছোঁয়া অনুভব করে। পায়ের দিকের উন্মুক্ত জানালা-টার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া দেবযানীর শরীর জড়িয়ে দেয়। কানে ভ্রমর-গুঞ্জরণের মতো অনুতোষের—তোমাকে

হৃদয় এক অনাস্বাদিত ভাবাবেগে, অনির্বচনীয় পুলকে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত। যুক্ত করে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে দেবযানী মনে মনে বলে —আমি ধন্য, আমি সার্থক। মিলনের এক সুমধুর মনোহর চিত্র মনের পটে ভেসে ওঠে। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে—মিলনের তা হলে আর বাধা কোথায়? উর্ধ্বপানে চেয়ে দেখে আকাশ তারায় তারায় ভরা। অনাদিকাল থেকে অহর্নিশ এদেরই চির-জাগ্রত চোখের সম্মুখে কোটি কোটি নর নারীর জীবনের কত নাটকই না অভিনীত হয়ে চলেছে। তারা কি পারবে তার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে—দিতে পারবে তার জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধানের কোন ইংগিত।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখে ঘন তমিস্রা পাহাড়ের গায়ে স্তূপীকৃত হয়ে জমে আছে। ঐ অন্ধকারের গর্ভেই অনুতোষ কোথায় যে উধাও হয়ে গেলো। সেখান থেকে তার প্রত্যাবর্তন কি অনিশ্চিত। না, দেবযানী এরূপ চিন্তা মনে ঠাঁই দিতে পারে না। উর্ধ্বাকাশ থেকে আচম্বিতে কক্ষচ্যুত এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বেগে ছুটে নিমেষে বিলীন হয়ে গেলো। অদূরে গভীর অরণ্যের অন্ধকারের বক্ষ চিরে ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের কর্কশ আর্ত-কণ্ঠ শোনা গেলো, কোন নখর হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণে বুঝি তার ভবলীলা সাঙ্গ হলো। এসব কিসের সংকেত। দেবযানীর মন অশান্তি, উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভরে গেলো—যেন কোনো অশুভ অমঙ্গলের নিশ্চিত পদক্ষেপ শুনতে পেলো—সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। তার প্রশ্নের উত্তর আর খুঁজে পেলো না।

অনেকদিন আগে অনুতোষের কথাগুলি মনে পড়লো—নারীর প্রেম স্বাধীনতা পূজারীদের পথের কাঁটা—সংকল্প সাধনে মহা বিঘ্ন। স্ত্রীলোক মাত্রই বয়সের তারতম্য অনুসারে আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা মা, মাসী পিসি কিংবা বোন। এর ব্যতিক্রম বিচ্যুতি ঘটলে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিছুক্ষণ পূর্বে দেবযানীর কক্ষে নিভৃত নিশীথে অনুতোষের অপ্রত্যাশিত আগমন ও তার স্বীকারোক্তি নিশ্চয়ই দলীয় অনুশাসন ও আচরণ-বিধি বহির্ভূত অমার্জনীয় অপরাধ। এই অপরাধে তাদের অভিধানে শাস্তির কি বিধান আছে? ভয়ে দেবযানীর গায়ে কাঁটা দিলো, আতংকে চক্ষু মুদে এলো।

অনুতোষের কৃতকর্মের জন্য দেবযানী মনে মনে বিলাপ করতে থাকে —এ তুমি কেন করলে অনুতোষ। এমন করে চাওয়া তো তুমের জন্য

কোনদিন তা আমার কল্পনায়ও আসেনি। লোকালয় থেকে দূরে বিজন অরণ্যে আপন মহিমায় প্রস্ফুটিত কত ফুল গন্ধ বিকিরণ করে অনাঘ্রাত থেকে পৃথিবীর কোলে ঝরে পড়ে। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি কিন্তু প্রতিদানে তো কিছুই কামনা করিনি। তোমার মহৎ সংকল্প ও মহান উদ্দেশ্য সাধনে কোনো বিঘ্ন যাতে না-ঘটে সে জন্য আমি সদা সতর্ক থেকেছি। তোমার চলার পথের কাঁটা হয়ে যাতে না পড়ি সেজন্য কর্ম ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকালে খুবই সংযত হয়ে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। ভুলেও কখনো নিজেকে তোমার নিকট ব্যক্ত করবার প্রয়াস করিনি। নারীর স্বভাব-সুলভ হাব-ভাব ও আচার আচরণ দ্বারা তোমাকে প্রলুব্ধ করতে বিরত থেকেছি। দূর হতে শুধু তোমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেই নিজেকে সার্থক ভেবেছি। কখনো তোমার পূজার ফুল হয়ে বিকশিত হতে চাইনি। শুধু অনাঘ্রাত কুসুমের মতো নীরবে নিভৃতে পৃথিবীর কোলে ঝরে পড়বার কামনা করেছি। কিন্তু হায়, এই মুহূর্তে কি ঘটে গেলো! এতদিনের সংযম সংকল্প, সাধনা সবই কি ব্যর্থ হলো! জেনে শুনে আগুনে হাত দিলে নিজেকে পুড়িয়ে মারবে বলে? এর চেয়ে যে আমার মৃত্যু ভালো ছিলো। দেবযানী আর সহ্য করতে পারে না। অসহ্য বেদনায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে। মৌন সর্ব-সহা ধরিত্রী দেবযানীকে বক্ষে নিয়ে বুঝি নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকে।

কখন ভোর হয়েছে দেবযানী টের পায়নি। হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক আওয়াজে সে জেগে ওঠে। রাত্রে আলুথালু হয়ে ভূমি শয্যায় পড়ে কতক্ষণ কাঁদছিলো, কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো তা মনে নেই। উঠে বসে অসংবৃত কেশ-বেশ গোছগাছ করে দরজা খুলে দেখে শহর ট্রে হাতে দুয়ারে দাঁড়িয়ে। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেবযানী জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। ভোরের রাগিনী গাছে গাছে পাখির কাকলিতে শুরু হয়েছে। যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ-পত্রে-ভরা বিটপী শ্রেণীর অফুরন্ত সমারোহ। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড হরিৎ ক্ষেত্রে ধানের শীষে ভোরের বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে। মৃদু মন্দ বাতাসে নানা ফুলের মেশা গন্ধ ভেসে আসছে। দূর পাহাড়ের সবুজ বনানী প্রভাত অরুণের প্রথম কিরণে হাসিতে ঝলমল। দেবযানীর চিত্ত নিরানন্দ বিষাদময়। শরৎ প্রভাতের এত সৌন্দর্যে-ভরা রমণীয়

কমনীয় রূপ তাকে আদৌ স্পর্শ করলো না। তার উদাসী মনে বিন্দুমাত্র আশা আনন্দ জাগালো না। সব যেন বিষাদময় ফাঁকা, ঊষর মরুর মতো শুষ্ক।

বিগত রজনীর ঘটনা দেবযানীর মনে আবার ভিড় করে এলো। অনুতোষের শেষ কথা—ফিরি আর নাই ফিরি—কিসের ইংগিত? গত রাত্রে আহারের পর সুদেষ্ণার উক্তির সঙ্গে মেলালে কথাটা নিঃসন্দেহে অর্থপূর্ণ। তবে কি অনুতোষ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিপজ্জনক বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়েছে যা সাধন করতে রক্তঝরা-বন্ধুর-পথ-অতিক্রমণ অনিবার্য। সে পথ থেকে ফিরে আসা অনিশ্চিত। এক অসহায় বিষণ্ণতা তার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। সে অস্থির ভাবে পাইচারি করতে থাকে। হঠাৎ সুদেষ্ণার কথা মনে হতেই দেবযানী দাঁড়িয়ে পড়ে। ভোর হলেই তিনি তাকে যেতে বলেছেন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব জরুরী এবং অনেকক্ষণ ধরে তিনি তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। অপ্রস্তুত দেবযানী স্নানের ঘরে প্রবেশ করে। বেশভূষায় যত দূর সম্ভব স্বাভাবিকত্ব এনে ত্বরিৎ পদে ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হয়।

সুদেষ্ণা ছোট্ট চায়ের টেবিলের উপর ঝুঁকে মন দিয়ে কি যেন দেখছিলো। দেবযানী ঢুকতেই মুখ না তুলে বলে—বোস। হাতের টুকরো কাগজখানা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরে জিজ্ঞাসা করে—রাত্রিবেলা ভালো ঘুমিয়েছিস তো? পরক্ষণেই মুখ তুলে দেবযানীর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বলে—ওমা, তোর এ কী শ্রী হয়েছে রে! শুকনো ফ্যাকাশে মুখ, চোখের নিচে কালি—উস্কো খুস্কো চেহারা! ব্যাপার কি বল তো?

দেবযানী মহা ফাঁপরে পড়েছে। কি জবাব দেবে। মিথ্যা বলা তার আসে না—তার উপর সব কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলা! সে যে এক ভীষণ কঠিন ব্যাপার! এখন উপায়? চোখ মুখের কালি ঢাকবে কি বলে—কি অজুহাতে! মনে মনে অনেক কসরতের পর মুখে শুষ্ক হাসি ফুটিয়ে বলে—কি যে তুমি ভাবো দিদি! হাতি ঘোড়া কি আবার হবে! তবে হাঁ ঘুমটা ভালো হয়নি। আর কি করেই বা হবে বলো? একেবারে অচেনা অচিন জায়গা—প্রথম রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার আসর—অবিশ্রান্ত গানে কান ঝালাপালা। রাত বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ উৎপাত কমলো বটে কিন্তু পাহাড়ের গম্ভীর নির্জন নিঝুম নিস্তব্ধতা যেন বুকে পাথরের মতো চেপে বসলো। ঘুম আর আসে না—ঝিম মেরে পড়ে আছি।

তারপর যখনই ঘুমে চক্ষু বুঁজে আসে একটা না একটা উপদ্রব উৎপাত লেগেই আছে। কখনো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বন্য শ্বাপদের গুরু গম্ভীর গর্জন আর হুঙ্কার, কখনো বা নিশীথ রাত্রির বুক চিড়ে অসহায় প্রাণীর আর্ত্ত চীৎকার। তা শেষ হলো তো শুরু হলো নিশাচর পাখীর প্রাহরিক ঐকতান। এভাবেই আধো ঘুম আধো জাগরণে রাত কাবার। ভোরের দিকে ঘুমটা বোধ হয় গাঢ় হয়েছিলো তাই উঠতে বেলা হলো।

—ভয় পেয়ে আমাকে ডাকলি না কেন? আমি গিয়ে তোর কাছে শুতাম, কিংবা তুই এসে আমার কাছে শুতে পারতিস।

—ওমা, ভয়ের কথা তোমাকে আবার কখন বললুম! কি যে সব অদ্ভুত উদ্ভট কথা বলো দিদি। আমি কি এখনো সেই ছোট্ট কচি খুকিটি আছি নাকি যে, ভয় পাবো।

—তা কি আর জানি না? তুমি এখন মস্ত ডাঙব হয়েছো। তবে চেহারা অন্য কথা বলছে কি না। সুদেষ্ণার গম্ভীর-ললাট চিন্তায় কুঞ্চিত।

দেবযানী কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেলো। শঙ্কর ছোট-হাজরি নিয়ে হাজির। দিদির আকস্মিক গাম্ভীর্যে তার মনে সন্দেহ জাগলো। দিদির শেষ কথার তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে মনে নানা প্রশ্নের উদয় হলো। যা সে বলতে চেয়েছিলো তা আর বলা হলো না।

সুদেষ্ণা তড়িঘড়ি প্রাতরাশ নিয়ে বসে দেবযানীকে বলে তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে আয়। তোকে জরুরী কাজ বুঝিয়ে আমি বেরিয়ে যাবো—আমার খুব তাড়া।

দেবযানী চেয়ে দেখে সুদেষ্ণার আনন গম্ভীর—চিন্তার বলিরেখার সঙ্গে কর্মব্যস্ততার ভাব তাতে সুপরিস্ফুট। কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হলো না। আশ্চর্য চরিত্র! ক্লান্তি অবসাদ বলতে যেন কিছু নেই। সদা কর্ম-ব্যস্ত অথচ প্রফুল্ল—কেবল মাঝে মাঝে এত গম্ভীর হয়ে পড়েন যে কাছে যেতে কিংবা কথা বলতেও ভয় হয়।

ড্রয়িং-রুম থেকে বেরিয়ে দেবযানী একেবারে সুদেষ্ণার ঘরে গিয়ে হাজির। সুদেষ্ণা একটা খামের ওপর নাম লিখছে। দেবযানীকে দেখে বলে দেয়ালের ধারে ওয়ার্ডরোবের শেষ খোপে আমার কাপড় চোপড়ের মাঝখানে টাকা, আধুলি, সিকি দু'আনি, আনি, ডবল পয়সা, পয়সা ইত্যাদি আছে। সেগুলি আলাদা আলাদা কাগজে মোড়া আছে। প্রত্যেক মোড়কের উপর মোট মূল্যের উল্লেখ রয়েছে। একটা কাগজে

তাবুকে দিয়ে যোগফলটা লিখে এই ড্রয়ারে রাখবি। তার একটা নকল তোর কাছে থাকবে। তোর ছোট টিনের সুটকেসটাতে একটা কাপড় বিছিয়ে ঐগুলি জড়িয়ে নিবি। শহর সুটকেসটা বয়ে নিয়ে তোর সঙ্গে যাবে। এই নে দুটো মনিঅর্ডার ফরম। মাষ্টার মহাশয়ের নামের খামটা, দু'শ টাকার মনিঅর্ডার ফরম এবং অন্য মনিঅর্ডার ফরম-এ মোট মূল্য লিখে টাকা পয়সা সহ সব তাঁকে দিবি। মনিঅর্ডার দুটোর রসিদ তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিবি। ড্রয়ার-এর ভেতর তিরিশটা টাকা আছে। দু'শ টাকার রসিদ পেলে ঐ টাকা থেকে কুড়ি টাকা মাষ্টার মশায়কে দিবি। অন্য মনি-অর্ডার-এর কমিশন বাকী দশটাকা থেকে দিয়ে অবশিষ্ট তোর নিকট রেখে দিবি। লক্ষ্য রাখবি শহর সুটকেশটা যেন বেশী নাড়া-চাড়া না করে। পোষ্টআপিসে ঢুকবার আগে শহরেব হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নিবি। এবং তাকে আড্ডা ঘরের বারান্দায় তুই না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবি। খানিক চুপ করে থেকে সুদেষ্ণা আবার বলে—ভাল কথা—মাষ্টারেব সঙ্গে কাজ হয়ে গেলে ভেতরের দিকে তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবি। তিনি তোর দিদিমার বয়সীই হবেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি। যে নামে খুশী তাঁকে ডাকিস আর হাত বাড়িয়ে পান দিলে অবশ্যই খাবি। কথাটা বলে সুদেষ্ণার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠে।

পাশের সুটকেশটা তুলে নিয়ে সুদেষ্ণা উঠে পড়ে। যেতে যেতে বলে—মাষ্টার গিন্নীর বয়স হয়েছে—কাজেই সেকেলে তো হবেনই—তবে হাসি খুশী এবং মেজাজী হলেও রসিক। তাঁর কোন কথায় রাগ করিস না। ওখান থেকে ফিরে তুই চান টান সেরে খেয়ে নিবি—আমার জন্য অপেক্ষা করবি না। আমি কখন ফিরি ঠিক নেই। গফুরকে সব বলে যাচ্ছি। দরজার কাছে ফিরে এসে নিম্ন কণ্ঠে বলে—রাস্তাঘাটে চারচোখ মেলে চলবি—কেউ তোকে অনুসরণ করছে কিনা সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখবি। যা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।

দেবযানী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়—মুখে বলে, তোমার তালিম নিখুঁত ভাবে পালিত হবে। তুমি কিছু ভেবোনা দিদি। কথা শেষে তার দৃষ্টি সুদেষ্ণাকে অনুসরণ করে। সুদেষ্ণা দৃষ্টি বহির্ভূত হলেই দেবযানী অবাক হয়ে ভাবে এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কি ভাবে সে [illegible] এঁদের কর্মের জালে জড়িয়ে পড়েছে। এঁদের কর্মপন্থা আলো কি মন্দ

তা সে তলিয়ে দেখেনি। তবে এঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। না হলে এত আদর্শ ও অনুকরণীয় চরিত্রের একত্র সমাবেশ কি ভাবে সম্ভব! এ যাবৎ যে কয়জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, যাঁদের সান্নিধ্যে তার আসবার সুযোগ হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকেই অনুকরণীয় ও বরণীয়—আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কাছে গেলে শ্রদ্ধা ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে, তাঁদের আদেশ পালনে চিত্তে কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের উদ্রেক হয় না। অধিকন্তু নিজেকে কৃতার্থ বলেই মনে হয়।

দেবযানী উঠে পড়ে। ওয়ার্ডরোবের নিকট গিয়ে নিচের ড্রয়ার খুলে ফেলে। উপর থেকে কাপড় সরিয়ে সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখে কাঁচা টাকা আর ছোট ছোট অসংখ্য কাগজের মোড়কে ড্রয়ার ভর্তি! আশ্চর্য এ সব কোত্থেকে এলো? এ কি ভিক্ষা-লব্ধ না অন্য কোন উপায়ে সংগৃহীত! তার মনে পড়ে সেবাদলের পক্ষ থেকে সেও কয়েকদিন উত্তর বঙ্গের বন্যার্তদের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল ডাল, জামা কাপড় ও অর্থ সংগ্রহ করেছে। দিনান্তে সংগৃহীত অর্থ গুনে গুনে এভাবে কাগজে মুড়ে তার ওপব মূল্য লিখে আপিসে জমা দিয়েছে।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই দেবযানী ড্রয়ার থেকে কাপড় সুদ্ধ মোড়কগুলি এনে বিছানার ওপর রাখে। তারপর নিজের ঘর থেকে সুটকেসটা এনে দরজায় খিল এঁটে দেয়। কাগজ নিয়ে বসে টাকা, আধুলি, সিকি দু'আনি আনি, ডবল পয়সা ইত্যাদির ক্রমিক মূল্য লিখে যোগ করে। যোগফল ঠিক আছে কিনা তা পুনরায় দেখে একটা প্রতিলিপি তৈরি করে। মনি অর্ডার ফরম-এর শূন্যস্থানে টাকার অঙ্ক বসিয়ে মোড়কগুলি সব কাপড়ে জড়িয়ে সুটকেসে ভরে তালা এঁটে দেয়। নিজের ঘরে এসে বেশভূষা ঠিক করে দিদির নির্দেশ মতো সব হলো কিনা দেখে সুটকেশ হাতে বেবিয়ে পড়ে।

ডাক বাংলোর সম্মুখের প্রশস্ত চত্বরের উভয়দিকে ফুলের বাগান। তাতে কত রঙ বেরঙের ফুল ফুটে আছে—বিচিত্র ফুলের বাহার। নানা রকমের প্রজাপতি, মৌমাছি, ভ্রমর এ ফুল থেকে ও-ফুলে নানা নৃত্য-ছন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখে মন আনন্দে নেচে ওঠে। দেবযানী কিন্তু তা দেখেও দেখলো না। এক মনে হেঁটে চলেছে। এক রাত্রির মধ্যে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার ধ্যান-ধারণা সব যেন উল্টেপাল্টে গেছে!

এক রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে দাঁড়িয়েছে। কি যে ঘটে গেল—তার সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বারংবার একই জায়গায় পৌঁছে হোঁচট খাচ্ছে। তার পরে কি—ততঃ কিম্? এই জিজ্ঞাসার কুল কিনারা পাচ্ছে না।

চৌকিদারের আস্তানায় পৌঁছে দেবযানী গফুর কিংবা শহর কাউকে দেখতে পায় না। পাশে বাবুর্চি খানসামার ঘরও বন্ধ। গফুর ভাই, গফুর ভাই ডাকতে ডাকতে সে একেবারে রসুই ঘরের সামনে এসে হাজির। ডাক শুনেই গফুর বেরিয়ে আসে।

—বাবুর্চি খানসামারা সব কোথায়?

—আর বলো কেন ছোটদিমণি। বাবুর্চি খবর পাঠিয়েছে, ওর বিবির ব্যামোর বাড়াবাড়ি। সে আসতে পারছে না। তবে সায়েব সুবা এলে খবর দিতে। খানসামা এখনো কোন খবর দেয়নি। তাই তোমাদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করছি। বড়দিমণি সব বলে গেছেন। শহর তোমার সঙ্গে যাচ্ছে।

দেরী হচ্ছে দেখে দেবযানী বাক্যব্যয় না করে শহরের মাথায় সুটকেশ চাপিয়ে হাঁটা শুরু করে। দেবযানীর অকস্মাৎ প্রস্থান হেতু গফুরের আর কিছু বলা হলো না। তার শেষ কথা কানে এলো—শহরকে জলদি ছেড়ে দিও ছোটদিমনি।

টিলা থেকে নামবার মুখে সুদেষ্ণার সাবধান-বাণী দেবযানীর স্মরণে এলো। আশপাশের ঝোপঝাড়গুলি সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে দেখে সে নামতে থাকে। দূরে ভূরাস্তার দিকে চেয়েও অস্বাভাবিক কিছু তার নজরে পড়ে না। অন্যের অজ্ঞাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পথে ঘাটে চলতে ফিরতে এখনো সে অভ্যস্ত হয়নি তবুও দিদির তালিম মতো চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেই সে গন্তব্য অভিমুখে চলতে থাকে।

শান্ত সুন্দর রৌদ্র ঝলমল নব-প্রভাতে পাহাড়ের পাদমূলে স্নেহময় কোমল সবুজ-ঘেরা ছোট্ট জনপদটি একখানা ছবির মতো দেখাচ্ছে। মাথার উপরে আকাশের কোলে নীল গালচেয় শুয়ে খণ্ড খণ্ড শ্বেত শুভ্র মেঘ যেন তন্দ্রালস চোখে নিচের দিকে চেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। রাস্তায় লোক চলাচল বিরল। কচিৎ কদাচিৎ গরু বাছুর সহ পাচনি হাতে রাখাল কিংবা কুড়ুল হাতে কাঠুরিয়ার সাক্ষাৎ ঘটছে।

সুটকেশটা মাথায় নিয়ে শহর আগে আগে চলেছে। রাস্তা

ওয়াকিবহাল নয় বলেই দেবযানী ইচ্ছা করে এই পন্থা নিয়েছে। অদূরে রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ কিছুক্ষণ ধরে একটানা বেজে চলে। সে শব্দ পাহাড়ের গায়ে টক্কর খেয়ে প্রতিধ্বনির লহর তুলে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। চলে চলে রাস্তার বাঁক ঘুরতেই দেবযানীর নজরে পড়ে একদল সন্ন্যাসী দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। নিকটবর্তী হতেই বোঝা গেল সকলেই বয়সে নবীন। বাহ্যিক জটাজুট, ভস্মাচ্ছাদন তাদের বয়স ঢেকে রাখতে পারেনি। তাঁদের আনন এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চাঞ্চল্যে সমুজ্জ্বল, যৌবন জোয়ারে উদ্দীপ্ত উচ্ছল।

অগ্রগামী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি দেবযানীর উপর নিবদ্ধ হতেই তাঁর চলার গতি বুঝি ক্ষণেকের জন্য শ্লথ হয়ে যায়। পরক্ষণেই জোর কদমের সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে হর হর বম বম ধ্বনি নিসৃত হয়। সে-ধ্বনি সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তোলে। কৌতূহলী দেবযানীর চোখে চলমান ভস্মাচ্ছাদিত সে-দৃষ্টি ধরা না পড়লেও সন্ন্যাসীর কণ্ঠ-নিসৃত হর হর বম বম ধ্বনি শুনে সে চমকে উঠে। তৎ-ক্ষণে তাঁকে দেখবার আশায় পেছন পানে চায়। সন্ন্যাসীর দল ততক্ষণে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেবযানীর বক্ষ ভেদ করে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে! এ কণ্ঠস্বর কি কখনো ভুল হতে পারে! উহা যে তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। বিগত রজনীর বিদায়ী কণ্ঠস্বর—ফিরি আর নাই বা ফিরি, দেখা হোক কি না-হোক—আমি তোমায়······আর এই মাত্র শ্রুত কণ্ঠস্বর একই কণ্ঠোদ্ভূত! প্রভেদ শুধুমাত্র তাঁর রূপে—ভিন্ন ভিন্ন বেশ বিন্যাসে—যা হয়তো তার সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

ভারাক্রান্ত মনে দেবযানী পোষ্টআপিসে পৌঁছে! শহরের হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে আড্ডাঘরের বারান্দায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে খোলা দরজা দিয়ে সে আপিস ঘরে প্রবেশ করে। মাষ্টারবাবু তখন সদ্য-ডাকে-প্রাপ্ত টিকিট, খাম, পোষ্টকার্ড ইত্যাদি গোনায় ব্যস্ত। দেবযানী একেবারে তার টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। পোষ্টমাষ্টার কাপড়ের খস্ খস্ শুনে বাঁয়ে চেয়ে বিরক্তির সঙ্গে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মোটা চশমার ভেতর দিয়ে শাড়ির আচল দেখে বাক-রোধ করলেন। তারপর মাথা তুলে দেবযানীর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে লঘু কণ্ঠে বললেন—কে বাবা তুমি জলপরী, এই কেবল ভোরে আমার সামনে

এসে দাঁড়ালে। শুনেছি পাহাড়ের কোলে ঐ ঝরনার বিলে পূর্ণিমার রাতে মাঝে মাঝে জল-পরীরা এসে কেলি করেন। তারপরে পদ্মফুলে সেজেগুঁজে উড়ে একেবারে দেবাদিদেবের মন্দিরে গিয়ে পূজা-আচ্চা সাঙ্গ করে আবার ডুব মেরে চলে যান। তা বাবা, এটা তো নীপবন নয় যে তুলে খোঁপায় গুঁজবে আর এটাও মন্দির নয় এবং আমিও মহাদেব নই যে আরাধনা করবে! এটা কট্টর ইংরেজ রাজত্বের পয়লা নম্বর গোলাম-খানা। এ অধম তার সামান্য এক দ্বারপাল মাত্র। এখানে শুধু টাকা, আনা, পাই-এর কারবার—একটা কানাকড়ি এদিক ওদিক হয়েছে কি হাতে হাত-কড়া, তারপর বাস্—শ্রীঘর বাস! তবে হাঁ, তব মুখ হেরি কেন জানি মহাদেব হবার ভীষণ সাধ জেগেছে—বলো তো চেয়ার ছেড়ে ভূমি শয্যা নিয়ে একেবারে চিৎপটাং হই!

মাষ্টারের কথায় চটুল ঢং-এর রঙ বুঝি দেবযানীর গায়ে লেগেছে! ফিক্ করে হেসে বললে—বাব্বা, এ বয়সেও মহাদেব হবার সখ! বেশ তো সাধ যখন জেগেছে একবার পরখ করুন। তবে এবড় বিষম-কালী—পদভরে মেদিনী টলমল করবে, তখন গাঁজা না-টেনেও ধুতরো ফুলের বদলে চোখে শর্ষে ফুল দেখবেন আর ছেড়ে দে কালো-বদনী বলে কঁকিয়ে পাড়ার সব কাক চিল জড়ো করবেন। দুঃখ হয়, কি যে আপনি! কোথায় এ বয়সে নাতি নাতনীদের নিয়ে তিন্তিড়ি বৃক্ষ ছায়ে বসে গল্পগুজব করে শেষ ক'টাদিন কাটাবেন; না এখনো যক্ষের মতো গোলামখানার মালকড়ি আগলে রয়েছেন! এই নিন সন্দেশ! দেবযানী হাত বাড়িয়ে সুদেষ্ণার চিঠিখানা ধরে।

পোষ্টমাষ্টার হো হো করে হেসে ওঠেন—জব্বর বলেছ, বাবা, মেয়ে তো নয় যেন জল বিছুটি! খুব ঘায়েল করলে বটে! দেবযানীর হাত থেকে চিঠি খানা নিয়ে আগাগোড়া পড়লেন তারপর চিৎকার দিয়ে উঠলেন—তাই বলো, আমিও তো ভাবছিলাম—ইনি কে বটেন। এমন জনের সাকরেদ না হলে কি কখনো রূপে বোলে এমন খোলতাই হয়! হা, হতোস্মি, চিনি চিনি করেও চিনতে পারছিলাম না, ক্ষণিকের দেখা তো অথচ হৃদয় পটে ঐ মূর্তি আঁকা ছিলো। ওরে হরি, দিদিকে একখানা চেয়ার দে। নাও এবার মালকড়ি সব ঝেড়ে ফেলো দিকি। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোক জনের ভিড় বাড়বে। তার ওপর আজ আবার খাজনা দাখিলের দিন।

দেবযানী মাষ্টারের হাতে চাবিটা গুঁজে দিয়ে বলে—এই নিন। স্যুটকেসের মধ্যে মনিঅর্ডার ফরম সুদ্ধ সব মজুত আছে। আমার কাছ থেকে কেবল কমিশনের টাকা নিয়ে রসিদ দুটো আমাকে দেবেন।

—হাতের কাজ সেরে এসবের বিলিব্যবস্থা করতে ঘণ্টাখানেক সময় তো অবশ্যই লাগবে। ততক্ষণ মহাশয়ার কি করা হবে ?

—কেন, আমি না হয় এখানে চুপটি করে বসে চক্ষু মুদে ভোলানাথের ধ্যান করবো। আপত্তি আছে ?

—আলবৎ আছে ! বলো কি পাগল না, মাথা খারাপ ! অমন কম্মটি করো না দিদি ! ও আমার এ-বয়সে সহ্য হবে না। মুহুর্মুহু তব 'মুখ চন্দা দরশন লাগি' চক্ষু ফেরাতে হবে। ফলে কর্ম-নাশ, তপস্যা ভঙ্গ ও সর্বনাশ !

—তবে তো মহা ভাবনার কথা ! এই অবস্থায় একমাত্র সমাধান অন্দর মহলে প্রবেশ এবং মহাদেবী সন্দর্শনান্তে পুণ্যার্জন। কোন বাধা বিপত্তি নেই তো ? কিন্তু সর্বাগ্রে স্যুটকেশটা খালি করে দিলে বাধিত হবো। ওটা ওর বাহনকে ফেরৎ দিয়ে বিদায় করতে হবে।

মাষ্টার হেসে ফেললেন—বাধা ! তা কেন হবে ? ওতো বহুত খোশ বাত, উত্তম প্রস্তাব ! তবে খুব সাবধান ! আগে ভাগেই বেমক্কা কিছু ডেকে বসোনা। তুমি যেমন বুনো ওল, তিনিও এবয়সে বড় একটা কম যান না—একেবারে বাঘা তেঁতুল ! নামটাও আবার তেমনি কিনা।

কথা শেষে দেবযানীকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই পোষ্ট মাষ্টার উঠে পড়েন। মেঝেতে আটা লোহার সিন্দুকটা খুলে একটা লোহার ট্রে বের করে আনেন। তারপর স্যুটকেশটা খুলে একেবারে হাঁ হয়ে যান ! একি, এযে দেখছি কেবল, সিকি, দু'আনি, আনি আর পয়সার মেলা ! এসব কোত্থেকে যোগাড় হলো—কে দিলে ? কেমন এক সন্দেহাত্মক দৃষ্টিতে তিনি দেবযানীর দিকে তাকান।

ক্ষণকালের জন্য দেবযানী বুঝি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ প্রশ্ন তো তার মনেও জেগেছিলো। কিন্তু কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ যে তাদের শুধু আইন-বিরুদ্ধ তা নয়, দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। এখন সে কি করবে—মাষ্টারের সন্দেহ কিভাবে অপনোদন করবে ? তৎক্ষণাৎ নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে জবাব দেয়—আর বলেন কেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত চাষীরা এভাবেই তো প্রিমিয়াম দেয়। এতে বেজায় খাটুনি। গুনে মেলাতে কত যে সময় নষ্ট তা বলার নয়।

পোষ্ট মাস্টারের দৃষ্টি নরম হয়—তবে সন্দেহ-বিমুক্ত হলো কিনা বোঝা গেলো না। মুখে বললেন—ঠিকই বলেছ। আমাকেও কি এজন্য কম হুজ্জত হাঙ্গামা পোহাতে হয়। মনিঅর্ডার করবে, সেভিংসে টাকা জমা দেবে, খাম পোষ্টকার্ড কিনবে—একগাদা খুচরো নিয়ে এসে হাজির। চাষীরা আবার এক কাটা বাড়া—তারা হয়তো না কেন একসঙ্গে পয়সা, ডবল পয়সা এমন কি পাই পয়সা নিয়ে এসে হাজির। কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব—কেন এগুলি কি সরকারের তৈরি নয়! তারা কি এর জন্য জিম্মাদার নয়? এসব তো তারা তৈরি করেনি যে মেকি বলে ফেলে দেবে?

এরপর আর কি বলবার আছে? নিজের হাত নিজে কামড়ানো ছাড়া আর কিই বা করবার থাকে! না নিলে হয়রানি বাড়বে বৈ কমবে না। সরকারের খাস পেয়ারা ডিপার্টমেন্ট, আর এরা সব তার পুষ্যি পুত্তুর। সত্যি মিথ্যে বানিয়ে আর্জি পেশ করলেই হলো। ওভারসিয়ার, ইন্‌সপেক্টর, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছুটে আসবে, আর ডি পি. এম. জি., পি. এম. জি., মায় ডি. জি., শুদ্ধ সব তটস্থ। এসবের মোকাবেলা ও জবাবদিহি করতে প্রাণান্ত! বদলীর খড়্গ তো মাথার ওপর অনবরত নাঙা হয়ে ঝুলছে! কিছু না পেলো তো তারই এক কোপ বসিয়ে দিলে! যাক্ গে, কাজ অনেক বাড়িয়ে দিলে দিদি! হিসেবের কাগজটা দাও—সময় মতো গুণবো। সব কিছু ঐ ট্রের মধ্যে ঢেলে রেখে কাপড়খানা শুদ্ধ খালি সুটকেসটা দেবযানীকে ফিরিয়ে দেন।

সুটকেসটা নিয়ে দেবযানী বাইরে গিয়ে শঙ্করের হাতে তুলে দিয়ে বলে—তুমি চলে যাও, আমার ফিরতে দেরী হবে। আপিস ঘরে ফিরে এসে দেখে মাষ্টারবাবু কর্মব্যস্ত। তাঁকে কিছু না বলে দেবযানী ঘুরে ঘুরে ঘরের মধ্যটা দেখতে থাকে। এক জায়গায় একজন বসে ঠকাঠক শব্দে চিঠি পত্রে মোহর ঠুকছে; আর একজন সেগুলি নিয়ে কবুতর খোপের মতো ছোট ছোট খোপে ছুঁড়ে ফেলছে। অদ্ভুত দর্শন লোহার সিন্দুকটা মেঝের ভেতর সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা। তালা ছাড়াও নিরাপত্তার জন্যই বোধহয় ঢাকনির ওপর ক্রশবার-এর মতো কব্জার সঙ্গে আঁটা একটা লোহার পাত। সেটা আরো দুটো অতিকায় তালা দিয়ে বন্ধ। দেয়ালের শেষ প্রান্তে একটা দরজা। একটু চাপ দিতেই সেটা খুলে যায়। উঁকি দিতেই এক ফালি সরু পথ দৃষ্টিগোচর হয়। বুঝলো এটাই অন্দর মহলে

যাবার প্রাইভেট পথ। আপিস ঘরের পেছনের দিকের অংশটাই তা হলে মাষ্টার মহাশয়ের বাসা বাড়ি। সেখান দিয়ে ঢুকে ভেতরে যেতে যেতে দেখে পথের বাঁদিকে জানালা বিহীন মস্ত একটা কাঠের পার্টিশন। সামনেই শান-বাঁধানো প্রশস্ত বারান্দা। তার পরেই ছোট্ট একটু উঠোন। তার ও-পাশে রান্না-ঘর। ডানদিকে এক খণ্ড জমিতে শাক-সব্জির বাগান। উঠোনে নেমে দেবযানী কাউকেই দেখতে পায় না। তবে রান্নাঘর থেকে মশলা পেষার শব্দ আসছে। উঠোন পেরিয়ে সে বাগানে প্রবেশ করে। তার পরেই পুকুর—টলটল করছে জল। কাঠের সিঁড়ির ঘাট। জলের ভেতরেও কয়েকটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। আব্রুরক্ষার জন্যই বোধ হয় বাঁশের মোটা চাঁচারি দিয়ে চতুর্দিক ঘেরা। সামনের দিকটা লম্বা হয়ে পুকুরের অনেকখানি অবধি নেমে গেছে। সাঁতার কেটে স্নান করতেও অসুবিধা হয় না। দেবযানী সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়—বড়, ছোট, মাঝারি নানা রকম মাছ খেলে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পেছনে খশ্ খশ্ শব্দ শুনে দেবযানী ঘুরে দাঁড়ায়। একজন বর্ষিয়সী মহিলা চশমার মোটা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছেন। দেবযানী বুঝলো—ইনিই মাষ্টার-গিন্নী। সে তাঁর দিকে এগিয়ে যায়। কাছে আসতেই তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কেগো বাছা। আমার লক্ষ্মী তো তুমি নও।

দেবযানী অনুমান করলো দূর থেকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই তাকে লক্ষ্মী ঠাউরে ছিলেন। কাছে আসতেই তাঁর ভুল ভাঙে। সুতরাং সে হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—আমি আপনার লক্ষ্মী নই বটে, তবে আপনার আর একজন লক্ষ্মী হতে আমার কোন আপত্তি নেই। যখন শ্রীচরণ দর্শনা-কাঙ্ক্ষায় এসেছি তখন পরিচয় অবশ্যই পাবেন। আগে শ্রীচরণ দু'খানি বাড়ান —পেন্নামটা সেরেনি। ভয় পাবেন না—অজাত কুজাত নই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেবযানী উবু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

মাষ্টার গিন্নীর বিস্ময়ের অবধি নেই! ঘর থেকে বারান্দায় পানের পিক ফেলতে এসে পুকুর ঘাটের দিকে তার নজর পড়ে। এত ভোরে ওখানে কে দাঁড়িয়ে। ঝি তো রান্না ঘরে মশলা পিষছে। দূর থেকে তিনি ভাল দেখতে পান না। কৌতূহলী হয়ে পুকুর ঘাটের দিকে এগোতে এগোতে তার মনে হলো লক্ষ্মীই বুঝি ওখানে দাঁড়িয়ে। ওর তো মাছ খাবার জীবন বাতিক। তবে কি ভোরের গাড়িতে একাই এসেছে!

কিন্তু তা হলে ওর দাদু এবং আমার সঙ্গে দেখা না করেই এখানে এসে দাঁড়াবে। পেছন থেকে দেখা মেয়েটির দাঁড়াবার ভঙ্গী, কাপড় পরা, চুল বাঁধা এমন কি গায়ের রঙ শুদ্ধ হুবহু যেন লক্ষ্মী! ডাকতে যাবে এমনি সময় মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়।

মেয়েটির চোখা চোখা বুলিতে মাষ্টার গিন্নীর মুখের বিস্ময়ের ভাব কেটে যে বিরূপ ভাব ফুটে উঠেছিলো তা প্রণাম করার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে গিয়ে তাঁর সারা আননখানি প্রসন্নতায় ভরে ওঠে! তিনি দেবযানীর মাথায় হাত দিয়ে চিরায়ুষ্মতী হও—আশীর্বাদ করে বলেন—এসো। বারান্দার কাছে এসে হাঁক দেন—সৈরভী, একখানা পিঁড়ে দেতো।

বারান্দায় উঠে দেবযানী খালি মেঝেতেই একেবারে মাষ্টার গিন্নির গা ঘেঁষে বসে পড়ে। তার পর তাঁকে বলবার কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ঐ লক্ষ্মীটি আপনার কে হয় শুনি?

মাষ্টার গিন্নি হেসে বললেন—ওমা, সে যে আমার নাতনী গো, মেয়ের ঘরের। দেখনে, চলনে, বলনে হাসিতে খুশিতে ঠিক তোমারই মতো। কত করে লিখলাম আসতে। তা নয়, উল্টো অনুযোগ অভিযোগ—আমি কেন যাইনা, আমার দয়া মায়া নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে গেলেই হলো! তুমিই বলো বাছা, এই বুড়ো মানুষটাকে একা ফেলে আমি যাই কি করে? পেনসনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকী—ভালয় ভালয় কাটে তবেই না বাঁচি! পোড়া কপাল আমার, এমন অজ পাড়া-গেঁয়ে জায়গা যে, একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত পাইনা—যেন কালা পানির দ্বীপের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। এ সব কি কেউ ভাবে, না বিবেচনা করে! মেয়েকে নেকাপড়া শেখানো হচ্ছে—জজ ম্যাজিস্টর হবে! যত সব অনাছিষ্টি আদিখ্যেতা আর ধিঙ্গীপনা! ভদ্রমহিলার অন্তরের বিক্ষোভ-বিক্ষোভ এই কথা কয়টির মধ্যে দিয়ে যেন ফেটে পড়ে।

দেবযানীর হৃদয় সহানুভূতিতে গলে যায়। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বুঝি দরদী সুরে বলে—বেশ তো, আমি যখন আপনার লক্ষ্মীর মতোই তখন বলেন তো কয়েকদিন না হয় আপনার নিকটই থেকে যাই।

—ওমা, বলে কি গো! আমার কি আর অমন কপাল হবে! খুশী মনে হাসতে গিয়ে তাঁর মুখের বলী রেখা গুলো আরও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—। কি যে তৃপ্তি পেলাম দিদি। পরক্ষণেই চিৎকার করে তাঁকে —ওরে ও সৈরভী, দৌড়ে যা, বলরামের দোকান থেকে কিছু মিছি টিছি

নিয়ে আয়। তোদের কি আর জ্ঞান গম্যি বুদ্ধি শুদ্ধি বলতে কিছু হবে না। মশলা পিষছে তে পিষছেই—সব দিকেই তো নজর রাখতে হবে। যা বাছা, ছুট্টে যা। দেখিস বাসি পচা যেন আনিস না—সব গরম গরম আনবি।

দেবযানী বাধা দিলো—না, না দিদিমা, ওসবের হাঙ্গামা করবেন না, ও ভালো লাগে না। আমি খেয়ে দেয়েই বেরিয়েছি।

মাষ্টার গিন্নি অবাক! অবিশ্বাসের সুরেই দেবযানীর কথা নিম্নস্বরে প্রতিধ্বনি করে—খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছ—তা বাছা এত সকালে এমন কি খেলে যে আর খেতে পারবে না?

—কেন, ছোট-হাজরি।

—সে আবার কি! বলেই মাষ্টার গিন্নি চুপ করে গেলেন। তাঁর মনের কথা মুখে ভাবে প্রকাশ না পেলেও চোখের দৃষ্টিতে বুঝি দ্বিধা আর সন্দেহের ছায়াপাত হলো!

সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই অসমবয়সীর মধ্যে এত অল্প সময়ের সাক্ষাৎ ও ও আলাপের মাধ্যমে যে মধুর প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাতে বুঝি হঠাৎ চিড় ধরে! অপ্রত্যাশিত ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—এবার তোমার পরিচয়টা দাও তো বাছা।

দেবযানী হেসে ফেললে—তার জন্য তাড়াহুড়োর কি দরকার—সে তো এমনিতেই জানতে পারতেন। মনে মনে কিন্তু তার ভয় হলো। এই তো বেশ ছিলো—উভয়েই একে অন্যের অলক্ষ্যে এক কোমল অনুভূতি বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছিলো। পরিচয় যদি উভয়ের মধ্যে সে বন্ধনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে তা ছিন্ন করে দেয়!

উৎকণ্ঠা চেপে বললে—যাক্‌গে মনের কথা যখন মুখে ব্যক্ত করলেন তখন আর ঝুলিয়ে রাখবো না। আমি এক দীন ব্রাহ্মণ কন্যা। লেখা পড়া করি আর তারই ফাঁকে ফাঁকে রুজিরোজগারের ধাঁধায় বীমার দালালী করি। এখানে ডাক বাংলোয় উঠেছি। আপাততঃ মাষ্টার বাবুর নিকট বীমার কার্যোপলক্ষে এসেছি।

মাষ্টার গিন্নি গম্ভীরভাবে বললেন—হুঁ, যা ভেবেছি, ঠিক তাই। নির্ঘাৎ ঐ সুদেষ্ণা বেটির সাকরেদ—না হলে এমন ক্যাঁট ক্যাঁট কথা আর কেটাং চেটাং বুলি বেরোয়! এমন না হলে এই পাহাড়িয়া অজ পাড়াগাঁয়ে এমন ডিংড়ি মেয়ে কোথা থেকে আসবে! থানার দারোগা, ষ্টেশন

মাষ্টারের আত্মীয় স্বজনরা এখানে এলে মাঝেসাঝে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসে বটে কিন্তু এমনটি তো এই তিন বৎসরের ভেতর এখানে কখনো দেখিনি। তা বলি বাছা, এই তো উঠতি বয়েস—এত রূপ যৌবন নিয়ে রাস্তা ঘাটে ধিঙ্গিপনা করে না ঘুরে বেড়ালেই কি নয়! কোন দিন কি কেলেঙ্কারি ঘটবে তখন কি হবে! তোমার বাপ মাকেও বলিহারি দিই —তাঁরা কি চক্ষু বুঁজে আছেন—বিয়ে শাদি দিতে পারেন না!

দেবযানী মুচকি হেসে বললে—সব হবে। ঐ যা যা বললেন সময় হলে সবই হবে। যত কটু কাটব্যই করুন আর যত দজ্জালই ভাবুন না কেন, ভয় ভাবনার কিচ্ছু নেই। দেখতে শুনতে খোঁচা বোঁচা তো নই। আর রাস্তা ঘাটে চলা ফেরা করলেই কেলেঙ্কারি হয়, ঘরে বসে থাকলে হয় না—এ যুক্তি অচল, বরং বিপরীতটাই যে হামেশা ঘটছে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তও আছে।

—অচল সচল আমি বুঝিনা বাপু। সুদেষ্ণা বেটি আসুক। এর বিহিত যদি না করি তো আমার নাম নেত্যকালী নয়। উত্তেজনায় তাঁর ঠোঁট দুটি বেতস পাতার ন্যায় থর থর কাঁপতে থাকে।

দেবযানী গম্ভীরভাবে মাষ্টার গিন্নির পায়ের ওপর উঁবু হয়ে পড়ে বললে—দোহাই দিদিমা আপনার লোল রসনা আর রক্ত চক্ষু সংবরণ করুন। ছোট থেকে পিতামাতা হারা, এখন আমি দাঁড়াই কোথা!

—আরে সব্বোনাশ, এ যে বঁটির উপর পড়লো গো! মাষ্টার গিন্নি তার দু'বাহু ধরে ফেললেন, তারপর বুকের কাছে টেনে এনে মুখখানা তুলে চিবুকে হাত ছুঁয়ে চুমো খেয়ে—বেঁচে থাক, বলে আশীর্বাদ করলেন।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সৈরভী ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। ডাক পিওন পতিতপাবন জানালে যে দিদিমণিকে মাষ্টারবাবু ডেকেছেন।

মাষ্টার গিন্নী গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন—তুমি যাও দিকি পতিত। দিদিমণি সময় হলেই যাবে। তারপর দেবযানীর দিকে চেয়ে বললে—এতক্ষণ বেশ ছিলাম। নিজের নাতনীর মতোই তোমার সঙ্গে রঙ্গে রসে কেটে গেলো। কিছু খেলে না দিদি, সেজন্য খারাপ লাগছে—মনটা খচ্ খচ্ করছে। তাঁর গলার স্বর কেটে গেলো।—বলছিলাম কি দিদি, বেলা তো অনেক হলো—দুপুর হতে আর দেরী নেই—এখানেই খেয়ে যাও।

এত অল্পক্ষণের আলাপ পরিচয়ে এই বর্ষীয়সী মহিলার সুনিবিড়

স্নেহের উত্তাপ বুঝি দেবযানীর হৃদয় স্পর্শ করলো। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললে—ঠিক সময় না পৌঁছলে দিদি বড্ড ভাববেন। তা খাবারের জন্য এত তাড়া কিসের—মাষ্টার মশায়ের নিকট তো হামেশাই আসতে হয়—তখন হয়তো আবার তাড়াবার জন্যই ব্যস্ত হবেন।

দেবযানীর কথায় কান না দিয়ে মাষ্টার গিন্নী—সৈরভী সৈরভী, বলে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো। তারপর দেবযানীর দিকে চেয়ে অনুরোধ মেশানো কণ্ঠে বলেন—কিছুই তো খেলে না দিদি, একটা পান-ই না হয় খেয়ে যাও—তাতে কিছুটা শান্তি পাবো। লক্ষ্মী আমার তৈরী আর মুখ-চিবনো পান খাবার জন্য কিরকম আঁকুপাঁকু করে তা যদি একবার দেখতে!

ভদ্রমহিলার অন্তরের একান্ত ব্যগ্রতা যেন কথাগুলির ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সুদেষ্ণার উপদেশও দেবযানীর মনে এলো। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে—বেশ তাই খাবো।

মাষ্টার গিন্নীর মুখে হাসি আর ধরে না। দেবযানীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—বা, এইতো লক্ষ্মীর মতো কথা! আর সুদেষ্ণা বেটি পানের নাম শুনলেই চিংড়ির মতো লাফিয়ে ওঠে আর যতো সব অনাছিষ্টি মেলেচ্ছ কথা বলে! তাজ্জব ব্যাপার, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস—পান খাবি না! না হলে ঠোঁট রাঙাবি আর বেটাছেলেদের ভেড়া বানাবি কি দিয়ে। আরে গুয়া পান—ওতে দেবতারা পর্যন্ত বশীভূত হন। দেখ না, হিন্দুদের পূজা আচ্চা, ব্রত, পালপার্বোন ইত্যাদিতে গুয়া পান না হলে চলে! দেবতারা তুষ্ট হলেই না ভালো ঘর বর জোটে!

সৈরভী একে একে ডাবর, পানের বাটা, ঢাকা একটা সাজি, পিকদানি ইত্যাদি এনে হাজির করে! সবগুলি পেতলের—ঝকঝকে তকতকে। ডাবর ভর্তি পান—ভেজা নেকড়া দিয়ে ঢাকা। বাটার ওপর পেতলের বাঁটের জাঁতি আর গোটা দুই ছিপি আঁটা ছোট ছোট শিশি আর চুনের ভাণ্ড। চুন জমে জমে সে ভাণ্ডের এমন চেহারা হয়েছে তা মাটির কিংবা অন্য কোন ধাতুর—বোঝা কঠিন। মাষ্টার গিন্নী বঁটি আর সব্জির ঝুড়ি সরিয়ে প্রসন্ন আননে পানের বাটা কাছে টেনে আনেন। তারপর ঝাঁপিটা খোলেন—ভেতরে নানা খোপ। তার মধ্যে হরেক রকম কাটা সুপারি থেকে শুরু করে কত রকম রঙ বেরং-এর যে মশলাপাতি, দেখে অবাক হতে হয়।

ডাবরের মুখ থেকে নেকড়া সরাতেই দেখা গেল ছোট বড়, মাঝারি নানা রকমের পান তার মধ্যে পর পর সাজানো। মাঝারি একটা পান নিয়ে বোঁটাসুদ্ধ শির দাঁড়া ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর দু'খণ্ড একত্র করে যখন চুন মাখাচ্ছিলেন দেবযানী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত। দৃষ্টি তার পানের ওপর নিবদ্ধ, আনন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। মনে হলো এক কুশলী শিল্পী বুঝি একমনে কারুকর্মে নিবিষ্ট—অন্য কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি নেই। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবার পর দেবযানীর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—চুন সুপারি কম কম করে দেবেন—নচেৎ মুখ পুড়বে মাথা ঘুরবে।

আর যাবে কোথায়! রসভঙ্গ হলে রসিকজন যেরূপ সকরুণ দৃষ্টিতে বেরসিকের পানে চায় মাষ্টার গিন্নী সেভাবে দেবযানীকে দেখলেন তার পর ম্লান হেসে বললেন—আজকালকের মেয়েদের ঐ এক দোষ—কিছু জানবে না, বুঝবে না, দেখবে না, কেবল ফোঁড়ন কাটবে। আরে বাপু, আগে দেখ, শোন, বোঝ, শেখ—সে চেষ্টা নেই। আমি পানের কারিগর —পান তৈরির কলা কৌশল আমার এক্তিয়ারে। এমন পান সাজাবো যা তুমি শুধু খাবে না, আবো চেয়ে খাবে—তবেই না শিল্পীর সৃষ্টির সার্থকতা। কাছে এস, দেখ এই সাজির খোপে খোপে কত কিছু রয়েছে —মগি, মাদ্রাজী সুপারি মোটা, মাঝারি, সরু করে কাটা। খয়ের তিন রকম। এলাচ ছোট বড়, লবঙ্গ, দারুচিনি, জাফরান, ধনের চাল, মৌরি, আলোচাল, দোক্তা, তামাক পাতা, গুণ্ডি, জবদা, কিমাম—আরো কত কি! এর থেকে কি কি নিয়ে তোমার পানটি সাজাচ্ছি খালি চুপটি করে বসে দেখো—কথা নয়—স্পিকটি নট্‌! পান সাজা হলে পব মাষ্টার গিন্নী সেটি দেবযানীর হাতে দিয়ে বললেন—এবার ওটা মুখে পুরে দু'মিনিট ধরে চিবোও তারপর পিক ফেলে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। ভালো না লাগে তো আমার শির কবুল, বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

দেবযানী বিনা প্রতিবাদে পানটি মুখে পুরে চিবোতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর পিক ফেলে যখন চক্ষু তুলে তাকালো মাষ্টার গিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলো—একি করেছ দিদি! চাঁপাকলির মতো ঠোঁট দুটো যে রাঙা টুকটুকে করে ফেলেছ—দেখে তো আমারই ভিরমি যাবার অবস্থা! বেটাছেলে তো ভস্মই হয়ে যাবে—একেবারে মদন ভস্মের মতো! সাবধান দিদি সাবধান! পথে ঘাটে অনেক হাড়হাবাতে, কাক চিল্ল রয়েছে—ছোঁমেরে না নিয়ে পালায়!

দেবযানী লাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিগত রজনীর অনুতোষের উক্তি স্মরণে শরীরে পুলক-শিহরণ লাগে। মাষ্টার গিন্নীর চক্ষু এড়াবার উদ্দেশ্যেই বুঝি মুখ গম্ভীর করে বলে—ধেৎ, যতসব আজেবাজে কথা! ওসব ভূত প্রেত, যক্ষ কিন্নর ও কাক চিলের মারণ-মন্ত্র আপনার আশীর্বাদে আমার জানা আছে—ভয় পাবেন না!

মাষ্টাব গিন্নী দেবযানীর মুখেব দিকে সন্দেহাত্মক দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। হয়তো দেবযানীর চোখে মুখের ভাবেব খেলা তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি—না অন্য কিছু! দেবযানীও বা কি বুঝলো কে জানে। মাষ্টার গিন্নী মুখব্যাদন করবার আগেই হেসে বলে—একটা সত্যি কথা বলবো? পানটা খেতে খুব ভালো লাগছে—চমৎকার!

মাষ্টার গিন্নীর সারা মুখে গর্বমিশ্রিত পরিতৃপ্তিব হাসি ছড়িয়ে পড়লো —সে হাসির একই অর্থ—কেমন কি বলেছিলুম!

—বড্ড দেরী হয়ে গেল, বলেই দেবযানী উঠে দাঁড়ায়। মাষ্টাব গিন্নী দেবযানীর মাথার হাত দিয়ে আশীর্বাদ কবেন এবং চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেয়ে তাকে নীরবে বিদায় দেন। ক্ষণিকের অ লাপনে নাতনীর বয়সী এই কিশোরীটির সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে তিনি আটকা পড়েছেন —তাই বিদায়মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই সরে না। প্রণাম করে দেবযানী যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথেই বেরিয়ে যায়—পেছন ফিরে আর তাকায় না।

পোষ্টআপিসে ঢুকে দেবযানী সরাসরি মাষ্টার মহাশয়ের টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ায়। মাষ্টার মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেন— একি করেছ দিদি পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে এলে? বড্ড ভুল করলে। ও-পানে যাদু আছে! একবার খেয়েছে কি মরেছে—আর ছাড়তে পারবে না। আমি বুড়ো মানুষ বহুদিন থেকেই ও-ফাঁদে আবদ্ধ! এখন বুড়ো হয়েছি, দাঁতে জোর নেই—অনেকগুলো পড়ে গেছে। তবুও পান না হলে চলে না। এই দেখ ডিবে ভর্তি হামানদিস্তায় ছেঁচা পান। আশ্চর্য প্রথম যৌবনে ওঁর তৈরি যেরকম পান খেয়েছি এখনও ঠিক সে রকমই খাচ্ছি স্বাদে এতটুকু তারতম্য নেই—অদ্ভুত! নাতি নাতনীরা ওঁর কাছে এলে ওর মুখের পান চিবনো না খেলে চলবে না। বিশ্বাস কর কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কে আগে খাবে। কি, ছেঁচা পান একটু চাখবে নাকি?

—ওরে বাবা, মাপ করুন। যা বললেন তার পরও আর ও-পান খাই ? শেষকালে নেশায় ধরলে কি হবে ?

—যাকগে, সে তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে। এই ধরো মনি অর্ডারের রসিদ দুটো। ওর কমিশন আব আমার প্রাপ্য সহ মোট টাকা ঐ স্লিপে টুকে রেখেছি। দেবযানী মাষ্টারের হিসাব চুকিয়ে দিয়ে বলে—সেই সাত-সকাল থেকে এসে কত জ্বালাতনই না করলাম বিশেষ করে দিদিমাকে তা আর বলবার নয়। এর মধ্যে যদি কিছু অন্যায় ঘটে থাকে ক্ষমা করবেন, দিদিমাকেও করতে বলবেন। আসবার সময় তাঁর নিকট ভাল করে বিদায় নিয়ে আসতে পারি নি, মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করে উঠলো। কথা বলতে পারলাম না— পালিয়ে এলাম।

—কি যে বলো দিদি, অন্যায়টা আবার তোমার কোথায় হলো ? আত্মীয় স্বজন বিহীন বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে আছি—একা একা হাঁপিয়ে উঠি। আমাব তো তবু কাজ কর্মেব বাস্ততার মধ্যে দিন কেটে যায়। কিন্তু ওঁর কথাটা একবার বিবেচনা কব—একা একা কি ভাবে যে সময় কাটে। লোকজন এলে—বিশেষ করে তোমাদেব মতো নাতি নাতনীর বয়সী হলে কত যে ভালো লাগে আব আনন্দ পান। কাজেব ঝঞ্ঝাটে নিজে হাজির না থাকতে পাবলেও মনে মনে তোমাদের উপস্থিতি অনুভব করে তৃপ্তি পাই। উনি তো ছাড়তে চান না। এখন গেলে দেখতে পাবে মুখ ব্যাজার করে বসে আছেন আর হয়তো কাপড়েব খুঁটে চোখ মুছছেন।

দেবযানী কেমন যেন অভিভূত। কোন রকমে শুধু চলি—উচ্চারণ করেই পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করে। গেট পার হবার মুখে মাষ্টারেব ডাকে আবার তাকে থামতে হলো। তিনি কাছে এসে নিম্ন স্বরে বললেন—সুদেষ্ণাকে খবর দিয়ো যে দুই একটা জব্বর রুই কাতলা গাঁথবার তালে আছি। চার ফেলে ছিপ ধরে বসে আছি। কাতলা ডুবালেই কষে টান মাববো। খেলিয়ে পাড়ে তুলতে পারলেই খবর দেবো।

পোষ্ট আপিসের গেট পার হতেই সৈরভীর সঙ্গে দেখা। সে কাপড়ের আড়াল থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে তার দিকে এগিয়ে ধরে বললে—মা দিয়েছেন। এই ছোট্ট হালকা কাগজের পুরিয়ার ভেতর এমন কি থাকতে পারে ! হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গিয়ে মনে হলো যেন এক মমতাময়ী কোমল হৃদয়া বৃদ্ধার স্নেহের স্পর্শ পেলো। অন্তমনস্কের মতো

সৈরভীকে বলে—আচ্ছা মাকে বলো। কি বলবে সেটা ব্যাখ্যা না করেই দেবযানী দ্রুত হেঁটে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

সৈরভী কি বলবে তা বুঝতে না পেরে দেবযানীর চলার পথের দিকে বিমূঢ় ভাবে চেয়ে থাকে। তারপর আহা ঢং দেখে আর বাঁচি না—গজর গজর করতে করতে সে প্রস্থান করে।

সুদেষ্ণা অর্পিত কর্ম নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হওয়াতে দেবযানী নিজেকে অনেক হাল্কা বোধ করে। মাষ্টারবাবু এবং তাঁর গিন্নীর—সত্যিকারের দুটি দরদি মনের স্নেহের ছোঁয়ায় তার হৃদয় মনেও যেন পরিবর্তন সূচিত করছে। যে-মন নিয়ে সে এসেছিলো আর যে মন নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছে উভয়ের মধ্যে যেন বিস্তর ব্যবধান। চলতে চলতে তার মনে হলো যাবার কালে যখন সে এ পথ ধরে গিয়েছিলো তখন যেন এর ভিন্নরূপ ছিল। বাঁ দিকে বহুদূর বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। তারই শেষ প্রান্তে লাল খোয়া সুরকির এই পথটাকে মনে হচ্ছে একখানা হলুদ শাড়ির লাল পাড় এঁকে বেঁকে রেল লাইন পর্যন্ত প্রসারিত। রাস্তার ডান পাশে ছোট ছোট বাগান-ঘেরা বাড়ি। রাস্তাটার দু'দিকে সাড়ি সাড়ি বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে উভয় দিক থেকে ডাল পালা ঘন সবুজ পল্লবের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ছত্রাকারে রাস্তাটাকে ঢেকে রেখেছে। এখানে ওখানে ছাল বাকল-ওঠা পত্র বিহীন মহীরুহ শুষ্ক ডাল পালা নিয়ে আকাশের গা ফুঁড়ে নাঙা দাঁড়িয়ে আছে। এমন জল-ছাওয়া সুধা-শ্যামলিম পরিবেশে এ দৃশ্য যেমনি বেমানান তেমনি চক্ষুপীড়াদায়ক। আরো কিছুদূর এগোতেই রেল-ঘুমটি। উভয় দিকের গেট বন্ধ। লাইনসম্যান সবুজ নিশান হাতে দাঁড়িয়ে। দেবযানী চলার গতি শ্লথ করে। লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে চলা দরকার মনে করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা সমীচীন মনে হলো না। দূরে রেলগাড়ির শব্দ ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। কাগজের পুরিয়াটা তখনো তার হাতে ধরা। হাত বদল করতে গিয়ে খেয়াল হতেই মাষ্টার গিন্নীর কথা মনে পড়ে। বিদেশ বিভুঁইয়ে এই বর্ষীয়সী মহিলার স্নেহ ভালবাসা স্মরণ করে দেবযানী আপন হৃদয়ে তাঁর জন্য সহানুভূতি ও বেদনা অনুভব করে। নিজের দুর্বলতায় সে অবাক হয়। রেলগাড়ি ততক্ষণে ঘুমটি ছাড়িয়ে ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গেট খুলে যায়।

ঘুমটি ছাড়াতেই দেবযানী রাস্তায় আগের তুলনায় পণ্যসম্ভার নিয়ে স্ত্রী, পুরুষ, সাইকেল আরোহী, মাল বোঝাই গরুর গাড়ির আনা গোনা বেশী দেখতে পায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের উত্তাপ প্রখরতর অনুভূত হচ্ছে। ডাক বাংলো রাস্তায় প্রবেশের মুখে দেবযানী চতুর্দিক ভালো করে লক্ষ্য করে। সন্দেহাত্মক কিছু নজরে পড়ে না। কেবল রাস্তার বাঁকে নিচে নালার ধারে কতগুলি শুকনো কাঠ জড়ো করা আছে যা যাবার সময় তার চোখে পড়েনি। হয়তো গাছ থেকে ভেঙ্গে-পড়া শুকনো ডাল পালা কেউ কুড়িয়ে রেখে গেছে। সময় মতো নিয়ে যাবে।

ডাক বাংলো পৌঁছে সুদেষ্ণার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেবযানী বাধা পায়—দরজা বন্ধ! শহরকে ডেকে জানতে পারে তিনি তখনও ফেরেন নি। সেই কোন সকালে বেরিয়েছেন! এত দেরী তো হবার কথা নয়! দেবযানী উৎকণ্ঠিত হয়।

বেশী দিন হয় নি দেবযানী সুদেষ্ণার সঙ্গে কাজ করছে। এরই মধ্যে সে তাঁর যতটা পরিচয় পেয়েছে তাতে তার মনে হয়েছে এমন অনুকরণীয় চরিত্র সত্যিই দুর্লভ। পর দুঃখে কাতর, পরোপকারে সদা-উন্মুখ, অনলস, কর্তব্যকর্মে কঠোর নিষ্ঠা ও অবিচল দৃঢ়তা! শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে—অতি আপনজন বলে ভাবতে ভালো লাগে। সর্বত্র সকলেই তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সমীহ করে কথা বলে এবং ভালোবাসে।

বিপ্লবীদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে কিছু কিছু শুনে থাকলেও দেবযানী বিশেষ কিছু এখনো অবধি জানেনা। একমাত্র অনুতোষ ছাড়া কাউকে সে জানেনা, দেখে থাকলেও চেনে না। তবে আখড়াটা যে বিপ্লবীদের একটা কর্ম-কেন্দ্র তা সে বুঝেছে। সেখানে সুদেষ্ণার প্রতিপত্তি অসাধারণ। লক্ষ্য করেছে—মহারাজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথাবার্তা বলেন। এ তল্লাটে সুদেষ্ণার মতো জীবন বীমার এজেন্ট খুব কমই আছে। প্রতি বৎসর কোম্পানিকে অনেক টাকার বীমাপত্র দেন। তাঁর নানা কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে বীমার কাজ কর্ম বোধ হয় তাঁর মহান আদর্শ রূপায়নে এবং উদ্দেশ্য সাধনে এক মস্ত হাতিয়ার। আয় করেন প্রচুর ব্যয় করেন ততোধিক! এই ব্যয় কতটা তাঁর নিজ প্রয়োজনে আর কতটা তার দেশ ও দশের হিতসাধনে তা বোঝা দুরূহ। তাঁর আপন বেশভূষা, থাকা খাওয়া অতি সাধারণ—প্রায় সন্ন্যাসিনীর মতো। নিজ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কিছু

ব্যয় করতে হলেই বলেন—অর্থ কোথায়? আর আত্মীয় স্বজন? তাদের সম্পর্কেও নীরব নিস্পৃহ।

কর্ম অন্তে উভয়েই যখন বিশ্রামের জন্য একত্র হয় দেবযানীর মনে সুদেষ্ণার পরিচয় জানবার প্রবল আগ্রহ জাগে। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়েই তাকে নিবৃত্ত হতে হয়। তাঁর চোখ মুখ অপরিসীম ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, নয়নের দীপ্তিতে রয়েছে আষাঢ়ের জল ভারানত ঘন কালো মেঘের ছায়া। দেবযানী সন্দেহে পীড়িত—তবে কি দিদির এ সবই বাহ্য। তাই এই নিরলস কর্ম-চাঞ্চল্য—শুধু নিজেকে ভুলে থাকাব কৌশল আর অপরকে বুঝতে না দেবার ছল। তাঁর এই নিঃসঙ্গ জীবনের পশ্চাতে তা হলে কি কোন গভীর দুঃখ আর অপরিসীম বেদনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে, ভেতরে তার চোখের জল? এই হঠাৎ আবিষ্কারে দেবযানী চমকে ওঠে! তার জীবনে সবে যে নাটকের সূত্রপাত দিদির জীবনে কি তার বিয়োগান্ত দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটেছে! দিদির জন্য সহানুভূতিতে তাব মন গলে যায়, হৃদয় ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

পথ শ্রমে ক্লান্ত দেবযানী ঘরে ঢুকে আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চক্ষু মুদে থাকে। অনুভূতিবিহীন অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে সে সোজা হয়ে বসে তারপর অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে স্নানাগারে প্রবেশ করে। ড্রেসিং টেবিলেব সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কাঁটা খুলতে গিয়ে মুকুরে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে দেবযানী চমকে ওঠে! তার একি চেহারা হয়েছে! শুষ্ক মুখ, উষ্কখুষ্ক চুল, চোখ বসে গিয়ে নিচে কালো রেখা পড়েছে! বিগত রজনীর ভয় ভীতি, উদ্বেগ উত্তেজনা, আশা নিরাশা, পাওয়া না-পাওয়া—সব কিছুর ধকল তাকে যেন একেবারে চুপসে দিয়েছে। অথচ তার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার আশা নিরাশা দ্বন্দ্বেব এতদিনে পরিসমাপ্তি ঘটেছে! যাকে সে ভালোবাসে, যাকে পাওয়াব জন্য সে এক কণ্টকাকীর্ণ রক্তরাঙা পিচ্ছিল পথে প্রবেশ কবেছে, তার ভালোবাসা পেয়ে সে সফল ও ধন্য হয়েছে! সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে, স্বীয় শপথ স্বীকৃতি লঙ্ঘন করে, দলের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে তার প্রেমাস্পদ অকপটে তার মনের কথা দুটি শব্দে ব্যক্ত করে গেছে—তোমাকে ভালোবাসি।

সে আজ বিজয়িনী। এক সেবাব্রতীর নিষ্ঠা, দেশের মুক্তি সাধন-রত ব্রহ্মচারী তপস্বীর ব্রত ও তপস্যা ভঙ্গ করেছে। আর কি চাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে—নারীর চিরন্তন কামনা বাসনা—বাসর সজ্জা,

মিলন ? সেই মুহূর্তে আয়নায় নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই সে স্তম্ভিত—নিজেকে বুঝি নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। অবাক বিস্ময়ে আপন প্রতিচ্ছবির যৌবনোদ্দীপ্ত প্রতিটি অঙ্গ-রেখা নিরীক্ষণ করতে থাকে ! সে দৃষ্টি যেন কোন নারীর নয়—এক পুরুষের, আপন বল্লভের। মুগ্ধ সম্মোহিত প্রলুব্ধ নয়নে আপন প্রিয়াকে দেখছে। অসীম পুলকে তার প্রতি অঙ্গ শিহরিত, পদদ্বয় বুঝি নৃত্যছন্দে আন্দোলিত ? সে যেন নৃত্য-পটিয়সী অপ্সরা রম্ভা—তার লাস্যময় লীলায়িত পদক্ষেপে যেন বিজুরী বিচ্ছুরিত। নৃত্যের তালে তালে প্রতি অঙ্গের আবরণ উন্মোচন করে কঠোর তপস্যামগ্ন জাবালির তপোভঙ্গে মত্ত। বিজয় গর্বে উৎফুল্ল, আনন্দে আত্মহারা আর লালসায় উন্মত্ত দেবযানীর মনে হলো—সে বুঝি সৃষ্টির আদি মানবী ইভ আর অনুতোষ আদি মানব আদম ! উভয়ে হাত ধরাধরি করে নিবিড় আদিম অরণ্যে অন্তর্হিত হলো।

দেবযানী আর দাঁড়াতে পারছেনা। অভূতপূর্ব উত্তেজনায় শরীর থর থর করে কাঁপছে। হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলটা ধরে ফেলে। সারা শরীরে অদ্ভুত অভিনব এক অনুভূতি আর জ্বালা অনুভব করে। শরীর জুড়োবার জন্য দেবযানী শুভ্র জলাধারে নেমে কল খুলে দেয়। অবিরল জলধারার হিম-শীতল স্পর্শে ঠাণ্ডা হয়।

সুদেষ্ণা একটা রঙ-চটা টিনের সুটকেশ হাতে নিয়ে ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাংলোর টিলাটার নিম্নদিকের সর্পিল পথের দু'দিকের গাছপালা ঝোপঝাড় রাত্রির বিলীয়মান অন্ধকারকে তখনো যেন বুকে ধরে রেখেছে। স্থানে স্থানে আবছায়া অন্ধকার। দেবযানীকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তার যাত্রা বিলম্বিত হয়েছে। সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছতে না পারলে কর্ম-বিপর্যয়ের আশংকা। সুদেষ্ণা চলার গতি দ্রুত করে।

গত রাত্রে অনুতোষের কথাবার্তায় সুদেষ্ণার নিকট এখানে তার আগমনের আকস্মিক নির্দেশের কারণ স্পষ্ট হয়েছে। অনুতোষ পরি-চালিত অভিযান লব্ধ অর্থ সামলে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জিম্মাদারি তার উপর বর্তেছে। অনুতোষ নিঃসন্দেহে উপযুক্ত পাত্র। অভিযানের সফলতা বিফলতা সর্বক্ষেত্রেই শুধু পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরি-

চালনার উপর নির্ভরশীল। ইতিপূর্বে নানা কর্মের মধ্যে দিয়ে সে নিজের দক্ষতা ও বিচক্ষণতার অনেক প্রমাণ দিয়েছে। এই অভিযানে ইতিমধ্যেই সে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে। দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আনা'গোনা করে অভিযানের লক্ষ্যস্থলের ব্যবধান পনের থেকে পাঁচ মাইলে কমিয়ে এনেছে। তাছাড়া সাধুবাবা সেজে ধুলো, বালি, জল-পড়া ও তাবিজ কবজ দিয়ে যে টাকা সংগ্রহ করেছে তার অঙ্কটাও নেহাৎ নগণ্য নয়! বাহাদুরই বলতে হবে!

অর্থের অভাব লক্ষ্যস্থলে পৌছতে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের সভ্য ও অন্যান্যদের কাছ থেকে যে চাঁদা সংগৃহীত হয় তাতে দৈনন্দিন খরচেরই সংকুলান হয় না। সেবাদলের মাধ্যমে আহৃত অর্থের সিংহ ভাগই তাদের প্রয়োজনে—চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম, ওষুধ বিষুধ ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। সুতরাং অর্থের প্রয়োজনে লুণ্ঠন ভিন্ন অন্য পন্থা নেই।

এই সব চিন্তা করতে করতে সুদেষ্ণা বড় রাস্তায় পড়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে পূর্ব দিকে চলতে থাকে। শরতের প্রভাত—হিমেল হাওয়ায় নানা ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। পূর্ব দিগন্তে নবারুণ পাহাড়ের আড়াল থেকে ঝিকিমিকি দিয়ে উঠছে। গাছে গাছে তার সোনালা আভায় নবম হাসি হাসি ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ বাতাস নানা পাখির কঁকলিতে মুখর। রাস্তা ফাঁকা। এত সকালে লোক চলাচল শুরু হয়নি। পাহাড়ের এ অঞ্চলটায় জনবসতি নেই। সংবৎসর কেবল যাত্রী, পাণ্ডা, পুজারি, ফলমূল মিষ্টি ইত্যাদি পূজার উপকরণ বিক্রেতা, ভিক্ষুক, আর কাঠুরিয়া এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। বর্ষাকালে তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার উভয়দিকে বেত, বাঁশ, শিমুল, হরিতকি, আমলকি, বহেড়া, নাম-না-জানা নানা বৃক্ষ আর লতাপাতার ঠাস-বুনোনির নিবিড় অরণ্য। কোথাও অতলস্পর্শী গভীর খাদ রাস্তার ধার থেকে খাড়া নেমে গেছে। চাইলে মাথা ঘুরে যায়। কোথাও রাস্তার পাশে খেয়ালি নির্ঝরের জলধারা পর্বতগাত্র ভেদ করে সর্পাকারে মন্দগতিতে বয়ে চলেছে। কোথাও বা ঐ জলধারা স্ফীতকায় হয়ে ঝরঝর শব্দে গভীর খাতে নিপতিত হচ্ছে। কোনখানে তা উপচে পড়ে রাস্তার অপর দিকে নেমে উপলখণ্ডে আছড়ে পড়ে অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে।

রাস্তার উপর এখানে ওখানে প্রস্তরীভূত শিলা গাত্রের ফাটল দিয়ে

পর্বত অভ্যন্তরস্থ নির্গলিত বাষ্প বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে উঠে লকলকে শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ে আবার নিবে যাচ্ছে। ঝাটলের চতুর্দিকে যাত্রীদের পূজার অর্ঘ্য—স্তূপীকৃত পুষ্প বিল্বপত্র অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। অপরূপ তরলে, শ্যামলে, কোমলের সঙ্গে রুক্ষ কাঠিন্যের এক অদ্ভুত মিতালি। মন বিচিত্র ভাব-রসে ভরে উঠে এক কল্পলোকে বিচরণ করে। এই নির্জন ভাবগম্ভীর পরিবেশে একা চলতে চলতে সুদেষ্ণাও বুঝি ভাবের প্রভাবে আনমনা হয়ে যায়। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে ভোরের ভৈরবী রাগিণী অনুরণিত হয়। মনের মণিকোঠায় অতি গোপনে সযত্নে রক্ষিত স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গিত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত পূজারী এক মহাপ্রাণ সাধকের সৌম্য মৌন মূর্তি অকস্মাৎ হৃদয়পটে ভেসে উঠে।—যিনি বহু বিধি নিষেধ ও শপথের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে আপন মহিমায় উজ্জ্বল ও ভাস্বর! যাঁর কাছে গেলে মনে হয় ইনি বহুদূরের আর দূরে গেলে মনে হয় অতি কাছের—হাত বাড়ালেই বুঝি ছোঁয়া যায়! সুদেষ্ণার অন্তরের ক্ষণিক দুর্বলতা দীনতা এসব ভাবালু চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে আপন অজ্ঞাতে প্রকট হতেই সে লজ্জিত বোধ করে—এ তো একপ্রকার ভাবের ঘরে চুরি—অবৈধ কামনা বাসনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্বীয় তনুর উন্মোচন! এর আর অন্যকোন ব্যাখ্যা নেই! এসবের মতো এতবড় কর্মনাশা উদ্দেশ্য-বিঘ্নকর আর কিছু হতে পারে না। কঠোর শপথ-বাণী স্মরণ হতেই সে আত্ম-স্খলনের জন্য নিজেকে চক্ষুরাঙিয়ে শাসন করে।

অকস্মাৎ হনুমানের কিচির-মিচির কানে আসতেই সুদেষ্ণার চলার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। চেয়ে দেখে রাস্তা অবরোধ করে কিষ্কিন্ধ্যা তনয়েরা বসে আছে আর তাদের কাচ্চাবাচ্চা গুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে লতা-পাতা ছিঁড়ে ঝোপ ঝাড়ের ডালপালা ভেঙে নর্তন কুর্দন লম্ফঝম্পে ব্যস্ত। আরো অগ্রসর হওয়া সুদেষ্ণা সমীচীন মনে করে না! যদিও অত্যাচারিত না হলে এরা যাত্রীদের আক্রমণ করেছে এমন কথা সে এ-তল্লাটে শোনেনি। তবে কলা মূলা ছোলার লোভে তারা পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে এবং তা না পেলে যাত্রীদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য কখনো সখনো চড় চাপড়ে তাদের নাজেহাল করেছে বলে শুনেছে। সুতরাং খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঠিক নয় ভেবে সে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই উঁকি দিয়ে দেখে হনুমানগুলির মধ্যে ব্যস্ততার সাড়া পড়েছে। বাচ্চাগুলি দৌড়ে

এসে মায়ের কোলে আশ্রয় নিতেই তাদের কোলে পিঠে করে সকলে তাড়াতাড়ি রাস্তা ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুদেষ্ণাও আড়াল থেকে বেরিয়ে ত্বরিৎ গতিতে গন্তব্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর আগমনও বাড়তে থাকবে। আজ ভাদ্রের কৃষ্ণা চতুর্দশী—আগামীকাল অমাবস্যা। এই দুই রাত্রি অগণিত দেবদর্শনার্থীর ভিড় হবে। দূরে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দিকে চেয়ে সুদেষ্ণার মনে হলো অতিকায় এক তপস্বী জটাজুটধারী মহাপুরুষ বুঝি বল্কল পরিধান করে ধ্যানমগ্ন। কতযুগ ধরে তিনি এভাবে স্তিমিত নেত্রে বসে আছেন কে জানে! নবারুণের আলোকচ্ছটায় পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত শ্বেতশুভ্র প্রস্তর নির্মিত দেবাদিদেবের মন্দিরটি শুভ্রতর দেখাচ্ছে। মন্দির শীর্ষস্থ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত ধাতুব পাত্র থেকে বিচ্ছুরিত তির্যক রশ্মি যেন মহাযোগীর তপস্যালব্ধ তৃতীয় নয়নের অলৌকিক জ্যোতির স্ফুরণ! দূর থেকে পর্বতটাকে কাছে মনে হলেও এগোবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন পেছনে সরতে থাকে—পথ যেন আর শেষ হয় না!

সুদেষ্ণা জোর কদমে চলেছে। দূরে পর্বতগাত্রে লোক চলাচল দৃষ্ট না হলেও মাঝে মাঝে হরহর মহাদেব ধ্বনি তার কানে আসছে। পর্বতের চড়াই আরম্ভ হবার আগে তার নিম্ন দেশে রয়েছে এক বিশ্রামাগার—পাণ্ডারা বলে পাতালপুরী। পার্শ্বদেশেই এক ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী—পর্বতের উঁচুদেশ থেকে রূপালী রেখায় নেমে এসেছে। শত সহস্র ছোট বড় উপলখণ্ডের বক্ষের উপর দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে। সারা বৎসরই জল থাকে তবে বর্ষাকালে তার ভিন্নরূপ; ফেঁপে ফুলে তখন তার গতি প্রচণ্ড, ভীম-নাদ ও ভীষণ দর্শন—নাম মন্দাকিনী! ভগীরথ দিব্যরথে চড়ে গঙ্গপ্রবাহ নিয়ে এই পাতালপুরে উপনীত হন। পুণ্যতোয়ার স্পর্শলাভে ভস্মীভূত ষাটসহস্র সগর সন্তান মুক্তিলাভ করে এখান থেকে স্বর্গারোহণ করেন। মন্দাকিনীর জলধারা থেকে এক কৃত্রিম কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তার ধারে শান-বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। যাগ, যজ্ঞ, হোম, শ্রাদ্ধ শান্তি সহ নানা ক্রিয়াকলাপ এখানে সম্পন্ন হয়। পিতৃপক্ষ উপলক্ষে দান-ধ্যান তর্পণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। কুণ্ডের অনতিদূরে ছোট্ট একটি গুহা। ভেতরে বৃষারূঢ় ঈশান-ঈশানীর শ্বেত-পাথরের মূর্তি। তার থেকে কিছু দূরে পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ এক বিশাল হনুমানের মূর্তি—গদাস্কন্ধে লম্ফনোদ্যত—আপাদমস্তক তেল সিঁদুর মণ্ডিত এবং পাদদেশে পুষ্প বিল্বপত্রের ছড়াছড়ি।

ঐ পাতালপুরীতেই তার জন্য অমুতোষের অপেক্ষা করার কথা। অনেকক্ষণ ধরেই হয়তো সে তার আগমন প্রতীক্ষা করছে। এদিকে রাস্তা ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। সম্মুখে শানবাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠেছে। দ্রুত হাঁটা দুঃসাধ্য। পাহাড়ের দুর্গম বন্ধুর পথে বিপজ্জনক স্থানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নানা বিত্তশালীদের অর্থানুকূল্যে এরূপ বহু সিঁড়ি ও সেতু তৈরি হয়েছে—একই সঙ্গে অক্ষয় পুণ্যার্জন ও স্মৃতি-রক্ষা সাধন। সিঁড়ি ও সেতুর গায়ে প্রস্তর ফলকে স্বর্গত প্রিয়জনের নামের সঙ্গে দাতার নামও উৎকীর্ণ। দূর দূর দেশের ধনপতিরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই ভাবে অর্থব্যয়ে দেবদর্শনার্থীদের সেবা দ্বারা পরলোকে সদ্‌গতি লাভের কামনা জানায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে সুদেষ্ণার খেয়াল হয়—এভাবে আর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নয়। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চতুর্দিক দেখে সট করে সে পাশের এক ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হয়। কিছুক্ষণ পরেই এক রক্ত-পটাম্বরা নবীনা সাধিকা আবির্ভূত। শুষ্ক রুক্ষ আলুলায়িত কুন্তল জটার মতো করে মাথার উপর বিন্যস্ত, ললাট সিন্দুর লাঞ্ছিত—মধ্যখানটায় ত্রিশূলের মতো। ডান হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। কিছুক্ষণ পূর্বেকার পীন-পয়োধরা ক্ষীণকটি নিতম্বিনী রমণীর সঙ্গে এর কোন মিল নেই, কেবল বাম করধৃত সুটকেশটি ছাড়া। এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন! চোখে মুখে তপস্বিনীর কাঠিন্যের সঙ্গে ভাগবত রসে আপ্লুত তিতিক্ষার ভাব—দর্শন মাত্রই ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে।

এই বেশেই—জয় মহাদেব, বলে সুদেষ্ণা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালপুরীতে উপনীত তখন সেখানে কয়েকজন পাণ্ডা ভিন্ন আর কেহ নেই। তারা আপন আপন ফল মূল, পুষ্পপত্র, কোষাকুষি ইত্যাদি পূজার সাজসরঞ্জাম গোছাতে আর যাত্রী সমাগমে কার কত আয় হবে সে হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। কিছুটা বিরক্তি আর খানিক বিস্মিত দৃষ্টিতে নবীনা সন্ন্যাসিনীর দিকে চেয়ে তারা নিজ নিজ কর্মে মনোনিবেশ করে। পুণ্য-তিথি উপলক্ষে তীর্থক্ষেত্রে অধিক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম পাণ্ডাদের পছন্দ নয়। এঁদের নিকট থেকে তাদের কোন অর্থাগম তো হয়ই না, অধিকন্তু যাত্রীরা সাধু সন্ন্যাসীর চারদিকে ভিড় করে থেকে তাদের ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটায়।

অমুতোষের অনুপস্থিতিতে সুদেষ্ণা উৎকণ্ঠিত। সে অস্থির চিত্তে

পাতালপুরীতে অধিষ্ঠিত দেবদেবীদের দর্শন ও প্রণাম করে কুণ্ডের জল মাথায় দিয়ে আবার এসে বিশ্রাম বেদীতে উপবেশন করে। কিন্তু বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা অনুচিত। দলের বিধান অনুযায়ী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদনের ভার-প্রাপ্তদের সবসময়েই গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই কর্ম-পরিচালনা ও সম্পাদন করা আবশ্যক। পাণ্ডাদের চোখ-মুখের ভাব দেখে সুদেষ্ণার মনে হলো তারা যেন ক্রমেই তার সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠছে। তার চলা ফেরা বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। হাতের রুদ্রাক্ষের জপমালা কপালে ছুঁইয়ে সুদেষ্ণা—জয় শিব শংকর, বলে উঠে পড়ে। পাতাল থেকে উঠবার সিঁড়ির মুখে আসতেই উচ্চকণ্ঠ-নিসৃত হর হর বম্ বম্ ধ্বনি তার কর্ণগোচর হয়। অনুতোষের দলের কণ্ঠস্বর অনুমান করেই সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। তারপর অদূরে রাস্তার ধারে যে মস্ত পাথরটা মাথা উঁচিয়ে আছে তার উপর উঠে দাঁড়ায়। সেখান থেকে দেখতে পায় পঞ্চপাণ্ডবের মতো জোটবদ্ধ হয়ে একদল সন্ন্যাসী উপরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের পশ্চাতে আরেক দল যাত্রী যে আসছে তাও সুদেষ্ণার দৃষ্টি এড়ালো না।

অনুতোষের অপ্রত্যাশিত বিলম্বের জন্য পাতালপুরীতে তাদের একত্র হওয়া কোন মতেই কার্যকরী করা সঙ্গত নয়—বিশেষ করে পাণ্ডাদের ঔৎসুক্যের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং তন্মুহূর্তেই আপন কর্তব্য স্থির করে নেয়। পাষাণ স্তূপ থেকে নেমে অনুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রাস্তার পাশে আসন করে বসে অর্ধনিমীলিত নেত্রে রুদ্রাক্ষের মালা জপতে থাকে। এসব রাস্তার ধারে যোগাসনে সাধনারত নানা সাধু সন্ন্যাসী ভৈরব ভৈরবীদের দেখা যায় এবং তা লোক-চক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনুতোষ সদলে সন্ন্যাসিনীর সম্মুখ দিয়ে চলেছে। আশ্চর্য কেউ তাকে দেখে চিনতে পারে না। অনন্যোপায় সুদেষ্ণা তখন সতর্ক দৃষ্টিতে চার-দিক চেয়ে—অনুচ্চকণ্ঠে—প্রভাত বলে ডাক দেয়। দলের সর্বশেষ সন্ন্যাসী নিজ নাম শুনে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এমন অপরিচিত অজ্ঞাত স্থানে কেই বা তাকে চেনে আর নাম ধরে ডাকতে পারে! সশঙ্ক-বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পায়না। সন্দেহ হলো তবে কি সে ভুল শুনেছে? কিন্তু পর মুহূর্তেই তার দৃষ্টি পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট সন্ন্যাসিনীর প্রতি নিবদ্ধ হতেই তার হাতের ইংগিতে প্রভাত যে বার্তা পেল তা দলপতির নিকট পৌঁছে দেবার জন্য সে ছুটে যায়। বার্তা

পেয়ে অনুতোষ বুঝলো যে তার দেরীর জন্যই দিদিকে এ পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। সুতরাং পূর্ব ব্যবস্থা বাতিল করে সে সদলে রাস্তা ধরে সম্মুখ দিকে চলতে থাকে।

সুদেষ্ণা শিলাসন থেকে উঠে পড়ে। পুরোবর্তী সন্ন্যাসীরা পাতাল-পুরীর সিঁড়ি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুদেষ্ণা দূরত্ব বজায় রেখে তাদের অনুগমন করতে থাকে। কিছুদূর এগোতেই একটা কাঠের সাঁকো। সেটা পেরিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে সে কাউকে দেখতে পায়না। সামনেই আবার চড়াই শুরু হয়েছে। রাস্তার বামে ঝোপঝাড়, লতাপাতা, গাছপালার ঘন সবুজ বন। ডান দিকে গভীর খাদ—চাইলে মাথা ঘুরে যায়। অনুতোষ দলবল সহ যখন রাস্তায় নেই তখন সে নিশ্চয়ই সকলকে নিয়ে ঐ বনের মধ্যেই ঢুকেছে। নচেৎ যাবে কোথায়? হাওয়ায় তো মিলিয়ে যেতে পারে না!

এই ভেবে সুদেষ্ণা বনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের পায়ের চিহ্ন খুঁজে বেড়ায়। পায়ের চিহ্ন তো দূরের কথা কোথাও লতাপাতা ভুমড়নো মোচড়ানো, কিম্বা ডালপালা ভাঙা দেখতে পায় না। কোন গোপন পথেরও সন্ধান মেলে না। এভাবে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। অগত্যা লতা পাতার বেড়াজাল থেকে কোন প্রকারে গা বাঁচিয়ে সেও বনের ভেতর ঢুকে পড়ে। চলতে চলতে তার নজরে আসে যে বনের গাছপালার ঠাস বুনোনি ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে। আরো কিছু দূর যেতেই অবাক হয়ে দেখে অগুনতি ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় পাথরের চাঁই স্কন্ধকাটা কালো কালো দৈত্যের মতো কাত হয়ে পড়ে আছে। তাদের পার্শ্বদেশের ফাটল দিয়ে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো লকলকে জিহ্বা মেলে পাথরের গা বেয়ে উঠছে আর নামছে। যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে কেবল একই দৃশ্য। তার পরেই আবার গভীর অরণ্য—প্রখর রৌদ্রকরোজ্জ্বলে যেন আরো নিবিড় সবুজ ঘন। নানা ফল ফুলের গন্ধ। সেই সঙ্গে ভূপৃষ্ঠ থেকে উদগত বাষ্পের কড়া গন্ধও নাকে আসছে—নানা গন্ধের মহোৎসব। এমন ভয়াল সুন্দর অদ্ভুত পরিবেশে সুদেষ্ণা বুঝি ক্ষণেকের তরে অন্যমনস্ক হয়ে চলেছিল। নচেৎ পাশের এক ঝোপের আড়াল থেকে অনুতোষের আবির্ভাব কেন সে টের পেলো না।

—দিদি, ডাক দিয়েই অনুতোষ সামনে এসে দাঁড়ায়।

১৯

সুদেষ্ণা হেসে বলে—খুব লুকোচুরি খেললে! আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে শোধবোধ করে নিলে তো! কিন্তু যদি ভুল করে অন্য দিকে চলে যেতাম!

—আপনার ভুল হবে না জানতাম, তবু আপনাকে পথ দেখিয়ে আনবার জন্য আমাদের একজন তো অলক্ষ্যে অপেক্ষা করছিলো। আমাদের গণ্ডী পেরিয়ে গেলেই আপনাকে সাংকেতিক আহ্বান জানাতো। আপনার এমন ছদ্মবেশ আমি ধারণা করতে পারিনি। এই বেশভূষায় আপনাকে চিনতে পারে এমন সাধ্য কার! টেগার্ট আর মজুমদারের বাঘা বাঘা টিকটিকি গিরগিটি তো দূরের কথা এমন যে চতুর গোয়েন্দা চূড়ামণি শার্লক হোমস তিনি শুদ্ধ বুদ্ধু বনে যেতেন।

চলতে চলতে সুদেষ্ণার প্রশ্ন—আজকে রাত্রের অভিযানে কেউ যদি আহত এবং তা যদি গুরুতর হয় তখন কি ব্যবস্থা করবে? এই ডাকগাড়ি এ তল্লাটে খুবই বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ। হামেশাই বড় বড় সিভিল ও মিলিটারি সাহেব সুবা এতে যাতায়াত করে। সশস্ত্র পুলিশ মিলিটারিও রক্ষক হিসেবে কখনো সখনো থাকে। গাড়ি আটক করে মেইল ভ্যান লুণ্ঠিত হচ্ছে জানতে পেরে যদি বেরিয়ে এসে গুলি চালায়?

—সে সময় ওদের দিলে তো! অভাবিত কিছু না ঘটলে প্ল্যানমাফিক ঘড়ির কাটা ধরে আমাদের কর্ম ফতে করতে মাত্র আট থেকে দশ মিনিট লাগবে। রিহার্সেল দিয়ে পরখ করেছি। একবার ভাবুন অমাবস্যার রাত, ঘোর ঘনঘুট্টি অন্ধকার—রাত্রি সাড়ে-এগারটা। যাত্রীরা বিশেষ করে সে সব হোমরা চোমরা ব্যক্তি যাদের কথা আপনি উল্লেখ করলেন—গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। টের পেয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই আমরা সব কিছু লোপাট করে বেরিয়ে যাবো না! তবে এতেও যদি কেউ আহত হয় তার ব্যবস্থা—আঘাত সামান্য হলে ফার্স্ট-এড তো সঙ্গেই আছে। তাতে না হলে আপনার ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবেন। আর আঘাত মারাত্মক হলে আহত-জনের জীবন ওখানেই ইতি। সুদেষ্ণা—হুঁ, বলে চুপ করে যায়। অনুতোষের নিকট এরূপ জবাবই সে প্রত্যাশা করেছিল।

চলতে চলতে তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছে যেখান থেকে সম্মুখে, ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এখান থেকেই পাহাড় ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কিছু দূরে পাথরের নুড়িতে আছাড়

খেয়ে খেয়ে দিকভ্রান্তের মতো মন্দাকিনী সশব্দে দামাল হয়ে ছুটে চলেছে। দিবা রাত্রি তার চলার আর শব্দের বিরাম নেই। বাঁয়ে সবুজ বন-রেখার পরেই রেলের লাইন সরিসৃপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে। তার পরে দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে গাছপালা সহ গ্রামগুলি দূর দিগন্তে সবুজ বিন্দুর মতো। ডান দিকে কিছু দূরে বিস্তৃত রুক্ষ কঠিন নাঙা পাহাড় মাথা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিকের সবুজের মধ্যে একেবারে বেমানান, বেয়াড়া বেঢপ। মনে হয় যেন সবুজ বন্যার প্রতিরোধ কল্পে একটা নেড়া পাথরের দেয়াল উঠেছে। কিন্তু তাতেও সবুজের আক্রমণ থেকে রেহাই নেই। এখানে ওখানে তার শুষ্ক বক্ষের মাঝে ছোট ছোট গাছপালা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কোথাও বা তা মহীরূহ রূপে প্রস্তরের পাঁজর বিদীর্ণ করে অক্টোপাশের মতো ছোট বড় শিকড় মেলে জড়িয়ে ধরে তার শুষ্ক বক্ষ থেকে রস আহরণ করে সগর্বে দাঁড়িয়ে যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। অদূরে একটা বিরাট পাথরের চাঁই ভূপৃষ্ঠ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে অর্ধেক উঠে আছে। মনে হয় যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক অতিকায় জীব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পিঠের মাঝখানটা অমসৃণ ও কুঁজো।

অকস্মাৎ অনুতোষ সুদেষ্ণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দৌড়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতিতে ঐ অতিকায় পাথরটার উপর উঠে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সুদেষ্ণাকে ডেকে বলে—আপনাকে আমাদের কর্মকেন্দ্রের অবস্থানটা বুঝিয়ে দিচ্ছি দিদি। পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করুন—দূরে সুনীল আকাশের কোলে নবীন সবুজ রেখা। তারই মাঝে মাঝে তাল তমালের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে উত্তাল সাগরের ফেনিল ঊর্মি সূর্য কিরণে চিক চিক করছে। ঘন নীল সবুজের মাঝখানে লৌহবর্ত্ম পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে বক্রগতিতে চলে চলে কেমন অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা হাঁসুলির আকার ধারণ করেছে। এর এক মাথায় ঐ যে ছোট ছোট লাল লাল ঘরগুলি দেখছেন তা হলো এখানের রেল স্টেশন। মাঝের ঘরগুলি পরবর্তী স্টেশন। তারপর হাঁসুলির শেষ মাথা ছাড়িয়ে কিছু দূরেই আমাদের কর্মস্থল। ঐ স্থানের দূরত্ব মধ্যবর্তী স্টেশন থেকে ছয় মাইলের মতো। রেল লাইনের পশ্চিমে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তাও সমান্তরালে চলেছে। ঐ রাস্তা ধরে এগোলে দূরত্ব আরো অধিক। এখন লক্ষ্য করুন আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি তার থেকে আমাদের যুদ্ধস্থলের ব্যবধান উড়ন্ত কাকের ২ মাইল। কিন্তু

আমরা পাহাড়িয়া চড়াই উৎরাই এবং বনবাদাড় ভেঙে যে পথ আবিষ্কার করেছি তা চার মাইলের মতো। সময় লাগে—রাত্রিবেলা রিহার্সাল দিয়ে দেখেছি—চার ঘণ্টা। আজও আর একবার যাতায়াত করে রাস্তার সঙ্গে পরিচয়টা আরো দৃঢ় এবং পথের নির্দেশকগুলি ঠিক আছে কিনা তা সরজমিনে তদ্বির তদারক করবো যাতে দিকভ্রান্তি না ঘটে কিংবা পথ হারিয়ে না যায়।

সুদেষ্ণা অনুতোষের কথার পুনরুক্তি করে—দিক্‌ভ্রান্তি! হ্যাঁ, তাতো হতেই পারে। একে দুর্গম অরণ্য তাতে আবার অমানিশা। পথের নিশান ঠিক রাখা খুবই দুরূহ! সুদেষ্ণার কথা শুনে অনুতোষ পাথরটার উপর থেকে লাফ দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।—সেজন্য চিন্তিত হবেন না দিদি, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, বলেই সে হাত তুলে পাশের ঝোপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সুদেষ্ণা উৎসুক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসু নয়নে অনুতোষের দিকে তাকায়।

—চলুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—বিষয়টা এমন কিছু কঠিন কিংবা জটিল নয়, বলেই অনুতোষ সুদেষ্ণাকে নিয়ে প্রকাণ্ড একটা ঝোপের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেখানে লতাপাতা গাছ গাছড়ার আড়ালে বড় ছোট নানা প্রকার জ্বালানি কাঠ খড় ইত্যাদি স্তূপীকৃত হয়ে আছে। অনুতোষ তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বোঝালো—রাত্রি বেলা এর অগ্নি শিখা আমাদের পথের নির্দেশ দেবে। প্রতি এক মাইল অন্তর অন্তর এভাবে ঝোপঝাড়ের ভেতর জ্বালানি কাঠখড় জড় করে রাখা আছে। যে ভাবে আর যে কৌশলে কাঁচা আর শুকনো কাঠখড় মিলিয়ে এগুলি সাজান হয়েছে তাতে গত রাত্রির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এই জ্বালানি স্তূপ চতুপার্শ্বস্থ ঝোপঝাড় সুদ্ধ প্রায় আট থেকে দশ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন জ্বলবে। ঐ দিকের পোড়া ঝোপটার শিখা লক্ষ্য করে প্রভাত ও অরুণ ঠিকমত পৌঁচেছে। পাহাড়টা এখান থেকে ঢালু হয়ে হয়ে সমতলে গিয়ে ঠেকেছে। সুতরাং অগ্নি শিখা থেকে আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত করবার কিংবা ঢেকে রাখবার মতো মধ্যখানে কোন টিলা বা অন্য প্রতিবন্ধক নেই। এই পাহাড়িয়া অঞ্চলে বনে বাদাড়ে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে দিবারাত্র আগুন জ্বলছে সুতরাং এরূপ বুশফায়ার দেখে লোকের মনে সন্দেহ জাগবারও কোন কারণ নেই।

—উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে—সাবাশ। সুদেষ্ণার কণ্ঠ থেকে উৎসাহ ব্যঞ্জক ধ্বনি নির্গত হয়। তার স্মিত আননে আগামী রজনীর দুঃসাহসিক অভিযানের সফলতা সম্পর্কে কোন সংশয়ের চিহ্ন দেখা দেয়না।

অনুতোষ পূর্ব কথার জের টেনে বলে—আপনি রাত্রি সাড়ে দশটায় এতে অগ্নি সংযোগ করবেন। এই অগ্নি শিখাই হবে আমাদের দিক-নির্ণয় আর সঠিক স্থানে প্রত্যাবর্তনের প্রধান দিশারী। দুর্গম পথহীন অরণ্যে নিঃসীম দিগন্ত বিস্তৃত নিবিড় ঘন অন্ধকারে সঠিক লক্ষ্যের ধ্রুবতারা। ঐ দেখুন ওখানে লতাপাতার আড়ালে আরো শুকনো কাঠ খড় রাখা আছে। প্রয়োজন বোধে তাও ব্যবহার করবেন। এই নিন বলেই বাহুসংলগ্ন গোল করে পাকানো হরিণ চর্মের ভেতর থেকে মোমবাতি ও দেশলাই বার করে সুদেষ্ণার দিকে হাত বাড়ায়। তারপর কিভাবে শুকনো খড়ে আগুন ধরিয়ে কাঠের স্তূপের কোন খানটায় তা সংযোগ করবে তাও হাতে কলমে দেখিয়ে দেয়।

সুদেষ্ণা হেসে বলে—সবই বুঝলাম ভাই, এখন বলো রাত্রির কোন যামে তোমাদের প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করতে পারি।

—তোমরা বলতে শুধু একজনই আপনার কাছে ফিরে আসবে। আর সকলে আপন আপন কর্ম সাঙ্গ করে সরে পড়বে। যে জন নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী আপনাকে মালপত্র সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে না-পাত্তা হয়ে যাবে সে-জন আমি। আমি না এলে প্রভাত। আর যদি কেউ না আসে তবে বুঝবেন বিষম বিপত্তি ঘটেছে। কথার শেষের দিকে অনুতোষের গলার স্বর বুঝি কিছুটা বিকৃত শোনালো—চোখ মুখের ভাবেরও কিছুটা পরিবর্তন দেখালো। সুদেষ্ণা তা লক্ষ্য করে অবাক না হয়ে পারে না।

অসমাপ্ত কথার রেশ টেনে অনুতোষ বলে—সময়ের নির্ঘণ্ট অনুসারে রাত্রির তৃতীয় যামে এখানে ফিরে আসবার কথা। তবে তা সম্ভব না হলে আরো কিছু সময় গ্রেস দেবেন। এখন বিদায় নিচ্ছি—এখনো অনেক কাজ বাকী। কথার শেষে অনুতোষের গলার স্বর স্পষ্ট ধরে যায়। উবু হয়ে সুদেষ্ণার পায়ে হাত দিয়ে নিস্তেজ কণ্ঠে উচ্চারণ করে—আশীর্বাদ করুন দিদি, যেন সফলকাম হই।

সুদেষ্ণা অনুতোষের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরে। মনের উদ্বেগ গোপন করে অনুতোষকে উৎসাহিত করবার জন্যই মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—আমার আশীর্বাদ তো অনুক্ষণ

অভেদ্য কবচের মতো তোমাদের আবেষ্টন করে রেখেছে; চক্রপাণির চক্রের মতোই নিরন্তর তোমাদের অমঙ্গল বিনাশ করে চলেছে। আগামী রজনী আমাদের নিকট সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের সুনিপুণ কর্মকুশলতা, নিখুঁত পরিকল্পনা, অমিত শক্তি আর অসীম সাহস প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সিংহকে বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। বিপ্লবের দেদীপ্যমান রক্তাম্বরে তোমরা নতুন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হবে। সারা ভারত তোমাদের এই অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হবে। ভারতের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে এক নব অধ্যায় রচিত হবে। স্বাধিকার অর্জনে অন্যান্য বীর সংগ্রামী পুরুষদের মতো স্বাধীনতার বেদীমূলে মহান শহিদদের সঙ্গে তোমাদের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের ঘরে ঘরে তা গানে গাঁথায় কবিতায় ও চারণ কবিদের মুখে মুখে গীত হবে। মনশ্চক্ষে ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে বন্দিনী ভারত মাতার অসহায় করুণ রূপ প্রত্যক্ষ কর। অভাব অনটনে ক্লিষ্ট, অনশনে জীর্ণ শীর্ণ, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় জর্জরিত তাঁর কোটি কোটি সন্তান নিঃসহায় নিরবলম্ব দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে চেয়ে এক সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় দিন গুণছে।

বলতে বলতে সুদেষ্ণা অনুতোষের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে যায়। সে মুখ যেন দ্যুতিহীন নিস্তেজ—নাকি তারই চোখের ভুল! আপন মনের ভাব গোপন করে সুদেষ্ণা আবেগভরা কণ্ঠে পুনরায় বলে —গীতা পাঠ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেয়েছি! গীতার সেই শাশ্বত সনাতন বাণী—'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত…' স্মরণ করো। তোমরাই আজ বীর পার্থরূপে ভারতকে অধর্মের কলুষ থেকে মুক্ত করবে, পরাধীনতার কঠোর কঠিন নিগড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে। কুরুক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে অর্জুনের বীতরাগ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—মনের ক্লীবত্ব, মায়া মোহ, মাৎসর্য্য, দীনতা হীনতা পরিত্যাগ করে মুক্তমনে বীরদর্পে শত্রুনিধনে তৎপর হয়ে এগিয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে প্রসারিত করে আশ্বাস দিয়েছেন— হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহী। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ, আর জয়লাভ করলে সগৌরবে পৃথিবী ভোগ। তুমি সন্ন্যাসীর বেশে আছ। স্মরণ কর আনন্দমঠের সেই বীর সন্ন্যাসীদের আর তাঁদের ভৈরব মন্ত্র—"হরে মুরারে মধুকৈটভ হারে…'॥ বলতে বলতে

তপস্বিনী সুদেষ্ণার আনন উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। নয়ন থেকে বুঝি অগ্নি স্ফুলিংগ ঠিকরে পড়তে থাকে।

অনুতোষ মুখ তুলে সুদেষ্ণার দিকে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দিদির এই ভীমা শত্রু-দলনী রূপ সে যেন এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। সুদেষ্ণার অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুঝি অনুতোষের সহ্য হলো না। সে চক্ষু আনত করে।

নিজেকে সংযত করে সুদেষ্ণা অনুতোষকে বিদায় দেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে অনুতোষের মুখের দিকে চেয়ে তার সন্দেহের বুঝি নিরসন হয় না। আশ্চর্য, আগে তো কখনো এরূপ হয়নি। সদানন্দময়, উৎসাহী নিঃশঙ্ক, কর্মকুশল, স্থিতধী, মিতবাক অনুতোষকে যখনই কোন কর্ম সম্পাদনের ভার নিতে ডাকা হয়েছে উদ্যোগী পুরুষ সিংহ মূর্তিমান সাফল্যের মতো উন্নতশির স্ফীতবক্ষে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।—যেন এক তেজী ঘোড়া গতির আনন্দে ভরপুর হয়ে টগবগ করছে। রাশ ছেড়ে দিলেই নিমেষে সকলকে পরাস্ত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। কিন্তু আজ যেন তার ব্যত্যয় ঘটেছে। বাজীরাজ কি হীন-বীর্য হয়ে পড়েছে! সুদেষ্ণার মনের আকাশে দুশ্চিন্তার যে কালোমেঘ দেখা দিয়েছে তা বুঝি আরো বিস্তৃত হলো। শরতের আলো ঝলমল রঙ্গীন প্রভাত যে আশার বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তেমনটি নিয়ে বুঝি শেষ হলো না!

হঠাৎ গিরিকন্দর বন প্রকম্পিত করে সন্ন্যাসীদের বজ্র কণ্ঠে নির্ঘোষিত হল—হরে মুরারে মধুকৈটভ হরে…। এ-ধ্বনি সুদেষ্ণার মনে কোন আশার বাণী বহন করে আনলো কিনা বোঝা গেল না। সুদেষ্ণা পাশ ফিরে তাকালো। অনুতোষ সদলে ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। পাহাড়ের উতরাইয়ে তাদের আরোহণ শুরু হয়েছে। অদূরে মন্দাকিনীর কলকল্লোলে অশ্রুতপূর্ব এক মহান সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। সে-সুর বুঝি সগর রাজ-এর সহস্র তনয়ের পুনরুজ্জীবনের মতোই ভারতে এক নব সন্তানদলের পুনর্জন্মের বারতা বয়ে আনছে—এক নবযুগ ঘোষণা করছে। সুদেষ্ণা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহাসম্ভাবনায় তন্ময় হয়ে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বুঝি মহাজ্যোতিষ্কের আলোকে তারই ইংগিত প্রত্যক্ষ করে।

আর অনুতোষ, অভিযানের অধিনায়কের মনে বিগত রজনীর অনেক শপথ বিচ্যুতির ঘটনা যে মোহ ও অবসাদের কুজ্ঝটিকা সঞ্চার করেছে

তা মন্দাকিনী পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি উবে যায়। তার সংকটাকাঙ্ক্ষী মন ভাবী অভিযানের উত্তেজনায় অধীর ও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সে ভেবে অবাক হয়ে যায় জীবনের চলার পথে বিচিত্র ঘটনা প্রবাহ তাকে কিভাবে কোথায় নিয়ে চলেছে! নির্জন বনপথে চলতে চলতে অতীতের এক বেদনা-ঘন বিষণ্ণ সন্ধ্যার, স্মৃতি তার মানস পটে ভেসে ওঠে যা তার জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বয়ে নিয়ে চলেছে। স্বীয় জীবনের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষণকাল তার মানসপটে আপন ভাগ্য নিরূপণে অতীতের এক রক্তাক্ত সংঘাত ও সংঘর্ষের চিত্র ভেসে ওঠে।

এভাবেই আবহমান কাল থেকেই বুঝি ঘটনা প্রবাহ মানব ইতিহাসের ভাঙা গড়ার কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিয়ত নিরূপিত করে চলেছে। তারই প্রভাবে অহরহ যেরূপ বিষম বিপত্তি বিপর্যয় ঘটছে সেরূপ যুগান্তকারী মহৎ কর্মও উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কত ঘোর সংসারী গৃহ-ত্যাগী, কৃপণ কঞ্জুস দানবীর, বলহীন বলীয়ান বীরভদ্র রূপে পরিগণিত হয়েছে, আর পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করেছে! ধর্মভীরু এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দেবদ্বেষী হয়ে শত শত দেব দেবীর মূর্তি ও দেউল চূর্ণ করে কালা পাহাড় আখ্যা লাভ করেছে! পুরাণে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বরণ, দুর্যোধন কর্তৃক তাঁর বস্ত্রহরণ ও পঞ্চ পাণ্ডবকে সূচ্যাগ্র পরিমিত ভূমিদানের পরাঙ্মুখতা হেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের সবংশে নিধন থেকে যদুবংশ ধ্বংস, ট্রয়নগরীর পতন ও বিনাশ ইত্যাদি নানা ঘটনা প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতের চরম পরিণতির নিদর্শন!

আধুনিক যুগের বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে যে-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয় জার্মানির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু তারই পরিসমাপ্তি নয়, য়ুরোপের রাজতন্ত্রের সমাধিও রচিত হয়। বৃটিশ-সিংহ তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পর তার সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ভারতবর্ষে আবার জাঁকিয়ে বসে, শাসনের লাগাম আরও শক্ত হাতে ধারণ করে। ভারতের প্রাক্তন তথা বাংলার রাজধানী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, চৌরঙ্গী আর গড়ের মাঠ অঞ্চল তখন গোরা সৈন্যদের দাপটে চঞ্চল। তাদের দৌরাত্ম্য কখনো সখনো ত্রাস আর বিভীষিকার সঞ্চার করতো। ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে তাদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করা

নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেশি বিদেশী সংবাদপত্রে এসব

আলোচনা দৃষ্ট হতো। কেননা বৃটিশ আর্মি

সসাগরা ধরিত্রীর বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান হাতিয়ার। পুরাকালের ব্রাহ্মণের মতো এই সৈন্যবাহিনী সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে এক 'নিউ ব্রাহ্মিণ' ক্লাশ—এক নব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়—সমালোচনার ঊর্ধ্বে পরিগণিত।

সে সময়ে ফুটবল খেলার মরসুমে গোরাদের অত্যাচারের মাত্রা যেন আরো বৃদ্ধি পেতো। কারণ বহু গোরা সৈন্য দল—যথা কে ও. ওয়াই. এল., ডারাহাম লাইট ইনফেন্ট্রি, শের-উড-ফরেস্টার, রয়েল-ফিউজিলার্স, ডেবন-শায়ার ইত্যাদি অনেক নাম করা গোবার দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এসে অ'ই. এফ. এ. লীগ ও শীল্ড-এর খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। ফোর্টের আশপাশ, র‍্যামপার্ট গ্যালারি ও মাঠে তখন তাদের অধিক সংখ্যায় দেখা যেত। খেলার মাঠে কোন ভারতীয় টিমের নিকট পরাজিত হলে তারা আক্রোশে ফেটে পড়তো। কী, নেটিভ নিগারদের এত বড় আস্পর্ধা যে তাদের হারাবে! তবে রে, ময়দানে এবং তার আশপাশের রাস্তা ঘাটে তখন শুরু হয়ে যেত তাদের তাণ্ডব! নিরীহ পথচারী ও দর্শক খালি খালি তাদের গালি, কীল, ঘুষি, চড় চাপড়, লাথি ও ছড়ির আঘাতের শিকার হতো। কোন নেটিভ নিগার যদি এসব অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতো তা হলে যে তুমুল তুলকালাম কাণ্ড ঘটতো ও যে দৃশ্যের অবতারণা হতো তা অবর্ণনীয়। সারা অঞ্চলটা লালপাগড়ী ও লাল-মুখোতে ছেয়ে যেতো। সারা মাঠ জুড়ে চলতো ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, আর ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি। পুলিশ যাকে পেত তাকেই নির্বিচারে লাঠি পেটা করে কুকুর বেড়ালের মতো হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলে একেবারে লালবাজার! সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য! যারা তা প্রত্যক্ষ করেনি তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

সেকালের কলকাতা এখনকার মতো ঘিঞ্জি ও জনাকীর্ণ ছিল না। ফুটবল খেলা দেখতে সে যুগে কলকাতা শহরে শুধু বঙ্গ বিহার, উড়িষ্যার নানা স্থান থেকেই নয় ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে প্রচুর ক্রীড়ামোদী ও দর্শকের সমাগম হতো। বহিরাগত ও স্থানীয় লোকের ভীড়ে মাঠ উপচে পড়তো। এমন কি আশপাশের বৃক্ষ শাখাগুলি জনভার ভারে মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তো।

শৈশব থেকেই খেলাধুলায় অনুতোষের উৎসাহ ও আগ্রহ [illegible]

কিন্তু বয়স অনুপাতে হীনবল হওয়ার দরুন লেখাপড়ার মতো খেলা-ধুলায় আশানুরূপ পটুত্ব অর্জন করতে পারে নি। ম্যাট্রিক পাশের পর কলেজে ভর্তি হয়েই আই. এফ. এ. শীল্ড-এর ফুটবল টুরনামেন্ট দেখবার অত্যুগ্র আগ্রহে সে একাই কলকাতা ছুটে এলো। উঠলো নিকট আত্মীয় কাকার মেসে। চুনোপুকুর গলি শিয়ালদহ-এর কাছে হলেও গড়ের মাঠ থেকে অনেক দূরে। সুতরাং সুদূর মফঃস্বল নিবাসী কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্রের অজ্ঞাত অপরিচিত কলকাতায় একেলা আগমন নিঃসন্দেহে মেসবাসী প্রবাসী খুল্লতাতের যথেষ্ট অশান্তি ও অস্বস্তির কারণ হয়। অনুতোষের খেলা দেখার প্রবল আগ্রহ তাঁর নিকট নিতান্ত দুঃসাহস ও উৎকট শখ বলেই প্রতীতি হয়। তা সত্ত্বেও যখন এসেই পড়েছে তখন তো আর পরবর্তী রেলগাড়িতে ফেরৎ পাঠানো যায় না। সুতরাং খুড়ো মহাশয় আপিস যাবার প্রাক্‌কালে ভাইপোকে মেসবাড়ির বাইরে 'পাদমেকং ন গচ্ছসি' বলে বারংবার সাবধান করলেন। চাকরবাকরদেরও ভাইপোর উপর কড়া নজর রাখবার হুকুম দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আপিস থেকে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া। দু'দিন সঙ্গে নিয়ে গেলেই খেলার মাঠ ও যাতায়াত-এর পথের সঙ্গে তার পরিচয় লাভ ঘটবে। খেলা-পাগল ভাইপো কয়টা খেলা দেখবে তা তো আগের থেকে অনুমান করা যায় না।

তখনকার কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে ট্রাম আর ঘোড়ার গাড়িই ছিল প্রধান। সেই সঙ্গে ছিল রিক্স ও ট্রামকোম্পানীর গোনা-গুন্তি কয়েকখানা সবুজ রঙের বাস। ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর একতলা কিংবা ছাত-খোলা দোতলা অথবা কোন প্রাইভেট কোম্পানীর বাস রাস্তায় তখনো আবির্ভূত হয় নি। মেস থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে কাকা পায়ে হেঁটেই খেলার মাঠে যাওয়া স্থির করলেন। তাতে ভাই-পোর কলকাতা দেখা এবং রাস্তা চেনা হয়ে যাবে—এক সঙ্গে রথ দেখা কলা-বেচা দুই-ই হবে। ট্রামে বাসে চড়ে হুশ্ হুশ করে যাতায়াতে কিছুই তো দেখা হয় না। অধিকন্তু ঠিক জায়গায় নামতে না পারলে ভাই-পোর পথ ভুলে হারিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বহুবাজারে পড়ে তারপর ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে ধর্মতলা হয়ে এসপ্লানেড এবং কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে গড়ের মাঠে পৌঁছতে গেলে পথ অনেকটা ঘুরলো। তার-চেয়ে বহু বাজার দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার বরাবর এগিয়ে তারপর বাঁয়ের

গলিঘুঁজির ভেতর দিয়ে এসপ্লানেডে পড়ে মাঠে পৌছতে সময় অবশ্য কম আর পথশ্রমের লাঘবও ঘটে। কিন্তু তাও কি চলার জো আছে। সেন্ট্রাল এভেনিউর সবে পত্তন শুরু হয়েছে। চীনা বস্তির ভাঙা বাড়ির ইট চুন সুরকীর স্তূপীকৃত জঞ্জাল পেরিয়ে পথের নিশানা ঠিক করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার—বিশেষত নবাগত ভাই-পোর পক্ষে। সুতরাং বহুবাজার ধরে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

যেতে যেতে কাকা ভাই-পোকে রাস্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করছিলেন এবং কি ভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করতে হয় তারও তালিম দিচ্ছিলেন। এইভাবে চলে তারা ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি ডাইনে রেখে বেন্টিক স্ট্রীট পেরিয়ে লালবাজার ছাড়িয়ে লাল দীঘির পাড়ে রাইটাবস্-এ সামনে এসে পড়েছে। সেদিনের কিশোর বালক অনুতোষের নিকট কলকাতা শহর তার পেল্লায় পেল্লায় গগন-চুম্বি বাড়ি, গাড়ি ঘোড়া, মাঠ ঘাট লোকজন সহ বইতে পড়া ময়দানবের আশ্চর্য পুরী বলেই বুঝি মনে হয়েছিল। সে কেবল চোখ ডাগর করে সব দেখছে। এটা কি সেটা কি ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা খুড়োর বিরক্তি উৎপাদন করেনি। হল ওয়েল মনুমেন্টের সামনে রাস্তা পার হয়ে, জি. পি ও-র পার্শ দিয়ে সোজা দক্ষিণমুখী চলে হেয়ার স্ট্রীট পেরিয়ে সেণ্ট জেমস গীর্জা ডাইনে এবং লাটসাহেবের বাড়ি বাঁয়ে রেখে হাইকোর্টের সামনে এসে উপস্থিত। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়ে চাঁদপাল ঘাট হয়ে গঙ্গার ধার ধরে ধরে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ করে। প্যাগোডার পাশ দিয়ে চলে পুল পেরিয়ে ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড-এর মাঠ ছাড়িয়ে বড় রাস্তার ধারে পৌছয়। দুই বড়রাস্তার সঙ্গমে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মূর্তির ডাইনে আউটরাম ঘাট। গঙ্গায় কয়েকটা বড় সামুদ্রিক পোত নোঙর ফেলে আছে। ওপারে হাওড়া—বড়বড় কলের চিমনির ধুঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন। বড় রাস্তা পেরিয়ে ফোর্টে ঢুকবার একটা রাস্তার মুখে তারা এসে দাঁড়ায়। তারপর এগিয়ে সি. এফ. সি-র মাঠের সামনে এসে অনুতোষ একেবারে হাঁ হয়ে যায়। ফোর্টের র‍্যামপার্ট থেকে শুরু করে রাস্তা অবধি লোকে লোকারণ্য—কোথাও তিল-ধারণের স্থান নেই। এত লোক এক সঙ্গে অনুতোষ জীবনেও দেখে নি। মনে পড়লো গান্ধিজী ও মৌলানা ভাইয়েরা যেবার শহরে এসেছিলেন সেসময় প্রচুর লোকের ভিড় হয়েছিল। তখন যদিও সে ছোট ছিল তবু স্পষ্ট মনে আছে—

শহরের চতুর্দিক ঃ সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে, নৌকায়, গরুর, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরে, রেলে যে যেভাবে পেরেছে হাসপাতাল ময়দানে জড় হয়েছে। সে এক অদ্ভুত স্মরণীয় দৃশ্য! স্বপ্নসম অফুরন্ত এক জনতার মিছিল—হিন্দু মুসলমান একমন একপ্রাণ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অধীর আগ্রহে তাঁদের দর্শনের জন্য যেন এক পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে। সেদিনও সে বোধ হয় এত লোক দেখেনি!

কাকা ভাইপোর চোখ মুখ দেখেই তার মনের অবস্থা আঁচ করেন। শক্ত করে তার হাত ধরে ভিড় ঠেলে মাঠে ঢুকে পড়েন। আপিসে এসেই তিনি টিকিটের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং সারবন্দী হয়ে টিকিটের জন্য আর লাইনে দাঁড়াতে হয় নি। অনুতোষের খুশী আর ধরে না। সবুজ গ্যালারীর সর্বোচ্চ সীটে বসে সে অবাক হয়ে দেখে মাঠের ভেতরে দর্শকদের চতুর্গুণেরও অধিক বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠ আর তার আশপাশের গাছে গাছে পর্যন্ত লোকে ঠাসাঠাসি। এমন কি দূর ইডেন গার্ডেনের উঁচু উঁচু গাছগুলিতেও লোক বাদুড়-ঝোলা মতো ডাল ধরে দাঁড়িয়ে। লোকের চাপে কোন কোন গাছের ডাল একেবারে নুয়ে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এক অদ্ভুত দৃশ্য!

খেলার সময় যতই এগিয়ে আসছে অনুতোষ ততই এক অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছে। কতকাল থেকে যে সে কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা দেখবার স্বপ্ন দেখেছে এবং তা চাক্ষুষ দেখবার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে! প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত দুই গোরা টিম—শের উড ফরেস্টার বনাম ডি. এল. আই (ডারহাম লাইট ইনফেন্ট্রি) পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। রেফারী একজন ভারতীয়। বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশিত খেলা শুরু হলো। কি সাবলীল ক্ষিপ্রগতি! বল তো নয় যেন যাদু-করা গোলক! আঠার মতো পায়ে পায়ে লেগে ছুটে চলেছে! এক একটা লম্বা শট যেন হাওয়াই বাজী—হাওয়ার আগে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যস্থলে পড়ছে! অদ্ভুত খেলার কলাকৌশল! অনুতোষের চোখের পাতা আর পড়ে না! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খেলা দেখছে। উত্তেজনার মুহূর্তে দাঁড়াতে গেলেই কাকা তার কাঁধে হাত রেখে বসিয়ে দিচ্ছেন। খেলা শেষ—ওয়ান অল ড্র। নক্ আউট টুরনামেণ্ট—হারজিতের খেলা। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও সমান সমান—গোল-লেস ড্র। কোথা দিয়ে

যে সময় কেটে গেল অনুতোষ টের পায়নি। হৃষ্ট চিত্তে কাকার হাত ধরে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

বর্ষাকাল—কর্দমাক্ত মাঠ। সকাল থেকে দুপুর অবধি কয়েক পশলা হালকা বৃষ্টি হয়েছে। তারপর আর বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘে ঢাকা —গুমোট থমথমে ভাব। সূর্য অস্ত না গেলেও সন্ধ্যার অন্ধকার যেন আগেই নেমে আসছে। মাঠের ওপর একটা পাতলা ধোঁয়াশার আবরণ ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরে দূরে গ্যাস বাতিগুলি জ্বলে উঠেছে। মই কাঁধে নিয়ে একটা লোক দৌড়চ্ছে। গ্যাস পোষ্টে উঠে উঠে বাতি জ্বালিয়ে নেবে আসছে। সারা মাঠ জুড়ে আলোর রোশনাই! ট্রাম ধরবার জন্য কাকা ভাইপোকে নিয়ে এসপ্লানেডের ট্রাম গুমটি বরাবর ময়দানের মধ্যেকার পায়ে হাঁটা পথ ধরে চলেছেন। কিছুদূর এগোতেই গ্যাসবাতির উজ্জ্বল আলোয় লাট সাহেবের বাড়ির দক্ষিণ দিকের গেট দৃষ্টিগোচর হয়। গেটের দুই পাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছাউনির নিচে লাল কুর্তা পরিহিত পাগড়ি মাথায় দুই ঘোড় সওয়ার কোমরে বেল্টের সঙ্গে তলোয়ার ঝোলানো এবং হাতে বল্লম নিয়ে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারই বিপরীত দিকে রাস্তার পাশে মাঠের উপর বিরাট এক পাথরের মুর্তি। তার পাশ দিয়ে চলা কালে অনুতোষ মুখ তুলে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে অবাক হয়ে যায়। স্থুলাকার চতুষ্কোণ ইটরঙের মসৃণ পাথরের বেদী। চারদিক ঘিরে তিন থাক সিঁড়ি। বেদীর শীর্ষে মূর্তিটি স্থাপিত। অনুতোষ থমকে দাঁড়ায়। ইচ্ছা হয় সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে মূর্তিটাকে ভাল করে দেখে। কিন্তু হলো না। কাকার আহ্বান কানে আসতেই আবার চলতে থাকে। কাকার হাত ধরে রাস্তা পার হয়ে কার্জন পার্কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে একেবারে ট্রাম ঘুমটিতে এসে পৌছয়। ভিড়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেও যখন ট্রামে ওঠা গেলোনা তখন কাকা ভাইপোর হাত ধরে বললেন— চ' হেঁটেই যাই। ট্র্যামের জন্য বসে থ কলে অনেক রাত হবে।

অন্ধকার ততক্ষণে তার মোটা কালো ঘোমটা দিয়ে চতুর্দিক ঢেকে ফেলেছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর গুরুগুরু গর্জন। কাকা ভাইপোর হাত ধরে চৌরঙ্গীর চৌরাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথ ধরে অগ্রসর হন। রাস্তার ধারের বিপণিগুলির আলো ঝলমল সুসজ্জিত নানা পণ্য সম্ভার পথিকের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অনুতোষের মনে হয় দিনের চাইতে রাতের কলকাতার জৌলুস যেন অনেক বেশী, অনেক প্রখর।

দেখে দেখে আর চোখ ফেরানো যায় না। এতক্ষণ বেশ লাগছিল, কিন্তু গলির মধ্যে পড়েই অনুতোষ দমে গেল। একেবারে ভিন্ন পরিবেশ। অন্ধকার স্যাঁৎ স্যেঁতে গলি। দু'দিকে টিনের আর খোলার ঘরের বস্তি। কোথাও বা ভগ্ন প্রায় পুরাতন বট অশত্থ বিদীর্ণ জীর্ণ শীর্ণ অট্টালিকা আশেপাশে স্তূপীকৃত জঞ্জাল নিয়ে খাড়া হয়ে আছে। দূরে দূরে রাস্তার বাতিগুলি টিম টিম করে জ্বলছে। তাতে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বুঝি বেশী প্রকট করছে। পেঁচানো গলি চলতে চলতে কেমন যেন দিশেহারা হতে হয়। মেসে ঢুকে অনুতোষ হাঁপ ছাড়ে।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই তার খেলা দেখার প্রোগ্রাম কাকাকে জানায়। জনপ্রিয় এক বিখ্যাত দেশী টিমের খেলা। কতকাল থেকেই এই টিমের খেলা দেখার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সে পোষণ করে আসছে। আজ তা সার্থক হতে চলেছে! কাকা তার কথা শুনে চুপ করে থাকেন। রোজ রোজ আপিস কামাই করে ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে তো আর খেলা দেখা যায় না! তারপর কি ভেবে বললেন—বেশ, আমি তোমার জন্য টিকিট কেটে রাখবো'খন। আমাদের আপিসেরও কয়েকজন যাবে। তাদের সঙ্গেই যেও। কাকার কথা শুনে অনুতোষ মহাখুশী। ইচ্ছা হলো কাকাকে একবার জড়িয়ে ধরে আদর করে।

প্রাতরাশের পর অনুতোষ কাকার অনুমতি নিয়েই গলিটা বড়রাস্তা অবধি ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বেড়িয়ে কাকা আপিস যাবার আগেই সে মেসে ফিরে আসে। কাকার সামনে হাজিরা দিতেই তিনি অনুতোষের সামনে ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ তক্তপোষের উপর রাখেন। হেঁটে অথবা ট্রামে কিভাবে সহজে গড়ের মাঠে যাওয়া যায় তারই একখানা সরল মানচিত্র। তাতে রয়েছে রাস্তার নাম ও তীর চিহ্ন দিয়ে হাঁটা পথের দিক নির্দেশ। সেই সঙ্গে রাস্তার ধারে বহুল পরিচিত বাড়িগুলির নাম লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত যাতে কোন ক্রমেই পথ-ভ্রান্তি না ঘটে। ট্রামে যাতায়াত কালে আপ ডাউন ট্রামে কোথায় উঠবে এবং নামবে তাও লাল থাম এঁকে তার দুই পার্শ্বে লিখে দেওয়া আছে। গড়ের মাঠে পৌঁছে খেলার মাঠ চিনতে যাতে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য কোথায় কোন খেলার মাঠ তা লিখে তারা এঁকে চিহ্নিত করা আছে। কলকাতার রাস্তা সম্পর্কে যে কোন অনভিজ্ঞ লোক এই মানচিত্র দেখে যথাস্থানে পৌঁছতে পারবে। ম্যাপ-এ পেন্সিল, লাল

এবং কালো কালি ব্যবহার করা হয়েছে। মনে মনে অনুতোষ কাকার অক্লান্ত চাতুর্যের তারিফ না করে পারে না।

কাকা ম্যাপটির সব কিছু অনুতোষকে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন—খাওয়া দাওয়ার পরে একটু জিরিয়ে আমার আপিসে, আসবে বলেই ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন—এটা জি. পি. ও.। এর দক্ষিণে বড়রাস্তার নাম দেখো কয়লাঘাট। এ রাস্তা ধরে পশ্চিমে গঙ্গার দিকে এগোলে পড়বে এই স্ট্র্যাণ্ড রোড। দুই রাস্তার মোড়ের যে বাড়িটা লেখা আছে দেখছো সেটা পোর্ট কমিশনার্স হেড আপিস। এটার পাশ দিয়ে উত্তরমুখী এগিয়ে তৃতীয় বাড়িটা আমাদের আপিস। এই দেখ আপিসের নাম লেখা আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দারোয়ানকে এই স্লিপখানা দিলেই সে আমাকে ডেকে দেবে। সাবধানে দিশা রেখে রাস্তা চলবে। আমাদের গলির বেরোবার মুখে ডান দিকে সোনার এবং বাঁ দিকে কাপড়ের দোকানটা ঠিক নজরে রাখবে তা হলে গলিতে ঢুকতে কিংবা বেরোতে ভুল হবে না।

কাকা আপিস চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার বৃষ্টি নামলো। অনুতোষ খুবই মুষড়ে পড়ে। সারাদিন এভাবে বৃষ্টি হলে মাঠে জল দাঁড়াবে— ফলে খেলা এবং তা দেখা উভয়ই পণ্ড হবে। কলকাতা আসাই বৃথা যাবে। মন খারাপ সত্ত্বেও সে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরি হয়। বৃষ্টি থামা মাত্রই বেরিয়ে পড়বে। দুপুর নাগাদ বৃষ্টি ধরে আসে। অনুতোষের আর তর সইলো না, কাকার নির্দেশ মতো ম্যানেজারের কাছে ঘরের চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বৃষ্টি-স্নাত কলকাতা এক ভিন্নরূপ ধরেছে। সকাল থেকেই বৃষ্টি। ফলে বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, গাছপালা ভেজা ভেজা—স্যাতসেঁতে আবহাওয়া। রাস্তায় লোকজন কম—একটা গুমট চাপা ভাব বুঝি জনমানসে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। মনে নিরুৎসাহ ও আলস্য চেপে বসেছে। অনুতোষকে কিন্তু তা স্পর্শ করেনি। খেলা দেখার অত্যুগ্র বাসনা ও উৎসাহ নিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে সে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। আকাশে ততক্ষণে মেঘ কিছুটা কেটে গেছে—ক্ষণে রৌদ্র ক্ষণে মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে। কাকার দেওয়া ম্যাপখানা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। নাক বরাবর পশ্চিম দিকে চেয়ে অনুতোষ অবাক! ট্রাম লাইন বহুদূর অবধি বিস্তৃত। উপরে ট্রাম, টেলিফোন, ইলেকট্রিক

ইত্যাদি হরেকরকম তারের ঠাস বুনোনি। যেন রাস্তার উপরে তারের জাল ঝুলছে আর বৃষ্টিভেজা তারগুলো সূর্যালোকে চিক্‌চিক্ করছে! কাকার নির্দেশ অনুসরণ করে হেঁটে হেঁটে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই সে তাঁর আপিসে গিয়ে উপস্থিত। নামকরা এক বিলিতী কোম্পানীর আপিস। তিনতলা—পেল্লায় বাড়ি! ফুটপাথ থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। লাল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে বিরাট এক ঝক্‌ঝকে পেতলে মোড়া বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড সে দরজা! কি ভাবে ভেতরে ঢুকবে ভাবতে গিয়ে খানিক ইতস্ততর পর পিতলের গোল হ্যাণ্ডেলটা ধরতেই পাশে ইংরেজিতে 'পুশ' লেখাটা অনুতোষের নজরে পড়ে। হ্যাণ্ডেলটা ধরে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়। হলঘরের মতো সুপরিসর বারান্দা—ঝকঝকে তকতকে। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝে। দোতলা উঠবার দুটি প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি দু'দিক দিয়ে উঠে গেছে। মসৃণ পালিশে মুখ দেখা যায়। সিঁড়িতে উঠবার মুখে দু'দিকে পাতাবাহার গাছ শোভিত বিরাটাকার পেতলের উজ্জ্বল টব। সিঁড়িতে রঙীন সতরঞ্চি পাতা চক্‌চকে পেতলের পাতে আঁটা। বারান্দার উভয় দিকে জোবা কাঁচের দরজা—ভেতরে পর্দা। বাইরে থেকে কিছু বোঝার জো নেই। বিরাট বপু উর্দীপরা চুমরানো-গোঁপ এক দেশোয়ালী দারোয়ান প্রবেশ পথের ডান দিকে নিঃশব্দে পাথরের মতো নিশ্চল বসে আছে। তকমা আঁটা আর্দালীরা উপর নিচ করছে—ভেতরে ঢুকছে আর বেরিয়ে আসছে।

অনুতোষ সব দেখে একেবারে থ হয়ে গেছে! তাকে বোকার মত মাঝ বারান্দায় হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দারোয়ান রুক্ষ কণ্ঠে—ক্যা মাঙতা, বলেই হাত ইশারায় কাছে ডাকে। অনুতোষ তার কাছে গিয়ে পকেট থেকে কাকার দেওয়া কাগজখানা বার করে এগিয়ে ধরে। সেটা হাতে নিয়ে এক পলক দেখেই দারোয়ানের মুখের কটমট ভাব নরম হয়। দারোয়ান বাঁ হাতে দেয়ালে আঁটা একটা বোতাম টিপতেই ভোজবাজীর মতো তকমা আঁটা এক আর্দালি এসে হাজির। দারোয়ান তার হাতে চিরকুটখানা গুঁজে দেওয়া মাত্র সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে—আইয়ে, বলেই হাঁটতে থাকে। অনুতোষ তার অনুসরণ করে সিঁড়ির পাশে ছোট একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। নাতিপ্রশস্ত ঘর—একদিকে কাঠের পার্টিশন, কয়েক খানা চেয়ার পাতা। অনুতোষকে

বসতে বলেই আর্দালী পার্টিশনের দরজা ঠেলে ভেতরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই খট করে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে যায়। অনুতোষ অবাক—সব যেন কলের পুতুল, চুপচাপ কাজ করে চলেছে! এতবড় বাড়িটায় কোথাও টুশব্দটি পর্যন্ত নেই! মাঝে মাঝে বাইরে রাস্তায় ট্রাম চলাচলের ঘর্ঘর শব্দের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে আসছে যেন বহুদূর থেকে শ্রুত মেঘ গর্জনের গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ!

কাকা নিঃশব্দে ঘরে ঢোকেন। তাঁকে দেখেই অনুতোষ উঠে দাঁড়ায়। পকেট থেকে খেলার টিকিট খানা বার করে তিনি অনুতোষের হাতে দিয়ে বলেন—আমাদের আপিসেরও জনা তিনেক লোক যাবে। তবে ছুটি হতে এখনো দেরী। ততক্ষণ তুমি এখানে অপেক্ষা করবে, না এখনই মাঠে যাবে?

কাকার প্রশ্নের উত্তরে অনুতোষ মুখ কাচুমাচু করে বলে—সেই ভালো। আমি বরং মাঠে যাই সেখানেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে।

ভ্রাতুষ্পুত্রের উত্তর আর মুখের ভঙ্গীতে তিনি হেসে ফেলেন।—বেশ চলো, বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একেবারে সিঁড়ি অবধি আসেন। ফিরবার মুখে অনুতোষকে সাবধান করেন—গোরা-কালার খেলা, ফলাফল দৃষ্টে মারপিট লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। খুব সাবধান, বেগতিক বুঝলে সে যেন তৎক্ষণাৎ মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি মেসে না ফিরলে তিনি খুব চিন্তিত হবেন।

অনুতোষ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পড়ে। ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে রাস্তা পেরিয়ে লাল দীঘিতে ঢোকবার লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। জি. পি. ও.-র ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবে তারপর পার্কে ঢোকে। ঘড়িতে সবে আড়াইটা। খেলা শুরু হতে এখনও অনেক দেরী। ভেতরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার মনস্থ করে দীঘির দক্ষিণ পড়ে ডালহৌসি ইনস্টিটিউটের কাছে বড় বটগাছের তলায় একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। দীঘির চতুর্দিকে রাস্তায় নানা প্রকার যানবাহন বিচিত্র শব্দ তরঙ্গ তুলে ছুটোছুটি করছে। লোক চলাচলেরও বিরাম নেই—সকলেই যেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটছে! পার্কের ভিতরেই বা কতরকমের লোক কতভাবে বিশ্রাম করছে—কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউবা গল্পগুজবে মশগুল! ফেরিওয়ালারও অভাব নেই। চানাচুর, বাদাম, হরেক রকম ফল থেকে

শুরু করে চুলের ফিতে, কাঁটা, চিরুনী, চুড়ি, ছুরি কাঁচি, তালা চাবি ইত্যাদি নানা পণ্যসম্ভার সাজিয়ে বসেছে। কেউবা এসব জিনিষ হাঁক দিয়ে ফেরি করছে। এই বিচিত্র পরিবেশে লাল পাগড়ি পুলিশও টহল দিচ্ছে। দিনদুপুরে সে এখানে কিসের সন্ধান করছে তা অনুতোষের বোধগম্য নয়। অনুতোষ চোখ দিয়ে সব কিছুই উপভোগ করছে।

গাছের ছায়ার বাইরে ঠাঠা রোদ্দুর। ভাপসা গরম—আলস্যে হাই উঠে। সম্মুখে রেলিংঘেরা পুকুরটার দিকে অনুতোষের দৃষ্টি পড়ে। চারদিকে সান বাঁধানো ঘাট। প্রবেশ-পথে লোহার দরজায় তালা আঁটা। ঐদিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে এক অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে—এটাকে লাল-দীঘি বলে কেন? কলকাতার গোল দীঘি, লালদীঘির কথা সে অনেক শুনেছে। গোল দীঘিটা সত্যিকারের গোল কিনা তা সে এখনো চোখে দেখেনি! কিন্তু এই লাল দীঘির ধারে বসে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, এর জল লাল তো নয়ই বরং ঘিনঘিনে সবুজ শেওলা পড়া। কিনারা জলজ জঙ্গলে আকীর্ণ। এটা বড়জোর একটা পুকুর—দীঘিপদবাচ্য মোটেই নয়। তাদের ওখানে কালিতারার দীঘি এর প্রায় কুড়িটার সমান—এপাড়ে দাঁড়ালে ওপাড়ের লোক ছোট্ট দেখায় আর এধারে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিলে ওধারে শোনা যায় না। কি নির্মল জল—কাক চক্ষুর মতো স্বচ্ছ!

হঠাৎ নজরে পড়ে পুকুরের ডান কোণে কয়েকটা লাল শাপলা। তাদেরই অদূরে কয়েকটা লাল পদ্মও ফুটে আছে! তবে কি ঐ লাল রঙের অট্টালিকা—কাকা বলেছেন—'সেক্রেটারিয়েট' বা রাইটার্স বিল্ডিং বাংলা গভর্ণমেন্টের শাসন যন্ত্রের স্নায়ু কেন্দ্র থেকেই লাল দীঘি নামকরণ হয়েছে? না কি অন্য কোন ইতিহাস, কিংবা কিংবদন্তী ঐ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে!

গণিতের ছাত্র হলেও ইতিহাস তার অতি প্রিয় বিষয়। কেননা ইতিহাসই মানব জীবনের আলেখ্য। সন তারিখে কণ্টকাকীর্ণ বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা তার জানা আছে। লাল দীঘির তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার মগজে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়। এই যে ডালহৌসি স্কোয়ার যেখানে সে বসে আছে আর ঐ যে পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে তিন রাস্তার সঙ্গমে অবস্থিত সাদা মার্বেল পাথরের স্তম্ভ—হলওয়েল মনুমেন্ট, তার ইতিহাস তো তার নখদর্পণে। ওখানেই তো ব্ল্যাক-হোল ম্যাসাকার ঘটেছিলো ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন তৎকালীন

সুবে বাংলার নবাব ইংরেজদের যুদ্ধে হারিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সেনা নিবাসের এক অন্ধকুঠুরিতে বহু শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদের বন্দী করে রাখেন। স্থানাভাবহেতু দমবন্ধ হয়ে অধিকাংশের জীবনান্ত হয়। তার পরেই তো পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা রবি অস্তমিত এবং শ্বেত যবনের রাজত্ব কায়েম হয়। সে তো যুদ্ধ নয়, শুধু বিশ্বাসঘাতকার কুটচক্র খেলা যার চাকার তলায় মীরমদন মোহন লালের মত বীর সহ অগণিত সেনা নিষ্পেষিত হলো। সে এক মর্মন্তুদ ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় বিশ্বসঘাতকার দৃষ্টান্ত বুঝি বিরল। তার প্রায় শতবর্ষ পরে কোম্পানীর আমলের অবসান এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক শাসন দণ্ড গ্রহণ। লর্ড ডালহৌসির—যাঁর নামে বৃটিশ রাজত্বের প্রাণ স্বরূপ এই প্রধান ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রের নামকরণ—গভর্ণর জেনারেল রূপে ভারতে আগমন। তাঁর অনেক কুকীর্তির সঙ্গে বহু সুকীর্তিও জড়িয়ে আছে। তাঁর সময়েই ভারতবর্ষে এশিয়ার সর্বপ্রথম রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোষ্টআপিস ইত্যাদি জনসংযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন। এর ফলে ভারতবাসীর পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সুবিধা ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে স্বাজাতিকতা এবং স্বাদেশিকতা বোধের উন্মেষ ও বিকাশ হতে থাকে। এভাবে ভারতের অগ্রগতিতে লর্ড ডালহৌসির অবদান অনস্বীকার্য। তারপরই ১৮৫৭-তে শুরু হ'ল ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ—সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি যেভাবেই হোক না কেন—নিপীড়িত ভারতবাসীর ইহাই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম প্রয়াস ও সংগ্রাম।

চতুর্দিকে এইসব জাঁকজমক ও জৌলুশ অনুতোষের মনে হলো শুধু বাহ্য—দেশের নাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন। মুষ্টিমেয় ইংরেজ আর ততোধিক সংখ্যালঘু অনুগৃহীত পদলেহী দেশীয় রাজারাজড়া, জমিদার, নবাব আর বিত্তশালীরা সব কিছু সুবিধা ভোগ করছে। দেশের ধন সম্পদ ঐশ্বর্য সব কিছু তাদেরই কুক্ষিগত। সারা দেশ পরাধীনতার কঠিন নির্মম নিগড়ে, দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ, অশিক্ষা কুশিক্ষা, অন্নবস্ত্রহীন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ধুঁকছে। বৃষ্টিধোয়া পুকুরের উত্তর দিকে রাস্তার ধারে ছিমছাম ঐ লাল রঙের অট্টালিকা ও আশপাশের কোন কোন বাড়ির শীর্ষে ইউনিয়ন জ্যাক—ভারতের পরাধীনতার প্রতীক গর্বভরে পতপত করে উড়ছে। অনুতোষের সুকুমার বক্ষ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়—

কবে দেশের রাহু মুক্তি ঘটবে, কবে ঐ অট্টালিকার শীর্ষে স্বাধীনতার বিজয় কেতন উড়বে! সে কবে গো, কবে!

জি. পি. ও-র শ্বেত শুভ্র গম্বুজের শীর্ষে উড্ডীন ইউনিয়ন জ্যাক থেকে চক্ষু নামাতেই বিরাট ঘড়িটার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে তিনটায়। বেঞ্চি থেকে সে লাফিয়ে উঠে। অবাক কাণ্ড, এতক্ষণ ধরে এখানে বসে সে বহুবর্ষ আগেকার ইতিহাসেব রক্ত'ক্ত পথ পবিক্রমা করেছে। সর্বনাশ, এখন মা'ঠ ঢুকতে পারলে হয়! উঠতে গিয়ে পেছন ফিবে চাইতেই পা'র্ক থেকে বেরোবার ছোট্ট একটা রেলিং দেওয়া গোলাকাব নিষ্ক্রমণের পথ তার নজরে পড়ে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াতেই নাক ববাবর লাট সাহেবের বাড়িটা দৃষ্টি গোচর হয়। মনে হলো ধাপে ধাপে অনেকগুলি প্রশস্ত সিঁড়ি একেবারে রাস্তা থেকেই উঠেছে। ঐ বিরাট বাড়িটার দক্ষিণেই গড়ের মাঠ। যাক্ দিক্‌ভ্রমের আর ভয় নেই! অনুতোষ আশ্বস্ত হয়। বাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকের বড় লাল বাড়িটাব সামনের চওড়া ফুট পাথ ধবে চলে চলে একেবারে লাটের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছে। তারপর রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথ ধবে কিছুদূব এগিয়েই বাঁয়ে মোড় নিয়ে মাঠ বরাবর হাঁটতে থাকে। অক্টরলোনী রোড-এর সামনে এসে দেখে অগণিত লোক নানা দিক থেকে কাতাবে কাতারে চলেছে।—সকলেবই লক্ষ্য গোরা-কালার খেলার মাঠ। রাস্তা পার হয়ে আগের দিনের দেখা মূর্তিটার পাশ দিয়ে যাবার কালে তাকে দেখবার ইচ্ছা জাগে। সংগে সংগেই বেদীর দুই ধাপ উঠে মূর্তিটিকে চেয়ে দেখে নামটা পড়ে—লর্ড নরেন্স। ঝপাঝপ বৃষ্টি নামে! ছাতা খুলে অনুতোষ পলাশী গেট ধবে ফোর্টের দিকে এগোতে থাকে। চতুর্দিকে লোক গিজগিজ করছে। কিন্তু লোকের মাথা দেখা য'য় না—শুধু ছাতা আব ছাতা—যেন লক্ষ ছাতার মেলা!

রাস্তার ধাবে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অনুতোষ কাকার দেওয়া ম্যাপখানা পকেট থেকে বার করে কোন মাঠে খেলা হচ্ছে তা দেখে নিয়ে সে-দিকে অগ্রসব হয়। মাঠেব প্রত্যেকটি টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘশ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান। মাঠে ঢুকবার গেটের সম্মুখে এসে পকেট থেকে টিকিটখানা বের করে দেখে। উঁচু ক্লাশের টিকিট সুতরাং টিকিট চেকার-এর নির্দেশ মত তাকে ভিন্ন গেট দিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে হয়। অনুতোষের আনন্দ আর ধরেনা। উৎফুল্ল চিত্তে গ্যালারির

কয়েকধাপ উপরে উঠে আপন সীটে গিয়ে বসে। বৃষ্টি ধরে আসছে—আকাশে মেঘের আড়ম্বর আর তেমন নেই। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। দর্শকদের মনেও আশা সঞ্চারিত হচ্ছে—বৃষ্টি আর হবে না, খেলাটা জমবে ভালো!

খেলার সময় যতই এগোচ্ছে সারা মাঠে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ততই বাড়ছে! অবশেষে দর্শকবৃন্দের অধীর প্রতীক্ষার অবসান হয়। একই সময়ে একদিক থেকে ভারতীয় দল এবং অন্যদিক থেকে গোরার দল মাঠে অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা মাঠ জুড়ে দর্শকদের উল্লাস-ধ্বনি আর হাততালি খেলোয়ারদের অভিনন্দন জানায়। ভারতীয় ও আর গাইল হাইল্যাণ্ডারস্—উভয় দল মাঠের মধ্যস্থলে বৃত্তের উভয়দিকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। অনুতোষ যদিও এই দেশীটিমের খেলোয়ারদের কিংবা তাদের খেলা কখনো দেখেনি, তথাপি গোলকিপার থেকে আরম্ভ করে ব্যাক্ হাফব্যাক্, সেন্টার ফরোয়ার্ড, রাইট আউট, লেফ্ট আউট এবং অন্যান্যদের নাম তার মুখস্থ। সকলেই যেন তার অতি পরিচিত আপনজন। কিন্তু দণ্ডায়মান তাঁর 'হিরোজ' একাদশ তুলনায় গোরাদের চেয়ে ক্ষীণকায় ও নিষ্প্রভ! অনুতোষ ঘাবড়ে যায়। এক একটা গোরা যেন তেজি বাজী, কি অটুট স্বাস্থ্য, যৌবন উচ্ছাসে টগবগ করছে! ছুটবার পূর্ব মুহূর্তে ঘোড়া যেরূপ অস্থির চাঞ্চল্যে খুর দিয়ে মাটিতে পা ঠেকে তারাও তদরূপ পা তুলে কসরত করছে! ভারতীয়দের অধিকাংশেরই খালি-পা। গোরাদের সকলেরই পায়ে বুট। শারীরিক সৌন্দর্য ও সবলতা না থাকলে কি কখনো ভাল স্পোর্টস্ম্যান হওয়া যায়! এ প্রশ্নই অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছে অনুতোষকে। সেই সঙ্গে তার মনের মধ্যে নিজেকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও সবল করে গড়ে তোলবার এক প্রবল অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগে!

খেলা শুরু হয়েছে। গোরাদের খেলা অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও উন্নত ধরনের হলেও বর্ষা সিক্ত কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে তারা স্পীড্ আর সর্ট-পাশ-এ ভারতীয়দের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তথাপি গোরারা সর্বক্ষণ প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয়দের চেপে রাখছে। খেলার অর্ধ-বিরতির আগে হঠাৎ কর্ণার কিক্ থেকে এক গোরা হেড করে নেটের ভেতর ঢুকে যেতেই রেফারী অফ্‌সাইড ঘোষণা করেন। সবুজ গ্যালারিতে প্রচুর কোলাহলের সঙ্গে হাততালি আর গোরাদের মুখে চুনকালি! তাদের আক্রোশ জনিত ক্রুদ্ধ চিৎকার সারা মাঠ সরগরম হয়ে ওঠে। তারা

গ্যালারি থেকে মাঠে নেমে পড়ে আর কি! মিলিটারি পুলিশের সময় মতো বাধাদানের ফলে সংঘর্ষ নিবারিত হয়।

বিরতির পর খেলা আরম্ভ হতেই গোরার দল খেলার নিয়ম কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে দারুণ মারপিট করে খেলছে! গোল করার চাইতে প্রতিপক্ষকে মেরে ঘায়েল করবার জন্যই তারা হন্যে হয়ে উঠছে! ফলে মাঠে এবং গ্যালারিতে প্রবল উত্তেজনা! মাঠের চতুর্দিকে হৈ হট্টগোল। এরই মধ্যে আচম্বিতে ভারতীয় লেফট ইন গুরুতর ভাবে আহত হয়। ষ্ট্রেচারে করে তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে থেকে শেম্ শেম ধ্বনি ওঠে। কিছু জুতো মাঠে পড়ে। উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। এই ডামাডোলের মধ্যে ভারতীয় খেলোয়াররা তাদের ট্যাকটিক পালটে ফেলেছে। সংঘর্ষ এড়িয়ে তারা অধিকতর স্পিড এবং ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করাতে গোরারা তাদের মারতে গিয়ে পিছনে পড়ছে। ফলে তারা আরো ক্ষেপে হন্যে হয়ে উঠছে।

খেলা শেষ হতে আর দেরী নেই। ভারতীয় দর্শকবৃন্দ প্রমাদ গোণে। ড্র হলে আরো অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে! এতক্ষণ দশজন নিয়ে খেলে ভারতীয়রা পরিশ্রান্ত—তাদের দম ফুরিয়ে আসছে। এখন উপায়! সকলেই নিরাশায় মুহ্যমান। আচম্বিতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়। ভারতীয় দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড যাদুকরের মতো পায়ে পায়ে বল নিয়ে ব্যাককে কাটিয়ে তীর বেগে ছুটে চলছে—কি হয়! কী হয়!! উত্তেজিত দর্শকরা আসন ছেড়ে উঠে পড়ে। গোলকীপার বল রুখতে পারেনা, তার হাত ছুঁয়ে বল তীব্র বেগে কোণাকুণি নেটে ঢুকে যায়—ক্লিয়ার গোল। গোল, গোল! তীব্র কর্ণ-বিদারী চিৎকার। দেখাদেখি অনুতোষও উঠে দাঁড়িয়ে ছাতা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। রেফারী বাঁশি বাজিয়ে বিজয় ঘোষণার সঙ্গে, সঙ্গে হাত তুলে বল সেণ্টারে আনবার সংকেত জানায়। সবুজ গ্যালারিতে তত্‌ক্ষণে ভারতীয়দের করতালি, উল্লম্ফন, নৃত্যগীত আর মুহুর্মুহু চিৎকার। ছাতা, লাঠি, জুতো যার হাতে যা আছে তা আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করছে। ওদিকে সাদা গ্যালারিতে পরাজয়গ্লানি-ক্লিষ্ট গোরাদের—অফসাইড, অফসাইড ক্রুদ্ধ কর্কশ চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে। অভূতপূর্ব এক বিস্ফোরক অবস্থা। রেফারীর নির্দেশ মতো বল সেণ্টারে নিতে গোরারা বাধা দিচ্ছে। সকলে মিলে ভারতীয় সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে

ঘিরে ধরেছে। তাকে উদ্ধারের জন্য ভারতীয় খেলোয়াররা সেদিকে ছুটেছে। এই গোলমালে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, রেফারী খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে সরে পড়েন। ততক্ষণে মাঠের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে। উভয় দলের মধ্যে কীল, চাপড়, ঘুষি যথেচ্ছ চলেছে। তা দেখে সবুজ গ্যালারি থেকে ভারতীয় দর্শকরা পিল পিল করে মাঠের দিকে ছাতা, লাঠি, জুতো যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে ছুটছে। ওদিক থেকে গোরারা তাদের গ্যালারি ছেড়ে ছুটে আসছে। তাদের পেছনে মিলিটারি পুলিশ আর এদিক থেকে লাল পাগড়ি দৌড়ে আসছে। মাঠে সিভিল আর মিলিটারি পুলিশে ছয়লাপ। গোরারা লাল ফিতে-বাঁধা মিলিটারি পুলিশ দেখেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে থাকে। সিভিল পুলিশ ভারতীয় খেলোয়ারদের এসকর্ট করে মাঠের বাইরে তাঁবুর দিকে নিয়ে চলে। খেলোয়াদের অধিকাংশেরই জামা ছেঁড়া, কারো বা নাকে মুখে রক্তমাখা রুমাল চাপা, কেউ বা খুঁড়িয়ে চলেছে—গোরাদের সঙ্গে লড়ে ঘায়েল হওয়ার চিহ্ন। এসব দেখে দর্শকরা আরো উত্তেজিত। কিন্তু পুলিশ প্রতিরোধের ফলে তারা নিরুপায়। পুলিশ খেলার মাঠের দড়ির সামনে ব্যারিকেড করে রেখেছে। কাউকে মাঠের মধ্যে ঢুকতে দিচ্ছেনা, যারা পুলিশ বেষ্টনি ভেদ করে মাঠে ঢুকছে তাদের পুলিশ লাঠি-পেটা করে বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুতোষের নিকট এ দৃশ্য অভাবিত ও অদৃষ্ট-পূর্ব। ঘটনার আকস্মিকতা ও দাবানলের মতো তার দ্রুত পরিব্যাপ্তিতে সে হতবাক। মাঠে দু'দলের মধ্যে মারামারি চলাকালীন তারও হাত নিশপিশ করে। উত্তেজিত হয়ে গ্যালারি থেকে নামবার মুহূর্তে কাকার সাবধান বাণী স্মরণ হতেই সে বিরস বদনে বসে পড়ে! তার মনে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে এটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা যে তার দল জিতেছে এবং তার হিরোজরা স্বদেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করেছে। তবে গোরাদের বেধবক পেটাতে এবং তাতে অংশ নিতে পারলে সে আরো বেশী খুশী হতো।

বিরসবদনে অনুতোষ বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। গ্যালারি থেকে নামবার জন্য পা বাড়াতে গিয়ে চতুর্দিকে চেয়ে সে কিংবর্তব্যবিমূঢ়! কাকার আপিসে যে কয়জন তার পাশে বসেছিলেন তারাও না-পাত্তা। এই তুলকালাম হট্টগোলের মধ্যে কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছেন! গ্যালারির শেষ কয়েকধাপ থেকে মাঠের

বেষ্টনি পর্যন্ত লোকে ঠাসাঠাসি। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ভিড়ের চাপে বেরোবার গেট অবরুদ্ধ। এরই মধ্যে ক্ষিপ্ত জনতা কোথাও বিজয়ের আনন্দে নৃত্য গীতে মত্ত, কোথাও বা রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসেফুঁসে লম্ফঝম্ফ দিয়ে গোরাদের শ্রাদ্ধে রত আর প্রতিশোধ নেবার জন্য গগন-বিদারী চিৎকারে উন্মত্ত। গ্যালারির পেছনে খেলোয়ারদের তাঁবুর চতুর্দিকে অগণিত লোক! নিরুপায় অনুতোষ মাঠের বাইরে দৃষ্টিপাত করে। সেখানেও জনতার ভিড় তবে ভেতরের চাইতে হালকা। পশ্চিম দিগন্তে অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নানা রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাঠের মধ্যেকার আলো ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। আর দেরী করা সঙ্গত নয়। কাকা খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হবেন। খেলার মাঠের খবর ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নানা শাখা প্রশাখা মেলে, ফেঁপে ফুলে অতিরঞ্জিত আকারে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কাণেও তা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে।

অনুতোষ গ্যালারির শেষ কয়েক ধাপ অতিকষ্টে অতিক্রম করে মাঠে নেমে পড়ে। তারপর ভিড় ঠেলে গেটের মুখে লাইনে এসে দাঁড়ায়। সুমুখ দিকে চেয়ে সে ঘাবড়ে যায়। বিরাট লাইন—লোকে একেবারে ঠাসা! তার উপর পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ! রিভলবার হাতে পুলিশ সার্জেণ্ট, লাল ফিতে হাতে ব্যাটন নিয়ে মিলিটারি পুলিশ আর লম্বা লাঠি উঁচিয়ে লাল-পাগড়ি পরা দেশী পুলিশ। সবারই চোখে মুখে উগ্র হিংস্র ভঙ্গি। গেটের বাইরে অসংখ্য ঘোড়সওয়ার পুলিশ। বল্গা ধরে যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ভেতরের মাঠে শত-সহস্র কণ্ঠে গগন-ভেদী চিৎকার। এখানে নীরব একটা থমথমে ভাব। যে কোন মুহূর্তে পুলিশ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুঝি তাদের পিষে ফেলবে! পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রেখে এক একজন করে গেট পার হতে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে পেছন থেকে ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়ি সৃষ্টি হতেই লাঠিধারী লাল পাগড়ি হুঁশিয়ারি দিয়ে দুদিক থেকে এগিয়ে এসে ভিড় সামাল দিতে মাঝখানে লাঠি ঢুকিয়ে পেছনের লোক আটকে রাখে। সামনের লোক ততক্ষণে একে একে বেরিয়ে গেলে লাঠি তুলে নেয়। পেছনের লোক তখন এগিয়ে আসে। এভাবেই চলেছে লোক বহিষ্কারের প্রক্রিয়া। গেট দিয়ে বেরোবার সময় অনুতোষের হাতে গুটানো ছাতা দেখে প্রহরারত হাতে লাল ব্যাণ্ড বাঁধা লাল মুখো মিলিটারি পুলিশ কটমট করে তার দিকে তাকায়। সভয়ে

গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে সে হাঁপ ছাড়ে। মাঠের দর্শক ছাড়াও গোরারা একক বা দলবদ্ধ হয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তাদের কারো পরিধানে সাদা পোষাক, কারো বা ইউনিফর্ম—সেজে গুঁজে ফোর্ট থেকে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছে। প্রত্যেকেরই হাতে ছড়ি এবং বাহু-সংলগ্না ফিরিঙ্গি বান্ধবী।

পশ্চিম গগনে বিলীয়মান রবির রক্তরাগ ক্রমে ধূসর হচ্ছে। অদূরে গঙ্গা বক্ষের ওপর সচল অচল ভাসমান জলযান-গুলির আর ওপারের সারি সারি কারখানার উচ্চ চিমনি থেকে উত্থিত ধূম্রবাশি ঐ দিকের প্রদোষের ফ্যাঁকাশে আকাশটাকে যেন আরো ঘন কালো করে ফেলেছে। তৃণাবৃত ভেজা মাঠ, গাছপালা আর দূরে দূরে খেলার মাঠের পাশে তাঁবুগুলির ওপর আসন্ন রজনীর কালো আবরণ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। অনুতোষ দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে। বড় রাস্তায় পড়বার মুখে ডাইনে মোড় নিতে গিয়ে তার ছাতাটা অতর্কিতে একটা গোরার গায়ে লাগে। আর যায় কোথায়! গোরাটা একটা অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করে ছড়িটার গোল সীসে আঁটা মাথা দিয়ে অনুতোষের পেটে জোর গুঁতো মারে। তলপেটে হাত চেপে অনুতোষ কঁকিয়ে উঠে। রাগে তার গায়ে জ্বালা ধরে। তার অবচেতন মনে হয়তো তখনো মাঠের গোরা-কালার মারা-মারির দৃশ্য সক্রিয় ছিল। তাই পারিপার্শ্বিক ভুলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে ছাতা উঁচিয়ে গোরাটার মাথা লক্ষ্য করে আঘাত হানে। গোরাটা বাঁ হাত তুলে বাধা দিতেই অনুতোষ এক ঝটকায় ছাতাটা টেনে নিয়ে বনবন্ করে ঘোরাতে থাকে। গোরারা দলে ভারি। তারা একত্রে তাকে আক্রমণ করে। শুরু হলো অহিরাবণের যুদ্ধ। এক কিশোর বালকের সঙ্গে মদগর্বিত শ্বেত হনুমানের লড়াই। লোকজন এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে থাকে। লোকজনের হৈ চৈ ডাক চিৎকার শুনে গোরার দল জামা জুতো ঝেড়ে গ্রীবা উন্নত করে সগর্বে সেখান থেকে অপসৃত হয়। জনতা তাদের বাধা দিতে কিংবা গায়ে হাত তুলতে সাহস করে না।

গোরাদের কীল চড়, লাথি ঘুষি খেয়ে অনুতোষ অচৈতন্য হয়ে মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দু'পাটি জুতো দুদিকে ছিটকে গেছে আর ছাতাটা ভাঙ্গা দুমরনো অবস্থায় পাশেই পড়ে আছে। ছেঁড়া জামা কাপড়ের এখানে সেখানে চাপ চাপ রক্ত। এ দেখে লোকজনের উত্তেজনা বিক্ষোভ চরমে উঠে। তাদের চিৎকার শুনে এবং দৌড়তে দেখে পুলিশও তাদের

পেছনে ছুটছে। অন্যদিক থেকে ঘোড়সওয়ার পুলিশও এসে পড়েছে। তাদের তাড়া খেয়ে জনতা আহত রক্তাপ্লুত অচৈতন্য অনুতোষের কাছে ঘেঁষতে পারছে না। খেলার মাঠের উত্তেজনা এখানেও ছড়িয়ে পড়ে। জনতার লম্ফঝম্ফ ও হৈ হল্লার মধ্যে মোটর সাইকেলে এক পুলিশ সার্জেন এসে অনুতোষকে লাশ তোলার মতো হিড় হিড় করে টেনে সাইকেলে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়! জনতা এক কিশোর বালকের অভিমন্যুর মত সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হয়ে এক অসম যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দর্শনে যেরূপ গর্বিত ও উদ্দীপ্ত এ-দৃশ্য দেখে তারা তদরূপই মুহ্যমান হয়ে পড়ে। একান্ত অসহায়ের মতো প্রতিকারবিহীন অপমান ও লাঞ্ছনার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমে আসে। বিপন্ন অসহায়ের ক্ষোভ ও বেদনায় আর্ত প্রকৃতিও বুঝি সহানুভূতিতে গলে ঝরঝর ধারে অশ্রু মোচন করতে থাকে। রাতের অন্ধকার নেমে এসে অপমানিতের লজ্জা ক্ষোভ কালো আবরণে ঢেকে দেয়।

সন্ধ্যা অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়েছে তবু অনুতোষের দেখা নেই। খেলার মাঠে গোরা-কালার মারামারি ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সংবাদ শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত ও নানা ভাবে পল্লবিত ও নানা রঙে রংঙীন হয়ে শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। মেসে বসে কাকার উৎকণ্ঠা ক্রমে আশংকায় পর্যবসিত। সন্ধ্যা থেকেই অবিরাম বৃষ্টি। উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলেছে। কাকা অস্থির হয়ে অবশেষে এই দুর্যোগ মাথায় করেই তাঁর যে সহকর্মী খেলার মাঠে গিয়েছিলেন তার বাড়ি উপস্থিত হলেন। সেখানে যা শুনলেন তাতে তিনি বিস্মিত।—বুঝলেন লোকমুখে যা রটেছে তা নেহাৎই গুজব—প্রকৃত ঘটনার মারাত্মক রকমের বিকৃতি। কিন্তু তা হলে প্রশ্ন ছেলেটা গেল কোথায়! বিদেশ বিভুঁইয়ে ঝড়বাদলের রাতে তবে কি সে পথ ভুলে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে! কাকা নিজেকে খুবই ধিক্কার দিলেন। ছেলেটাকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া আদৌ সঙ্গত হয়নি। নিজের অবিবেচনা প্রসূত কর্মের জন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত ও মর্মাহত।

ভাইপোকে কি ভাবে খুঁজে বার করা যায় সে সম্বন্ধে সহকর্মির সঙ্গে পরামর্শের পর বিষয়টা পুলিশের গোচরে আনাই স্থির হয়। কিন্তু থানা পুলিশ সম্পর্কে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করবেন তারও উপায় নেই। রাস্তা জন-বিরল—যানবাহন চলাচল প্রায়

বন্ধ। যে দু-একটা ঘোড়ার গাড়ি ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে কিংবা রিক্সা টুংটাং করে তখনো রাস্তা দিয়ে চলেছে তারাও থানার নাম শুনে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—কে জানে পাছে কি ফ্যাসাদে পড়ে! অবশেষে অনেক ভাড়া কবুল করে তারা নিকটবর্তী একটা থানায় যাবার জন্য একটা রিক্সা চেপে বসে! বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই। রাস্তায় কোথাও হাঁটু-জল। দূরে দূরে গ্যাস বাতির টিমটিম আলো বৃষ্টির জলের আবরণে আরো মিটমিট করছে। রাস্তার দোকান প্রায় সবই ঝাপবন্ধ। কেবল উড়েদের দু-একটা পান-বিড়ি সোডার দোকান তখনো খোলা!

থানায় পৌঁছে রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে উভয়ে গেটের মুখে এসে দাঁড়াতেই তন্দ্রালু প্রহরী স্বভাব বশতই সসঙ্গীন বন্দুকটা বাড়িয়ে ধরে বাধা দেয়। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই সে সেটা সামনে টেনে নিয়ে পথ করে দেয়। ভেতরে ঢুকে তারা অবাক! এতবড় লাল বাড়িটা নিঝুম নিস্তব্ধ—বর্ষার আমেজে যেন কাঁথা মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাবিষ্ট। বাঁহাতি হল ঘরের লম্বা টেবিলটার এক কোণে এক বিরাট বপু মাথার লাল পাগড়িটা টেবিলের ওপর রেখে গামছা মুড়ি দিয়ে ঢুলছে। ডাকা ডাকিতে ঢুলুঢুলু চোখে তাদের দেখেই তাড়াতাড়ি পাগড়ি মাথায় চাপিয়ে অতি বিরক্তির সঙ্গে—ক্যা মাঙতা, বলে তাদের সম্বর্ধনা জানায়।

আগন্তুকদের জবাব শুনে পুলিশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর গজগজ করতে করতে—ঠাহ্‌র যাইয়ে। এতনা বারিষমে দুপহ্‌রাত ঝুটমুট ঝামেলা করনে আয়া, বলেই সে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আধা-বয়সী এক ভদ্রলোক তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার চোখে তন্দ্রা, মুখে বিরক্তি, পায়ে স্যাণ্ডেল, পরিধানে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি এবং বাম বাহুর উপর সাদা ইউনিফর্মের কোটটি ঝুলছে। চেয়ারে বসে তিনি একটা খাতা টেনে নিয়ে রুক্ষ খন্‌খনে কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—বলুন, কি বলতে চান?

কাকার বক্তব্য কিছুটা শুনেই পুলিশ অফিসারটি বাধা দিয়ে বলেন—দাঁড়ান। তারপর—তেওয়াড়ি তেওয়াড়ি, বলে উচ্চকণ্ঠে দু'বার হাঁক পাড়েন। তেওয়াড়ি এসে সামনে দাঁড়াতেই বলে—উহ্‌ কামারাসে এক নম্বর খাতাটো লে আও। তেওয়ারি খাতাখানা নিয়ে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই থানার পেছন দিক থেকে দারুণ চীৎকার ভেসে আসে। কাকা

সন্ত্রস্ত, কিন্তু পুলিশমহাশয় নির্বিকার। তিনি খাতা খানা হাতে নিয়ে লক্‌আপ-এ কে ডিউটি দিচ্ছে জানতে চায়। গোলমাল তখনো চলছে দেখে তেওয়ারিকে বললেন—যাকে দেখো ক্যা হুয়া। শালে কুত্তে লোক চুপ না করনেসে উস্‌কো আচ্ছা দাওয়াই দেনে বোলো। উহ্ একেলা না সেকে তো তোমভি হাত লাগাও। তারপর খাতা খুলে তার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করেন– কি নাম কত বয়েস যেন বললেন ?

কাকার জবাব শুনে বললেন যে ও-নামে বা ও বয়সের কেউ এ-থানায় আসেনি। ডায়েরি করতে চান তো আপনার নাম ঠিকানা বলুন। কথা শেষে তিনি আর একটা খাতা নিলেন। কাকার নামের পর ঠিকানা শুনেই পুলিশ অফিসার খাতাটা বন্ধ করেই লাফিয়ে উঠেন—কে আপনাকে এখানে আসতে বলেছে ? এই বর্ষা বাদলার মধ্যে রাত্রি তেরটার সময় এসে হাঙ্গাম হুজ্জং !

কাকা হকচকিয়ে যান। বিনম্র কণ্ঠে কি এমন অপরাধ করেছেন জানতে চান।

—অপরাধ, বলতে অপরাধ ! আপনি মশায় ভুল থানায় এসে খামাকা ঝামেলা লাগিয়েছেন !

কাকা দিশেহারা ! এখন তিনি কি করবেন ? এই জল ঝড়ে কোথায় তিনি থানা খুঁজে বার করবেন ! পুলিশমহাশয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর করুণা উদ্রেকের জন্য কাকা করুণ কণ্ঠে হাত জোর করে বললেন—মহা বিপদে পড়েছি স্যার, দয়া করে যদি থানার নাম ঠিকানাটা বলে দেন।

অফিসারটি কি ভেবে দাঁড়ালেন। কোন থানায় ডায়েরি করতে হবে এবং কোন থানায় গেলে খেলার মাঠের খবর পাবেন তা বলেই পাণ্ডে বলে হাঁক দিলেন—বাবু লোগকো যানে দো।

কাকা ধন্যবাদ জানিয়ে হলঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বেরোবার কালে আবার সেই চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে হুম্ হাম্ দুপ দাপ—আচ্ছা দাওয়াইর রেওয়াজ কানে এল। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! ব্রিটিশ শাসনের লৌহ কাঠামোর এক প্রধান অঙ্গ এই পুলিশ বাহিনী—কঠোর উদ্ধত, সহানুভূতিহীন ও মানবতাবোধ বিবর্জিত। অত্যাচার ও মানুষ নিষ্পেষণের প্রধান হাতিয়ার! অদ্ভুত মনে হলেও ব্রিটিশ রাজত্বে এই পুলিশ মিলিটারির দোসর। পোষাকেআশাকে সুস্পষ্ট প্রভেদ থাকলেও আচার

আচরণে আর কালা আদমি দমনে নেই ভেদ। উভয়েরই ভূমিকা আশ্চর্য সাদৃশ্যপূর্ণ। অপেক্ষমান রিক্সাতে উঠে কাকা প্রথমে খেলার মাঠের খবর নেবার জন্য যে থানার নাম করেছে সেখানে রিক্সা নিয়ে যেতে বললেন। থানাতে থানাতে সাদা এবং কালো পুলিশে যে এত প্রভেদ থাকতে পারে তা এ থানাতে না এলে তিনি জানতে কিংবা বুঝতে পারতেন না। থানার আকারে এক হলেও প্রকৃতিতে যেন অনেক ব্যতিক্রম! দ্বার রক্ষীর বাধা পেরিয়ে বাঁ-হাতি হল ঘরটাতে প্রবেশ করে মনে হলো পরিবেশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। লাল-মুখো পুলিশ অফিসারটি কর্মব্যস্ত। এগিয়ে টেবিলের বিপরীত দিকে মুখোমুখি দাঁড়াতেই তিনি চোখতুলে একবার দেখে—Take your seat Babu—বসো বলেই আবার কর্মব্যস্ত হলেন। কয়েক মিনিট অন্তর কাজ শেষ করে বললেন—Well babu, what can I do for you?—বলো কি করতে পারি?

সাহেবকে দেখেই কাকা কি ভাবে কথা পারবেন তা ভেবে রেখেছিলেন। সুতরাং সাহেবের প্রশ্ন শোনা মাত্রই বিষয়টা তাকে বললেন।

সাহেব কাকার কথারই পুনরুক্তি করে বললেন—teen aged, great lover of sports.—খেলা পাগল ছেলে—মফঃস্বল থেকে খেলা দেখতে এসেছে। তারপর একটা খাতা খুলে দেখতে দেখতে—রাম সিং, বলে হাঁক দিলেন।

রাম সিং—জী হুজুর বলে সেলাম ঠুকে সামনে এসে দাঁড়াতেই সাহেব হুকুম দিলেন—বাবু লোককো লক-আপ দেখাকে লে-আও। কাকা রাম সিং-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে জানালেন যে, বালকটি সেখানে নেই।

সাহেব টেবিলের ওপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টোকা দিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর কাকার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—Is the boy a sportsman too—বালকটি কী খেলোয়ার?

কাকা—হাঁ বলতেই সাহেব টেলিফোন তুলে অপারেটরকে লালবাজার দিতে বলেন। লালবাজারের নাম শুনেই কাকা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কথা শেষ হতেই সাহেব টেলিফোন রেখে বলেন—An injured and an unconscious boy of your descriptions was picked up by a special squad police sergeant from the Maidan this evening and taken to Medical College Hospital,

—তোমাদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন একটি আহত অচৈতন্য ছেলেকে লালবাজার বিশেষ শাখার এক পুলিশ সার্জেন্ট আজ সন্ধ্যায় মাঠ থেকে তুলে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে গেছে। I am very sorry babu —আমি খুবই দুঃখিত বলে তিনি তাদের বিদায় দেন।

খবর শুনেই কাকা সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে ছোটেন। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে এসে অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও তিনি অনুতোষের পাত্তা পেলেন না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি তখন এক ওয়ার্ড-বয়কে ধরেন। সব কিছু শুনে সে অন্য একজনকে ডেকে আনে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তার নিকট হতে জানা গেল—হ্যাঁ ঐরকম এক লেড়কা এক পুলিশ সার্জেন্ট নিয়ে এসে জমা দিয়ে গেছে। লেকেন উহ্ বহুত জখম আউর বেঁহুশ থা, এখন কেমন আছে তা সে জানেনা। কিন্তু চোখে না দেখলে কী করে বুঝবে ঐ বালকই অনুতোষ কিনা। অথচ সন্ধ্যা ছটার পর রোগী দেখার হুকুম নেই। এখন উপায় ? ওয়ার্ড-বয়কে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে কোনো ফল হলো না। অগত্যা নিরুপায় কাকা অর্থ কবুল করেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলে। তাকে অপেক্ষা করতে বলেই ওয়ার্ডবয় অন্তর্হিত। অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে জানায়, রোগীর হুঁশ ফিরেছে। এখন নিদ্রা যাচ্ছে। রামজীকা কিরপাসে বাঁচ গিয়া। আভি কোই খাতরা নেহি। আপ্ ফিকর মৎ কি জীয়ে। ডিউটি নার্সকে বলে বহুৎ কষ্টে রাজী করিয়েছি। জুতি রাখকে এক আদমি আইয়ে—লেকেন সোরগোল মৎ বঁচাইয়ে।

ওয়ার্ডবয়ের সঙ্গে কাকা ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের প্রশস্ত হল ঘরে প্রবেশ করেন। কোণের দিকে একটা বেডের নিকটে এসে মৃদু অস্পষ্ট আলোতে ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝলেন, হাঁ, অনুতোষই বটে। শরীরের নানা জায়গায় আর মাথার কাণের ওপরটাতে ব্যাণ্ডেজ বঁধা। বুঝলেন ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। কাকার চক্ষু ফেটে জল এলো। মাথায় হাত দিতে গিয়ে ওয়ার্ডবয়ের নিষেধে পিছিয়ে এলেন। ঘর থেকে বেরোবার কালে চতুর্দিকের রোগীদের দেখে কাকা একেবারে হতভম্ব! কারো হাত পা বাঁধা এবং নাকে সরুনল অক্সিজেন সিলিণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত। কারো বা সারা মাথা ব্যাণ্ডেজ মোড়া। বেডের পাশে স্ট্যাণ্ড-এ ঝুলন্ত বোতল থেকে রবারের লম্বা টিউব হাতের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা। কোথাও বা রোগীরা চিৎকার করছে। কেউ বা কাঁদছে! এক অদ্ভুত

বেদনাকর অভিজ্ঞতা। বাইরে এসে নার্সকে দেবার জন্য তার নাম ঠিকানা লিখে ওয়ার্ডবয়কে দিলেন। পরের দিন কখন এলে রোগী দেখা যাবে জেনে নিয়ে ওয়ার্ডবয়ের হাতে বক্‌শিস্ গুঁজে দিয়ে কাকা বেরিয়ে পড়েন। শ্রাবণ-ধারার তখনও বিরাম নেই—ঝরঝর ধারায় ঝরছে। রাস্তায় হাঁটু জল।

ভোরের দিকে চক্ষু মেলে অনুতোষ প্রথমেই উপলব্ধি করে হাতে পায়ে মাথায় এবং শরীরের নানা জায়গায় কি সব বাঁধা! নড়তে গিয়ে সারা শরীরে ব্যথা আর মাথায় অধিক যন্ত্রণার অনুভূতি! ভাল করে চক্ষু মেলে চেয়ে বুঝলে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত পরিবেশে সে শুয়ে আছে। ঘরের আনাচে কানাচে তখনো অন্ধকার লেপ্টে আছে। তা ছাড়া মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পারছেনা বলে স্থান সম্পর্কে সম্যক কিছু ধারণা করতে পারছে না। আর কিছু ভাববার মতো শক্তিও বুঝি তার নেই। অবসন্নের মতো চক্ষু বুঁজে পড়ে থাকে! কতক্ষণ এভাবে আছে মনে নেই। হঠাৎ আবার চক্ষু মেলে চাইতেই মনে হলো অন্ধকার আর নেই পরিষ্কার দিনের আলো। মাথার উপর একটা ফ্যা'ন বন্‌বন্ করে ঘুরছে। কেমন যেন সন্দেহ জাগে—কাকার মেসের ঘরে তো এ রকম পাখা নেই। এমনি সময় এক শুভ্র-বসনা মেমসাহেব এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে কি বললেন। অনুতোষ তার কিছুই বুঝলো না। অতঃপর মেমসাহেব ভাঙা ভাঙা অপরিষ্কার বাংলা বলতেই অনুতোষ হাঁ করে। মেমসাহেব থার্মোমিটারটা তার মুখে পুরে দেন। ধূম্র দর্শনে অগ্নির উপস্থিতির মতোই অনুতোষ বুঝলে সে হাসপাতালে আছে। মনে পড়ে একবার এক অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে এরূপ শুক নার্সের সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছিল। নার্স চলে যেতেই অনুতোষ আবার চক্ষু মুদে পড়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে কেন এবং কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। না কিছুই স্মরণে আসছে না—স্মৃতির পর্দা যেন গাঢ় কালো আবরণে ঢাকা আস্তে আস্তে তা স্বচ্ছ হতেই খেলার মাঠ থেকে শুরু করে গোরাদের সঙ্গে মারামারি পর্যন্ত ঘটনাগুলো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিন্তু তারপর কি ঘটেছে তা আর কিছুতেই মনে পড়ে না।

দুপুরের দিকে কাকা এলেন। অনুতোষ তখনো নিদ্রিত। এক পরিচিত ডাক্তারকে ধরে হাসপাতালের হাউস সার্জেনের নিকট হতে অনুতোষের

আঘাত সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে নেন। শরীরে গোটা ছয়েক ষ্টিচ করা হয়েছে। একমাত্র মাথার আঘাত ছাড়া অন্যগুলি সাংঘাতিক কিছু নয়। কানের উপর থেকে মাথায় কিছুটা কেটে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে—একটা ভোঁতা কিছু দিয়ে জোরে আঘাত হেনেছে। শরীরের অনেক জায়গায় কালশিরা দেখে বোঝা যায় ছড়ি দিয়ে বেদম প্রহার করা হয়েছে। এমন কি ঘটেছে যার জন্য এই বালক এমন নিষ্ঠুরতার শিকার হলো! কোন শত্রুও তো এত নৃশংস হতে পারে না। কাকা ভেবে কূল কিনারা পান না। পুলিশের তরফ হতেও আর কোন সাড়া শব্দ, খোঁজ খবর নেই। হাসপাতালে দিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র অনুতোষই ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু ডাক্তার বারবার সাবধান করে দিয়েছে—উত্তেজিত হতে পারে এমন কিছু বর্তমানে করা বা বলা চলবে না। কাকা বিছানার পাশে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

আপিসের পরে বিকেলের দিকে তিনি আবার এলেন। অনুতোষ তখন তন্দ্রাবিষ্ট। জ্বরটা আবার বেড়েছে। শরীরের ব্যথা ও মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। চক্ষু মেলে কাকাকে দেখে সে কান্নাকাটি তো করলোই না বরং তার মুখে শংকা ও সংকোচের ভাব ফুটে উঠেছে। কাকা সান্ত্বনার সুরে বললেন—তুমি কিছু ভেবোনা অনু, ডাক্তারবাবু বলেছেন তুমি শীঘ্রই সেরে উঠবে। কাকার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে —বাবা মাকে কিছু জানিও না। জানলে তাঁরা অস্থির হয়ে ছুটে আসবে। তোমার দুর্ভোগ তখন বাড়বে বৈ কমবে না। কথা শেষে অনুতোষ হাঁপিয়ে পড়ে চক্ষু মুদে পড়ে থাকে। কাকা নিশ্চল নির্বাক হয়ে বিছানার পাশে অপেক্ষা করেন। কিন্তু অনুতোষ আর কিছু বলে না। হাসপাতাল ত্যাগের ঘণ্টা বাজতেই—কাল আসবো বলে তিনি উঠে চলে যান।

এভাবে আপিস আর হাসপাতাল করে করে দু'সপ্তাহ অন্তে কাকা একদিন ভাইপোকে হাসপাতাল থেকে মেসে নিয়ে আসেন। সে-সন্ধ্যায় কাকার ঘরে যেন মেলার ভীড় জমেছে! অনেক চা চলে আর অসংখ্য সিগারেট পোড়ে। সকলের কণ্ঠেই উৎসুক জিজ্ঞাসা—কি ঘটেছিলো? অনুতোষ তখনো দুর্বল। মনের উত্তেজনা ও অস্থিরতা ব্যক্ত না করে শান্ত শীতল ক্ষীণ কণ্ঠে সকলের প্রশ্নের উত্তরে সেদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি

করে। ছাতা তুলে গোরাদের আক্রমণ করবার পরে কি ঘটেছে, গোরারা দলে কতজন ছিল তা সে আর বলতে পারে না। অনুতোষ তৎক্ষণে একজন হিরো বনে গিয়েছে। তার এই অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য সে অধিকাংশেরই ভূয়সী প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করে। যদিও বয়োবৃদ্ধদের কেউ কেউ তার সাহসকে দুঃসাহস আখ্যায় ভূষিত করে তিরস্কার যোগ্য বলে মনে করেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অর্থও উক্ত ঘটনা থেকে সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়!

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই অনুতোষ কাকার নিকট বাড়ি যাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কাকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—সে কি? তুমি এখনো অবধি ভাল করে সেরে ওঠনি। একে দুর্বল শরীর তার উপর এত দূরের রাস্তা! এই অবস্থায় তোমাকে একা ছেড়ে দিলে দাদা বৌদিই বা আমাকে কি বলবেন! আহাম্মক ভিন্ন আমাকে তাঁরা আর কি আখ্যা দেবেন?

অনুতোষ খানিক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবে তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বলে,—আমার শরীর ভাল আছে, তবে একটু দুর্বল। সে জন্য তুমি কিছু ভেবো না কাকু।

শরীরের অজুহাতে যখন অনুতোষকে নিবৃত্ত কিংবা তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা গেল না তখন কাকা খেলাধুলো থিয়েটার বায়োস্কোপ ইত্যাদি দর্শনীয় ও প্রলোভনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফল হলো না অনুতোষ অনড় অটল। অগত্যা কাকা একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবুও দু'দিন তিনি তালবাহানা করে কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন অনুতোষের তাড়ায় অস্থির হয়ে রেলের টিকিট কেটে আনবেন আশ্বাস দিয়ে তিনি আপিস চলে যান। পরের দিন সন্ধ্যা রাত্রে অনুতোষ কলকাতা ছাড়ে।

যে অপমান, অভিমান, লাঞ্ছনা নির্যাতন আর বেদনার ভার বয়ে নিয়ে এক অপরিণত বয়স্ক কিশোর বালক সেদিন কলকাতা পরিত্যাগ করে তাহাই বুঝি তার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসূচী নির্ধারিত করে কালের অমোঘ লিখন ললাটে এঁকে দেয়। রেলগাড়ি ছেড়ে যখন সে স্টীমারে গিয়ে উঠে তখন যামিনীর শেষ যাম। দূর্বল শরীরে দীর্ঘ রেল পথের ধকল বুঝি তার সহ্য হচ্ছিল না। স্টীমারে উঠেই সে উপরের ডেকে আশ্রয় নেয়। চতুর্দিকে শান্ত শীতল পরিবেশে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই সে

ঘুমিয়ে পড়ে। স্টীমার নোঙর তুলে কখন ছেড়েছে, কোথায় ভোর হয়েছে তা সে টের পায় নি। প্রত্যুষে নদীর শীতল হাওয়ার কোমল স্পর্শ আর দিগ্বলয়ের ঊর্ধে উত্থিত প্রভাত অরুণের প্রথম কিরণ রেখা তার ললাট চুম্বন করে তাকে জাগিয়ে দেয়। চোখ রগড়ে উঠে বসে সে বিমুগ্ধ নয়নে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে থাকে। নদীর এপার ওপার দৃষ্টি গোচর নয়। ভাদ্রের ভরা নদীর বিপুল জলরাশি ফেঁপে ফুলে দু'কূল ছাপিয়ে উন্মত্ত দিশেহারা হয়ে ধেয়ে চলেছে। আর তাদের জলযান—ডাবল-ডেকার স্টীমার—যেন ময়ূরপঙ্খী নাও—স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। দূরে পানসী আর জেলে-ডিঙি গুলিকে মনে হচ্ছে এক ঝাঁক শ্বেত কপোত উড়ে চলেছে। অপূর্ব দৃশ্য—নদীমাতৃকা সুজলা সুফলা বাংলার এমন অপরূপ মনোহর রূপ অনুতোষ আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। কবিকণ্ঠে সুর মিলিয়ে মাথা নত করে মনে মনে আবৃত্তি করে—"নমো নমো ·····জননী বঙ্গভূমি।" বিস্ময় বিমুগ্ধ অনুতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শরীরটা তার অদ্ভুত রকম ভালো লাগছে। মনে হলো শরীরে অনেক বল সঞ্চারিত হয়েছে। বিগত কয়েকদিন যে মানসিক যন্ত্রণা আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছে তা আর নেই। হঠাৎ অজ্ঞান্তে চিবুকে হাত ছোয়াতেই আবার যেন সে কেমন হয়ে যায়। পুরনো ব্যথা চাগিয়ে উঠে। উপরের ঘা শুকোলেও মনের গভীরে বুঝি তা দগদগ করছে। সেদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক দৃশ্য তার মনের পটে আবার ভেসে উঠে। অনুতোষ ভেবে পায়না কিভাবে গোরারা দলবদ্ধ হয়ে তাকে এমন ভাবে জখম করে। মাঠে তখনো দিনের শেষ আলো ছিল। আগে পিছে ডাইনে বাঁয়ে লোক চলাচল করছিল। তাদের মধ্যে এমন কি কেউ ছিলনা যে অকুস্থলে এগিয়ে এসে বুক চেতিয়ে তাকে রক্ষা কিম্বা সাহায্য করে! চলার পথে এমন দৃশ্য সে হলে কখনো বরদাস্ত করতো না। তার রক্তে আগুন ধরে যেতো। আক্রান্তকে রক্ষার জন্য অগ্রপশ্চৎ বিবেচনা না করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দশজনে মিলে ভারুর মতো একজনকে ঠেঙানোকে অমানুষিক বর্বরতা আর হার্মাদি ভিন্ন আর কি বলা যায়!

অনুতোষের মনে ভালো-লাগা ভাবটা সরে গিয়ে বিষাদে ভরে উঠে। স্মরণ করতে চেষ্টা করে এমন ঘটনা ইতিপূর্বে তার জীবনে ঘটেছে কিনা। স্কুলের ক্লাসে, কিম্বা খেলার মাঠে এরই ক্ষুদ্র সংস্করণ যে না হয়েছে এমন

নয়। শারীরিক শক্তিতে না কুলোলেও সে বুক ফুলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু এ কী! কলকাতার রীতি কি তা হলে—চাচা আপন বাঁচা! না, তাও তো নয়! কলকাতার রাস্তাঘাটে, অলিগলিতে এরূপ ঘটনার ব্যতিক্রমই তো খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়! তবে কি খোদ ইংরেজ দেখে ভয়ে সবাই পেছপাও হয়েছে! দেশটা কি একেবারে ফেরুপালে ভরে গেছে? না হলে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের শ্বেত অধিবাসী মুষ্টিমেয় ইংরেজ সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এতবড় বিশাল দেশ শাসন করতে পারতো? দেশে মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদের অভাব কি! এদেরই প্রতিভূ হয়ে ধূর্ত শঠ ইংরেজ রাজত্ব করছে। অবিচার অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালাচ্ছে! মীরকাশিম, মীরমদন, মোহন লাল আর নেই। তাদেরকে ইংরেজ হয় নন্দকুমারের মতো ফাঁসীতে লটকিয়েছে নয় তো কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দিয়ে নির্বংশ করেছে।

অনুতোষ কয়েক মুহূর্তের জন্য বুঝি ভাবের স্রোতে গা ভাসিয়ে এক অন্তহীন অতীত রক্তাক্ত পথ পরিক্রম করে আসে। পরক্ষণেই মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়—তাতেও কি শান্তি স্থাপিত হয়েছে? ওদের সিংহাসন নিরাপদ নির্বিঘ্ন হয়েছে? বিদ্রোহ বিপ্লব অশান্তির কি শেষ হয়েছে? সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে বুড়ি বালামের তীরের যুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞ—এসব কিসের ইংগিত, কোন অলক্ষ্য বিধাতার হাতছানি! দেশ শনৈঃ শনৈঃ নিশ্চিত গতিতে, অলংঘ্য নিয়মে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ও পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে! গভীর হতাশা ও অন্ধকারের মধ্যে অনুতোষ উজ্জ্বল আশার আলোক দেখতে পেল, শুনতে পেল গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে বীর বিপ্লবীর উদ্দীপ্ত ভাষণ—জীবন যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া প্রণামের রক্তজবা ভাসাইলাম! শুনতে পেল কবি রচিত সেই অমর গীতি—বুড়ী বালামের তীরে ·····লক্ষ বক্ষ চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।

স্নায়বিক উত্তেজনায় অনুতোষ নির্জীবের মতো চক্ষু মুদে পড়ে থাকে। তার নিমীলিত নয়নের পর্দায় একের পর এক অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠে। সেই অগ্নি যুগের শত শত শহিদের রক্তে রঞ্জিত লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শ্রুত অশ্রুত বীর বিপ্লবী শহিদের দল বুক চেতিয়ে নির্ভিক চিত্তে অমিত বিক্রমে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাদের

শাণিত কৃপাণের আঘাতে উদ্যত সঙ্গীণ হস্তে শত সহস্র শত্রুসৈন্য লুটিয়ে পড়ছে। তাদের দৃপ্ত পদক্ষেপে অসংখ্য বাঁধার দেয়াল ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। অদূরে দাঁড়িয়ে অনেক অচেনা মুখ তাকে স্বাগত জানায়। অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্প বৃষ্টি শুরু হয়। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠে—রক্ত কমলে গাঁথা মালাখানি বিজয়লক্ষ্মী পরাবে তাদের গলে। সঙ্গে সঙ্গে সুরলোকে উচ্চ নিনাদে দুন্দুভি বেজে ওঠে!

অনুতোষের তন্দ্রা টুটে যায়! চক্ষু মেলে বুঝলে স্টীমার ভেঁপু বাজিয়ে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বাঁক নিয়ে পাড়ের দিকে এগোচ্ছে! স্টীমারের উভয় দিকের চাকার জল কেটে অগ্রগতির শব্দের সঙ্গে নদীর কলকল্লোল মিশে এক অদ্ভুত শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। অনুতোষের মনে হলো সুরধুনীর সেই সুর থেকে যেন মন মাতানো গুরুগম্ভীর মহাসঙ্গীত ভেসে আসছে—মুক্তির মন্দির সোপান তলে কতো প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।

সারাদিন ঘুমে জাগরণে কাটিয়ে সন্ধ্যা সমাগমে দূর হতে রেলস্টেশনের আলোগুলি দেখে অনুতোষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মনে হলো বহু দিন দূর প্রবাসে দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে ঘরের ছেলে ঘর ফিরে আসছে। স্টীমার যতই পাড়ের দিকে এগোচ্ছে আলোর মালা যেন নদী তরঙ্গে লুকোচুরি খেলছে আর হাতছানি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে—এসো এসো! এসো বীর—উন্নত তব শির। খুশিমনে অনুতোষ স্টীমার ছেড়ে অপেক্ষমান রেল গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

পথহীন নির্জন অরণ্যে সদলে চলতে চলতে সে দিনের ঘরে ফেরার ঘটনা—মায়ের কান্না, বোনের বিস্ময় আর পিতার আশীর্বাদ ইত্যাদি সব কিছুই এখনো অনুতোষের স্মৃতির কোঠায় দেদীপ্যমান। ভোর রাত্রে গাড়ি থেকে নেমে সে হেঁটেই বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

ভোরের আলো সবে ফুটেছে। সদর দরজায় জোর কড়া নাড়ার শব্দে নিয়তির ঘুম ভেঙ্গে যায়। মাকে না ডেকে ঝি এসেছে ভেবে সে একাই উঠে দরজা খুলে দেয়। ঝির বদলে দাদাকে দেখে সে লাফিয়ে উঠে। চেঁচিয়ে মাকে ডাকতে থাকে—ওমা, দেখে যাও কে এসেছে।

পরক্ষণেই আগন্তুককে সম্বোধন করে বলে—তোমার আক্কেল খানা কি বলো তো দাদা! সেই যে গেলে, আর কোন খবর নেই! কাগজে দেখি শীল্ড খেলা শেষ অথচ তোমার নো-পাত্তা! আমরা ভেবে সারা। বিদেশ বিভূঁই—কলকাতা শহর। চেনা জানা নেই—কি জানি কি অঘটন ঘটলো! কাকাকেও বলিহারি! তিনি তো আর তোমার মতো ছোট্ট খোকাটি নয়—একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তার তো উচিত ছিলো একটা চিঠি দেওয়া। এবার পূজায় আসুক না, মজা দেখাবো। একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে নিয়তি হাঁপিয়ে পড়ে।

চেঁচামেচি শুনে মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। নিয়তিকে ডেকে সুধান—হাঁরে, অনুকে এখনো বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? দু-রাত্তির একদিন বেল স্টীমারের ঝক্কি পুইয়ে এসেছে। বলি তোর কি আক্কেল বুদ্ধি কোনদিন হবে না? বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে উঠোনে পা দেন।

—আজ্ঞে তা হচ্ছেনা। আগে দেখাও আমার জন্য কি কি এনেছ। এত করে বলে দিলুম।—একটা কাগজেও লিখে দিলুম। বের কর দেখি ওতে কি আছে—বলেই নিয়তি পুঁটলিটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে।

অনুতোষ খুবই লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করে। আদরের ছোট বোনকে এখন কি বলে সান্ত্বনা দেবে। কি দিয়ে কি ভাবে তার প্রত্যাশা পূর্ণ করবে! কিন্তু সে তো জানে না, গত কয়েকদিন তার শরীরের ওপর দিয়ে কি ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তখন ওসব মনে রাখবার মতো অবস্থাই তার ছিল না। বোনটিকে কাছে টেনে আদর করে বলে—হবে, সবই হবে, কিচ্ছু ভেবো না। এখন ঘরে চলো। ততক্ষণে মা এসে পড়েছেন, বোনের হাত ধরে অনুতোষ বারান্দায় উঠে আসে।

জননীর সুক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টি অনুতোষ কিন্তু এড়াতে পারলো না। ছেলে মেয়ের পেছনে তিনি বারান্দায় উঠে আসেন। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হারে অনু, তোর কি হয়েছে বল তো বড্ড রোগা রোগা দেখাচ্ছে। তোর চলন বলনও যেন কেমন অস্বাভাবিক। তারপর সম্মুখে এসে মুখখানা তুলে ধরে আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করেন—তোর মুখে কানে মাথায় এসব কিসের দাগ? নিশ্চয় ভীষণ কোন একসিডেণ্টে পড়েছিলি —বল সত্যি কিনা। পুত্রের কোন সংবাদ এতদিন ধরে না পেয়ে জননী যে ঘোরতর অমঙ্গলের আশংকা করেছেন তার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি

শিউরে ওঠেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অদূরে দাঁড়ানো অনুতোষের পিতাকে ডাকলেন—দেখে যাও কেন তোমাকে বারংবার হরিশ ঠাকুরপোকে টেলিগ্রাম করতে বলেছিলাম। তিনি আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, দাওয়ার খুঁটি ধরে বসে পড়েন। নিয়তি মায়ের আর্ত কণ্ঠ শুনে এবং চোখের জল দেখে হতভম্ব ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সে দাদাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। অনুতোষ মায়ের অবস্থা দেখে নির্বাক নিস্পন্দ। মাকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা খুঁজে পায় না। বিহ্বল দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। পিতা কাছে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন—ঘরে যাও—গিয়ে বিশ্রাম কর।

তারপর থেকেই শুরু হলো সাধনা—শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম সাধনম্—অনুতোষের শক্তি সাধনা। সে যুগে বাংলা দেশের নগরে নগরে প্রতি মহল্লাতেই এমন কি সুদূর গ্রামে গঞ্জেও থাকতো একটি করে ব্যায়ামাগার ও তৎসংলগ্ন পাঠাগার। ঐ পাঠাগারের একটি প্রকোষ্ঠে কিম্বা আল-মারিতে থাকতো প্রাথমিক চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষার অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র ও সাজ সরঞ্জাম। এই সব প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস ছিল খুবই সীমিত।—একমাত্র সভ্য সভ্যাদের প্রদত্ত চাঁদা আর জন সাধারণ থেকে সংগৃহীত মুষ্টি ভিক্ষা। এরূপ জনহিতকর ও মানুষগড়ার প্রকল্পের জন্য অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। ঐ অর্থাভাব সংস্থাপক প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সততা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও জন-সেবাপরায়ণতা কায়িক শ্রম দ্বারা পরিপূর্ণ হতো। সরকারের শ্যেন-দৃষ্টির কারণে সে কালের রাঘব বোয়ালেরা কচিৎ কদাচিৎ এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহস করতো। ভোটাভুটি যদিও বা ছিল ভোটারের সংখ্যা ছিল সীমিত। সুতরাং ভোটযুদ্ধ তেমন জমতো না। সেজন্য এখনকার মতো এত মাতামাতি হানাহানিরও অবকাশ ছিলো না। এছাড়া রাজনৈতিক কারণেও ভোটকুড়োনিরা এসবের ছায়া মাড়াতো না। ফলে দলীয় সংকীর্ণতা, কলুষতা ইত্যাদি চরিত্র হননকারী পাপাচার এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কোনরূপ দুষ্ট, দূষিত চক্রের সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না। এক নির্মল পবিত্র উন্মুক্ত উদার পরিবেশে

প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুবক যুবতীদের চরিত্র গঠিত হতো। যুবশক্তি সংহত করে দেশে এভাবেই মানুষ গড়ার কাজ চলেছিল!

অনুতোষের পাড়াতেও এরকম একটি ব্যায়ামাগার ছিল। খেলাধুলোয় প্রচণ্ড উৎসাহ থাকলেও শরীর চর্চার প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না। বরং অনীহা'ই ছিল বলা যায়। সেজন্য কোনোদিনও সে ওদিক মাড়ায় নি। কিন্তু কলকাতার মর্মান্তিক ঘটনার পর তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। নিজেকে শক্তিধর করবার প্রচণ্ড ইচ্ছা তার মনে জেগেছে। শরীরের শক্তি সামর্থ্য থাকলে মাঠে সেদিন দান উল্টে গিয়ে বিপরীত কাণ্ডই ঘটাতো। অন্তত এভাবে বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতালে যেতোনা! ইতিমধ্যে পাড়ার এবং পরিচিত অনেকেই কলকাতায় তার দুর্ঘটনার খবর শুনেছে। কিন্তু ঘটনাটা জানেনা। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল তা অনুরুদ্ধ হয়েও অনুতোষ কাউকে বলেনি, এমনকি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনকেও নয়। তার অন্তরে শ্বেত প্রভুদের প্রতি যে নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ তুষের আগুণের মতো অহর্নিশ জ্বলছে তার খবর কেউ জানল না।

লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে অনুতোষ একদিন পাড়ার ব্যায়ামাগারে উপস্থিত। স্বভাব চরিত্র ভাল ও লেখাপড়ায় মেধাবী বলে সকলেই তাকে জানে। ব্যায়ামাগারে তার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি ছাত্র ও শিক্ষকের কৌতূহল উদ্রেক করে। শিক্ষক মহাশয় অনুতোষকে দেখেই হেসে বললেন—অনুতোষ যে, এসো এসো। হঠাৎ কি মনে করে!

অনুতোষ সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিলে—আজ্ঞে, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা। তার মুখে আর কোন কথা যোগালো না।

—সাধু সাধু, উচ্চারণ করে শিক্ষক মহাশয় সহাস্যে বললেন—দেবী সরস্বতীর সঙ্গে মল্লদেবের কিন্তু বিষম বিবাদ বিসম্বাদ। দেখো বাবা, দেবী না শেষকালে বিগড়ে যান।

শিক্ষক মহাশয়ের কথার অর্থ ঠিক মতো ধরতে না পারলেও তার মনে হলো উহার মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ইংগিত রয়েছে। শরীর চর্চার উৎসাহ তার দপ্ করে নিবে যায়।

এর পরে পাড়ার জিমনাষ্টিক ক্লাবে অনুতোষের আর যোগ দেওয়া হলো না। তবে কি বেপাড়ার কোন ক্লাবে গিয়ে সে ভর্তি হবে যেখানে তাকে কেউ জানে না চেনে না। কিন্তু সেখানেও তার শারীরিক শীর্ণতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার

চাইতে প্রথমে ঘরে বসে ব্যায়ামাভ্যাস করলে কেমন হয়! মনের এরূপ নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসার জের কাটিয়ে অনুতোষ অবশেষে একদিন একখানা ব্যায়াম-চর্চার বই কিনে ফেললে।

সেই থেকে শুরু হলো একান্তে একমনে অনুতোষের শরীর চর্চা। একলব্যের মতো নীরবে নিভৃতে শক্তির আরাধনা। দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করতে এসে নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নীচজাত বলে প্রত্যাখ্যাত হলেন। অভিমানাহত বালক একলব্য গৃহ ত্যাগ করে বনবাসী হলেন। গভীর বনে দ্রোণাচার্যের এক মৃন্ময় মূর্তি গড়ে তাঁকেই গুরু কল্পনা করে তিনি ঐ মূর্তির সম্মুখে ঐকান্তিকতার সহিত ধনুর্বিদ্যা অনুশীলন করতে লাগলেন। মনের দুর্দমনীয় শক্তি ও একান্ত নিষ্ঠা ও সাধনার জোরে একলব্য কালক্রমে গুরু দ্রোণাচার্যের অনুপস্থিতি ও অগোচরে তাঁরই বিদ্যা, কলাকৌশল ইত্যাদি অদ্ভুত ভাবে আয়ত্ব করেন। অবশেষে এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে সে যুগের এক মহা-ধনুর্ধর অর্জুনের চাইতেও নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করলেন। ফলে প্রিয় শিষ্য অর্জুনের নির্বন্ধাতিশয্যে দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই প্রতিভাবান্ অনার্য বীরপুরুষের দক্ষিণ হস্তের খণ্ডিত অঙ্গুলি গ্রহণ করে আর্য অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করলেন। উপখ্যানের সে এক করুণ বিষণ্ণ অধ্যায়।

অনুতোষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তদরূপ না হলেও একলব্যের অনুরূপ মনোবৃত্তি নিয়েই বিনা-গুরুতে তার শরীর-চর্চা শুরু হয়। সে কালের অসাধারণ শক্তিধর রামমূর্তি, শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, গোবর ইত্যাদি অনেক নাম ততদিনে তার জানা হয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে কাকে যে সে মনে মনে গুরু রূপে বরণ করেছিলো তা কেউ জানেনা।

একদিন শেষ রাত্রে পাশের ঘর থেকে অনুতোষের বুক-ডন, বৈঠক ইত্যাদির হুঁমহাম, ফোঁসফোঁস শব্দ পিতামাতার কর্ণে প্রবেশ করে। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও শব্দটা কিসের তা বুঝতে তাঁদের দেরী হয় না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও অনুতোষের নিকট যখন তার আঘাত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না তখন পিতা কলকাতায় ছোট ভাই হরিশের নিকট চিঠি লিখে ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হন। ভাইয়ের চিঠিতে আর একটা বিষয়েরও উল্লেখ ছিলো—একদিন তার অবর্তমানে সাদা পোষাকের পুলিশ অনুতোষ সম্পর্কে খোঁজখবর করেছে। যদিও পুলিশ

মেসের ঠাকুর চাকরের নিকট হতে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি তবুও সতর্কতার জন্য বিষয়টা তাঁদের গোচরে আনা দরকার। কেননা বাঘে ছোঁয়ার মতো পুলিশ ছুঁলেও আঠার ঘা। ঐ চিঠি পেয়ে তাঁরাও সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছেন। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবের নির্বন্ধাতিশয্যেও কলকাতার প্রকৃত ঘটনা তাঁরা প্রকাশ করেন নি। অধিকন্তু পুত্রের শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের জন্য তাঁরা গর্বিত হয়েছেন। সুতরাং অনুতোষের দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ও উৎকর্ষতা সাধনের প্রচেষ্টা তাঁদের মৌন-সম্মতি ও আশীর্বাদ-ধন্য ছিল। ছেলের অধ্যবসায় ও একাগ্রতার জন্য তাঁরা খুশী। তবে শক্তি সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সে দিকে তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। সে যুগে শক্তি সামর্থ্যে বলীয়ান, জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় গরীয়ান অনেক যুবকেরই শয়নে স্বপনে জাগরণে একমাত্র ধ্যান ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন—জননী জন্মভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। সুতরাং অনুতোষের ক্ষেত্রেও বুঝি তার ব্যত্যয় হলো না। বয়ঃসন্ধি আর শক্তি অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষের দেহে ও মনে যে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয় তা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তার জীবনের ধারাও বুঝি ঐ খাতে প্রবাহিত করে।

অনুতোষ সসম্মানে পাশ করে স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করেছে। প্রাক্তন ভাল এবং মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে সেও আমন্ত্রিত। অনুষ্ঠান সূচীতে গতানুগতিক খেলাধুলা দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি ছাড়াও দৈহিক শক্তির ক্রীড়া প্রদর্শনেরও উল্লেখ রয়েছে। এই বিশেষ প্রদর্শন ব্যবস্থাই তাকে উপস্থিত থাকতে আকৃষ্ট করে। প্রাক্তন সহপাঠীদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারে স্কুলের নতুন ড্রিল ও জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার আপন শিষ্যসহ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার প্রধান অতিথি। শহরের অনেক হোমরা চোমরা গণ্যমান্য দিশি বিলাতী সাহেব সুবা উপস্থিত। তা ছাড়া দর্শনার্থীর সমাগমও প্রচুর! জাঁকজমক ও জৌলুসে মাঠ মেলার রূপ ধারণ করেছে। সাহেব মেমের হুড়োহুড়ি, য়ুনিয়ন জ্যাক্ এর ছড়াছড়ি। পরিবেশটা অনুতোষকে কলকাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিরক্তিতে তার মন ভরে উঠে। খেলা-দেখার আগ্রহ উবে গিয়ে মাঠ পরিত্যাগের বাসনা জাগে। অনুতোষ উভয় সংকটে পড়ে। শ্বেতাঙ্গ

বিদ্বেষের জন্য মাঠ ছেড়ে গেলে ড্রিল মাষ্টারের শারীরিক ক্রিড়া কৌশল দেখা থেকে বঞ্চিত হবে। শেষে নিজেকে বুঝিয়ে পড়িয়ে ধৈর্য ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্কুলের বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠান্তে স্কুল পরিচালক মণ্ডলির অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। সভাপতি রূপে জেলাধীশ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষে খেলাধুলো শুরু হয়। সবশেষে ফিজিকেল ফিটস্ (শারীরিক-বল ক্রীড়া) উল্লেখ থাকার জন্যই বোধ হয় গতানুগতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সমবেত জনতা বিশেষ উৎসাহিত বোধ না করলেও আখেরের চাঞ্চল্যকর অনুষ্ঠান দর্শনের আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। ভীড় হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

টাগ-অফ-ওয়ার সাঙ্গ হলে পর সামিয়ানার নিচে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের থেকে কিছু দূরে টাঙানো আর একটা সামিয়ানার নিচে নাতি-উচ্চ এক মঞ্চ স্থাপিত হলো। পাশেই প্যারালাল বার বসলো। সবই যেন পূর্ব থেকেই তৈরি ছিলো। চোঙা থেকে ঘে ষণাকারীর কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের পশ্চাতে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একদল যুবক। দৃপ্ত সুশৃঙ্খল পদক্ষেপে তারা মঞ্চের উপর উঠে এলো। সকলেরই বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, সুন্দর অঙ্গশ্রী—পরিধানে নীল রঙের ইলাস্টিক জাঙিয়া আর হাতকাটা সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পুরোগামী ব্যক্তির সঙ্গে অনুগামীদের প্রভেদ সুস্পষ্ট। তাঁর ঘনশ্যাম কান্তি, উন্নতশির, বাবরি-ঢাকা বৃষস্কন্ধ, ব্যুঢোরস্ক, আজানুলম্বিত দীর্ঘ ঋজু দেহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কুলের সহপাঠীদের বর্ণানুযায়ী অনুতোষ বুঝলো—ইনিই স্কুলের নতুন ড্রিল মাস্টার।

মঞ্চে উঠে দলের সকলে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সমাগত অতিথি অভ্যাগত ও দর্শকবৃন্দকে আনত শিরে অভিবাদন জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে চোঙা থেকে ধ্বনিত হলো—এখন স্কুলের ড্রিল মাস্টার ও ফিজিকেল ট্রেনর কালীকিঙ্কর বাবু পেশীর নৃত্য প্রদর্শন করবেন। মাস্টার দলের সম্মুখভাগ থেকে সরে মাঝখানে এলেন। অন্য সকলে তখন মাস্টারের পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে দু'হাতে কোমর ধরে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যে তাদের হাত ও পায়ের পেশী সমূহ স্ফীত হয়ে উঠেছে। মাস্টার গায়ের গেঞ্জি খুলে হঠাৎ লম্ফ দিয়ে শূন্যে উঠে বাবরি দুলিয়ে বুক চেতিয়ে এমন ভাবে দাঁড়ালেন

যে তাঁর শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী সকল অদ্ভুত ভাবে ফুলে উঠেছে। অপরাহ্ণ বেলার সূর্যের আলোকচ্ছটা রক্তবর্ণ সমিয়ানা ভেদ করে মাস্টারের গায়ে পড়েছে। অনুতোষের মনে হলো কালো মসৃণ পাথরে খোদাই গ্রীকদের শক্তির দেবতা হারকিউলিস দাঁড়িয়ে আছেন! চতুর্দিক থেকে মুহুর্মুহু করতালি তাঁকে অভিনন্দিত করে। তাঁরপর শুরু হলো তাঁর পেশীর নর্তন। পশ্চাতের যুবকবৃন্দ মাস্টারেরই অনুরূপ ভঙ্গীতে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে। মাস্টার অদ্ভুত কৌশলে তাঁর সারা শরীরের পেশীর নৃত্য প্রদর্শন করলেন। দর্শকগণ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত। তাদের অবিশ্রান্ত করতালি মাস্টারকে অভিনন্দন জানালো। তিনি সম্মুখে ঝুঁকে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে ধীর পদক্ষেপে পেছনে সরে গেলেন। এগিয়ে এলো শিষ্যবৃন্দ। প্রত্যেকেই শক্তিমান—মজবুত গঠন ও স্বাস্থ্যে উচ্ছল। একে একে তারা মুগুর-ভাঁজা, বারবেল, প্যারালাল বার ইত্যাদির খেলা অদ্ভুত দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে প্রদর্শন করে। তাদের রণপায়ে দৌড় প্রতিযোগিতা ও কৃত্রিম যুদ্ধ এবং লাঠিখেলা খুবই উপভোগ্য হয়। সকলেই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

সূচী অনুযায়ী এর পরেই মাস্টারের শক্তি পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—শৃঙ্খল ভঙ্গ, মোটরের গতিরুদ্ধ ও যাত্রীসহ বুকের উপর মোটর গাড়ি অতিক্রমণ। অপেক্ষমান জনতা অধীর আগ্রহে উদ্বেলিত। অনুতোষ রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষারত। মাস্টার মঞ্চের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে আজানুলম্বিত হস্তে স্টাচুর মতো স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দুই ব্যক্তি শিকল সহ মঞ্চে আবির্ভূত। তারা মাস্টারের বক্ষ ও হস্তদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলে। সমবেত দর্শকবৃন্দ অবাক বিস্ময়ে দেখে মাস্টারের বক্ষ ও হস্তদ্বয়ের পেশী সমূহের সঙ্গে সারা শরীর ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। অনুতোষের মনে হলো পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমুদয় ভারতবাসীর রুদ্ধ আক্রোশ বুঝি মাস্টারের শরীরে এসে ভর করেছে! তিনি এক ভয়াল কালান্তক মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। মাথার বাবরি চুল চোখমুখ সব ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ কি যেন ঘটলো—ঠং করে শেকল ভাঙার আওয়াজের সঙ্গে ঝন ঝনাৎ শব্দে শেকল মঞ্চের উপর খসে পড়লো। ছিন্ন হলো বন্দীর বন্ধন, শুরু হলো জনতার মহা উল্লাস। সেই সঙ্গে অতিথি অভ্যাগতদের করতালি মিশে চতুর্দিক মুখরিত। মাস্টার স্মিত আননে

সম্মুখে ঝুঁকে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। অতঃপর দৃপ্ত পদক্ষেপে তিনি মঞ্চে থেকে নেমে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে হুস হুস ভোঁস ভোঁস শব্দে একটা মোটর গাড়ি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো।

হঠাৎ জনতার মধ্যে সম্মুখে এগিয়ে আসার হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে। কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে তা বন্ধ হয়। একটা মোটা কাছি ও মোটা চওড়া চামড়ার বেল্টসহ একজন এগিয়ে আসে। কোমরবন্ধ নিয়ে মাস্টার নিজ হাতে তা পরে ড্রিল করার কায়দায় নানা ভাবে শরীর নাড়াচাড়া করেন। শক্তির উচ্ছ্বাসে তিনি যেন ফেটে পড়ছেন। সারাশরীর অস্থির চাঞ্চল্যে টগবগিয়ে উঠলো। মোটর গাড়ির চালক নেমে এসে মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে সম্মুখ সারি থেকে তিন জন লোক নিয়ে মোটর গাড়িতে উঠে বসেন। কাছি ধরে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি এগিয়ে এসে এক প্রান্ত মাস্টারের হাতে দিয়ে অপর প্রান্ত গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলেন। মাষ্টারের শক্তি পরীক্ষার চরম মুহূর্ত আসন্ন। তিনি অচল অটল বিরাট এক মহীরুহের ন্যায় দণ্ডায়মান! হঠাৎ হুস করে একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে মোটর গাড়ি গড়গড় শব্দে গতিশীল হলো। কাছিতে পড়লো টান। মাষ্টার কাছিটাকে কোমরে এক পাঁক দিয়ে দু'হাতে ধরে শরীরটাকে একটু পেছনের দিকে হেলিয়ে দিলেন। সঙ্গের লোক এক দুই তিন গুণতেই একরাশ ধোঁয়া উদ্গারণ করে গাড়িটা এগোতে চেষ্টা করে। প্রথম আকর্ষণে মাষ্টার বুঝি একটু নড়ে উঠে কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে দৃঢ় অকম্পিত শক্ত মুঠিতে রশি ধরে দাড়িয়ে আছেন। গাড়ি এগোতে পারছে না। ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো রুদ্ধ আক্রোশে গোঁ গোঁ শব্দ করে কেবল ধোঁয়া ছাড়ছে। এক থেকে দশ গোনা শেষ হতেই গাড়ি হুস করে কালো ধোঁয়া ছেড়ে থেমে যায়। চতুর্দিকে অজস্র প্রশংসা ধ্বনি ও করতালি তাঁকে অভিনন্দিত করে।

সব শেষে অদ্ভুত শক্তি কৃতিত্বের সঙ্গে বুকের ওপর দিয়ে যাত্রীসহ চলমান মোটর গাড়ির ভার-বহন ক্ষমতা দেখিয়ে তিনি আর একবার সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। মাষ্টার শহরের শ্রেষ্ঠ শক্তিমান পুরুষ বলে বিবেচিত হলেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শনে মুগ্ধ শহরের দুই ধনী ব্যক্তি এক একটি করে সোনা ও রূপার মেডেল দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং সরকার পক্ষ থেকে

এককালীন ৫০০৲ (পাঁচশ') টাকা দানের কথা ঘোষণা করলেন। দর্শকবৃন্দ হৃষ্ট চিত্তে অশেষ প্রশংসা মুখর হয়ে করতালি দিলেন।

যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনুতোষ বার্ষিক অনুষ্ঠানে এসেছিলো তা সার্থক হয়েছে। যাঁকে সে খুঁজছিলো এতদিনে বুঝি তাঁর সাক্ষাৎ ও সন্ধান মিলেছে! মাষ্টারের প্রতি অনুতোষ এক অদ্ভুত আকর্ষণ ও প্রাণের টান অনুভব করলো। এত শক্তির আধার অথচ কেমন নমনীয় কমনীয় নিকষিত কৃষ্ণমূর্তি—সদা হাস্যময়। শরীরে কোথাও প্রকাশ নেই শক্তির ঔদ্ধত্য কিংবা উগ্রতা। আচার আচরণে কথা বার্তায় নেই কোন রূপ অশালীন রুক্ষতা। মাষ্টারের মতো করেই অনুতোষ নিজেকে গড়ে তুলতে কৃতসংকল্প হলো। লেখা পড়ার সঙ্গে শরীর চর্চা, খেলাধুলো নিয়মিত ভাবেই করে চলেছে কিন্তু তাতে মন ভরছে না- শরীরের আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না। কোথাও যেন রয়েছে গলদ, ঘটছে ত্রুটি। শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভব করছে। মনে মনে সে মাষ্টারকেই শিক্ষক রূপে বরণ করেছে। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য লাভের উপায় কি? জানা শোনা নেই—উপযাচক হয়ে পরিচয় করতে গেলে যদি সে পূর্বের মতো অবহেলিত হয়? তা হলে মাষ্টার সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণার সৌধ যে ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যাবে। তা সে সহ্য করতে পারবে না। একমাত্র স্কুলের কোন শিক্ষকের মাধ্যমে সে পরিচয়ের সুযোগ করে নিতে পারে। কিন্তু তাতে কেমন যেন হীনমন্যতা বোধ হয়। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। অনুতোষ অধীরভাবে তারই অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রতীক্ষিত সুযোগ উপস্থিত! উপলক্ষ সরস্বতী পূজা। বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনাই ছিলো সে-যুগের ছাত্র-ছাত্রী বালক বালিকাদের প্রধান আনন্দোৎসব-এর উৎস। তাতে না ছিল ছোরা ছুরি, ঘুষোঘুষি, জোরজবরদস্তি, জুলুমবাজী কিংবা বোমাবাজী করে চাঁদা আদায়। স্বেচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানেই পূজার ভাণ্ডার ভরে উঠতো। ভক্তিপূর্ণ ভাব গম্ভীর পরিবেশে দেবীর অর্চনা হতো। পূজা অন্তে হতো গান বাজনা, যাত্রা থিয়েটার, শরীর চর্চা ইত্যাদি শিক্ষামূলক নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। উদবৃত্ত অর্থ নানা লোকহিতকর কর্মে ব্যয় হতো। মানব জীবনের

বিবর্তনের মতো এ যুগে দেবীর গঠন ভঙ্গীতে ঘটেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। কপালে করাঘাত করে উচ্চ কণ্ঠে বলতে ইচ্ছা করে—হায়, মা কি ছিলেন, আর কি হলেন! পূজা মণ্ডপে ভাব গম্ভীর পরিবেশে, পূতঃ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্তে চলেছে দিবারাত্রি কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী মাইকের চিৎকারে চুটকি চটুল হিন্দীগানের পদাবলী। পূজার ষোড়শ উপচার উপকরণের চাইতে বিশেষ করে নজরে পড়ে বাহ্যিক জাকজমক, বিজলী আলোর ফুলঝুরি আর আনুষঙ্গিক নানা রোশনাইয়ের কেরামতি—যাকে অবিমৃষ্য অপব্যয় আর হঠকারিতা ভিন্ন আর কোনো আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। আর পূজা—একদিনের পূজা তিন দিন, তিন দিনের পূজা ৭ দিন, ১০ দিন—এসবই ভ্রষ্টাচার আর ধর্মের নামে কলুষতা। তার পর পূজা শেষে আবাধ্যা দেবীর বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষ প্রকাশ্য রাজপথে চলে অশালীন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিকৃত অরুচিকর বিষদৃশ আনন্দভোগ। বাঙালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ভক্তি শ্রদ্ধা বিবর্জিত পূজার সঙ্গে সম্পর্ক লেশহীন এসব অনৈষ্ঠিক কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড, আচার আচরণ এক গভীর পঙ্কিল আবর্তের সৃষ্টি করে সমাজ জীবনকে শুধু লাঞ্ছিত উৎপীড়িত করছে না দুষ্টক্ষতের মতো দিনে দিনে তার ক্ষয়িষ্ণুতা বৃদ্ধি করে চলেছে।

কলেজে পূজা ইত্যাদি নানা উৎসব অনুষ্ঠানের কর্তৃত্বভার প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের উপর। সে বৎসর কলেজের পূজা কমিটিতে অনুতোষ স্থান পেয়েছে। কলকাতা থেকে ফেরার পর তার মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কথাবার্তায় আচারআচরণে সপ্রতিভ হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শরীরের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সুতরাং স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কর্মকর্তাদের মধ্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনুতোষ শারীরিক শক্তি-ক্রিড়া প্রদর্শনও যোগ করতে সমর্থ হয় এবং তার ব্যবস্থাপনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করে।

জিমন্যাষ্টিক মাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ আসে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মাষ্টার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। প্রথম সম্ভাষণেই অনুতোষ মুগ্ধ। মনে হলো মাষ্টার যেন এতদিন ধরে তারই প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর গর্বোন্নত শির, সহজ সরল দৃষ্টি, হাবভাব, কথাবার্তা

অনুতোষকে বইএর সেই বিখ্যাত পংক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়—He stares disdainfully upon thousand athlets and bows to serve as a horse to children (তিনি সহস্র বলীকে অবজ্ঞাভরে দেখেন কিন্তু বালকদের সঙ্গে ঘোড়া ঘোড়া খেলবাব জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন)।

ক্রমে উভয়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য স্নেহ প্রীতি ও ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠে। মাষ্টারের স্নেহধন্য অনুতোষ নিজেকে সার্থক ও ভাগ্যবান মনে করে। মাষ্টারের শিক্ষাধীন অনুতোষের শরীর চর্চায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। দিনে দিনে শক্তি সামর্থ্যের সঙ্গে শশীকলার মতো অঙ্গশ্রী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অনুতোষ তারুণ্যে উপনীত হয়। মাষ্টার ও তাঁর দলের সঙ্গে এখানে সেখানে শক্তি-ক্রীড়া প্রদর্শন করে সেও খ্যাতি অর্জন করে।

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ভারতব্যাপী দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে। জেল ফেরৎ কতিপয় "স্বদেশী ওয়ালা" এক ধনীর বদান্যতায় শহরের এক পরিত্যক্ত নিভৃত অঞ্চলে নামমাত্র খাজনায় জমি সংগ্রহ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা জোরদার করার উদ্দেশ্যে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাকে স্বয়ম্ভর করবার মানসে তাঁরা চাষবাস, গোপালন থেকে শুরু করে তাঁতবস্ত্র বয়ন ইত্যাদি বিবিধ কুটির শিল্পের প্রবর্তন করেন। এভাবে ধনীর দাক্ষিণ্যে ও নির্ধনের মুষ্টিভিক্ষা আর কায়িক শ্রমের বিনিময়ে আশ্রমটি এক বিখ্যাত বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দেশের যুবশক্তিকে সংহত করে মানুষের মতো গড়ে তুলবার জন্য সেখানে ছিলো নানারূপ শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা। শরীর গঠনের জন্য যেমন ছিলো ব্যায়ামাগার খেলাধুলোর মাঠ, সাঁতার কাটার দীঘি, সেরূপ মনে উৎকর্ষতা সাধনের জন্য ছিলো স্কুল, লেকচাররুম ও লাইব্রেরী। সেখানে দিনে রাত্রে নানারকম ক্লাস বসতো, বক্তৃতা হতো। শহর পরিদর্শন করতে এসে আশ্রমে পদার্পণ করেন নি সেযুগে এমন প্রখ্যাত নেতা নেত্রী বিরল ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, গান্ধিজী, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আজাদ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশপ্রাণ, বড় ছোট নেহরু, সরোজিনী নাইডু নেতাজী, তুলসী গোঁসাই থেকে শুরু করে খ্যাত অখ্যাত অনেকেই দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন।

"স্বদেশীওয়ালারা" প্রতিষ্ঠানের সেবা বিভাগ পরিচালনায়ও কম

কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নি। রোগজর্জরিত, নিরন্ন অভাব অনটন-ক্লিষ্ট কটিবস্ত্র সম্বল দুস্থ দেশবাসীর রোগ নিরসন ও নিরাময়ের জন্য কেবল ওষুধ বিতরণ করেই ক্ষান্ত হতেন না। অকুণ্ঠ ও অক্লান্ত ভাবে তাদের সেবা ও পরিচর্যা করতেন। দিবারাত্রি রোগীর ভিড় লেগেই আছে। অধিকাংশ চিকিৎসাই হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক মতে। এ্যালোপ্যাথির ব্যবস্থাও যে না ছিলো তা নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বোধে এমন কি অপারেশন পর্যন্ত করা হয়। শহর ও তার আশপাশে কলেরা, টাইফয়েড বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হলে প্রতিষ্ঠানের সেবা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে যেত। তাছাড়া আশ্রমিকরা আপদে বিপদে আর্তজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতো। এসব নানা কারণেই আশ্রমের জনপ্রিয়তাও প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আশ্রমের ব্যায়াম, কুস্তি, যুযুৎসু ইত্যাদি স্কুলের ড্রিল মাষ্টার কালি-কিঙ্কর বাবুর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর সঙ্গে যাতায়াত করে অনুতোষেরও আশ্রমের ছোট বড় সকলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। মহারাজের সান্নিধ্যলাভও তার এভাবেই হয়। সুদূর রাজস্থানের এক নির্জন মরুভূমি অঞ্চলে দীর্ঘদিন রাজবন্দীরূপে অন্তরীণ থাকার পর মুক্তি পেয়ে মহারাজ নিজবাসভূমে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী ছন্নছাড়া অশান্ত জীবনকে তিনি ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারলেন না। তাঁর সংকটাকাঙ্ক্ষী মন সংসারের নিরুত্তাপ একঘেয়েমি আর পুলিশের সদা সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে বুঝি হাঁপিয়ে ওঠে। ঘর ছেড়ে একদিন তিনি বেরিয়ে পড়েন। অমৃত কাননের খ্যাতি তখন বহুদূর বিস্তৃত। নতুনের খোঁজে তিনি এসে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং আপন পছন্দমতো কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রথমেই তিনি ছোরা, লাঠিখেলা এবং শিক্ষাবিভাগ ঢেলে সাজান। তারপর সেবা ও শুশ্রূষার কেন্দ্রটিও নিজ হাতে তুলে নেন এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক বাছাই করলেন। অনুতোষও তাদের মধ্যে একজন। এভাবেই অনুতোষ আশ্রমের সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করে।

সেবাদলে ভর্তি হবার পর থেকেই তার নব-জীবনের সূত্রপাত। মাষ্টার আর মহারাজ—তার দুই গুরু। শারীরিক গঠনে, বল বীর্যে, দয়া দাক্ষিণ্য এঁরা কেউ কারো চেয়ে ন্যূন নন। অদ্ভুত দুই পুরুষ—যেন কৃষ্ণ বলরাম।

অনুতোষ এঁদেরই স্নেহধন্য। এঁদেরই সযত্ন তত্ত্বাবধানে তার শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনের চর্চা আরম্ভ হয়—ঘটলো দ্রুত পরিবর্তন। নিজের অজ্ঞাতে এভাবেই তার ভবিষ্যৎ জীবন বুঝি নির্ধারিত হয়ে গেলো।

জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, স্বধর্মে নিষ্ঠা, অনলস শ্রম ও কর্ম-দক্ষতার জন্য মাষ্টার ও মহারাজ অমৃতকাননের ছোটবড় নির্বিশেষে সকলেরই অতি প্রিয়। তাঁদের শিক্ষাদানের প্রণালীও অভিনব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! মাষ্টার সপ্তাহে দু'দিন ক্লাশ বন্ধ রাখেন। প্রত্যেককে সব কিছু হাতে কলমে শিক্ষা করার সুযোগ দেন। আর মহারাজ সপ্তাহে মাত্র ৩'দিন ক্লাশ নেন এবং বাকী ক'দিন অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অবকাশ দেন। আশ্রমের নিজস্ব বিদ্যাপীঠেও তাঁরা এ ধারাই অনুসরণ করেন। মহারাজ বলতেন ধর্ম, পুরাণ, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি না হলে স্বদেশ ও স্বজাতিকে জানা যায় না। জ্ঞান, গুণ, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বিকাশের জন্য প্রয়োজন তাদের চর্চা ও অনুশীলন। তা না হলে মনের বিকাশ ঘটে না—আর মানসিক বিকাশ না হলে উদ্দেশ্য ও কর্মের সমন্বয় সাধিত হয় না। অতি সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি এইসব আলোচনা করতেন। বিষয় নির্বাচনে কৃতিত্ব আর সেই সঙ্গে শব্দ বাছাই করে বোঝাবার ক্ষমতাও ছিল তার অসাধারণ। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে বিগত আড়াই হাজার বৎসরের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে বৌদ্ধ ধর্মের পতন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান, মুসলমান আক্রমণ, মানদণ্ডী ইংরেজের রাজদণ্ড ধারণ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ক্রমাবনতি, পরাধীনতার এবং জাতির অধঃপতনের কারণ উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দর-ভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝাতেন।

গান্ধিজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন চলেছে তার উৎপত্তি কোথায় এবং পরিণতি বা কি তা সুস্পষ্ট ভাষায় বিনা-দ্বিধায় ব্যক্ত করতেন। তিনি প্রায়শঃ সখেদে বলতেন হিন্দু মুসলমানের বিভেদ বৈদেশিক শক্তির এক মোক্ষম চতুর অবদান। উভয় সম্প্রদায়ের একতার জন্য সবাগ্রে প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ। কিন্তু গান্ধিজীর শ্লোগান—"রাম রহিমকো যুদা না করো" আর "বন্দেমাতরম্ আল্লাহো আকবর ধ্বনি"—একতা না বাড়িয়ে বিভেদেরই ইন্ধন যোগাবে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের আঁতাত-এর বিষময় পরিণাম—

রক্তপাত ও বিভেদকরণ। কারণ রাজনীতি আর ধর্ম উভয়ের সংমিশ্রণের উর্বরক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হয়েছে তা অদূর ভবিষ্যতে শাসককুলের সহায়তায় ও প্রচ্ছন্ন ইংগিতে এক বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে দেশটাকে ছারখার করে জাহান্নামে পাঠাবে। ধর্মের উত্তাপে যে প্রচণ্ড বাতাবর্তের সৃষ্টি হবে তাতে চক্কর খেয়ে খেয়ে আমাদের আসল উদ্দেশ্য বরবাদ হয়ে যাবে—দেশের সর্বনাশ হবে।

মহারাজ বিশেষ উষ্মার সঙ্গেই বলতেন—এ যেন সেই মধ্যযুগীয় পন্থা—পুরোহিত আর মোল্লাদের ভয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সিংহাসনে অন্ধ অজ্ঞ মসীময় কুসংস্কারের আহ্বান ও অভিষেক। এই প্রসঙ্গে তিনি ইতিহাসের অতীত অধ্যায় থেকে অতীব শিক্ষণীয় জ্ঞানগর্ভ এক সুন্দর কাহিনী শুনিয়েছেন:

গজনীর সুলতান মামুদ প্রতিবেশী রাষ্ট্র খিব-এর (মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান—বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্গত) ওপর রুষ্ট হয়ে উহাকে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধে খিব-এর শাসনকর্তাকে পরাভূত করে মামুদ উহা স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজয়ী মামুদ অতঃপর খিব নৃপতির বিশিষ্ট সভাসদ আমীর ওমরাহদের বন্দী করে গজনীতে নিয়ে আসেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাজ-সভার নামী সদস্য সে যুগের বিখ্যাত এক মুসলমান পণ্ডিত অলবিরুণী (আবু রেহান)।

রাজ্যজয়ের নেশা মামুদকে পেয়ে বসে। ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়। ১০২১ খৃষ্টাব্দে মামুদ পাঞ্জাব জয় করে উহা গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অলবিরুণী হিন্দু এবং তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছেন। সেসব আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার আগ্রহ এবং তাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি বহুদিন থেকেই পোষণ করে আসছেন। মামুদের পাঞ্জাব বিজয় তাঁর সেই বহুকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার মহা সুযোগ এনে দেয়। অলবিরুণী গজনী ছেড়ে পাঞ্জাবের মুলতানে আসেন। সেখানের সূর্যমন্দির হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ। সেখানে থেকেই অলবিরুণী হিন্দুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা ও অনুশীলন আরম্ভ করেন। ভাবলে অবাক হতে হয় যবনের বিরুদ্ধে সেযুগের হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রবল বিরূপতা, বিরুদ্ধতা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কি উপায়ে ঐ যবন মনীষী তা অতিক্রম করে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং ভারতীয়দের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে এতদূর

ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর রচিত আরবী-সংস্কৃত অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক এবং সে যুগের জ্ঞানের ভাণ্ডারে অদ্বিতীয় অসামান্য অবদান ও এক মহৎ সাহিত্যকীর্তি !

এই মহা পণ্ডিত তাঁর "কিতাব-হি-তহ্‌কিকে মাজিল হিন্দে" গ্রন্থে তৎকালীন ভারতীয়দের মনোভাব ও জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমালোচনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাও বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। হিন্দুদের জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলনের পর তিনি বলছেন— বহুমুখী জ্ঞান বিজ্ঞানের আরও উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল যদি ঐ সকল জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হতো এবং তাদের দৃষ্টি ঐদিকে আকৃষ্ট করা যেতো। কিন্তু সময়ের স্রোত ঐরূপ শিক্ষাদান ব্যবস্থার অনুকূল না হয়ে বরং প্রতিকূল। সুতরাং সেকালে নব নব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন কিংবা বিজ্ঞানের গবেষণা ও সম্প্রসারণ সম্ভবপর হয়নি বলেই প্রতীয়মান। এ কারণে বিজ্ঞান বলতে যা কিছু রয়েছে তা উহার সামান্য অবশেষ মাত্র !

—হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার কারণ ওটা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একজনকে জ্যোতির্বিদ আখ্যা পেতে হলে তাকে কেবল জ্যোতিষ সম্পর্কে, বৈজ্ঞানিক তথ্যও অঙ্কশাস্ত্রে, সুপণ্ডিত হলেই চলবে না তাকে ফলিত জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদও হতেই হবে। যতদূর দেখেছি ও জেনেছি তাতে হিন্দুদের গণিতের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার তুলনা করলে মনে হয় যেন মুক্তার আধারের সঙ্গে তেঁতুল বিচির কিংবা মুক্তার সঙ্গে গোবরের অথবা বহুমূল্য স্ফটিকের সঙ্গে সাধারণ পাথরের। আরও আশ্চর্যের বিষয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির অনুশীলনের অভাব হেতু উভয়ের মূল্য একই পঙ্‌ক্তিতে রক্ষিত। ব্রহ্মগুপ্তের মতো একজন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত যখন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা পরিহার করে ঐ জ্যোতির্ময় বলদ্বয়ের উপর ছায়াপাতকে কল্পিত কুগ্ৰহ রাহু কেতুর গ্রাস আখ্যা দিয়ে এক অতি মনোরঞ্জক জনপ্রিয় অলীক কাহিনীর অবতারণা করেছেন তখন নিশ্চয়ই পুরোহিত ও শাসককুলকে খুশী করার জন্যই তিনি এরূপ অবৈজ্ঞানিক, বিবেক-বিরুদ্ধ ঘোরতর অন্যায় অশাস্ত্রীয় ও অবৈধ কর্ম করেছেন।

হিন্দুদের ধ্যানধারণার সঙ্গে পুরাকালের গ্রীক মনীষীদের তুলনা করে

অলবিরুণী বলছেন—গ্রীক দার্শনিকরাও স্বদেশের মাটিতেই বিজ্ঞানের চর্চা করে নানারূপ প্রাথমিক ও মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যাখ্যা করতে তাঁরা কখনো লোকরঞ্জক কুসংস্কারের আশ্রয় নেন নি কিংবা মুখরোচক এমন কিছু বলেন নি যাতে কুসংস্কার দানা বাঁধতে পারে। উচ্চ এক শ্রেণীর গ্রীকরা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য অনুসরণ করে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। জনসাধারণ শাসককুলের শাস্তির ভয়ে স্বভাবতই ভুল, বিকৃত ও বিতর্ক-মূলক অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার মধ্য থেকে হাবুডুবু খেতো।

সোক্রাতিসের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। তিনি পুতুল পূজার বিরুদ্ধাচরণ করলেন এবং নক্ষত্রকে দেবতার আসনে বসাতে অস্বীকৃত হলেন। এ কারণে তাঁর বিচার হলো। এথেন্সের গণ-আদালতে ১২জন বিচারপতির মধ্যে ১১জনই তাঁর মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে রায় দিলেন। সত্য-নিষ্ঠ ও আপন বিবেক বিশ্বাসে অটল অবিচল সোক্রাতিস মৃত্যুবরণ করলেন।

—হিন্দুদের মধ্যে এধরনের লোক বিরল যাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার তাৎপর্য উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দানে সক্ষম ও ইচ্ছুক। সেজন্য তাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপাখ্যানগুলিও একেবারে অবিন্যস্ত এলোমেলো ও অযৌক্তিক এবং শেষ পর্যন্ত কেবল নিম্নস্তরের নির্বোধ আর অর্থহীন বাক্য বিন্যাসের ফুলঝুরি ও অলীক গালভরা বুলিতে পরিপূর্ণ—অসংখ্য, বিরাট অনন্তকাল, অসীম-ব্যাপ্তি, ইত্যাদি গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদের বাষ্পে আচ্ছন্ন ও নামাবলীতে ভরপুর। চিন্তার দৈন্য, অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাসের কুয়াশার গাঢ় আবরণ হেতু এ অবৈজ্ঞানিক মত ও ধ্যান-ধারণাকে যাচাই করতে পর্যন্ত হিন্দুরা পরাঙ্মুখ।

বলা শেষে মহারাজ সকলের সম্মুখে প্রশ্ন রাখতেন—এত বড় একজন বিখ্যাত জ্ঞানীগুণী মুসলমান পণ্ডিতের এইসব উক্তি কি কেবল হিন্দু বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাব প্রসূত! এরূপ কঠোর সমালোচনা কি যুক্তি তথ্য বিবর্জিত। বিষয়টা প্রকৃতই গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য।

সৌর জগতের অসীম রহস্য, গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তন অনুবর্তন আর মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে অনুতোষের জ্ঞান যেরূপ পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে সীমিত সেরূপ চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণ সম্বন্ধে তার জ্ঞানের পরিধি

পিতামহীর নিকট শ্রুত রাহু কেতুর রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু মহারাজের শিক্ষণীয় ভাষণ ও পরবর্তী মন্তব্য সেদিন কিশোর অনুতোষের চিন্তাধারার মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন আবর্তের সৃষ্টি করে। মনে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়। তার আবাল্যের বহুবিধ সংস্কার, বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মনের আকাশে কেমন যেন সন্দেহ সংশয়ের কালো মেঘ দেখা দেয়। মনের এই দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা অনুতোষ একদিন অকপটে মহারাজের নিকট ব্যক্ত করে। শুনে মহারাজ খুবই খুশী হন। উত্তরে বলেন--সৃজন ও বিকাশের উৎস হলো ঐ দ্বন্দ্বাত্মক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা। মানব-সভ্যতার ক্রম বিকাশের মূলেও ঐ তত্ত্ব নিহিত। জন্মলগ্ন থেকে সুদীর্ঘ লক্ষ কোটি বৎসর অতিক্রম করে মানবজাতি আজ যেখানে এসে পৌঁচেছে সে ইতিহাস চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ ও লক্ষকোটি তারকা খচিত অসীম অনন্ত নভোমণ্ডলের চেয়ে কোন অংশেই কম রহস্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়! মনের এই দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা সমালোচনার কষ্টি পাথরে যাচাই করে আপন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করবে এবং সেভাবে মত পথ বেছে নিয়ে জীবনে চলার পথে অগ্রসর হবে। যে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তুমি কর্ম করবে তাই হবে তোমার ধর্ম এবং এভাবেই ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় ঘটে। চৈতন্যশীল মানবের ধর্ম, পশুর ধর্ম আর অচৈতন্য গাছ পালার ধর্ম আকার প্রকার ভেদে আলাদা। বালকের ধর্ম, যুবক ও বৃদ্ধের ধর্ম সময় ও কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। একবার স্মরণ কর আমাদের ধর্ম। সে ধর্ম কী? মন প্রাণ শক্তি সামর্থ্য সবকিছু দিয়ে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন—পরাধীনতার নিগড় থেকে স্বদেশ স্বজাতিকে উদ্ধার করে দেশকে স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী করা। শরীর চর্চা, শক্তি পূজা, গীতা পাঠ ইত্যাদি সদাচরণ ও সদানুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহের ও মনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি, বোমা বারুদ, পিস্তল বন্দুক ইত্যাদি উপচার আহরণ ও অভ্যাস করে স্বধর্ম পালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এগিয়ে চলন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

নির্জন পথহীন গভীর বনে চলতে চলতে এই শপথবাণী স্মরণ হতেই অনুতোষ জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো সিধে হয়ে থমকে দাঁড়ায়। গুরুগম্ভীর স্বরে যেন শুনতে পায় মহারাজের কণ্ঠ নিঃসৃত গীতার সেই অমর অমোঘ

বাণী—কুরুক্ষেত্রে সমরে কুরুপাণ্ডব পরস্পর আত্মজন নিধনের জন্য মুখোমুখী দণ্ডায়মান দৃশ্যে মায়া মোহাবিষ্ট অর্জুনের প্রতি সারথী শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত উপদেশ—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। সেইসঙ্গে পাঞ্চজন্যের কর্ণভেদী নিনাদ। অনুতোষ কেঁপে ওঠে। তার সম্মুখে সমর! অথচ তার চিত্ত অন্য চিন্তায় বিক্ষিপ্ত ও মত্ত। এ শুধু দুর্বলতা নয়—ঘৃণ্য কাপুরুষতা ও আমার্জনীয় অপরাধ! নিজেকে সে শত ধিক্কার দিয়ে কঠিন বাস্তবে ফিরে আসে। পেছনে না ফিরে উচ্চকণ্ঠে স্বদেশকে জিজ্ঞাসা করে—তু'নম্বর সংকেতের টিলাটা কতদূর? চড়াই তো অনেকক্ষণ আগেই শুরু হয়েছে!

অনুতোষের হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত প্রশ্নে স্বদেশ অবাক না হয়ে পারে না। জবাব দেয়—না আর তো বেশীদূর নয়। ঐ তো সেই টিলা।

—হুঁ, বলে অনুতোষ উর্ধ্বপানে চেয়ে শঙ্কিত হয়। আশ্চর্য, প্রকৃতির এই ভয়াল রুদ্র সাজবদল এতক্ষণ তার চোখে পড়েনি! আকাশে পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘগুলি ফুলে ফুলে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে সূর্যকে গ্রাস করতে ছুটে চলেছে। তাদের গুরুগম্ভীর বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গ আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানিতে মনে হচ্ছে যেন দেবদৈত্যের যুদ্ধ বেধেছে। গিরিকন্দর থেকে উত্থিত ধোঁয়াটে বাষ্প রাশি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে গাছপালা সব ঢেকে ফেলে গভীর দুর্গম অরণ্যে চলার বাধা সৃষ্টি করছে। মেঘের ঘনঘটায় নিশাগমের পূর্বেই ভাদ্রের কৃষ্ণা চতুর্দশীর অন্ধকার যেন তার কালো পক্ষ বিস্তার করে দিনের আলো সব শুষে নিয়েছে! শঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষ কিছুটা স্বস্তিও অনুভব করে এই ভেবে যে প্রকৃতির এই ভয়ংকরী সাজগোছ তাদের অভিযানের পক্ষে খুবই অনুকূল। কিন্তু এই সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি হলে—প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী। ফলে তাদের দিক্ নির্ণয় ব্যবস্থা পণ্ড হয়ে যাবে। অবশ্য বিকল্প পথ সে একটা ভেবে রেখেছে কিন্তু সময়ের অভাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বর্তমান ব্যবস্থা বানচাল হলে অগত্যা ঐ পথই তাকে ধরতে হবে তা সে যতই ঘোরানো ও বিপদসঙ্কুল হোক না কেন!

নির্দিষ্ট টিলার নিকট পৌঁছেই অনুতোষ সদলে জঙ্গলাকীর্ণ পথ বেয়ে উপরে উঠে আসে। এক কোণে ঘন লতাপাতা ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাশীকৃত কাঠ সাজানো আছে। অনুতোষ চারদিক ঘুরে দেখে—না কাঠ

অপসারিত হয়নি। কাঠুরিয়ারা এর সন্ধান পায় নি। অনুতোষ কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন ঠিকমতো ধরেছে কিনা তা দেখেই সে সঙ্গীদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ পরবর্তী লক্ষ্যস্থল অভিমুখে রওনা দেয়। বাতাসের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। চতুর্দিকের গাছপালা ছুটোপাটি শুরু করেছে, হাওয়ার ঝাপটায় একে অন্যের গায়ে নুয়ে পড়ছে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ডালপালা, লতাপাতা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অনুতোষ উর্ধ্বপানে চেয়ে দেখে বাত্যাতাড়িত কালো কালো মেঘগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে প্রচণ্ড বেগে উড়ে যাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করে অনুতোষ মনে মনে প্রমাদ গোণে! কিন্তু সঙ্গীদের আশ্বাস দেবার জন্যই বুঝি হাল্কা সুরে স্বগতোক্তির মতোই বলে—বাব্বা, বিরাটাকার কালো কালো ঝাঁকড়া-চুল দৈত্যের মতো মেঘগুলি বাঁধন ছিঁড়ে গুরুগম্ভীর গর্জন করতে করতে যেভাবে প্রতিযোগিতা করে একে অন্যকে ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে তাতে জোর বারিপাতের আশঙ্কা কমে যাচ্ছে। কথা শেষে অনুতোষ জয় শিবশংকর হুঙ্কার দিয়ে জোর কদমে চলতে শুরু করে।

ঝড়ো বাতাস ঝোপঝাড় থেকে কালো জমাট-বাঁধা অন্ধকারগুলি যেন ফুঁ দিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জোনাকিগুলিও বেরিয়ে পড়ে হাওয়ার দাপটে উল্কা বেগে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি লাগিয়েছে। পরবর্তী নিশান—দূরের নাতিউচ্চ টিলাটা নিরেট একটা অন্ধকার স্তূপ বলে মনে হচ্ছে। সেদিকে নজর রেখে তারা দুর্গম অরণ্যে এগিয়ে চলেছে। বর্ষণ শুরু হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে যেমনটি আশা করা হয়েছিল তেমনি নয়। ঝড়ের তেজে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি শতসহস্র কণা হয়ে ছুটছে। শরীরে সেগুলি যেন ছুঁচের মতো এসে বিঁধছে। টিলাতে পৌঁছেই অনুতোষ কাঠের স্তূপটা ভালো করে দেখে। লতাপাতার আচ্ছাদনের আড়ালে ওটা অক্ষতই আছে। প্রভাতকে তাতে আগুন লাগাবার ভার অর্পণ করে সে সরে যায়। পেছন ফিরে দেখে ৮' নম্বর টিলা থেকে অসংখ্য আগুনের ফুলকি হাউই বাজির মতো উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অন্ধ তিমির-ঘন রাত্রি। উন্মত্ত প্রকৃতি যেন প্রলঙ্কর তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত। বাতাসের শোঁ শোঁ শোঁ-ওঁ শব্দ যেন শতসহস্র কালনাগিনীর রুদ্ধ আক্রোশের ফোঁসফোঁসানি।

বাইরের সঙ্গে সমতালে অনুতোষের অন্তরেও চলেছে প্রচণ্ড ঝড়! সম্মুখে বিপদসঙ্কুল অভিযান। প্রকৃতির মতোই উদ্দাম বেগে কর্মসিদ্ধির

জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটাই তাদের শেষ ঘাঁটি। এখান থেকেই পাহাড়টা ঢালু হয়ে নিচে সমতল ভূমিতে মিশেছে। দূরে রেল স্টেশনের বাতিগুলি ক্ষীণ আলোক বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। এখানেই তাদের সাজ বদলের পালা। সন্ন্যাসীর ধড়াচূড়া ছেড়ে হাতের চিমটা কমণ্ডলুর বদলে হাতিয়ার ধরতে হবে। অনুতোষ সকলকে বেশভূষা পরিবর্তনের জন্য তৈরি হতে বলে নিরঞ্জনকে নিয়ে টিলার পশ্চাৎদিকে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। শ্বাপদের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে যেখানটায় এসে পৌঁচেছে সেখানটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা! ছোট বড় পাথরে আকীর্ণ। টর্চ জ্বেলে একটা ঝোপের নিকট এগিয়ে যায়। ঝোপের আড়ালে আকারে বড় একটা পাথর পড়ে আছে। অনুতোষ দু'হাত দিয়ে ওটাকে টেনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাত ফস্‌কে যায়। শেওলা-ধরা পাথরটা বৃষ্টির জলে ভিজে পিছল হয়েছে। টর্চের আলোতে পাথরটার চারধার দেখে অনুতোষ সবলে একটা হেঁচকা টান মারতেই পাথরটা সরে যায়। তারপর লতাপাতা সরাতেই একটা বড় গর্ত দৃষ্টি গোচর হয়। টর্চ জ্বেলে গর্তের ভেতরটা ভালো করে নিরীক্ষণ করে একটা কাপড়ের বোঁচকা ও একটা রবারের থলে বের করে আনে। তারপর গর্তটা পুনরায় লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। নিরঞ্জনকে কাপড়ের বোচকাটা দিয়ে রবারের থলেটা নিজ হাতে নিয়ে অনুতোষ দ্রুতপায়ে আগের জায়গায় ফিরে আসে। বোঁচকা খুলে যার যার জামা প্যান্ট নিয়ে সকলে বেশ পরিবর্তন করে। পরিত্যক্ত সন্ন্যাসীর বেশভূষা একটা গাঁটরিতে বাধা হয়। প্রভাত সেটা পূর্বোক্ত গুপ্ত স্থানে রেখে আসে। নতুন পোষাকে সজ্জিত যুবকদল সারিবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। খানিক পূর্বে এরাই যে কৌপীন পরিহিত ভস্মাচ্ছাদিত চিমটা কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী ছিল তা মনে করতেও ভ্রম হয়। তেজোদ্দীপ্ত উৎসাহে চঞ্চল নবীন যুবকদল যেন তাজা ঘোড়ার মতো টগবগ করছে। ঝঞ্ঝা বাত্যা-বিক্ষুব্ধ দুর্যোগের রাত্রি তাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। অনুতোষ সবাইকে একে একে সম্বোধন করে নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করে। অতঃপর অর্পিত কর্মভার অনুযায়ী প্রত্যেকের হাতে হাতিয়ার তুলে দেয়।

সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় তাদের দুষ্কর অবরোহণ। বাংলা মায়ের কতিপয় দামাল ছেলের এক দুঃসাহসিক অভিযানের উদ্দেশ্যে অবতরণ! প্রকৃতির তাণ্ডব ইতিমধ্যে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

গভীর তমসাচ্ছন্ন পিচ্ছিল পথ বেয়ে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল ভেঙে তারা দুর্বার বেগে নেমে চলেছে। হৃদয় তাদের দুর্জয় দুরন্ত সাহসে ভরপুর, কণ্ঠে তাদের মহাসংগীত—'প্রলয়পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্...।' দূরে স্টেশনের আলোক তাদের পথ নির্দেশিকা। বিনা দুর্ঘটনায় তারা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছয়। হাওয়ার দাপট এখানে অনেক কম। সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত মাঠ। মাঠের পরেই নালা, তারপরে রেল লাইন। এই মাঠ ছাড়িয়ে নালা পেরিয়ে রেল স্টেশন পিছনে ফেলে রেল লাইন ধরে অনেকখানি উজিয়ে যেতে হবে। রেল লাইন যেখানে ছোট টিলাটা ভেদ করে গেছে সেখানেই তাদের অভীষ্ট কর্মকেন্দ্র—রেল গাড়ি রুখবার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এ কি, ও কিসের শব্দ! রেল গাড়ির শোঁ শোঁ শব্দের মতোই কানে আসছে! কিন্তু এ সময়ে তো ডাক গাড়ি আসবার কথা নয়! তবে কি তারা খুবই দেরী করে ফেলেছে! পাশ ফিরে দেখে একটা আলোর বন্যা এগিয়ে আসছে। মনে মনে শঙ্কিত হলেও অনুতোষ সকলকে ডবল মার্চ করে এগোতে উৎসাহ দেয় এবং সময়ের হিসেব নিয়ে আন্দাজ করে—হয় ওটা খালি ইঞ্জিন নয় তো মালগাড়ি, ডাক গাড়ি কিছুতেই নয়। অবশেষে সকল সন্দেহের নিরসন করে একটা মালগাড়ি অন্ধকার ভেদ করে বিরাটাকার সরিসৃপের মতো রক্ত রাঙা চক্ষু দেখিয়ে ফোঁস ফোঁস ভোঁস ভোঁস করতে করতে মাটি কাঁপিয়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। টিলা ছাড়িয়ে অনুতোষ সদলে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ায়। প্রভাতকে ছোট রেল পোলটা পেরিয়ে ফিস প্লেট খুলতে বলে নিরঞ্জন ও স্বদেশকে নিয়ে নালার ধারে জাম গাছটার কাছে এগিয়ে যায়। গাছটাকে কেটে সকলে মিলে ধরাধরি করে ডালপালা শুদ্ধ টিলার সম্মুখে রেল লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে ফেলে রাখে। গাছটাকে এমন ভাবেই কাটা হয়েছে যাতে দেখলেই মনে হবে ঝড়ের দাপটে গাছটা শেকর সুদ্ধ উপড়ে এসে এখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ততক্ষণে প্রভাত তার কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে। রেলগাড়ি রোখার গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ সমাধা হয়েছে। সকলে ছোট টিলাটার উপর উঠে আসে। এই টিলার পেট চিরেই রেল লাইন চলে গেছে। সেখানে সকলকে দাঁড় করিয়ে অনুতোষ প্রত্যেককে ডাকগাড়ি থেমে যাবার পর কার কি করণীয় এবং কে কোথায় দাঁড়াবে ইত্যাদি স্পষ্ট করে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়। তারপর টিলার ঢালু দিক দিয়ে নিচে

রেল লাইনের দিকে এগোতে থাকে। অনুতোষ আর একবার পাশ ফিরে দেখে দূর পাহাড়ে ধূমায়িত সমুজ্জ্বল অগ্নি শিখা—তাদের প্রত্যাবর্তন পথের নিশ্চিত দিশারি। রেল লাইনে পৌঁছবার মুহূর্তে দূর থেকে একটা গুমগুম শব্দ কানে আসে। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে—হৃৎ-স্পন্দনও দ্রুততর হতে থাকে! অভিযানের চরম মুহূর্ত আসন্ন! সেই উত্তেজিত মুহূর্তে অনুতোষ নিজেকে অবিচল রেখে ঘুরে দাঁড়ায়। নিরুদ্বিগ্ন নিরুত্তাপ কণ্ঠে সকলকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুনবায় অবহিত করে নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণে আদেশ দিয়ে সকলকে শুভ কামনা জানিয়ে একমাত্র সঙ্গী সমভিব্যহারে রেললাইন ধরে অগ্রসর হয়।

কিছু দূর এগিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে উভয়ে গা ঢাকা দেয়। ততক্ষণে পাহাড়ের বাঁক ছাড়িয়ে ইঞ্জিনের তীব্র আলো ঘনতমিস্রা ভেদ করে পাহাড়ের গায়ে কাঁপন জাগিয়ে শব্দের আলোড়ন তুলে দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে থেকে অনুতোষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাংকেতিক আলোর প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু ছুটে আসা গাড়ি থেকে কোন আলোর সংকেত পাচ্ছে না। অধৈর্য হয়ে সে ঝোলা থেকে টর্চ বার করে টিপতে গিয়ে থেমে যায়। না, নিয়ম বিরুদ্ধ কিছুই সে করতে পারে না। মনে শঙ্কা জাগে তবে কি বিকাশ ডাক গাড়ি ধরতে পারে নি, না কি অন্য কিছু বিপদ ঘটেছে? আশঙ্কা ক্রমে ঘনীভূত হয়ে বিষম ভয়ের আকার ধারণ করে। দূরের রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে ঝোপঝাড় গাছপালা দ্রুত অগ্রসরমান রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সন্ধানী আলোকে ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। আলোর পশ্চাতে অন্ধকারে অনুতোষ হঠাৎ আলোর ফুলকি দেখতে পায়। ওটা কি জোনাকির আলো না অন্য কিছু, না কি দৃষ্টি ভ্রম। চোখ রগড়ে পুনরায় দৃষ্টিপাত করতেই অনুতোষ বুঝতে পারে একটা আলোর বিন্দু জ্বলছে আর নিবছে এবং ধাবমান গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে। নিসংশয় অনুতোষ টর্চ জ্বেলে যথাযথ সাংকেতিক উত্তর জ্ঞাপন করে।

গাড়িটা সামনে দিয়ে হুস হুস করতে করতে টিলার ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতোষ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সঙ্গীকে নিয়ে ছুটতে থাকে। ডাক গাড়ি থেকে নিক্ষিপ্ত থলিগুলিকে কি করতে হবে তা পুনবায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুতোষ মুখে রুমাল বেঁধে বিকাশের আলো লক্ষ্য করে চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।

গাড়ির গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে আসছে। পকেট থেকে রেলের কামরা খোলার চাবি নিয়ে সশব্দে দরজা খুলেই উন্মুক্ত রিভলবার হাতে—হ্যাণ্ডস্ আপ—চিৎকার দিয়ে সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো সে ডাক-কামরার ভেতরে ঢুকে যায়। হতভম্ব ভীত সন্ত্রস্ত কর্মীবৃন্দ হাত তুলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই অনুতোষ তাদের সবাইকে একত্র করে যন্ত্র-চালিতবৎ পেছন ফিরে ঊর্ধ্ব-বাহু হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে বিকাশ ডাকের থলিগুলি বাইরে নিক্ষেপ করতে শুরু করেছে। আর অনুতোষ বাঁ হাতে সর্টিং টেবিলের উপর রক্ষিত ইনসিওর ও রেজিস্ট্রি করা খাম আর সীল করা চামড়ার টাকার থলে সব এক জায়গায় জড় করে। গাড়ি থেমে গিয়ে বিপদ-সূচক সিটি দিচ্ছে। আর দেরী করা ঠিক নয়। বিকাশ একটা খালি থলেতে সে গুলি ভরে নিয়ে নেমে যায়। আর কিছু পড়ে আছে কিনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনুতোষ সর্টিং টেবিলের এক খোপে একটা টাকার থলি দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে চাবি এঁটে নেমে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অতি সুকৌশলে বিদ্যুৎ গতিতে এবং বিনা প্রতিরোধে দুঃসাহসিক লুণ্ঠন কর্ম সমাধা হয়!

গাড়ি থেকে নেমে অনুতোষ ডাকের থলি, সুভাষ ও বিকাশকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। নিশ্চয়ই তারা এতক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দেশিত পথ ধরে এগোচ্ছে। রেল-রাস্তা ছেড়ে যাবার মুহূর্তে অনুতোষ দেখে গার্ড সাহেব দ্রুত পদে এক হাতে লণ্ঠন অন্য হাতে টর্চ নিয়ে গাড়ির ভ্যাকুয়াম ব্রেক পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে আসছে। অনুতোষ গার্ড-এর দৃষ্টি এড়াবার জন্য চট করে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর পাশের নালায় নেমে পড়ে। ডাঙার উপর থাকা এখন তার পক্ষে নিরাপদ নয় যদিও সে জানে রেল গাড়িতে কোন সশস্ত্র প্রহরী নেই। নালাটি রেল লাইনের সমান্তরাল চলে কিছু দূরে গিয়ে বাঁক নিয়েছে। তদনুযায়ী নালা ধরে এগিয়ে বাঁক ছাড়িয়ে সে ডাঙায় উঠে পড়ে। এত দূরে রেল লাইন থেকে নিক্ষিপ্ত টর্চের আলোতে তাকে আর দেখা যাবে না। ওদিকে গাড়ি অচল হয়ে থাকায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে ভেবে যাত্রীদের আর্তনাদ, চেঁচামেচি হৈ হল্লা ছুটোছুটি শুরু হওয়াতে গভীর অন্ধকার রাত্রে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। অনুতোষ পেছন ফিরে সেদিকে কর্ণপাত না করে ত্বরিত গতিতে লক্ষ্যস্থল

অভিমুখে অগ্রসর হয়। ঊর্ধ্বাকাশে দৃষ্টিপাত করে দেখে মেঘের ঘনঘটা অনেক হালকা হয়ে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। তুই একটি তারাও ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে অনুতোষ কাউকে দেখতে না পেয়ে শুধু হতভম্বই নয় খুবই বিচলিত বোধ করে। সময়ের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী প্রভাত, স্বদেশ ও নিরঞ্জনের ইতিপূর্বেই এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের অনুপস্থিতির হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটতে পারে! এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অনুতোষ পাহাড়ের নিম্ন দেশ থেকে আরও উপরে উঠে সম্মুখ পানে চায়। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রেল গাড়ির আলো, ভিন্ন অন্ধকারে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়। অগত্যা সাংকেতিক ধ্বনির মাধ্যম ব্যতীত সকলকে আহ্বান করার ভিন্ন পন্থা নেই। আচম্বিতে অনুতোষের কণ্ঠ হতে শেয়ালের হুক্কাহুয়া ধ্বনিতে বন প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে বন মধ্যে হুয়া হুয়া প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। অনুতোষ নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনুতোষের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে সঙ্গীগণ অচিরেই তার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং বিলম্বের কারণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করে—অনবধানতা বশতঃ একটা ডাকের থলি ঝোপের ভেতর পড়েছিল। গুণতিতে ধরা পড়তেই সেটা খুঁজে বার করে আনতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়। কিন্তু অনুতোষের নিকট এখন বড় প্রশ্ন—বিকাশ কোথায়! তার কি হলো? সে কি পথ ভুলে গেছে? মিলিত হবার সংকেত ধ্বনি কি তার কর্ণগোচর হয়নি? হলে, এতক্ষণে তার এখানে পৌঁছনো উচিত। তার অপেক্ষায় এখানে সবাইকে আটকে রাখা ঠিক নয়। অনুতোষ প্রভাতের হাতে চামড়ার থলেটা দিয়ে তাকে মালপত্র ও দলবল সহ তিন নং স্টেশনে যাবার আদেশ দেয়। সেখানে পৌঁছে ডাকের থলিগুলি খুলে ইনসিওর ও রেজিষ্ট্রি করা খামগুলি বেছে আলাদা করবে। তালাআঁটা ও সীলকরা চামড়ার ক্যাশ ব্যাগ ও ইনসিওর করা খামগুলি খুলে টাকা বের করে নেবে। রেজেষ্ট্রি করা খামগুলিও খুলে দেখবে ভেতরে টাকা আছে কিনা। তারপর খালি থলে, তালা আলাদা করে নিয়ে চামড়ার ব্যাগ এবং চিঠি পত্র সব কিছু অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে। খুব চটপট কাজ শেষ করবে। ভোর হওয়ার আগেই ১নং স্টেশনে পৌঁছনো আবশ্যক।

প্রভাত চলে যেতেই বিকাশের জন্য এখানে অপেক্ষা করাটা অনুতোষের আদৌ সমীচীন বলে মনে হলো না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে তড়িঘড়ি সব কাজ সেরে এক নম্বর স্টেশনে যথাসময়ে না পৌঁছাতে পারলে এক গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাজেই বিকাশকে নিজের থেকেই পথ খুঁজে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতোষ চলতে থাকে। কিছুদূর এগোতেই ঝিল্লির ঐকতান ভেদ করে সুস্পষ্ট তক্ষকের খোক্কর খোক্কর ধ্বনি ভেসে আসে। অনুতোষ ঘুরে দাঁড়িয়ে একই ধ্বনিতে তার প্রত্যুত্তর দিয়ে বিকাশের অপেক্ষা করতে থাকে।

অন্ধ তিমির রজনী। বৃষ্টি ভেজা বৃক্ষপত্র-চ্যুত ফোঁটা ফোঁটা জল ঝোপে ঝাড়ে পড়ে এক অদ্ভুত শব্দের ঝঙ্কার সৃষ্টি করছে। সেই সঙ্গে নিশাচর পশুপাখি, কীটপতঙ্গের কণ্ঠস্বর মিশে বিচিত্র ধ্বনির লহরি তুলে ধরিত্রী যেন তার প্রাণের স্পন্দন ঘোষণা করছে। চতুর্দিকের গাছপালা ঝোপে ঝাড়ে জোনাকির মেলা—ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা এধার থেকে ওধারে উড়ে যাচ্ছে। আবার কখনো বা উপর থেকে নিচে, নিচ থেকে উপরে চক্কর খেয়ে খেয়ে উড়ছে, কখনো বা গাছের শাখা-প্রশাখায়, লতাপাতায় বসে ঝিমোচ্ছে—জ্বলছে আর নিবছে। একই সঙ্গে প্রকৃতির এই বিচিত্র কঠিন কোমল কমনীয় রূপ অনুতোষের বাহ্যিক কঠিন আবরণ ভেদ করে অন্তরে ভাবাবেশ জাগিয়ে তাকে ক্ষণিকের জন্য বুঝি উন্মনা করে। পরক্ষণেই বিকাশের কণ্ঠস্বরে সে আপন সত্তায় ফিরে আসে। বিলম্বের কারণ সম্পর্কে বিকাশকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই অনুতোষ ত্বরিতপদে চলতে থাকে। ডাকের থলে কাঁধে নিয়ে বিকাশ তার অনুসরণ করে।

যথাস্থানে পৌঁছে বিকাশকে তার থলে থেকে ইনসিওর্ড এবং রেজিস্টার্ড খাম এবং চামড়ার ব্যাগ থেকে টাকা পয়সা সব বার করতে বলে অনুতোষ প্রভাতের নিকট গিয়ে দেখে তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্তূপীকৃত খাম পোস্টকার্ড, খণ্ডিত থলি, চামড়ার ব্যাগ ইত্যাদি চতুর্দিক থেকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সব শুদ্ধ কত টাকা হয়েছে। তা জেনে নিয়ে দশ টাকার খণ্ডিত নোটের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে সে বিকাশের নিকট প্রাপ্ত অর্ধাংশ নোটের বাণ্ডিলগুলোর ক্রমিক সংখ্যা মিলিয়ে দেখে যে কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। সংখ্যাগুলো একবার বিকাশকে দিয়েও পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে সেগুলি নিরঞ্জনের হাতে তুলে দিয়ে প্রত্যেকটি বাণ্ডিলের স্টিচ্ খুলে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবার এবং

ক্যাশ ব্যাগের তালাগুলো পাথর দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে টিলার পেছন দিকের খাদে বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়ে ফেলবার আদেশ দেয়। প্রাপ্ত টাকার মোট অঙ্ক (নোট, মুদ্রা ও খুচরো মিলে) দুখানা কাগজে টুকে নিয়ে নোটগুলি একটা কাপড়ের থলিতে এবং খুচরোসহ মুদ্রাগুলি ভিন্ন থলেতে ভরে অনুতোষ নিজ হেপাজতে নিয়ে নেয়।

লুণ্ঠনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ার পরও অনুতোষ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিক ঘুরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখে তবে নিশ্চিত হয়। ইতিমধ্যে সকলে পরিহিত পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে পূর্ববৎ ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর মূর্তি ধারণ করে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে। পর্যবেক্ষণের পর অনুতোষ তাদের কর্মতৎপরতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করে বলে--বিকাশের আগমনের বিলম্ব হেতু তাদের প্রত্যাবর্তনের সময় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং ডবল মার্চ করে দেরিটা পুষিয়ে নিতে হবে। এতবড় একটা দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট সময়ে বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে সমাধা হয়েছে। লব্ধ অর্থও পরিমাণে সামান্য নয়। সুতরাং আশাতীত অসামান্য সাফল্যের উৎসাহে উদ্দীপ্ত ও নব-প্রাণে সঞ্জীবিত যুবকগণ তথাস্তু, বলেই দলপতির অনুসরণ করে।

ঘনঘোর অন্ধকার, বাদলা রাত, পিচ্ছিল পথ, চড়াই উৎরাই, খানাখন্দ, ঝোপঝাড়, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি কোন কিছুই তেজোদ্দীপ্ত যুবকদের গতি রুদ্ধ কিংবা শ্লথ করতে পারে না। সমুদয় বাধাবিঘ্ন অমিত বিক্রমে অতিক্রম করে দুই নম্বর স্টেশনের অগ্নিশিখা আলোকবর্তিকা সম দৃষ্টিপথের সম্মুখে রেখে নির্দিষ্ট সময়সূচী মতোই তারা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়। অনুতোষের অনুমান মতো রজনীর তৃতীয় যাম নিঃশেষিত প্রায়। নির্ঘণ্ট অনুযায়ী এখানেই তাকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। সুতরাং দলের নেতৃত্ব প্রভাতকে অর্পণ করে কিভাবে পূর্ব মহড়া মতো রেলপথ ছেড়ে নির্দেশিত পথে চলে পাহাড় উল্লঙ্ঘন করে নিজ নিজ আবাসে পৌঁছতে হবে তাহা পুনরুল্লেখ করে। ইহার ব্যতিক্রমে বিষম পরিণতি সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়। অতঃপর সকলের কর্মদক্ষতা ও বিচার বুদ্ধিতে আস্থা জ্ঞাপন করে—শুভমস্তু জানিয়ে তাদের বিদায় দেয়। অন্ধকারের অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত অনুতোষের দৃষ্টি তাদের অনুসরণ করে। পরক্ষণেই সে ভিন্ন দিকে ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

অভাবিত সাফল্যের আনন্দে ভরপুর, আবেগে অধীর অনুতোষ দুর্গম বিপজ্জনক পথের বাধাবিপত্তি সিংহ বিক্রমে অতিক্রম করে পাহাড়ের উপরিস্থ দুই নং স্টেশনে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে এক নং স্টেশনের দিকে চেয়ে তার সকল দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার অবসান হয়। দূরে অগ্নিকুণ্ড থেকে উল্কা বেগে উত্থিত স্ফুলিংগ তার অভিযানের শেষ অঙ্কের দুর্গম কঠিন পথের প্রদর্শক রূপে যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে। রাত্রির প্রহর নির্ণয় কল্পে অনুতোষ ঊর্ধ্ব গগনে দৃষ্টিপাত করে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নিষ্প্রভ অস্পষ্ট তারকারাশি রাত্রির অন্তিম যাম আসন্নের ইংগিত দিচ্ছে। কাল বিলম্ব না করে অনুতোষ ১নং স্টেশনে অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গভীর বনে মাঝে মাঝে আচম্বিতে নানা পাখির কলরব, বন্য মোরগ ও হরিণের কর্কশ কণ্ঠস্বরে প্রভাতের আগমনী চলেছে। পাহাড়ের উৎরাইয়ের মুখে দূরের অগ্নিশিখা দেখে দিক নির্ণয় করে অনুতোষ অভিযানের শেষপাদের দুস্তর দুর্গম গিরিপথ অভাবনীয় ক্ষিপ্রতা ও নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে অতিক্রম করে নদীতীরে এসে পৌঁছয়। নদী পেরিয়ে চড়াই শুরু হয়েছে। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রজনী তার অবগুণ্ঠন খানি গুটিয়ে ক্রমেই অপসৃত হচ্ছে। দ্রুতগতিতে ঊর্ধ্বারোহণ করে পর্বতের সমপৃষ্ঠে পৌঁছে দূর থেকে দিদিকে দেখতে না পেয়ে অনুতোষ ঊর্ধ্বশ্বাসে অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে।

অনুতোষের প্রত্যাগমনে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হেতু দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সুদেষ্ণার মনের চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। সে অস্থির উদ্বিগ্ন চিত্তে ঝোপের ধারে পায়চারি করতে থাকে. সম্মুখে নিবদ্ধ সুদেষ্ণার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপসৃয়মান অন্ধকারে হঠাৎ এক চলমান মূর্তির আবির্ভাব ধরা পড়ে। সে মূর্তি দ্রুতগতিতে অগ্নিশিখার দিকে আগুয়ান। নিকটবর্তী হতেই সুদেষ্ণা টর্চের আলোতে অনুতোষকে দেখতে পায়। অনুতোষ সুদেষ্ণার কাছে থলে দুটো রেখে প্রণাম করার জন্য মাথাপিচু করে। খুশীতে উচ্ছল সুদেষ্ণা তার মাথায় হাত রেখে—শুভমস্তু বলে আশীর্বাদ করে। অনুতোষ মাথা তুলে বলে—দিদি দুর্ঘটনা-বিহীন, বিনা-রক্তপাতে আমাদের এই অভিযান সার্থক ও সফল হয়েছে। এ এক অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব ব্যাপার। ডাকগাড়ি থেকে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা নোটসহ একটা থলেতে এবং মুদ্রাসহ খুচরো ভিন্ন থলেতে রাখা আছে। এই নিন তার হিসাব। দিনের আলো আবির্ভাবের পূর্বেই সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে আমাকে এ অঞ্চল

ছেড়ে পাহাড় ডিঙিয়ে ভিন্ন পথে অনেক দূরে যেতে হবে। আর দেরী করা ঠিক নয়। দূব গগণের নবারুণের রক্তরাগ ক্রমে পাহাড় পর্বত গাছ-পালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিম্নভূমে নেবে আসছে! হ্যাঁ, আর একটা বিষয় আপনার জানা দরকার—রেল লাইন মেরামতের পর আপ ডাউন ট্রেন চলাচল দুপুরের পূর্বে কিছুতেই সম্ভব হবে না। কথা শেষ হতেই অনুতোষ ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হয়। সুদেষ্ণা নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ ঐ দিকে চেয়ে থেকে আপন কর্মে মনোনিবেশ করে।

প্রথমে টর্চ জ্বেলে অনুতোষ প্রদত্ত চিরকুট খানাতে টাকাব অঙ্ক দেখে সুদেষ্ণা উৎসাহে উদ্দীপ্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সুটকেশ থেকে গেরুয়া ঝোলাটা বের করে থলে দুটো তার ভেতরে ঢুকিয়ে কাঁধে তুলে সুটকেশ হাতে নিয়ে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায়। চতুর্দিকে গাছপালা ঝোপঝাড়ে তখনো পাতলা অন্ধকারে লেপ্‌টে আছে। পূর্বদিকের বড় পাহাড়টার আড়ালে নবোদিত সূর্যের তির্যক রশ্মি শত সহস্র ধারায় বিদীর্ণ হয়ে তার শিখরে গলে পড়ছে। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি নানারঙ মেখে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করছে। ধরণী তার কালো অবগুণ্ঠনখানি উন্মুক্ত করে কলহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত করে যেন স্বর্ণ-কন্যা ঊষাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পর্বতশীর্ষে দেবাদিদেবের মন্দিরে সারারাত্রি পূজার্চনা, যাগ যজ্ঞ হোম স্তবস্তুতি ও আরাধনান্তে ঊষালগ্নে জানকী কুণ্ডে স্নান ও পাতালপুরীতে পিতৃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রীদের অবরোহণ শুরু হয়েছে। দূর থেকে তাদের জয়ধ্বনি ও কলকোলাহল ভেসে আসছে। সুদেষ্ণা তাদের সঙ্গে মিশে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে মনস্থ করে। কেশে বেশে সন্ন্যাসিনী সেজে কাঁধে ঝোলা, বাঁহাতে ত্রিশূল এবং ডানহাতে সুটকেশ নিয়ে সুদেষ্ণা ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে এগোতে থাকে। রাস্তার ধারে এসে সুদেষ্ণা একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়ায়। দলে দলে যাত্রা বিগত রজনীর বৃষ্টিস্নাত এবড়োখেবড়ো পিচ্ছিল পথ বেয়ে চলেছে। একদলে অনেক স্ত্রীলোক দেখে সুদেষ্ণা অলক্ষিতে তাদের দলে ভিড়ে যায়। এইভাবে দলবদল করে করে সুদেষ্ণা ডাক বাঙলোর নিকটে এসে পৌঁছে। ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শরতের রাঙা সোনালী রোদ ভেজা ভেজা গাছপালা মাঠঘাটের ওপর পড়ে প্রকৃতি এক পরম রমনীয় মোহনীয় কমনীয় রূপ ধারণ করেছে।

ডাক বাঙলোর টিলাটার কাছে এসেই সুদেষ্ণা সুযোগ মতো দল থেকে

বচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী এক ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হয়। অতঃপর টিলাটার পেছন দিকের বনবাদার, ঝোপঝাড় কষ্টকর পথ পেরিয়ে সুদেষ্ণা তপস্বিনীর বেশ পরিবর্তন করে প্রিয়দর্শিনারূপে ডাক বাঙলোর চক্রপথে আবির্ভূত হয়। বাঙলোর সম্মুখ দিক দিয়ে না উঠে পেছন দিক দিয়ে উঠতে থাকে। উপর থেকে তাকে দেখেই দেবযানী দৌড়ে এসে সুটকেশটি নিয়ে আগে আগে এসে ঘরে প্রবেশ করে। সুদেষ্ণা ঘরে এসেই কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে দেবাজে রেখে সেটা বন্ধ করে দেবযানীকে বলে,—শহরকে ছোট হাজারি আনতে বল, খেতে খেতে কথাবার্তা হবে, বলেই সুদেষ্ণা স্নানের ঘরে ঢোকে।

স্নানান্তে সুদেষ্ণা খানা কামরায় প্রবেশ করে। বিগত রজনীর অনিদ্রা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা জনিত কোন গ্লানি তার চোখে মুখে কোথাও পরিদৃষ্ট নয়। আনন সাফল্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল উচ্ছল। কেবল চুলগুলি উস্কোখুস্কো অগোছাল। ইহা ইচ্ছাকৃত না অমনোযোগ বশত বোঝা দুষ্কর। খেতে খেতে সুদেষ্ণা দেবযানীর নিকট গত রাত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে কিনা জানতে চায়।

দেবযানীর উত্তরে দেয়—যাবার সময় তুমি হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে বলে গেলে। কিন্তু ঘুমোলে কি করে হুঁশিয়ার হব? কাজেই সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে কেবল ঘরবার করে কাটালাম। একবার শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম নেই—ভাবনা, এই বুঝি তুমি এলে! ভোরের আগেই তোমার ফেরার কথা। তুমি এলে না। ভোর হলো—সূর্য উঠি উঠি করছে—তবু তোমার দেখা নেই। বোঝ, আমার মনের অবস্থা। ভাবনা ক্রমে ভয়ে পরিণত হলো। মনের তৎকালীন উৎকণ্ঠা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না দিদি। তারপর সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যেই মুহূর্তে তোমায় দেখতে পেলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে তোমার নিকট দৌড়ে গেলাম, ব্যস্, এখানেই ইতি।

সব শুনে সুদেষ্ণা হাসতে হাসতে বলে—চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার কাছে এসে বোস। দেবযানী কাছে গিয়ে বসতেই সুদেষ্ণা তার গলা জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ আদর করে বলে—যা, শহরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তুই এবার নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়। যতক্ষণ পারিস ঘুমিয়ে নে, আমার হাতে অনেক কাজের বোঝা। হয়ে গেলে তোকে ডাকব।

দেবযানী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। কিছুক্ষণ গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে

থেকে অভিমান জড়িত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে—যেতে বলছ, যাচ্ছি। প্রতিবাদ করলেই অনধিকার চর্চা বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার চাইতে তোমার বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন যে কতগুণ বেশী তা তুমি বুঝতে না চাইলেও আমি বুঝি। কথা শেষে সুদেষ্ণাকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়েই সে দুম্‌দাম্‌ শব্দ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সুদেষ্ণা দেবযানীর দরদভরা, ভালোবাসা মাখা অভিযোগ অনুযোগ শুনে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তার গমন পথের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস এই কথাই ব্যক্ত করে—হায়, কেন যে তুই এই কঠিন মরণ ব্যূহে পা বাড়ালি! এর থেকে যে নির্গমনের পথ নেই! দিনে দিনে কঠিন মাকরসার জালে জড়িয়ে পড়বি!

ঘরে এসে সুদেষ্ণা ঝটিতি কয়েকখানা চিঠি শেষ করে খামে পুরে নাম ঠিকানা লিখে টেবিলের উপর রেখে বারান্দায় বেরিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। উর্ধ্বপানে চেয়ে দেখে বিগত রাত্রির বর্ষণের পরেও আকাশে মেঘের ঘোর কাটেনি। সাদা, কালো, হলুদ, পাঁশুটে বিচিত্র রঙের মেঘের ফাঁকে রৌদ্রের ঝিকিমিকি। ডালে ডালে পাখির নাচনে পাতায় কাঁপন। তাতে বাতাসের দোলা নেই! প্রকৃতির গুমট ভাব। রসুই ঘরের দিক থেকে শহরকে আসতে দেখে সুদেষ্ণা হাত ইশারায় তাকে ডেকে বারান্দায় উঠে আসে। শহর কাছে আসতেই নাস্তা করেছিস কিনা জিজ্ঞাসা করতেই সে ঘাড় নেড়ে হাঁ জানায়। সুদেষ্ণা তাকে নিয়ে ঘরে আসে। টেবিল থেকে একটা খাম নিয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে—এটা বাজারের কাশেম সর্দারের, বলেই খামটার কোণে একটা কালির দাগ দিয়ে ওর হাতে দেয়। তারপর—এটা সুধন্য সরকারের, বলেই খামটার কোণে দুটো কালির দাগ দিয়ে ওর হাতে দেয়। সবশেষে—এটা ডাকঘরের বড় বাবুর, বলেই খামটার কোণে তিনটে কালির দাগ টেনে ওর হাতে তুলে দিয়ে বলে—এবার বলতো কোনটা কাকে দিবি। কিছুক্ষণ ইতস্ততের পরে কোনটা কাকে দেবে তা খাম তুলে ঠিক ঠিক দেখিয়ে দেয়। সুদেষ্ণা খুশী হয়ে শহরের পিঠ চাপড়ে বলে সাবাস! এই নে বকশিশ। যা, এক্ষুণি ছুটে যা। যাবার সময় তোর ফুপাকে এখানে আসতে বলবি। ফুপার কথা বলতেই শহর দাঁড়িয়ে কাঁচুমাচু করতে থাকে। সুদেষ্ণা তা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে—কিরে, কিছু বলবি?

—আজ্ঞে মেমসাব, ফুপা বাজারে সওদা করতে গেছে, এখনও ফেরেনি।

—ঠিক আছে, রসুই ঘরে যে আছে তাকে বলে যাস ফুপা এলে এখানে পাঠিয়ে দিতে।

—জী মেমসাব, বলেই শহর সেলাম ঠুকে বেরিয়ে যায়।

শহর চলে যেতেই সুদেষ্ণা দরজা বন্ধ করে ঝোলাটা বার করে আনে। প্রথমে কাগজের টাকার ব্যাগটা খুলে বাণ্ডিলগুলো গুণে চিরকুটে লেখা সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। বাণ্ডিলগুলো সমানভাগে ভাগ করে বাঁধে। তারপর দুটো বালিশের মুখ খুলে তুলোর মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়ে সেলাই করে ওয়ার পরিয়ে দেয়। এভাবে নোটগুলো নিরাপদে নিয়ে যাবার হিল্লে করে সুদেষ্ণা স্বস্তি অনুভব করে। এখন সমস্যা কাঁচা টাকা আর খুচরো নিয়ে। এই ভারি জিনিসগুলি কি উপায়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? এ প্রশ্নের মীমাংসা আপাততঃ স্থগিত রেখে সুদেষ্ণা থলে খুলে টাকা ও খুচরোগুলো গুণে বেছে চিরকুটে লেখা অঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সমান ভাগে দুটো থলেতে পুরে শক্তকরে বাঁধে যাতে ভেতরের মুদ্রাগুলোর ঝনৎকার না শোনা যায়। তারপর সে দুটোকে কাপড় দিয়ে মুড়ে পুটুলির মত করে ওয়োর্ডরোবের ভেতরে রেখে দরজা খুলে দেয়। হাত ব্যাগ থেকে ইনসিওরের কাগজপত্র বের করে নিয়ে সেগুলি তৈরি করতে কিছু সময় কাটে। অতঃপর ঘরের কাপড় চোপড় এবং ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। তন্দ্রা লাগবার মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে—না, এখনও যে অনেক কাজ বাকী। কিন্তু গফুরের দেখা নেই। আজ হাটবার, সওদা করে তাড়াতাড়ি ফেরাই তো উচিত। তবে বিগত রাত্রির ঘটনার সংবাদ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ফেঁপে ফুলে নানা গুজব সৃষ্টি করেছে! সুদেষ্ণা ব্যাগ থেকে ঘড়িটা বার করে দেখে উদ্বিগ্ন হয়। বেলা বারোটার মধ্যে যে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। ঘর ছেড়ে সে বারান্দায় আসে। রসুই ঘরের দিকে চেয়ে কাউকে দেখতে পায় না। হাঁটতে হাঁটতে দেবযানীর ঘরের সামনে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। সে ঘুমুচ্ছে। অগত্যা সুদেষ্ণা নিজেই রসুই ঘরের দিকে এগোয়। গফুর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সুদেষ্ণাকে দেখেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে—

বাজার করে ফিরতে বড্ড দেরী হলো। কিন্তু কি করবো—গিয়ে দেখি মহা হৈ হৈ রৈ-রৈ। শুনলাম রেল লাইন উপড়ে ফেলে ডাকগাড়ি লুট হয়েছে। গোলাগুলি চলেছে। গাড়ি চলাচল বন্ধ। এই সংবাদ লোক মুখে দমকা হাওয়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কি করি, সঠিক খবরের জন্য ফিরতি পথে স্টেশনে গেলাম। জমাদার রঘুয়ার নিকট জানলাম —ছ'স্টেশনের পরে তিন স্টেশনের মাঝখানে ডাকগাড়ি লুট হয়েছে। রাত্রি ৪টা নাগাদ সদর থেকে সাহেব সুবা, পুলিশ মিলিটারি, লোক লস্কর ভর্তি এক রেল গাড়ি ঐ দিকে গেছে।

সুদেষ্ণা শান্ত নিরুত্তেজিত কণ্ঠে বললে—এই ব্যাপার! তা ভাববার কথা বটে। যাকগে, আমি বেলা বারোটায় লাঞ্চ খেয়ে বেরবো। চারটে নাগাদ ফিরবো এবং সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যাবো।

—সে কি! গাড়ি চলবে কিনা ঠিক নেই, তার উপর এই ডামাডোল. ভিড় ভাড়াক্কা! ঘরে ফেরার জন্য তীর্থযাত্রীরা স্টেশনের চতুর্দিক ছেয়ে ফেলেছে। সে কি ভিড়—চলা দায়!

—সবই বুঝলাম গফুর। তবুও আমাকে যেতেই হবে। আমার কাজ কারবার যে কত জরুরী সে তো জানো, এক জায়গার কাজ হলে তো অন্য জায়গায় ডাক পড়ে—আমার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকে তার উপর আজ যদি কোন সাহেবসুবা এসে পড়ে!

—অবস্থানকারীকে সরিয়ে নতুনদের জায়গা দেওয়া ডাক বাংলোর আইনে নেই, তা সে যতই হোমরা চোমরা এবং প্রয়োজন যতই জরুরী হোক না কেন। যাকগে, সে ভাবনা আমার। তুমি ভেবে ব্যস্ত হয়ো না!

সুদেষ্ণা বোঝে যে এই গণ্ডগোলের মধ্যে তাকে যেতে দেবার ইচ্ছা গফুরের নেই। সুতরাং তাকে আশ্বাস দেবার সুরেই বলে—ঠিক আছে গফুর, যেতে না পারলে যাবো না। তবুও তুমি দু'খানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে এনো। গাড়ি না চললে তো আর যাওয়া হবেনা—টিকিট ফেরৎ দেবো।

গফুর আর বাক্য ব্যয় করে না। বড়দিমণির কি ইচ্ছা তা সে বুঝে নিয়েছে। হাত পেতে বলে—দাও, টাকা দাও। তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক। গাড়ি চললে এবং সন্ধ্যার ট্রেনের গাড়ি থাকলে আমি টিকিট সহ মুটে নিয়ে এসে হাজির হবো। গফুরকে টাকা দিয়ে সুদেষ্ণা বলে—শ

এলে দেখা করতে বলো আর বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে খাবার দিও।

গফুর চলে যেতেই সুদেষ্ণা হাঁটতে হাঁটতে দেবযানীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখে সে তখনো গভীর নিদ্রামগ্ন। আহা, সারা রাত ঘুমোয়নি—কেবল ছটফট করেছে। ডাক দিতে দুঃখ হচ্ছে। বিছানার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকে—দেবযানী। সুদেষ্ণার হাতের স্পর্শে দেবযানী নড়েচড়ে চক্ষু মেলে তাকে দেখেই উঠে বসে। একটু লজ্জিত কণ্ঠে বলে—ও, অনেক ঘুমোলাম!

—নারে না, মোটেই অনেকক্ষণ ঘুমোস নি। তবে হাঁ, বেলা হয়েছে বটে। আমি দুপুরে ১২টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেল। আমরা আজ সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্ছি। হাঁ, আর একটা কথা—মাথায় তেল না দিয়েই স্নান করিস। চুলগুলো উস্কোখুস্কো রাখিস—মাথায় চিরুনি দিস না। সব সেরে আমার ঘরে আসিস—বলেই দেবযানীকে কোন কথার অবকাশ না দিয়েই সুদেষ্ণা চলে যায়।

হঠাৎ ঘুম ভাঙার ফলে দেবযানীর ঘুমের ঘোর তখনো সম্পূর্ণ কাটে নি। সুদেষ্ণার কথা সে কেবল শুনেছে। সবটা হয়তো বোধগম্য হয়নি। বিছানা ছেড়ে দেবযানী উঠে পড়ে। প্রথমেই জিনিসপত্র গুছোবার উদ্দেশ্যে ঘরের চারদিক একবার ঘুরে দেখে। না, কোথাও কিছু অগোছাল হয়ে নেই জিনিষপত্র বাঁধা-ছাদা করতে মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। সুতরাং মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে এবং জড়তা কাটাতে সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করে। ঢুকেই মনে পড়ে দিদি তেল ও চিরুনি ব্যবহারের উপর ট্যাবু দিয়েছেন। নিষেধের কারণ নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। স্নান করে শান্ত শীতল হয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আবহাওয়া ভাদ্রের গুমোট ভরা। গতদিনের বৃষ্টিতেও তা কাটেনি। আকাশে ছাড়া ছাড়া খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি যেন আবার একত্রে জড় হয়ে বর্ষণমুখর হতে সচেষ্ট। কালবিলম্ব না করে দেবযানী বারান্দা ধরে দিদির ঘরের দিকে এগোয়। জানলা দিয়েই দেখে তিনি শুয়ে আছেন। ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে খাটের ধারে দাঁড়িয়ে দিদির মুখের দিকে দেবযানী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মুখখানা যেন কল্লোলিনী বারিধির বুকে নিথর নিস্তব্ধ

নিস্তরঙ্গ গম্ভীর ভাবের এবং সদা-চঞ্চল নিদ্রামগ্ন দুরন্ত শিশুর শান্ত শীতল মুখের প্রতিচ্ছবি। দেবযানী কেবল দিদির সদাবর্মচঞ্চল ভাবগম্ভীর মুখই দেখেছে। শিশুর মতো নির্মল নিরুদ্বেগ অচঞ্চল এই মুখচ্ছবি তার অপরিচিত। দেখে মায়া হলো—ঘুম ভাঙানো উচিত কিনা ভাবতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। বেলা বেড়ে চলেছে। না জাগালে—কর্ম ভণ্ডুল হলে তাকেই দোষারোপ করবেন। অবশেষে ভেবে চিন্তে পায়ের আঙুল ধরে নাড়া দিয়ে—দিদি দিদি, বলে ডাকতেই সুদেষ্ণা ধড়মড় করে উঠে বসে। দেবযানীকে দেখে একটু অপ্রস্তুত ভাব মেশানো কণ্ঠে বলে—দেখলি তো অলসতা কেমন কর্মনাশা! মনে রাখিস আলস্য শরীরের এক মহা-রিপু। দিদির অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখে দেবযানী হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। মুচকি হেসে বলে—আমি তো ভাবছিলাম তোমাকে ডাকবোই না—এত ধকল কি কখনো শরীরে সয়।

—খুব ভালো করতিস—। আমার কাজকর্ম সব পণ্ড হতো। এখন যা দেখে আয়, শহর আসছে না কেন ?

দেবযানী ফিরে এসে বলে—শহর আসছে। এখন বলো আমাকে আর কি করতে হবে ?

—ঘরের জিনিসপত্র টুকি-টাকি নিশ্চয় সব ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছিস। শুধু তোর হোল্ডঅল সুদ্ধ বিছানাটা এ ঘরে এনে বাধ ছাঁদা করতে হবে। একখানা আটপৌর শাড়ি বের করে রাখিস। তা পরেই আমরা যাব—লাল পাড় হলেই ভালো হয়। না থাকলে বলিস—দেখবো আমার আছে কিনা। বেলা ১১টায় খাবার ঘরে আসিস। তুই ঐ সময় খেতে না চাইলে খানসামাকে বলিস। কথা শেষে সুদেষ্ণা উঠে পড়ে। শহর ঘরে ঢুকতেই সুদেষ্ণা আবার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

দেবযানী বেরিয়ে যায়। সুদেষ্ণার হেঁয়ালী-ভরা আদেশ অনুজ্ঞা তার মনে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা তোলপাড় করে। কিন্তু দলের শৃঙ্খলার খড়্গ সর্বদা মাথার উপরে খাড়া। সুতরাং নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া ভিন্ন গতি নেই। দেবযানী ঘরে না গিয়ে বারান্দা থেকে নেমে ঘুরতে ঘুরতে বাগানে প্রবেশ করে। সেখানে এ-গাছ থেকে ও-গাছে, এ-ফুল থেকে ও-ফুলে—কাউকে ইনিয়েবিনিয়ে আদর করে, কারো বা গন্ধ শুঁকে কিছুক্ষণ ইতস্তত লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে চিত্তের অস্থির ভাব প্রশমনের চেষ্টা করে। তারপর ঘরে ফিরে জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে

ভাবে—দিদির সঙ্গে কয়েকবার তো বেরলুম, কিন্তু তার কর্মধারার সত্যিকার কোন হদিশ পাচ্ছিনা—সব যেন কেমন সঙ্গতিবিহীন এলো মেলো! লোকজনকে বলে কয়ে বুঝিয়ে পড়িয়ে কিভাবে জীবন-বীমা কাজে অগ্রসর হতে হয় তা হাতে কলমে তালিম দিতে বলে আসছি। কিন্তু এখনো অবধি তাঁর সময় হয়ে উঠলো না—হবে হবে, সবই সময় মতো হবে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, বলে আশ্বাস দিচ্ছেন। সুটকেশ খুলে একটা হলুদ-পাড় শাড়ি ভিন্ন আটপৌরে আর কোন শাড়ি পাওয়া গেলো না। সেখানা বাইরে রেখে সুটকেশ বন্ধ করে খানা-কামরায় এসে দেখে খানসামা খানা-টেবিল গোছাচ্ছে কিন্তু দিদির দেখা নেই। আলমারি খুলে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে চেয়ারে বসে পাতা ওল্টাতে থাকে। দিদি এসে ঘরে ঢোকে। তাঁর চোখে মুখে কেমন যেন অস্থির চাঞ্চল্য যার সঙ্গে দেবযানীর পরিচয় নেই।

খানসামাকে খাবার আনতে বলে দেবযানীকে বলে—খেতে বোস। আজ রেলে যেতে কষ্ট হবে—একে ঘর-মুখো যাত্রীর ভিড়ে স্টেশনের আশপাশ সব ছেয়ে গেছে তার উপর ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা নাকি বিপর্যস্ত। যাত্রীদের ভিড় ঠেলে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে যেতে হবে।

খানসামা খানা নিয়ে হাজির—পেছনে গফুর। খানা দিয়ে খানসামা বেরিয়ে যায়। কিন্তু গফুর তখনো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সুদেষ্ণা তা লক্ষ্য করে তাকে ডাকে। গফুর কাছে আসতেই সুদেষ্ণা বলে—কাজ কর্মের ভিড়ে তোমার বিবির খবর নিতে পারি নি। সে কেমন আছে—ডাক্তার দেখিয়েছো তো?

—আজ্ঞে হাঁ, দিদিমণি। আপনার কথা মতো ডক্তার নিয়ে দেখিয়েছি। লেখা মতো দাওয়াই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। মৌত ধরেছে!

—সে আবার কি?

—এ রোগ আর সারবার নয়। মরণ কামড়—শরীর হাড্ডি সার। হাড়ের খাঁচার মধ্যে প্রাণ পাখী কেবল ধুকধুক করছে!

—যত সব অলক্ষুনে কথা। আমি আজ ডাক্তারকে বলে যাব। দরকার মতো সর্বদা তাকে দেখাবে এবং ঠিক মতো দাওয়াই খাওয়াবে। ঝাড়ফুঁক সব বাদ দেবে। সাবু ভালো তো?

—আজ্ঞে, আপনার দোয়ায় বেটা ভাল আছে। বেশ ডাগর হয়েছে।

এ ভাবেই সুদেষ্ণা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত গফুরের সঙ্গে কথাবার্তা তার পারিবারিক সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ রাখে। খাওয়া শেষে উঠে যেতে যেতে বলে সকালের কথা মতো কাজ করো। আমি বিকেল ৫টার মধ্যেই ফিরে আসবো।

গফুরের হয়ত আরো কিছু বলবার ছিল। কিন্তু বড়দি-মণির তড়িঘড়ি প্রস্থানের ফলে আর বলা হলো না। গফুর ক্ষুণ্ণ মনে টেবিল ছাপ করে বেরিয়ে যায়।

ঘরে এসে সুদেষ্ণা ঘড়ি দেখে দেবযানীকে বলে—এখনও আধ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। তুই ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি হাতের কাজ সেরে যাবার সময় তোকে জাগিয়ে যাব।

যেতে যেতে দেবযানী বলে—একটু বিশ্রাম কর দিদি, বিশ্রাম কর—শরীরে এত ধকল সহ্য হবে না। অসুখবিসুখে পড়বে।

সুদেষ্ণা হেসে ফেলে তাকে ডেকে—শোন। দেবযানী কাছে আসতেই বলে—কর্মই আমার জীবন। কর্মেই আমার সুখ শান্তি নিহিত—কর্ম বিনা সুখ নেই। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আখড়া। সুতরাং সাবধান! সবদাই কর্মে ব্যস্ত থাকবি—নচেৎ যত সব দুশ্চিন্তা ও কুচিন্তার শিকার হয়ে পড়বি। মনে রাখিস বিপ্লবের এই রুদ্র গম্ভীর, ভয়াল রক্তরাঙা পথে ঈপ্সিত মুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি স্বস্তি বিশ্রাম নেই। বজ্র নির্ঘোষে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উঁচু নিচু সবাইকে ডেকে বলতে হবে চল, চলরে চল—স্বাধীনতা সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে জোর কদমে এগিয়ে চল। এখানে জাতপাতের বিচার নেই—সবাই আমরা সমান, এক মায়ের সন্তান। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ এর পর ঢেউয়ের আঘাতে আমাদের বুকের ওপর চেপে বসা পরাধীনতার এই জগদ্দল পাথর ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তার উপর স্বাধীনতার ইমারতের সুদৃঢ় ভিত প্রতিষ্ঠা করতে হবে—মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!!

সুদেষ্ণার হিতবাণী ও অবিরাম সংগ্রামের উল্লেখ দেবযানীর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তার কোন প্রতিফলন তার মুখাবয়ব থেকে বোঝা গেলনা। সে নির্বাক ধীর মন্থর গতিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সুদেষ্ণা স্বীয় উত্তেজনা প্রশমিত করে দেবযানীর গমন পথের দিকে চেয়ে ভাবে—এ কুঁড়ি আপন সৌরভে উদ্ভাসিত হবে তো, নাকি কলি থেকেই রুদ্ধ গন্ধে অন্ধ হয়ে অকালে বৃন্তচ্যুত হয়ে ধরিত্রীর কোলে ঝরে

পড়বে! দেবু অঞ্জলির জীবনের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি মনে হতেই তার বুক ভেদ করে গভীর দুঃখ-ভরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে তাকে বুঝি উন্মনা করে দেয়—হায়, কেন বিশ্বাস ঘাতককে হত্যার পর আত্ম-প্রক্ষালন করলে না! কেন অভিমান আর ভুলের যূপকাষ্ঠে নিজেদের অমূল্য জীবন বলি দিয়ে সংগ্রামী জীবনের অহেতুক ছেদ টেনে দিলে আর সংগ্রামী মোর্চাকে দুর্বল করে গেলে! বিষাদঘন কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সুদেষ্ণার কপোল বেয়ে ঝরে পড়ে তাকে বুঝি অবশ করে দেয়।

ক্ষণিকের অবসাদ ও মোহ ঝেড়ে ফেলে সুদেষ্ণা আবার পূর্ণ উদ্যমে আপন কাজে ডুবে যায়। টেবিলের কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরে রাখে। টেবিল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অসংবৃত বেশ-বাস গুছিয়ে নিয়ে সে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ে। দেবযানীর ঘরের কাছে এসে জানালা দিয়ে দেখে সে শুয়ে আছে। বাইরে থেকে না ডেকে ঘরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকে।

দেবযানী চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে উঠে বসে। চোখে দিবানিদ্রার অলস জড়তা নেই। সুদেষ্ণা তা লক্ষ্য করে বলে—ঘুমোসনি বুঝি?

—ঘুম হবে কি করে? ভোজনান্তে যে মুখশুদ্ধি দিলে তাতে পরিপাক যন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেয়—কিছুই জীর্ণ হতে চাইছে না।

সুখবরই বলতে হবে! গুরুপাক দ্রব্যের জীর্ণতা সময় সাপেক্ষ! ঘাবড়ে যাসনে! আমি বেরুচ্ছি। আমার অবর্তমানে সব কিছু তদবির তদারকের ভার তোর উপর। খুব সতর্ক দৃষ্টিতে এবং কান-খাড়া করে সব দেখাশোনা করবি। গফুর থাকছে না। শঙ্করকে তোর কাছে রাখিস। খানসামা আছে, হয়তো বাবুর্চিও এসে যাবে। সব কিছু গুছিয়েছিস তো? আমি এলে পর হেডকোয়ার্টারে দুটি বেঁধে রওনা দেব। কথা শেষে সুদেষ্ণা বেরিয়ে যায়।

বাইরে ঘন-ঘটা না হলেও আকাশের পাংশুটে মেঘ সূর্যকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু তার উত্তাপ যেন গলে গলে পড়ছে। হাওয়ার স্বল্পতা হেতু ধরণী উত্তপ্ত—গুমোট গরমে যেন ধুঁকছে। ডাক বাংলার পথ ছেড়ে সুদেষ্ণা বড় রাস্তায় এসে পড়ে। রাস্তার উপর উভয় দিকের বড় বড় গাছের বিস্তৃত ডালপালা শাখা-প্রশাখা ও পল্লব পরস্পরে মিতালি পাতিয়ে হাত হাত মিলিয়ে ধরাধরি করে এক সবুজ চাঁদোয়া তৈরি করে

রেখেছে। তার ঠাণ্ডা শীতল ছায়া পান্থজনের প্রচণ্ড গরম জনিত ক্লান্তি ও শ্রান্তি হরণ করছে। তীর্থযাত্রী ছাড়াও বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে গরুর গাড়ি, সাইকেল, চাষী কাঠুরিয়া রাস্তা বেয়ে হাটের দিকে চলেছে। গরুর গাড়ির চাকার ঘর্ষণ দূর থেকে করুণ ক্ষীণ ক্রন্দনের মতো শোনাচ্ছে। রেল লাইন পার হতে গিয়ে ডাইনে চেয়ে সুদেষ্ণার চক্ষু স্থির। রেল লাইনের ছ'ধারে স্টেশন পর্যন্ত অগণিত যাত্রীতে ঠাসাঠাসি—প্রচণ্ড কোলাহল। আরও অবাক কাণ্ড স্টেশন জমাদার রঘুনন্দন গুমটির বারান্দায় নিরলস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীর্থযাত্রী বিশেষ সাধু সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের লক্ষ্য করছে। সুদেষ্ণাকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে বলে—দারুণ কাণ্ড দিদি—রেল চলাচল বন্ধ, যাত্রীদের দুর্গতির আর শেষ নেই। পুলিশ স্টেশন প্লাটফরম কিংবা বিশ্রাম ঘরে যাত্রীদের ঢুকতে দিচ্ছে না। গাড়ি চলার হুকুম না আসা পর্যন্ত টিকিট দেওয়াও বন্ধ।

—তোমার খবরের জন্য ধন্যবাদ রঘু। আমার এখন খুব তাড়া আছে। ফিরতি পথে স্টেশনে যাব, তখন দেখা হবে। সুদেষ্ণা দ্রুতপদে হাঁট অভিমুখে হাঁটতে থাকে। এ অঞ্চলের এটা বিখ্যাত এক বিপণন কেন্দ্র—গরু বাছুর ছাড়াও নানা জীবজন্তু থেকে শুরু করে এমন পণ্য সম্ভার নেই যা এখানে বিকিকিনি না হয়। এমন কি মাঝে মাঝে হাতিও কেনা বেচা হয়। কাশেম সর্দারের আড়তে বেজায় ভিড়। সুদেষ্ণাকে দেখেই সর্দার উঠে পড়ে—আসুন বহিন, বলে তাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যায়। কয়েকজন লোক সেখানে বসে গল্পসল্প করছে। সর্দার তাদের সুদেষ্ণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর বীমার মেয়াদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফরম সই করিয়ে প্রথম কিস্তির টাকা সহ সুদেষ্ণার হাতে তুলে দেয়। সুদেষ্ণা প্রত্যেককে একখানা বীমার প্রচার পত্রসহ কাঁচা রসিদ দিয়ে শুভকামনা জানিয়ে সর্দার সহ বেরিয়ে আসে। গদিতে এসে সর্দারকে তার প্রাপ্য দস্তুরি দিয়ে উঠে পড়বার মুহূর্তে সর্দার বাধা দেয়। ছোকরাকে একটা ডাব আনবার হুকুম দিয়ে সর্দার সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে বলে—এদিকে খবর সব শুনেছেন তো?

—হাঁ, স্টেশন জমাদার রঘুর সঙ্গে পথে দেখা—যাক এখন গাড়ি চললেই বাঁচি। আমি আজই চলে যাচ্ছি। কোম্পানী থেকে কয়েকটা বড় কেসের ব্যাপারে জরুরী তলব এসেছে। কাশেম সর্দারকে আর কোন কথা তোলবার অবকাশ না দিয়েই সুদেষ্ণা উঠে পড়ে। —আচ্ছা চলি,

শুধু দেখবেন প্রিমিয়ামের টাকাগুলি যেন ঠিকমত দেয়। নতুন কেস যোগাড় হলে জানাবেন—খোদা হাফেজ।

সুধন্য সরকারের গদিতে এসে দেখে একই চিত্র—গরম ব্যবসা। সুদেষ্ণাকে দেখেই সুধন্য বড় ছেলে নেত্যকে ডেকে বলে—ভেতরের বারান্দায় সুবোধ, সারিন, হাফেজ ওরা সব পান বিড়ি তামাকের শ্রাদ্ধ করছে। এই ধর লিস্টি। ইহা অনুযায়ী ওদের জীবন-বীমার পয়লা কিস্তির টাকা আমার নিকট আছে। দিদিকে নিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে। বারান্দায় গিয়ে সুদেষ্ণা সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর ছাঁকা ছাকা কথা বলে বীমার উপকারিতা সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করে। তারপর ফরম সই করিয়ে বীমার প্রচারপত্রসহ টাকা প্রাপ্তির স্বীকৃতি স্বরূপ কাঁচা রসিদ দিয়ে চুক্তিমতো যাতে কিস্তির টাকা দিতে কোন গাফিলতি না হয় সেজন্য সতর্ক করে দেয়। সকলের নিকট বিদায় নিয়ে সুদেষ্ণা গদিতে ফিরে আসে। নেত্যকে ডেকে বলে—ধর, এই ফরমখানা সই করো। বিয়েশাদি করেছ—বিপদ আপদের কথা তো বলা যায় না। বীমা হলো অতি সামান্য টাকার বিনিময়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের এক পরম নিশ্চিত আশ্বাস। আর কিস্তির টাকার জন্য তো তোমাকে ভাবতে হবে না! নিত্য ফরম খানা হাতে নিয়ে বাবার দিকে চায়। সুধন্য যখন জীবন বীমার গুণ কীর্তন করে এবং তার পক্ষে ওকালতি করে তখন নিজের ছেলের জীবনবীমার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি খুবই দৃষ্টিকটু। অগত্যা সবজন সমক্ষে রাজী হয়ে বলে—নে দিদি যখন বলছেন, সই করে দে—টাকার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। এইকথা বলে সুধন্য সরকার সুদেষ্ণাকে নিয়ে ভেতরের ঘরে গিয়ে হিসাবপত্র সব বুঝিয়ে টাকা পয়সার লেনদেন সমাপ্ত করে। ভবিষ্যতে আরও অনেক কেস-এর আশ্বাস দিয়ে সুধন্য উঠে পড়ে দিদিকে কিছু জলযোগের জন্য অনুরোধ জানায়।

—না না, আজ আমাকে মাপ করবেন। আমার খুব তাড়া আছে। কোম্পানীর জোর তাগিদে আমাকে আজই ফিরে যেতে হচ্ছে।

—সে কি গাড়ি চলাচল তো বন্ধ। খবর জানেন না বুঝি ?

—গাড়ি চললেই যাব, বলে সরকারকে আর কোন কথার অবকাশ না দিয়েই সুদেষ্ণা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পোষ্ট আপিসে ঢুকবার মুখে ষষ্ঠীর সঙ্গে দেখা। সে প্রণাম জানিয়ে বলে—গিন্নীমা আপনাকে অবশ্যই দেখা করতে বলেছেন।

—আচ্ছা, তোমার খবর সব ভালো তো? কথা শেষ করে সুদেষ্ণা ডাক ঘরে প্রবেশ করে। এখানেও কাউন্টারে জমজমাট ভিড়। মাষ্টার মশাই এত ব্যস্ত যে মাথা তুলতে পারছেন না।

সুদেষ্ণাকে দেখেই হাত ইশারায় বসতে বলেন। হাতের কাজ সাঙ্গ করে তিনি ষষ্ঠীকে ডাক দেন। ড্রয়ার থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করে সুদেষ্ণাকে দিয়ে বলেন—মক্কেলরা আড্ডাঘরের বারান্দায় বসে পান তামাকের সদ্ব্যবহার করছেন। তাদের নিকট গিয়ে ফরমটরম সব সই সাবুদ করিয়ে নিন। ষষ্ঠী, সুদেষ্ণাদেবীকে আড্ডা ঘরে নিয়ে যা। আড্ডাঘরে উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর সুদেষ্ণা জীবন বীমার উপকারিতা এবং নিয়মমতো কিস্তির টাকা দেওয়া বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী কয়েকটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে তাঁদের মুগ্ধ করেন। তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব সই করিয়ে নিয়ে টাকা প্রাপ্তির কাচা রসিদ সহ বীমার প্রচারপত্র তাদের হাতে দিয়ে বিদায় নেয়। পুনরায় ডাকঘরে প্রবেশ করে সুদেষ্ণা দেখে মাষ্টার মহাশয়ের কাজ কিছু হালকা হয়েছে। সুদেষ্ণাকে দেখা মাত্রই তিনি ড্রয়ার খুলে লিস্ট অনুযায়ী বীমার প্রথম কিস্তির টাকা তার হাতে তুলে দেয়। সব বুঝে নিয়ে সুদেষ্ণা একটু নিম্ন কণ্ঠে বলে—মহাদেবী দর্শনে যাচ্ছি, দস্তুরিটা তাকেই প্রণামী দেবো—কি বলেন?

—তথাস্তু, উচ্চারণ করেই মাষ্টার মশাই পুনঃ নিজ কর্মে লিপ্ত হন।

অন্দর মহলে ঢুকতে গিয়ে সুদেষ্ণা বাধা পায়—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই সৈরভী দরজা খুলে দিয়ে বলে—আসুন। মাষ্টার গিন্নি সবে দিবা-নিদ্রা থেকে উঠে পা ছড়িয়ে বসে মনের সুখে পরম পরিতৃপ্তিতে পান চিবুচ্ছিলেন। সুদেষ্ণাকে দেখেই বলে—এসো। ওরে ও সৈরভী একখানা পিঁড়ে দে।

সুদেষ্ণা বাধা দিয়ে—না, বলেই মেঝেতে বসে পড়ে।

মাষ্টারগিন্নি বোধহয় এতটা আশা করেননি। তিনি একেবারে হতভম্ব—মুখ দিয়ে কথা সরছে না। অকস্মাৎ সুদেষ্ণার মাথাটা কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো দিয়ে বলেন তাড়া আছে বুঝলাম —কিন্তু যাবে কি করে? ডাকাতরা তো শুনছি ডাক গাড়ি লুট করে

রাস্তা ঘাট সব বন্ধ করে দিয়েছে। গোলাগুলি চলেছে—কি হাঙ্গামা হুজ্জত যে শুরু হলো!

—সেজন্য গাড়ি চলা তো বন্ধ থাকতে পারে না। যখন চলবে তখনই উঠে বসবো। এই নিন পেন্নামী অর্থ ও তার রসিদ—হাত বাড়িয়ে কলম দিয়ে বলে—রসিদ খানায় হস্তাক্ষর বসান। মাষ্টারগিন্নী মোটা অক্ষরে রসিদখানা সই করে সুদেষ্ণার হাতে তুলে দেন। সুদেষ্ণা সেখানা ব্যাগে পুরে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে উৎকণ্ঠিত—হাতে আর সময় নেই। সৈরভী একটা গ্লাসে ডাবের জল আর এক থালা মিষ্টি নিয়ে হাজির। ডাবের জল পান করে সুদেষ্ণা সত্যই পরিতৃপ্ত। তারপর একটা মিষ্টি খেয়ে আর এক গ্লাস জল আনতে বলে থালাটা সরিয়ে রাখে।

মাষ্টার গিন্নী হা হা করে ওঠেন—করছ কি? সবটাই খেতে হবে। দেখ আমি ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছি—তাদের মুখ দেখেই বলতে পারি খিদে পেয়েছে কিনা! কাজেই কোন বাহানা অজুহাত চলবে না—সবটা খেতে হবে। সুদেষ্ণা এই বর্ষিয়সী মহিলার মাতৃসুলভ স্নেহ বাৎসল্যে সত্যই অভিভূত! বিনা বাক্যব্যয়ে মিষ্টি খাওয়া শেষ করে হাসতে হাসতে হাত পেতে বলে—মুখশুদ্ধি দিন।

—পান খাবে? মাষ্টার গিন্নীর মুখে হাসি আর ধরে না। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাঁক দিয়ে বলে—ওরে ও সৈরভী জলদি পানের বাটাখানা নিয়ে আয়। সৈরভী হুকুম মাফিক সঙ্গে সঙ্গে ডাবর ভর্তি পান ও অনুষঙ্গিক সব কিছু নিয়ে হাজির।

হেসে বলে আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে এই পুণ্য দিনে আমি ব্রত পালন করছি। সুতরাং ছোট্ট এক টুকরো পানের সঙ্গে কুঁচো গুয়া আর মৌরি দিন।

সুদেষ্ণার উক্তি শুনে মাষ্টার গিন্নী মহা খুশী।—ও, তাই বুঝি এই রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা! ভাল, খুব ভাল, এই নাও। এক টুকরো পান সুদেষ্ণার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, কিন্তু এতে আমার চিত্ত ভরলো না জেনো।

সুদেষ্ণা উঠে পড়ে—নষ্ট করবার মতো সময় তার হাতে সত্যিই নেই।

—আচ্ছা যাও, তোমাকে ধরে রাখবার মতো কোন বন্ধন-ডোর তো আমার নেই। হাঁ, তোমার সাকরেদ ঐ যে আমার নাতনীর মতো, যে সেদিন এসেছিলো—কি জানি নাম—তাকে আমার নাম করে আশীর্বাদ

সহ একটা পান দিও—মনে শান্তি পাব। সৈবভীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলার স্নেহ-মমতাভরা অনুভূতির পরশ সুদেষ্ণার অন্তরের এক মধুর করুণ আবেগের উদ্রেক করে। প্রণাম করে আর পেছন ফিরে তাকায় না। পেছন ফিরলেই দেখতে পেতো—তিনি আঁচলে চোখ মুছছেন।

আপিস ঘরে ঢুকে সুদেষ্ণা দেখে বারান্দায় আর আগের মতো লোকজনের ভিড় নেই। মাষ্টারের কাছে গিয়ে বলে—মহাদেবী দর্শন, প্রণামী অর্পণ এবং চর্ব্যচুষ্য গ্রহণ করে এলুম। সর্বদাই রুই কাতলা গাঁথবার তালে থাকবেন। চুনোপুটিতে পকেটের সুসার হয় না। চললাম, আজইচলে যাচ্ছি—আবার দেখা হবে। মাষ্টারমশায় বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বলবার কোন অবকাশ না দিয়েই সুদেষ্ণা দ্রুত আপিস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। গেটের মুখে সৈরভী নেকড়া জড়ানো ছোট্ট একটা পুঁটলি তাকে দিয়ে জানায়—গিন্নীমা দিলেন। পুঁটলি নিয়ে সুদেষ্ণা হেসে বলে—গিন্নীমাকে বলো,—কি বলো তা আর বোঝা গেল না।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে সুদেষ্ণা দেখে মাঠঘাট, গাছতলা সর্বত্র অগণিত যাত্রী! চতুর্দিক তাদের কলকোলাহলে মুখর। স্টেশনের গেট দিয়ে ঢুকে টিকিটঘরের সামনে এসে উঁকি দেয়। ছোটবাবু নেই। ঘুরে বারান্দায় আসে। পুলিশ তাকে বাধা দেয় না। স্টেশন চত্বরে পুলিশ ছাড়া কেউ নেই। কেবল হরকিষেণ দূরে মালপত্র ওজনের যন্ত্রটার পাশে বসে খৈনি টিপছে। সুদেষ্ণাকে দেখেই সে দৌড়ে আসে। ছোটবাবু কোথায় জিজ্ঞেস করতেই সে বলে—এইমাত্র কোয়ার্টারে গেছেন। ভেতরে বড় বাবু আছেন। —তুমি ছোট বাবুকে খবর দাও—আমি অপেক্ষা করছি। হরকিষেণ চেয়ার আনবার জন্য ছোটবাবুর ঘরের দিকে যেতেই সুদেষ্ণা বাধা দিয়ে বলে—না, চেয়ারের দরকার নেই। তোম জলদি ছোটবাবুকো বোলাকে লে আও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটবাবু এসে হাজির। নমস্কার জানিয়ে বলে—কি হাঙ্গামা হুজ্জতের মধ্যে যে পড়েছি। খাওয়া দাওয়া নেই, সর্বক্ষণ কেবল ডিউটি—প্রাণ ওষ্ঠাগত। যাক্ দেখা হয়ে ভালই হলো। গফুর এসেছিল টিকিট কাটতে। কিন্তু গাড়ি চলাচলের সংবাদ না পাওয়া

অবধি টিকিট কাটার হুকুম নেই। আমি টাকা নিয়ে রেখেছি। গাড়ি চলার হুকুম এলেই আপনার টিকিট কেটে রাখবো। তবে ভাবনার কিছু নেই। খবর এসেছে রাস্তা মেরামত হয়ে গেছে—যে কোন মুহূর্তে গাড়ি চলার হুকুম এসে যাবে। তাছাড়া পুলিশের দুই বড় সাহেব অকুস্থলে তদন্তে গিয়েছেন। তাঁরা রাত্রিটা এখানের ডাক বাংলোতে কাটাবেন বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন। খবরটা গফুরকে জানিয়েছি।

—সবই বুঝলুম, এখন চলুন আপনার জীবন-বীমা-করণ কার্যটি সমাধা করি। কোন অজুহাত আর নয়—অনেকদিন পালিয়ে বেড়ালেন। বয়স বাড়ছে—ছেলেপুলে নেই—দিনকাল কি পড়েছে, দেখছেন তো। কখন কি দুর্ঘটনা ঘটবে আর ভদ্রমহিল অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খাবেন। আজীবন বীমা নয়—দু'হাজার টাকার ১৫ বৎসরের য়েনডাউমেন্ট পলিসি—প্রিমিয়ম সামান্য বেশী, কিন্তু বেনিফিট প্রচুর তা প্রচারপত্র দেখেই বুঝবেন। মাষ্টার খানিকক্ষণ কি ভাবেন—তারপর কতটা আত্ম-সমর্পণের সুরেই বলেন—চলুন, বলছেন যখন—আর আপনাকে বিমুখ করবো না।

আপিস ঘরে এসে সুদেষ্ণা ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে মাষ্টারকে দিয়ে সই করিয়ে প্রথম কিস্তির টাকা নিয়ে রসিদ প্রদানের পর ধন্য-বাদান্তে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে—আমি ট্রেনের সময় অনুসারেই আসবো এবং পুলিশ বেষ্টনির বাইরে যাত্রীদের মধ্যেই থাকবো। আপনি রঘুয়াকে দিয়ে টিকিট দু'খানা দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন।

—না না। সে কি! আপনি এখন যেভাবে এসেছেন তখনও এখানে সেভাবেই আসবেন—আমি আপনাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেব।

—না না। সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। পুলিশের আদেশ ভঙ্গ করা উচিত নয়—বিশেষ করে এই উত্তেজক মুহূর্তে। আপনি রঘুয়াকে ডাকুন—আমি বলে যাচ্ছি।

—তা যা বলেছেন। কিন্তু রঘুয়াতো এখন এখানে নেই। যাত্রী সমাগম হলেই বেটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফুড়ুৎ করে কেটে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে—বিশেষ করে পশ্চিমা সাধুসন্ত আর বৈরাগীদের মধ্যে ঘুরঘুর করে কি যেন খোঁজে!

—তাই নাকি, ভেরি ইনটারেস্টিং! গুমটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঘুয়ার অপলক দৃষ্টিতে তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য করার ঘটনাটা সুদেষ্ণার মনে পড়ে।

যাই হোক খোঁজ নিয়ে টিকিট দুটো পাঠিয়ে বাধিত করবেন। আচ্ছা চলি—নমস্কার, আবার দেখা হবে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় লাল পাগড়ীর সমাবেশ যেন আগের চেয়ে বেশি বলেই সুদেষ্ণার মনে হলো। তবে সাদা পোষাকের কোন আই বি. কে তার নজরে পড়ে না। পথে, বাজারের দশকর্ম ভাণ্ডার থেকে তীর্থ-যাত্রীদের মতো একটা খেজুর পাতার ব্যাগ, দুটো বাঁকানো বেতের ছড়ি, কলাপাতা, ধান দুর্বা, তিল, রঙ্গীন তুলো, মাটির সরা ইত্যাদি পূজোর একথালি ডালি কিনে নেয়। ডাক বাংলোয় যখন পৌঁছয় দিনের আলো তখন নিবু নিবু। একে ভাদ্রের বেলা তার উপর আকাশ মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যার মলিন ধূসর ছায়া ক্রমেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হচ্ছে। ঘরে ঢুকে বিছানার হোল্ডঅলের একদিকের থলেতে নোটের সেলাই করা বালিশটা আর অপর দিকে কাঁচা টাকার থলেটা কাপড় জড়িয়ে রেখে হোল্ডঅলটা দু'হাতে তুলে ধরে। না, আকার কিম্বা ওজন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেবযানীকে দেখেই সুদেষ্ণা বলে—চ, তোর হোল্ডঅলটা নিয়ে আসি। তুই তোর সুটকেশে যেসব জামা কাপড় ভরেছিস তার কিছুটা রেখে বাকী সব নিয়ে আয়। কথা শেষে দেবযানীর হোল্ডঅলটা নিয়ে এসে সে আসবার আগেই টাকার থলে এবং বালিশটা সুদেষ্ণা তার মধ্যে যথ স্থানে ভরে রাখে। দেবযানী কাপড়-চোপড় নিয়ে এলে সেগুলি হোল্ডঅল-এর মধ্যে রেখে দু'জনে মিলে চামড়ার বেল্টটা কষে বাঁধে। দুটো হোল্ডঅল বাঁধা হবার পর একটা করে বেতের ছড়ি বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

দিদির রহস্যপূর্ণ আচার আচরণ আচরণ ও কথাবার্তা ইতিমধ্যে দেবযানীর কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। তবু এই বেল্টের মধ্যে ছড়ি গোঁজা দেখে সে হেসে বলে—এ আবার কি!

—কেন, বুঝলি না? আমরা তীর্থক্ষেত্রে এসেছি—ব্রতপালন করছি—এটা তারই চিহ্ন। তা ছাড়া ঐ খেজুর পাতার থলেটার মধ্যে সরা, ফুল, বেলপাতা, ধান দুর্বা, তিল ইত্যাদি পূজার ডালির নানা উপচার উপকরণ রয়েছে। তুই গফুরকে চা ওমলেট আর রুটি নিয়ে আসতে বল। রাতে ট্রেনের গর্দিশ কাটিয়ে কখন পৌঁছবো, কখন আবার খাবার জুটবে তার তো ঠিক নেই। শহরকেও আসতে বলিস।

দেবযানী চলে যেতেই সুদেষ্ণা হোল্ডঅল দুটো আবার নেড়েচেড়ে দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করে—কেননা আকারে কিংবা ওজনে অস্বাভাবিক কিছু চোখে ঠেকে না। সুদেষ্ণা আবার দেরাজ, টেবিলের ড্রয়ার, আলমারি ইত্যাদি ভাল করে দেখে কোথাও কিছু পড়ে আছে কিনা। দেবযানী ফিরে আসতেই বলে—যা, তোর ঘরে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার, আলমারি ইত্যাদিতে কোথাও কিছু পড়ে আছে কিনা দেখে আয়। এই টেবিলে বসেই চা খাওয়া হবে। শহর কি এসেছে? ওকে আসতে বলেছিস?

—শহর নেই, বাবুর্চিকে ডাকতে গেছে, বলেই দেবযানী চলে যায়।

গফুর এসে হাজির—তার চোখ মুখ কেমন যেন মলিন! সে কিছু বলবার আগেই সুদেষ্ণা বলে—আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম। ছোটবাবুর নিকট সব শুনেছি। এ অবস্থায় তোমার কিছু করবার নেই। কুলির ব্যবস্থা করেছ?

—ফরেস্ট আপিসের কাল্লু আর বিল্লুকে আসতে বলেছি। তারা ঠিক সময়েই এসে যাবে। তাছাড়া আমি তো সঙ্গে যাচ্ছিই।

—সে কি, তুমি যাবে কি করে? পুলিশের বড়সাহেবরা আসছেন। তোমাকে উপস্থিত না দেখলে রেগে যাবে না?

—তা কেন, বিন্দে মালি, ঝাড়ুদার দুখিয়াকে খবর দিয়েছি। তোমরা চলে গেলেই তারা এসে সব ছাপছুতরো, গোছগাছ করবে। তা ছাড়া খানসামা ও শহর রয়েছে। বাবুর্চিকে খবর পাঠিয়েছি। সাহেবদের কোন অসুবিধা হবে না। তোমাদের গাড়িতে তুলে দিয়েই আমি জলদি ফিরে আসবো।

—কিন্তু রেলগাড়ি কখন আসছে তার তো কিছু ঠিক ঠিকানা নেই—ধর যদি অনেক দেরিতে আসে—এমন কি যদি কোন কারণে রাত্রে নাই বা আসে।

—সে ভাবনা আমার। মোদ্দা কথা তোমাদের গাড়িতে তুলে দিতে না পারলে আমি শান্তি পাব না।

—হাঁ, আর একটা কথা—প্লাটফরমে পুলিশ যাত্রীদের ঢুকতে কিংবা থাকতে দিচ্ছে না! গাড়ি এলে পর আমাদেরও অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে প্লাটফরমের বাইরে পুলিশের খবরদারীর মধ্যে দিয়েই গাড়িতে উঠতে হবে।

দেবযানী ইতিমধ্যে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। দিদি ও গফুরের কথাবার্তা

শুনে বুঝলো—এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য রেল গাড়ি অচল। যাত্রীর ভিড় আর পুলিশের আবির্ভাব। এখানে আসার পর বিগত কয়েকদিনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ থাকলেও দলীয় শৃঙ্খলের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে নীরব দর্শক ও শ্রোতা হওয়া ভিন্ন আর কিই বা তার করবার আছে। বিগত সেই রজনীতে অনুতোষের আকস্মিক আগমন ও নিষ্ক্রমণকালের উক্তি—ফিরি আর নাই বা ফিরি—আমি তোমায় ভালোবাসি। নিভৃত নিরালায় অনুতোষের ঐ স্বীকৃতি তার অন্তরে অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে। হঠাৎ সে চমকে ওঠে —তবে কি এই সবই তার দুঃসাহসিক অভিযানেরই ফলশ্রুতি। কিন্তু সে কোথায়? এই জিজ্ঞাসায় তার অন্তর আশঙ্কার উদ্বেলিত হয়।

খানসামা খাবার নিয়ে এসে টেবিলে রাখতেই সুদেষ্ণা বসে পড়ে। দেবযানীও তার দেখাদেখি বসে যায়। কিন্তু খেতে যেন তার রুচি নেই। না খেলে দিদির নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়ার ভয়ে সে তা কোনরকমে গলাধকরণ করে উঠে পড়ে। আহারান্তে তাকে নিঃশব্দে প্রস্থানরত দেখে সুদেষ্ণ ডেকে বলে—তোর সুটকেশটা নিয়ে এখানে চলে আয়। এখান থেকেই আমরা রওনা দেব। কাগজপত্র সব গুছিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে সুদেষ্ণা ব্যাগে হাত দিতেই মাষ্টারগিন্নীর দেওয়া পানের প্যাকেটটা হাতে ঠেকে। ব্যাগটা নিয়ে সে উঠে পড়ে। দেবযানীর ঘরে গিয়ে দেখে সে চোখ বুজে চেয়ারে বসে আছে। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস তো? যাক্ আর তো মাত্র কয়েক ঘটা—তারপর বাড়ি গিয়ে মনের সুখে ঘুমোতে পারবি। এখন হাত পাত, এক ভদ্রমহিলা তার অতি প্রিয় একটা বস্তু আমার মারফত তোকে পাঠিয়েছেন। জীবনে চলার পথে নিষ্ঠুরতা ক্রুরতার মতোই অজস্র প্রেম প্রীতি ভালবাসার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। এর থেকেই বুঝতে পারবি তিনি তোকে কতটা ভালবেসে ফেলেছেন। দেবযানীর হাতে পানের মোড়কটা দিয়ে সুদেষ্ণা মিষ্টি মিষ্টি হাসতে থাকে। দেবযানী মোড়ক খুলে পানের খিলিটি দেখে অবাক হয়ে সুদেষ্ণার মুখের দিকে চায়। সুদেষ্ণা হাসি মুখেই বলে—দে, মুখে পুরে দে—ভালোবাসার দান মাথায় পেতে নিতে হয়। সুদেষ্ণা ঘর ছেড়ে চলে যায়। দেবযানী পানটা চিবোতে চিবোতে বর্ষীয়সী মাষ্টার গিন্নীর মুখখানা মনে পড়তেই কেমন যেন মমতা বোধ করে। যে বিমর্ষ ও অবসাদে সে এতক্ষণ ভুগছিলো তা যেন অনেকটা

কেটে যায়। সত্যিই পানটা অদ্ভুতরকমের ভালো। দেবযানী উঠে পড়ে। বাথরুম এবং ঘরটা আর একবার ঘুরে দেখে স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে দিদির ঘরে গিয়ে হাজির হয়।

সুদেষ্ণা দেবযানীকে দেখেই বলে—পানটা খেয়েছিস তো?

—হ্যাঁ দিদি, পানটা খেতে সত্যিই খুব ভালো। এরকম পান পেলে আরো খেতে ইচ্ছা করে।

—ঠিক আছে, আবার এলে তোর সুখ্যাতি (কমপ্লিমেণ্ট) তাঁকে জানাবো এবং আমিও তোর মতো তাঁর শিষ্যা হয়ে যাবো। কিন্তু এ কি করেছিস! পান খেয়ে ঠোঁটকে তো রাঙা টুকটুকে করেছিস—চোখ মুখ শুদ্ধ ঠোঁটের রঙে রাঙিয়ে ফেলেছিস? না, না, এ চলবে না। মনে রাখিস আমরা পুণ্য তীর্থধামের ব্রতচারিণী। যা, শিগগির বাথরুমে যা। চোখ মুখ ঠোঁট ধুয়ে রাঙা টুকটুকে ভাব কমিয়ে আয়।

দেবযানী হেসে ফেলে—কেন পান দিলে? কি যে কাণ্ড হলো বলো তো! দাও, সাবান দাও, দেখি ঘষেমেজে ব্রতিনীর মতো ঠোঁট দুটোকে আমসি করতে পারি কিনা। দেবযানী গট্‌গট্ করে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে।

গফুর কুলি নিয়ে হাজির। সুদেষ্ণা ব্যাগ খুলে তার হাতে টাকা দিতেই সে অবাক হয়ে বলে—এত লাগবে কিসে।

—লাগবে, লাগবে— ওদের ভাড়া, শহরের বকশিস, সাবুর জামা, আর তোমার বিবির ওষুধ পত্র—ভাল ভাল জিনিষ—ফলটল খাওয়াবে। গফুর বাক্যহীন হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে!

দেবযানী বাথরুম থেকে ফিরে আসে। গফুর কুলির মাথায় বেডিং চাপিয়ে হাতে স্যুটকেশ দুটো তুলে দেয়। বেরোবার মুখে সুদেষ্ণা গফুরকে বলে—প্লাটফরমের ডান পাশে যতটা পার পুলিশ বেষ্টনির কাছ ঘেঁষে থাকবে। আমরা পৌঁছলে পর ছোটবাবুর কাছে টিকিট আনতে গিয়ে জানবে গাড়ি কখন আসছে। দেবযানীর হাতে খেজুর পাতার থলেটা দিয়ে সুদেষ্ণা ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়িয়া এই অঞ্চল সাঁঝ-বেলাতেই ঝিমিয়ে পড়ে আঁধার ছড়িয়ে দেয়। কর্কশ ঝিল্লিরব তার নির্জনতাকে সরব না করে যেন শ্মশানের নীরবতা নিয়ে আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা নেচে নেচে অন্ধকারকে স্বাগত জানায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ধরণী উত্তপ্ত নিঝুম নিস্তব্ধ—বৃক্ষপত্র নিথর নিস্পন্দ। সুদেষ্ণা ও দেবযানী নিঃশব্দে

ডাক বাংলোর পথ বেয়ে নিচে নেমে আসে। উভয়ের চিন্তা-ধারা ভিন্নমুখী। এবারেব যাত্রায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এবং দলীয় কর্মে আশাতীত সাফল্যে সুদেষ্ণা উৎফুল্ল আর দেবযানী আপন দয়িতের চিন্তায় বিমনা বিমর্ষ।

বড় রাস্তায় পড়ে হাট-ফিরতি নানা পণ্যসম্ভার নিয়ে গৃহাভিমুখী লোকজনের সাক্ষাৎ মেলে। গুমটির নিকটে আসতেই যাত্রীদেব কোলাহল কানে আসে। রেল লাইনের লোহার গেট বন্ধ। সুদেষ্ণা স্বগতোক্তির মতোই বলে—যাক রেলগাড়ি তাহলে চলতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্ণ-বিদারি শিষ দিতে দিতে হুস্ হুস্ ভোঁস ভোঁস শব্দে মাটি কাঁপিয়ে গাড়িটা সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। গেট খুলে যেতেই সুদেষ্ণা দেবযানীকে বলে,—চ, একটু পা চালিয়ে চ—শীঘ্রই হয়ত শহরগামী গাড়ি এসে পড়বে।

রেললাইন ধরে না গিয়ে সুদেষ্ণা স্টেশনের সড়ক ধরে চলে চলে প্লাটফরমের ধারে উপস্থিত হয়। যাত্রীদের চিৎকার চেঁচামেচি, গুমট গরম, অন্ধকার ইত্যাদি সবকিছু মিলে এক অস্বাভাবিক অসহ্যকর পরিবেশ। সুদেষ্ণা পুলিশ বেষ্টনির কাছে গফুর কিংবা কুলিদের কাউকেই দেখতে পায় না। ভিড়ের মধ্যে রেল লাইনের দিকে এগোনো অসম্ভব বাঁয়ে প্লাটফরমের আলোগুলি টিমটিম জ্বলছে। পুলিশের হুমকির ভয়ে টর্চ জ্বেলে দেখবারও সাহস হচ্ছে না। সুদেষ্ণা খুবই চিন্তিত। তবে কি গফুর অন্য কোথাও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্টেশনের ছোট বাবুর নিকট যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তাঁর নিকট হতে টিকিট নিয়ে গাড়ির সময় জেনে গফুরের খোঁজ করতে হবে। দেবযানীর হাত ধরে সুদেষ্ণা প্লাটফরমে ঢোকার গেটের সামনে উপস্থিত। ঢুকতে দিতে পুলিশ প্রথমে আপত্তি করে। কিন্তু মেয়েছেলে দেখে তার উপর ছোটবাবুর নাম করতেই পুলিশ গেট ছেড়ে দেয়। ছোটবাবু সুদেষ্ণা ও দেবযানীকে দেখে বলেন—কি ব্যাপার? গফুরকে না পাঠিয়ে স্বয়ং হাজির!

কারণ আছে বলেই তো আপনার শরণাপন্ন হলাম। গফুর পুলিশ বেষ্টনির বাইরে মালপত্র নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে কোথায় যে আছে এই অন্ধকারে তার হদিশ করতে পারলাম না।

—এই ব্যাপার! রঘুয়া রঘুয়া বলে ছোটবাবু হাঁক পাড়েন। রঘুয়ার বদলে হরকিষেণ এসে হাজির। তাকে দেখেই ছোটবাবু বলে—রঘুয়া কোথায়?

—আজ্ঞে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে রঘুয়া তো হরদম তীর্থ যাত্রীদের তদ্বির তদারক করছে।

—হু, বলে ছোটবাবু হরকিষেণকে হুকুম করে—তুই আমার লণ্ঠনটা নিয়ে গিয়ে দেখ চৌকিদার গফুর এঁদের মালপত্র নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে পুলিশের বেষ্টনির বাইরে কোথায় আছে। জলদি করে খোঁজ নিয়ে আয়—আপ গাড়ি আসতে এখনো আধঘণ্টা দেরী। আদেশ মাত্রই হরকিষেণ লণ্ঠন হাতে প্রস্থান করে। ইতিমধ্যে টিকিট দেবার জানালায় আবার লোকের ভিড়। টিকিট দেওয়া শেষ হতে না হতেই টেলিগ্রাফ টেবিলে ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে ওঠে। কিছুক্ষণ টরে টক্কা করে সংবাদ দেয়া নেয়া করে ছোটবাবু—রঘুয়া রঘুয়া বলে হাঁক দেয়। সে অনুপস্থিত! অগত্যা নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি আসার সংবাদ ঘোষণা করে।

ঘণ্টা শুনেই রঘুয়া অন্ধকার থেকে ভূতের মতো এসে হাজির। চেহারা ও তার রকমসকম ভূতে পাওয়ার মতোই—উস্কোখুস্কো চুল, চক্ষু কোটরগত! ছোটবাবু তাকে দেখেই ধমক দিয়ে বলে—হতচ্ছাড়া কোথায় থাকিস। নে জলদি সিগনেল দে, ৫০নং ডাউন ট্রেন আসছে। তারপর পর পর দুটো আপ ট্রেন। তাতে পুলিশের দুই বড় সাহেবের সঙ্গে আমাদেরও এক বড় কর্তা আসছেন। খবরদার আর কোথাও যাবিনা—সাবধান করে দিচ্ছি। ছোটবাবু বকবক করতে করতে ঘরে ঢোকে। আমার হয়েছে মরণ! গফুরকে বলেছিলাম, পুলিশের দুই বড় সাহেবের কথা এখন তাদের সঙ্গে আমাদেরও একজন যোগ হলো—এ যেন গোদের ওপর বিষফোড়া। কেনরে বাবা এইসব খুনখারাবি, হাঙ্গামা হুজ্জত! গান্ধী মহারাজের কথা মতো চল, অসহযোগ কর, জেল ভর; তবে না দেশের স্বাধীনতার পথ সুগম হবে! তারপর সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—বলুন ঠিক কিনা!

সুদেষ্ণার হাজির জবাব—তা তো বটেই।

হরকিষেণ এসে জানায় গফুরের সন্ধান মিলেছে। আগের ডাউন ট্রেনের যাত্রীদের পিছে পিছে হুড়োহুড়ি করে সে একেবারে রেললাইনের ধারেই রয়েছে এবং আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যাত্রীদের ভেতর দিয়ে ভিড় ভেঙ্গে গাড়ি ধরতে গেলে পৌঁছবার পূর্বেই গাড়ি ছেড়ে দেবে। এটা ভেবে গফুরের নিকটে দাঁড়ানো এক দেশোয়ালী লাল পাগড়ীকে বললাম—জী মহারাজ, রাম রাম। আপকা পাশ মেরা এক

আর্জি—রেল স্টেশনকা ছোটা বাবুকো ছু রিস্তাদার জেনানা আনেওয়ালা আপ গাড্ডিমে যায়েগা। আপ মেহেরবানী করকে উন দোনোকে ইধারসে যানে দে তো বহুৎ মেহেরবানী হোগী, রামজী আপকো ভালা করেগি। শুনে তো বেটা একেবারে তালপাতার সেপাইর মতো কুপোকাৎ। ওর সাথীর সঙ্গে আলাপ করে বলে—ঠিক হ্যায়—গাড্ডি আনেকা সাথ সাথ উন দুনোকো লে আনা।

ছোটবাবু শুনে বলে—না, বেটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে—রঘুয়াটার মতো নিরেট নয়। এখন যা দুখিয়াকে ডেকে আন। আমাদের সাহেব যদি পুলিশ সাহেবের সঙ্গে ডাকবাংলো যান তবে তো বাঁচোয়া। আর যদি ওয়েটিংরুমে রাত্রিযাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তবেই তো চিত্তির! যা দুখিয়াকে দিয়ে ওয়েটিং এবং বাথরুম ছাপছুত্‌রো করিয়ে রাখ। আর ট্রেনের ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে মাইজীদের নিয়ে যাবি। হরকিষেণ মাথা নেড়ে চলে যেতেই ছোটবাবু বলেন—যাক ভালোই হলো —অনেক হাঙ্গামা হুজ্জত থেকে বাঁচলেন। আমি কাজকর্ম সারি—ডাউন ট্রেন তো এসে পড়লো বলে। ট্রেনের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রঘুয়া দৌড়ে এসে ছোটবাবুর ঘর থেকে লোহার আংটা দেওয়া গোল মতো একটা বেতের ছড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। বড়বাবু তার ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে চলে যান। বড়বাবুকে দেখে সুদেষ্ণাও প্লাটফরমে নেমে পড়ে। কিছুক্ষণ যাত্রীদের হুড়োহুড়ি উঠানামা হাঁকডাক চিৎকার চলে। গাড়ি ছাড়ার পর বড়বাবুকে ফিরতে দেখে সুদেষ্ণা এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানায়। বড়বাবু প্রতি-নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এবার কেসটেস কেমন হলো?

—তা আপনাদের পাঁচজনের শুভেচ্ছায় খারাপ নয়। ভালকথা এবার এনডাউমেণ্ট পলিসির ওপর কোম্পানির ডিভিডেণ্ড-এর হার বৃদ্ধির ডিক্লারেশনটা পেয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, এবার তো আর হলো না, আগামীবার এখানে এলে দেখা করবেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে সুদেষ্ণা ফিরে আসে। বিপদসংকুল প্রত্যাবর্তনের পথে যে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা খুবই অনুকূল। সুদেষ্ণা বারান্দায় পাইচারিরত দেবযানীর সঙ্গে এসে যোগ দেয়। অদূরে সিগনেলের চাকার লোহার বেষ্টনির ধারে দণ্ডায়মান রঘুয়া তাকে দেখেই

দৌড়ে আসে—বহুত কসুর হয়ে গেল বহিনজী, বলেই সে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

—সেকি তুমি আবার আমার কাছে কি কসুর করলে!

—তখন ছোটবাবু বহুত গালমন্দ করলেন।

—ও, সে তো তোমাকে পাওয়া যায়নি বলে, এদিকে গাড়ি আসছে।

—যো কুচ হো, বহিনজী ম্যায় তো থক গিয়া, বিলকুল পাগল বন গিয়া।

—কেন কি হলো!

—সে এক আজব কাহিনী বহিনজী—আপকো না বললে আমার মনে শান্তি আসবে না। আপনি গরীবের দুঃখ কষ্ট সমজেন। কথা শেষ হতে না হতেই ছোটবাবুর রঘুয়া রঘুয়া চিৎকার শোনা যায়। রঘুয়া লণ্ঠন হাতে ছোটবাবুর ঘরের দিকে ছোটে।

তাকে দেখেই ছোটবাবু বলে—আপ গাড়ি আগের স্টেশন ছেড়েছে। ঘণ্টা বাজাও। আর শোন, পুলিশ সাহেবের সঙ্গে আমাদের এক বড়কর্তাও আসছেন। হরকিষেণকে ডাক, মাইজীদের গাড়িতে তুলে দেবে। দেখ তো প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামঘর, বাথরুম ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে কিনা। পোষাক টোশাক একটু কেতা-দুরুস্ত কর।

রঘুয়া ঘণ্টা বাজিয়ে আপ ডাউন সিগন্যাল দিয়ে প্রথমশ্রেণীর বিশ্রামঘর বাথরুমে ইত্যাদি দেখে ছোটবাবুকে বলে বেরিয়ে আসতেই সুদেষ্ণা বলে—তোমার কথা এবার আর শোনা হলো না রঘুনন্দন—আসছে বার এলে শুনবো।

রঘুয়া হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু হরকিষেণ ছুটে আসাতে আর কিছু বলা হলো না। সুদেষ্ণা, দেবযানী ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলে—ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।

ছোটবাবু প্রতিনমস্কার জানায় বটে কিন্তু কথা বলার অবকাশ পায় না। টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান প্রদানে ব্যস্ত।

হরকিষেণ সুদেষ্ণা ও দেবযানীকে নিয়ে প্লাটফরমের ভেতর দিয়েই রেল লাইনের দিকে অগ্রসর হয়। দূর থেকে রেলগাড়ির শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসছে এবং ইঞ্জিনের সন্ধানী আলো দেখা যাচ্ছে। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই গফুর লাফ দিয়ে গাড়ির পা দানিতে উঠে পড়ে দরজা খুলে কুলিদের মাথা থেকে বেডিং দুটো এবং হাতের সুটকেশ গাড়িতে তুলে

দিয়ে নেমে আসে। সুদেষ্ণা ও দেবযানী গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে পা-দান-এ দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ উঠতে পারেনা। কুড়ি ঘণ্টার পর এই প্রথম গাড়ি। কামরা যাত্রীতে ঠাস ঠাসি। বসবার জায়গা নেই। গফুর বেডিং দুটো ঠেসেঠুসে কোন রকমে বাঙ্কের উপর রেখেছে। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে সুদেষ্ণা হরকিষেণকে ডেকে তাকে বকশিষ দিয়ে বলে—আমাদের জন্য তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হলো। হরকিষেণ কঁাচুমাচু হয়ে কি বললে বোঝা যায়না। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে তা ডুবে যায়। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সুদেষ্ণা দরজা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দেখে গফুর তখনো অন্ধকারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। জীবনে চলার পথে সমাজের উঁচু নিচু বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কার্যব্যাপদেশে সুদেষ্ণার মেলামেশা। কিন্তু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জন-জীবনের এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য কেন জানি সে সত্যিকার প্রাণের টান অনুভব করে—অর্থ সামর্থ্য দিয়ে তাদের উপকার করতে পারলে সে নিজেকে একান্ত সার্থক ও পরিতৃপ্ত মনে করে।

পরপর কয়েকটি স্টেশন পেরনোর পর কামরাটা কিছু হালকা হয়েছে। শহরে পৌছতে আর বিলম্ব নেই। সুদেষ্ণা পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে দেবযানীর হাত থেকে তীর্থযাত্রীর ব্যাগটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ভিন্নরূপে বেরিয়ে আসে। কপালে লম্বা সিঁদুরের টান, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। দেবযানী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সুদেষ্ণা হেসে বলে—হাঁ করে দেখছিস কি! নে, ওঠ গাড়ি পৌছলে বলে। সুদেষ্ণার এই আকস্মিক বেশ পরিবর্তন কামরার কারো নজরে পড়েছে কিনা বোঝা গেলনা—কারণ সকলেই তখন আপন আপন মাল সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। সারা দিন গাড়িতে আটক থেকে এখন আপন আপন ঘরে পৌছতে ব্যগ্র।

গাড়ি এসে প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছে। সুদেষ্ণা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ে। দেবযানীকে মালের কাছে দাঁড় করিয়ে সে কাকে যেন খুঁজছে আর সেই সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্লাটফরম থেকে বার হবার প্রতিটি গেট লক্ষ্য করছে। সর্বত্রই কড়া পুলিশ পাহারা। সাদা পোষাকে গোয়েন্দারা ঘুর ঘুর করছে। একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি যে গেটের বাইরে দাঁড়ায় সেখানটা অন্ধকার এবং পুলিশ ও গোয়েন্দার সংখ্যাও কম। ফিরে আসার মুহূর্তে একটি ছেলেকে ত্বরিত গতিতে তার পাশ কেটে যেতে

দেখে সুদেষ্ণা চাপা গলায় আবতুল বলে ডাক দিতেই সে ফিরে তাকায়। এগিয়ে এসে সুদেষ্ণাকে দেখেই—ওমা, দিদি যে। আমি তো হন্যে হয়ে খুঁজছি। দেখেও আপনাকে চিনতে পারিনি। হায় কপাল। অবশ্য আমারও আসতে একটু দেরী হয়েছে। আবতুল কুলি কুলি বলে ডাকতেই তু'জনা এসে হাজির। তাদের মাথায় বেডিং চাপিয়ে ও হাতে সুটকেশ দিয়ে আবতুল চলতে থাকে। সুদেষ্ণা ও দেবযানী তাদের অনুসরণ করে। আগে পিছে আরও যাত্রী মোটঘাট নিয়ে চলেছে। পুলিশ বেষ্টনি ছাড়িয়ে, গেট পেরিয়ে আবতুল ঘোড়ার গাড়িতে উঠে পড়ে। সুদেষ্ণা গাড়িতে উঠতে যাবে এমনি সময় রাস্তার ওধারে ল্যাম্প পোষ্ট-এর আলোতে একটি ছেলেকে দেখে- সুধাংশু ডাকতেই সে কাছে আসে। সুদেষ্ণাকে দেখেই অবাক হয়ে বলে—দিদি! হায় হায় আমি তো চিনতেই পারি নি। গাড়োয়ান যেন একটু আস্তে গাড়ি চালায়। আমি এক্ষুনি আসছি, বলেই সে উধাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই দৌড়ে এসে অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতিতে গাড়ির পা দানিতে পা রেখে উঠে পড়ে। সুদেষ্ণা দরজা খুলে দিতেই সে তার পাশে গিয়ে বসে। গাড়ি ছুটে চলেছে। হাসপাতাল ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে গাড়ি দাঁড়াতেই সুটকেশ হাতে নিয়ে দেবযানী নেমে যায়। সুদেষ্ণাও নেমে তার সঙ্গে গলির মুখ অবধি আসে। দেবযানীর হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলে —তোর পারিশ্রমিক। এ যাত্রায় অনেক খাটা-খাটি করেছিস। বিছানাটা কাল যে কোন সময় তোর বাড় পৌঁছবে—মামীকে বলে রাখিস। কথা শেষে সুদেষ্ণা অদূরবর্তী গাড়িতে গিয়ে ওঠে। গাড়ি ছেড়ে দেয়। হাতে টাকা নিয়ে দেবযানী কিছু বলবার আর অবকাশ পায় না। সেখানে থেকে একেবারে সে তা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। কড়া নাড়তেই মামা দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মামী ও সুদেব এসে হাজির। লণ্ঠনের আলোতে দেবযানী সকলের চোখে মুখে উদ্বেগ ও বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পায়। মামার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন—গাড়ি চলছে? কোন গাড়িতে এলি?

উত্তরে দেবযানী বলে—হঁ্যা, সাড়ে আটটার গাড়িতে এসেছি। তবে লেটে রান করেছে।

মামী বলেন—এখন আর কথা নয়। যা, হাত মুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে নে, তারপর কথা বলিস।

দিদির সঙ্গে কথা বলার জন্যে সুদেব এতক্ষণ কেবল হাঁকপাঁক

করছিল। দিদি ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই সুদেব আর নিজেকে চেপে রাখতে পারেনা—কি যে কাণ্ড দিদি, চতুর্দিকে হৈ হৈ রৈ-রৈ—শহর একেবারে সরগরম!

ভাইয়ের কথার ধরনধারণ দেখে দেবযানী হেসে বলে—তোমার কথা শুনলুম কিন্তু কিছুই বুঝলুম না ভাই—কি কারণে হৈ চৈ তার কারণটিই বললে না!

মামী এসে ঘরে ঢোকে। সুদেবকে ধমকে দেয়—কি হচ্ছে? ওকে বিশ্রাম করতে দে। তারপর দেবযানীকে বলে—ওঠ, জল খাবার তৈরি, রান্না ঘরে আয়।

—এত রাত্রে আবার জল খাবার কেন? আচ্ছা একটু দাঁড়াও তো মা, বলেই দেবযানী উঠে পড়ে। স্যুটকেশ খুলে টাকা কয়টা নিয়ে উবু হয়ে মামীকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে বলে—আমার প্রথম রোজগার।

উর্মিলা অবাক! উদ্বেলিত স্নেহের আবেগে ওকে তুলে ধরে মাথায় চুমো দিতে গিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল আশীর্বাদের মতো ওর মাথায় ঝরে পড়ে। দেবযানী হতবাক হয়ে মামীর মুখের দিকে তাকায়। উর্মিলা টাকাটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

এই সব নাটকীয় দৃশ্যে সুদেবের ভেবা-চাকা লাগে। দিদিকে যা বলার জন্য সে এতক্ষণ ছটফট করছিল তা আর বলা হয় না। —দুত্তোর ছাই, বলে সে চেয়ারে বসে পড়ে। দেবযানী কাপড়-চোপড় নিয়ে কলতলায় চলে যায়। স্নান সেরে সে সোজা রান্না ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাকে দেখেই মামী—বোস, বলেই খাবার থালা সামনে ধরে দেয়।

—না, না, এত দিওনা। একটু পরেই তো আবার ভাত খেতে ডাকবে।

—ভাত না হয় একটু দেরী করে খাস। এখন বল, তুই কেমন ছিলি? চেহারাটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে! বড় হয়ে আমাকে ছেড়ে তো এত দূরে কখনো যাসনি।

—দূর আর কোথায়! রেলে তো মাত্র দেড় থেকে দু'ঘণ্টার পথ। ভালই ছিলাম। মাঝে মাঝে তোমাদের কথা মনে হলে মনটা আনচান করতো। তবে কাজ কর্মে খুব ব্যস্ত ছিলাম—ছুটোছুটি হয়তো একটু

বেশী হয়েছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো—আমাকে দেখে তোমরা সকলেই কেমন যেন অবাক হয়েছ বলেই মনে হলো—আমি যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ ভিন্ন এক জগৎ থেকে তোমাদের সামনে নেমে এলাম।

—তা কেন; তবে হ্যাঁ, তোর জন্য আমরা সকলেই খুব চিন্তা করছিলাম। তোর মামা সেদিন এক খবর নিয়ে এলেন—খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে—তুই যেখানে গিয়েছিলি তার আশপাশে কোথায় কোন স্টেশনের কাছে ডাকাতরা ডাক গাড়ি আটক করে প্রচুর টাকা লুটে নিয়েছে। রেলগাড়ি বন্ধ—কবে চলবে তার নাকি ঠিক নেই।

—কি বললে, ডাকগাড়ি লুট হয়েছে! দেবযানী উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

—হ্যাঁ কেন তুই জানিস না?

—না তো। আজ আসবার সময় মাত্র জানলাম গাড়ি বন্ধ, কেন জানিনা, জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে দিদি খবর নিয়েছে যে, গাড়ি সন্ধ্যা নাগাদ চলতে শুরু করবে। স্টেশনে এসে দেখি চতুর্দিক আটকে পড়া তীর্থযাত্রীর ভিড়ে জমজমাট, আর সারা স্টেশন চত্বর জুড়ে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। লেট করে গাড়ি এলো। তাতে তিলমাত্র স্থান নেই! পুলিশ চৌকিদার ও স্টেশন জমাদারের সাহায্যে কোনরকমে গাড়িতে উঠলাম। যথাসময়ে শহরে এসে পৌছলাম। তারপর ঘোড়ার গাড়ি চেপে বাড়ি এলাম—ব্যস। কথা শেষ দেবযানী উঠে পড়ে।

মামী বললেন—যা এবার গিয়ে বিশ্রাম কর। যাবার সময় তোর মামার কাছ হয়ে যাস। বড্ড চিন্তা করছিলেন কিনা।

ঘরের দাওয়ায় উঠে দেবযানী দেখে মামা চুপটি করে অন্ধকারে চেয়ারে বসে আছেন। কাছে এসে বলে—তুমি না হক চিন্তা করছিলে মামা। খবরের কাগজ তিলকে তাল আবার তালকেও তিল করে। সরজমিনে তদন্ত না করে আপিসের টেবিলে বসেই এরা গাছে আর মাছে—যা খুশি বানিয়ে বানিয়ে লেখে। কৈ, দাও তো তোমার কাগজখানা—দেখি কি লিখেছে?

—ও আর দেখে কি হবে?

—না, তবু আমি দেখতে চাই—কি ছাইপাশ লিখেছে যার জন্য তোমরা এতখানি চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েছিলে!

—তা কাগজেব আর দোষ কি বল। যা ঘটেছে সে খববই লিখেছে। কিন্তু খববেব কাগজ তো ক্লাবেব এবং তা ক্লাবেই আছে। ঐ সংখ্যাটা যদি পাই তবে কাল তোর জন্য নিয়ে আসবো। যা, এখন গিয়ে বিশ্রাম কব।

দেবযানী, নিজেব ঘবেব দবজাব সামনে এসে দাঁড়ায়। সুদেব টেবিলেব সামনে মাথা নিচু কবে পাঠে নিমগ্ন। চুপি চুপি পায়ে ভাইযেব পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধবে মাথায় একটা চুমো দিয়ে পাশেব চেয়াবে বসে বলে—ভ্রাত, কহ কিবা সন্দেশ তব।

দিদিব আদবে গলে গিয়ে সুদেব পাশ ফিবে দিদিব কোলে মুখ গুঁজে চুপ কবে থাকে! সুদেবেব পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দেবযানী ঈষৎ হেসে বলে—বাব্বা, বুড়োধাড়ি ছেলেব আদব খাবার নমুনা দেখ! নে, ওঠ আব আদব খেতে হবে না। দেবযানী সমাদবে ভাইযেব মাথাটা তুলে দেখে তাব চোখেব কোনে জল টলটল কবছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধবে।

সুদেব এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে। চেয়াবটায় ঠিক হয়ে বসে বসে বলে উঃ, দিদি তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে! বাবা, মা তো দিবানিশি বিমর্ষ বিষণ্ণ আব ছটফট কবতেন। মা তো আমাব ঘবে শুতেন—মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলে দেখতাম মা ঘবময পাইচাবি কবছেন। গত দু'দিন মাযেব মুখে হাসি দেখিনি। এইসব দেখে-শুনে তোমাব বেচাবি হতভাগ্য ভ্রাতাব অবস্থাটা একবাব কল্পনা কব।

সবই বুঝলাম ভাই। কিন্তু যে কাগজে এসব বেবিয়েছে, তখ সেটাই দেখতে পেলাম না। মা বললেন—ক্লাবেব কাগজ ক্লাবেই আছে—বাবা কাল নিয়ে আসবেন। যাক, ওসব নিয়ে আব মাথা ঘামাবো না। এখন তোমাব খবব বলো—লেখাপড়া শবীবচচা ইত্যাদি কেমন হচ্ছে?

—লেখাপড়া! এই মন নিয়ে কখনো হয়? তুমিই বলো? আব শবীব চর্চা! সাবা শহবেব ক্লাবে ক্লাবে কেবল এক জটলা—কে, বা কাবা এই দুঃসাহসিক কর্মটি কবলো! ব্রিটিশ সিংহেব বিবরে হানা উপবে পুলিশ আব টিকটিকির দৌরাত্ম্য—সন্দেহভাজন থানায় নিয়ে গিযে জেবা—মাবধোরও হয়ত করছে। গিয়ে নাকি খোঁজ খববও নিচ্ছে। তি হলো কোথায—আব পুলিশ তাব জের টা[illegible]

হাঙ্গামা হুজ্জত করে। অদ্ভুত ব্যাপার! যাক্ তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না ভাই। তোমার এখন একমাত্র সাধনা—লেখাপড়া, শরীরচর্চা আর মানসিক উন্নতিসাধন।

উত্তরে সুদেব কিছু বলতে গিয়ে দিদিকে ডেকে সাড়া না পেয়ে চুপ হয়ে যায়।

অবিশ্রান্ত চলে ক্লান্ত শ্রান্ত অনুতোষ পর্বতশীর্ষে দেবাদিদেবের মন্দিরের দ্বারে এসে উপস্থিত। বৃষ্টিস্নাত রৌদ্র ঝলমল আকাশের নিচে চতুর্দিকে সবুজ লাবণ্যে ভরা অন্তহীন বনানী ঢেউ-এর পর ঢেউ-এ দিগন্তে বিলীন। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়—চোখ ফেরানো যায় না। মন এক অনির্বচনীয় গভীর গম্ভীর ভাবে আপ্লুত হয়। সারারাত্রি ব্যাপী পূজার্চনা, হোম, যাগ-যজ্ঞ, ধূপধুনো, পুঞ্জীভূত পুষ্প বিল্বপত্রের বাসী মিষ্টি গন্ধ মন্দিরাভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছে। মন্দিরের চতুর্দিকে উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো ও সমতল ক্ষেত্রে যাত্রীরা সব ছড়িয়ে আছে। কেউ শুয়ে কেউ বসে, কেউবা যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত। সাধু সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ যোগাসনে স্তিমিত নেত্রে ধ্যান-মগ্ন। অনেকে গোল হয়ে ধুনির চতুর্দিকে বসে গঞ্জিকা সেবনরত। এক জটাধারী সম্মুখে পোঁতা ত্রিশূল মাটিতে পুঁতে যাত্রীদের হাত দেখছেন। তার চতুর্দিকে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়! ভিক্ষু ভিক্ষুনীরা জয় শিবশংকর বলে হাত বাড়িয়ে ভিখ মাগছে। এক বিচিত্র পরিবেশ—মেলার আমেজ! অনুতোষ ঘুরে ঘুরে প্রভাত ও অন্যদের খোঁজ করে—দেখতে পায় না। হয় ওরা আগেই চলে গেছে নয়তো ভিন্ন পথে গিরি লঙ্ঘন করেছে।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের আসা যাওয়া সমান তালে চলেছে। [illegible] পণ্যাদি উপলক্ষে যাত্রী আগমনের পাল্লা তুলনা-

শায় মন্দিরদ্বার রুদ্ধ
যাত্রার জন্য পা বাড়িয়েছে
ঢাকা শায়িত এক মূর্তির

প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাশেই এক বর্ষীয়সী ভৈরবী কমণ্ডলু থেকে শায়িত ব্যক্তির মুখে জল দেবার চেষ্টা করছে। যাত্রীদের কেহ কেহ কাছে গিয়ে কিংবা দূর থেকে দেখেই চলে যাচ্ছে। কি ব্যাপার! তবে কি লোকটা কোন সংক্রামক বা অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত! এ জিজ্ঞাসা মনে জাগতেই অনুতোষের সেবা-পরায়ণ হৃদয় বিচলিত হয়ে ওঠে। আপন মুখোশ বজায় রেখে কিভাবে ঐ রুগ্ন অসহায় ব্যক্তিকে সেবা ও সাহায্য করা যায়? ভেবে চিন্তে অনুতোষ চলার পথে পা না-বাড়িয়ে সোজা গাছতলায় গিয়ে উপস্থিত। দেশোয়ালী ভাষায় ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করে জানে—গত রাত্রিতে নান্দিকেশ্বর মন্দির থেকে এখানে আসবার পথে বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল সিঁড়িতে অনবধানতাবশত আছাড় খেয়ে তার সঙ্গী নিচে গড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন যাত্রীর সহায়তায় ধরাধরি করে এখানে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। এখন সে চলচ্ছক্তিহীন, জ্বরে বেহুঁশ। কথা শেষে ভৈরবী অতি করুণ অসহায় দৃষ্টিতে অনুতোষের দিকে তাকায়। অভিজ্ঞ সেবাব্রতী অনুতোষ রোগীর গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে, তারপর হাঁটুর কাপড় সরিয়ে দেখে ডান পা ফুলে গিয়েছে। পা'টা ধরে একবার টান দিতেই রোগী কঁকিয়ে উঠে। অনুতোষ অনুমান করে হাঁটুর মালাইচাকিই বোধ হয় জখম হয়েছে। মাথায় চোট লাগার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে একে এভাবে ফেলে রাখলে এর জীবন সংশয় দেখা দেবে। সুতরাং যেভাবেই হোক একে এই মুহূর্তে নিচে সেবাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া জরুরী। চতুর্দিকে চেয়ে দেখে সেবা-কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক কোথাও নেই। যুবা বৃদ্ধ প্রৌঢ় যাত্রী এবং সাধুসন্ন্যাসী যারা গাছতলা দিয়ে চলেছে তাদের কারো সেখানে ক্ষণিকের তরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবার অবসর কিংবা এতটুকু মানবিকতাবোধ নেই যে তাদেরই মতো এক পুণ্যাভিলাষী যাত্রী গাছতলায় এরূপ অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে কেন! দয়া দাক্ষিণ্য অনুকম্পা বোধ তো দূরের কথা! সারারাত্রিব্যাপী পূজার্চনা, যাগযজ্ঞ, হোম আরাধনা ও দেবদর্শনের পর পুণ্যের বোঝা ভারি করে নিয়ে পরিতৃপ্ত মনে ফিরে চলেছে! আশ্চর্য, তবে কি ধর্মকর্ম দেবদর্শনে ইত্যাদি মানবিকতাবোধ বিহীন কেবল অসার আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব! ধর্মের পথ কি তবে শুধু এক কানাগলি! অনুতোষের মনে এই সর্বপ্রথম ধর্ম সম্বন্ধে এক নতুন চিন্তা জাগে এবং নব-জিজ্ঞাসা ও চেতনার উন্মেষ ঘটে।

না, আরো দেরী করা রোগীর মতো তার পক্ষেও মারাত্মক। ইতিমধ্যে পুলিশ নিশ্চয়ই ডাকাতের খোঁজে চতুর্দিকে চর অনুচর পাঠিয়েছে। তারা এখানেও আসতে পারে—কিংবা ইতিমধ্যে এসেও গেছে। অনুতোষ কর্মতৎপর হয়ে উঠে ভৈরবীকে আদেশ করে—আপনি এর জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার এই কমণ্ডলু ও মৃগচর্মের পুঁটলিটা সহ আমার সঙ্গে চলুন। আমি একে কাঁধে করে নিচে আর্তত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাচ্ছি।

কথা শেষে অনুতোষ অদ্ভুত কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আহতের ঘাড়ের নিচে এক হাত ও কোমরের নিচে এক হাত দিয়ে তাকে তুলতে গিয়ে দেখে মাথার নিচের মাটি রক্তে ভিজে জমাট বেঁধে গেছে। অনুতোষ হতভম্ব—বুঝলো হাঁটুর মতো মাথার আঘাতও গুরুতর। সাতশ' ফুট-এর মতো এই পাহাড়ী উঁচুনিচু এবড়ো খেবড়ো রাস্তা চলে তার উপর কয়েকশ' ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নিয়ে যেতে এর মাথা যেভাবে দুলবে তাতে রক্তক্ষরণে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। অনুতোষ প্রমাদ গোণে! এই অবস্থায় স্ট্রেচার করে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। অনুতোষ পুনরায় রোগীকে পূর্বাবস্থায় একটু কাৎ করে শুইয়ে দিয়ে ভৈরবীকে তার মুখের চোয়াল একটু চেপে ধরতে বলে। তারপর বাবরি চুল সরিয়ে মাথার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সিঁড়ির কোণায় লেগে মাথাটা বেশ জখম হয়েছে। হাড় ভেঙেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অনুতোষ চটপট মৃগচর্মের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা থলে বের করে আনে। সেটা খুলে ওষুধ নিয়ে তুলো ভিজিয়ে মাথার জমাট বাঁধা রক্ত আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে। তারপর আর এক খণ্ড তুলোতে অপর এক শিশি থেকে পাউডার ঢেলে সেটা ক্ষতস্থানে চেপে বসিয়ে দেয়। অতঃপর ভৈরবীকে দু'হাত দিয়ে মাথাটা সামান্য তুলে ধরতে বলে ব্যাণ্ডেজ বের করে তা দিয়ে নিপুণ কুশলী হস্তে মাথাটা বেশ করে বেঁধে ভাঁজ করা কম্বলের উপর বসিয়ে দেয়।

এক নবীন যুবা সন্ন্যাসীকে দুর্ঘটনায় আহত এক তীর্থযাত্রীর সেবা শুশ্রূষায় রত দেখে কয়েকজন তীর্থযাত্রী কৌতুহলী হয়ে তার আশেপাশে ভিড় করে তাকে এবং তার সেবা শুশ্রূষার পদ্ধতি বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে থাকে। এতজনের নজরে পড়া অনুতোষের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। অতি নিকটবর্তী এক তীর্থযাত্রীকে একটু সহানুভূতিশীল মনে হওয়ায় অনুতোষ আহত ব্যক্তির সঙ্গীন অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত

করে বলে—নিচের আর্তকেন্দ্রের মেডিকেল ইউনিট থেকে ষ্ট্রেচার এনে রোগীকে অগৌণে ডাক্তারের হেপাজতে পৌঁছে দেওয়া একান্ত জরুরী। নচেৎ রোগীর জীবন সংশয় দেখা দেবে। কথা শেষে অনুতোষ দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করেই বলে—দেবদর্শন এক মহৎ কর্ম—তাতে পুণ্যলাভ ; তবে জীবে-দয়া আর্তজন সেবা নিঃসন্দেহে মহত্তর—ইষ্ট দেবতারা তাতেই তুষ্টি লাভ করেন। সুতরাং এই অসহায় মুমূর্ষুর জীবন মরণের ভার গ্রহণে আপনিই প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। পরমাত্মা আপনার মঙ্গল করুন বলে অনুতোষ সম্বোধিত ব্যক্তিকে কিছু বলা কিংবা ভাববার অবকাশ না দিয়েই উঠে পড়ে।

জীবে-দয়া ও সেবা পরমধর্ম আখ্যা দিয়ে অনুতোষ যাঁর হস্তে রোগীর ভার অর্পণ করে তিনি তখনও নিস্তব্ধ নিরুত্তর অবস্থায় অনুতোষের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছেন। তারপর গভীর গম্ভীর কণ্ঠে পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে ডেকে বলেন—অজিত, তুই ছুটে যা! নিচে বড় সরকের ধারে অশত্থ গাছের নিচে মিশনের সেবা কেন্দ্র। সেখান থেকে জলদি বাহকসহ স্ট্রেচার নিয়ে আয়। সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষ বলে—ভৈরবীজীকেও সঙ্গে নিয়ে যান। তাতে সেবাকেন্দ্রের অধিকর্তা বিষয়টার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হবেন। পরমুহূর্তে ভৈরবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুতোষ বলে—গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, সাধু, সাধ্বী ও সন্ত জনের পরিচয় জানা মানা। শুধু আপনার হুঁশিয়ারীর জন্য জানাচ্ছি আপনার সঙ্গীকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই অগৌণে হাসপাতালে পাঠাবার একান্ত প্রয়োজন। কথা শেষে অনুতোষ হাত তুলে—শিবজী সবকো মঙ্গল করেন—আশীর্বাদ উচ্চারণের পর জয় শিবশংকর বলতে বলতে পাহাড়ের ঢালু পথে অদৃশ্য হয়ে যায়

অকস্মাৎ পতন-জনিত আঘাতের ফলে সংজ্ঞাহীন সঙ্গীকে নিয়ে ভৈরবী এতই বিচলিত বিপন্ন ও অসহায় বোধ করছিল যে, পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কি প্রয়োজন তা ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছিল না। তার মনের ভারসাম্য এতদূর বিপর্যস্ত যে কাউকে ডেকে কোন সাহায্য পর্যন্ত চায় নি। কেবল অসহায় দৃষ্টিতে চলমান তীর্থযাত্রীদের দেখেছে। এই নবীন সন্ন্যাসীর অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবির্ভাব এক দেবদূতেরই আগমন ভেবেছে। সন্ন্যাসীর দরদভরা সেবা, নিপুণ হস্তের পরিচর্যা ও অদ্ভুত শারীরিক সামর্থ্য সে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে। আবেদন,

নিবেদন, অভাব অভিযোগ কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কোন অবকাশই পায় নি। এমন কি সন্ন্যাসীর প্রস্থান মুহূর্তে বিদায় অভিবাদনও জানাতে পারে নি—শুধু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার অপসৃয়মান মূর্তি অনুসরণ করেছে। অমুতোষের অনুরোধে যে তীর্থযাত্রী রোগীকে আর্তত্রাণ শিবিরে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করেন তিনিও যুবা সন্ন্যাসীর মানবিকতা-বোধ, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা দর্শনে ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি শ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসীর যাবার কালে তিনিও কোন বিদায় সম্ভাষণ জানাবার ভাষা পাননি; কেবল সশ্রদ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত চেয়ে দেখেছেন।

সন্ন্যাসীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী বুঝি আপন সত্তায় ফিরে আসে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়। সন্ন্যাসীর সাবধান বাণী মনে পড়ে—অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে এর জীবন সংশয় দেখা দেবে। ভৈরবী নিজের ও সঙ্গীর জিনিষপত্র গুছিয়ে ঝোলায় ভরে। তারপর দুই ঝোলা দুই কাঁধে নিয়ে ডান হাতে কমণ্ডলু ও বাঁ হাতে ত্রিশূল নিয়ে চলার জন্য উঠে দাঁড়ায়। অচৈতন্য সঙ্গীর দিকে চেয়ে তার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠে। গৃহত্যাগী সাধক সাধিকাদের অশ্রুপাত নিষিদ্ধ। অতিকষ্টে তা সংবরণ করে অদূরে দণ্ডায়মান ভৈরবের দায়িত্ব গ্রহণকারীর উদ্দেশ্য বলে—আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমার জানা নেই। শিবজী আপনার মঙ্গল করুন। যাত্রী মহোদয় তাঁর সঙ্গীকে বলেন—অজিত ভৈরবীর একটি ঝোলা তুই নে। যতশীঘ্র সম্ভব স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে আয়। দেরীতে অনর্থ ঘটার সমধিক সম্ভাবনা। সঙ্গীর আদেশ মতো অজিত একটি ঝোলা কাঁধে নিয়ে চলতে থাকে। ভৈরবী তার অনুগমন করে।

মিশন প্রতিবৎসর প্রতি পুণ্যতিথি ও মেলা উপলক্ষে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং ডাক্তারদের সহযোগিতায় এখানে আর্তত্রাণ শিবির স্থাপন করে। এবার লোকজন ও তীর্থযাত্রীর সমাগম অন্যবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। হয়ত অতিরিক্ত বর্ষাই এর কারণ। তবু ত্রাণশিবির বেশ কর্মচঞ্চল। অজিত ভৈরবীকে নিয়ে চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ভৈরবীর মুখে বিস্তারিত অবগত হয়ে ব্যবস্থাপক স্ট্রেচার ও বাহক চারজন স্বেচ্ছাসেবক অজিতকে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। যথাসময় স্ট্রেচার এসে পৌঁছয়। ইতিমধ্যে রোগীর কোন পরিবর্তন হয়নি। অতি সাবধানে ধরাধরি করে স্ট্রেচার তুলে পাহাড়িয়া পথে

যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে ভৈরবকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে আসা হয়। মাথার আঘাত ছাড়া ডাক্তার রোগীর সব কিছুই পরীক্ষা করেন। মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষত পরীক্ষা করতে ডাক্তার সাহস করলেন না। কারণ মাথাটা এমন সুনিপুণভাবে একজন দক্ষ নার্স-এর মতো ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা হয়েছে যে, তা খুলতে গেলে যদি আবার রক্ত মোক্ষণ শুরু হয় তাহলে রোগীর জীবন নিয়েই টানাটানি হবে। সুতরাং ডাক্তার রোগীকে পরপর কয়েকটা ইন্‌জেকশন্‌ দিলেন। সন্ধ্যা উতরে গিয়েছে তবু রোগীর কোন পরিবর্তন কিংবা সাড়া নেই। অতঃপর সেলাইন দেওয়া শুরু হয়। সেলাইন টানলেও রোগীর চেতনার কোন লক্ষণ নেই। সারারাত্রি এভাবেই অতিবাহিত হয়। ভোরে রোগীর অবস্থার কোন হেরফের নেই দেখে ডাক্তার মিশনের কর্তাকে অবিলম্বে রোগীকে সদর হাসপাতালে পাঠাতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মুসকিল এখানে এ্যামবুলেন্সের কোন ব্যবস্থা নেই। টেলিফোনও নেই যে সদর হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা আনানো যায়। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় রোগীকে অনতিবিলম্বে রেলগাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা। কিন্তু এস.বর ব্যবস্থা করবে কে? যে তীর্থযাত্রীর প্রচেষ্টায় রোগীকে এখানে আনা হয়েছে তিনি সব দেখে শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে সমস্যার সমাধান করলেন। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার ভার নিলেন। কেবল স্ট্রেচার ও বাহকদের তাঁর সঙ্গে দেবার অনুরোধ জানালেন। তাদের যাতায়াত ও খাইখরচ ইত্যাদি তিনিই বহন করবেন। মিশন পরিচালক এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং ডাক্তারকে রোগীর সম্পর্কে পূর্ণ রিপোর্ট লিখে দিতে বললেন।

ভৈরবী সারা রাত্রি অশত্থ তলাতেই কাটিয়েছে। ভোর হতে না হতেই এসে রোগীর অদূরে বসে আছে। রোগীর ভারপ্রাপ্ত তীর্থযাত্রী, ডাক্তার ও সেবাকেন্দ্রের পরিচালকের মধ্যে কথোপকথন ভৈরবী সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও কি ঘটতে চলেছে তা স্ট্রেচার ও বাহকদের উপস্থিতিতে সম্যক বুঝতে পারে। তীর্থযাত্রী মহাশয়ও তার নিকট এসে রোগীর হাল এবং আশু ব্যবস্থা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল এবং রোগীর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন। ভৈরবী খানিক চিন্তা করে বলে,—তার যাওয়া বৃথা। তাতে কোন ফায়দা তো হবেই না বরং নানা অসুবিধার সৃষ্টি করবে। সে তীর্থক্ষেত্রের এই গাছতলাতেই অবস্থান এবং অপেক্ষা করবে। তিনি

যেন শুধু সেবাকেন্দ্রের কর্তার সম্মতি তাকে জানিয়ে যান। আর রোগীর অবস্থা—ভাল মন্দ যাই হোক তাকে সময় মতো জানান।

ভৈরবকে বেড থেকে স্ট্রেচারে তোলা হয়েছে, এখন কাঁধে তোলার অপেক্ষা। ভৈরবী স্ট্রেচার-এর একপাশে স্তিমিত নেত্রে কিছুক্ষণ বসে কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে ভৈরবের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। ঝোলা থেকে রক্তচন্দনের গুঁড়ো বের করে তাতে জল মিশিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালে একটা ত্রিশূল এঁকে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দুঃখ বেদনা প্রপীড়িত হৃদয়ের প্রতিফলন তার চোখেমুখে সুস্পষ্ট। বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্তে বিশুষ্ক নেত্রে ভৈরবী নির্নিমেষ স্ট্রেচারে শায়িত ভৈরবের দিকে চেয়ে থাকে। স্ট্রেচার দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত। নানা স্মৃতি বিজড়িত সুদীর্ঘকালের সাহচর্যের হলো অবসান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভৈরবী অদূরে অশ্বত্থ গাছে নিচে এসে বসে ধ্যান স্তিমিত নেত্রে সঙ্গীর জন্য আকুল প্রার্থনা জানাতে থাকে।

তীর্থযাত্রী এসে ডাক দিতেই ভৈরবী চক্ষু মেলে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়। তাতে অশ্রুধারার অস্পষ্ট চিহ্ন। গভীর গম্ভীর প্রশান্ত আনন—প্রার্থনা অন্তে মনে শান্তি ও সংযমী ভাব ফিরে এসেছে। তীর্থযাত্রী মহাশয় তাকে সেবাকেন্দ্র পরিচালকের অনুমোদন জানিয়ে কিছু অর্থ তার দিকে এগিয়ে ধরেন। ভৈরবী নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান যা নিয়ে সে তার সঙ্গীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না তাতে তার কিবা প্রয়োজন? তীর্থযাত্রী ভৈরবীর মনোভাবের সঠিক সন্ধান না পেয়ে হাত গুটিয়ে নিয়ে আশ্বাস দেন যে, শীঘ্রই তিনি সুস্থ ভৈরবকে নিয়ে ফিরে আসবেন। অতঃপর তিনি ত্বরিৎ পদে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হন। কাছে আসতেই গাড়ি আসার সতর্কীকরণ ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে। জোর কদমে তিনি স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটবার কাউন্টারের সামনে রাখা স্ট্রেচারের আশ-পাশের উৎসুক জনতাকে সরিয়ে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করেন। পুলিশ প্রথমে ইতস্ততঃ করে কিন্তু স্ট্রেচারবাহিত রোগীকে দেখে আর ওজর আপত্তি করে না। অতঃপর তীর্থযাত্রী স্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়ে ঘটনাটা বলে প্রয়োজন বোধে গাড়ি একটু বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবার অনুরোধ জানান।

জমাদার রঘুনন্দন অদূরে রেলিং ধরে সিগনেল দেবার জায়গায় ছোটবাবুর হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে পুলিশের এক কর্তা

এসে স্ট্রেচারবাহিত রোগীর দুর্ঘটনার স্থান, কাল, ধরন ইত্যাদির বিবরণ, স্ট্রেচার বাহক ও সহযাত্রী দুজনের পেশা হাল সাকিন ইত্যাদি টুকে নেন। সবকিছু লক্ষ্য করে রঘুনন্দনের স্ট্রেচারে শায়িত চুল দাড়িওয়ালা আহত ব্যক্তিকে দেখবার প্রবল প্রলোভন জাগে। কিন্তু জায়গা ছেড়ে যাবার হুকুম নেই। হঠাৎ ছোটবাবুর চিৎকার শোনা যায়—গাড়ি আসছে, ঘণ্টা বাজা, সিগন্যাল দে, চালান নিয়ে যা। ঘণ্টা বাজাবার জন্য হরকিষেণকে ডেকে না পেয়ে রঘু সিগনেল দিয়ে নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটবাবুর ঘরের দিকে যাবার পথে স্ট্রেচারে শায়িত লোকটাকে দেখে সে তড়িৎ আহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। হুঁ একেই তো মনে হয় সে সেদিন এক ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে—বহু খোঁজাখুঁজি করেও আর পাত্তা পায়নি। তার স্মৃতির কোঠায় দারুণ আলোড়ন জাগে। আঁতিপাতি করে খুঁজতে খুঁজতে এই আদালের এক ঘৃণ্য মুখচ্ছবি তার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। রঘুয়া দিশে-হারা হয়ে যায়। তবে কি এই সেই যে তার জীবনকে বিষময় অভিশপ্ত করেছে। পুনরায় ছোটবাবুর চিৎকার কানে আসতেই তার সম্বিত ফিরে আসে। সে দৌড়ে ছোটবাবুর ঘরে উপস্থিত হয়। তাকে দেখেই ছোটবাবু রাগতস্বরে চিৎকার দিয়ে ওঠেন—হতচ্ছাড়া কি করছিলি? গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না? যা চালান নিয়ে দৌড়ে যা। বড়বাবুও ইতিমধ্যে বাইরে এসেছেন। তিনি ধাবমান রঘুয়ার হাত থেকে লাল সবুজ নিশান দুটো নিয়ে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে যান।

গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাত্রীদের উঠানামা ও ভিড়ের চাপে স্ট্রেচার শুদ্ধ রোগীকে তুলে দেওয়া সম্ভব হলো না। অগত্যা স্টেশন মাষ্টার গার্ডকে বলে স্ট্রেচার সহ সকলকে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দেন। গাড়ি ছেড়ে দেয়। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ভৈরবের যাত্রা শুরু। যে ব্যক্তি একদা অপরের মেয়েমানুষ নিয়ে গাঁও ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়ে বিগত কুড়ি বৎসর নানা দেশ নানাতীর্থে বেড়িয়েছে তার এই তীর্থক্ষেত্রে এসে একি পরিণতি। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সে সংজ্ঞা লাভ করে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে কিনা তা অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত।

গাড়ি ছেড়ে গেছে কিন্তু রঘুয়ার চিত্তের উদ্বেগ অশান্তি কিছুতেই তাকে ছাড়ছে না। ঘুরে ফিরে কেবল একই চিন্তা তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে—একেই তো সেদিন সন্ধ্যায় সে ট্রেন থেকে সঙ্গিনীসহ নামতে দেখেছে। কিন্তু এ ব্যক্তিই যদি সে হয় তবে তার সঙ্গিনীটি কোথায়? সারামাথা ও কপাল ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অল্পক্ষণের জন্য দেখা লোকটি তবে কে? তার চক্ষুই কি তাকে ফাঁকি দিল? না, তাও বা কি করে সম্ভব? এরা যে তার জীবনের দুঃখ-ভরা ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এদের তিক্ত মধুর স্মৃতি অন্তরের অন্তস্তলে জট পাকিয়ে আছে। খুলতে গেলে চিত্ত দুঃখ বেদনা নিরাশায় শতধা বিদীর্ণ হয়। একটানা পোনের বৎসর সে এদের খুঁজে ফিরছে। অবশেষে এই তীর্থধামে আসা অবধি দিবারাত্রি শিবজী মহারাজকে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন—প্রভুজী আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো—আমার মেণিয়াকে আমার নিকট ফিরিয়ে দাও। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই নিরন্তর খোঁজাখুজি ও নানাভাবে তাদের খিদ্‌মত্‌ করছে। সবই কি ব্যর্থ হবে? এতদিন পরে তার হারানো মাণিকের সন্ধান পেয়েও কি তার অবহেলায় আবার হারিয়ে যাবে। না, তা সে কিছুতেই আর ঘটতে দেবে না। খোঁজ নিতেই হবে—ওর সঙ্গিনী—ক্ষণিকের তরে দেখা সেই ভৈরবী কোথায়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই বিশাল জনারণ্যে তাকে সে কিভাবে খুঁজে বার করবে? দিনের বেলা এতটুকুও সময় মেলে না। ট্রেন চলাচল এখনও ঠিকমতো শুরু হয়নি। চতুর্দিকে পুলিশ, মিলিটারি, সাহেবসুবো আর অগণিত যাত্রীর ভিড়। তার উপর ছোটবাবুর কড়া হুকুম—প্ল্যাটফরম ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এখন সে কি করবে? এ যে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন।

স্টেশন প্লাটফরমের মেহেদি বেড়ার ধারে বসে রঘুয়া এসব চিন্তা করছে আর খৈনি টিপছে। খৈনি মুখে পুরে সে হঠাৎ উঠে পড়ে ছোটবাবুর ঘরের দিকে দৌড়তে থাকে। ঘরে ঢুকে সে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে আকুতি জানায়—বাবুজী আধা ঘণ্টাকে ওয়াস্তে হামকো ছুট্টি দো—নেহি তো ম্যায় পাগল বন জায়গা।

ছোটবাবু অবাক! পা ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি বললি, পাগল হবি? কেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে? কিছুদিন যাবৎই দেখছি কাজে তোর মন নেই—কেবল উন্মাদের মতো কি ভাবিস আর না বলে কয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে যাস।

—কুছ নেহি হুয়া বাবুজী। লেকেন মেরা দিলমে শান্তি নেহি—বহুৎ খতরা পয়দা হুয়া—ম্যায় বিলকুল থক গিয়া—আধা ঘণ্টাকা অন্দর ম্যায় লোটেঙ্গি।

ছোটবাবু খানিক চিন্তা করে ঘড়ি দেখে বলেন—যাবি তো যা। কিন্তু ঠিক সময়ের মধ্যে ফিরে আসা চাই। রঘুয়া সেলাম ঠুকে বেরিয়ে যায়। ছোটবাবু রঘুয়ার সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত হন। সাধু সন্ন্যাসীর পিছে তার ঘুরঘুর করা এবং আটা, চাল লকড়ি ইত্যাদি দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করার খবর তিনি রাখেন। সেই অভ্যাসই বোধ হয় এখন ক্ষ্যাপামিতে দাঁড়িয়েছে। এ ভাল কথা নয়—পরে মস্তিষ্কবিকৃতির রূপ নিতে পারে। সুতরাং ওর সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন ভেবে ছোটবাবু আপন কর্মে মনোনিবেশ করে।

বাইরে এসে রঘুয়া হরকিষেণকে ডাকে। হরকিষেণ তখন সিগন্যালের এবং ঘরে বাইরের যাবতীয় বাতির পরিচর্যায় ব্যস্ত। তাই দেখে রঘুয়া তার নিকট গিয়ে বলে—হাম আধাঘণ্টাকো ওয়াস্তে বাহার যাতা, তু ইধার সম্হাল দেনা। হরকিষেণ মাথা তুলবার আগেই রঘুয়া ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফরমের বাইরে অপেক্ষমান জনতার ভিড়ে মিশে যায়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কাছেপিঠে যত যাত্রী আছে তাদের মধ্যে রঘুয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে এক চক্কর ঘুরে বিফল মনোরথ হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে ছোটবাবুর ঘরের বাইরে গুম হয়ে বসে থাকে।

তীর্থের পুণ্যলগ্ন শেষ। যাত্রীরা সব ঘরমুখো। এত লোকের মধ্যে রঘুয়া কোথায় কিভাবে তাকে খুঁজে ফিরবে? হঠাৎ তার মধ্যে আর এক জিজ্ঞাসা জাগে—তবে ঐ ভৈরবীও কি এরকম কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কোথাও পড়ে পড়ে ধুকছে, নাকি শেষ হয়ে গেছে! এইরূপ নানা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে রঘুয়া দৈনন্দিন কর্ম করে চলছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে মনে অনুক্ষণ একই চিন্তা কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে—কোথায় এবং কিভাবে ক্ষণিক দেখা হলেও সেই অতি-চেনার দেখা পাবে? একবার ভাবে রাতের ডাক গাড়ি পাস করিয়ে বাকী রাত্রি তাকে ঢুঁড়বে। কিন্তু তাতেও বা কি ফায়দা? অগুণতি যাত্রী তার উপর এই ঘোর ঘনঘুট্টি অন্ধকার—এতো খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতো—বিলকুল পণ্ডশ্রম! দিন গিয়ে রাত্রি আসে—ঈপ্সিতজনকে খুঁজে বার করবার

মতো কোন পন্থা রঘুয়ার মাথায় আসে না। ভাবনা চিন্তার অথৈ জলে সে হাবুডুবু খাচ্ছে—কূল কিনারা পায় না।

রাতের ডাকগাড়ি চলে গেছে। রঘুয়া বিছানায় বসে খৈনি টিপছে। চতুর্দিকে যাত্রীদের অবিশ্রান্ত কলকোলাহল আর বিশ্রামঘরে পুলিশের সন্দেহভাজন লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি চড়চাপড়, হুম হাম দুম দাম সমান তালে চলেছে। চিন্তাজ্বরে জর্জরিত, কর্মক্লান্ত, হৃত-আশ রঘুয়া হরবিষেণকে ডেকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়—ঘুম আসে না। চক্ষু বুজে পড়ে থাকে। এই অবসরে অতীতের অতিক্রান্ত অন্ধকার দিনগুলি একে একে স্মৃতির পিঞ্জর খুলে তার সম্মুখ দিয়ে সারিসারি চলেছে :

সেদিন তার প্রথম পরিচয়ের রেলগাড়িতে সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার চেঁচামেচি করে রাত্রি শেষে এক রেল স্টেশনে এসে পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে এক পাহারাদারের নজরবন্দী হয়ে গাড়ি থেকে নামে। লোকটা অদ্ভুত দর্শন—চোখমুখের চামড়া কুঞ্চিত, চোয়ালের হাড় উঁচু, খুদে খুদে গোল গোল রক্তবর্ণ চোখ—কুৎসিৎ বীভৎস দর্শন এক পাথর মূর্তি। লোকটা তাদের গুনে নিয়ে দূরে দাঁড়ানো অপর এক ছোট রেল গাড়িতে তুলে দেয়। ছোট্টগাড়ির ছোট্ট কামরায় গুটিকয়েক চেপটা মুখ গোলাকার চোখ, নাক থেবড়া বেঁটে লোক ছাড়া বাকী সকলেই আগের গাড়ির লোক। পাতলা কুয়াশ চ্ছন্ন প্রভাতালোকে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা বনজঙ্গল ভেদ করে যেন পাহাড়ের গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে মন্থরগতিতে ঝিকঝিক ভোঁস ভোঁস করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বিনিদ্র ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত লোকগুলো ছাগল ভেড়ার মতো গাদাগাদি ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছে। কেউ ঝিমিয়ে পরস্পরের গায়ে ঠোক ঠুকি করছে—কেউ বা বসে নাক ডাকাচ্ছে—বিচিত্র, বিশ্রি কুৎসিত এক পরিবেশ।

অবশেষে বেলাবসানে অবসন্ন অসহায় অজ্ঞ দেহাতি লোকগুলির ক্লান্তিকর সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের পরিসমাপ্তি হয়। গাড়ি থামতেই দরজা খুলে এবার দীর্ঘবপু গোঁপদাড়ি পাগড়িওয়ালা ডাণ্ডা হাতে যমদূতের মতো একব্যক্তি এসে দাঁড়ায়। লোকগুলি দরজা খোলা পেয়ে গাড়ি থেকে হুড়হুড় করে নেমে জল জল বলে চিৎকার দিয়ে ছুটবার মুখে লোকটা

ডাণ্ডা তুলে বাধা দেয—ঠাবো ঠাবো, পহিলে মুঝে গিন্তি করনে দো। সকলে ভয়ে ভয়ে থমকে দাঁড়ায়। গোণাগুন্তি শেষ হলে সর্দার লাঠি তুলে দূরে পাহাড়ের গায়ে কতগুলি খুপরি দেখিয়ে বলে—ওধারে যা, জল, খাবার ইত্যাদি সব মিলবে! সকলে তাদের সম্বল একখণ্ড চট, আর লোটা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঐ দিকে ছুটতে থাকে।

পাহাড়ের পাদদেশ সারিসারি কয়েকটা ঝুপড়ি। তারই মধ্যে বসতি, দোকান ইত্যাদি। সকলেই একটা দোকানের সামনে এসে লোটা ধরে পানি পানি চেঁচাতে থাকে। দোকানী তাদের ধমকে দিয়ে ছোকরাকে এক মগ করে জল দিতে হুকুম করে। তৃষ্ণার্ত লোকগুলি জল খেয়ে আবো জলের জন্য লোটা বাড়ায়। দোকানী আবেক প্রস্থ গালাগাল দিয়ে বলে—এখন আব নয়, খাওয়াব পরে পাবি। কে কি খাবি বল—২ খানা চাপাটি সঙ্গে সব্‌জি, নাকি একপোয়া ছাতু আব সঙ্গে নুন, লঙ্কা তেঁতুল? নেপালী বাদে প্রায় সকলেই ছাতু আব এক ঘটি জল খেয়ে উঠে পড়ে। দোকানী পুনরায় ধমক দেয়—লাটের বাচ্চারা চলেছিস কোথায়? খেলি তো কড়ি দিবি না? ফেল, বেটারা গাঁট থেকে ছয় পয়সা করে নগদ ফেল। লোকগুলি ভেবা-চাকা খেয়ে একে অন্যের মুখের দিকে চায়। সকলেই এরা একেবারে অজ্ঞ পাড়াগেঁয়ে—আপন গাঁয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে কোনোদিন পা বাড়ায় নি। সুতরাং বহির্বিশ্বের লোকজন এবং হালচাল সম্পর্কে তারা একেবারেই অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ। দোকানী আবার উচ্চগ্রামে গালাগাল দিয়ে এই মারি কি তেই মারি করে ছুটে আসে। রঘুয়া সামনে ছিল। সে-ই ভয়ে ভয়ে সব প্রথম টেঁক থেকে পয়সা বার করে দেয়। তার দেখাদেখি অন্যরাও গাঁট খুলে দোকানীর দেনা শোধ করে। গাল-পাট্টা ও পাগড়িধারী লোকটা যেন হঠাৎ ভুঁই-ফুঁড়ে সেখানে হাজির হয়। সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে তার দিকে হাত বাড়ায়—মেরা দস্তুরি টেঁক সে নিকালো।

দোকানী হতবাক—সে কি সর্দার! ওদের কাছ থেকে খাই খরচা নিয়ে তোমার এতগুলি টাকা বাঁচিয়ে দিলাম। প্রতিদানে তুমি আবার উপরি চাইছ?

—হাঁ, মেরা পাওনা ম্যায় কভি নেহি ছোড়তা।

—আর কথা কাটাকাটি ঠিক নয় বুঝে দোকানী সর্দারের হাতে দস্তুরী

গুঁজে দেয়। সর্দার এবার লোকগুলির দিকে ফিরে বলে—যা, আভি উধার টেশনকা চত্বর পর শো যা। কাল সুবা পায়দল চলনা হোগা। হুঁশিয়ার, সব এককাট্টা হোকে শো যানা। হাম জমাদ্দার কো বোলেগা। লেকেন প্ল্যাটফরমকা লোহাকী বেড়কা অন্দর শোনা। রাতমে বহুত খত্‌রা পয়দা হোতা—পাহাড়সে বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে আউড় বড়াবড়া বিল্লি আকর আদমি লে যাতা আউর তঙ্‌ ভি করতা, হুশিয়ার! সুবা মোলাকাত হোগা বলেই সে উধাও।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নির্জন অল্প-বসতি পাহাড়িয়া অঞ্চল ক্রমেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত লোকগুলি দাঁড়িয়ে। কোথায় যাবে কি করবে বুঝতে পারে না। অবশেষে দোকানীর শরণাপন্ন হয়ে আকুলি ব্যাকুলি করতে থাকে। অর্থদণ্ড হেতু দোকানী সর্দারের উপর এমনিই চটে আছে। সুতরাং তার ব্যাপারে দোকানী আর মাথা গলাতে রাজী নয়। সে চুপ করে থাকে। কিন্তু এতগুলি লোকের এরূপ অসহায় দুরবস্থা দেখে তার সর্দারের উপর যেমন রাগ হয় তেমনি এই হতভাগ্যদের জন্যও বোধহয় কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়। সে ছোকরাকে ডেকে বলে—যা তো গুরে এগুলিকে স্টেশনের বিশ্রাম ঘরটা দেখিয়ে দে। স্টেশনের জমাদারকে বলবি সর্দার নিহাং সিং-এর লোক রাত্রে প্ল্যাটফরমে থাকবে। ছোকরা লোকগুলিকে পৌঁছে দেয় বটে কিন্তু জমাদারকে না পেয়ে কিছু না-বলেই ফিরে যায়।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে মশককুল চতুর্দিক থেকে ঘিরে তাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। হাত দিয়ে তাড়িয়ে কিংবা চট কম্বল মুড়ি দিয়েও দংশন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তা ছাড়া নাক চোখ মুখ কান দিয়ে ঢুকে একটা অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি করছে। এই হতভাগা, বিপন্ন অসহায় লোকগুলির দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধির জন্যই বুঝি চতুর্দিকের অরণ্য থেকে নানা হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয় ভীতিকর কর্ণ-বিদারী হুঙ্কার ও নিশাচর পাখির আর্তনাদে থেকে থেকে তারা কেঁপে উঠছে। রঘুয়ার অন্তরের অন্তস্তলে সেই কালরাত্রির অসহ্য যন্ত্রণার স্মৃতি কাটা ঘায়ের মতো এখনও দগদগ করছে। অন্য সকলের মতো সেও মশার কামড়ে টিকতে না পেরে কেবল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আচম্বিতে ঘোর অন্ধকারের বুক চিরে এক বাজখাঁই কণ্ঠস্বর—তুম লোগ কৌন্ হো? প্রশ্নকর্তা দৃষ্টির অগোচর।

চতুর্দিকের ভয়ঙ্কর হিংস্র মত্ত কোলাহলের সঙ্গে তাল রেখে এও হয়তো কোন অশরীরী হুঙ্কার! ভয়ে জড়সড় হয়ে সকলে এককাট্টা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আবার সেই গলা এবং একই জিজ্ঞাসা—তবে গলার স্বর ভিন্ন—মালুম হয় মানুষেরই কণ্ঠস্বর। কিন্তু কি জবাব দেবে? সেটা তাদের জানা নেই। সকলেই চুপচাপ। আর কোন সাড়াশব্দ নেই। খানিকবাদে একজন লণ্ঠন হাতে নিয়ে উপস্থিত। নিকটে এসে লণ্ঠন উঁচু করে তাদের দেখে বলে—হুঁ আভি ম্যায় সমঝা—লেকেন কোন আদমি তোম লোগকো ইধার ভেজা? জবাবে তাদের মধ্যেই একজন বলে উঠে—দোকানিকা ছোকরা বোলতা থা—নিহাং সিং।

—আভি মেরা বিলকুল পাত্তা আ গিয়া—উহ্ হারামিকা বাচ্চা—ঠিক হ্যায়। লেকেন শুনো, ইয়ে তো লণ্ডবখানা আউর ধরমশালা নেহি—ইয়ে রেল কোম্পানিকা খাস্ তালুক। ইধার রহেনেবালেকো এক এক পয়সা কেরায়া দেনে হোতা। নিকালো, পয়সা নিকালো—নেহি তো সবকো ইধার সে ভাগা দেঙ্গে। লোকগুলি হতভম্ব! লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতে লোকটার জোয়ান মদ্দ চেহারা দেখে তারা সভয়ে ট্যাঁকে হাত দেয়। না দিলে আবার কি ঝকমারি হবে ভেবে পয়সা বার করে লোকটার হাতে দেয়। পয়সা পেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সে প্রস্থান করে।

নরকবাস আর নরক যন্ত্রণা যাকে বলে লোকগুলি সারা রাত তাই ভোগ করে। ভোর হতে না হতেই বাইরে থেকে চিৎকার শোনা যায়—হেই কুলি লোগ, বাহার আ যাও—আভি চলনে হোগা। "কুলি" শব্দ তারা জীবনে এই প্রথম শোনে। সুতরাং কাকে ডাকছে বুঝতে না পেরে ঘাবড়ে গিয়ে ইতস্তত করতে থাকে। দেরি দেখে নিহাং সিংকে যমদূতের মতো লাঠি উঁচিয়ে আসতে দেখে তারা ভয়ে ভয়ে পিছু হটতে থাকে। নিহাং চেঁচাতে থাকে—ভাগো মত, ঠারো। বিষয়টা বুঝতে পেরে তারা অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিহাং কাছে এসে নম্বর মিলিয়ে তাদের গুনে দেখে তারপর বলে—চলো। দের হোনেসে ধুপমে বহুত তকলিফ হোগা।

অবশেষে শুরু হলো ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুখের লোভ দেখিয়ে সংগৃহীত কতগুলি দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, সহজ সরল, অজ্ঞ দেহাতি লোকের অজ্ঞাত অচিন-পথ-যাত্রা। অনিদ্র অস্নাত অভুক্ত অবসন্ন লোকগুলি ক্লান্ত শ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। সম্মুখে দিগন্ত

বিস্তৃত অসংখ্য পর্বতমালা—মৃত্যুবাহী মশক, কীটপতঙ্গ, রক্তচোষা জোঁক, সরীসৃপ, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আবাস। প্রভাতের নবারুণ রাগ চতুর্দিকের সুধা শ্যামল বনানীর সঙ্গে সখ্যপাতিয়ে যে মনোরম স্নিগ্ধ কোমল আমেজ সৃষ্টি করে বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা রুদ্রভয়াল অনল-বর্ষী অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। রুক্ষ বন্ধুর পাহাড়িয়া পথের অবিরল চড়াই উৎরাই লোকগুলি আর বুঝি অতিক্রম করতে পারছে না। ইতিমধ্যেই বিগত রজনীর মশক দংশনে কয়েকজন পীড়িত হয়ে ধুঁকছে। রঘুনাথের মনে আছে—অশক্ত অসমর্থ একজনকে সে কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে চলেছে সম্মুখে নিবিড় শ্যামল স্নিগ্ধ বনানী। তার ভেতর দিয়ে পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। রোদে-পোড়া তৃষ্ণার্ত লোকগুলি বনে প্রবেশ করে জল, জল চাই বলে চিৎকার দিতে দিতে বৃক্ষের শীতল ছায়াচ্ছন্ন রাস্তার উপরই শুয়ে পড়ে। নিহাং সিং হুঙ্কার দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। তাকে দেখে তারা সমস্বরে পানি দো, পানি দো বলে চেঁচাতে থাকে। উঠবার লক্ষণ নেই। মার পিট করলে উল্টো ফল হবে বুঝে নিহাং আশ্বাস দেয়—হাঁ পানি জরুর মিলেগী—সাথ সাথ খানা ভি মিল যায়গা। থোরা দূর যানেসে এক বড়া পাহাড়িয়া নালা—পানি বহুৎ ঠাণ্ডা আউর মিঠা পানি কা সাথ খানার নাম শুনে সকলে উঠে বসে একে অন্যের মুখের দিকে চায়। নিহাং সিং পুনরায় মিঠা বুলিতে জলদি পানি আর খানার আশ্বাস দিতেই তারা চলতে শুরু করে। কিন্তু রাস্তার বুঝি আর শেষ নেই। যে উৎসাহ নিয়ে তারা চলেছে তা বুঝি আর থাকছে না—ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছে। উৎরাই থেকে চড়াই-এ উঠবার মুখে দূরে কয়েকটা পাহাড়ী ঝুপড়ি নজরে পড়তেই তাদের চলার উৎসাহ আবার বৃদ্ধি পায়। ঝুপড়ির কাছে এসেই তারা পানি দো পানি দো বলে চেঁচাতে থাকে। নিহাং সিং তাদের কাছে এসে ডাণ্ডা তুলে অদূরে ছোট নদীটির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সকলে সে দিকে দৌড়তে থাকে. নদীর ধারে গিয়ে লোটা ভরে জল খেয়ে শান্ত হয়ে সেখানেই বসে পড়ে।

বেলা পড়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে রোদের উত্তাপের প্রচণ্ডতা কমছে। ডাইনে তাকালে দেখা যায় দূরে পাহাড়ের গায়ে লাল টালির বাড়িগুলি পড়ন্ত রোদে ঝলমল করছে। আর বাঁয়ে বহুদূর বিস্তৃত পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে ছোট ছোট সবুজ চারা গাছের কচি পাতার ঢেউ খেলানো

বন্যা। মাটির শ্যামলা রঙ আর কচি চিকণ-পাতার আভা মিশে এক রমণীয় কমনীয় দৃশ্য রচনা করেছে।

বিশ্রামের পর লোকগুলি আর এক ঘটি জল নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে উঠে পড়ে। নিহাং সিং দোকানীকে নিশ্চয় আগে থেকেই বলে রেখেছে। তারা এগিয়ে আসতেই নিহাং আঙুল দিয়ে দোকানটা দেখিয়ে দেয়। যারা ঝোপড়ির সামনে পড়ে থেকে জ্বরে ধুঁকছে জল খেয়ে তারা কিছু শান্ত হয়। বাকীরা সব দোকানের সামনে ভিড় করে। খাবার বিশেষ কিছু নেই—শুকনো চাপাটি, সব্জী, ছাতু লঙ্কা আর গুড়। বিশ্রী নোঙড়া পরিবেশ—চতুর্দিকে অসংখ্য মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। খাবারের উপর ঢাকনি নেই। মাছিতে ঢেকে থাকায় সেগুলি চালে তিলে রূপ ধরেছে। ভুখা মানুষগুলি যাহা পায় তাই গিলে ঢক্‌ঢক্‌ করে লোটা ভর্তি জল খেয়ে দোকানের সামনেই যে যেখানে পারে শুয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে অচৈতন্য—কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। নিহাং এসে দোকানীর সঙ্গে দামদস্তুর ও তার দস্তুরী ঠিক করে। বেলা শেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যার পূর্বেই লোকগুলিকে বস্তির সর্দারকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই তার ছুটি। সুতরাং আর দেরী করা যায় না। সে কুলিদের হাঁক ডাক করে জাগিয়ে তোলে। সকলেই চোখ রগড়ে উঠে বসে। নিহাং সিং হুকুম করে—দাঁড়া, সবাই ফৌজের মতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। অসুস্থ লোকগুলিও কোনরকমে উঠে দাঁড়ায়। সবাইকে গুণে নিয়ে সে বলে—ছয় পয়সা করে টেঁক থেকে বার কর। তারা একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে। নিহাং সিং এবার জোর ধমক দিয়ে বলে—খানা তো মুফৎ মিলতা নেহি—নিকালো, জলদি নিকালো, বলেই সে ডাণ্ডা হাতে এগিয়ে আসে। সকলেই ভয়ে ভয়ে টেঁক থেকে পয়সা বার করে তার হাতে তুলে দেয়।

লোকগুলির চরম বেদনাদায়ক দীর্ঘ বিলম্বিত বাকী পথ-চলা শুরু হয়। সন্ধ্যার পূর্বেই লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছে। নদীর ধার ঘেঁষেই বস্তি—চলতি কথায় কুলি ধাওড়া। সারি সারি এক ফালি করে ইটের কুঠি-ঘর—করোগেট টিনের ছাউনি। ভেতরে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সারাদিন রোদে পুড়ে ঘরগুলি যেন এক একটা লৌহ কটাহ—ঘরে ঢুকতে গেলে আগুনের হলকা গায়ে লেগে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়। নিহাং সকলকে জানিয়ে দেয়, এই তাদের ডেরা। তার কথা শেষ

হতে না হতেই আর এক মূর্তি এসে হাজির—নাতি দীর্ঘ বপু, গায়ের রং কালো আলকাতরা, দু-কানে দুটো পেতলের আংটি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরা আর হাতে লম্বা লাঠি। তাকে দেখামাত্রেই নিহাং বলে—মণ্ডলু, লে ইয়ার, তেরা কুলি-গ্যাঙ (দল)—সমঝ লে। কথাশেষে তার হাতে একখণ্ড কাগজ গুঁজে দেয়। মণ্ডলু কাগজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই হাঁক দেয়—সব এককাট্টা হো যাও—এক লাইনে দাঁড়া। যারা শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে তাদের নিয়ে গণতি করে মণ্ডলু হাঁকে—ঠিক হ্যায়: উধার রহেনেকা কুঠি। সব আদমী কুঠিকা অন্দর শো যানা। বাহার বহুত খত্‌রা পয়দা হোতা—বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে হাতি। ইসকে এলাওয়া মচ্ছর—খুনপিতা মচ্ছর—ইয়ে মুল্লুককা সবসে বড়ি খতরনাক—হুঁশিয়ার। কাল সুবা হাম আউর ডক্‌তর আয়েগা। ডক্‌তর বিমারী আদমিকো লিয়ে, আউর হাম তোমলোকসে কাম লেনেকো লিয়ে।

লম্বা কুলি ব্যারাক (লাইন)। এতে যে কতলোক আছে তার সীমাসংখ্যা নেই। একমাত্র কর্তৃপক্ষ আর সর্দাররা ছাড়া কেউ জানে না বা জানতে পায় না। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি—কোথাও বাতি নেই। কেবল অসংখ্য উনানের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন। কর্মক্লান্ত বুভুক্ষু লোকগুলি বেঁচে থাকার তাগিদে দিনান্তে আহার সংস্থানে ব্যস্ত সমস্ত। এরই মধ্যে চলেছে কোথাও চেঁচামেচি, মারামারি, কোথাও বা গান-বাজনা আর দোহাপাঠ। এই জৈব উল্লাস আর হৈ হুল্লোড়ের সঙ্গে সমান তালে চলেছে মশককুলের ভাতিকর গুঞ্জন ও রক্তশোষণ সেইসঙ্গে মলমূত্র আবর্জনার দুর্গন্ধে ভরা বাতাস—এক বীভৎস নারকীয় পরিবেশ। মানুষ সৃষ্ট অতি ঘৃণ্য কদর্য আবহাওয়া—মানুষ পেষা নরকের সৃষ্টি। পুরাণ-কথিত নরক—তমিস্রা, অন্ধ তমিস্রা, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপক্ ইত্যাদি একুশপ্রকার নরকেও বুঝি হার মানায়, লজ্জা দেয়।

মায়ের স্নেহ বাৎসল্য, পত্নীর প্রেম প্রীতি ভালোবাসা পরিত্যাগ করে একমাত্র রুজী রোজগারের ধান্ধায় রঘুয়া গৃহত্যাগ করেছে। তাদেরকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখবার তার রঙীণ পরিকল্পনা ও সোনালী স্বপ্ন বিগত ও অদ্য রাত্রির রূঢ় কঠিন বাস্তব ঘটনার আঘাতে ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খান খান হয়ে যায়। তার সকল আশা শূন্যে বিলীন হয়ে বুঝি আকাশ কুসুমে পরিণত হয়। রঘুয়ার চোখ ফেটে জল গড়াতে থাকে। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে মনের ভার কিছুটা লাঘব হয়। ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমে তার

চোখ জড়িয়ে আসে। কুঠির ভেতর ঢুকতে গিয়ে ভ্যাপসা গরম, ধোঁয়া আর মশার ডাকে সে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। এখন সে কি করবে? বাইরে ঘুমোলে জন্তু জানোয়ারের হাতে আর ঘরে শুলে গরমে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। এই উভয় সংকট থেকে রঘুয়া যখন পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না তখন পাশের ঘর থেকে তাদেরই এক রুগ্ন সাথীর আর্ত কানফাটা চিৎকার—গেলামরে, মরলামরে, কে কোথায় আছরে—শুনতে পায়। রঘুয়া দৌড়ে লোকটার কুঠির সামনে গিয়ে একটানে দরজা খুলে ফেলে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে তার আগের মতোই অবস্থা হয়। তবুও ঘর থেকে না বেরিয়ে সে সাহস করে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটা তখনও চিৎকার করে চলেছে। সাহস করে তার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই মনে হলো সে যেন একটা তপ্ত কড়ায় হাত দিয়েছে! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় রঘুয়া কি করবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার অসহায় আর্তনাদ শুনে সেও যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। পর মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে নিজের কুঠি থেকে জলভর্তি লোটা নিয়ে ফিরে আসে। জলে হাত ভিজিয়ে লোকটার চোখ ও কপালে হাত বুলোতে থাকে। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও রঘুয়ার মনে হলো রুগী যেন একটু একটু হাঁ করছে—হয়ত জল খেতে চাইছে। রঘুয়া হাতে জল নিয়ে আস্তে আস্তে তার মুখে দেয়। কয়েক গণ্ডুষ জল পান করে লোকটা যদিও নেতিয়ে পড়ে তথাপি মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে আর্তনাদ করছে! ক্রমে ক্রমে রোগীর আর্ত চিৎকারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেরূপ বাড়ছে তার স্বরও সেরূপ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে! ইতিমধ্যে রোগীর আর্ত-চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আরো দুই সাথী সেখানে উপস্থিত। তারা একটু সমাহ করে রঘুয়ার নিকট ঘটনাটা জানাবার জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। রঘুয়া কতকটা বিজ্ঞের মতো তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। হঠাৎ লোকটা একটু ক্ষীণ আর্তনাদ করে নড়ে উঠে চুপ হয়ে যায়। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে সকলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

রঘুয়া তার কুঠি ঘরের সামনে এসে বসে। রোগীর আর্তনাদ এখনও তার কানে বাজছে—উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণায় না জানি সে এভাবে অমানুষিক চিৎকার করেছে! সহানুভূতিতে তার হৃদয় গলে যায়। কিন্তু সে কি করতে পারে! কতটুকু বা সাহায্য করতে পারে? এ জিজ্ঞাসা তার মন

তোলপাড় করতে থাকে। পরক্ষণেই সে আঁৎকে উঠে। হায় হায়,—তারও যদি ওর মতো বেমার হয়। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, ডাক্তার বৈদ্য কবরেজ হেকিম নেই—দেখভাল করবার কেউ নেই—অসহায় অচিকিৎসায় তারও তো এই হাল হবে। তখন কি হবে? হায় তার বাবাও কি তবে এরূপ মর্মান্তিকভাবেই না-পাত্তা হয়ে গেছে! ভয়ে সে শিউরে উঠে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে উঠে আবার রোগীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের দরজা হাঁ পাটখোলা। ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ আসছে না। চতুর্দিকে হিংস্রশ্বাপদ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তাদের চিৎকার কানে আসছে। দরজা খোলা থাকলে এই অসহায় রুগ্ন লোকটাকে যদি মুখে করে তুলে নিয়ে যায়! এই ভেবে রঘুয়া দরজাটায় হাত দিয়েও বন্ধ না করে ভেতরে যায়। ইচ্ছা হয় লোকটার গায়ে হাত দিয়ে দেখে গায়ের উত্তাপ কেমন। কিন্তু গায়ে হাত দিলে সে যদি আবার জেগে উঠে আগের মতো চিৎকার শুরু করে? এই ভয়ে রঘুয়া গায়ে হাত না দিয়ে দরজা বন্ধ করে আপন ঘরে ফিরে আসে।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কুলি বস্তির হৈ হল্লা, ডাক চিৎকার গান বাজনা, স্তিমিত হয়ে এলেও তার স্থলে এখন চলেছে ভিন্ন রকমের গোলমাল—জৈব জীবনের যৌন তাগিদের অভিব্যক্তি—মাদো মাতলামি, স্ত্রীপুরুষের সাম্মিলিত নৃত্যগীত, হৈহুল্লোড়, চেঁচামেচি—নরক গুলজার। দুস্থ অসহায় নিপীড়িত লোকগুলোর একদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা—মরণের নিঃশব্দ পদধ্বনি—আর একদিকে জীবনের রস আস্বাদনের অসংবৃত অসংযত পৈচাশিক উন্মত্ত উল্লাস। রঘুয়া কিছু জানেনা, বোঝেনা, তবু তার অমার্জিত অজ্ঞ মনের কাছে পাশাপাশি এই দুই চিত্র কেমন যেন বিসদৃশ বেয়াড়া বেঢপ মনে হয়। সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আচম্বিতে একটা জন্তুর ভীতিকর গর্জন শুনে ভয়ে ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়, ভেতরে গরম কিছু কম অনুভূত হলেও রক্তচোষা মশার দল গুঞ্জন করে তাকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করছে। টিকতে না পেরে সে প্রথমে কাপড়ের খুট দিয়ে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করে। পরিশেষে চটমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

বাইরের শোরগোল শুনে রঘুয়ার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দিনের আলো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে সে ধড়মড় করে উঠে পড়ে

বাইরে এসে দেখে মঙ্‌লু সর্দার হাঁক ডাক দিয়ে সবাইকে জড় করছে। বেরিয়েই সর্বপ্রথম রঘুয়ার বিগত রাত্রির অসুস্থ সাথীর কথা মনে পড়ে। দৌড়ে গিয়ে ঐ কুঠি ঘরের দরজা ধরেই টান দিতেই মঙলু হা হা করে ছুটে এসে বলে—ক্যা করতা, অন্দর মত্ যানা। ডগ্‌তর সাব আট বাজনেকা অন্দর আকে সব বন্দোবস্ত করেগা। সর্দারের কথায় রঘুয়ার মন মানে না। গত রাত্রে তাকে সে যে অবস্থায় দেখে গেছে তারপর আজ সে কেমন আছে তা চাক্ষুষ দেখতেই সে উদ্‌গ্রীব। মঙ্‌লুর হুশিয়ারি অগ্রাহ্য করে ভেতরে ঢুকবার মুখে মঙ্‌লু দৌড়ে এসে তার পিঠে জোর লাঠির ঘা মারতেই সে বসে পড়ে। মঙ্‌লু রাগে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো ফুঁসতে থাকে—বত্তমিজ বেশরম—সর্দারকা বাত শুনতা নেহি। ক্রোধে তার চক্ষু দুটো রক্তবর্ণ গোলকের মতো ঘুরছে আর কানের গোল আংটি দুটো থরথর করে কাঁপছে—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শরীর এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে!

রঘুয়া কি করবে? সর্দারের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করবে—না কি চুপ করে এই অপমান হজম করবে? জীবনে সে এই প্রথম শারীরিক আঘাত পেল—মার খেল! এই আঘাত তার শরীরের চাইতে মনের উপর জোর দাগ কেটে দেয়—দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে থম ধরে বসে থাকে। অপর সাথীরা সর্দারের ক্রুদ্ধ আক্রোশ দেখে ভয়ে মুষড়ে পড়ে—পাছে সে সকলের উপর চড়াও হয়। সঙ্গীদের অবস্থা দেখে সে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপচাপ উঠে পড়ে সকলের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। তার নতুন চাকুরী জীবনের প্রারম্ভেই এক বেদনা-ঘন মহা অশুভ ইংগিতই বুঝি বয়ে নিয়ে এল!

মঙ্‌লু সারিবদ্ধ লোকগুলিকে কর্মের আরম্ভ, বিরতি অন্তে ছুটির সময় ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে। তারপর সবাইকে প্রাতকৃত্য, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির জন্য আধ ঘণ্টা সময় দিয়ে সাবধান করে দেয় যে ভবিষ্যতে সে আসবার আগেই তাদের খাওয়া-দাওয়া, নিত্যকর্ম ইত্যাদি শেষ করতে হবে। একটুও ব্যতিক্রম চলবে না। টাইম মত সব করতে হবে।

ছুটি পেয়ে লোকগুলি নদীর দিকে দৌড়তে থাকে। সেখান থেকে তারা যখন খাবারের সন্ধানে বস্তীর অদূরে দোকানের দিকে চলতে থাকে রঘুয়া তখন দল থেকে সটকে পড়ে কুঠি ঘরের সামনে এসে হাজির হয়।

মঙ্‌লুর ভর্ৎসনা ও তীক্ষ্ণ কষাঘাত সত্ত্বেও বিগত রজনীর অসুস্থ যন্ত্রণা-কাতর সাথীর জন্য কেমন যেন একটা সহানুভূতিশীল বেদনা অনুভব করে। তাকে দেখবার জন্য এক অত্যুগ্র বাসনা রঘুয়াকে এখানে টেনে আনে। কিন্তু আশ্চর্য মঙ্‌লু নেই। আরও অবাক কাণ্ড ঘরের দরজা খুলে দেখে ঘর ফাঁকা, রুগ্ন সাথী সেখানে নেই। একটা অজ্ঞাত ভয়ে সে শিউরে ওঠে। তবে কি লোকটা মরে গেছে! আর তার লাশ মঙ্‌লু গুম করছে? বাকী অসুস্থ সাথীদের বা কি হলো? একথা মনে হতেই সে কুঠি ঘরগুলির সম্মুখ দিয়ে হাঁটতে থাকে যদি কারও ডাক চিৎকার আর্তনাদ তার কানে আসে। না, কোন কুঠি থেকেই সাড়া শব্দ আসছে না। সব নিঝুম নিস্তব্ধ—মৃত্যুর নীরবতা। তবে কি সকলেরই এক অবস্থা! সকলকেই মঙ্‌লু গুম করেছে! রঘুয়ার শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। নিজ কুঠি ঘরেব সামনে ফিরে এসে রঘুয়া বসে পড়ে কাঁদতে থাকে। নিজেকে সামলে নিয়ে পুনরায় পাশের ঐ হাঁ-করা খালি ঘরটার দিকে তাকাতেই সেই অব্যক্ত ভয় তাকে ঘিরে ধরে—সারা শরীর তার কাঁপতে থাকে। কিন্তু তার এই ভয়ের কথাটা তো সঙ্গী সাথীদের বলা যাবে না। কিম্বা আকারে প্রকারে মঙ্‌লুকেও জানতে বা বুঝতে দেবে না। ভয়ের কারণটা মঙ্‌লুর কানে গেলে তার পিঠ আবার তার কষাঘাতে জর্জরিত হবে। এমনকি মঙ্‌লু হয়তো তাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই গুম করে ফেলতে পারে। সুতরাং তার মনের ভয় ভীতি আশঙ্কা যতদূর সম্ভব নিজের মধ্যেই চেপে রেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করবে। উঠে গিয়ে সে খালি ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দেয়।

সঙ্গীবা সব এসে পড়েছে। কিন্তু মঙ্‌লুর দেখা নেই। সকলেই অপেক্ষমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় মঙ্‌লু দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। রঘুয়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। মঙ্‌লু কাছে এসে পূর্বের মতো তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুণে নিয়ে হুকুম করে—চল।

কর্মক্ষেত্রে এসে রঘুয়া অবাক। অসংখ্য লোক নানা দিকে নানা কাজে ব্যস্ত। তাদের দলকে জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে লাগানো হয়েছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রঘুয়া মাথা তুলে দেখে অদূরে চা বাগিচায় বেঁটে, নাক থ্যাবড়া মেয়েগুলোর মাথায় কাপড়, পিঠে একটা লম্বা ঝুড়ি ঝুলছে।

সেটা প্যান্টের মতো ফিতে দিয়ে মাথার সঙ্গে বাঁধা। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে গাছের কচি পাতা তুলে মাথার উপর দিয়ে পেছনে ঝুড়িতে নিক্ষেপ করছে। তাদের কাজ যেন এক সুরে বাঁধা এক ছন্দে গাঁথা—চেয়ে চেয়ে দেখবার মতো। কিন্তু উপায় নেই। মাথা তুললেই সর্দার হুমকি দিয়ে তেড়ে আসে। একজনের হাত চলছে না দেখে সর্দার তো তেড়ে এসে দিলে এক লাঠির ঘা বসিয়ে। প্রতিবাদ বৃথা—তাতে অত্যাচারীর অত্যাচার বাড়ে বৈ কমে না।

এভাবেই কখনো জঙ্গল সাফ, কখনো মাটি কাটা। কখনো রাস্তা তৈরি ইত্যাদি নানা কাজ করে চলেছে। কখনো বা চা পাতা শুকোবার ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া। এই শুকোবার ঘরটা যেন এক জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ড। বাইরের মার্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রখরতা তার তুলনায় ম্লান। সাবা দিন এই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে হাতে আসে মাত্র তেরটি পয়সা। এর থেকে কখনো সখনো কাজের গাফিলতির জন্য জরিমানা, সর্দারের দস্তুরি ইত্যাদি কাটা গিয়ে হাতে যে কয়টি পয়সা থাকে তাই দিয়ে দিন গুজরান করতে হয়। তার উপর অসুখ বিসুখ তো নিত্য সাথী। ডাক্তাব আসে। এক শিশি লাল জল দেয়—তাতে অসুখ সারা তো দূবেব কথা বরং বেড়েই যায়। এই বিভীষিকাময় ব্যামোর করাল গ্রাসে যে কত হতভাগ্যবা নিপাত্তা হয়ে যায় তাব সীমা সংখ্যা নেই। আরো আশ্চর্য, জ্বরের প্রকোপ বেড়ে গেলে ডাক্তাব বৈদ্য আসে বটে তাবপব একদিন কুঠিঘর থেকে সবে যায়। কি ভাবে যায়, কোথায় যায় তার আর হদিশ মেলে না। তারপর ঐ খালি ঘরে আবার নতুন লোক আসে—কালক্রমে তারও আবাব ঐ দশা হয়। এভাবেই অসংখ্য না-পাত্তা মৃতের সমাধিব ওপর চা বাগানের মালিক সাহেব সুবাদের বিপুল ধনরাশি, সুখ স্বচ্ছন্দ ঐশ্বর্য আব আরামের ইমারৎ গড়ে উঠছে। এই প্রেতপুরীর অশেষ দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সইতে না পেরে কতজন যে পালাতে গিয়ে ধবা পড়ে শারীরিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কতবার তাবও পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু ধরা পড়ে পলাকতদের নির্যাতন নিপীড়নের মাত্রা দেখে একান্ত অনিচ্ছায় তাকে সে ইচ্ছা সংবরণ করতে হয়। আর পালিয়ে সে যাবেও বা কোথায়? দুনিয়ার কিছুই সে জানে না চেনে না। একমাত্র নিজের নাম ছাড়া তার দেশ কি এবং কোথায় তাও তাঁর অজানা। মাতা ও

জায়ার খোঁজ নেবার জন্য কতবার সে এক্লোম-আলা দোকানীর শরণাপন্ন হয়েছে। কত অনুরোধ উপরোধ করেছে—মেরা গাওমে এক খত ভেজ দেও জী। দোকানী ভরসা দিয়েছে—ঠিক হ্যায়, খত পানেওয়ালা, গাঁও, ডাকঘর আর জেলাকা নাম বোল্। হায় হায়, একমাত্র মা, স্ত্রী ও গাঁয়ের নাম ছাড়া সে তো আর কিছুই জানে না। সুতরাং গাঁয়ে খত পাঠাবার সাধ বারংবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দিনের বেলা অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন আর রাতের বেলায় দুষ্ট ক্ষতের মতো পাপাচার, স্ত্রী পুরুষের ভ্রষ্টাচার ব্যাভিচারের চরম উন্মত্ত জঘন্য কুৎসিত দৃশ্য—ভুটিয়া, খাসিয়া, নেপালি বস্তির মেয়েরা সাহেব সুবা থেকে ভদ্র ইতর নির্বিশেষে সকলের কামার্ত মাংস লোলুপতার শিকার। মদো মাতালের লীলাভূমি—ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, চিৎকার চেঁচামেচিতে রাত নরকগুলজার হয়ে ওঠে। সেও হয়ত এই কামার্ত কামনা বাসনা লালসার শিকার হয়ে পড়ত। কিন্তু শয়নে স্বপনে জাগরণে একমাত্র মোতিয়ার চিন্তাই ছিলো তার রক্ষা কবচ।

এভাবেই দিনের পরদিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার অবিচার নির্যাতন ও দুষিত পাপাচারের জাঁতাকলের নিষ্পেষণে তার দিন রাত্রি কাটছে। মুক্তির কোন আলো দেখতে পাচ্ছে না—চতুর্দিক ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কিন্তু সেই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাতে কেউ এগিয়ে আসে না। এরূপ একই ভাবে চলাকালীন একদিন কাজে গিয়ে তার মনে হলো সাহেবসুবা, বড় ছোট সর্দার সকলেই কেমন যেন ত্রস্ত ব্যস্তসমস্ত চঞ্চল। যে পুলিশকে তারা কোন দিন চোখে দেখেনি হঠাৎ তাদের আবির্ভাব, নিয়মিত ঘনঘন আনাগোনা চলছে—তার মধ্যে অনেক লালমুখোও আছে। সর্দারগণ সব সময় উচ্চকিত।

অবশেষে একদিন এ-কান, ও-কান, স-কান হয়ে খবর এলো—তাদের দুঃখ কষ্ট অত্যাচার অবিচারের প্রতিকারের জন্য দূর শহর ও গঞ্জের বাবুর দল এগিয়ে আসছে। পাশের চা বাগানে নাকি গোলাগুলি চলেছে। অনেকে মরেছে এবং ঘায়েল হয়েছে। দাবানলের মতো এ সংবাদ চতুর্দিকের চা-বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। অমানুষিক অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনের দুর্গকারায় আবদ্ধ নিপীড়িত অসহায় বন্দীদের প্রাণে সাড়া জাগে। তাদের অন্তরের বিদ্রোহের ধূমায়িত অগ্নি লেলিহান

শিখা মেলে জ্বলে ওঠে। কারাগার ভাঙ্গলো—বন্দীর বন্ধন ছিন্ন হলো। মানুষের মতো বাঁচার অধিকারের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত জনতা অত্যাচার অবিচার থেকে মুক্তি লাভের আশায় এক মন এক প্রাণে একত্রিত হয়। সাদা-টুপী পরা স্বেচ্ছাসেবী বাবুদের দল তেরঙা নিশান কাঁধে সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলে—চলরে চলরে চল—মুক্তির পথে এগিয়ে চল। শুরু হলো তাদের সুদীর্ঘ কঠিন রক্তরাঙা পদযাত্রা! নানা বাধা বিঘ্ন, পুলিশ মিলিটারি, গোলাগুলি কিছুই তাদের রুখতে পারে না। বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের মতো সকলে দুর্দান্ত উন্মত্ত বেগে এগিয়ে চলে। চা বাগিচার রক্তলোলুপ সাহেব সুবা এবং তাদের সাকরেদদের বাধা বিঘ্ন আর ঐ অত্যাচারীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা বৃটিশের পুলিশ মিলিটারির বেষ্টনি তাদের সদর্প পদ-ভারে ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল! অত্যাচারিতের রক্তের স্রোতে ধরণী কলুষিত হয়। তবুও তাদের চলার বিরাম নেই। শতেক শতাব্দী ধরে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত অপমানিত অবহেলিত জনতা মুক্তির আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে অবিরাম দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। এ উত্তাল উদ্দাম জল তরঙ্গ রুধিবে কে! শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ও গোলাগুলি তুচ্ছ করে বিভিন্ন পাহাড়িয়া স্টেশনের রেলগাড়িতে তারা চেপে বসে। শুরু হলো তাদের ঐতিহাসিক অভিযান।

অতীতের সেই রক্তরাঙা দিনগুলি বহু বৎসর পেরিয়ে এসেও রঘুয়ার বিনিদ্র নয়নের পর্দায় ছায়া ছবির মতো ভেসে চলে। সংসার অনভিজ্ঞ অজ্ঞ পাড়াগেঁয়ে এক যুবক মায়ের ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদকণা আহারে বীতস্পৃহ আর যোয়ানী জরুর আব্রুরক্ষায় ব্যর্থতা জনিত অপমান রোধে অসমর্থ হয়ে একদা তাদেরই সুখ সচ্ছন্দ্য বিধানের আশায় গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলো; তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। ইতিমধ্যে চা বাগানের কুলিদের উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভু ও তাদের সাকরেদদের মর্মন্তুদ অত্যাচার অবিচার নির্যাতনের সঙ্গে পুলিশ মিলিটারির গোলাগুলির কাহিনী সারা দেশে জানাজানি হয়ে দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কুলিদের সমর্থনে দেশী খবরের কাগজগুলোতে জোর লেখালেখির সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মালিকদের অসহ্য অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী বড় বড় শিরোনামায় ছাপা হতে থাকে। সুতরাং কুলিদের বিপদ-সঙ্কুল সুদীর্ঘ যাত্রা পথে স্টেশনে স্টেশনে একদিকে যেমন পুলিশ মিলিটারির প্রতিরোধ অবরোধ চলেছে অপরদিকে তেমনি জনসাধারণ স্বতস্ফূর্ত উৎসাহ ধ্বনি দ্বারা তাদের

সম্বর্ধিত করছে। এইভাবে দু'দিন দু'রাত্রির পর—তাদের মনে হলো অনেক যুগ পেরিয়ে—রেলগাড়ি এক নদীর ধারে রেল স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। উচ্ছ্বাসে উদ্বেল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখর জনতা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। খাদি টুপি-পরা স্বেচ্ছাসেবকগণ বন্দেমাতরম্ আল্লাহো আকবর ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তাদের নিয়ে নদীতে অপেক্ষমান স্টীমারে উঠবার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। নদীঘাটে স্টীমারে উঠবার মুখে বিরাট এক পুলিশ বাহিনী বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। ওদিকে কাঠের সিঁড়ি তুলে নিয়ে নোঙ্গর খুলে ভোঁ ভোঁ করতে করতে স্টীমারগুলি মাঝ দরিয়া বরাবর সরে যায়। নদীর এপার থেকে নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি সকল জলযানকে পুলিশ সরে যেতে নির্দেশ দেয়। তারপর লাঠিও সঙ্গীন তুলে চতুর্দিকে থেকে লোকজনকে হটিয়ে পুলিশ কয়েক'শ চা বাগিচার কুলিদের একটা খাঁচাকলে বন্দী করে ফেলে। চতুর্দিকে একটা থমথমে ভাব যেন এক মহা অশুভ ঘটনার পূর্বাভাস। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত লোকগুলির হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ে চলেছে। আর সাদা টুপি মাথায় স্বেচ্ছাসেবকদের বন্দেমাতরম্ আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে। লোকগুলিকে জল ও খাবার দেবার জন্য স্থানীয় সেবা প্রতিষ্ঠানের দাবী পুলিশ বারংবার প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট লোক পুলিশের বড় সাহেবকে বলে-কয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে লোকগুলির মধ্যে খাদ্য বিতরণে সক্ষম হয়। রৌদ্রদগ্ধ নিরীহ অসহায় লোকগুলি মানুষের মতো বাঁচার অধিকারের দাবী নিয়ে মদমত্ত বৃটিশরাজ ও তার পুলিশ মিলিটারি বাহিনীর সম্মুখীন। এভাবেই সারাদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত হয়।

সন্ধ্যা সমাগমে সমগ্র অঞ্চল আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। অদূরে স্টীমার ঘাটে যাত্রীবাহী দুটো স্টীমার কিনারে এসে ভিড়তেই অবরুদ্ধ জনতা স্টীমারে উঠবার অত্যুগ্র আগ্রহে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। বন্দেমাতরম্ আল্লা হো আকবর ধ্বনি দিতে দিতে তারা পুলিশ বেষ্টনী ভাঙবার জন্য জোর কদমে ছুটতে থাকে। পুলিশ তৈরি হয়েই ছিল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য তারা লাঠি ও সঙ্গীন দিয়ে জোর আক্রমণ চালায়। উদ্বেলিত অগ্রবর্তী জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। লাঠির ঘায়ে ও সঙ্গীনের খোঁচায় তারা নানা দিকে ছিটকে পড়ে। রঘুয়া লাঠির

আঘাতে ঘায়েল হয়ে দৌড়তে দৌড়তে নদীর ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

বহুদিন পরেও রঘুয়ার স্মৃতিতে সে কাল-রাত্রির বিভীষিকা এখনও জ্বল জ্বল করছে। সে-রাত্রির ঘটনাবলী মনে এলে সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তার গায়ে কাঁটা দেয়। চেতনা ফিরতে সে উঠে বসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বাঁ হাতের অসহ্য ব্যথায় সারা শরীর কাঁপছে—হাতটা বুঝি ভেঙেই গেছে! চক্ষু মেলে দেখে আশপাশে কেহ নেই—চতুর্দিক নিথর নিস্তব্ধ—যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস! তবু মাঝে মধ্যে সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠের চিৎকার আর্তনাদ আর গোঙানী শুনতে পাচ্ছে। দূরে মাঝ-দরিয়ায় স্টীমারগুলি আলো-ঝলমল! আলোয় উদ্ভাসিত নদী-তরঙ্গ যেন আলোর বন্যা হয়ে নৃত্যের ছন্দে ছুটে চলেছে। নদীতে ভাসমান নৌকোগুলি ঢেউয়ে ঢেউয়ে এদিক ওদিক দুলছে। তাদের আলোগুলি যেন জোনাকির মতো জ্বলছে আর নিবছে। মাঝেমাঝে রেল ইঞ্জিনের বাঁশি আর মাল গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে। রঘুয়া আর বসে থাকতে পারছে না—শুয়ে পড়ে।

আচম্বিতে গোলাগুলির আওয়াজ, আর্তচীৎকার কান্নাকাটি ও চেঁচামেচিতে রঘুয়ার তন্দ্রা টুটে যায়। চোখ মেলে দেখে আলো ঝলমল-পুরী ঘনঘুট্টি অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারই মধ্যে নিরস্ত্র অসহায় জনতার উপর মদমত্ত ব্রিটিশ পুলিশ মিলিটারি গোলাগুলি বন্দুক সঙ্গীন আর লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! রাতের অন্ধকারে চলে বর্বরোচিৎ বীভৎস নৃশংস অত্যাচার আর সহায় সম্বলহীন জনতার কানফাটা আর্তনাদ ও ক্রন্দন। এইরূপ ভয়ঙ্কর ডামাডোলের মধ্যে পড়ে রঘুয়ার জ্ঞান বুদ্ধি বুঝি হারিয়ে গেছে। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে ঘোর অন্ধকারে তীব্র আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফরফর ক্যাট-ক্যাট গুলির আওয়াজ কানে আসছে। দৌড়বার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে আর দৌড়লেই বা কি হবে—পুলিশ শব্দ লক্ষ্য করে নির্ঘাৎ গুলি চালাবে। হঠাৎ দুপদাপ শব্দ হতেই মনে হলো অনেক লোক নদীর দিকে দৌড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সাঁই সাঁই শব্দে কয়েকটা গুলি বুঝি তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়—অল্পের জন্য সে বেঁচে যায়। না, আর এখানে পড়ে থেকে দেরি করলে মৃত্যু অবধারিত ভেবে এক হাতে ভর করে হামা গুঁড়ি দিয়ে দিয়ে "গঙ্গা মাই" বলে ঝুপ করে নদীতে পড়ে ডুব দেয়। একবার ডুব দেয়

আবার মাথা তুলে দেখে। অন্ধকারে নদী তীরের কিছু স্পষ্ট দেখা না গেলেও ভয় যদি পুলিশ আলো ফেলে মাথা দেখতে পেলেই গুলি করে। সুতরাং যতদূর সম্ভব মাথা শুদ্ধ নাকটাকে জলের উপর ভাসিয়ে রেখে এক হাতে ভর করে স্রোতের টানে অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে চলে। হায়, খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার অধিকারের দাবী জানাতে উপস্থিত কতগুলি অজ্ঞ, নিরীহ নিঃসম্বল নিরস্ত্র লোককে মদগর্বিত বৃটিশ রাজ জেনে শুনে রাস্তার ঘৃণ্য কুকুর বেড়ালের মতো হত্যা করলো—নির্দোষের রক্তে ধরণী কলুষিত হলো। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক নতুন রক্তাক্ত অধ্যায় সংযোজিত হলো।

স্রোতের টানে রঘুয়া ভেসে চলেছে। গভীর জলে গিয়ে যাতে না পড়ে সে জন্য প্রাণপণে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে নদীর কিনারে থাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু এক হাত দিয়ে কতক্ষণ লড়াই চলে? অন্য হাত তখনও নাড়তে পারছেনা। এতক্ষণ কোন রকমে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারে সে কুল হারিয়ে ফেলে। চতুর্দিকে অথৈ জল। নিঃসীম অন্ধকারে সে ভেসে চলেছে। হঠাৎ দূরে এক ঝলক আলো দেখতে পেয়ে সে প্রাণপণে ঐ দিকেই সাঁতরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আর বুঝি সে পারছে না—শরীর অবশ হয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আলোটা বরাবর আসতেই সে—বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার দেয়। নদীতীরে দণ্ডায়মান লোকগুলি হতবাক। এতরাত্রে নদীতে কে—বাঁচাও বাঁচাও, চিৎকার করছে। পরক্ষণে আবার সেই চিৎকার—করুণ আর্ত চিৎকার এবং জলে ঝুপঝাপ শব্দ শুনেই দু'জন লোক নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতরে সাঁতরে অন্ধকারে নদীতে ভেসে যাওয়া হাবুডুবু খাওয়া লোকটাকে কোন রকমে ধরে ফেলে। তারপর তারা অতিকষ্টে কিনারে নিয়ে এসে পাড়ে তোলে। অচৈতন্য হয়ে লোকটা পড়ে আছে। উদ্ধারকারীরা বিব্রত হয়ে পড়ে—শ্মশানে তাদের দাহকার্য শেষ। এখন একে নিয়ে তারা কি করবে? অজ্ঞান লোকটাকে এভাবে নদী তীরে ফেলে রেখে গেলে হয় শেয়াল কুকুরে কামড়ে খাবে নচেৎ আবার জোয়ার এলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অগত্যা ধরাধরি করে তারা লোকটাকে উঁচু পাড়ে শান বাঁধানো চত্বরে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানেও সেই একই

প্রশ্ন—বেহুঁশ লোকটাকে একা ফেলে রেখে গেলে নিচের শ্মশান ঘাটের মতোই বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং পুনরায় লোকটাকে এনে নিকটবর্তী শ্মশানকালী মন্দিরের ভেতরে রেখে দরজার হুড়কো টেনে দেয়। মন্দির থেকে বেরোবার মুখে লোকটার গোঙানি শুনে বুঝলো শীঘ্রই তার জ্ঞান ফিরবে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তারা হরিধ্বনি দিতে দিতে দূর গাঁয়ের পথে চলে যায়।

মন্দিরে শায়িত রঘুয়ার ক্লান্ত পীড়িত স্নায়ুতে উচ্চ হরিবোল ধ্বনি বুঝি জোর আঘাত হানে। সে চক্ষু মেলে চায়। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয়না। শুধু অনুভব করে একটা নিরেট শক্ত কিছুর ওপর সে পড়ে আছে। কিন্তু এখানে সে কি করে এলো? এই প্রশ্নের উত্তর তার মধ্যে প্রথমে কিছুটা এলোমেলো অস্পষ্ট ঘোলাটে হয়ে এলেও পরিশেষে তা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে যায়। মনে পড়লো অনেকক্ষণ ধরে নদীতে সে নিজেকে এক হাতে আর ভাসিয়ে রাখতে পারছিলো না। বাঁ হাত অবশ হয়ে গেছে। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে সে ডুবে যাচ্ছে। ঐ সময়ে নদীতীরে হঠৎ এক ঝলক আলো দেখতে পেয়ে—সে বাঁচাও বাঁচাও, চিৎকার করে ওঠে। তারপর কি ঘটেছে তা আর স্মরণ করতে পারছে না। তবে অনুমান তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে কেউ দয়া পরবশ হয়ে তাকে নদী থেকে তুলে এখানে এনে রেখে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে উঠে বসতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাথাটা ঝিম ঝিম করাতে আবার শুয়ে পড়ে। দূরে নদীতে নৌকায় ছপ ছপ শব্দ আর গাছে গাছে কাকের কলরব শোনা যাচ্ছে—ভোর হতে আর দেরী নেই। এমনি সময় হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। প্রথমে ভড়কে গেলেও সে মাথা তুলে তাকায়। মনে হলো অন্ধকার হাল্কা হয়ে সাদা আভা ফুটে উঠছে। সে এবার মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। হরিধ্বনি দিয়ে কয়েকজন লোক কাঁধ থেকে কাপড়ে জড়ানো কিছু একটা মাটিতে রেখে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের হাত-লণ্ঠনের আলো তার দিকে পড়তেই অবাক হয়ে দেখে সে একটা শান বাঁধানো ঘরে রয়েছে। সামনে লোহার দরজা। দাঁড়ানো লোকগুলি হরিবল বলতে বলতে নদীর দিকে নেমে যায়। সে বুঝলো কাপড়ে জড়ানো বস্তুটি মৃত দেহ এবং নিচে নদীর ধারেই শ্মশান। আর ঐ শ্মশানের আগুনই সে রাত্রি বেলা দেখেছে। রাম নাম সত্য হ্যায় আর হরিবোল শব-দাহ ক্রিয়াকর্মের একই ধ্বনি। রঘুয়া বেরবার জন্য উঠে

দাঁড়ায়। ঘরের ভেতরটা তখনো ঘোলাটে আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন—স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর নয়। বাইরের অন্ধকার সরে গিয়েছে। গাছে গাছে সোনালি আভা দেখা দিয়েছে। দরজা ঠেলে বার হতে গিয়ে দেখে লোহার শিকের দরজা বন্ধ।— অথচ তালা দেওয়া নয়। তারপর অনেক কসরত আর কৌশলের পর দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে আসতেই সে বুঝতে পারে যে,'সে একটা মন্দিরের মধ্যেই রাত্রি কাটিয়েছে। বোঝা মাত্রই সে দরজা ঠেলে পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করে অদূরস্থ ঘোর কালো মূর্তির সম্মুখে প্রণাম নিবেদনের জন্য সাষ্ঠাঙ্গে শুয়ে পড়ে। ঐ দেবতাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসেছেন। নচেৎ তার বাঁচবার কোনই আশা ছিল না। ভক্তিভরে বার বার মাথা ঠুকে গড় করে সে উঠে দাঁড়ায় এবং জয় সীয়ারাম বলতে বলতে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। নদীরপাড়ে শান বাঁধানো চাতালে দাঁড়িয়ে নিচে নদী এবং শব যাত্রীদের দেখে। তারপর 'গঙ্গা মাই' এবং যারা রাত্রিবেলা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করেছে চাতালে বসে মাথা ঠুকে ঠুকে তাদের উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে সে উঠে পড়ে। পুনরায় মন্দির দুয়ারে গিয়ে প্রণাম করে নদীর পাড় ছেড়ে নিচে নেমে যায়।

অপরিচিত অজ্ঞাত বিদেশ বিভুঁই—কোথায় কোন দিকে যাবে? রাস্তা বলতে কিছু নেই। সে সূর্য বরাবর পুব মুখীই হাঁটতে থাকে। কিছু দুর যেতেই একটা রাস্তা নজরে পড়ে—সে রাস্তাটা আবার খানিকটা গিয়ে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে এঁকে বেঁকে চলেছে। এখন সে কোন্ রাস্তা ধরবে? উদ্দেশ্যহীন কোন দিকে, কোথায় যাবে? নাকি ঐ দেবতা যিনি তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁর মন্দিরেই পড়ে থাকবে? কিন্তু খাওয়া জোটাবে কি ভাবে? এই নির্জন শ্মশান ঘাটে কি খাবে—কে খাওয়া জোগাবে? কাজ নেই যে খেটে খাবে। একমাত্র সম্বল শ্মশান যাত্রীদের নিকট ভিক্ষা করা। না, ভিক্ষা সে করতে পারবে না—সে বড় ঘৃণার ব্যাপার। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলে চলে সে ডান দিকের রাস্তা ধরেই এগোতে থাকে। গেঁয়ো মেটে হাঁটা-পথ—আশপাশের মাঠ ঘাট বাট, গাছ পালা সব রৌদ্রে ঝলমল করছে। রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় নেই—যে দু' একজনকে দেখছে তাদের সে ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না, পাছে তার পরিচয় জেনে পলাতক

ভেবে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সুতরাং কোন কারণেই সে আপন পরিচয় দেবে না বলেই স্থির করেছে। কিন্তু যদি কেউ তার নাম ধাম সাকিন ঠিকানা জানতে চায় সে কি জবাব দেবে? জুৎসই কিছুও মনে আসছে না।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা গাছতলায় উঁচুমতো জায়গা দেখে বসে পড়ে। ক্ষুধার্ত্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত রঘুয়া সেখানেই গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ধরে সে ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ ডাকাডাকি শুনে সে চোখ রগড়ে উঠে বসে। দেখে একটা লোক লাঠি হাতে তার দিকে চেয়ে আছে। সে তো ভয়ে জড়সড়! লোকটা জিজ্ঞাসা করে—তুই কেরে? রঘুয়া কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। পাছে চোর ছেঁচড় ভেবে লোকটা না তাকে লাঠি-পেটা করে এই ভয়ে আচমকা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—ম্যায় ভিখিরি হুঁ বলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত পাতে। লোকটা সরে গিয়ে—আ মলো, বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে এবং রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। রঘুয়া নিজের উপস্থিত বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়ে পুনরায় গাছতলাতেই বসে পড়ে। তার দৃষ্টি দূরে একটা সবুজ মাঠের উপর পড়তেই দেখে কতগুলি গরু সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। ঐ দৃশ্য তাকে তার ফেলে-আসা জীবনকে মনে করিয়ে দেয়। হায়, সে কি ভুলই না করেছে! তা আর শোধরাবার নয়। জীবন-ভর তাকে এই ভুলের মাসুল গুনতে হবে। মাকে, স্ত্রীকে হারিয়েছে—আর এখন সে নিজেই মরতে মরতে বেঁচে উঠেছে। মা ভিক্ষা করে করে শেষে আর অন্ন জোটাতে না পেরে শুকিয়ে মরেছে। আর তার সোমত্ত বউ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরতে আর লাজ রক্ষা করতে না পেরে হয় আত্মহত্যা করেছে নয় পালিয়েছে—কাল্লু কিংবা হরিয়ার সঙ্গে। ওরাই তো কামার্ত্ত লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে ছিন্ন বস্ত্রা মোতিয়ার যাতায়াতের পথে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।

মনে পড়ে চা-বাগিচার পাপাচার কামাচার থেকে দূরে দূরে থাকতো বলে অনেক সাথী তাকে হরদম ঠাট্টা করতো। এক সাথী একদিন তো বলেই ফেলে—তুইতো দিবারাত্রি তোর জেনানা জেনানা করে হাঁ পিত্যেশ করে মরছিস। আরে তোর জেনানা তো ও দিকে অভাব অনটন সহ্য করতে না পেরে দেখ গে যা তোদের গাঁয়েরই কারো সঙ্গে ঘর গাঁও ছেড়ে পালিয়েছে। কথাটা শুনে সে রাগে দপ করে জ্বলে উঠেও শেষে

চুপসে যায়। কিন্তু কথাগুলো তার মনে দাগ কেটে বসে। না সে আর ভাবতে পারছে না। দুর্বল শরীর, তার উপর খিদের তাড়নায় সে অস্থির। গাছতলা থেকে সে উঠে পড়ে। চুম্বকের মতো দূর মাঠের গরুগুলি তাকে আকর্ষণ করছে। সে এক-পা দু-পা করে শেষে দ্রুত গরুগুলির দিকে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে এক একটা গরুর গলার নিচে হাতিয়ে হাতিয়ে আদর করে গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য একটা গরুও মাথা নাড়া দেয় না কিম্বা অপরিচিত বলে তেড়ে আসে না। রঘুয়ার আদর বোধ হয় তারা মনের তৃপ্তিতে উপভোগ করছে। আর রঘুয়ার অতীতের কথা যতই মনে পড়ছে ততই তার শোক উথ্‌লে ওঠে। অবশেষে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে সে অদূরে ঘাসের উপর বসে চোখের জল মুছতে থাকে। গরুগুলি ঘাসে মুখ না দিয়ে মাথা তুলে মনে হলো যেন তার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে আছে।

বেলা দুপুর—গৃহস্থ তার গরু তদারক করতে বেরিয়েছে। দূর থেকে রঘুয়াকে গরুগুলির কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখে প্রথমে তাকে গরুচোর বলেই সন্দেহ করে। তারপর যখন তাকে মাঠে বসে চোখের জল মুছতে দেখে তখন গৃহস্থ অবাক। কিছুক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার পর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে তুই কে, এখানে কি করছিস? তোর মতলবখানা কি, বল?

আমার কোন মতলব নেই বাবুজী। আমি গরুকে বহুত পেয়ার করি। বাচ্‌পন সে রাখালি করেছি, এখন ভবঘুরে বনে গেছি। ঘুরিফিরি, কেউ কাজ দিলে করি—খাইদাই চলে যাই। আভি বড্ড ভূখা লেগেছে বাবুজী। আমাকে কিছু কাজ দিয়ে তার বদলে খেতে দিন

মালিক রঘুয়ার সহজ সরল কথা বোধ হয় অবিশ্বাস করতে পারে না। তবু জিজ্ঞাসা করে—তুই কি কাজ করতে পারিস?

—আজ্ঞে, যা দেবেন তাই করবো।

—বেশ চ, গোয়াল সাফ আর গরুর জাবনা করবি। তারপর খেয়ে দেয়ে গরুগুলি চরিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ঘরে নিয়ে আসবি। হ্যাঁ, তোর নাম কি?

—আমার নাম রঘুনন্দন।

মালিক তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। গোয়াল সংক্রান্ত কাজকর্ম, পুকুর ইত্যাদি সব দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

রঘুয়ার বাঁ হাতে আগের মতো ব্যথা আর নেই। তবুও নাড়তে চাড়তে কষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও রঘুয়া তার ফেলে আসা দিনের রাখালিয়া কাজ আবার নতুন করে আরম্ভ করে। এ ভাবেই দিন কাটতে থাকে। গরু চরাতে চরাতে তার বাঁশির কথা মনে পড়ে। কিন্তু হায়, তার বাঁশি শুনবে কে? যে একদিন তার হাতে বাঁশি দিয়ে রাধা সেজে একই ঢঙ-এ রঙ্গ করে তার গলায় হাত রেখে পাশে দাঁড়িয়েছিল তাকে যে সে কিভাবে হারিয়ে ফেললে! বুকের পাঁজর ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে!

একদিন দূরের মাঠে গরু চরাতে গিয়ে অকস্মাৎ উঁচু রেল লাইন তার দৃষ্টি গোচর হতেই সে চলে চলে রেল লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে যেন রেল চাকার ঝকাঝক শব্দ শুনতে পায়—বোধ হলো তারা যেন তাকে ডাকছে—চলে আয়, আয় চলে আয়। সেই থেকে তার মন বেরিয়ে পড়বার জন্য উৎসুক উতলা হয়ে ওঠে—দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে মোতিয়াকে খুঁজে ফিরবে! লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে রেল লাইন কোথা থেকে এসেছে কোথায় গিয়েছে, কাছের রেল স্টেশন কত দূরে এবং কিভাবে যেতে হয় ইত্যাদি খবর নিতে থাকে। কিন্তু কাজ কর্মে কোন গাফিলতি নেই—নিয়মিত করে চলেছে। তার পর একদিন সকালে উঠে বাইরের মাঠে গরুগুলিকে বেঁধে রেখে গোয়াল সাফ ও জাবনা তৈরি ইত্যাদি নিত্যিকার কাজ কর্ম সমাধা করে বাড়ি ঢোকবার মুখে এসে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ চিন্তার পর মালিক বলে ডাক দিতেই তিনি বেরিয়ে আসেন। রঘুয়া তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলে—বাবুজী, আমি চলে যাচ্ছি।

—সে কিরে? কোথায় যাচ্ছিস—কেন, কি হলো?

—কিচ্ছু হয় নি বাবুজী। লোকেন, মেরা দিল চলা গিয়া। ম্যায় ঘুমতে ঘুমতে আপকা পাশ আয়া, ফের ঘুমতে ঘুমতে কাঁহা চলা যায়গা কুচ্ মালুম নেহি। আপনে বহুত মেহেরবানি কিয়া।

—তা যাচ্ছিস যখন—বাধা দেবো না। শুখা মুখে যাসনি—খেয়ে যা। এতদিন রইলি—না খেয়ে গেলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে যে!

—বলছেন যখন এক টুকরো কাপড়ে কিছু খানা বেঁধে দিন।

—আচ্ছা দাঁড়া, আমি আসছি।

রঘুয়া মাঠে এসে গরুগুলির প্রত্যেকের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, গালে গাল রেখে আদর করে। চক্ষু তার সজল হয়ে ওঠে।

মালিক এসে রঘুয়াকে একটা গামছায় বাঁধা খাবার আর পাঁচটা টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে বলে—তুই তো কখনো কিছু চাসনি। তোর যখন ইচ্ছা জাগে চলে আসিস। আমার দুয়ার তোর জন্ত সর্বদাই খোলা থাকবে।

রঘুয়া মালিকের এতটা বদান্ততা বোধ হয় আশা করেনি। সেও কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়ে। একটা মমত্ববোধ তার অন্তরে জেগে উঠে তাকে বিহ্বল করে। সে আর কথা বলতে পারে না। শুধু ছোট্ট একটা —নমস্তে—উচ্চারণ করেই পেছন ফিরে চলতে থাকে আর পেছনে তাকায় না। রাস্তার বাঁক নেবার মুহূর্তে একবার করুণ নয়নে গরুগুলির দিকে তাকায়। দেখে মালিক তখনো ছেলের হাত ধরে গরুগুলির পাশে দাড়িয়ে আছে।

শুরু হলো রঘুয়ার ভবঘুরে জীবন। রেল এবং রেল স্টেশনকেই সে তার ছন্নছাড়া জীবনের কর্ম কেন্দ্র করবার মনস্থ করে। কারণ রেল এবং রেল স্টেশন দিয়ে অগণিত লোকের চলাচল ও উঠানামা তাকে নানালোকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ এনে দেবে। তার অন্তরের ক্ষীণ আশা—এভাবেই মোতিয়ার সাক্ষাৎ লাভ হয়তো একদিন না একদিন ঘটতে পারে। বহুদূর হেঁটে রৌদ্রে পুড়ে সে রেল স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়। সেই থেকে আজ এই স্টেশন কাল ঐ স্টেশন করে করে সে জীবনের কয়েকটা বৎসর কাটিয়ে দেয়। তারপর একদিন সে আবার সেই রেল স্টেশনে এসে হাজির যেখানে কয়েক বৎসর আগে পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলে রাতের অন্ধকারে গোলাগুলি বন্দুক সঙ্গীন ও লাঠি নিয়ে চড়াও হয়ে অধিকাংশকেই শেষ করে দিয়েছে। অতীতের সেই সর্বনাশা রাত্রির কথা মনে হলেই সে আতঙ্কে শিউরে উঠে চক্ষুবুজে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায়।

এখানেই রঘুয়া স্টেশন প্ল্যাটফরমের এক চায়ের দোকানে নকরি নেয়। স্টীমার থেকে নেমে যাত্রীদল দাঁড়িয়ে থাকা রেল গাড়িতে আবার রেল গাড়ি এসে থামার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীরা স্টীমারে গিয়ে উঠছে। এভাবেই চলেছে দিবা রাত্রি অগণিত জনতার মিছিল। দেহাতি আদমি কিংবা জেনানা, সাধু সন্ত, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, ভৈরব ভৈরবী দেখলেই সে উৎসুক হয়ে ওঠে। কখনো কখনো তাদের অনুসরণ পর্যন্ত

করে। কিন্তু সবই বিফলে যায়। এভাবেই একটানা বহুদিন চলে—কিন্তু ঈপ্সিতার সাক্ষাৎ মেলে না।

অবশেষে একদিন স্টীমার থেকে অবতরণকারী একদল দেহাতি তীর্থযাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে এক পুণ্যলগ্নে রঘুয়া এখানে এই তীর্থক্ষেত্রে এসে উপস্থিত। দেব-দর্শন ও পুণ্যকর্ম ইত্যাদি সমাপনান্তে সে এখানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পুণ্যধামে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হেতু কোন দিন হয়ত মোতিয়ার সন্ধান পাবে যদি না সে অন্য কারো সঙ্গে ঘর বেঁধে থাকে। এইরূপ মনস্থির করে সামান্য স্টেশন কুলি থেকে কাজ শুরু করে কত কষ্টে কিভাবে যে সে জমাদার পদে উন্নীত হয়েছে সে আর এক ইতিহাস আর এক মহাভারত!

অভিযান অন্তে বিজয়ী অনুতোষ মনের আনন্দে চলতে চলতে যেন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে স্বাধীনতার তেরঙা ধ্বজা অভ্র ভেদ করে সগর্বে উড়ছে। বিজয় তোরণে দুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে পুষ্পার্ঘ্য বৃষ্টি হচ্ছে। আর সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার পথে বন্যার বেগে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে সকল বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে তার খেয়ালে আসে যে যেখান দিয়ে সে চলেছে সে পথে কেবল কাঠুরিয়ারা চলাচল করে। এই বে-পথে এক অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখলে কাঠুরিয়াদের সন্দেহের উদ্রেক অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং পথ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সে বিপরীত মুখী ঘোরা পথে অনল কুণ্ডের দিকে এগোতে থাকে। ঐ কুণ্ডে পুণ্যস্নান উপলক্ষে দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা চলেছে। অনুতোষ তাদেরই মধ্যে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিড়ে যায়। ফলে ঐ রাতে তার শহরে পৌঁছনো সম্ভব নয় কেননা দলের [illegible]ভাবে চলাফেরা ব্যাহত হয়। অনলকুণ্ডে এসে

অনুতোষ আর একদল সন্ন্যাসীর অনুগমন করে। তারা ঊর্মিমালী বিধৌত পর্বতে অবস্থিত দেবাদিদেব দর্শনে চলেছে। এই ভাবে বারংবার দল বদলের পর অনুতোষ রাত্রির প্রথম যামে শহরতলীতে উপনীত হয়। সেখান থেকে শটকে পড়ে সন্ন্যাসীর ধরাচূড়া ছেড়ে ভিন্ন রূপে শহরে প্রবেশ করে নির্বিঘ্নে আপন ডেরায় পৌঁছে।

তারপর একদিন কলেজ ফেরৎ আখড়ায় গিয়ে শরীর চর্চার সময় নিরঞ্জন-কে দেখে তার বিগত অভিযানের সহযোগীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়। গতানুগতিক কাজ কর্মের মধ্যেই তার দিন কাটছে। হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে তার ডাক আসে। যার মাধ্যমে এবং যেভাবে আহ্বান আসে তাতে বিষয়টা জরুরী না হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই কোনো বড় এ্যাসাইনমেণ্ট (কাজ) অপেক্ষা করছে। তার সংকটাকাঙ্ক্ষী মন স্বভাবতই চাঞ্চল্য অনুভব করে। আখড়ায় নিয়মিত শরীব চর্চার পর মনের উদ্বেগ উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অনুতোষ লাঠি হাতে নিয়ে ভাঁজতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই সে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। হাতের লাঠি যেন আর লাঠি নেই—একটা বিরাট চক্র অদ্ভুত কৌশলে বন্‌বন্‌ করে ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে ঘুরে ঘুরে এক চক্রব্যূহ তৈরি করেছে। তার ভেতরে অনুতোষ দাঁড়িয়ে নিজেকে কল্পিত শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে চলেছে। আত্মরক্ষার কসরতের পর অনুতোষ আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করে। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কল্পিত শত্রুকে দ্বন্দ্বে আহবান করে অসাধারণ নৈপুণ্যে লম্ফ দিয়ে তার আক্রমণ প্রতিহত করে। ভীম বিক্রমে প্রত্যাক্রমণের কৃত্রিম যুদ্ধ চাতুর্য মুগ্ধ বিস্ময়ে উপস্থিত লাঠি খেলোয়ার ও শিক্ষানবীশগণ প্রত্যক্ষ করে।

হাই কমাণ্ড থেকে খবর প্রাপ্তির পর থেকেই তাঁদের আজ্ঞা অনুজ্ঞা নিয়ে জল্পনা কল্পনা জনিত উৎকণ্ঠা ও চিত্তচাঞ্চল্য লাঠিখেলা কসরতে কিছুটা প্রশমিত হয়। আখড়া থেকে ফুটবল মাঠে গিয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখে। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মর্মমুখর অমৃতকানন ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছে। বিলীয়মান রবি রশ্মির অন্তিম আভাটুকু বৃক্ষচূড়া থেকে মিলিয়ে যেতেই গাছপালা, ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষমাণা রাত্রি বেরিয়ে এসে। অবগুণ্ঠন খুলে এলায়িত কৃষ্ণকেশে চতুর্দিক ঢেকে দেন। তাঁর সহচর সহচরী ঝিঁঝিঁ পোকা আর জোনাকির দল নৃত্যগীতে ক্রমেই [illegible] জাঁকিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর কয়াজের

মতো অন্ধকার চিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দূরে দূরে কুঠিরাভ্যন্তরস্থ ক্ষীণ আলোর রেখা কেবল জন জীবনের স্বাক্ষ্য বহন করছে।

অনুতোষ উদ্‌গ্রীব চিত্তে শঃনৈ শঃনৈ লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হয়। আম্রকাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্রই এক অলক্ষিত প্রহরীর কণ্ঠস্বর তাকে হুঁশিয়ার করে। যথারীতি পরিচয় দিয়ে সে অদূরে কুঠিরের দিকে অগ্রসর হয়। ভেজানো দরজায় সাংকেতিক টোকা দিয়ে অনুতোষ তার উপস্থিতি জ্ঞাপন করে। ভেতর থেকে কোন সাড়া আসছে না। অগত্যা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে অবাক হয়। কেউ নেই। আশ্চর্য এরকম তো আগে কখনো ঘটেনি। অনুতোষ দরজা ভেজিয়ে তার উদ্দেশ্যে কোন সংবাদ রাখা আছে কি না নির্দিষ্ট স্থানে তা খুঁজে দেখে—না, কিছু নেই। অবাক কাণ্ড। এমনি সময়ে দরজায় সাংকেতিক টোকা পড়তেই অনুতোষ দরজা খুলে দেয়। সম্মুখে অপ্রত্যাশিত আগন্তুককে দেখে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তার মুখ থেকে অজানতে বেরিয়ে যায়—আপনি।

—হাঁ, হঠাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপকদের এক জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছে। হয়তো সারা রাত কিংবা অর্ধ রাত পর্যন্ত চলবে। ফলে আমাকেই বার্তাবহ হয়ে আসতে হলো। তুমি চলে যাও—যথাসময়ে সংবাদ পাবে। কথা শেষে তিনি অনুতোষের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখেই দরজা খুলে অন্ধকারে অপসৃত হন। ঘটনাটা এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে হাঁপাট খোলা দরজার বাইরে অন্ধকারের তার দৃষ্টি কিছুক্ষণ তাঁর অনুসরণ করে।

বার্তাবহ বৃটিশের পয়লা নম্বরের এক খয়ের খাঁ রায়বাহাদুরের খ্যাতিমান ছেলে—বিদ্বান, বড় অভিনেতা এবং রাইফেল স্যুটিং-এ নিপুণ। সহরের গণ্যমান্য কয়েকজন বড়লোকদের মতো তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত শুনেছেন। তা বলে তিনি দলের একজন সক্রিয় সদস্য এমন সম্ভাবনা তার কল্পনায়ও স্থান পায়নি। আর সক্রিয়ই যদি না হবেন তা হলে দলের কোড্ নাম্বারে ওয়াকিবহাল হলেন কি করে? দলীয় রীতি নীতি অনুযায়ী একমাত্র কর্মোপলক্ষ্যেই দলের সভ্যরা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে। তার বাইরে একে অন্যকে জানবার কিংবা তাদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ কচিৎ কদাচিৎ ঘটে—শুধু পরিচয়টুকুই থাকে। এঁর দক্ষতার কথা শোনা থাকলেও এঁকে দেখা এবং এঁর পরিচয়

এই প্রথম। এই সব গোলমেলে জিজ্ঞাসা ও এখনকার ঘটনা অনুতোষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে দরজা ভেজিয়ে কুটির ত্যাগ করে।

সে-রাতের অভাবনীয় ঘটনার পর অনুতোষ সর্বক্ষণ কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক চাপা উত্তেজনা, উদ্বেগ ও অস্থির চিত্ত-চাঞ্চল্যে ভুগছে। কেন এবং কখন তলব আসবে এ নিয়ে মাথা ব্যথার কোন কারণ না থাকলেও বিগত দিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অস্বস্তি কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার দুপুরের পরে ক্লাশ। বাড়ি থেকে অনুতোষ বেলা করেই বেরিয়েছে। তালপুকুর ছাড়িয়ে ছাতিম পার্ক পেরিয়ে বড় দেওয়ানি আদালতের টিলার নিচের রাস্তা ধরে সে চলেছে। আচমকা একটা ঘোড়ার গাড়ি তার সামনে এসে থামতেই সে দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ি থেকে শ্মশ্রুযুক্ত এক প্রৌঢ় ব্যক্তি নামে। সঙ্গে বন্দুকধারী দেশোয়ালী দারোয়ান। উভয়েই আদালতের টিলার পেছনের থাক-কাটা সিঁড়ি দিয়ে উপর উঠে যায়। গাড়ি নিয়ে আদালতে যাবার ঘোরানো সদর পথ দিয়ে না গিয়ে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার কোন তাৎপর্য অনুতোষ অনুমান করতে পারে না। কিছুদূর যেতেই তার মনে পড়ে দারোয়ান সহ এইরূপ এক ভদ্রলোককে সে ইতিপূর্বে দেখেছে—কিন্তু কোথায় স্মরণে আনতে পারছে না, স্মৃতির মণিকোঠায় আতিপাতি করে খুঁজেও। কলেজের শেষ ক্লাশ করে বেরতেই বেলা শেষ। প্র্যাকটিকাল এটেণ্ড না করেই সে আখড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। নিয়মিত শরীর চর্চার পর সে আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়ে। সাঁঝের আঁধার নেমে আসছে —আখড়া প্রায় খালি। রাস্তার ধারে অথবা মাঠে তখনো লোকজন দাঁড়িয়ে বা বসে কথাবার্তা বলছে কিংবা গল্প করছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে অনুতোষ গোশালার পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার মুখে পেছন থেকে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়। আহ্বায়ক কাছে আসতেই দেখে— অনিরুদ্ধ। অনুতোষ জিজ্ঞাসা করে, ভাল আছ তো? সেদিন ফুটবল মাঠে তোমায় দেখিনি।

—না আমি যাইনি। তুমি আগামী পরশু সন্ধ্যারাতে সেবা প্রতিষ্ঠানে এসো, বলেই সে পেছন ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায়। দলের সভ্যদের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাক্যালাপ নিষিদ্ধ না হলেও অলিখিত নির্দেশে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা সর্বদা পরিত্যাজ্য। কেননা তাতে কথায়

কথায় নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলোচনায় এসে পড়ে।

নির্দিষ্ট দিনে আখড়া থেকে অনুতোষ সন্ধ্যা সমাগমেই বেড়িয়ে পড়ে। অন্ধকার ঘনীভূত হতেই সে আম্রকাননে প্রবেশ করে। অদৃশ্য সতর্ক প্রহরীর আহ্বানে যথাযথ জবাব দিয়ে অনুতোষ প্রতিষ্ঠানের কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বন্ধ দরজায় পরিচয় জ্ঞাপক সাংকেতিক টোকা দিতেই ভেতর থেকে সাড়া আসে—এসো।

ভেতরে প্রবেশ করে অনুতোষ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি অনুতোষের হাত ধরে বলেন, আসন নিয়ে আমার সামনে এসে বসো। হাতের পঞ্জি বন্ধ করে আসনের নিচে রেখে বলেন—অর্থ সংগ্রহের জন্য যে-ভার তোমাকে দেওয়া হয়েছিল তা তুমি অদ্ভুত কৃতিত্ব ও কুশলতার সঙ্গে নিখুঁত ভাবে নিষ্পন্ন করেছ। আমরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কদম কদম এগিয়ে চলেছি। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের রণ-দুন্দুভি বেজে উঠেছে। মহাসারথির পাঞ্চজন্য ভীম-নাদে নির্ঘোষিত হচ্ছে। হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে শত্রুকে চরম আঘাত হানবার শুভলগ্ন দ্রুত এগিয়ে আসছে। আরও অর্থ আরও হাতিয়ার চাই—সুযোগ নষ্ট করা চলবে না।

বক্তার আননে চিন্তার বলিরেখা ফুটে ওঠে। তিনি আসনের নিচ থেকে দিনপঞ্জিখানা তুলে পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

অনুতোষ নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর আদেশের প্রতীক্ষারত। অন্তরে একটা প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনা প্রবাহ চলেছে। রোজনামচাখানা বন্ধ করে তিনি অনুতোষের দিকে চেয়ে বলেন—অর্থ সংগ্রহের সংকল্প নিয়েই তুমি একদা স্থানীয় ট্রেজারির কর্মধারা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ নিয়ে সমীক্ষা করেছ।

প্রত্যুত্তরে—আজ্ঞে হাঁ, বলেই সে-দিন বন্দুকধারী দারোয়ান সহ-দৃষ্ট প্রৌঢ় ব্যক্তিকে কোথায় দেখেছে তা তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে অন্তরে প্রবল উত্তাপ সৃষ্টি করে।

—যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেদিন দুঃসহ নির্যাতন সয়ে অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করেছ তার বাস্তব রূপায়ন সম্ভবপর কিনা ভেবে চিন্তে সুষ্ঠু পরিকল্পনা সহ আগামী সপ্তম দিবসে এমনি সময়েই এখানে এসো।

মহারাজ-এর বক্তব্য অনুতোষের নিকট তাঁর আদেশেরই সমতুল্য।

সুতরাং নির্দ্বিধায় সে তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে প্রণামান্তে উঠে পড়ে।

—শুভমস্তু, বলেই তিনি অনুতোষের মাথায় হাত দিয়ে তাকে বিদায় দেন।

দেবস্থানের পুণ্যলগ্নের মেলা শেষ। যাত্রীদের অধিকাংশই চলে গেছে। অবশিষ্টরাও যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তবে রাস্তার ধারে গাছের তলায় এখানে ওখানে এখনো বেশ কিছু সাধু সন্ন্যাসী, ভৈরব ভৈরবী, বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ মেলে। মিশন তাদের সেবা প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে এনেছে—কেবল কয়েকজন রোগীর আখেরি ব্যবস্থার অপেক্ষা করছে। স্টেশন চত্বর থেকে পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে। রেলগাড়ির ঠিকমতো চলাচল শুরু হয়েছে। রঘুয়ারও যাত্রীদের তদ্বির তদারকের কাজ আর নেই বললেই হয়। স্টেশনেও আগের মতো কাজের চাপ নেই। রেল স্টেশন ও তার আশপাশে কোন চাঞ্চল্য নেই—রঘুয়া কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—বাড়িতে জাঁকজমক পূর্ণ উৎসব শেষে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার যেরূপ হয়। ক্ষণেকের দেখা ভৈরবীরূপী মোতিয়া আর ভৈরবরূপী কাল্লু সেদিন যাত্রীদের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল রঘুয়া তার হদিশ পেলে না। তারপর মেলা চলাকালীন হঠাৎ একদিন স্ট্রেচার-বাহিত মাথায় পট্টিবাঁধা রক্তাপ্লুত ও আহত যে ব্যক্তিকে সে রেলগাড়িতে তুলতে দেখেছে সে যে কাল্লু ভিন্ন অন্য কেউ নয় এ বিষয়ে সে স্থির নিশ্চিত। কিন্তু তার সঙ্গিনী ভৈরবী কোথায়? হন্যে হয়ে খুঁজেও রঘুয়া এ যাবৎ তার সন্ধান পায়নি। দিবারাত্রি সে মনমরা হয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে—হায়, পেয়েও হারিয়ে ফেললে।

ওদিকে ভৈরবী মিশনের আশ্রয়ে ভৈরবের সংবাদ প্রাপ্তির আশায় উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছে। যে ব্যক্তির সহৃদয় প্রচেষ্টায় ভৈরবকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, তিনি কথা দিয়েছিলেন—ভালো মন্দ যাই হোক অবশ্যই জানাবেন। তিনি আসছেন না, কিংবা সংবাদও দিচ্ছেন

না। তবে কি ইতিমধ্যেই সব শেষ! তাই যদি ঘটে থাকে তবে সে এখন কি করবে—কোথায় যাবে? যার সঙ্গে তার সাদি হয়েছিল সে তো রুজি রোজগারের ধান্দায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাপের মতোই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! অপেক্ষা করে করে অবশেষে পেটের জ্বালায়, রূপ যৌবন ও আব্রু রক্ষার তাগিদে ঘর গাঁও ছেড়ে ভালো মন্দ যাই হোক সুদীর্ঘকাল বৎসরের পর বৎসর দেশে দেশে নানা স্থানে, নানা তীর্থে ঘুরে বেরিয়েছে। কোথাও ঘর বেঁধে বসবাস করার তাগিদ অনুভব করেনি। দীর্ঘ দিনের মেলা মেশায় উভয়ের মধ্যে যে একটা মোহ বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে তারও বুঝি পরিসমাপ্তি হলো! তার চক্ষু ফেটে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে!

মিশন যেদিন তাদের সেবাকেন্দ্র বন্ধ করবে তার আগের দিন সেই সহৃদয় ভদ্রলোক—যার জন্য ভৈরবী অধীর প্রতীক্ষা করছে—এসে হাজির। মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তিনি ভৈরবীর নিকটে আসেন; রোগী এবং তার অবস্থা সম্পর্কে সব কিছু বলে ভৈরবকে শেষ দেখা দেখতে তার সঙ্গে তিনি যেতে ইচ্ছুক কিনা জিজ্ঞাসা করেন।

ভৈরবী আখেরী খবরের জন্য আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছে। বিচ্ছেদ বেদনা, শোক ও দুঃখ ভোগ জীবনে সে অনেক সয়েছে। অবিচলিত অকম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর দেয়—না। অচৈতন্য জড় ব্যক্তিকে, শেষ দেখা দিয়ে নিজের বেদনা, তার চাইতে বড় কথা আপনার তক্লিফ দুর্ভোগ আর বাড়াতে চাই না। চৈতন্যশীল থাকলে শেষ-দেখা দেখে হয়তো নিজে কিছু সান্ত্বনা পেতাম, তাকেও দিতে পারতাম। তা তো হলো না। আপনি আমাদের জন্য আশাতিরিক্ত অনেক কিছু করেছেন। পরমাত্মা আপনার এবং দেবদূতের মতো আকস্মিক আবির্ভূত সেই নবীন সন্ন্যাসীর মঙ্গল করুন। আপনার নিকট আমার শেষ প্রার্থনা—আমাকে এখানে এই তীর্থক্ষেত্রে একটা আস্তানা খুঁজে দিন যাতে আমি এখানেই আমার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। আমার জীবনেরও শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে—হয়তো বেশী দূরে নয়—আমি তার হাতছানি দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রলোক ভৈরবীর শেষ কথাগুলো শুনে—হেঁয়ালি মনে হলেও—অবাক হয়ে যান। খানিক চুপ করে থেকে—আচ্ছা দেখি, বলেই তিনি চলে যান। মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন তাদের স্থানীয় আশ্রমে ভৈরবীর স্থান নেই—মেয়েরা সেখানে নিষিদ্ধ। এখানে মন্দির ও

অন্যান্য দেবস্থান দূর পর্বতে এবং গহন অরণ্যে অবস্থিত। লোকালয় থেকে দূরে সে সব জায়গায় একা বাস করা ভৈরবীর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাঁর মনে হয়। তবু তাকে একবার জিজ্ঞাসা করবে। সেবাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক খোঁজ খবর নিয়ে নানা জায়গা ঘুরে দুটো জায়গা ভৈরবীর থাকবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন—একটা বড় রাস্তা থেকে কিছু দূরে বুড়ো শিবতলা, আর একটা ঝিলের ধারে শ্মশান ঘাট। ফিরে এসে তিনি ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে তা দেখিয়ে তাকে রাস্তা ঘাট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন এবং চলে যাবার পূর্বে তিনি ভৈরবী সহ মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়ে সমুদয় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে প্রয়োজন মতো ভৈরবীকে সাহায্য দান ও চিকিৎসাদি করবার অনুরোধ জানান। তারপর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য দানের খাতাটায় নিজের নাম ধাম ও টাকার অঙ্ক লিখে অর্থসহ খাতাটা প্রত্যর্পণ করেন। ভৈরবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে তার হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলেন—এই সামান্য দান গ্রহণ করুন। অসময় কাজে লাগতে পারে। বিনা বাক্যব্যয়ে ভৈরবী এবার তা গ্রহণ করে অনুরোধ জানায়—হাসপাতালে মৃতদের গণদাহ করা হয় বলেই সে শুনেছে। ওকে আলাদা ভাবে দাহ করা সম্ভব হলে ওর স্মৃতি রক্ষার্থে যদি কিছু চিতাভস্ম আমাকে পাঠিয়ে দেন। কথা শেষে ভৈরবী কোন উত্তরেব অপেক্ষা না করেই নির্গলিত অশ্রু গোপনের উদ্দেশ্যে ত্বরিৎ গতিতে মুখ ঘুরিয়ে প্রস্থান করে। তার সঙ্গী বিহীন জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হলো।

কিছু দিন পর থেকেই শ্মশানে শববাহকেরা রাত্রি বেলা প্রায়ই এক ভৈরবীকে দেখতে পায়। চিতার পোড়া কাঠ জড় করে ধুনি জ্বালিয়ে শ্মশান যাত্রীদের চালা ঘরটায় সে অবস্থান করে। বুড়ো শিবতলা যারা মানত রক্ষা করতে যায় তারাও সেখানে এলোচুলে এক ভৈরবীকে কখনো কখনো দেখতে পায়। এভাবেই এক ভৈরবী সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে নানা মুখে নানা কথা কাহিনী আকারে শাখা প্রশাখা মেলে ছড়াতে থাকে।

একদিন হাট থেকে ফেরার পথে হরকিষেণও ঐ ভৈরবীর কথা ও কাহিনী ডাক হরকরা ষষ্ঠীর মুখে প্রথম জানতে পায়। রাত্রের ডাক গাড়ি ছেড়ে গেলে পর হরকিষেণ কাজ কর্ম ও খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যাবার সময় রঘুয়াকে জিজ্ঞাসা করে হালফিল কোন ভৈরবীর কথা সে শুনেছে

কিনা ? 'ভৈরবী' শুনেই রঘুয়া উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—কি বললি —ভৈরবী ? কোথায়—কার কাছে কি শুনেছিস শীগগির বল। রঘুয়ার এই আকস্মিক অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখে হরকিষেণ কৌতুক অনুভব করে। রগড় করবার জন্যই বলে— আরে সে এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রোমহর্ষক ব্যাপার!—এক ভৈরবী নাকি রাত্রিবেলা শ্মশানে কংকাল করোটি নিয়ে ভূত পেত্নীর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচে। আর এক ভৈরবী বুড়ো শিবের থানে ইয়া ইয়া কেউটের সঙ্গে খেলে আর নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে নেচে কুঁদে ঘোরে!

রঘুয়া আবো উত্তেজিত হয়ে উঠে হরকিষেণের হাত ধরে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে—তোকে এসব কে বলেছে, শীগগির বল।

গত কয়েকদিন যাবৎই রঘুয়ার চলাফেরা, আচাব আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক—কথাবার্তা কম বলে আর মাঝে মাঝে গুম হয়ে থাকে। সুতরাং তার এই হঠাৎ উত্তেজনা ও হাত ধরে জোর ঝাঁকানিতে হরকিষেণ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলে—হাত ভেঙে যাবে, হাত ছাড়, বলছি।—ষষ্ঠীব সঙ্গে হাটে দেখা—তার মুখেই শুনেছি।

রঘুয়া আরও অবাক করে—চিৎকার দিয়ে বলে—ষষ্ঠী, কে ষষ্ঠী!

—কেন, ডাক হরকরা ষষ্ঠীকে চেন না নাকি ?

—হুঁ, উচ্চারণ করেই রঘুয়া উঠে গিয়ে অদূরে আপন বিছানায় শুয়ে পড়ে। হঠাৎ ছোটবাবুর ঘরে টেলিগ্রাফেব ঘণ্টা বেজে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে সে ছোটবাবুকে ডেকে আনে। কিছুক্ষণ পর ছোটবাবু ডেকে বলেন— ডাউন পার্শেল ট্রেন—সঙ্গে মিলিটারী। সিগনেল দে—হরকিষেণকে চালান নিতে বল। হুঁশিয়ার! যাবাব সময় রঘুয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখে— ঘড়িতে রাত্রি দেড়টা।

পার্শেল ট্রেন অতিক্রম করে যেতেই রঘুয়া কাজ সেবে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে— ঘুম আসে না। বিগত কয়েকদিন কাজেব ফাঁকে ফাঁকে সে সমুদয় গাছতলা, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদেব আড্ডা ও আখড়া, মঠ মন্দির এমন কি নির্জন পাতাল পুরীর ভৈরবের মন্দির—সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে—কোথাও ভৈরবী রূপিণী মোতিয়াকে দেখতে পায়নি। তাহ'লে হবকিষেণ বর্ণিত ভৈরবীটি কে এবং হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হল ? নানা এলোমেলো চিন্তা তাকে উত্তপ্ত, অশান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সারা-রাত্রি বিনিদ্র নয়নে কাটিয়ে ভোরে উঠে সে নেশাখোরের মতো দৈনন্দিন

কাজকর্ম সারে। ভোর ছ'টার গাড়ি চলে যেতেই ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির। ছোটবাবু তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করে—কিরে তোর কি হয়েছে!

রঘুয়া অদ্ভুত চোখ মুখের ভঙ্গী করে বলে—কুচ্ হুয়া নেহি বাবুজী। ম্যায় স্রেফ্ ছুট্টি মাঙতা হুঁ।

—ছুট্টি! ছোটবাবু তো অবাক! এতদিন হয় তিনি এখানে এসেছেন—এর মধ্যে রঘুয়া কোন দিন ছুট্টি চায়নি কিংবা ছুটির আর্জি পেশ করেনি। সুতরাং জিজ্ঞাসা করেন—ছুটি? তা বেশ, কিন্তু জানিস তো স্টেশন ছাড়তে হলে লিখিত আর্জি পেশ করতে হয়।

স্টেশন ছাড়া ও দরখাস্তের কথা শুনে রঘুয়ার হুঁশ হয়। সে বলে—তা নয় বাবু, আমি এখন ছুটি চাইছি। বেলা বারোটার মধ্যে ফিরে আসবো।

ছোটবাবু ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন—সবে সকাল সাড়ে ছ'টা। একটু ভেবে বলেন—এই সময়ের মধ্যে দুটো গাড়ি আসবে যাবে। তা যাবি তো যা। হরকিষেণকে সব বলে বুঝিয়ে দিয়ে যাস। ঠিক সময়ের মধ্যে ফিরে আসবি। সাবধান—সবে এক ঝামেলা গেছে—তার জের এখনো কাটেনি। আবার বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! ছেদিকে স্টেশনে হাজির থাকতে বলিস। ছোটবাবু বাসার দিকে চলে যায়।

কি কি করতে হবে হরকিষেণকে সব বুঝিয়ে দিয়ে এবং ছেদিকে ডেকে এনে স্টেশনে থাকতে বলে রঘুয়া বেরিয়ে সোজা পোষ্ট আপিসে গিয়ে উপস্থিত। আড্ডা ঘরের দিকে এগোতেই ডাকের থলিবাহী রানারদের বল্লমে আঁটা ঘুঙুরের আওয়াজ কানে আসে। বুঝলো ষষ্ঠী ওরা ডাকের থলি নিয়ে বেরুচ্ছে। সুতরাং রঘুয়া না এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। চলবার পথে ষষ্ঠী রঘুয়াকে দেখে অবাক হয়। তার দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। হাঁটতেই হাঁটতেই জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার সাঙাত, ঘাঁটি ছেড়ে যে বেরিয়েছ?

—তোমার সঙ্গেই দরকার ছিল।

—তা, রাত্রে ডাক গাড়ি ছেড়ে যাবার পর বলো, ষষ্ঠীর সঙ্গে আরও দু'জন রানার। তারা গেটের বাইরে গিয়ে বল্লমের আগুটার আঁটা ডাকের থলিগুলি কাঁধে তুলে নেয়। তারপর তিনজন রানার একসঙ্গে পা ফেলে অদ্ভুত গতি ও ভঙ্গিতে চলতে থাকে। বল্লমে আঁটা ঘুঙুর

তাদের চলার তালে তালে এক অদ্ভুত টুংটাং ঐক্যতান ঘোষণা করছে—রাজাধিরাজ সম্রাট-এর ডাক চলেছে—হুঁশিয়ার! শূণ্যদৃষ্টিতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রঘুয়া ঘুরে ডাকঘরের বারান্দায় বড়বাবুর জানালার ধারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—বাবু আমার হিসাবে কত আছে—একবার বলুন তো।

পোষ্টমাস্টার প্রশ্ন শুনে মাথা না তুলেই জবাব দেন—কেরে তুই হিসাব চাইছিস? এটা কি তেজারতি কারবারের গদি, না কি মুদিখানা? তারপর মাথা তুলে প্রশ্নকর্তাকে দেখেই বলে—কি ব্যাপা'র রঘুনন্দন—হঠাৎ এই প্রশ্ন—পাস বই তো তোমার কাছেই আছে।

—হাঁ বাবু, ঠিকই বলেছেন। অপ্রস্তুত রঘুয়া পোষ্ট আপিস ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে—এসব সে কি করছে? যতসব এলো মেলো চিন্তা মাথায় আসছে আর তার শিকার হয়ে সে যা তা বকছে ও করছে! লোকে ভাবছে কি—মাথা তার খারাপ হলো নাকি। মাথাটা কয়েকবার এদিক ওদিক নেড়ে-চেড়ে যাচাই করে দেখে সে হাঁটতে থাকে। ষষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলতে না পারায় তার কার্যক্রম সব ভেস্তে গেছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে ভাবে—কোথায় যাবে? এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে। হরকিষেণকে কাজ বুঝিয়ে পড়িয়ে বার হতে তার দেরী হয়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে হলো—শ্মশানটা ঘুরে হরকিষেণের কথার সত্যতা যাচাই করে দেখা যাক না। কিন্তু শ্মশান তো বেশ দূরে—যেতে আসতে সময় পেরিয়ে যাবে। তবু সময়ের গণ্ডি তার পথ রোধ করতে পারে না। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রুত পদে ঐ দিকে হাঁটতে থাকে। শ্মশানে পৌঁছে নজরে পড়ে কেবল ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটানো ভাঙা কলসি, মেটে শরা, আধপোড়া কাঠ আর কয়লা। কোথাও কেউ নেই—চড়া রোদে জনমানবহীন শ্মশান ধু-ধু করছে।

হতাশায় প্রপীড়িত, অনিদ্রায় অবসন্ন, আতপ তাপে ও দীর্ঘ পথ শ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত রঘুয়া যখন স্টেশনে ফিরে আসে তখন সে প্রায় চলচ্ছক্তি-হীন। কোনরকমে ছোটবাবুর নিকট হাজিরা দিয়ে বাইরের বারান্দায় শুয়ে পড়ে। বাকী দিনটা রঘুয়া নিষ্প্রাণ যন্ত্রবৎ কাজ করে। হরকিষেণ মাঝে মাঝে রঘুয়ার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েও তার হাবভাব রকমসকম দেখে চুপ হয়ে গেছে।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রঘুয়ার অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডাক গাড়ি ছেড়ে যেতেই সে ষষ্ঠীকে পাকড়াও করে হরকিষেণের নিকট শোনা সংবাদের সত্যতা জানতে চায়। ষষ্ঠী রঘুয়ার কথার ঢং ও আগ্রহাতিশয্য দেখে অবাক। প্রত্যুত্তরে সে জানায় ঘটনার কোনোটাই তার চোখে দেখা নয়। এমন কি কমলপুরের জমিদার মেজবাবু নাকি শবদাহ করতে এসে ভৈরবীকে দেখে শ্মশানে এক কালিমন্দির প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছেন—এ সবই তার শোনা কথা।

ষষ্ঠী চলে যেতেই রঘুয়া কাজকর্ম সেরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম নেই—যেন উবে গেছে। কেবল ভাবছে—এখন সে কি করবে? দিনের বেলা তো গিয়ে দেখেছে শ্মশান খাঁ খাঁ করছে। তবে কি একবার বুড়ো শিবতলা যাবে? দেখবে শ্মশান ভৈরবী আর বুড়ো-শিব ভৈরবী কি এক—নাকি একেরই বিভিন্ন রূপ—নাকি উভয়ই আলাদা। তবে ভৈরবী রূপিণী মোতিয়া যে এখানেই কোথাও আছে এবং ভৈরবরূপী কাল্লু যে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেনি সে সম্বন্ধে রঘুয়া নিঃসন্দেহ। তার চক্ষু কখনও তার সঙ্গে ছলনা করতে পারে না। এতসব গোলমেলে জট ছাড়িয়ে মোতিয়াকে তার বার করতেই হবে। তাতে জীবন যায় যদি যাক—কুছ্ পড়োয়ার নেহি। সারাজীবন সে এভাবে আর জ্বলে পুড়ে মরতে রাজী নয়। এই দৃঢ় সংকল্প তার মনে কিছু স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়ে আনতেই সে নিদ্রাগত হয়।

সে দিন বাসস্থানের খোঁজে যে দুটো আস্তানা ভৈরবী ঐ ভদ্র মহোদয়ের সঙ্গে দেখেছে তা প্রথমে খুব হতাশাব্যঞ্জক মনে হলেও নিরুপায় ভৈরবী সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ শ্রেয় মনে করেছে। মানুষের জৈবিক লুব্ধ লোলুপ দৃষ্টির অগ্নিদহন থেকে বন জঙ্গলে পশু পাখির সাহচর্যে নিরালা নিভৃত জীবন যাপন শ্রেয়। এতো সে তার নিজের জীবনের নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করে আসছে। স্বামীর গৃহ ত্যাগের পর তার দুঃখ কষ্ট দুর্দশার অবধি নেই। পেটে ভাত নেই, পরিধানে লাজরক্ষার আবরণ নেই—সোমত্ত জোয়ানীর প্রতি অঙ্গের উদ্ধত রূপরেখা ছিন্ন বস্ত্রের আচ্ছাদনে উৎকট নির্লজ্জ ভাবে প্রকটিত। মানুষের কামাতুর দৃষ্টির শিকারে নিয়ত সে দগ্ধ। শাশুড়ী তাঁর ভিক্ষালব্ধ খুদ-কুঁড়ো তাকে খাইয়ে নিজে না-খেয়ে এক প্রকার অনাহারেই মৃত্যু বরণ করেছেন। তারপর

আর কোন বাধা বিঘ্ন রইল না। মাংস-লোভীরা লালসার হিংস্র দন্ত, নখর আর লকলকে জিহ্বা বিস্তার করে তাকে ছিন্নভিন্ন করবার জন্য শেয়াল কুকুরের মতো দিবারাত্র আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করছে। ঘরের বাইরে যাবার জো নেই। পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, রাতে ঘুম নেই। অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় আর অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে চিরমুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে গভীর নিশীথে মরিয়া হয়ে সে জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য—মৃত্যু হলো না। জ্ঞান ফিরে আসতে অন্ধকারে চক্ষু মেলে দেখে—সিক্ত-জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্রে অসংবৃত অবস্থায় সে কাল্লুর কোলে শুয়ে আছে! লজ্জা ঘৃণা ভয়ে সে মাথা তুলে উঠবার চেষ্টা করে—পারে না—মাথা ঘুরে পড়ে যায়। যে কাল্লুকে সে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করেছে—স্বামীগৃহে আসার পর থেকেই যে নিয়ত যাতায়াতের পথে লুব্ধ শ্যেন দৃষ্টিতে তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে নিয়তির নিষ্ঠুর নির্মম বিধানে সে কিনা তারই কোলে শুয়ে আছে! এ যে মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক—অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর নির্মম পরিহাস!

অতঃপর আর কোন গতি নেই। সেই নিরুপায় নিশীথেই কুলে কালি দিয়ে গাঁও গৃহ ছেড়ে ঐ কাল্লুর সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সেই থেকে এই ভৈরবীর ভেকে বৎসরের পর বৎসর সুদীর্ঘ চোদ্দ বৎসর কাল কত দেশ দেশান্তর পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল ঘুরে বেরিয়েছে। কত ধর্ম স্থান পরিভ্রমণ, কত দেব দেবী দর্শন, কত পুণ্য-তোয়ায় স্নান, সন্ধ্যাবন্দনা করেছে। কিন্তু অনুক্ষণ অনুভব করেছে সর্বত্রই জৈব লালসা, কামনা বাসনা নানা রূপে, নানা রঙের আবরণে, বাঘা বাঘা ধর্মীয় বুলি ও ধ্বনির আড়ালে খেলা করে চলেছে। শান্তি কোথাও মেলে নি। একটা প্রচণ্ড অপরাধ-বোধ প্রতি নিয়ত ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করেছে। দেব দেবীদের প্রণাম করে তাদের চরণে শুধু এক প্রার্থনাই নিবেদন করেছে—তার এই জঞ্জালময় ঘৃণ্য জীবনের শীঘ্র যেন অবসান হয়। অদৃশ্য থেকে দেবতারা তার ঐকান্তিক কাতর প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনেছেন—এমন আঁট-সাঁট দৃপ্ত দৃঢ় শরীর ক্রমেই শিথিল থেকে শিথিলতর এবং একটা ক্লান্তিকর অবসাদে শরীর ক্রমেই শক্তিহীন হচ্ছে। মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা। ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। কামাখ্যা-ধামে শরীর দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে যেতে হয়। অনেক চিকিৎসার পর ডাক্তার রায় দেন—এরোগ থেকে মুক্তি নেই—কাটা ছেঁড়া করলে রোগ বাড়বে বৈ কমবে

না। রোগের নাম লিখে অনেকগুলি বড়ি দিয়েছেন। ব্যথা বাড়লে একটা করে খেতে হয়। তাতে ব্যথা কমে বটে কিন্তু রোগের উপশম নেই। যে সব রাখাল বুড়ো-শিব দীঘির পাড়ে গরুবাছুর চরাতে আসে তাদের সঙ্গে ক্রমে তার একটা নিবিড় স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে দিয়েই তার অতীত জীবনের স্মৃতি জেগে উঠে তাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেয়। রাখালরাই দীঘির এক কোণে বন কেটে তাকে একটা বসত করে দিয়েছে। তারাই তার দেখভাল করে। দূর দুর গ্রাম থেকে খাবার নিয়ে আসে। তাছাড়া বুড়ো শিবের মানত-কারীরা আসে। গাছতলায় বসে সে তাদের আশীর্বাদ করে। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ফল, মূল, কলার সঙ্গে মাঝে মাঝে অর্থও দান করে। দিনটা সে বুড়ো শিবতলা আর রাত্রিটা শ্মশানে কাটায়। শেয়াল কুকুর আর অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর উৎপাত থেকে রক্ষার জন্য সে ধুনি জ্বালিয়ে রাখে। প্রাণের ভয় তার মোটেই নেই—মরণের পথেই সে পা বাড়িয়ে আছে—যে কোনো দিন তাকে গ্রাস করবে।

পরের দিন সকালে উঠেই রঘুয়া তড়িঘড়ি তার নিত্যকর্ম সমাধা করে ভোরের গাড়ি পাস করিয়ে হরকিষেণকে ডেকে বলে, ঘণ্টা দুয়েকের জন্য সে বেরুচ্ছে। তার অবর্তমানে সে যেন ঠিকমতো কাজ চালিয়ে নেয়। ছোটবাবু তার খোঁজ করলেই যেন বলে—সবে বেরিয়েছে। রঘুয়া প্লাটফরমের গেট দিয়ে না বেরিয়ে সোজা রেল লাইন ধরে দক্ষিণ মুখী হাঁটতে থাকে। গুমটি পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়েই মাঠে নেমে বুড়ো শিবতলা বরাবর এগোতে থাকে। আশ্বিনের শেষ—রৌদ্রের প্রখরতা কম। মাঠের ঘাসে আর কাটা ধানের গোড়া তখনও শিশির-ভেজা। দূরে মাঠের শেষে খাড়া বট গাছটা পাতলা কুয়াশায় ঘেরা জটী বুড়ির মতো দেখাচ্ছে। পেছন দিক থেকে লতাপাতা ঘেরা আর নানা কাঁটা গাছের ভেতর দিয়ে গাছ তলায় পৌঁছবার রঘুয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অগত্যা তাকে দূরে সামনের দিক দিয়ে চলা পথে বুড়ো শিবের থানে পৌঁছতে হয়। বিরাট বট গাছের তলাটা জন প্রাণী বিহীন। রঘুয়া বটের ঝুরিগুলির আড়াল আবডাল তন্ন তন্ন করে খোঁজে—কেউ কোথাও নেই—সর্বত্রই শ্মশানের মতো একটা ভয়াল নিস্তব্ধ, নির্জনতা। ঘুরতে

ঘুরতে রঘুয়া ভাঙা হাঁ করা সিঁড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। দূরে দীঘির বিপরীত পাড়ে গরু বাছুর চরছে, কিন্তু তাদের পালক—রাখালদের দেখা নেই। হৃত-আশ রঘুয়া ফিরে এসে গাছতলার বেদীর ওপর বসে পড়ে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। আর তো অপেক্ষা করা যায় না—কি আশা নিয়েই বা সে অপেক্ষা করবে! তবে কি যা শুনেছে সবই মিথ্যা—গুজব মাত্র। ভগ্ন হৃদয়ে সে বুড়ো শিবতলা ত্যাগ করে।

স্টেশনে ফিরে যেতে যেতে রঘুয়া ভাবে ঘটনাটা শুধু অলীক এবং গুজবও বা হয় কি করে। সে তো নিজের চোখে মোতিয়া আর কাল্লুকে ভৈরব ভৈরবী বেশে যাত্রীদের মধ্যে দেখেছে। যদিও বহু বৎসর পর ক্ষণেকের তরে হঠাৎ দেখা তাতেও তার ভুল হবার কথা নয়—এরা দু'জন যে তার স্মৃতিতে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে—চক্ষু বুজলেই এদের জলজ্বলে মূর্তিতে দেখতে পায়। তবুও প্রশ্ন জাগে—মোতিয়াই যে এই ভৈরবী তারও বা প্রমাণ কি? বহু ভৈরব ভৈরবীই তো মেলা উপলক্ষে এখানে এসেছে। সে জন্যই তো চাক্ষুষ দেখে সন্দেহের নিরসন একান্ত আবশ্যক।

এইরূপ নানা চিন্তা ভাবনায় প্রপীড়িত রঘুয়া স্টেশনে আসা মাত্রই হরকিষেণ জানায়—ছোটবাবু তাকে না-পেয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ করেছেন। রঘুয়া তার কথার কোন জবাব না দিয়ে ছোটবাবুর সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। তাকে দেখেই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন—তোর মতলব খানা কি বলতো? কি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে কার পিছু ধাওয়া করছিস? সর্বদাই উড়ু উড়ু ভাব! অথচ বারবার বলেছি না-বলে-কয়ে স্টেশনের বাইরে যাবি না। কখন কি হাঙ্গামা হুজ্জত হয়! চুপ করে আছিস কেন—বল, কথা বল হতভাগা!

রঘুয়া মাথা নিচু করে চুপ করেই আছে। তার হতভাগ্য জীবনের মর্মন্তুদ ঘটনাবলী তো কাউকে বলবার নয়—চক্ষু ফেটে তার জল আসে। নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা নিচু অবস্থাতেই বলে—ব্যাপার অনেক বাবু—খুবই গুরুতর। আমার জীবন মরণ সমস্যা। আপনি তা বুঝবেন না। একমাত্র বহিনজী বুঝতে পারেন। কেবল তাকেই বলা যায়। তিনি গরীবের দুঃখ বেদনা বোঝেন—পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেন। গফুর তো তা বলে শেষ করতে পারে না।

ছোটবাবু রঘুয়ার কথার গুরুত্ব অনুভব করে বলে—বেশ তো। তাই

যদি বুঝে থাকিস তবে তাঁর কাছে যা—একদিনের ছুটি, রেলের পাশ আর ঠিকানা নিয়ে তার কাছে চলে যা।

রঘুয়া ছোটবাবুর কথা শুনে প্রথমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। পরমুহূর্তে শহরের কথা মনে হতেই কেমন যেন চুপ্‌সে যায়। ছোটবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলে—বড্ড ভয় করে। শুনেছি সে বড় পেঁচানো জটিল জায়গা—কেউ কারো ধার ধারে না। কথার জবাব পর্যন্ত দেয় না। সকলেই দরবড়ে ঘোড়ার মত—ছুটে চলেছে। অতবড় অমন জায়গায় আর গাড়ি ঘোড়ার মেলে হারিয়ে যাব বাবু, হারিয়ে যাব!

ছোটবাবু হেসে ফেলেন—তা হলে তো কবে তিনি আসবেন—ততদিন অবধি অপেক্ষা করে থাক। কিন্তু মোদ্দা কথা—যা বলো তাই বলো—আর যাই করো—না বলে কয়ে কখনো স্টেশন ছাড়বে না—আবারও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি!

ছোটবাবুর শেষ কথা শুনে কিছু না বলেই রঘুয়া বেরিয়ে যায়। তবে তাঁর কথার অর্থ সে বুঝে নিয়েছে। দিন রাত যে কোন সময়েই হোক তাঁকে না-বলে আর বের হবার যো রইল না। এখন সে কি করবে! শ্যাম রাখবে, না কুল রাখবে।— চাকুরি রাখবে, না ইস্তফা দেবে? চাকুরি ছাড়ার কথা মনে হতেই সে ভয়ে আঁৎকে উঠে। এই চাকুরির সন্ধানে বেরিয়েই তো তার যত দুঃখ দুর্দশা—মা, বউ ঘর বাড়ি হারিয়ে পরবাসী হয়ে কত কষ্টই না ভোগ করেছে ও করছে! এখন সে নিজের দুঃখের কথা বলে কার পরামর্শ নেবে? হায় হায়, এই সময়ে—তার জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে সে যদি বহিনজীর দেখা পেতো! হায় ভগবান, বাৎলে দাও এখন সে কি করবে?

এভাবেই আপশোষ আর আক্ষেপের মধ্যে রঘুয়ার দিনের কর্ম সমাধা হয়। কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। রাত্রি আসে। যথা রীতি কাজ করে যায় বটে, কিন্তু রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন তার শ্মশানে যাবার জন্য উচাটন হয়ে উঠে। ডাক গাড়ি চলে যেতেই সে ষষ্ঠীকে পাকড়াও করে। একান্তে টেনে নিয়ে হরকিষেণ কথিত সমাচারের সত্যতা যাচাই করে।

—হাঁ, তাকে রাতে শ্মশানে আর দিনে—শনি মঙ্গলবারে—নাকি বাবার থানে দেখা যায়। তা ছাড়া কে যেন বলছিল ইতিমধ্যে শ্মশানে পাকা ঘর উঠেছে। সামনের অমাবস্যা রাতে সেখানে কালি প্রতিষ্ঠা হবে।

পাশেই আর একখানা ছোট ঘর তৈরি হয়েছে। ভৈরবী—দেবীর সেবায়েত হয়ে সেখানে বাস করবে। জমিদারবাবু নাকি সেবায়েতের জন্য মাসোহারার কথাও ঘোষণা করেছেন।

—খুব ভালো কথা। জানতো আমি সাধু সন্ন্যাসীদের খেদমত করে আনন্দ পাই। সুতরাং চলো না সামনের অমাবস্যা রাতে উভয়েই এক সঙ্গে শ্মশানে যাই। কালি প্রতিষ্ঠার সমারোহ আর ভৈরবী দর্শন—একই সঙ্গে ধর্মকর্ম এবং পুণ্যার্জন হবে।

ষষ্ঠী সানন্দে তার সম্মতি জানায়। রঘুয়া খুশী হয়ে বলে—অমাবস্যাটা কবে আমাকে জানিও ভাই। পরদিন রাত্রে রঘুয়ার সঙ্গে দেখা হতেই ষষ্ঠী জানায় আগামী শনিবার দুপুর রাত্রিতেই কালি পূজা।

ভৈরবী সন্দর্শনের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পর রঘুয়ার মধ্যে যেন উৎসাহ উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর—সুদীর্ঘকালের অধীর প্রতীক্ষার অবসানের পর সে যেন পিয়া-মিলনে চলেছে। মোতিয়ার সহবাসে অতীত যৌবনের মধুময় দিনগুলির সুখ-স্মৃতিতে সে ভেসে চলেছে—লুপ্ত যৌবন ফিরে পেয়ে সে জোয়ান হয়েছে—আর বিচ্ছেদের ভাবনা ও বিরহের আশংকা নেই।

শনিবার দিন সকালে বুড়ো শিবতলা আর রাত্রে শ্মশানে উপস্থিত হয়ে একই দিনে রঘুয়া উভয় স্থানের ভৈরবীকে দেখে সন্দেহ নিরসনের সংকল্প করে। তদনুযায়ী শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা রঘুয়া ছোটবাবুর ঘরে হাজির হয়। ছোটবাবু গত কয়েকদিন তার কাজ কর্ম দেখে ভেবেছেন—বেটা তা হলে সেবেছে—ওর কাঁধ থেকে ভূত নেমেছে! কিন্তু সন্ধ্যার পর রঘুয়াকে আবার হঠাৎ দরজায় দাঁড়ানো দেখে তাঁর মনে পূর্ব-সন্দেহ ফিরে আসে। রঘুয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তিনি আপন কাজ করে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ও ইতঃস্ততের পর রঘুয়া কাঁচুমাচু হয়ে বলে—বাবু, হাম ছুট্টি মাঙতা।

ছোটবাবু রঘুয়ার দিকে চেয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে—সেকি? তোকে তো আগেও বলেছি ছুটি নিতে হলে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্ত হেড আপিসে যাবে। ছুটি মঞ্জুর হলে পর বদলি এলেই তোর ছুট্টি।

—আজ্ঞে আমি তো সেরকম ছুটি চাইছি না। আমি কেবল আগামী কাল সকালে গাড়ি পাস করার পর থেকে বেলা ১টা অবধি আর রাত্রে ডাক গাড়ি পাস করিয়ে দিয়ে পরদিন ভোর ৫টা অবধি ছুটি চাইছি।

—দরকার হলে ছুটি অবশ্যই নিবি। তাবলে এভাবে মাঝে মাঝে কাজ কামাই করা ঠিক নয়। তোর কাঁধে যে মেছোভূত চেপেছে ভয় হয় ঐ ভূতই না শেষে গেছোভূত হয়ে তোকে লটকে দেয়। খুব সাবধান। হরকিষেণকে সব বুঝিয়ে আর ছেদিকে তালিম দিয়ে যাস।

রঘুয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ছোটবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছোটবাবুর সাবধান বাণী তার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কিনা বোঝা গেল না। তার চোখে মুখে কোন বিষণ্ণ রেখাপাত নেই। রাতের কাজ সে যথারীতি করে। পরদিন ভোরের গাড়ি চলে যেতেই রঘুয়া হরকিষেণ ও ছেদিকে কাজ কর্ম সব বুঝিয়ে দিয়ে ফাব না ফেরা পর্যন্ত সব ঠিক মত করবার হুকুম দিয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে যায়।

আগের দিনের পথ অনুসরণ করেই রঘুয়া বুড়ো শিবতলার দিকে এগোতে থাকে। দূর থেকেই শঙ্খ, ঘণ্টা কাঁসর বাদ্যি ও উলুধ্বনি তার কানে আসছে। গাছ তলায় পৌঁছে দেখে সেখানে মেলার ভিড়। সারাটা চত্বর জুড়ে পূজা অর্চনা চলেছে। অসংখ্য বটের ঝুড়ির মাঝে মাটির বেদির ওপর ধার ঘেঁষে উত্তর-মুখী হয়ে কপালে সিঁদুর-লিপ্ত লাল পাড় রক্তবস্ত্র পরিহিতা রুক্ষ-কেশী এক ভৈরবী বসে। দু'হাতে এবং গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা—বাঁ পাশে সিন্দুর-লিপ্ত মাটিতে পোঁতা একটা ত্রিশূল। কিছু দূরে গাছের গোড়ায় নানা আকারের শিলাগুলি ফুল বেলপাতায় ঢাকা। পূজা অন্তে বাচ্চা কোলে মায়েরা ভৈরবীর সামনে এসে দাঁড়াতেই সে মায়ের হাত থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে কোলে বসিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে। তারপর পাশের ত্রিশূল থেকে সিঁদুর নিয়ে বাচ্চাটাকে ফোঁটা দিয়ে তাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। বয়স্ক ছেলে মেয়েরা মায়ের হাত ধরে ভৈরবীর সামনে গিয়ে বেদিতে প্রণাম করে। ভৈরবী তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। সকলেই ফল মূল কিংবা অর্থ—যে যা এনেছে ভৈরবীর সম্মুখে রেখে প্রণাম করে সরে যায়।

ভৈরবীর মুখ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না। রঘুয়া এগিয়ে যাবার জন্য অস্থির কিন্তু মেয়েদের ঠেলে এগিয়ে যেতে পারছে না। অগত্যা সকলের পিছুপিছু সেও এগিয়ে চলে। ভৈরবীর সামনে গিয়ে বেদীতে প্রণাম করে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ক্রমে ক্রমে সরে আসে। রঘুয়ার

সারা শরীর এক অভূতপূর্ব পুলকে রোমাঞ্চিত। একান্ত পরিচিত সেই নাক মুখ চোখ। কপালের ডান দিকে চুলের নিচে একটা কাটা দাগ— ছোটবেলা আছাড় খেয়ে কেটে গিয়েছিল। এতদিন পরে—যেন বহু যুগ পেরিয়ে এসে সে তার হারানিধির দর্শন পেল। কিন্তু আশ্চর্য, রঘুয়া যখন বেদিতে প্রণাম করার পর অনিমেষ নয়নে ভৈরবীর মুখের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায় তখন তার মনে হয় ভৈরবীও বুঝি তাকে লক্ষ্য করেছে। হয়ত চিনতে পারেনি। এই বয়সে, এতদিন অদেখার পরে এত মেয়ে পুরুষের মধ্যে—বিশেষত এই দাড়ি গোঁফ সহ তাকে চেনা মোতিয়ার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মোতিয়া হয়ত ধরেই নিয়েছে রঘুয়া আর বেঁচে নেই—সে তার বাপের পথই অনুসরণ করেছে।

মানতকারীরা ভৈরবীর আশীর্বাদ কুড়িয়ে একে একে গাছতলা ত্যাগ করছে। সারাটা চত্বর প্রায় খালি। এই অবস্থায় মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকা খুবই দৃষ্টি-কটু। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ তখনও অদূরে বসে একত্রে খাওয়া দাওয়া করছে। এই পরিস্থিতিতে রঘুয়ার প্রচণ্ড বাসনা জাগে ভৈরবীর সম্মুখে গিয়ে অতীত যৌবনের রাধা-কৃষ্ণের খেলার মতো বেদীর নিকট হাঁটুগেড়ে বসে প্রেমভিক্ষার ছলে আত্মপরিচয় দিয়ে বলে—মোতিয়া আমি এসেছি, চেয়ে দেখ—আমি রঘুয়া। বহুদিন পর বহু দুঃখ কষ্ট ভুগে তোমার সম্মুখে উপস্থিত—আমাকে গ্রহণ কর। তার চক্ষু ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করে রঘুয়া বটের ঝুড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য ভৈরবী কি করে, কোথায় যায় অলক্ষ্যে থেকে তা লক্ষ্য করা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক রাখাল বালক এসে ভৈরবীর সামনে দাঁড়ায়। সে তার কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে ফল মূল টাকা পয়সা সব বাঁধে। ভৈরবী ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে বুড়ো বটের দিকে এগিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। মোতিয়ার হাঁটাচলা দেখে রঘুয়ার মনে হয় সে যেন খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত। অতঃপর ভৈরবী রাখাল বালকের পিছু পিছু বেদী থেকে নেমে দীঘির ঘাটের দিকে এগোয়। সেখানে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। রঘুয়া ত্বরিত-গতিতে ঘাটলার ধারে এসে দাঁড়ায়। নিচের দিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। কোথাও ভৈরবী নেই! আশ্চর্য, ভোজবাজির মতো সে কোথা দিয়ে যে হাওয়া হয়ে গেল। রঘুয়া

সেখানে দাঁড়িয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেও ভৈরবীর অদৃশ্য হওয়ার গোপন পথের সন্ধান পায় না। হাজামজা বিশাল দীঘির বিরাট সিঁড়ির ধাপগুলি কোথাও বা হাঁ হয়ে, কোথাও বা কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে এক সঙ্গে অতীত ঐশ্বর্য এবং কালের অমোঘ বিধানে বিজয় ও বিনাশ ঘোষণা করছে। ভগ্ন-প্রায় দীঘির চার ধার ঝোপঝাড় আর আগাছায় ভরা। শুধু দক্ষিণ পাড়ে আর জলার ধারে কিছু ফাঁকা জায়গায় গরু বাছুর চরে বেড়াচ্ছে। কোথাও বা বসে বসে ঝিমুচ্ছে কিংবা জাবর কাটছে। রঘুয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ়—এখন সে কি করবে? উর্ধ্বপানে চেয়ে দেখে সূর্য মাঝ গগনে এসে গেছে। আর দেরী করা সমীচীন নয়। ছোট-বাবুর গালমন্দের ভয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। গাছতলা জনমনুষ্যবিহীন। ভগ্ন-চিত্ত রঘুয়া স্টেশন অভিমুখে রওনা দেয়। স্টেশনে পৌঁছে হরকিষেণের নিকট কাজকর্ম ঠিকমতো হয়েছে জেনে আশ্বস্ত হয়। বাকী দিনের কাজ কর্ম সে যন্ত্রবৎ করে যায় বটে কিন্তু মন তার পড়ে আছে হাতিচরা দীঘির ধারের ভাঙা ঘাটে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ভৈরবী বুড়ো শিবতলা কিংবা দীঘির ধারে কোথাও আস্তানা করে আছে।

রাত্রি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রঘুয়ার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়—শ্মশানে যাবার জন্য অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাতের ডাক গাড়ি চলে যেতেই সে ষষ্ঠীকে বলে—তুমি এগাও। আমি আড্ডাঘর থেকে তোমাকে ডেকে নেব। হরকিষেণের নিকট এসে বলে খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকবি ও কাজ-কর্ম করবি। ছোটবাবুর ঘরে ঘণ্টাধ্বনি হলেই ছেদিকে পাঠিয়ে তাঁকে বাসা থেকে ডেকে আনবি। কথা শেষে রঘুয়া লণ্ঠন ব্যতিরেকেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অমানিশার অন্ধকার। পথের বাধা বিঘ্ন তার চলার গতি রোধ করতে পারে না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্মশানে পৌঁছনো। পোষ্ট আপিসে এসে আড্ডাঘর থেকে ষষ্ঠীকে নিয়ে রঘুয়া শ্মশান অভিমুখে চলতে থাকে। অন্ধকারে ষষ্ঠীর হাতের লণ্ঠনের আলো তাদের চলার পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে। সুতরাং রঘুয়া ষষ্ঠীর হাত থেকে বাতিটা নিয়ে নিভিয়ে দিয়ে আগে আগে চলতে থাকে। রঘুয়ার ব্যতিব্যস্ততা ও তাড়াহুড়া দেখে ষষ্ঠী অবাক না হয়ে পারে না। কিছু না বলে সে রঘুয়ার অনুসরণ করে। দূর থেকেই শ্মশানের কলকোলাহল কানে আসছে। অন্ধকারে দিক্ নির্ণয়ের আর অসুবিধা হয় না।

শ্মশানে পৌঁছে দেখে দূরে ঝিলের ধারে তখনও দুটো চিতা জ্বলছে। গাছতলার একচালাটার নিচে কালিমূর্তিটি রাখা আছে। তার সম্মুখে ভৈরবী আসন করে চক্ষুমুদে বসে আছে। বাঁয়ে সিঁদুর লিপ্ত ত্রিশূল এবং ডাইনে ধিকি ধিকি ধুনির আগুন জ্বলছে। সকালের দেখা ছেলেটি ধুনির সামনে চুপটি করে বসে আছে। গাছতলারই কিছুটা দূরে ছিমছাম মন্দিরটি। তার লাগোয়া ছোট্ট একটি ঘর—বোধহয় সেবাইতের জন্য। জমিদার বাড়ির ঠাকুর চাকর নায়েব গোমস্তারা পূজার সব কিছু তদ্বিব তদারক করছে। জমিদারদের মেজবাবুও নাকি বিকেলে ঘোড়ায় চেপে এসে সব দেখে শুনে ঢালাও প্রসাদ বিতরণের হুকুম দিয়ে গেছেন। তদনুযায়ী মন্দিরের ভেতরে বড় বড় কলাপাতার উপর স্তূপীকৃত ফল মূল নৈবেদ্য সাজান হচ্ছে। ভিখিরি আতুর, বৈরাগী, সাধু সন্ন্যাসী, হাট বাজার ও আশপাশের গাঁয়ের লোকের জমজমাট ভিড়—বেশ বড় একটা মেলার আমেজ। মাঝে মাঝে কয়েকটা গ্যাস লণ্ঠন জ্বলছে। অদ্ভুত বিচিত্র এক পরিবেশ। রঘুয়া ষষ্ঠীব সঙ্গে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি কবে ভৈববীর সামনে আবার এসে দাঁড়ায। ভৈরবী দর্শনের জন্য খুব ভিড়। রঘুযা লক্ষ্য করছে এখান দিয়ে আগে যাবার কালে ভৈরবীকে যে-ভাবে বসে থাকতে দেখেছে এখনও সে একই ভাবে বসে আছে।—আমি আসছি, বলে ষষ্ঠী রঘুয়াকে ভৈরবীর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে যায়। রঘুয়া একটু ডাইনে সরে ভৈরবীকে এক নজবে দেখতে থাকে। অদূরবর্তী গ্যাস লণ্ঠনের আলোকে নিমীলিত, নিথর-নিষ্কম্প-নয়না ভৈরবীকে পাথর প্রতিমার মতোই মনে হচ্ছে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস দ্বারা মোতিয়া বসার কায়দাটা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। তার উপর তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা শুচি শুভ্র ভাব ও তিতিক্ষা বিরাজ করছে। রঘুয়া দেখে অবাক না হয়ে পারে না।

হঠাৎ ঢাক ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত দুই সহকারী সহ এগিয়ে আসছেন, অমাবস্যার পূজার লগ্ন আসন্ন। শ্মশান কালী প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে প্রতিমার কাঠামোটা স্পর্শ করেন। অতঃপর সহকারীদ্বয় কাঠামো ধবে প্রতিমা তুলে নিয়ে চলতে থাকে। তাদের পেছনে মন্ত্রোচ্চারণ-রত ঠাকুর, তাঁর পেছনে রাখাল বালক সহ ত্রিশূল হস্তে ভৈরবী এবং সব শেষে বাদ্যভাণ্ড চলেছে। রঘুয়া তখনো সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে—হয়ত বহুদিন আগেকার মোতিয়া

তার মানসপটে ভেসে ওঠে। ষষ্ঠীর আহ্বানে সে বর্তমানে ফিরে নিঃশব্দে তার অনুগমন করে।

পূজা আরম্ভ হয়েছে। ভৈরবী মন্দিরের ছোট্ট বারান্দাটুকুতে পূর্বের মতোই চক্ষু বুজে বসে আছে। রাত্রি গড়িয়ে চলেছে। ষষ্ঠী রঘুয়াকে উদ্দেশ্য করেই বলে কালীপূজার উপচাব উপকরণ যেরূপ জটিল আচার অনুষ্ঠানও তদরূপ দীর্ঘ সময়ব্যাপী। সুতরাং পূজা শেষ হতে ভোর হয়ে যাবে। সময়ের আন্দাজ না পেলেও ভোর হতে আর বেশি বিলম্ব নেই বলেই অনুমান হচ্ছে। ঐ শোন, গাছে গাছে কাক ডাকছে। সুতরাং তার পক্ষে অপেক্ষা করা আর সমীচীন নয়। ভোর হতেই ডাকের নানা ঝামেলা। তা শেষ হলো তো ডাকের থলি নিয়ে বেলা আটটার মধ্যেই ছুটতে হয়। এত সব বলে কালীঠাকুরকে প্রণাম করে ষষ্ঠী প্রস্থান করে।

সমাগত বৃদ্ধ প্রৌঢ়দের অনেকেই মন্দিরের সম্মুখে বিছানো শতরঞ্চিতে বসেছেন। অদূরে গাছতলায় ভিখিরি আতুর রবাহুতরা শুয়ে বসে প্রসাদ লাভের আশায় উন্মুখ উদগ্রীব। নির্জন শ্মশান প্রান্তর তাদের কলকোলাহলে সবগরম। অনেকের মতো রঘুয়াও দাঁড়িয়ে এবং যতটা সম্ভব মন্দিরের সন্নিকটে। তার একমাত্র লক্ষ্য ভৈরবী। দেবীর আরতি শুরু হয়েছে। ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনির প্রতিধ্বনি অমানিশার বুক চিড়ে প্রবল আলোড়ন তুলে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মন্দির ও কালী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভৈরবীর হঠাৎ আবির্ভাবের যোগাযোগ হেতু অনেকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। বৃক্ষশাখে পাখির কলকণ্ঠে প্রভাত-আগমনি শুরু হতেই পূজা শেষ হয়। ভৈরবী দরজার সম্মুখে কিছুক্ষণ জোর হাতে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। অতঃপর ফুল বিল্বপত্র সহ প্রসাদ নিয়ে মন্দির সংলগ্ন কুটিরে প্রবেশ করে।

ভৈববীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোন আকর্ষণ রঘুয়ার নেই। দেবীকে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে সে শ্মাশান ছেড়ে স্টেশনের পথ ধরে। অমানিশা শেষে ঊষাগমনে চতুর্দিক ক্রমেই উদ্ভাসিত। নবারুণের সোনালি কিরণে মাঠ ঘাট বাট যেন নতুন রঙে রঞ্জিত ও নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত। রঘুয়ার অন্তর কিন্তু নতুন আশায় আলোকিত নয়। যে আশা নিয়ে সে ভৈরবীর পেছনে

ঘুরছে তার মধ্যে সে বুঝি মোতিয়াকে খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কি মোতিয়া সত্যি সত্যিই ভৈরবীর মধ্যে হারিয়ে গেল! এই জিজ্ঞাসা তার অন্তরে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা তুলে তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। মন তার বিষাদে আচ্ছন্ন। হায়, হায়, এখন সে কি করবে? যার জন্য সে আজীবন কষ্ট ভোগ করছে, সুদীর্ঘকাল বৎসরের পর বৎসর যাকে সে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে—তাকে হাতের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে! চিন্তা ভাবনাক্লিষ্ট রঘুয়া সারা দিনমান যন্ত্রবৎ কাজ করে যায়। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক অদৃশ্য শক্তি তাকে চুম্বকের মতো ঐ শ্মশানের দিকে আকর্ষণ করছে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে রাতের ডাকগাড়ি পাস করিয়ে বিছানায় শুয়ে ঝিম ধরে পড়ে থাকে। চিন্তার হাত থেকে কিন্তু রেহাই নেই। একবার ভাবে ভৈরবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বলে—মোতিয়া আমি এসেছি। চেয়ে দেখ আমি রঘু—চুর্নি গাঁয়ের রঘুনন্দন। অনেককাল ছাড়াছাড়ি হয়ে আছে। আর নয়—এবার ফিরে এসো, চলো। পরমুহূর্তেই শঙ্কিত হয়—মোতিয়াকে ভৈরবীরূপে সে যে অবস্থায় দেখেছে তাতে মোতিয়া রূপে ফিরে এসে তার সঙ্গে বসবাস আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপ নানা চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়ে সে বিছানায় ছট্‌ফট্ করছে।

আচম্বিতে তার মনে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়, এক নব জিজ্ঞাসা জাগে—যদি কাল্লুর মতো সে-ও ভৈরবের ভেক ধারণ করে? তা হলে ভৈরবী রূপিণী মোতিয়ার নিশ্চয়ই তার সঙ্গে বসবাস করতে আর কোন বাধাবিপত্তি, ওজরআপত্তি থাকতে পারে না কিংবা থাকবে না। অমানিশার অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রঘুয়া এক ঝলক আশার আলোক আবিষ্কার করে উৎফুল্ল চিত্তে নিদ্রা যায়।

সকালে উঠে রঘুয়ার নিজেকে অনেক সতেজ ও স্বাভাবিক মনে হয়। গত কয়েকদিনের ক্লান্তি ও বিমর্ষভাব আর নেই। সারা দিনের কাজ কর্মের মাঝে তার একমাত্র চিন্তা—গত রাত্রের সঙ্কল্প সিদ্ধান্ত কিভাবে ফল-প্রসূ করা যায়! বিষদভাবে বিবেচনার পর স্থির মীমাংসায় পৌঁছে সে ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির। তিনি তখন টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে বাসায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। রঘুয়াকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার রঘুনন্দন?

—মেরা তো এক আর্জি হ্যায়।

—বল, কি আর্জি।

—ম্যায়নে ছুট্টি মাঙতা।

—ক্যা, ফের ছুট্টি। ওভাবে খুচরো ছুটি আর মিলবে না। ছুট্টি চাস তো দরখাস্ত কর—কতদিনের ছুট্টি এবং কবে থেকে।

কিছুক্ষণ ভেবে রঘুয়া বলে—হাম তো পুরা এক মাহিনাকা ছুট্টি মাঙতা।

ক্যা, এক মাহিনাকা ছুট্টি ? বুঝেছি তোর কাঁধে শুধু ভূত নয়, এবার এক পেত্নীও চেপেছে। তোকে ঐ বিলের জলে চুবিয়ে চুবিয়ে মারবে। ঠিক আছে, কাল বড়বাবুও বলছিলেন—ওকে খুচ্‌খাচ্‌ ছুট্টি না নিয়ে লম্বা ছুটি নিতে বলো। অনেকদিন এক নাগারে কাজ করছে—আর বয়সও বাড়ছে, অবসর নেবার সময় হয়ে আসছে।

রঘুয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি বললেন বাবু—অবসর নিতে বলছেন ?

—নারে, তা নয়। তবে অবসর নেবার বয়সও তো তোর হয়ে আসছে। ঠিক আছে কাল সকালে ভোরের গাড়ি চলে গেলে এখানে এসে দরখাস্তে টিপসই দিস—আমি লিখে রাখবো'খন। কিন্তু মনে রাখবি—ছুটি মঞ্জুর হলে বদলি না আসা অবধি ছুটি নেই। আর কোন অবস্থাতেই স্টেশন ছেড়ে যাবি না।

রঘুয়া নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছোটবাবুর কথায় অবসরের উল্লেখ তার মনে বিষম খটকা বাধে। এর মধ্যেই কি সে চাকুরিতে এত বৎসর পেরিয়ে এসেছে। অবাক লাগে—সেই কালরাত্রির পরে বানের জলের মতো ভেসে ভেসে একদিন সে এই স্টেশনে এসে পৌছে। সে-দিনের এই স্টেশনের বড়বাবু তার দুঃখের বৃত্তান্ত শুনে দয়া পরবশ হয়ে বলেছিলেন—রঘু তোকে আর কোথাও যেতে হবে না। আমার বাসায় থাক, কাজকর্ম কর, খা দা। সুযোগ পেলে তোকে রেল কোম্পানিতে চাকুরি দিয়ে দেব। বড়বাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। সে সব মনে হয়—এই তো সেদিনের কথা। যাক্ এখন ছুটি তো নিই—দেখা যাক্ কি হয়। মোতিয়াকে পেলেই আমার সব মুশকিলের আসান হবে।

পরদিন ভোরের গাড়ি চলে যেতেই রঘুয়া ছোটবাবুর ঘরে হাজির হয়। তিনি দরখাস্তে টিপসই নিয়ে বললেন—ছুটি মঞ্জুর হয়ে না-আসা অবধি তুই

হরদম হরকিষেণ ও ছেদিকে তোর হরেকরকম কাজকর্মের তালিম দিতে থাক। ধর, ছুটি মঞ্জুর হলো, কিন্তু বদলি আসছে না, তখন তুই ওদের উপর ভার দিয়ে ছুটিতে যেতে পারবি—তবে হাঁ, আমার ঝঞ্চাট ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না।

তার জন্য ভাববেন না বাবু, আমি তো এখানেই থাকবো। মাঝে মাঝে এসে দেখবো। আমার ঘরের জিনিসপত্র তো থাকছেই। বদলি এলে সেগুলি হরকিষেণের জিম্মায় থাকবে।

—সে কি ? তাহলে ছুটি নিচ্ছিস কেন ?

—সে অনেক ব্যাপার বাবু। আপনি তো আমাকে রোজ রোজ স্টেশন ছেড়ে যেতে দেবেন না। যাক, দেখবেন ছুটিটা যেন তাড়াতাড়ি মঞ্জুর হয়ে আসে, বলেই রঘুয়া বেরিয়ে যায়।

ছোটবাবুর নির্দেশ মতো রঘুয়া তার কাজকর্ম হরকিষেণ ও ছেদিকে হাতে কলমে কাজ করিয়ে নিচ্ছে বটে কিন্তু এসবে সে ক্রমেই যেন বীতস্পৃহ হয়ে উঠছে। দিনের বেলা মন তার বুড়ো শিবতলা আর রাতে শ্মশানেমশানে ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে ছুটি তার মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু বদলির কোন উল্লেখ নেই। ছোটবাবু রঘুয়াকে ডেকে বলেন তো'র ছুটি মঞ্জুর হয়েছে বটে কিন্তু বদলি আসেনি। তোর কাজকর্ম হরকিষেণ ও ছেদি কেমন চালাচ্ছে তা আজ আমি সরজমিনে তদন্ত তদারক করবো। ওরা ঠিক মতো করতে পারছে দেখলেই তোর ছুটি।

পরদিন ছোটবাবুর থেকে ছুটির হুকুম পেয়ে রঘুয়া ঘর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র একটা থলেতে ভরে ঘরে তালা এঁটে দেয়। চাবিটা ছোটবাবুর হেপাজতে রেখে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দিনটা ছিল শনিবার। স্টেশন থেকে সে সোজা বুড়ো শিবতলা গিয়ে হাজির। যথারীতি বাদ্যভাণ্ড বাজছে, পূজাআচ্চা চলছে, কিন্তু গাছতলার বেদীর উপর ভৈরবীর আসন খালি। হয়তো আসেনি, কিংবা এক্ষুনি আসবে ভেবে রঘুয়া অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত। মানতকারীরা পূজা দিয়ে একে একে দেবস্থান পরিত্যাগ করছে দেখে রঘুয়া ভাবে—তবে কি ভৈরবী তার আগেই এখানে এসে চলে গেছে। এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে ? বুড়ো শিবতলা ততক্ষণে একেবারে খালি—জন-প্রাণী নেই। রঘুয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কিছুক্ষণ গাছতলায় বেদীর উপর বসে থাকে। তারপর উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে দীঘির পাড়ে সিঁড়ির ওপর বসে।

ভাঙা সিঁড়িগুলি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে তাকে যেন গিলতে চাইছে! দীঘির ও-পাড়ে ফাঁকা জায়গায় গরুবাছুরগুলি চরে বেড়াছে—রাখালদের দেখা নেই। রঘুয়ার মনে প্রশ্ন জাগে—এই জংলা জায়গায় ভৈরবী কোথায় কিভাবে আছে? সেদিন তো সে নিজের চোখেই ভৈরবীকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছে।

অস্নাত অভুক্ত রঘুয়া ভগ্ন হৃদয় নিয়ে উঠে পড়ে। আজ থেকে তার ছুটি—স্টেশনে ফিরবার তাগিদ নেই। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সে বাজারে আসে। স্নান খাওয়াদাওয়ার পর শরীরে কিছুটা স্বস্তি ও শক্তি ফিরে আসে। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন চিন্তার আক্রমণে অশান্তি ও অস্থিরতায় উদ্বেল। ভৈরবী কি আজ শ্মশান-বাসী এবং সেজন্য বুড়ো-শিব-তলা আসেনি? নাকি তার অগোচরে সে এখান থেকে চলে গিয়েছে? তবে কি কাল্লু ফিরেছে? অবশ্য গত কয়েকদিন সে স্টেশনে লোকজনের যাতায়াতের ওপর নজর রাখতে পারে নি। খাবার দোকান থেকে বেরিয়ে বাজারের শেষ দিকে রাস্তার ধারে দশকর্ম ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ে। তীর্থযাত্রীর প্রয়োজন মতো এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ বিরল। একখানা লাল রঙীন কাপড়ও লাল ফতুয়া এবং ছুটো মোটা রুদ্রাক্ষের মালা কিনে ঝোলায় পুরে রঘুয়া বেরিয়ে যায়। পরিচিত লোকজনকে এড়াবার জন্য সে বাজার ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে কিছু দূর গিয়েই মাঠে নেমে শ্মশান মুখী এগোতে থাকে।

বেলা শেষ। অস্তগামী সূর্যের অন্তিম রক্তিম আভা সারা পশ্চিম গগনে যেন লাল আবির ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালা-গুলিতেও সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছে। রঘুয়া মাঠের মধ্যে একটা গাছতলার ঢিপির মতো জায়গায় বসে পড়ে। ঝোলা থেকে গাঁজা ও কল্কি বার করে। ধীরে ধীরে টিপে টিপে এক ছিলম গাঁজা তৈরি করে কল্কিতে রাখে। গাছের নিচের ডাল কুড়িয়ে আগুন জ্বালায়। জ্বলন্ত অঙ্গার কল্কির মাথায় চাপিয়ে টান দেয়। দ্বিতীয় টানে ধোঁয়া গিলে ফেলে। তৃতীয় টানে কল্কির মাথায় চট্‌চট্ শব্দ ওঠে; চতুর্থ টান একেবারে বুঁদ হয়ে কল্কিটা মাটিতে রেখে গাছে হেলান দিয়ে চক্ষু বোজে। ঐ অবস্থাতেই রঘুয়া ঘুমিয়ে পড়ে। নির্জন প্রান্তরে হঠাৎ বন্য প্রাণীর চিৎকারে তার নিদ্রা টুটে যায়। চক্ষু মেলে দেখে অন্ধকারে সে গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে! রাত্রি কত এবং কতক্ষণ সে এভাবে বসে

ঘুমিয়েছে তা আন্দাজ করতে পারে না। দিশে-হারার মতো সে উঠে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিছুক্ষণ পরে ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই দিক নির্ণয় করে সে শ্মশান অভিমুখে হাঁটতে থাকে। দূর থেকে হরিধ্বনি শুনেই বুঝতে পারে তার দিক-ভ্রম হয় নি।

শ্মশানে পৌঁছে দেখে ঝিলের ধারে একটা চিতা জ্বলছে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে শব দাহকারীদের উচ্চ কণ্ঠের হরিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে ধ্বনির তরঙ্গ তুলে রাতের অন্ধকারের বুক চিড়ে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ঐ শব্দ-তরঙ্গ রঘুয়ার অন্তরে আঘাত করে তাকে কেমন একটা উদাস ভাবে আচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ করে ফেলে। গাছের নিচের যাত্রী বিহীন ঘরটায় সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে অদূরে জোরে জ্বলে উঠা চিতার আগুন থেকে অসংখ্য অগ্নিকণা হাউইর মতো আকাশের গায়ে ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সেগুলি গাছের ডাল পাতায় পড়ে নিচটা ঘন অন্ধকারে এক অদ্ভুত রহস্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে।

মনের উন্মনা ভাব কাটিয়ে রঘুয়া ধীর পদক্ষেপে মন্দির অভিমুখে এগোতে থাকে। চলতে চলতে তার মনে হচ্ছে বহুযুগ পরে সে যেন আপন দয়িতার নিকট রাতের অভিসারে চলেছে। উত্তেজনায় শরীর তার ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে উঠছে—হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত তালে চলেছে—কান পাতলেই বুকের ঢিপ ঢিপ আওয়াজ শোনা যায়। রঘুয়া মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেউ কোথাও নেই। মন্দিরের ভেতরে কালীমূর্তির সামনে টিম টিম করে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। মন্দির সংলগ্ন কুটির থেকেও জনপ্রাণীর সাড়া আসছে না। রাত্রি এখন কত? তবে কি মোতিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে? দরজা কিন্তু ভেজানো—ঠেলবে কি ঠেলবে না। দাঁড়িয়ে সে ইতস্তত করতে থাকে। না, আর কিন্তু নয়। আজ তাকে মোতিয়ার নিকট আত্মপ্রকাশ করে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। রঘুয়া দরজায় আলতো ভাবে একটা ধাক্কা দেয়। কিন্তু খুলতে সাহস করছে না। যদি মোতিয়া তাকে চিনতে না পারে! স্বীকার না করে? তখন কি হবে? সে তো তা সহ্য করতে পারবে না।

এইরূপ নানা ভাবনা চিন্তায় প্রপীড়িত রঘুয়া মন্দিরের বারান্দায় বসে পড়ে। মনের মধ্যে এক নব-চিন্তার উদয় হয়—আত্মপরিচয় গোপন রেখে মোতিয়ার আশপাশ থেকে তার দেখভাল ও শাগরেদি করলে কেমন

হয়? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে ঝোলা থেকে লাল কাপড় ও ফতুয়াটা বের করে বেশ পরিবর্তন করে। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও হাতে পরে নেয়। তারপর কালীমূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রার্থনা করে—মায়ি, মেরা মনকা আশা পুরণ করো, বাঁধা বিঘ্ন নাশ করো। অদূরে শবদাহকারীদের বলো-হরি-বোল ধ্বনি সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করে এক বিচিত্র বৈরাগ্যের ভাবাবেশ সৃষ্টি করে।

রঘুয়া চক্ষু বুজে একই অবস্থায় কালীমূর্তির সামনে বসে আছে। মোতিয়ার দেখা-না-পাওয়া জনিত হতাশার মধ্যে এইটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা যে সে তার অতি নিকটেই রয়েছে। বহুকাল পরে সে এত সান্নিধ্যে এসেছে যে হাতবাড়ালেই বুঝি তাকে ছোঁয়া যায়। আত্মতুষ্টিতে ভরপুর রঘুয়া কখন যেন নিজের অজ্ঞাতেই তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়ে। কতক্ষণ সে এভাবে আছে তা জানে না। হঠাৎ অদূরে গাছের ডালে পেঁচার তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠে। তার তন্দ্রা টুটে যায়। সে উঠে বসে আত্মস্থ হয়ে ভাবে—পেঁচার কণ্ঠে এরূপ তীব্র তীক্ষ্ণ কান-ফাটা শব্দ। এ তো শব্দ নয় যেন কণ্ঠ-বিদারী তীব্র আর্তনাদ! লক্ষ্মী কিংবা হুতুম পেঁচার কণ্ঠ তো এ নয়। নির্ঘাত এ কাল-পেঁচা। সর্বনাশ, এতো মহা অশুভের পূর্বাভাস—অমঙ্গলের অগ্রদূত—এক অত্যাসন্ন মহাবিপদের পদধ্বনি!

আতঙ্কগ্রস্ত রঘুয়ার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। গাঁয়ে তাদের বাড়ির পিছনে প্রকাণ্ড এক পিপ্পল—তাতে বসে নানা পাখি দিনের বেলাটা যেরূপ তাদের কূজনে মুখরিত করত, রাত্তের অন্ধকারও সেরূপ নানা নিশাচর পাখির, বিশেষ করে পেঁচার কঠোর শ্রুতিকটু কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠতো। রাত্রিবেলা মা জেগে থাকলে কখনো কখনো পেঁচার ডাকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন—এটা লক্ষ্মী পেঁচার, ওটা হুতোম পেঁচার। এক রাত্রে মা ডেকে বললেন—ঐ শোন কাল-পেঁচার ডাক। ভীত শঙ্কিত কণ্ঠে মা বললেন—বড় অলক্ষুণে সচরাচর শোনা যায় না। শোনা গেলে বুঝবি নির্ঘাত বিপদ! সেই এক কাল-রাত্রে,—যেদিন তোর বাবা বিদেশে নোকরি করতে যায়—শুনেছিলাম। সত্যি বাবা সেই যে গেলেন আর ফেরেননি। মায়ের দুঃখ দুর্দশার আর অন্ত ছিল না। শেষে আমার অবর্তমানে হয়ত মা না-খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেলেন। এতদিন পরেও মায়ের কথা স্মরণ হতে রঘুয়ার চক্ষু ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে।

নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্য রঘুয়া ভাবে—এ কাল-পেঁচা না হয়ে অন্য কোন নাম-না-জানা নিশাচর পাখির আর্তচিৎকারও তো হতে পারে। তথাপি মায়ের সাবধান বাণী ও তার অন্তহীন দুঃখ দুর্দশার হেতু যে ঐ কাল-পেঁচার অশুভ আর্তচিৎকার তা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ফলে তার আবাল্যের সংস্কার, ঐ মন ভোলানো অন্য পাখির চিৎকারের যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়।

মোতিয়ার সান্নিধ্যের অনুভূতিটুকু তার মনে যে তৃপ্তির আমেজ বয়ে এনেছিলো তা বুঝি আর টেঁকে না। সে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার মনে এক অদ্ভুত চিন্তার উদয় হয়। এতক্ষণ ধরে সে এখানে আছে অথচ পাশের ঘরে জনপ্রাণীর কোন সাড়া শব্দ নেই! এও বা কি করে সম্ভব? এই জিজ্ঞাসা তাকে অস্থির উতলা করে তোলে। তবে কি মোতিয়া গভীর নিদ্রামগ্ন ধারণাটা তার ভুল—সে আদৌ ভেতরে নেই! এই নিদারুণ সংশয় নিরসন কল্পে সে এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করে। গাছতলার শুকনো ডালপালা পাতা ইত্যাদি মন্দির কুটির সংলগ্ন ফাঁকা জায়গাটুকুতে জড় করে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্ধকার দূরে সরে গিয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এবার দৃঢ়-চিত্তে রঘুয়া হাত বাড়িয়ে দরজাটা ছুঁয়ে হাতটা আবার টেনে আনে। বার দুয়েক এভাবে চেষ্টা করেও রঘুয়া দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলতে পারে না। অবশেষে রঘুয়া সসংকোচে নববধূর ঘোমটা খোলার মতো হাত বাড়িয়ে আস্তে দরজা খোলার চেষ্টা করে। খচ করে একটা শব্দ হতেই রঘুয়ার মনে হয় দরজাটা ভেতর থেকে অর্গলবদ্ধ নয়। পরমুহূর্তে আরও একটু জোরে ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে যায়। উঁকি দিয়ে ভেতরটা শূন্য দেখে রঘুয়া প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে যেন ছিট্‌কে পড়ে। হাত দিয়ে দরজাটা ধরে ফেলে। হৃদপিণ্ডে প্রবল স্পন্দন জাগে। হায় তার এত আশা আকাশ কুসুমের মতো শূন্যে বিলীন হলো; অতিযত্নে গড়া কল্পনার সৌধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বহুক্ষণ হাঁ-পাট খোলা দরজাটা ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। খেয়াল হতেই দরজাটা ছেড়ে দিয়ে ঘরময় ভূতে-পাওয়া লোকের মতো ঘুরে ঘুরে মোতিয়ার পরিত্যক্ত জিনিষগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মনে মনে মোতিয়ার স্পর্শ সুখ অনুভব করে।

বাকী রাতটুকু রঘুয়া একই ভাবে—এটা ছুঁয়ে, ওটা ধরে, শুয়ে বসে

আর ঘরময় অস্থির পাইচারি করে কাটিয়ে দেয়। গাছের ডালে কাকের কা-কা আর নানা পাখির কলরব শুরু হতেই ভোরের আর দেরী নেই বুঝে মোতিয়ার পরিত্যক্ত বস্ত্রের এক খণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে রঘুয়া বেরিয়ে যায়। মন্দিরের সম্মুখে এসে শুয়ে পড়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করতে করতে বলতে থাকে—মায়ী, বচপন্ সে ম্যায় বহুৎ দুঃখ কষ্ট ভোগ কিয়া। হাম কোভি সুখ নেহি মাঙতা। সব দেওতাকো চরণ মে কেবল একই প্রার্থনা কিয়া—মেরা মনকা আশ পুবণ করো, কামনা সফল করো। লেকেন কুছ্ নেহি হুয়া। মেরা জিন্দ্গী বিলকুল বরবাদ হো গয়া। আজ সে হাম্ আউব কোই দেওতাকো মেরা কোই প্রার্থনা নেহি শুনাওঙ্গি, বলেই আশা-হত রঘুয়া উঠে পড়ে মন্দির ত্যাগ করে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে চলে রঘুয়া শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হয়। শ্মশান খালি—কেবল কতগুলি জলে ভেজা পোড়া কাঠ আর আঙ্গার থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে, এদিক ওদিকে ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসি ছড়িয়ে আছে। উদাসী দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে রঘুয়া অনেকক্ষণ ধরেই বসে থাকে। সূর্যের উত্তাপ অনুভূত হতেই সে চেয়ে দেখে জলার ওধারে পাহাড়ের আড়াল থেকে তিনি উঠছেন। পেছনে একদল শববাহকের হরিধ্বনি শুনেই রঘুয়া উঠে পড়ে।

শ্মশান ছেড়ে রঘুয়া উদ্দেশ্যহীনের মতো চলতে থাকে। কিন্তু তার অবচেতন মন বুঝি তাকে নির্দিষ্ট পথে চালিত কবে বুড়ো শিবতলায় এনে হাজির করে। সেখানে পৌঁছে স্বপ্নোত্থিতের মতো তার হুঁশ হতেই সে অবাক হয়ে যায়। শনি কিংবা মঙ্গলবার তো আজ নয়। গাছতলার সারাটা চত্বর জনমানবহীন ফাঁকা। রঘুয়া বেদীর ওপর বসে। অসংখ্য পাখি গাছে বসে কলরব করছে। এ-ডাল ও-ডালে উড়ে পাকা বটফলগুলি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। অর্ধভুক্ত ফলগুলি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মতো টুপটাপ শব্দে মাটিতে পড়ছে। রঘুয়া নিশ্চুপ—মাথায় যেন কিছু নেই—একেবারে ফাঁকা। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে মাথাটা সাফ করবার উদ্দেশ্যে সে ঝোলা থেকে গাঁজা ও কল্কিটা বার করে। বহুক্ষণ ধরে টিপে গাঁজা তৈরি করে কল্কির মাথায় চাপিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গাঁজা টেনে টেনে একেবারে বুঁদ হয়ে যায়। বোজা-চোখে দেখছে মোতিয়া ভৈরবী বেশে বাঁ হাতে ত্রিশূল নিয়ে তার অদূরেই বসে আছে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই সে সট্ করে বেদী থেকে নেমে

গিয়ে দীঘির ঘাটলার ফাটল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। রঘুয়া চক্ষু মেলতে পারে না—ঝোলায় মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ে।

কতক্ষণ যাবৎ রঘুয়া ঘুমিয়ে আছে সে মনে করতে পারছে না। হঠাৎ অদ্ভুত ফোঁস ফোঁস, শোঁ সুঁই শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসে সে চতুর্দিকে তাকায়। এক বিস্ময়কর অভাবনীয় ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখে পড়ে। দেখে তার চোখের পাতা পড়ে না—বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। সে নিশ্চল কাঠ হয়ে যায়—হাত পা সুদ্ধ নাড়তে অক্ষম। যেখানে সে বসে আছে তারই অনতিদূরে, বেদীর নিচে বিরাট এক কাল সাপের সঙ্গে দুই নেউলের ভীষণ প্রাণপণ লড়াই চলছে। গাছের ফাঁক দিয়ে তির্যক সূর্যের রশ্মি লড়িয়েদের উপর পড়ে যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ আরও বিভীষিকাময় করে তুলেছে। সাপের মুখ দূরবর্তী দীঘির ঘাটলার দিকে। সাপটা চলতে শুরু করলেই এক নেউল সাপের লেজ কামড়ে টান মারে। সাপটা অমনি ছোবল মারার জন্য ভয়াল কুলো-পানা-ফণা মেলে তেড়ে আসে। নেউলটা তৎক্ষণাৎ ফুলে উঠে সুঁই শব্দে লাফ দিয়ে সরে যায়। মাথার দিকে নেউলটা তখন ফুলে উঠে সুঁই করে লাফ দিয়ে পেছন থেকে সাপের বিস্তৃত ফণাটার উপর আঘাত হেনে সরে যায়। সাপটা মাথায় আঘাত পেয়ে নেতিয়ে পড়তেই লেজের দিকের নেউলটা তৎক্ষণাৎ লেজটা কামড়ে ধরে টান দেয়। এই ভাবে দুই নেউলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সর্পরাজ একেবারে নেতিয়ে পড়ে। আর মাথা তুলতে কিংবা লেজ ঘোরাতে পারে না। সাপটার ঐ দশা দেখে উভয় নেউল তখন তাকে এক যোগে আক্রমণ করে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। অতঃপর রক্ত রাঙা মুখে নেউল-দ্বয় বিজয় গর্বে হেলে-দুলে চলে চলে অদূরবর্তী দীঘির জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আজীবন প্রচলিত সাপ নেউলের বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধের কথা রঘুয়া শুনেছে। এত বয়স অবধি তা চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য ঘটেনি। আজ অভাবনীয় ভাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উভয়ের অদ্ভুত মরণপণ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে। এক বিচিত্র বিষম অভিজ্ঞতা! রঘুয়া বেদী থেকে নেমে সাপটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দূর থেকে যা দেখেছে—সাপটা তার চাইতেও আকারে বড়—বিরাট এক বিষধর কাল সাপ। মাথাটা গলা থেকে বিচ্ছিন্ন আর লেজের দিকটা টুকরো টুকরো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। ইচ্ছা ছিল দীঘির ঘাটলাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ

ভাবে পরীক্ষা করবে এবং মোতিয়া সেদিন ওখান দিয়ে কি ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল সে রহস্যটা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে। কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকারে মৃত সর্পরাজের সঙ্গিনী হয়তো ঘাটলার কাছেপিঠে কোথাও কোনো অদৃশ্য বিবরে প্রতিশোধ নেবার জন্য ওঁত পেতে আছে। সুতরাং এই সায়ংকালে ওদিকটা মাড়ানো বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। সে কাজ আগামী দিনের জন্য মুলতুবী রেখে রঘুয়া বুড়ো-শিবতলা ত্যাগ করে।

সারা দিন অভুক্ত অস্নাত। বাজারে গিয়ে স্নানাহার সেরে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করবে। বাজারে এসে রঘুয়া স্নানাহার সেরে মোতিয়ার সাক্ষাৎ লাভের আশায় এত রাত্রেই পুনরায় শ্মশানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। যাবার পথে দোকান থেকে দুটো মোমবাতি কিছু শুকনো খাবার —রুটি বিস্কুট ইত্যাদি কিনে ঝোলায় পুরে নেয়। চলতে চলতে সে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়—এভাবে সে আর ঘুরে মরবে না। একটা হেস্তনেস্ত তাকে করতেই হবে। এই রাত্রে ভৈরবীকে শ্মশানে না পেলে আগামীকাল —মঙ্গলবার বুড়ো শিবতলা গিয়ে দেখবে মানত দিবসে ভৈরবী সেখানে উপস্থিত কিনা। অনুপস্থিত থাকলে রঘুয়া সারা দীঘির জল জংগল তোলপাড় করবে—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে—সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে সে কোথায় গেল। কোনখানে তার আস্তানা? প্রয়োজন বোধে সে রাখালদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখবে—ভৈরবীর আস্তানা খুঁজে বার করবার কোন সন্ধান তারা দিতে পারে কিনা।

শ্মশানে পৌঁছতেই ঝিলের ধারে শবদাহকরীদের হরিধ্বনি রঘুয়াকে বুঝি স্বাগত জানিয়ে পুনরায় ভব-সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন করে। রঘুয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। তার মনে ঐ ধ্বনি কোন বিবেকের সঞ্চার করেছে কিনা বোঝা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মান চাঁদ পেছনের পাহাড়ের বৃক্ষশ্রেণীর আড়াল হতে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ক্ষীণদ্যুতি বিস্তার করে এক মায়াময় কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকে রঘুয়া সরাসরি বৃক্ষতলে এসে উপস্থিত হয় এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে ধীর পদক্ষেপে মন্দিরাভিমুখী অগ্রসর হয়। মন্দির অভ্যন্তরস্থ মাটির প্রদীপটি তখনো মিটমিট করে জ্বলছে। পাশের কুটির আলো-বিহীন। রঘুয়া দরজার নিকট গিয়ে কান পাতে—যদি ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ শোনা যায়। না, সেখানে একেবারে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। তবু দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলতে রঘুয়ার সাহসে কুলোয়

না। হয়ত রঘুয়া তখনো ঘরের ভেতরে ভৈরবীর উপস্থিতি সম্পর্কে ক্ষীণ আশা পোষণ করছে। আগের রাত্রির মতোই রঘুয়া শুকনো ডালপালা পাতা একত্র করে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাইরে আগুন দেখে যদি ভেতরে সাড়া জাগে এবং ভৈরবী দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। না, রঘুয়ার এই আশাও বিফলে যায়, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর রঘুয়া মন্দির ছেড়ে কুটিরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। উৎকণ্ঠিত চিত্তে দরজাটায় ধাক্কা দিতেই শুধু ক্যাঁচ্ করে আওয়াজ হয়। তারপর জোর ধাক্কার সঙ্গেই দরজাটা খুলে যায়। চেয়ে দেখে ভেতরটা ফাঁকা, আমবাতি জ্বালিয়ে রঘুয়া ঘরে ঢোকে। আশ্চর্য গত রাত্রে ভৈরবীর যে সব জিনিষ পত্র ঘরে ছিলো তার কিছুই নেই। হতাশায় মুহ্যমান রঘুয়া সেখানেই বসে পড়ে। মনে প্রশ্ন জাগে তবে কি ভৈরবী লোটা কম্বল সব কিছু নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে? ইদানীং সে স্টেশনে থাকে না। কাল্লু ফিরেছে এবং ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে কি না এ তথ্য নির্ধারণ করাও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সুতরাং তার পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে রঘুয়া মনের উদ্বেগ চেপে রাত্রিটা এখানেই কাটাতে মনস্থ করে।

সারারাত্রি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ও অনিদ্রায় ভুগে রঘুয়া ভোরের পাখির কলরব শুরু হতেই বুড়ো শিবতলা রওনা দেয়। সূর্য সবে পাহাড়ে আড়াল থেকে ধীরে ধীরে উঠছে। মানতকারীরা তখনো কেউ আসেনি। শুধু দু'জন পুরোহিত ফুল বিল্বপত্র কোষাকুষি সাজিয়ে যজমানের অপেক্ষা করছে। তাদের বদলে রক্ত বস্ত্র পারিহিত রঘুয়াকে দেখে তাদের ভ্রুকুঞ্চন হয়। পুরোহিতদের সম্মুখে গাছতলার না-বসে রঘুয়া ঘুরে গিয়ে ঘাটলার ধারে বসে। উদ্দেশ্য ভৈরবী ঘাটলার কোথা দিয়ে উঠে আসে তা অলক্ষ্যে থেকে লক্ষ্য করা। দূরে ঢাকঢোল কাঁসর-ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মানতকারীরা সবে আসতে শুরু করেছে। রঘুয়া শ্যেন দৃষ্টিতে ভৈরবীর আশায় ঘাটলার নিচের দিকে চেয়ে আছে। বেলা বেড়ে চলছে। মানতকারীরা পূজার্চনা সাঙ্গ করে একে একে বুড়ো শিবতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভৈরবীর দেখা নেই। পুরোহিতরাও লোকজন আসার আর সম্ভাবনা নেই দেখে চালকলা নৈবেদ্য ইত্যাদি পোঁটলা বেঁধে উঠে গাছতলা ত্যাগ করে।

এখানে বসে আর অপেক্ষা করা বৃথা। ভৈরবীর আস্তানা খুঁজে বার করবার জন্য সে উঠে পড়ে। প্রথমেই সে ও-পাড়ের রাখালদের

জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বিশাল দীঘি, টিলার মতো উঁচু পাড়—মাঝেমাঝে ভাঙ্গা। জল দেখা যায় না। অসংখ্য জলজ উদ্ভিদে ঢাকা। মাঝেমাঝে শ্বেত ও লাল পদ্ম মাথা উঁচু করে উঁকি দিচ্ছে। দীঘির পাড়ের বুড়ো বটগাছের দিকটাই যেন গাছগাছড়া লতাপাতা ও ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। দীঘির ঐ পাড়টা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এবং ঘন সবুজ তৃণে ঢাকা। দিনমানে রাখালগণ গৃহপালিত পশুর পাল নিয়ে এখানে চরাতে আসে।

রঘুয়া দীঘির ও-পাড়ে যাবার আশায় বুড়ো বটের পেছনে কাঁটার জঙ্গল দিয়ে না গিয়ে সম্মুখ দিয়েই মাঠে নামে। নেমেই অবাক হয়ে দেখে দীঘির এদিকটায় কাছেপিঠে কোন গ্রাম নেই, মানুষের বসতি নেই। গাছপালা ঘেরা গ্রামগুলি দূর পাহাড়ের গায়ে যেন লেপ্টে আছে। রঘুয়া মাঠের উপর দিয়ে দীঘির পাড়ের সমান্তরাল হেঁটে চলে। পাড়ে উঠবার মতো জঙ্গলেব মধ্যে কোন পথ দেখতে পায় না। দীঘির এ-পাড় অন্য পাড়ের সঙ্গে যেখানে মিশেছে সেই কোণ বরাবর এসে জঙ্গলের ভেতর একটা হেঁটো রাস্তা তার নজরে পড়ে। তার ওপর গরু ছাগলের পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাহলে এখান দিয়েই রাখালরা গরুর পাল নিয়ে দীঘির পাড়ে যাতায়াত করে। সঙ্গে সঙ্গে রঘুয়ার মনে প্রশ্ন জাগে—বুড়োশিবের ভাঙা ঘাটলার নিচের দিকের আশপাশে নিশ্চয়ই এরকম কোন সংকীর্ণ হেঁটো পথ রয়েছে যেখান দিয়ে ভৈরবী বুড়ো-শিবতলা যাতায়াত করে এবং ঐ পথ ধরেই সে সেদিন অদৃশ্য হয়েছে! ঘাটলার আশপাশটা সেদিন আরো ভালকরে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। হায়, কি ভুলই না সে করেছে! যার জন্য তাকে অনেক খেসারত দিতে হচ্ছে ও হবে। নিজের অপদার্থতাকে ধিক্কার দিতে দিতে রঘুয়া ঐ সরু পথ ধরেই দীঘির পাড়ে উঠে আসে। এখান থেকে বুড়ো শিবতলা দেখা যাচ্ছে। লোকজন বিহীন ঘন গাছপালা-ঘেরা আলো-আঁধারি জায়গাটাকে কেমন যেন রহস্যময় ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। এপাড়ে গরু ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। কেউ পেট ভরে ঘাস খেয়ে বসে বসে জাবর কাটছে, কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ বা ঝিমোচ্ছে কিন্তু রাখালদের দেখা নেই। তারা কোথায়? এ জিজ্ঞাসা তার মনে আগেও জেগেছে যখন ও-পাড় থেকে চেয়ে রাখালদের দেখতে পায় নি। সেও তো এককালে রাখালি করেছে। গরু ছাগল ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় শুয়ে বসে থেকেছে কিংবা গাছের ডালে বসে পা ঝুলিয়ে দিয়ে কেষ্ট ঠাকুরের ভঙ্গীতে বাঁশি বাজিয়েছে। গরু

বাছুর কিন্তু চোখের আড়াল হতে দেয় নি। একবার এক ছাগল হারিয়ে গেলে কি ভাবে তাকে নাজেহাল হতে আর খেসারত দিতে হয়েছে! এতো দেখছি কেমন এক অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যাপার—গরু আছে রাখাল নেই! তা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই তারা আশেপাশে কোথাও আছে! এর জট খুলে বিষয়টার কিনারা করতে হয়।

রঘুয়া দীঘির পাড়ে একটা বড় গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য বসে। সম্মুখে প্রসারিত হাজামজা জঙ্গলাকীর্ণ বিশাল জলাশয়। বুড়োবটের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার সাপ নেউলের যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। কেন না সে দিন ঠিক এসময়েই সে ওখানে সাপ নেউলের মরণ-পণ যুদ্ধ দেখছে! সঙ্গে সঙ্গে মনে যে প্রশ্নের উদয় হয় তা হলো—এই বিষধর সর্পকুলের মধ্যে মোতিয়া কোথায় কি ভাবে বাস করছে? এখানে তার অবস্থিতি এবং রাখালদের অনবরত অনুপস্থিতির মধ্যে কোন যোগসাজশ আছে কি? থেকে থাকলে রহস্যটাই বা কী? রঘুয়া উর্ধ্বপানে তাকায়—সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। তৎপর হয়ে সে উঠে পড়ে—এখনো যে তার অনেক কাজ বাকী!

গাছতলা ছেড়ে রঘুয়া দীঘির পশ্চিম-পাড়-মুখী চলে চলে কোণ বরাবর এসে ঝোপ ঝাড়ের ভেতরে পুব দিকের মতোই একটা পায়ে চলা সরু পথ দেখতে পায়। তা ধরে সে একটা বড় মাঠের মধ্যে নেমে আসে। মাঠের ও-পাড়ে ছাড়া ছাড়া জন বসতি। রঘুয়া মাঠ দিয়ে পাড়ের সমান্তরাল কিছু দূর হেঁটে যায়। না, এ দিকেও পাড়ে উঠবার কোন রাস্তা নেই। অগত্যা সে ঘুরে ঐ কোণের পথ ধরেই আবার দীঘির পাড়ে উঠে আসে। এবার সে এ-পাড় ধরে উত্তর মুখী কিছু দূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে। সম্মুখে দীঘির পাড় অনেকখানি ভাঙ্গা এবং কাঁটার জঙ্গলে ঢাকা। পুনরায় আগের গাছ-তলাতেই সে ফিরে আসে। একটা গরুর ধারে বসে অভ্যাসবশত রঘুয়া তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে পিঠে মাথা রেখে আদার করতে করতে ভাবছে—এতক্ষণ ধরে সে এখানে আছে অথচ কোন রাখালের দেখা নেই! এ সম্পর্কে তার অন্তরে যে রহস্যের কুয়াশা দেখা দিয়েছে তা আরও ঘন ও গভীর হয়ে ওঠে। এ কুয়াশার জাল ভেদ করে তাকে অবশ্যই সত্য নিরূপণ করতে হবে।

রঘুয়া উঠে পড়ে। যে দিক দিয়ে সে প্রথমে দীঘির পাড়ে উঠেছে সে দিকেই চলতে থাকে। কোণ বরাবর এসে ঘুরে এবার পুব পাড়

ধরে উত্তরমুখী এগোয়। কিছুদূর গিয়েই জঙ্গলের মধ্যে স্পষ্ট সরু একফালি পথ আবিষ্কার করে নিদারুণ উত্তেজনায়—অব মিল গিয়া, বলেই সে লাফিয়ে উঠে ঐদিকে এগোতে থাকে। এ পথের শেষে নিশ্চয়ই মোতিয়ার আস্তানা ভেবে নিয়ে গলা ছেড়ে উচ্চকণ্ঠে মোতিয়া বলে ডাক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। না না, এ সে কি করছে। এরকম করলে সব ভেস্তে যাবে। তাকে ধৈর্য ধরে সব কিছু দেখতে হবে, বুঝতে হবে, তারপর এগোতে হবে। রঘুয়া পথের উপর নিশ্চল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুনরায় গাছতলায় ফিরে আসে।

রাখালরা যেখানেই থাকুক না কেন দিনের শেষে গরুর পাল ঘরে নিয়ে যাবার জন্য তাদের এখানে আসতেই হবে। ঝোলা থেকে এক ছিলিম গাঁজা বের করে রঘুয়া গম্ভীরভাবে আসন পেতে বসে টিপতে থাকে এবং অর্ধনিমিলিত চোখে চারদিকে নজর রাখে। গরুগুলি এখন মাঝে মাঝে ঘাস খাওয়া ছেড়ে মুখ তুলে ঘরে যাবার জন্য হাম্বা হাম্বা রবে রাখালদের ডাকছে। রঘুয়ার মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি আসে। সে ঝোলা থেকে সিঁদুর বের করে কাছে পিঠের গরুগুলির কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে যথাস্থানে এসে বসে। অবশেষে রঘুয়ার আশা ফলবতী হয়। দেখে কয়েকজন রাখাল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তার আবিষ্কৃত পথ ধরেই এদিকে আসছে। তাদের বেশভূষা রাখালদেরই মতো। সে চট্ করে ঝোলা থেকে গাঁজার কল্কিটা বের করে আনে এবং তাদের দেখতে পায়নি এমন ভাব করে একমনে গাঁজা টিপতে থাকে। দূর থেকে রঘুয়াকে দেখে তারা অবাক—এমন তো আগে কখনো এখানে দেখেনি। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কে?

রঘুয়া তাদের কথা বোঝে না—এমন ভান করে তাদের কথার জবাব না দিয়ে আশপাশে ছড়ানো কয়েকটা শুকনো ডাল নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর জ্বলন্ত আঙার কল্কের মাথায় চাপিয়ে চক্ষু বুজে জোরে টান দেয়। শেষ টান দিয়ে সে চক্ষু মেলে। দেখে ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন এসে রাখালের দল ভারি করেছে। বয়স্ক কেউ নেই তবু সে দণ্ডায়মান রাখালদের দিকে কল্কি বাড়িয়ে ধরে। সকলেই হেসে ফেলে হাত তুলে মানা করে। কিভাবে কথা শুরু করে এদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে একটা হার্দিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় রঘুয়ার মনে কেবল সেই চিন্তাই চলেছে। তদনুযায়ী রঘুয়া ঝোলা থেকে কতগুলি বিস্কুট বার

করে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—ম্যায় তো বাচ্চোকো বহুৎ পেয়ার করতা।

রাখালগণ হাত না তুলেই জিজ্ঞাসা করে—আগে বলো তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ ?

রঘুয়া এবার যেন তাদের কথা কিছুটা বুঝেছে এমন ভাব দেখিয়ে জবাব দেয়—আভি হাম থোরা কুছ সমঝা—লেকেন পহিলে তো তোম লোগ হাত বাড়াও। এবার সকলে হাত মেলে ধরে। রঘুয়া উঠে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের হাতে বিস্কুট দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—শোনো মেরে পেয়ারে বাচ্চা লোগ—ম্যায় তো মুসাফির হো—হরদম ঘুমতেই রহা। ইধার সে যানে কা বক্‌ত গৌকা ডাক শুনা পর হিয়া আ গিয়া। গৌ দেওতা হ্যায়—দেখো ম্যায় উনকো পূজা কিয়া।

রাখালদের এতক্ষণে খেয়াল হয়। তারা গরুগুলির দিকে তাকায়। ওদিকে সূর্য পাটে বসেছে। সারা পশ্চিম গগনে লাল সিঁদুরের আভায় যেন রক্তের প্লাবন। গাছপালা, লতা পাতা, গরু বাছুর, মানুষ—সবতেই যেন লালের ছোঁয়া লেগেছে। গরুগুলির কপালের সিঁদুর আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। প্রদোষের রক্তাম্বর তলে রক্তবস্ত্র পরিহিত দণ্ডায়মান রঘুয়াকে রাখালদের নিকট এক অদ্ভুত দর্শন শক্তিমান মানব বলেই বুঝি বোধ হয়।

রাখালগণ নিকটের একটা ঝোপের ভেতর থেকে পাচন-বাড়ি নিয়ে গরুগুলিকে সব একত্র করে চলবার মুখে রঘুয়াকে সম্বোধন করে বলে—সাধুবাবা, আমরা যাচ্ছি। গরু বাছুর নিয়ে আমাদের অনেকদূর যেতে হবে। আপনার সঙ্গে তো আর আমাদের দেখা হচ্ছে না।

রঘুয়া তাদের কথার চটপট জবাব দেয়—আলবৎ দেখা হোগা। হাম তো আভি ইধারই রহা যায় গা। তোমলোগ ফিকির মত করো। জরুর ফের ভেট হোগা।

রাখালগণ তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে—না, না, সাধুবাবা এখানে থাকবেন না। রাতে এ বড় বিষম খারাপ জায়গা—সাপ নেউলে যুদ্ধ করে, ভূত পেত্নী নেচে কুঁদে হল্লা করে ; পরীরা সব দীঘির পদ্মবনে কেলী করে, আর পাগলা ভোলা-বাবা ও-পাড়ে বটের তলে ডমরু বাজিয়ে শিঙা ফুকে নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে ধেই ধেই করে নৃত্য করে। খুব সাবধান বাবা। খুব সাবধান॥

রঘুয়াকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই রাখালরা পাচন-বাড়ি তুলে

হট্ হট্ করতে করতে গরুর পাল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। রঘুয়া বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আসল কথা কিছুই বলা হলো না, জানা গেল না। মনে খুব আপশোষ জাগে—চালে বুঝি আবার ভুল হলো। এখন সে কি করবে? এই ঘনায়মান অন্ধকারে ঐ সরু পথ ধরে ঝাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কি ভৈরবীর আস্তানায় আবির্ভূত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে? এর ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও তো হতে পারে? মুশকিল আসান না হয়ে আরো ঘোরালো হতে পারে। তবে একটা সান্ত্বনার বিষয় রাখলগণ ভৈরবীর আস্তানাতেই অবশ্য যাতায়াত করে এবং সারাদিনমান যে ঐ খানেই অতিবাহিত করে—এ সম্পর্কে সে স্থির নিশ্চিত। আর যে বালকটিকে ভৈরবীর সঙ্গে দেখেছে সেও এদেরই কোন আত্মজন। এই পরিস্থিতিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাখালদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন। এই সিদ্ধান্ত তার অশান্ত অস্থির চিত্তে কিছুটা শান্তি আনে, গভীর নিরাশার অন্ধকারে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দেয়।

অন্ধকার নেমে এসেছে। চতুর্দিক ঝিল্লী-মুখর। তাদের কর্কশ কণ্ঠস্বরে কান বধির হওয়ার উপক্রম। অসংখ্য জোনাকি সারাটা অঞ্চল জুড়ে ঘুরে ঘুরে নানা ঢঙে উড়ে উড়ে নৃত্য করছে। ঝিঁঝি কণ্ঠ বুঝি তাতে তাল দিচ্ছে! বিশাল দীঘির নিচে পানার উপর অসংখ্য গুচ্ছ গুচ্ছ জোনাকির ঝিকিমিকি এ-পাড় ও-পাড় ব্যাপী একটা চিকণ আভার ছটা দূর ঊর্ধ্ব গগনে পুঞ্জীভূত নক্ষত্র রচিত শুভ্র মেঘের ছায়া পথের মতোই মনে হচ্ছে। রঘুয়া তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে ও পাড়ের ডাল পাল সুদ্ধ বুড়ো বট গাছটাকে মনে হচ্ছে বিরাট এক কালো জটা রাক্ষুসী বুড়ী সব কিছু গিলবার জন্য হাঁ করে আছে। অদ্ভুত বিচিত্র পরিবেশ!

অন্ধকারে দিক্‌ভ্রমের ভয়ে রঘুয়া উঠে দাঁড়ায়। যত দূর অবধি দৃষ্টি যায়—ভাল করে লক্ষ্য করে রাখালরা যে পথে গিয়েছে সেই পথ ধরেই সে দীঘির পাড় থেকে মাঠে নেমে আসে। অভুক্ত অস্নাত রঘুয়া বাজারে এসে যখন পৌঁছে রজনীর প্রথম যাম তখন উত্তীর্ণ। পুকুরে স্নান করে শরীর অনেকটা তাজা মনে হয়। খাওয়াদাওয়ার পর স্টেশনে যাবার জন্য সে কেমন যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বিশ্রাম না করেই সে বেরিয়ে পড়ে। স্টেশনে এসে সে অবাক হয়ে যায়! সেখানের সব কিছুই যেন তার নতুন মনে হয়। এত পরিচিত—তবু মনে হয় বহু বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে সে আজ ফিরে এসেছে! কাজকর্ম সম্পর্কে হরকিষেণকে জিজ্ঞাসা করে

সে ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হয়। নমস্কার করে সামনে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কেমন আছিস? পরক্ষণেই রঘুয়ার দিকে চেয়ে তিনি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—একি তুই কাপালিক হলি নাকি?

—তা আর হতে পারছি কৈ বাবু। শুধু ঘুরে ঘুরে মরছি—আসল জিনিসের নাগাল পাচ্ছি না।

—চেষ্টা করে যা—অবশ্যই পাবি। কিন্তু আজ যে হঠাৎ এখানে? তোর ছুটি ফুরোতে তো এখনও দেরী আছে।

—তা জানি। আমি রাত্রে এখানে থাকবো বলেই এসেছি। ভোর রাত্রে কিছু জিনিসপত্র নিয়েই চলে যাব।

—ভাল। তোর ঘর তো খালিই আছে। বদলী তো এখনো অবধি আসেনি। ওরা দু'জনেই কোন রকম করে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে—আমার হয়রানি আর কি! যাক্ একটা খবর হলো—তোর বাহিনজী আজই সন্ধ্যার গাড়িতে এখানে এসেছেন। বড়বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন।

—তিনি কোথায় আছেন?

—তা তো জানি না। তবে ডাক বাংলো ছাড়া আর কোথায় উঠবেন!

রঘুয়া বেরিয়ে আসে। নিজ কোয়ার্টারে গিয়ে যা সঙ্গে নেবে সে সব গুছিয়ে শুয়ে পড়ে। বাকী রাত্রি আধো ঘুম আধো জাগরণে কাটে। রাত্রি ভোর হবার আগেই হরকিষেণকে বলে বেরিয়ে যায়। ভোরের পাখির কাকলি শুরু হতে না হতেই সে আগের পথ ধরেই দীঘির পাড়ে উঠে আসে। চতুর্দিকের ঝোপে ঝাড়ে তখনও অন্ধকার লেপ্টে আছে। আধা আলো অন্ধকারে এখন এর ভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন শোভা! দীঘির নিচের দিকটার কিছুই দৃষ্টি গোচর নয়—কালো কুয়াশার আবরণে ঢাকা। ও-পাড়ের বুড়ো বটগাছটা পাতলা কুয়াশার আবরণে একটা বিশাল স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। যে দিকেই দৃষ্টি ফেরানো যায় মনে হয় একটা কুহক জাল সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। রঘুয়া অবাক হয়ে ভাবে এই পরিবেশে মোতিয়ার দিবা রাত্রি কি ভাবে কাটে! এও তার নিকট এক রহস্য! না, আর চালে ভুল করলে চলবে না। সব রহস্যই তাকে ভেদ করতে হবে!

নানা পাখির বিচিত্র কাকলিতে উষার সম্বর্ধনা গীতি। রজনী তার

অবগুণ্ঠন খানি গুটিয়ে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে। কালো কুহকের আবরণ অপসৃত হতেই উষার এক মোহনীয় কমনীয় রূপ ফুটে উঠেছে। প্রভাত অরুণের সোনালী কিরণ গাছে গাছে পাতায় পাতায় সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওপারে বুড়ো বটের ঘন জটাজালে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা সোনালী আভায় এক বিচিত্র অনির্বচনীয় রূপ ধারণ করেছে।

রঘুয়া রাখালদের অপেক্ষায় বসে। ভোরের মোহমায়াময় নরম কোমল আমেজ সরে গিয়ে চতুর্দিক রৌদ্রে ঝলমল করছে। রৌদ্র-প্লাবনে সবুজ তৃণ লতাপাতা ঝোপ ঝাড় গাছপালা শ্যামল সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে এক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। রাখালদের দেখা নেই। কেন? তারা কি এত দেরি করেই আসে? নাকি আজ তারা আসবে না? এইরূপ নানা চিন্তা ভাবনায় রঘুয়া অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবে কি তাদের জন্য আর অপেক্ষা না করে সে একাই ঐ পথ দিয়ে নিভৃত নির্জনে মোতিয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে—মোতিয়া, আমি রঘু। কিন্তু তারপর? সে আর ভাবতে পারছে না। এমনি সময়ে দূরে হাম্বা রব শুনে সে আশ্বস্ত হয়। রাখালগণ আসছে। নিজেকে সংযত করে রঘুয়া ধ্যান স্তিমিত নেত্রে বসে থাকে।

গরুর পেছনে পেছনে আসা দূর থেকে রাখালদের দৃষ্টি সাধুর উপর পড়তেই তাদের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। নিকটবর্তী হতেই তারা লক্ষ্য করে গতকালের সাধুই একই জায়গায় একই ভাবে বসে আছেন। গরুগুলিকে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে তারা সাধুর সম্মুখে এসে গড় করে উঠে দাঁড়াতেই রঘুয়া চক্ষু মেলে হাত তুলে—জিতা রহো বেটা, পরমাত্মা সবকো ভালা করে, বলে আশীর্বাদ জানায়।

রাখালগণ কিছু না-বলে তাদের সঙ্গী বাক্স হাতে একজন বৃদ্ধকে নিয়ে ব্যস্ত সমস্তভাবে পুব-পাড়ের সরু পথ ধরে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার সম্মুখে না দাঁড়িয়ে রাখলদের তড়িঘড়ি প্রস্থান প্রথমে রঘুয়ার মনে কোন সন্দেহের ছায়াপাত করে নি। কিন্তু যতই সে রাখালদের সঙ্গে বাক্স হাতে বৃদ্ধের সম্বন্ধ নিয়ে চিন্তা করে ততই বিষয়টা তার নিকট অদ্ভুত খাপছাড়া গোলমেলে বলেই মনে হয়। বাক্স হাতে বৃদ্ধকে হেকিম কিংবা কবিরাজ বলে ধারণা হতেই একটা অশুভ চিন্তা রঘুয়ার মনের কোণে উঁকি দিতে থাকে। এর উপস্থিতির সঙ্গে ভৈরবীর অনুপস্থিতির যোগফল তার অসুস্থতা প্রমাণ করে না কি? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই

রঘুয়া অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। হায়, কেন ভৈরবীর অনুপস্থিতিটা অসুস্থতার কারণ বলে আগে তার মনে আসে নি। নিজেকে সে ধিক্কার দিতে থাকে। অনেক চিন্তার পর সে তার পরবর্তী কার্যক্রমের একটা ছক কেটে উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা নিয়ে বৃদ্ধের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করতে থাকে।

এই অবসরে রঘুয়া হঠাৎ আসন ছেড়ে কতগুলি ঘাস ছিঁড়ে একটা গোছা বানিয়ে নিকটবর্তী গরুটার কাছে গিয়ে আদর করে ঘাস খাইয়ে খাইয়ে সেটাকে তার আসনের নিকট নিয়ে আসে। গরুটা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ঘাস চিবোতে থাকে। তারপর রঘুয়া ঝোলা থেকে বিস্কুট বার করে ওটাকে খেতে দেয়। খেতে খেতে গরুটা তার আসনের পাশেই বসে পড়ে। রঘুয়া গরুটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছে কিন্তু দৃষ্টি তার সর্বক্ষণ দীঘির পুব-পাড়ের সরু পথের উপর নিবদ্ধ। বাক্স হাতে বুড়ো লোকটি কখন ফিরে আসে এই চিন্তায় সে অস্থির উদ্‌বিগ্ন। অনেকক্ষণ এই ভাবে হাঁপিত্যেশ করে বসে থাকাব পর রঘুয়ার আশা ফলবতী হয়—বৃদ্ধ দু'জন রাখালের সঙ্গে এদিকেই আসছে। নিকটবর্তী হতেই রঘুযা ধ্যান স্তিমিত নেত্রে—জয়সীয়া রাম, হর হর বোম্ বোম্, বলে আশীর্বাদ জানিয়ে চক্ষু মেলে বৃদ্ধকে হাত ইশারায় কাছে ডাকে। লোকটা কাছে আসতেই রঘুয়া তার চোখে চোখ রেখে বলে—দেখো হাকিম বাবা, ম্যায় সব কুছ্ জানতা, সমঝতা— মালুম হ্যায়, মামলা বহুত খতরনক্ হ্যায়, তোম বিলকুল থক্ গিয়া।

বৃদ্ধ অতসব কট্‌মটে হিন্দি না বুঝলেও এটুকু বুঝেছে যে মামলা খারাপ, বেমারি কঠিন। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—হাঁ বাবা, বেমারি বহুত খারাপ, আমি কিছু করতে পারলাম না। আপনি দেখুন—মন্ত্রতন্ত্র পড়ে, ঝাড়ফুঁক করে কিছু করতে পারেন কিনা। কথা শেষে রাখালদের দিকে চেয়ে বলে—সাধুবাবাকে নিয়ে দেখা, আমি চললুম।

বৃদ্ধ হাকিমের কথা শুনে রঘুয়া হতভম্ব। সর্বনাশ, এ কি বলছে! মোতিয়া কি তবে খুবই কঠিন রোগে আক্রান্ত? হায় হায় এখন আমি কি করি? অন্তরে তার কান্না গুমরে উঠছে। নিজেকে শক্ত করে রাখালদের কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বলে—চলো বাচ্চা। আসন গুটিয়ে, ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে গরুটাকে আদর করে রঘুয়া রাখালদের অনুসরণ করে।

বহুকাল পর আশা নিরাশা বিষাদ বেদনা ভরা হৃদয় নিয়ে রঘুয়া হারিয়ে যাওয়া দয়িতা সন্দর্শনে চলেছে। যুগপৎ ব্যথা বেদনা উত্তেজনায় সে কাঁপছে—নিজেকে বুঝি সে আর সামলাতে পারছে না। না, না, ভালো মন্দ যে অবস্থাতেই সে মোতিয়াকে দেখুক না কেন—রাখালদের নিকট তার সাধুবাবা সিদ্ধবাবার ভোল বজায় রাখতেই হবে। চালে ভুল হলে বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়।

রঘুয়া পর্ণকুটিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আলুলায়িতকুন্তলা মেজেতে শায়িতা মুমূর্ষা ভৈরবী যে মোতিয়া এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। রাখালগণ তার চতুর্দিক ঘিরে—কেউ হাতের তেলো, কেউ বা পায়ের পাতা ঘষছে। কেউ বা মাতাজী মাতাজী বলে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকছে, কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সহজ সরল রাখালগণের মোতিয়াকে ঘিরে এই অবস্থায় সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এক অভাবনীয় মর্মস্পর্শী দৃশ্য! রঘুয়া নিজেও যারপরনাই বিচলিত—তফাৎ থেকে ঠিক বুঝতে পারছে না, মোতিয়া অজ্ঞান না মৃত। ব্যথায় ভরা অন্তরের হাহাকার অতিকষ্টে সামলে নিয়ে সে ধীর পদক্ষেপে মোতিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। রাখালগণ তাকে জায়গা করে দেয়। মোতিয়ার শিয়রে বসে রঘুয়া তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। সারা মুখ তার পাংশুবর্ণ, —দৃষ্টি ভাব-লেশহীন। মোতিয়ার হাত খানা ধরতে গিয়ে তার হাত কেঁপে ওঠে। হাতের কাঁপুনি এতই জোরে হচ্ছে যে সে কিছুতেই মোতিয়ার হাত খানা তুলে ধরতে পারছে না। রাখালদের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। অগত্যা কম্পিত হাত খানা মোতিয়ার মাথায় রেখে কিছুক্ষণ অনুচ্চ কণ্ঠে ইষ্টদেবের নাম বিড় বিড় করে। হাতের কাঁপুনি কিছুটা কমতেই ডাক্তার কোব্‌রেজের অনুকরণে মোতিয়ার হাতখানা সযত্নে তুলে ধরে শিরা ও নাকের কাছে হাত নিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনুভব করে। তার পর পেটের উপর হাত রাখতেই তার সারা শরীর সিড়-সিড় করে ওঠে। হাত সরিয়ে নিয়ে পুনরায় মোতিয়ার মাথার উপর রেখে এক দৃষ্টে তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চলন লক্ষ্য করছে।

এরূপ বিপৎকালে কি করা উচিত সে বিষয়ে সে নিজেও রাখালদের মতোই অজ্ঞ। তবে এটা সে বুঝতে পারছে যে মোতিয়ার জীবনের স্পন্দন ক্ষীণতর—যে কোন মুহূর্তের ফুৎকারে তার জীবন দীপ নিবে যেতে পারে। মোতিয়ার মাথা থেকে হাত সরিয়ে পুনরায় তার হাতের শিরা ধরে রঘুয়া

মোতিয়ার জীবনের রক্ত মাংসের শেষ উষ্ণ স্পন্দন বুঝি অনুভব করতে থাকে। ভেতরটা তার দুঃখশোকের অনলে পুড়ে যাচ্ছে। অন্তরের হাহাকার সে বুঝি আর চেপে রাখতে পারছে না। চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে—মোতিয়া জাগো, চক্ষু মেলে দেখ আমি—চুর্ণি গাঁয়ের রঘু, রঘুনন্দন ফিরে এসেছি। আর তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না, আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। এতক্ষণের চাপা রুদ্ধ অশ্রু চক্ষু ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়—তার নকল সাজ বুঝি খান খান হয়ে যায়। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করে রঘুয়া রাখালদের মধ্যে বয়স্ক একজনকে হাত ইশারায় কাছে ডেকে বলে—দেখো উনকা হুঁশ লোটনেকা বারেমে ম্যায় তো পরমাত্মাসে দোয়া মাঙতে রহা। লেকেন ইনকা বেমারিকা হাল তোম লোগকো জরুর আচ্ছা মালুম হ্যায়। সবকুছ্ বোলকে কোই ডাক্তারকো বোলাকে লে আও। রূপিয়াকা ফিকর মৎ করো—ম্যায় জিম্মাদার হুঁ।

রাখাল রঘুয়ার মুখের দিকে চেয়ে বলে—এজন্যই তো সকাল বেলা গ্রাম থেকে একজন ভাল কোবরেজ নিয়ে এসেছিলাম। তিনি তো মাতাজীকে দেখে—কিছু করবার নেই, বলে চলে গেলেন।

—শোনো, কোবরেজ নেহি, হাম ডাক্‌দার মাঙতা—যো নল লাগানে, সুঁই ফোঁড়নে সক্‌তা। এয়সা এক ডাক্তার বোলাকে লে আও।

—ঠিক আছে বাবা। শুনেছি বাজারে একজন বড় ডাক্তার আছেন। সেখানেই যাচ্ছি—পেলে তাকে অবশ্যই নিয়ে আসবো।

রঘুয়া মোতিয়ার হাত ধরে চক্ষু মুদে বসে আছে। হঠাৎ হাতখানা আলগোছে রেখে ঝোলা থেকে রক্তচন্দনের গুঁড়ো বের করে জলে গুলে নিয়ে ভৈরবীর কপালে একটা ত্রিশূল এঁকে দেয়। তার পর মাথায় হাত রেখে—জয় সীয়ারাম, জয় শিব শংকর ধ্বনি দেয়। হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ করে মোতিয়া নড়েচড়ে ক্ষণেকের জন্য একবার চক্ষু মেলে। সঙ্গে সঙ্গে রাখালগণ হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসে ডাকতে থাকে—মাতাজী দেখো, চক্ষু মেলে দেখো আমরা এয়েছি। তাদের মধ্য থেকেই ছোট একটি ছেলে দৌড়ে জল নিয়ে এসে ডাকে—মাতাজী, মাতাজী দেখ আমি লেংচা—পানি পিয়ো। লেংচার কণ্ঠ স্বরে বুঝি মোতিয়ার হুঁশ হয়। একটু খানি চেয়ে হাঁ করে। লেংচা মুখে একটু একটু জল ঢালে। মোতিয়া হয়তো কিছুটা গলাধকরণ করে বাকীটা তার মুখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। লেংচা হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে।

মোতিয়ার জন্য রাখালবালকদের কান্নার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারও কাঁদতে ইচ্ছা করছে। তাদের মতো কাঁদতে পারলে তার হৃদয়ের ব্যথার ভার অনেকটা লাঘব হতো। কিন্তু সে তো তা পারছে না! ঝোলা থেকে লাল একখানা চাদর বের করে রঘুয়া মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধে। তারপর মোতিয়ার মাথায় হাত রেখে কিছুটা জোরে জোরে—জয় রঘুনন্দন, জয় সীয়ারাম বলতে থাকে। রঘুয়ার মনে হলো মোতিয়া একবার চক্ষু মেলে একটু দেখলো। সেই মুহূর্তে কানের কাছে মুখ নিয়ে রঘুয়ার মোতিয়াকে নাম ধরে ডাকবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু আচম্বিতে নিজের নাম শুনে উত্তেজনা হেতু চরম বিপদের ভয়ে রঘুয়া চুপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চুপ করে থেকে রঘুয়া পুনরায় মোতিয়ার হাত ধরে শিরা এবং নাকের কাছে হাত নিয়ে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অনুভব করে। উভয়ের অবস্থা আগের মতোই মনে হয়।

রঘুয়া এবার উঠে দাঁড়ায়। ঝোলা থেকে টাকা বের করে কাছের বালকটিকে ডেকে বলে—ইয়ে রূপিয়া ডাক্তার কো আর ইয়ে দাওয়াইকা ওয়াস্তে। সাধুর সহৃদয়তা ও বদান্যতায় মুগ্ধ রাখাল হাত পেতে টাকা নিয়ে ভক্তিভরে গড় করে উঠে দাঁড়ায়। অন্য সকলের দৃষ্টিও তার উপর নিবদ্ধ ও শ্রদ্ধাবনত।

বেলা বেড়ে চলেছে। মোতিয়া একই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। মাঝখানে ক্ষণিকের জন্য যে চেতনা এসেছিলো তা আর ফেরেনি। রাখালগণ আগের মতোই মোতিয়ার হাত আর পায়ের তেলো ঘষে চলেছে। তাদের বিশ্বাস ঘর্ষণ জনিত উত্তাপে মাতাজীর চৈতন্য ফিরে আসবে। আর অস্থির উদ্বিগ্ন চিত্তে রঘুয়া মোতিয়ার শয্যা থেকে একটু দূরে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসে ডাক্তারের অপেক্ষা করছে। ডাক্তার থেকে পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে সে আগেই মাথায় একটা লাল পাগড়ি বেঁধেছে। এখন পাগড়ির লেজটা মাথার পেছন থেকে কাঁধের উপর এনে মুখ অর্ধাবৃত করেছে।

প্রতীক্ষিত ডাক্তারবাবু এলেন। তিনি রোগিনীকে ভাল করেই পরীক্ষা করেন। রোগিনী কোন অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় এসেছে তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। ছেলেটির সবই যেন মুখস্থ। তৎপরতার সঙ্গে যথাযথ উত্তর দিয়ে ছেলেটি ভৈরবীর ঝোলা থেকে একখানা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র ডাক্তারকে দেয়। ডাক্তার কাগজখানা দেখে কেমন যেন বিমর্ষ

হয়ে যান। তবুও তিনি বলেন—রোগিনীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেলাইন দেওয়া দরকার। তা তো এখন সম্ভব হচ্ছে না। যা হোক, আমি একটা ইনজেকশন্ দিয়ে যাচ্ছি। রোগিনী ভাল মন্দ যে অবস্থায় থাকুক আগামী কাল সকালে খবর দেবে। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো। ঐ কাগজে লেখা বড়ি থাকলে রোগিনীর জ্ঞান ফিরলে ব্যথা উপশমের জন্য একটা বড়ি দেবে। ইন্জেকশনের পর ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মোতিয়ার হার্ট এবং হাতের শিরা পুনরায় পরীক্ষা করে ভাল মন্দ কিছু না বলেই পারিশ্রমিক নিয়ে যেতে উদ্যত হতেই ছেলেটিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

রঘুয়া অদূরে বসে স্তিমিত নেত্রে ডাক্তারের বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শোনে এবং আড়চোখে তাঁর প্রতিটি কর্ম লক্ষ্য করে। তিনি প্রস্থান করতেই রঘুয়া তার পূর্ব স্থানে—মোতিয়ার শিয়রে এসে বসে তার হাতের শিরা ও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অনুভব করে। কিন্তু আগের তুলনায় উভয়ের কোন হেরফের হয়েছে বলে রঘুয়ার মনে হয় না। ডাক্তারের ইন্জেকশনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে কিছু বোঝা কিংবা দেখা যাচ্ছে না। যে কাগজখানা দেখে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে যায় সেটা দেখাও তার দরকার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রঘুয়া আসন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ছোট্ট কুটিরটির অবস্থান দেখে রঘুয়া অবাক! দীঘির পাড় কেটে মাঝখানটার ঝোপঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে একটা প্রশস্ত চত্বরের উপর কুটিরটি তৈরি করা হয়েছে। সামনে, পেছনে এবং দু'পাশে অনেকখানি করে ফাঁকা জায়গা। নিচ থেকে উপরে উঠবার জন্য মাটির ধাপ আর দীঘি থেকে জল আনবার জন্যও ডান দিকে বেঁকে গিয়ে একটা ঘাটও তৈরি করা হয়েছে। মোতিয়ার জন্য রাখাল ছেলেগুলির কর্ম ও প্রচেষ্টা তাদের সত্যিকারের প্রাণের টানের জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

ভৈরবীর নিকট রাত্রিতে যে সব রাখাল থাকবে তারা এসেছে। বাকীরা সব ঘর যাবার জন্য তৈরি। সকলেই ভৈরবীর চারধার ঘুরে প্রণাম করে। মুখ তাদের বিষাদে মলিন। কথা বার্তা কেউ বলে না। কলের পুতুলের মতো নিঃশব্দ নীরবে তারা বেরিয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল বাঁধিয়েছে লেংচা। সে কিছুতেই ভৈরবীকে ছেড়ে যাবে না। ভীষণ কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য। রঘুয়া মোতিয়ার পাশ থেকে

লেংচাকে সরিয়ে নিয়ে প্রবোধ দিয়ে বলে—ঠিক হ্যায় বাচ্চা—তোম ইধারই রহো। অন্যদের দিকে চেয়ে বলে—হাম ইসকো দেখেগা—তুম লোক ফিকর মত করো।

ছোট্ট ঘরখানার এক কোণে একটা কুপি জলছে। মোতিয়া তার শেষ শয্যায় শয়ান। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন সাড়া নেই। রাখাল বালকেরা তাকে ঘিরে নিঃশব্দে নীরবে সেবা করে চলেছে। এই আধা আলো অন্ধকার মনে হচ্ছে মৃত্যু যেন তার হিমশীতল ছায়া বিস্তার করে সব কিছু নিথর নিস্তব্ধ করে ফেলেছে। রঘুয়া শিউরে উঠে! একমাত্র ব্যতিক্রম লেংচা—সে মাঝে মাঝে মোতিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে সরব আবেদন জানাচ্ছে—মাতাজী, মাতাজী চোখ খোল, দেখ, আমি লেংচা। এক বালকের অন্তর নিংরানো বেদনা-ঘন অশ্রুরুদ্ধ স্নেহ মমতা ভালোবাসার আহ্বান। মোতিয়াকে ঘিরে এই করুণ দৃশ্য রঘুয়ার সংযমের বাঁধ ভেঙে দেয়। এতক্ষণ ধরে তার হৃদয়ের অবরুদ্ধ ব্যথা বেদনা বিগলিত অশ্রু ধারায় নেমে আসে। বালকদের সম্মুখে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে আবছায়া অন্ধকারে সে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে নিঃসীম নীরন্ধ্র অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে হৃদয়ের পাষাণ-ভার কিছুটা লাঘব করে। ফিরে এসে পূর্বস্থানে বসে মোতিয়ার হাতখানা তুলে তার শিরার স্পন্দনের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের ব্যথার স্পন্দন বুঝি অনুভব করে। আশ্চর্য, ডাক্তারের ইন্‌জেকশনের পর মোতিয়ার শিরা, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি কিংবা অবস্থার কোন হেরফের ঘটে নাই বলেই রঘুয়ার মনে হয়। ফলে তার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়—এই কালরোগ থেকে মোতিয়ার আর নিস্তার নেই—এই কালঘুম তার আর ভাঙবার নয়। প্রাণ বায়ু তার শরীরের খাঁচায় কেবল ধুক ধুক করছে—যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তো তার হারানিধিকে অত সহজে যেতে দেবে না। সে শেষ চেষ্টা করে দেখবে—বহিনজীর শরণাপন্ন হবে—তার সৌভাগ্যই বলতে হবে—তিনি হঠাৎ এসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। চিন্তা মাত্রই সে উঠে দাঁড়ায়। ঝোলা থেকে খাবার বার করে লেংচাও অন্যান্যদের মধ্যে বেটে দেয়। তারপর মোতিয়ার ঝোলা থেকে চিত্রকূট খানা নিয়ে নিজের ফতুয়ার পকেটে রেখে বালকদের বলে—দেখো, আভি হাম দেবীজীকা পাশ যা রহা। মেরা লোটনেমে থোরা দের হোগা—তোম—

লোক সব হুঁশিয়ারসে রহো। মোতিয়ার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রঘুয়া বেরিয়ে যায়।

রাস্তাটা তার চেনা নয়। হুঁশিয়ার হয়ে টর্চটা জ্বেলে জঙ্গলের সরু পথ ধরে দীঘির পার থেকে মাঠে নেমে আসে। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে বাজারে আসে। আহারে তেমন কোন স্পৃহা নেই। তবু স্নান সেরে সামান্য কিছু গলাধকরণ করে ঝোলা ভর্তি খাবার ও অন্যান্য টুকি-টাকি কিছু কিনে সে বাজার ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। উর্ধ্বপানে চেয়ে অনুমান করে রাত্রিব প্রথম যাম উত্তীর্ণ। সে উর্ধ্বশ্বাসে ডাক বাংলো অভিমুখে হাঁটতে থাকে। গাঢ় অন্ধকার—রাস্তায় লোকজন নেই। শুধু জোনাকিরা মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে শেয়াল কুকুরের ডাক রাত্রির ঘন তমিস্রা ভেদ করে শব্দ-তরঙ্গ তুলে দূরদূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। বন আপিস ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়েই টর্চ জ্বেলে বাংলোর পথটা নির্ধারণ করে হন্তদন্ত হয়ে টিলা বেয়ে উঠতে থাকে। বাংলোর সম্মুখের মাঠে এসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য দাঁড়ায়। অন্ধকার মাঠের মধ্যে একটা মূর্তির মতো দেখে চৌকিদার গফুর জোর গলায় হাঁক দেয়—কে, কে ওখানে? নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি একটু স্বাভাবিক হতেই রঘুয়া জবাব দেয়—আমি। গফুর লণ্ঠন হাতে দৌড়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করে—আমি, আমি কে, শীঘ্র নাম বল। রঘুয়ার সামনে এসে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে বলে—তুমি, তুমি কে—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

রঘুয়া জবাব দেয়—তা চিনবার মতো তো কিছু নেই—আমি তো মরে আছি।

গলার স্বর শুনে গফুরের চিনি চিনি মনে হচ্ছে, তবু নাম বলতে পারছে না। লণ্ঠনটা আবার উঁচুতে তুলে প্রশ্ন করে—সত্যি করে বলো, তুমি কে?

—আমি, আমি স্টেশন জমাদার রঘুনন্দন।

—সে কি? শুনেছি তুমি নাকি বিবাগী হয়ে চলে গেছ?

রঘুয়া উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেয়—না, এখনো পুরোপুরি হইনি—কিছু বাকী আছে। শুনলাম বহিনজী এয়েছেন। তাই দেখা করতে এলাম।

—এত রাত্রে! তিনি তো খেতে বসেছেন। বেশ, চলো।

খানা কামরার কাছে এসে গফুর গলা খাঁকারি দেয়।

ভেতর থেকে সুদেষ্ণা জানতে চায়—কে?

—আজ্ঞে আমি গফুর।

—না, আমার আর কিছু লাগবে না। সে তো তোমাকে আগেই বলেছি।

—সেজন্য নয়। এয়েছি একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সুদেষ্ণা মনে মনে চাঞ্চল্য অনুভব করলেও মুখে বলে—এত রাত্রে দেখা করতে! ঠিক আছে, নিয়ে এসো।

গফুর ও রঘুয়া একই সঙ্গে সুদেষ্ণার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। উপস্থিত রক্তাম্বর পরিহিতকে চিনতে না পেরে সুদেষ্ণা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—গফুর, এ কে?

—আজ্ঞে আমি স্টেশনের জমাদার রঘুনন্দন।

সুদেষ্ণা হতবাক! তার দিকে চেয়ে থেকে বলে—সে কি—তোমার এ কি বেশ! ছোটবাবু বললেন তুমি নাকি লম্বা ছুটি নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছ—কি ব্যাপার!

আজ্ঞে সে ব্যাপার শোনাবো বলেই তো আপনার নিকট এত রাত্রে এসেছি। মনে আছে, পুলিশি হামলার সময় একদিন ছোটবাবু আমার অনুপস্থিতির জন্য আমাকে খুব গাল মন্দ করেন। আপনি তখন সেখানে উপস্থিত। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার রঘু? তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম—সময় পেলে আপনাকে সব বলবো। আজ সে সময় উপস্থিত। আমার সৌভাগ্য আপনি এ সময়ে এখানে। এ দুর্ভাগার বিষাদময় জীবনের পাঁচালি শোনাবার এবং শুনবার মতো যদি কেউ থাকে তো—সে একমাত্র আপনি। আপনার অপার করুণা—লোকের দুঃখ কষ্ট বোঝেন ও তা দূর করার চেষ্টা করেন ও সাহায্য করেন। তাই এক মুমূর্ষকে ফেলে রেখে আপনার নিকট এ অসময়ে দৌড়ে এসেছি। আমার মোতিয়া জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে। আপনার করুণার স্পর্শে আর প্রচেষ্টার দ্বারা যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। রঘুয়া আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। অশ্রুসিক্ত নয়নে সে তার বেদন-বিধুর জীবন-নাটকের আদ্যোপান্ত বলতে থাকে। রাত্রি বেড়ে চলেছে। সুদেষ্ণা এক দেহাতিজনের সুখ দুঃখ বেদনা বিজড়িত জীবন-ইতিহাস তন্ময় হয়ে শুনছে। গফুর ইতিমধ্যে দু'বার তাগাদা দিতে এসে ফিরে গেছে।

বক্তা কিংবা শ্রোতা কেহই তাকে লক্ষ্য করে নি। কাহিনী শেষ হতেই রঘুয়ার বেদনা-ক্লিষ্ট নয়ন থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে। আর সুদেষ্ণা সমবেদনায় অভিভূত—নির্বাক নিস্পন্দ—তার আপন হারা উদাসী দৃষ্টি জানালার বাইরে গভীর তিমির রাত্রির নক্ষত্র খচিত সুদূর আকাশ পানে নিবদ্ধ।

রঘুয়া উঠে দাঁড়াতেই সুদেষ্ণা আপন সত্তায় ফিরে আসে। বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করে—রঘু তোমার মোতিয়ার কি রোগ, ডাক্তার বা কি বললেন তা তো আমাকে কিছু বললে না। তবু আমি দেখবো—কি করা যায়। কাল সকালে বাজারের ডাক্তারখানায় লোক পাঠিও। আমি ডাক্তার নিয়ে আসবো।

রোগের কথা বলতেই রঘুয়ার পকেটে রাখা কাগজখানার কথা মনে পড়ে। সে তৎক্ষণাৎ তা বের করে সুদেষ্ণার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—দেখুন তো বহিনজী এতে কি লেখা আছে ?

কাগজখানা দেখে সুদেষ্ণার মুখ মলিন ও গম্ভীর হয়ে যায়। কথায় তা প্রকাশ না করে বলেন—এ তো দেখছি কামাখ্যাধাম হাসপাতালের এক রোগীর ও রোগের নামোল্লেখ সহ ঔষধের ব্যবস্থা পত্র। রঘুয়ার হাতে সেখানা প্রত্যর্পণ করে সুদেষ্ণা আশ্বাস দিয়ে বলেন—তুমি কিছু ভেবো না রঘু, আমি তো কাল সকালে যাচ্ছিই। তোমার মোতিয়া নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।

রঘুয়া চিরকুটখানা হাতে নিয়ে চলবার মুখে সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতোই বলতে শুরু করে—এ কাগজখানায় কি লেখা আছে তা আমার অজানা। এ সম্পর্কে ডাক্তারবাবু কিছু বলেন নি, আপনিও বললেন না। কিন্তু আমার মন বলছে মোতিয়া আর বাঁচবে না। আমার দুঃখ যখন তাকে পেলাম তখন সে চেতন-হীন পরপারের যাত্রী—এ পাওয়া না পাওয়ারই সামিল এবং না পেলেই বোধহয় ভাল হ'তো। কিন্তু পেয়ে হারালাম, এ যে কত বড় দুঃখ। তবে হাঁ, তাকে পাব—মরণের পরেই আমি তাকে একান্ত ভাবে পাবো। তখন সে আমার কাছে কাছেই থাকবে—আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না। সে জন্য ঠিক করেছি কুটির সংলগ্ন স্থানে তাকে কবরস্থ করে সকাল সন্ধ্যা তার সান্নিধ্য অনুভব করবো। মোতিয়াকে যারা দেখভাল করছে সেই সব রাখাল বালকদের নিকট আমি সাধুবাবা, সিদ্ধিবাবা রূপেই পরিচিতি লাভ করেছি। এই পরিচয়

বজায় রেখেই আমি তাদের মধ্যে থেকে সকলের সেবা শুশ্রূষা ও হিত-সাধন করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব বলেই মনস্থ করেছি। নমস্তে বহিনজী। নির্গলিত অশ্রু মুছতে মুছতে রঘুয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। গফুর তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হয়তো তারই অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে সে বুঝি গফুরকে দেখতে পায় নি।

বাংলোর টিলা থেকে নামবার সময় রঘুয়া একবার উর্ধ্বপানে চায়। তারা ঝলমল নির্মল আকাশে সুদূর নিহারিকার শুভ্র ছায়াপথ দৃষ্টে রাত্রির তৃতীয় যাম অনুমান করে রঘুয়ার অন্তরে নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা জাগে। বড় রাস্তায় পড়েই সে অন্ধকারে দৌড়তে থাকে। একটা ভয়ঙ্কর ভয় যেন তাকে পেছন থেকে তাড়া করছে। রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামবার মুহূর্তে রঘুয়া বুঝি এক আর্তকণ্ঠের আহ্বান শুনতে পায়। সে কাতর আহ্বান অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে দূর দূরান্তে বিলীন হয়ে যায়। ঐ আর্তকণ্ঠের ডাক শোনা মাত্রই রঘুয়া আর স্থির থাকতে পারে না। অস্থির উতলা হয়ে ঐ ধ্বনির অনুসরণ করে নিশি-পাওয়ার মতোই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মোতিয়া, মোতিয়া চিৎকারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। কতক্ষণ ধরে সে ছুটেছে তা সে জানে না। আচম্বিতে কতগুলি শেয়ালের হুক্কাহুয়া রব বুঝি রঘুয়াকে সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনে। সচেতন রঘু অন্ধকারে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারে সে দীঘির ধারের মাঠে বসে আছে। কিন্তু কেন এবং কিভাবে সে এখানে এসেছে এবং কতক্ষণ ধরে এ-ভাবে বসে আছে তা বুঝতে না পেরে অবাক হয়। স্মৃতির মণিকোটা আতিপাতি করে খুঁজেও সে ঘটনাটা স্মরণ করতে পারছে না। রঘুয়া হতভম্ব। উঠে দাঁড়াতেই মনে হয় সে যেন খুবই ক্লান্ত ও দুর্বল মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয়ের পর ঝোলা থেকে টর্চ নিয়ে দীঘির ধার ধরে চলে চলে কোণে এসে পূর্ব পরিচিত সরু পথ দিয়েই দীঘির পাড়ে উঠে আসে। ওখানে পৌঁছতেই তার আদ্যোপান্ত সব মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শংকাকুল চিত্তে সে দ্রুত পদে কুটিরে দিকে এগিয়ে চলে। কিছু দূর যেতেই রাতের অন্ধকারে চাপা কান্নার আওয়াজ তার কানে আসে। সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। উন্মাদের মত ছুটতে থাকে। ধাপ বেয়ে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ে। আবার উঠে কুটিরের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতরের ঝাপসা আলোকে দেখে—লেংচা

মোতিয়ার বুকের উপর পড়ে মাতাজী, মাতাজী বলে কাঁদছে। অন্যেরাও মোতিয়ার চারপাশে মেঝেতে লুটিয়ে কাঁদছে।

এই শোকাবহ দৃশ্যে রঘুয়া বুঝলো—সব শেষ, মোতিয়ার জীবন দীপ নিবে গেছে। সে এখন কি করবে? তার শরীর কাঁপছে। অন্তরের গুমরনো কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু সে তো রাখালদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। অন্ধকারে দুয়ার থেকে সরে গিয়ে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে মনের গুরুভার কিছুটা লাঘব করে। তারপর ভগ্ন হৃদয়ে ঘরে ঢুকে নিজেকে সংযত করে মোতিয়ার পাশে বসে তার হাতখানি তুলে শিরা ধরে—না কোন স্পন্দন নেই। লেংচার ধারে বিপরীত দিকে মুখ রেখে রঘুয়া কান পেতে বুকের ধুকধুকানি শোনবার চেষ্টা করে। তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মোতিয়ার বক্ষের বস্ত্র সিক্ত করে। শরীরের অন্যান্য স্থানে হাত দিয়েও কোন উত্তাপ অনুভুত হয় না। সারা অঙ্গে মৃত্যুর হিম শীতল পরশ! বোঝা গেল অনেকক্ষণ আগেই কাল তাকে গ্রাস করেছে। ক্রন্দনরত বালকদের সান্ত্বনা দিতে গেলে সে নিজেই কেঁদে ফেলবে। সুতরাং সে নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছেড়ে রঘুয়া উঠে বসে। সযত্নে মোতিয়ার হাতখানা কোলে তুলে নিয়ে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসে থাকে।

কালরাত্রির অন্ধকার শেষে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। রঘুয়া একই অবস্থায় অন্তরের হাহাকার চেপে মোতিয়ার হাতখানা গালে ঘষে বলে—মোতি আমার অনুপস্থিতিতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলে চলে গেলে! আমাকে শেষ-দেখার অবসরটুকু পর্যন্ত দিলে না! রঘুয়া নিচু হয়ে নিজের মুখ মোতিয়ার কপালে কপোলে এবং ঠোঁটে ঘষে স্থির হয়ে বসে। রাখাল বালকেরা যে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে—কোন সাড়া নেই।

বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-প্রত্যাগত রাখাল বালকেরা সব উপস্থিত। দুয়ার থেকে ঘরের ভেতরকার অবস্থা দেখে কি বিপত্তি ঘটেছে তা বুঝতে আর তাদের বাকী থাকে না। ঘরে ঢুকে সকলে মোতিয়াকে ঘিরে কান্নাকাটি শুরু করে। এক করুণ শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। রঘুয়া নিজেকে আরো শক্ত করে ধ্যান স্তিমিত নেত্রে বসে আছে। বালকদের কান্না কিছুটা প্রশমিত হলে সকলে মিলে মাতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলে তাকে ব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু রঘুয়ার তুষ্ণীম্ভাব দেখে তারা [illegible] মাতাজীর নিকট অবস্থানকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। লেংচা

তখনো ভৈরবীর বুকের উপর পড়ে আছে। মাঝে মাঝে হেঁচকি তুলছে। অপর দু'জন কাঁদতে কাঁদতে বলে—সাধুবাবা চলে যাবার পরেই মাতাজী হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট শুরু হয়। কখনো বা হাত দিয়ে কিছু ধরতে চায়, কখনো বা উর্ধ্বপানে রক্তরাঙা চক্ষু মেলে চায়। তারপর গোঙানি আরম্ভ হয়। অবশেষে একটা হিক্কা তুলে চুপ হয়ে যায়—আর নড়েচড়ে না। কথা শেষে তারা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

রঘুয়া এতক্ষণ পরে চক্ষু মেলে। রাখালদের মধ্যে বড়ছেলেটিকে ডেকে বাজার থেকে ধুপধুনো, ফুল, প্রদীপ, শাড়ি, চন্দন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব কিছু কিনে আসবার সময় অবশ্যই ডাক্তারখানা থেকে ডাক্তারবাবু ও দেবীজীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলে। ছেলেটি রঘুয়ার হাত থেকে টাকা নিয়ে একজন সঙ্গীসহ বেরিয়ে যায়। রঘুয়া তারপর সকল রাখাল বালকদের কাছে ডেকে জানতে চায় তাদের মাতাজীকে তারা গোর দেবে, না দাহ করবে। গোর দিতে চাইলে কোথায় দেওয়া হবে? সকলেই একবাক্যে গোর দেওয়াব পক্ষপাতী এবং তা কুটিরের সামনে কোন স্থানে। তাহলে তারা সকালে বিকালে মাতাজীর সামনে এসে তাকে ডাকতে ও প্রণাম করতে পারবে। গোর দেওয়ার জন্য দরকার হলে তারা কুটিরের সামনের আরও জঙ্গল কেটে সাফ করে দেবে।

—ঠিক হ্যায়, বলে রঘু লেংচার কাছে গিয়ে তাকে মোতিয়ার বুকের উপর থেকে তুলে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে কিছুতেই উঠবে না। মাতাজীর বুকের উপর পড়ে আরো জোরে কাঁদতে থাকে। রঘুয়া নাচার—অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে কোলে তুলে আদর করতে থাকে। লেংচাকে কোলে নিয়ে রঘুয়া রাখালদের একজনকে ঝোলা থেকে একখানা কাপড় নিয়ে মাতাজীকে ঢেকে দিতে বলে। ছেলেটি কাপড়-খানা নিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে—ঢাকা দেওয়া আর হয় না। বিচলিত রঘুয়া অগত্যা লেংচাকে কোল থেকে নামিয়ে ছেলেটির হাত থেকে কাপড় খানা নিয়ে মোতিয়াকে ঢেকে দেয়—মুখখানা খোলা রাখে। কিন্তু মাছির অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য অবশেষে তাও ঢেকে দিতে হয়।

রঘুয়া লেংচাকে মোতিয়ার শিয়রের কাছে বসিয়ে রাখালদের মধ্যে বড় তিনজনকে ডেকে গাঁও থেকে কোদাল বেলচা শাবল কাটারি ইত্যাদি জিনিষ সহ কবর দিতে অভিজ্ঞ এক আদমি সঙ্গে নিয়ে আসতে

বলে। তারপর লেংচার হাত ধরে বলে—যাও বাচ্চা ইনকে সাথ ঘর চলা যাও—থানেকা বাদ ফের আ যানা।

না, আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না, আমি মাতাজীর কাছে কাছেই থাকব, বলে সে আবার মোতিয়ার বুকের উপর পড়ে কাঁদতে থাকে।

রঘুয়া তাকে তুলে নিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলে—ঠিক হ্যায় বাচ্চা, তোমকো যানে নেহি হোগা। তারপর গমনোদ্যত বালকদের ওর বাবা কিম্বা মাকে নিয়ে আসতে বলে।

উত্তরে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠে—ওর বাবা মা কেউই নেই। থাকে দাদীর কাছে। এখন তো ও ঘর যায় না। মাতাজীর কাছেই খায় দায় থাকে। কতদিন বলেছি মাতাজী ওতো ভিন্ন জাত—ওর ডাক নাম লেংচা আসল নাম তো মকবুল। ওকে যে মন্দিরে পূজার স্থানে নিয়ে যাও তোমার তো ধর্মনাশ হবে—পাপ হবে, গুনা হবে। মাতাজী হেসে বলতো—ও আবার কি কথা—ধর্ম কোন দিন নাশ হবার নয় রে। সব ধরম এক—ধর্মের কাছে জাত পাত কিছু নেই। মন্দির মসজিদ—রাম রহিম—সব এক। অধার্মিকরাই ধর্মের নামে জাতপাত নিয়ে শোরগোল তোলে—হৈ হল্লা, মরামারি কাটাকাটি করে। খবরদার, আমার কাছে কখনো ধর্মের ধুয়া তুলবিনা, ধর্মের ধ্বজা তুলে জিগির দিবি না। কথা শেষে মাতাজী লেংচাকে কোলে নিয়ে কি যে আদর করতো দেখে তো আমাদের দারুণ হিংসা হতো। ছেলেটার কথায় মোতিয়ার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় জেনে রঘুয়ার অবাক লাগে। লেংচাকে জড়িয়ে ধরে বলে—ঠিক হ্যায় বাচ্চ তোম ডরো মৎ। মেরা পাশ তোমভি পেয়ার সে রহোগে।

ছেলে তিনটি গাঁয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই রঘুয়া লেংচাকে কোল থেকে নামিয়ে ঘরে আর যে কয়জন আছে তাদের ডেকে ঝোলা থেকে খাবার বের করে খেতে দেয়। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে সমাধির জায়গা স্থির করে ফিরে এসে মোতিয়ার শিয়রের অদূরে বসে। সম্মুখে লাল কাপড়ে আবৃত মোতিয়ার মৃত দেহ। সুদীর্ঘকাল—দিনের পর দিন, র পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে বহু দুঃখ কষ্টের ঘন অন্ধকারে াই তার অন্তরে একমাত্র আশার সলতে জ্বালিয়ে রেখেছিলো। সে বর্তিকা মরণের এক ফুৎকারে নিবে গেল! পেয়েও সে হারিয়ে ন্তরের হাহাকার কণ্ঠরুদ্ধ করে অশ্রুজলে ক্ষান্ত হয়।

কুটিরের বাইরে পদধ্বনি শুনতে পেয়ে রঘুয়া নিজেকে সামলে নিয়ে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে স্থির হয়ে বসে। ডাক্তরবাবু ও সুদেষ্ণা এসে উপস্থিত। ডাক্তারের নির্দেশে সঙ্গীয় বালকটি মোতিয়ার গায়ের আবরণ উন্মোচন করতেই উপস্থিত বালকেরা সমস্বরে কেঁদে ওঠে। হঠাৎ লেংচা এসে মোতিয়ার বুকের উপর পড়ে মাতাজী মাতাজী বলে কাঁদতে থাকে। এক অতি করুণ দৃশ্য। সুদেষ্ণা বিচলিত! স্তিমিত লোচন রঘুয়া আত্ম প্রকাশের ভয়ে নির্বাক নিথর। ডাক্তার মৃত দেহ পরীক্ষা করে সরে আসেন। কিন্তু মুশকিল হল লেংচাকে না সরালে মৃতদেহ ঢাকা যাচ্ছে না। কে সরাবে? সকলেই কাঁদছে। অগত্যা সুদেষ্ণা লেংচাকে টেনে তুলে মৃত দেহ ঢেকে দেয়। লেংচা পাশে বসে কাঁদতে থাকে।

ডাক্তারের ডেথ্ সারটিফিকেট লেখা কালীন সুদেষ্ণা কুটিরের বাইরে গিয়ে চারিদিক ঘুরে দেখে। লোকালয় থেকে দূরে দেবস্থানের সন্নিকট-বর্তী কুটিরে মৃতা ভৈরবীর অবস্থান সত্যই বিস্ময়কর। ফিরে এসে ডেথ্ সারটিফিকেটখানা দেখে ডাক্তারকে রোগীর কখন মৃত্যু ঘটেছে জিজ্ঞাসা করে। জবাবে ডাক্তার জানান যে প্রায় ঘণ্টা দশেক পূর্বে রাত দুপুরের কিছু আগে। সুদেষ্ণা বয়স্ক ছেলেটিকে কাছে ডাকে। ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে—তোমাদের মাতাজীর শেষ-কৃত্যের প্রয়োজনে এই টাকা কয়টা রাখ।

ভয় পেয়ে ছেলেটি টাকা না নিয়েই সরে যায়। ব্যাপারটা সুদেষ্ণার পক্ষে অস্বস্তিকর বিধায় নিরুপায় রঘুয়াকে তুষ্ণীম্ভাব ভেঙ্গে গম্ভীর স্বরে বালকটিকে আদেশ দিতে হয়—মাইজীকো রূপিয়া খুশি মন সে লে লেও। বালকটি তন্মুহূর্তে হাত পেতে টাকা নিয়ে সুদেষ্ণাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। সুদেষ্ণা ছেলেটির হাত ধরে বলে, আমাদের কোন সহজ সিধা পথে নিয়ে যাবে বলেছিলে, চলো। যাবার কালে সুদেষ্ণা লেংচার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—মাতাজী স্বর্গে গেছেন। তোমাদের কান্নাকাটি দেখে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আর কেঁদো না। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলে—আমি এখন যাচ্ছি, সময় পেলেই তোমাদের নিকট চলে আসবো। কথা শেষে সুদেষ্ণা মৃতা ভৈরবীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সিদ্ধবাবাকে সুক্রিয়া জানিয়ে ডাক্তার সহ কুটির ত্যাগ করে।

ছেলেরা কোদাল, বেলচা ইত্যাদি সহ একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এসে

হাজির। লেংচা তখনো মোতিয়ার পাশে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে। কেঁদে কেঁদে তার বুঝি আর জোরে কাঁদবার শক্তি নেই।

রঘুয়া উঠে দাঁড়ায়। বাইরে এসে কোথায় মোতিয়াকে সমাধি দেওয়া হবে তা দেখিয়ে দেয়। তদনুযায়ী রাখালগণ বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে কেউ জংগল কাটছে, কেউ জমি পরিষ্কার করছে কেউ বা মাটি খুঁড়ছে। বেলা গড়িয়ে চলে—সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। আর দেরী করা সঙ্গত নয়। যারা ঘরে রয়েছে রঘুয়া তাদের বাইরে যেতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বেরিয়ে যায়। কিন্তু লেংচা নাছোড়বান্দা—সে যাবে না। রঘুয়া তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে কোলে তুলে বাইরে নিয়ে এসে বলে—তোম ইধার ঠারো—হাম মাতাজীকো ইধার লে আয়েগা।

ঘরে এসে রঘুয়া মোতিয়ার গায়ের আবরণ সরিয়ে তার পাংশুবর্ণ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ নীরব মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অতীতের যৌবন-উচ্ছল মুধুময় দিনগুলির স্মৃতি চোখের পরদায় একে একে ভেসে উঠছে। না, আর কান্না নয়, অনেক কেঁদেছে, সারা জীবন কেঁদে চলেছে। নির্গলিত অশ্রু অবিরল ধারে মোতিয়ার কপোল কপাল ও মুদিত নয়নে পড়ে সারা মুখখান ভিজিয়ে দেয়। নতুন শাড়িখানা দিয়ে অনেক যত্নে আস্তে আস্তে তা মুছিয়ে দেয়– প্রতি অঙ্গ মৃত্যুর করাল গ্রাসে হিমশীতল। ধীরে ধীরে নতুন শাড়িখানা পরিয়ে মুখে চন্দন লেপে সারা অঙ্গে চন্দন-গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। মোতিয়ার পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি পুবনো শাড়িতে বেঁধে রাখে। ধুপ ধুনো প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে পাগড়ির নেজ দিয়ে নিজের চোখ মুখ থেকে অশ্রুর চিহ্ন মুছে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। সমাধিস্থান তৈরি। রঘুয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করে কুটিরে নিয়ে আসে। মোতিয়াকে কিভাবে কোলে করে নিয়ে সমাধির ভিতর রাখবে তা বুঝিয়ে দেয়। তদনুযায়ী বৃদ্ধ কবরে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে রাখবার মতো কয়েকটা ধাপ বানাবার নির্দেশ দেয়। রঘুয়াব কথা মতো বড় ছেলেটি নতুন গামছাখানা কবরে পেতে দিয়ে টুকিটাকি জিনিষপত্র সহ বাঁধা পুঁটলিটা উপাধান মতো করে মোতিয়ার শেষ শয্যা রচনা করে। বৃদ্ধ লেংচার হাত ধরে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করছে। ছেলেরা সকলে কুটিরে ফিরে এসেছে। মাতাজীর শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে তারা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছে। ধীর স্থির পদক্ষেপে নিঃশব্দে রঘুয়া এগিয়ে আসে। একটুও না কেঁপে দুই হাত মেলে মোতিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে দৃঢ়

পদক্ষেপে সমাধির দিকে এগিয়ে চলে—কোন রাম নাম নয়, হরি কিংবা আল্লাহ ধ্বনি নয়। কেবল প্রিয়জনের বেদনা-ভরা নীরব অশ্রুপাতের মধ্যেই মোতিয়ার শেষ যাত্রা শুরু হয়। সমাধিস্থানের নিকটে আসতেই লেংচা বৃদ্ধের হাতছাড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে কবরের দিকে দৌড়তে থাকে। সকলে মিলে তাকে ধরে রাখে। কিন্তু তার—মাতাজী, মাতাজী, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমাকে ফেলে যেওনা—বুকভাঙা কাতর ক্রন্দনধ্বনি বুঝি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে পাংশু বিষণ্ণ গোধূলি বেলাকে আরও বিষাদ-ঘন মলিন করে তোলে।

রঘুয়া আস্তে আস্তে মোতিয়াকে তার শেষ শয্যায় স্থাপন করে। দয়িতের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ভরা হৃদয় নিংরানো কয়েক ফোঁটা অশ্রু মোতিয়ার বক্ষস্থলে ঝরে পড়ে। নিজেকে সংযত করে রঘুয়া বৃদ্ধের নির্দেশ মতো শয্যার দু'পাশে প্রদীপ ও ধুপ-ধুনো রেখে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে মৃত দেহ যথারীতি ঢেকে দেয়। তারপর সকলে মিলে অশ্রুসিক্ত নয়নে মাটি ফেলে ফেলে সমাধি রচনা করে হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা নিবেদন করে।

প্রদোষের অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরণীর ওপর নেমে আসছে। রাত্রি তার কালো আবরণ খানি নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে। দূরে দীঘির পাড়ে গাভীরা সব হাম্বা হাম্বা রবে রাখালদের গৃহে প্রত্যাগমনের আহ্বান জানাচ্ছে। রঘুয়া নিষ্প্রদীপ কুটিরের দুয়ারে বসে। তার কোলে লেংচা তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অদূরে সমাধির উপর সন্ধ্যা-দীপের কম্পমান শিখা দূরগগনের নক্ষত্রলোকের মতোই বুঝি ঝিকমিক করছে।

সে রাত্রে অমৃতকানন থেকে ফিরে অনুতোষ তার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ট্রেজারি লুণ্ঠন কি উপায়ে রূপায়িত করা সম্ভব নিরন্তর সে চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। দিবারাত্রি ঐ তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। এই উদ্দেশ্যে ট্রেজারি সমীক্ষণকালে তাকে কতই না দৈহিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং একই সঙ্গে অর্থ লুণ্ঠন ও প্রতিশোধ গ্রহণ—

একই ঢিলে দুই পাখি মারণ। মনে হতেই অনুতোষ খুবই হর্ষোৎফুল্ল! কিন্তু খাজাঞ্চীখানা সদাসর্বদা সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত—তা তো সে নিজেই প্রত্যক্ষ করেছে। দল বেঁধে ট্রেজারি আক্রমণ ও লুণ্ঠন সম্ভব হলেও অপূরণীয় ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী এবং তা একান্ত অবিমৃশ্যকারিতারই সমতুল্য। সুতরাং সুচতুর কৌশলে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অর্থ লুণ্ঠন ভিন্ন অন্য উপায় নেই। নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করবার জন্যই বুঝি অনুতোষ মনে মনে সেই বিখ্যাত শ্লোকটি আওড়ায়— "...ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সর্বশেষ ভাবনাকে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় স্থির করে অনুতোষ অগ্রসর হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম জানা দরকার—কে কে কখন কোথা দিয়ে কিভাবে কোষাগারে অর্থ রাখতে কিংবা আনতে যায়। দেওয়ানী আদালত থেকে যে যায় তাকে তো সে নিজেই দেখেছে। তবু সে কবে কখন কোথা দিয়ে যাতায়াত করে? বাহন—নির্দিষ্ট কোন ঘোড়ার গাড়ি, নাকি যাহা পায় তাই চড়ে আসে যায়? এসব তথ্য জানবার সহজপন্থা ট্রেজারীর সম্মুখের রাস্তা থেকে সংগোপনে লক্ষ্য রাখা ও অনুসরণ করা। এই উদ্দেশ্যে অনুতোষ তার দু'জন নির্ভরযোগ্য অনুচরকে নিয়োগ করে এবং যথাসময়ে তারা বিস্তারিত সংবাদ তাকে সরবরাহ করে। ঐ সব প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা ও কার্যকরিতা যাচাই করে অনুতোষ স্বীয় পরিকল্পনানুযায়ী যে কর্মসূচী তৈরি করে তা দলীয় প্রধানাদিষ্ট কর্মসংশ্লিষ্ট হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে অনুতোষ আম্রকাননে উপস্থিত। কুটিরের সম্মুখে এসে দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে আহ্বান আসে—এসো। ঘরে ঢুকে অনুতোষ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রণাম করে আসন টেনে বসে পড়ে। বিগত কয়েকদিনের কর্মধারার বিশদ বিবরণ ও অনুসন্ধানের ফল পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় অভিমত তাঁর নিকট ব্যক্ত করে।

সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান অনুতোষ কথিত সমাচার ও সংবাদ বিশ্লেষণ করে বুঝলেন একমাত্র সম্মুখ সমর ব্যতীত ট্রেজারী লুণ্ঠন অসম্ভব। তবে সান্ত্বনা পুরস্কার স্বরূপ ট্রেজারীর পথে রেলের সদর দপ্তরের কিংবা দেওয়ানী আদালতের অর্থ লুণ্ঠনের প্রস্তাবনা সেই বিখ্যাত লোকগাথা স্মরণ করিয়ে দেয়—নাকের বদলে নরুন পেলুম তাকডুমাডুম ডুম। তাঁর

গম্ভীর আননে ব্যঙ্গ হাসির সুস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠে। মৃদু আলোকে অনুতোষের দৃষ্টি তা এড়িয়ে যায়। তিনি অনুভব করলেন নিষ্করুণ সশস্ত্র সংগ্রামে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিপুল অস্ত্রবলে বলীয়ান অসীম ধূর্ত ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রবলে হীন, জন বলে ক্ষীণ প্রতিদ্বন্দ্বীর পশ্চাদপসরণের মনোবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলে তো আমাদের স্বাধীনতা লাভ কোন দিনই সম্ভব হবে না। যে সীমিত সম্বল ও স্বল্প অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা স্বাধীনতা যজ্ঞেব উদ্বোধন করেছি তা কি তবে শতশত শহীদের রক্তাহুতিতে অনন্তকাল ধরেই জ্বলতে থাকবে! আমাদের এত রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা কী কেবল এভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। একের পর এক বাধার মরুভূমিতে আমরা দিশেহারা হয়ে হারিয়ে যাব? না, তা কখনই হতে দেওয়া যায় না। সসাগবা ধবিত্রীব অধিপতি বৃটিশ সিংহ যতই ক্ষমতাশালী দুর্দান্ত ধুরন্ধব হোক না কেন তাব বিবরে প্রবেশ করে আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে জর্জবিত কবতেই হবে; তাকে বুঝতে দিতে হবে—বাঘের ঘরে ঘোগ বাসা বেঁধেছে, আর নিস্তার নেই—দিন তার ফুরিয়ে এসেছে! বৃটিশেব বিরুদ্ধে তাব অন্তবের ক্ষোভ বিদ্বেষ তাঁকে অস্থির কবে তোলে। মুখ চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে!

তুষ্ণীম্ভাব ছেড়ে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবেন—তোমার সমীক্ষায় ট্রেজারীতে যাতায়াতকারীদের মধ্যে রক্ষীসহ কোন জনের ছদ্মবেশ সহজে অনুকবণীয়? প্রশ্নেব সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন কর্তার ইচ্ছার-ধারা আঁচ করে কিছুক্ষণ চিন্তার পব অনুতোষ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—সদব ডাকঘরের কেশিয়ার ও তাব প্রহরী লাঠিধাবী পাগড়ি-মাথায় দেশোয়ালী।

—বেশ, বেশ, ডাকঘব থেকে বেবিয়ে এবা কোন পথ ধবে ট্রেজারীতে যাওয়া-আসা করে?

অনুতোষ রাস্তার বিবরণ দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা, তা হলে পুলে উঠবার আগে ঐ রাস্তাটার দু'ধারে ঘন জংগল ও আগাছায় ভরা নয় কি?

শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে অনুতোষ চমৎকৃত! তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—আজ্ঞে হাঁ। তবে ঐ পথে মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়িও তারা ব্যবহার করে।

—হুঁ, তা হলে নকল কেশিয়ার সেজে নকল ভোজপুরী রক্ষী নিয়ে ট্রেজারীর অভ্যন্তরে গমন, অর্থলুণ্ঠন ও প্রস্থান সহজসাধ্য নয় কি?

বিষয়টা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে অনুতোষের সংকটাকাঙ্ক্ষী মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে অকপটে জবাব দেয়—আজ্ঞে হাঁ।

উত্তম। তা হলে তোমারি দেওয়া নির্ঘণ্ট অনুসারে আগামী পরশু কেশিয়ারের ট্রেজারীতে যাবার দিন। ঐ দিন তুমিও কেশিয়ারের মত পোষাক পরে ডাকঘর থেকে বেরবে। তারপর যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তাদের অনুসরণ করে জঙ্গলের ধার অবধি আসবে। সেখানে এসে অগ্রগামীদের অপসারণ করে তুমিই একজন সহকারীকে ভোজপুরী দারোয়ান বানিয়ে কি ভাবে কেশিয়ার রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে নায়কের পাঠ করে যাবে তা স্থির করবে। একজন মেকআপ ম্যান ও সার্পস্যুটার তোমাদের লক্ষ্যে রেখে পশ্চাদগমন করবে। প্রকৃত ঘটনার দিনে সেই-ই ভোজপুরী বেশে তোমার পাশে সহযোগী অভিনেতা রূপে দণ্ডায়মান থাকবে।

এই কর্মযজ্ঞের প্রধান হোতা তুমি। এর উদ্‌যাপন ও সুষ্ঠু সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির সঙ্গে সম্ভাব্য বিপদ আপদের ঝুঁকি ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনায় এনে সমগ্র কর্মসূচী তৈরী করে আগামী পরশুর পরের দিন এখানে উপস্থিত হবে। মেক্ আপ ম্যান ও সার্পস্যুটার তখন এখানে হাজির থাকবে।

বিপজ্জনক কর্মভার অর্পিত হওয়ায় অনুতোষের সংকটাকাঙ্ক্ষী মন কর্ম-চাঞ্চল্যে অস্থির ও উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত। সে মাথা নিচু করে সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধানকে প্রণাম করে। তিনি তার মাথায় হাত রেখে—শুভমস্তু, বলে তাকে বিদায় দেয়।

আম্রকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে অনুতোষ মাঠ বরাবর গেটের দিকে হাঁটতে থাকে। যে বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার তার উপর ন্যস্ত হয়েছে তার জন্য নিজেকে ধন্যও যারপর নাই গর্বিত বোধ করছে। মনে দারুণ উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে। অমৃত কাননের গেট ছাড়িয়ে চলে চলে সে বড়রাস্তায় পৌঁছে। কিছুদূর গিয়ে খেয়াল বশতঃ রাস্তার মোড় থেকে বাঁয়ে বেঁকে ভিন্ন রাস্তা ধরে একেবারে কাচারির সামনে গিয়ে হাজির। সারাদিনের কর্মচঞ্চল শব্দ-মুখর অঞ্চলটায় রাতের অন্ধকারে শ্মশানের ভয়াল গম্ভীর নিস্তব্ধতা। দূরে দূরে দু'একটা আলোর ফুলকি এই পরিবেশকে যেন আরো ভয়ংকর করে তুলেছে। মাঠের ও-ধারে

খাজাঞ্চীখানার দিক থেকে ঢোল করতাল সহযোগে—রামা হো রামা হো কীর্তন ভেসে আসছে। কিছুদিন পূর্বে কোষাগারের সম্মুখের মাঠে তার সমীক্ষাকালীন কৃত সমুদয় কর্মকাণ্ড এবং অর্থ নেবার ও রাখবার প্রয়োজনে সরকারী দপ্তরের লোক জনের ট্রেজারীতে আগমন ও নিষ্ক্রমণ দৃশ্য সকল অনুতোষের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট ভেসে ওঠে। চলতে চলতে ট্রেজারীতে প্রবেশের রাস্তাটা অতিক্রম কালে মনে হলো রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট-এ আলোর ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় জোরদার। আরো এগিয়ে পুল পেরিয়ে রাস্তাটার ধারে জঙ্গলের পাশে এসে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে এদিকটা ট্রেজারীর পেছনে কাঁটাতারে ঘেরা সীমানার বাইরে জল-নিকাশী ছোট নালার ধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘন জঙ্গল ও আগাছায় পরিপূর্ণ। আরো নেমে গিয়ে অন্ধকারে যতদূর সম্ভব ভেতরের অবস্থাটা দেখে রাস্তায় উঠে আসে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সদর ডাকঘরের কেশিয়ার ও তার রক্ষী ভোজপুরীকে কাবু করে কি ভাবে সরিয়ে নিয়ে স্ব-কার্য সাধন সম্ভব তারই ক্রিয়া কৌশলের একটা ছক্ মনে মনে তৈরি করে সে অনেক রাত্রে ঘরে ফেরে।

সে রাত্রে অনুতোষের নিদ্রার দারুণ ব্যাঘাত ঘটে। নানা ভাবনা চিন্তা জড়িত উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘুরে ফিরে কেবল একই চিন্তা আনাগোনা করছে—কি ভাবে সে তার উপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার সুসম্পন্ন করবে। আগা থেকে গোড়া অবধি স্বীয় কর্মসূচী খতিয়ে দেখে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেও আবার এক জায়গায় এসে বারংবার ঠোক্কর খাচ্ছে। সেখানে খোলামন নিয়ে দেখলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে স্বকার্য সিদ্ধির পথে বাধা বিঘ্ন নাশ কালে অপরের প্রাণ হরণ একান্ত অপরিহার্য হলে আত্ম-বিনাশও সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে।

চরম পরিণতি—মৃত্যু? মনে হতেই অনুতোষ কেঁপে ওঠে। কেমন যেন একটা ক্লৈব্যের কুয়াশা তার অন্তরাকাশে দেখা দেয়। সবল সুস্থ বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়। মনে সুয়ো দুয়োর দ্বন্দ্ব জাগে—ভাল করছি কি মন্দ করছি। কিন্তু এসব কচকচানি তো এখন বৃথা—সম্পূর্ণ নিরর্থক ও অবান্তর। বহুদিন পূর্ব থেকেই তো দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে সে অঙ্গীকারাবদ্ধ; শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন তার উৎসর্গিত। সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্যন্ত তো প্রত্যাবর্তন নেই।

এতৎসত্ত্বেও মনের দুর্বল মুহূর্তে প্রণয়-বিধুরা দেবযানীর মূর্তি মানসপটে ভেসে ওঠে—কিছুতেই এড়ানো যায় না। মনে পড়ে বিগত অভিযানের আগের দিন গভীর রাতে মনের এক অতি দুর্বল মুহূর্তে উপযাচক রূপে দেবযানীর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সভ্য হয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে। তজ্জনিত একটা অপরাধ বোধেও সে ক্লিষ্ট। অভিযান শেষে ফিরে এসে এযাবৎ দেবযানীর সাক্ষাৎলাভ ঘটেনি। হয়ত দলীয় কাজে কিংবা দিদির সাগরেদিতে ব্যতিব্যস্ত। তার উপর দলের নববিধান অনুসারে ছোরা ও লাঠি খেলা ছাড়াও বিশেষ নির্বাচিত সভ্য সভ্যাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেরও প্রশিক্ষণ চলেছে।

নিজের এইসব নানা বাধা বিঘ্নকারী শক্তি-নাশী চিন্তা ভাবনাগুলোকে দূর করবার জন্য অনুতোষ মনে মনে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করে—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ···ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।···তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়॥ এর ফলে মনের ক্লেদ ও দূর ও অস্থিরভাব প্রশমিত হয়ে পরম প্রশান্তি ফিরে অ সতেই ঘুমে তার চক্ষু জড়িয়ে আসে। দূরে জেলখানার ঘণ্টাধ্বনি গভীর রাত্রি ঘোষণা করে।



সেদিন দিদির সঙ্গে মফস্বলের কাজ সেরে ট্রেন বিভ্রাটের কারণে দেবযানীর বাড়ি ফিরতে দেরী হয়। অগণিত তীর্থ যাত্রীর দুর্ভোগ দুর্দশা তো সে নিজেই প্রত্যক্ষ করেছে। হঠাৎ এভাবে ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ জানবার উৎসাহ ও আগ্রহ অনুভব করলেও দেবযানী দিদিকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। দিদিও স্বঃতপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে কিছু বলেননি। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে মামা, মামী ও সুদেবের অবস্থা দেখে এবং ট্রেন বিভ্রাটের কারণ মেল-ট্রেন ডাকাতি জেনে সে একেবারে হতভম্ব। এরূপ দুঃসাহসিক অভিযান নানা ডালপালা মেলে পাড়ায় পাড়ায় জটলার ইন্ধন যোগাচ্ছে।

ছেলে ছোকরাদের মধ্যে উৎসাহ, উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। এমন কি বয়স্কদের মধ্যেও তার আভাস পরিস্ফুট। সকলেই ধরে নিয়েছে এটা স্বদেশী ডাকাতি—অতিশয় গর্বের ও আনন্দের। ঘটনাটা জানবার পর থেকেই দেবযানীর মনে একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—এর সঙ্গে কি অনুতোষের গতিবিধির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়? সেদিন নিশুতি রাতে ডাকবাংলোতে নিশাচরের মতো তার আকস্মিক গোপন আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের সঙ্গে প্রেম নিবেদন—ফিরি আর নাই বা ফিরি, আমি তোমায় ভালোবাসি। সে-নিশীথে অনুতোষের প্রণয় ও অনুরাগ নিবেদন যৌবন-ছুঁই-ছুঁই কিশোরীর মনে যে অনির্বচনীয় পুলক ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছে তার রেশ এখনো চলেছে। অবসর মুহূর্ত গুলোতে মন তার অজানতে যে রঙীণ স্বপ্নের জাল বোনে তা অনুতোষকে ঘিরে—যার কথা ভাবতে ভালো লাগে সে অনুতোষ।

পরদিন ভাইবোন পড়ার টেবিলে বসেছে। কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর আজ কলেজে যাবার মনস্থ করে পাঠ্য-পুস্তকগুলি গুছোবার উদ্দেশ্য বইগুলি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেবযানী তার মধ্যে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ থেকে শুরু করে নানা মনীষী মহাপুরুষ ও মহাজনদের জীবনী, নানা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের বাণী সংবালত চটি চটি বই দেখতে পায়। এইগুলি যে সুদেবের আমদানী এই বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। পুস্তকগুলি গুছোবার ফাঁকে সুদেব কি পড়ছে চেয়ে দেখে—না পাঠ্য বই-ই—কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেবযানী বই খুলে পড়বার উদ্যোগ করতেই রান্নাঘর থেকে মামীর ডাক শুনতে পায়। বই বন্ধ করে আড়চোখে সুদেবের দিকে চেয়েই সে বেরিয়ে যায়। রান্নাঘরে ঢুকে মামীর চিন্তাক্লিষ্ট ও আগুনের আঁচে তপ্ত বিশুষ্কমলিন মুখখানা দেখে তার ভীষণ কষ্ট হয়।

মামী তার আগমন টের পেয়েই বলেন—বোস। দেবযানী মাটির ওপর একেবারে মামীর গা ঘেঁষে বসে বলে—তুমি ওঠে তো মা, বাকী রান্নাটা আমাকে করতে দাও।

—এখন তো রান্নার আর কিছু নেই। তোর মামার আপিসের রান্না তো হয়ে গেছে। তোদের স্কুল কলেজের রান্না ধীরে সুস্থে হবে—অবশ্য তুমি যদি কলেজে যাও আর সে স্কুলে যায়।

—ওমা, এ আবার কি ধারার কথা!

—যে রকম ধারা তোমরা দু'জনে অনুসরণ করছ। তুমি লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে চাকুরি-মত্ত। আর একজন গোয়ার গোবিন্দ—লেখাপড়া কতদূর কি হচ্ছে বুঝিনা—টেবিলের উপর বইপত্র দেখে তো মনে হয় না। শুধু খেলার মাঠ, শরীরের নাচন কোঁদন—তাকে শরীরচর্চা বলো আর যাই বলো। সবার উপর আড্ডা আর রেতেবিরেতে ফেরা। কিছু জিজ্ঞাসা করলে নিরুত্তর—মুখে রা নেই!

দেবযানী উর্মিলার আরো গা ঘেঁষে বসে বলে—আমার সম্পর্কে তোমার অভিযোগ অনুযোগের উত্তর ঃ প্রথম,—আজ থেকে তোমাকে আমি ছোটবেলাকার মতো মা বলেই ডাকবো। নকল ডাকাডাকি ভালো লাগে না, আর বলবোও না। দ্বিতীয়—তোমাকে আগেও বলেছি আবারও বলছি, চাকুরি আমাকে করতেই হবে। তোমার ও মামার হাড়-ভাঙা খাটুনি আমার সহ্য হচ্ছে না—হবেও না। তুমি তোমার এই শরীর নিয়ে দিবা রাত্রি রাঁধুনী ও ঝি-এর কাজ করবে আর আমি তা বসে বসে মুখ বুজে চক্ষু মেলে দেখবো তা আমার দ্বারা আর হচ্ছে না, হবেও না। তুমি যদি রাঁধুনীর বন্দোবস্ত না কর তো আমি করবো। তা যদি না হতে দাও তো আমি লেখাপড়া ছেড়ে একসঙ্গে ঝি আর রাঁধুনীগিরি করবো —দেখে নিও। এ বিষয়ে তোমাকে আগেও বলেছি এখন আবার বলছি —এটা আমার লাস্ট ওয়ার্নিং। তারপর লেখাপড়া? তা চাকুরি করতে হলে একটু আধটু ব্যাঘাত হয় বৈকি। তার জন্যে তুমি আদৌ ভয় পেয়ো না মা—পরীক্ষার ফল দিয়ে বিচার করো। তৃতীয়—সুদেব—ওর বয়স বাড়ছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয় জানবার, শেখবার ও বুঝবার আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহল, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ছে—তা খুবই স্বাভাবিক। ওর এই বয়ঃসন্ধিক্ষণের সঙ্গে দেশের অবস্থা বিবেচনা করে দেখ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্বোধন। ক্রমে ক্রমে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে তা অপ্রতিহত গতিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। দেশে এখন তিন রকম 'বাদ' (মত) প্রবল গতিতে প্রবহমান। এক, গান্ধীবাদ—অসহযোগ, বিদেশী বর্জন ইত্যাদি অহিংস গণআন্দোলন। দুই, সশস্ত্র বিপ্লববাদ—অস্ত্রের দ্বারা আঘাতের পর আঘাত হেনে বিদেশী শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের জর্জরিত এবং ভারতভূমি থেকে তাদের বিতাড়ন ত্বরিৎ করণ। উভয়েরই লক্ষ্য স্বরাজ—স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তিন, স্বামীজীর কর্মবাদ ও তাঁর উদাত্ত আহ্বান—এসো হিন্দু

মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—পরস্পরের ভেদাভেদ ভুলে, উঁচু নিচু প্রভেদ দূর করে, মন শুচি করে সবাই এগিয়ে এসো। কর্মদ্বারা স্বদেশের সমাজের কলুষ, কুসংস্কার পঙ্কিলতা দূর করে এক সুখী সমৃদ্ধিশালী নব-ভারত গড়ে তোল। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।

দেশে যুগপৎ এই ভাঙাগড়ার আন্দোলন, আলোড়ন, অস্ত্র-শস্ত্রের ঝণৎকার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিফলন কিশোর ও যুবমানসে অবশ্যম্ভাবী। এর প্রভাবে নানা জন নানা পথে যেতে পারে কিন্তু বিপথগামী কখনো হতে পারে না—এ তুমি নিশ্চিত জেনো। সুতরাং আমাদের জন্য ভেবে ভেবে তুমি বৃথা মন কালি করো না মা। বলেই দেবযানী উর্মিলার পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে থাকে। উর্মিলা হতভম্ব। সে দেবযানীর মাথাটা কোলের উপর তুলে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকে। মাতা পুত্রীর বেদনাঘন অশ্রুজল কিসের ইঙ্গিত বহন করছে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন।

হঠাৎ দিদি দিদি ডাক শুনে দেবযানী মায়ের কোল থেকে মাথা তুলে উঠে বসে। তারপর চোখমুখ মুছে কাপড় চোপড় ঠিক করে নিয়ে কিছু না বলেই ঘব ছেড়ে বেরিয়ে যায়। দিদিকে দেখেই সুদেব জিজ্ঞাসা করে —বাব্বা, মায়ের কাছে রান্নাঘরে বসে এতক্ষণ কি করছিলে? আমি তো ডেকে ডেকে হয়রান। আমাকে ইংরেজি বই-এর এই স্ট্যাঞ্জাটা বুঝিয়ে দাও না? দেবযানী বইখানা নিয়ে সেটা বার দুই পড়ে সরল ভাষায় ভাইকে বুঝিয়ে দেয়। ভাই খুশি। সত্যি দিদি তুমি প্রত্যিটি জিনিস এমন ভাল করে বোঝাতে পার! মনে হয় মাষ্টার মহাশয়রা পিছনে পড়ে থাকেন।

—না ভাই, এমন কথা কখনো বলো না। এতে মাষ্টার মহাশয়দের মতো গুরুজনদের হেয় করা হয় এবং তা অপমানেরই সামিল।

—না দিদি, আমি সেভাবে কথাটা বলিনি। তবে হাঁ, আমার বলার ধারাটা হয়তো ভুল হয়েছে। সুদেব হয়তো আরো কিছু বলতো কিন্তু দিদি তার পাঠে মনোনিবেশ করেছে দেখে সেও পাঠে নিবিষ্ট হয়।

দেবযানী উঠে যেতেই উর্মিলা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে চুপ করে বসে ভাবতে থাকে। দেবযানীর তাৎপর্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ছোটবেলা থেকেই ওর একগুঁয়েমি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে উর্মিলার পরিচয় আছে। সে জন্যই তো

তার মনে ওর সম্পর্কে একটা ভয় ভীতি জেগে আছে—কখন কী কাণ্ড করে ফেলে। বর্তমানে দেশের এই অস্থির পরিস্থিতি ও ডামাডোলের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না হারিয়ে যায়। আর ছেলেটাও তো দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে—এক রোখা, মুখে রা নেই। ভয় হয় এসবে মিশে শেষে না একটা মারাত্মক প্রাণঘাতী কাণ্ড করে বসে। না, উর্মিলা আর ভাবতে পারে না—ভাবনা চিন্তার অকূল পাথারের কূলে দাঁড়িয়ে সে দিশে-হারা।

স্বামীর আপিসের বেলা হয়েছে। ছেলে মেয়েদের জল খাবার বাকী। উর্মিলা উঠে পড়ে। ঘরে গিয়ে দেখে স্বামী নেই, হয়তো চানে গেছে। বাটি করে খাবার নিয়ে ছেলেমেয়ের টেবিলের উপর রেখে স্বামীর ডাক শুনে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

খেতে খেতে সুদেব হঠাৎ বলে ফেলে—জানো দিদি গতকাল ক্লাবের খবর—পুলিশের গুপ্তচর নাকি ক্লাবের উপর কড়া নজর রাখছে। আমার তো পুলিশের নাম শুনে ইচ্ছা হলো ঐ টিক'টকি ব্যাটাদের মোকাবেলা করে তাদের বেধরক ঠেঙানি দিই।

—ওহে বীরপুরুষ, খবরদার। অমন কর্মটি করতে যেও না। পুলিশ ছুঁলে বাঘের ছোঁয়ার মতো আঠারো ঘা—মনে রেখো। লাঠি পেটা করে থানায় নিয়ে বন্দী করবে। তখন বাবা মার ভাবনা ভোগান্তি আর নানা ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে হেনেস্থার আর অবধি থাকবে না। খুব সাবধান!

—তা বলে কি মনের কথাটাও ব্যক্ত করতে পারবো না!

—না, মনেব ইচ্ছা, ভাব কিংবা কথা যা বলেই তাকে অভিহিত করো—যা ব্যক্ত করলে এ-কান থেকে ও-কান সে-কান হয়ে সারা পাড়া ছড়িয়ে পড়ে শেষে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে অহেতুক বিপদ ডেকে আনে—তা অব্যক্ত রাখা উচিত নয় কি? যাক্ এসব বাদানুবাদ, উচিত অনুচিত সব কিছু একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে তোমাকে বুঝিয়ে বলবো ভাই. এখন সময় নেই। আজ শনিবাব সকাল সকাল ক্লাশ বসবে। পড়াটা সেরে তাড়াতাড়ি কলেজ যেতে হবে।

সকালে মায়ের ডাকে রান্না ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের পর তাঁর পায়ে পড়ে কান্না বুঝি দেবযানীর মায়ের নিকট একরকম অগ্রিম ক্ষমা

প্রার্থনারই সামিল। কেঁদে কেঁদে সে মনে মনে কেবল বলেছে ক্ষমা কর, মা ক্ষমা কর। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়। সেই জন্মভূমির উদ্ধারকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে বিপ্লবের রক্ত রাঙা পিচ্ছিল পথে সে এগিয়ে চলেছে। এর থেকে প্রত্যাবর্তনের কোন পথ নেই। স্বাধীনতা যজ্ঞে যে কোন দিন নিজেকে আহুতি দিতে হবে। এ ভাবেই তো যুগ যুগ ধরে স্বদেশ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে স্ত্রী স্বামী হারা, মা সন্তান হারা, ভাই বোন হারা, বে ন ভাই হারা হয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। এর তো কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মায়ের জন্য বিকল্প একটা ব্যবস্থা অবশ্যই বার করতে হবে। যিনি পিতৃমাতৃহীনা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে মায়ের অধিক স্নেহে লালন পালন করেছেন সেই জননীর কোল সে কিছুতেই খালি হতে দেবে না—তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তার অবর্তমানে মায়ের শোক সে হৃদয় দিয়ে অনুক্ষণ অনুভব করছে—কান পাতলেই সে বুঝি তাঁর কান্না শুনতে পায়। জন্মভূমি আর জননীর প্রতি কর্তব্যবোধেব টানা পোড়েনে সে বুঝি দিশে-হারা—সে কি করবে। সে জানে তার ফেরাব আর পন্থা নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কিন্তু সুদেব। তাকে মায়ের কোল জুড়ে রাখতে হবে। বিপ্লবের রক্ত বাঙা পিচ্ছিল পথে সুদেবের পদক্ষেপ অবশ্যই রুদ্ধ করতে হবে। রান্না ঘরে মায়ের কাছ থেকে ফিরে এসে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসেও পাঠে তার মন বসছে না—সারাক্ষণ কেবল একই কথা অন্তরের অন্তস্তলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সুদেবকে রুখতেই হবে, মায়ের জন্য তাকে রক্ষা করতেই হবে।

কোনোরকমে নমোনমো করে পাঠ শেষে দেবযানী উঠে পড়ে। কলেজ শেষে আখড়ায় যেতে হবে। আগামীকাল মাসের শেষ রবিবার—চড়ুই-ভাতি। হাড়ি কড়াই ডেগচি কলসি ইত্যাদি রান্নাবান্নাব সাজসরঞ্জাম, চাল জল তেল নুন সহ নানা খাদ্য দ্রব্য নিয়ে রেলে চেপে এক পাহাড়িয়া স্টেশন যেতে হবে। সেখান থেকে দূর বন জংগলে গিয়ে রান্না খাওয়া দাওয়া। তার ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের গায়ে টাবগেট সুটিং প্র্যাকটিস্—চাঁদমারি। রিভলবার কিংবা সট্‌গান দিয়ে লক্ষ্যভেদে তার বড় একটা মিস (ফসকায়) হয় না। তাছাড়া আর এক ভদ্রলোক রাইফেল নিয়ে এসে তালিম দেন। তার সঙ্গে প্রায় সমানে সামনে পাল্লা দিয়ে সে লক্ষ্য ভেদ করে—দারুণ আনন্দ আব উত্তেজনা।

সারাদিনের কাজকর্মের শেষে অবসর মুহূর্তে তার একমাত্র ভাবনা মাতা আর ভ্রাতা। একটা অশান্ত চিন্তা প্রবাহ এদের দু'জনকে ঘিরে তাকে নিয়ত উতলা, অস্থির ও উন্মনা করে তুলছে। কি ভাবে তার সমাধান করবে। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন ঘোরালো হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক গগনে এক প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস। বিপ্লবী দলেও সাজ সাজ রব—শত্রুকে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হানতে হবে। সেই শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। কিশোব ও যুবমানসে প্রবল উত্তেজনা ও দুঃসাহসিক কর্ম প্রবণতার বাতাববণ সৃষ্টি হচ্ছে। নিজেকে দিয়েই সে তা অনুভব করছে—চলরে চলরে চল···জীবন আহবে চল।

বিকেলে দেবযানী আখড়া থেকে আগেই ঘরে ফিরে আসে। উর্মিলা দরজা খুলে তাকে দেখেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—কিরে, শরীরটরির খারাপ নাকি?

—না গো না। কিছু লেখা পড়া আছে। আগামীকাল আবার চড়ুইভাতি—দৌড়ঝাপ, খেলাধূলা—দিনমানের জন্য। কেবল ভোরেই বেরিয়ে যেতে হবে। সুদেব ফেবেনি?

—না, সে বাবুর কি সকালে ফেবা সম্ভব! খেলাধূলা জিমনাষ্টিক ক্লাব—সবাব উপরে আছে আড্ডা।

দেবযানী ভাইয়ের বিরুদ্ধে মায়ের অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে ঘবের দিকে যেতে যেতে পেছন থেকে তাঁব ডাক শুনতে পায়—হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে জল খাবার খেতে আয়।

কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে দেবযানী পড়াব টেবিলে বসে সুদেবের বইগুলি একে একে দেখতে থাকে। মাঝে মাঝে এক একটা বই খুলে তাব থেকে কিছু অংশোদ্ধার কবে মনে মনে তা ব্যাখ্যা করে বুঝবাব চেষ্টা কবে। বান্না ঘর থেকে মায়েব ডাক কানে আসতেই সে—আসছি, বলে দৌড়ে গিয়ে মায়েব কোলে ঘেঁষে বসে পড়ে।

উর্মিলা তার পিঠে আলতো ভাবে হাতখানা বেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপাব বলতো যানী, হালে দেখছি তুই আবার ছোট বেলাকার মতো কেমন যেন স্নেহের কাঙাল আর নেওটা হয়ে পড়তে চাইছিস? বলেই উর্মিলা স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে ক্ষীণ হাসি হাসে।

—হাঁ, ঠিকই বলেছ মা,—আমিও আমার মনের ব্যাপারটা ঠিক

ধরতে পারছি না। যখনই তোমার কাছে আসি তখন কেন জানি তোমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে কেবল মা মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। আবার যখন দূর থেকে তোমাকে দেখি তখন সাধ জাগে ঐ তুলসী মঞ্চের বেদীতে তোমাকে বসিয়ে প্রণাম করে বলি—মা, জননী, তুমি আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

উর্মিলা দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে কোলের কাছে টেনে এনে আদর করে বলে—না যানী, এসব ভালো লক্ষণ নয়—আমার মন বলছে এ আদৌ শুভ চিহ্ন নয়। কয়েক ফোঁটা স্নেহ বিগলিত অশ্রু তাঁর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। বাঁ হাতে খাবারের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বলে—নে, খেয়ে নে, না হলে ইচ্ছা হয়তো বল খাইয়ে দি।

—না, আর অত আদর আহ্লাদ দেখিও না মা, দেবযানী চক্ষু মুছে বাটিটা নিয়ে কোন রকমে খাবার গিলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

উর্মিলা অবাক। সে বুঝে উঠতে পারছে না—কেন হালে দেবযানীর এরূপ অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে। বরাবরই দেবযানী সম্পর্কে সে উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠা পোষণ করে আসছে। অধুনা তা যেন দেবযানীর মানসিক অবস্থা আচার আচরণ দেখে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, উর্মিলা রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে শিকল টেনে বেরিয়ে যায়। কলতলায় হাত মুখ ধুয়ে বস্ত্র পরিবর্তনের পর ধুপ ধুনো শঙ্খ প্রদীপ নিয়ে তুলসী মঞ্চে উপস্থিত। শঙ্খধ্বনি দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম ও সকলের মঙ্গল কামনা করে বলে—ঠাকুর যানীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিওনা, দোহাই তোমার! ঘনায়মান অন্ধকারে উর্মিলার ব্যথা-ভরা করুণ কাতর প্রার্থনায় তার প্রাণের ঠাকুর বুঝি অলক্ষ্যে হাসেন—নিয়তি কে ন বাধ্যতে! কিন্তু মঞ্চস্থ দীপশিখায় সহানুভূতিতে যেন মৃদু মন্থর কম্পন জাগে!

দেবযানী ঘরে এসে টেবিলের বইগুলি গুছিয়ে পড়তে বসে। কিন্তু মন বসছে না। সুদেবের তখনো দেখা নেই। উঠোনে তুলসী মঞ্চ থেকে মায়ের শঙ্খধ্বনি কানে আসে। ইচ্ছা হলো ছুটে যায়। উঠে আবার বসে পড়ে। অধুনা মায়ের কাছে গেলেই তার মনের ভাব-প্রবণ দুর্বলতার প্রকাশ আকস্মিক ভাবে অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে। ফলে তিনি খুবই কষ্ট পান। এখন থেকে মায়ের সম্মুখে সাবধান হতে হবে। কিন্তু যখন সত্যই সে চলে যাবে। তখন তাঁর অবস্থা কি হবে? কেঁদে কেঁদেই

হয়তো মরে যাবেন। না, দেবযানী আর ভাবতে পারছে না—চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়া শুনেই দেবযানী চক্ষু মুছে উঠে পড়ে। দরজা খুলে দিতেই সুদেব জিজ্ঞাসা করে—দিদি, আজ যে বড্ড সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছ?

—হঁা, বলেই দেবযানী সুদেবের আগেই ঘরে ঢুকে একখানা বই খুলে পড়তে বসে।

সুদেব টেবিলের ওপর বইখাতা রেখে হাতমুখ ধুতে কলতলায় যাবার মুখে মায়ের ডাক শুনতে পায়—সুদেব খেতে আয়।

—যাই, বলে সুদেব কলতলা থেকে সোজা রান্না ঘরে গিয়ে হাজির। খেতে খেতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক। সে মুখ জলভারনত আষাঢ়ে মেঘের মতো ঘনঘোর বিষাদ-মলিন। বেরিয়ে আসবার সময় মা শুধু বললেন—বিকেলের খাবার রাতে খেলে, রাতের খাবার কখন খাবে? মায়ের কথার কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে সুদেব নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ঘরে ফিরে দিদিকে শুনিয়ে কতকটা স্বগতোক্তির মতোই বলতে থাকে,—মা তো ফতোয়া দিয়েই খালাস। কিন্তু সেটা পালন করা যায় কি ভাবে! স্কুল আছে, জিমনাষ্টিক ক্লাব আছে, তার ওপর রয়েছে খেলার মাঠ ও মিশন। এর মধ্যে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা রেখে যথাসময় বিকেলে খাবার জন্য ঘরে আসা সম্ভব?

সুদেবের মন্তব্য কানে যেতেই দেবযানী বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে—তা মায়ের কথার কি জবাব দিলে?

—কি আর জবাব দিই বল—ভেবেই পেলাম না। অমনিই বেরিয়ে এলাম।

—সে কি? দেবযানীর মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সামলে নিয়ে বলে—জানো, মা জননী গুরুজন, স্বর্গের চাইতেও গরিয়সী। তাঁর জিজ্ঞাসার হাঁ, না, কিছুই উত্তর দিলে না? এ দ্বারা কি তাঁকে অবহেলা করা হলো না? গলার স্বর উচ্চে তুলে বলে—অবহেলা আর অপমান কি এক পর্যায় পড়ে না—বলো, তুমিই বলো। দিদির গলার স্বরে সুদেব প্রমাদ গোনে। —তোমার প্রবলেম্ এমন কিছু মারাত্মক তো নয় যে সলভ্ করা যায় না। স্কুল এ্যাটেণ্ড কমপালসারি (আবশ্যিক) বাকী—জিমনাষ্টিক ক্লাব, খেলার মাঠ, মিশন—এ সব তো অপ্শন্যাল্,

ঐচ্ছিক, গেলেও হয়, না গেলেও চলে। নয় কি? তার উপর রোজ রোজ তো খেলা হয় না, জিমনাস্টিক ক্লাব কিংবা মিশন যাওনা। সুতরাং স্কুলের পর খাবার খেয়ে মাকে বলে বেরিয়ে যাবে এবং যেটা যেদিন থাকে সেটা এ্যাটেণ্ড করবে. বিষয়টা তো খুবই প্রাঞ্জল, গোলমালের ব্যাপার তো কিছু নেই—বল, ঠিক কিনা!

—সত্যিই দিদি, তুমি অদ্ভুত, বলেই সুদেব দিদির গা ঘেঁষে বসে পড়ে। —তোমার মতো এত বুদ্ধি বিবেচনা যদি চট্-জলদি আমার মাথায় আসতো!

—তা হলে মায়ের ইচ্ছা মতো রোজ স্কুল থেকে এসে বিকেলের খাবার খেয়ে তারপর বেরবে—ঠিক তো?

—হ্যাঁ, কণ্ঠে আরও উচ্ছ্বাস এনে বলে—হ্যাঁ দিদি, আলবৎ।

—বেশ, বেশ। এখন এক কাজ কর। মায়ের কাছে যাও। তাঁকে প্রণাম করে বলো—মা, তোমার আদেশ শিরোধার্য। এবার থেকে রোজ বিকেলে ঠিক সময়ে খাবার খেতে আসবো। দেখবে মা তোমাকে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কত আশীর্বাদ করেন—মায়ের আশীর্বাদ আমাদের জীবনের পাথেয়—আপদে বিপদে রক্ষা কবচ!

—উঃ দিদি, তুমি যে কি ভালো। তোমার যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনি বিচার বিবেচনা! তোমার মতো জ্ঞান বুদ্ধি যদি আমি পেতাম! দাঁড়াও দিদি, মায়ের কাছে যাবার আগে তোমাকে একটা সেবা দিয়ে যাই। বলে সে মাথা নিচু করতেই দোবযানা তার হাত ধরে বুকের কাছে নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে আদর করে—কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তার কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। সুদেব স্তম্ভিত। দিদির চোখের জল দেখে তারও চক্ষু ছল ছল করে উঠে—একি দিদি তুমি কাঁদছো!

—না ভাই, এ আমার কান্না নয়—আনন্দাশ্রু, বলেই সুদেবকে ছেড়ে দেয়।

দিদির আদেশ শিরোধার্য করে ঘর থেকে বেরিয়ে সুদেব মায়ের ঘরে যায়। ঘর খালি বাবা তখনো আপিস থেকে ফেরেন নি। উঠনে নেমে দেখে মা নেই। তুলসীমঞ্চের প্রদীপটি তখনো টিম টিম করে জ্বলছে। সেখানে প্রণাম করে সুদেব রান্না ঘরে প্রবেশ করে। মা রান্নায় ব্যস্ত। উনুনের আঁচে তাঁর চোখমুখ রক্তপাণ্ডু—শুষ্ক মুখখানা কেমন যেন দেখাচ্ছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মায়ের করুণ রঙীন মুখখানা দেখে মায়ের

উপর তার অনির্বচনীয় ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদ্রেক হয়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে উঁবু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠে, উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি—কে, কে, বলতেই সুদেব মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মা, আমি সুদেব।

মা শান্ত হয়ে সুদেবের হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলে—বড্ড ভয় পেয়েছিলাম রে। মনটা আজকাল কেন যেন সর্বদাই অস্থির চঞ্চল—অন্তরে বুঝি অশুভের ছায়াপাত ঘটেছে—একটুতেই ভয় পাই। তা কি ব্যাপার বল তো বাবা।

—কিছু নয় মা। তখন তুমি বিকেলের খাবার সম্পর্কে বললে। আমি জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। তাই ক্ষমা চেয়ে বলতে এলাম—মা, এখন থেকে বিকেলে স্কুলের পরেই ঠিক সময়ে এসে খাবার খাবো। যেদিন আসবো না, আগেই বলে যাবো।

ঊর্মিলা মনের হৃষ্ট ও তুষ্টি ভাব গোপন করে হাত ধরে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে—তোমাদের জন্য কেমন যেন একটা অব্যক্ত ভয় ভাবনা আমাকে অহর্নিশ তাড়া করে ফিরছে। তা থেকে একমাত্র মুক্তির পথ—যদি দেখতে পাই লেখা পড়া শিখে তোমরা সত্যিকারের মানুষ হচ্ছ। পিতা মাতার মুখ তাতেই উজ্জ্বল হবে, আনন্দ ও গৌরবে ভরে উঠবে।

সুদেব মায়ের কাছ থেকে উঠে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মায়ের করুণ বিষাদমলিন মুখখানা তার হৃদয়-পটে বুঝি আঁকা হয়ে গেছে। আশ্চর্য, মাকে তো এমন করে আগে কোন দিন দেখেনি। হয়ত মায়ের মুখের দিকে ইতিপূর্বে এমন করে তাকাবার তার অবকাশও ঘটে নি। এভাবেই তার কিশোর চিত্তে মায়ের সম্পর্কে একটা মমতা-মাখা অনুভূতি জেগে উঠলো।

ঘরে ফিরে দিদির কাছে গিয়ে বলে—তোমার পা'টা একটু বাড়াও তো দিদি, একটা পেন্নাম করি। বাব্বা, যা শিক্ষা আজ দিলে তা জীবনেও ভুলবো না। মায়ের অবাধ্য আর কখনো হবো না, বা হতে চাইবো না। সুদেব প্রণাম করবার জন্য এগোতেই দেবযানী ভাইয়ের হাত ধরে ফেলে বলে—মনে রেখো এটা তোমার শপথ—মানে আজ থেকে তুমি শপথ নিলে যে কখনও মায়ের অবাধ্য হবে না। এই সঙ্গে, আর এক শপথও নাও যে কখনও কোন অবস্থাতেই তুমি মাকে ছেড়ে যাবে না। বল—

মাকে ছেড়ে যাবে না। দিদির চোখ মুখের অবস্থা এবং কথার ধরন-ধারন দেখে বিমূঢ় সুদেব অগোচরে দিদির কথারই পুনরুক্তি করে—মাকে ছেড়ে কখনো যাবো না।

ভাইকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে দেবযানীর হৃদয় আনন্দে উত্তাল। এতদিনে তার মনষ্কামনা পূর্ণ হলো। ভাইকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে —আজ থেকে তুমি আমার নিকট আর এক সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলেই গণ্য হলে। জানো তো যুধিষ্ঠির সত্য রক্ষার জন্য রাজ্যপাট ছেড়ে চলে গেলেন—মাতৃ আজ্ঞা রক্ষার জন্য পাঁচ ভাই মিলে এক কন্যা বিয়ে করলেন। দিদির হাত থেকে মুক্ত হয়ে সুদেব আপন চেয়ারে গিয়ে বসে। পাঠে বুঝি আর কারো মন বসে না। উভয়েই নির্বাক নিঃশব্দ —আপন আপন ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন।

সে রাতে, খাবার আসরও তেমন জমে না—কেমন যেন মিয়ানো। গৃহকর্তার কথায় ভাই বোনের মনে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক সারা জাগায় না। যে সুদেব অনবরত বক্‌বক্‌ করে খাবার আসর জমজমাট রাখে সেও যেন কেমন মিয়ানো নির্জীব। ক্লাব, মিশন এমন কি খেলার মাঠের উল্লেখেও সে উদ্দীপ্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে না। উর্মিলা বরাবরই নীরব শ্রোতা। সেও হাওয়া বুঝে আসর সরব রাখার চেষ্টা করে। আর দেবযানীকে কথাবার্তায় তার পূর্ব ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করেও বুঝি হার মানতে হয়।

ভাই বোন ঘরে ফিরে আসে। পড়ার টেবিলে বসে সুদেব বই খুলে কিছুক্ষণ মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়। বইখানা মুড়ে রেখে বলে—না দিদি আজ আর পড়ায় মন বসছে না। ইচ্ছে হচ্ছে ছোট-বেলাকার মতো তোমার পাশে শুয়ে গল্প শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়ি।

—ওমা, বুড়োধাড়ী ছেলের এ আবার কি রকম ধারা শখ আর আবদার। এখন তো তুমি আর ছোট্টটি নও ভাই। শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পদার্পণের মুখে। এখন কি আর শৈশবের রঙিন কল্পনায় মোড়া সে-কালের লালাবাই—ঘুমপাড়ানি গান, গাথা কিংবা রাজপুত্র ময়ূরপঙ্খী ডিঙায় চড়ে নীল সাগর, লাল সাগর, দুধ সাগর—পরপর সাত সাগর পাড়ি দিয়ে, জটা রাক্ষসীর কবল থেকে রূপবতী কেশবতী রাজকন্যার উদ্ধার করে পাতাল পুরী প্রবেশ করে সোনার খাঁচায় রূপোর পাখির

গলা ছিঁড়ে রাক্ষসী নিধনের পর কন্যার বিয়ে; কিংবা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজার ছেলে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে গজমতী হারের খোঁজে দিগ্বিজয়ে বার হওয়ার রূপ কথা ভালো লাগবে?

—তা যা বলেছ দিদি। তবুও রূপ-কথা শুনতে একদম ভালো লাগে না এমন কথা বলতে পারি না। তবে হাঁ, সে সব মনকে যেন আর আগের মতো টানে না—তার চুম্বক শক্তি যেন ক্ষয়ে গেছে।

—তাই তো স্বাভাবিক। তুমি এখন বড়ো হচ্ছো। বাস্তব জগতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছ। এখন কল্পনার জাল না বুনে যুক্তির জাল বিস্তার করে জ্ঞাত অজ্ঞাত অনেক কিছু জানবার ও বুঝবার আগ্রহ, ভালোমন্দ বিচার বিবেচনার সঙ্গে আবেগ উত্তেজনা খুবই স্বাভাবিক।

—কিন্তু দিদি, আমার ব্যাপারটা কেমন যেন উদ্ভট! হয়তো তোমাকে বলে ঠিক বোঝাতে পারবো না—মাঝে মাঝে সব তাল গোল পাকিয়ে যায়। স্কুলে থাকাকালীন মনের ভাব হয় এক রকম—পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন কালে মাস্টার মহাশয়দের উপদেশ মতো জ্ঞানে, গুণে, দানে, দয়ায়, কাজে কর্মে কখনও বিদ্যাসাগর, কখনো রাজা রামমোহন, কখনো বা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ইত্যাদি গরীয়ান মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে নিজেকে গড়ে তুলতে ইচ্ছা করে।

—স্কুল, ছুটির পর জিমনাস্টিক ক্লাবে গেলে মনের ভাব হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। বলে, বীর্যে, শৌর্যে, শক্তি সামর্থ্যে গোবর, গামা, শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ কিংবা আমাদের ক্লাবের জিমনাস্টিক মাস্টার কালি বিঙ্কর বাবুর মতো হবার যেন সাধ জাগে। তেমনি আবার স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা গুলিগোলা বোমা পিস্তল নিয়ে সাহেবদের মেরে শহিদ হচ্ছেন, পুলিশদের বেধড়ক ঠেঙাচ্ছেন, দারোগা খুন করছেন, তাঁদের মতো হতে মন চায়। তখন সে কি উত্তেজনা জাগে, সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলে!

—যেদিন মিশনের আশ্রমে যাই, মনের ভাব, ধ্যান-ধারণা সব একেবারেই পাল্টে যায়। সাধু মহারাজদের আধ্যাত্মিক বড় বড় কথা না বুঝলেও অনুভব করি তাঁরা দেশেরও দশের সেবা—মানসিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য নানা রকম কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে চলেছেন। জানো দিদি ওখানের এক গগন মহারাজ আমাকে খুব স্নেহ করেন। একদিন তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—আনন্দমঠের কাহিনী আর কলকাতায় প্লেগের

সময় মহীয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য মহারাজদের নিজের জীবন বিপন্ন ও তুচ্ছ করে আর্ত ও পীড়িত জনের সেবা শুশ্রূষার কাহিনী শুনিয়েছেন। তা ছাড়া রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা,—অলৌকিক ঘটনা সমূহ অনেক সময় গল্পাকারে বলেন। শুনতে এত ভালো লাগে! ভক্তি শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে, মাথা নত হয়। গগন মহারাজ আর একদিন আমাকে মুষ্টি ভিক্ষা তুলতে এবং অন্য একদিন তাঁদের সেবা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। কি বলবো দিদি—সেখানে এক জায়গায় রোগীরা সব অপেক্ষা করছে। সে যে কত রোগী আর তাদের কতরকমের ব্যাধি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর এক জায়গায় গরীব দুঃখীদের ভোগ প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। এলাহী ব্যাপার—অথচ সবই কিন্তু ভিক্ষালব্ধ।

দেবযানী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাইয়ের মনের গুরুগম্ভীর ভাবটাকে একটু হালকা করবার উদ্দেশ্যেই—সাধু! সাধু!! বাহবা দিয়ে বলে—তোমার কথা সব শুনলাম এবং সত্যিই খুশী হলাম। আজ এখানেই ইতি হোক। আর একদিন তোমার কথার উত্তরে কি করণীয় সব বুঝিয়ে বলবো, এখন রাত্রি অনেক। মায়ের রাতের টহল সমাগত। তখন যদি তিনি দেখেন যে আমরা জেগে বকবক করছি তা হলে অনর্থ করবেন। তার উপর আগামীকাল আমাদের পিকনিক। সকালে উঠেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। দেবযানী হ্যারিকেন লণ্ঠনের ফিতেটা কমিয়ে সেটাকে টেবিলের নিচে রেখে দেয়। ভাইবোন আপন আপন বিছানায় শুয়ে পড়ে। বাইরে বৃক্ষশাখে নাম না জানা কতগুলি রাতের পাখী ডেকে ডেকে গভীর রাত্রি ঘোষণা করে।

দলের প্রধানের সঙ্গে সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পরের দিন যথা সময়ে বড় ডাকঘরের কেশিয়ার ভোজপুরী [illegible] [illegible] নিয়ে ভেতর দিকের এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে।

অনুতোষও অনুরূপ কেশিয়ারের সাজে ডাকঘরের বাইরের বারান্দা থেকে নেমে তাদের অনুসরণ করে। ঐ সময়ে এক কাবুলী ডাকঘরের সদর গেটের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার সম্মুখ দিয়ে তিনজন বেরিয়ে যেতেই সে চট করে রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গিয়ে হন্ হন্ করে হাটতে থাকে। তার দৃষ্টি রাস্তায় চলমান তিন ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ। টিলার কাছে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে পুলটা দেখা মাত্রই কাবুলী দ্রুত হেঁটে সেটা পার হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। কেশিয়ার ও দারোয়ান পুলের উপর আসতেই সে পুনরায় পুলে উঠে ধীর পদক্ষেপে উভয়কে সম্মুখ থেকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে করতে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। কিন্তু এদের অনুসরণকারী তৃতীয় ব্যক্তিকে সে দেখতে পায় না। পুলে উঠবার আগে পর্যন্ত সে তাকে দেখেছে। রাস্তায় লোক-চলাচল একরকম নেই বললেই হয়—আশ্চর্য লোকটা গেলো কোথায়? মনের মধ্যে এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। পাশেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন জঙ্গল। না, এখানে একা দাঁড়িয়ে তৃতীয় জনের জন্য অপেক্ষা করার কোন অর্থ হয় না। তার যা দেখবার তা দেখেছে যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। সুতরাং অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের পূর্বেই সে সেখান থেকে সরে পড়ে।

অগ্রগামী কেশিয়ার ও দারোয়ান রাস্তার ধারে জঙ্গলের নিকটবর্তী হতেই পেছন থেকে কি কৌশলে তাদের কাবু করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে বন্দী করে রাখা যায় মনে মনে তার একটা রিহার্সাল দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর অনুতোষ জঙ্গলে নেমে যায়। সেখানে কি অবস্থায় কোথায় তাদের রাখবে এবং সেই সঙ্গে লুটের টাকা-কড়িরও বা কি ব্যবস্থা করবে তার একটা ছক সারা জঙ্গল ঘুরে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তৈরি করে অনুতোষ রাস্তায় উঠে আসে। সেখানে আবার মনে মনে প্রতিপক্ষ ব্যক্তিদ্বয়কে কল্পনা করে নিয়ে পরিকল্পনা মতো একে একে তাদের অপসারণ ইত্যাদি সমুদয় কর্ম সম্পাদন করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখুঁত মহড়ার সাফল্যে অনুতোষ খুবই উল্লসিত। জঙ্গল থেকে ভিন্ন পথে উঠে সে আখড়ার দিকে রওনা হয়। কিছুদূর গিয়েই তার মনে হঠাৎ একটা খটকা জাগে। জঙ্গলে লোক-লোচনের অন্তরালে যা সম্ভব তা লোক

চলাচলের রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে দু'জনকে ঘায়েল করে গুম করা সম্ভব হলেও তা কতদূর যুক্তি সংগত? এই প্রশ্নই অনুতোষের মনে বড় হয়ে দেখা দেয়। বিশেষত এতবড় বিপদ-জনক কাজে যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ সংগোপনে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এইসব ভাবতে ভাবতে অনুতোষ জঙ্গলের ধারে রাস্তায় আবার ফিরে আসে। রাস্তা দিয়ে কিরকম লোক চলাচল করে তা পুল অবধি দু'বার টহল দিয়ে বুঝে নেয়। এখন অপরাহ্ণ বেলা—রাস্তায় লোক প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু কেশিয়ার ও দারোয়ান উভয়েরই রাস্তা অতিক্রম কালে লোক চলাচল কি রকম এবং তদনুযায়ী লোক-চক্ষে ধুলো দিয়ে তাদের অপসারণ করে কি ভাবে কাজ হাসিল সম্ভব তা অবশ্যই সরজমিনে তদারক করে দেখতে হবে। সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী কালের জন্য মুলতবী রেখে সে পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বড় রাস্তা থেকে অমৃত কাননের রাস্তায় পড়ে অনুতোষের কেমন যেন দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে—হঠাৎ আলো থেকে অন্ধকারে এলে যা হয়! এ রাস্তাটার দু'পাশে গাছপালা, লতাপাতা, ঝোপ ঝাড়ের এতই আধিক্য যে মধ্যাহ্ন বেলাতেও সূর্যালোক ভালো প্রবেশ করতে পারে না। এখন অপরাহ্ণ কিন্তু রাস্তাটা অস্পষ্ট আলোতে মনে হয় যেন সায়াহ্ন। অনুতোষ রাস্তা থেকে মাঠে প্রবেশের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। গেট খুলতে গিয়ে থেমে যায়। দেখে এক তরুণী গেট বরাবর এগিয়ে আসছে। অনুতোষের গেট খোলা আর হয় না। হাতটা সরিয়ে নিয়ে দাঁড়ায়। দূর থেকে তরুণীটিকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। কাছে আসতেই দেখা গেল শুধু চেনা নয়—অতি চেনা—একান্ত আপন-প্রিয়!

ওদিকে দেবযানী আলো থেকে হঠাৎ গাছপালা ঢাকা অল্প আলোতে গেটের ওধারে রাস্তায় দাঁড়ানো অনুতোষকে প্রথমে ঠাহর করতে পারে নি। গেট খুলতে গিয়ে দেবযানীর দৃষ্টি গেটের ওধারে দাঁড়ানো অনুতোষের ওপর পড়তেই যুগপৎ আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার অন্তরে নানা ভাবের খেলা চলতে থাকে। অনুতোষের সাক্ষাৎ লাভ এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে দেবযানী গেট না খুলে তাতে হাত রেখে নির্বাক নিশ্চল চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অনুতোষের অবস্থাও [illegible]

দেবযানীর প্রতি অঙ্গের রূপ লাবণ্য যেন ফেটে পড়ছে। বসন্তের পুষ্প বনের গন্ধে, লাবণ্যের হিল্লোলে ভরপুর! অনুতোষ তদ্‌গত চিত্তে বিভোর হয়ে অদূরে বৃক্ষপত্র ভেদ করে অস্তাচল গামী সূর্য্যের শেষ ম্লান তির্যক রশ্মি-স্নাত দণ্ডায়মান দেবযানীর রূপ-সায়রে বুঝি ডুবে যাচ্ছে। আকাশের নানা রঙের মেঘ মালার সৌন্দর্য শতসহস্র খণ্ডে ছড়িয়ে প্রিয়ার নারী সত্তার মূর্তরূপ পরিগ্রহণ করেছে। উভয়েই আপন মনের মাধুরী মিশায়ে পরস্পরকে রচনা করে বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছে—সময়ের খেয়াল নেই।

অনুতোষই প্রথম মোহাবেশ থেকে স্ববশে ফিরে আসে। ছোট্ট একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবযানীকে সুধায়—কেমন আছ?

ঐ কণ্ঠস্বরে বুঝি অনুরাগে রঞ্জিত দেবযানীর হৃদয়-তন্ত্রীতে নতুন সুরের ধ্বনি বেজে উঠে তাকে সচেতন করে। গেট খুলে সে অনুতোষের সামনে এসে দাঁড়ায়। স্মিত আননে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে—দেহ মন প্রাণ যার নিকট অর্পিত ও উন্মুক্ত তার নিকট লজ্জায় মুখ বুজে থাকা অর্থহীন, হাস্যকর নয় কি? জীবন নিয়ে ছলা কলার আর কোন অর্থ নেই। সত্য সূর্য্যালোকের মতো উজ্জ্বল আর চন্দ্রালোকর মতো নির্মল। তা স্থির করে আজ এই মুহূর্ত থেকেই তোমাকে নতুন ভাবে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবো। এতে যদি কিছু অন্যায় হয় ক্ষমা করো। প্রত্যুত্তরে তোমার কথার পুনরুক্তি না করে তোমাকেও জিজ্ঞাসা করছি—ভালো আছো?

অনুতোষ সহাস্যে জবাব দেয়—ক্ষমা অক্ষমার কোন প্রশ্নই ওঠে না দেবযানী। তোমার অধিকার নিয়ে যে অভিধায় ইচ্ছা আমাকে ডেকো। রক্তমাংসে গড়া সুস্থ সবল দেহে আমি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত—কোন হেরফের নেই। তবে কি জানো— জীবন তো পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো ক্ষণস্থায়ী; যে কোন মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে—বিশেষ করে স্বদেশের মুক্তি-যজ্ঞে উৎর্গিত-প্রাণ বিপ্লবীদের। সত্যি করে বলছি—অধুনা তোমাকে দেখবার জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিলো। তাই এই প্রদোষ লগ্নে তুমি আকস্মিক আমার সামনে এসে দাঁড়ালে। দু'চোখের মিলন—ঘটনাটা খুবই বিস্ময়কর। না, আর নয়। বিপ্লবীদের পক্ষে এরূপ সাক্ষাৎকার ও বাক্যালাপ অবৈধ, ব্রাত্য—তা তো জানোই। এ নিয়ম ভঙ্গের জন্য ভবিষ্যতে হয়তো কঠোর ভবল প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এখন বিদায় দাও।

আমার নিকট যে ভাবে ব্যক্ত করেছিলে, আমিও আজ এই গোধূলি লগ্নে নিজেকে তোমার নিকট ব্যক্ত করে বলছি—আমি তোমার, তুমি আমার। এতে কোন প্রত্যাশিত জৈবিক কামনা বাসনার লেশ মাত্র নেই। দেব-দেউলে এক পূজারিণীর পুষ্পার্ঘে আত্মনিবেদন—আমি তোমার একান্ত ভাবেই তোমার। কথা শেষে দেবযানী অনুতোষের সম্মুখে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। অনুতোষ তাকে তুলে ধরে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বনে ভরিয়ে দেয়।

রোগ শয্যায় যে জীবন নাটকের শুরু এ শুধু তার অন্তবর্তী পট-পরিবর্তন। শেষ অঙ্কের অভিনয় ও যবনিকা পাত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত।

দেবযানীকে বড় রাস্তা অবধি পৌঁছে দিয়ে অনুতোষ আখড়ার পথে ফিরে চলে। দেবযানীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক সাক্ষাৎ—এক অঘটনীয় ব্যাপার। অত্যাসন্ন বিপদ-সঙ্কুল অভিযানের পূর্বে মনে মনে সে একান্ত ভাবেই দেবযানীর সাক্ষাৎ কামনা করেছিলো, কিন্তু সে চোখের আড়াল হতেই অনুতোষের মনে হলো সব যেন ফাঁকা—অন্তর একেবারে শূন্য।

অভিযান পরিচালনা ও তার সাফল্যের জন্য বিগত কয়েকদিন যাবৎ সে যে ভাবে নানা পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে তা যেন আচম্বিতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। সব যেন কেমন এলোমেলো—চিন্তায় দৈন্য, মনে নৈরাশ্য ও ক্লৈব্য ভাব। দেবযানীর সঙ্গে আগেও তো দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে—আশ্চর্য এমনটি তো কখনো ঘটে নি। অনুতোষের গীতার সেই মহৎ অভ্রান্তবাণী স্মরণে আসে- সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম। স্মৃতি ভ্রংশাদ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি। বুদ্ধি নাশ হলে বিনাশ প্রাপ্তি ঘটে! সর্বনাশ—এ যে ভীষণ ব্যাপার—একেবারে বিনাশ। না, না, এমনতো কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ—নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগের জন্য অনুতোষ রক্ত চক্ষু দেখিয়ে নিজেকে শাসন করতে করতে আখড়ায় এসে হাজির হয়।

সন্ধ্যা সমাগত। গুরখা আখড়ার সম্মুখে বসে আছে। তাকে দেখে

[illegible]

গিয়ে শরীর চর্চা, লাঠি, ছোরা ইত্যাদি অস্ত্র ক্রীড়া সম্ভব নয়। মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে গেছে। দুটো লাঠি নিয়ে এসো তো। দেখি লাঠি সেধে রক্ত গরম করে ভবিষ্যৎ চাঙা করে মনের বেহাল অবস্থাটা শোধ-রানো যায় কিনা। আধা-আলো-অন্ধকারে মাঠে নেমে উভয়েই কয়েক চক্কর ঘুরে ঘুরে লম্ফ ঝম্প দিয়ে লাঠি খেলে। অনুতোষের মনের ক্লেদ, গ্লানি ও জড়তা যেন অনেকটা কেটে যায়। মন তার বুঝি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

অমৃতকানন থেকে অনুতোষ গুবখাকে সঙ্গে নিয়েই বের হয়। বড় রাস্তায় পড়ে উভয়েই ট্রেজারীর অভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং ভাবী কর্মকেন্দ্রে —জঙ্গলের ধারে এসে দাঁড়ায়। গুবখাকে সম্বোধন করে অনুতোষ জিজ্ঞাসা করে সেদিনের কথা মনে আছে তো? তদনুযায়ী টেংরার দলের সঙ্গে তার দলের নকল যুদ্ধ (মক্ ফাইট) কোথায় কি ভাবে হবে এবং নকল যুদ্ধ করতে করতে রাস্তার ও-পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এ-পাশের জঙ্গলে অন্তর্হিত হবে তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেয়। মনে রাখবে মার খেতে খেতে টেংরার দল আমাদের লক্ষ্য—কেশিয়ার ও ভোজপুরী দারোয়ানের সম্মুখ দিয়ে পালাবে আর তোমার দল আমাদের পেছন দিয়ে তাদের তাড়া করবে। এই মক্ ফাইটের একটা মহড়া আগামী কাল দিনের বেলা দিও। দুপুরের দিকে রাস্তায় লোক চলাচল কম—ঐ সময়টাই প্রশস্ত। বেলা ১টা থেকে একটা পঁচিশ মিনিটের সময় আমি এই রাস্তা অতিক্রম করবো। নকল যুদ্ধের পর সাঙ্গোপাঙ্গ সব ইকে বিদায় দিয়ে তোমার কি কি করণীয় তাও মনে রেখো। প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মনে রেখো একটু ভুলচুক হলেই নিদারুণ বিপর্যয় বিপত্তি ঘটবে এবং তার জন্য প্রচুর মাশুল গুনতে হবে—এমন কি ভয়ানক সর্বনাশও ঘটতে পারে। হুঁশিয়ার! ঘটনার দিনক্ষণ যথা সময়ে জানতে পারবে। অনুতোষ পিঠ চাপড়ে গুবখাকে উৎসাহ দিয়ে স্থানত্যাগ করে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে অনুতোষ আম্রকুঞ্জে এসে উপস্থিত। নিরাপত্তার বেষ্টনি পেরিয়ে কুটির দ্বারে পৌঁছে সাংকেতিক টোকা দিতেই ভেতর থেকে আহ্বান আসে। দলপতির দৃষ্টি একখানা কাগজের উপর নিবদ্ধ। তার থেকে দৃষ্টি না-ফিরিয়েই তিনি হাত ইশারায় তাকে বসতে

বলেন। অনুতোষ দুপুরে গুরখা ও টেংরার দলের মক ফাইট-এর মহড়া দেখবার পর সমগ্র ব্যাপারটার কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে এবং তার সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা মনে মনে তাই খতিয়ে দেখছে এবং দলের প্রধানের ভাষণের অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মুখ তুলে অনুতোষের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার আগামী অভিযানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ?

–আজ্ঞে হাঁ, শুধু একটা বিষয়ে আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়—

ত অর্থের কি ব্যবস্থা হবে?

তিনি অনুতোষের সামনে নকশাটা মেলে ধরে বলেন—এটা লক্ষ্য কর। লম্বা কালো লাইনটা ট্রেজারীর দিকের রাস্তা, পাশের কালো ডট্ (বিন্দু) গুলি জঙ্গল। এই জঙ্গল পেরিয়ে উত্তর দিকে গেলেই যে রাস্তা পাবে সেটা জহুরী সায়েবের বাংলোর রাস্তা। তিনি নকশাটায় আঙুল দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নির্ধারিত সময়ে যে মেয়েটিকে এই রাস্তা দিয়ে যেতে দেখবে তার হাতে টাকার প্যাকেটটি দিয়ে দেবে—অবশ্য কোড নং জেনে নিয়ে। এই তার কোড নং। তিনি মুদ্রার ভঙ্গীতে অঙ্গুলি বিন্যাস করে, বুঝিয়ে দেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজায় টোকা পড়ে। —এসো, বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে আগন্তুক ভেতরে প্রবেশ করে তাকে দেখে অনুতোষ বিস্মিত এবং একেই তার সহযোগী ও সহকর্মী বলেই অনুমান করে। ইতিপূর্বে তাকে সে একবার মাত্র দেখেছে—তাও এখানেই। এর কর্মদক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা ইত্যাদি বিষয় তার সম্পূর্ণ অজানা—তবে হাঁ, চেহারাটা কতকটা ভোজপুরীর মতো—বলিষ্ঠ, দীর্ঘবপু, তীক্ষ্ণনাসা এবং দরোয়ানের মতোই গায়ের রং। আগত ব্যক্তি আসন প্ররিগ্রহণ করতেই দলপতি—এই তোমার সহকর্মী বলেই তিনি অনুতোষকে তার পরিকল্পনা ব্যক্ত করতে আদেশ করেন। অনুতোষ স্বীয় কর্ম-সূচী একে একে তাকে ব্যাখ্যা করে শোনান। সব জেনে তিনি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন। বোধ হয় মনে মনে অনুতোষ বর্ণিত কর্ম-পন্থার কার্যকারিতা বিচার বিশ্লেষণ করছেন। অবশেষে মৌন-ভঙ্গ করে তিনি—উত্তম! উত্তম!! বলে অনুতোষকে বাহবা দেন।

অনুতোষ নত মস্তকে তাঁর প্রশংসা-ধ্বনি স্বীকার করে বলে—দাদা এই পরিকল্পনা কেমন [illegible]

মাসের তিরিশ তারিখে উল্লিখিত সময়ে ঐ রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যায়। অন্যথা সমগ্র কর্মসূচী বাতিল বলে গণ্য করতে হবে।

—তথাস্তু, বলেই তিনি উভয়কে পাশের ঘরে গিয়ে পরস্পরকে জানতে এবং অভিযান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব বুঝে নিতে আজ্ঞা করেন।

ওঘরে প্রবেশ করে উভয়েই প্রথমে পরস্পরের হাতে হাত রেখে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপন করে। আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময়ের পরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সংযের নির্ঘণ্ট তৈরি করে। অত্যাবশ্যক হাতিয়ার ও রাসায়নিক পদার্থ বহন সম্পর্কে উভয়েই অবহিত হয়। আলোচনা শেষে অনুতোষের সহকর্মী ব্যাগ থেকে চশমা ও গোঁফ বার করে অনুতোষকে পরিয়ে কয়েক পা হাঁটতে বলে। তার চলার ভঙ্গী সাজসজ্জ (মেক-আপ) ইত্যাদি শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখে সহকর্মী সন্তুষ্ট হয়। অতঃপর সে নিজে দেশোয়ালীর মতো কাপড় ও পাগড়ী পরে গুম্ফ লাগিয়ে অনুতোষের সামনে এসে তার হাতে ছোট্ট একখানা আরশী গুঁজে দেয়। আরশীতে স্বীয় মুখচ্ছবি দেখে নিজেকে যেরূপ পোস্ট আপিসের কেশিয়ার তদরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান সহকর্মীকে দেশোয়ালী প্রহরীর প্রতিচ্ছবি বলেই প্রতীয়মান হয়।

পরিতৃপ্ত অনুতোষ নকল সাজেই সহযোগীর হাত ধরে অপর কক্ষে অবস্থিত দলপতির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। উবু হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরেন। তাদেরকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে—জয়তু, জয়তু, আশীর্বচন উচ্চারণ করে তাদের অভিনন্দিত করেন। —বৃটিশসিংহের বিবরে প্রবেশ করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তার হিংস্র দন্ত ও নখর উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বলতর হবে—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে।

অতঃপর দলপতি অনুতোষের সহকর্মীকে সম্বোধন করে বলেন—তুমি যাও ধীরেশ তোমার জন্য অন্য কাজ অপেক্ষা করছে। যাবার আগে ধীরেশ অনুতোষের চশমা ও গোঁফ হাতে নিয়ে বলে—আপনার আর সব ঠিক আছে। শুধু সার্টটা ঠিক করতে এবং চুল অন্যভাবে আঁচড়াতে হবে —সে সব যাবার সময় শুধরে নিতে হবে—বলেই সে কুটির ত্যাগ করে।

দলপতি আসন ছেড়ে উঠে অনুতোষকে বলেন—তুমি বোসো। তোমার সঙ্গে যার পরিচয় করিয়ে দেব, সে এক্ষুনি আসবে, বলেই তিনি ঘড়ি দেখে

ভিন্ন কামরায় চলে যান। ফিরে এসে আসন পরিগ্রহণ করতেই কুটিরের দরজায় টোকা পড়ে। তিনি—এসো বলতেই যে মেয়েটি ভেতরে প্রবেশ করে তাকে অনুতোষ কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। নির্দেশ মতো মেয়েটি অনুতোষের বিপরীত দিকে বসতেই অঙ্গুলি দিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলেন—একেই তুমি নির্ধারিত সময়ে জহুরি সায়েবের বাংলোর রাস্তায় দেখতে পাবে। উল্লিখিত প্যাকেটটি একেই দেবে।

অনুতোষ কুটির ত্যাগ করতেই মহারাজ সম্মুখে উপবিষ্ট কিশোরীটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে রাস্তাটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তা ধরে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিতেই ব্রেডন হিল্‌স। ঐ রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁয়ের পথে অল্প দূর গেলেই বাগানের মধ্যে শাহ্‌ মাজার। ঐখানেই তুমি দিদিকে দেখতে পাবে এবং তার হাতে ঐ প্যাকেটটি দেবে। ওটা তোমার হাতে এলেই একটা থলে কিংবা ব্যাগে ভরে নেবে এবং তা সুদ্ধই দিদিকে দেবে। তাকে না দেখতে পেলে তার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করবে। সময়টা দাঁড়িয়ে না কাটিয়ে মাজারটা প্রদক্ষিণ করবে এবং একটা মোমবাতি কিনে জ্বালিয়ে মাজারের পার্শ্বে স্থাপন করবে। উল্লিখিত রাস্তা সমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে আগামীকাল ঐ অঞ্চলটা একবার অবশ্যই ঘুরে দেখবে।

মহারাজ আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। কিশোরীটিও উঠে মহারাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘরে এসে মহারাজ কুটিরের চালার এক গোপন জায়গা থেকে একটা পোর্টফোলিও বার করে টেবিলে এসে বসেন। ফতুয়ার পকেট থেকে রোজনামচার ছোট্ট খাতা বার করে তাতে কিছু টুকে নিয়ে পোর্টফোলিওটা আবার যথাস্থানে রেখে ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার আসনে বসেন। রোজনামচাটা ফের বার করে কয়েকটি পাতা উল্টে দেখে পকেটে রাখেন। তারপর ঘড়ি দেখেই উঠে পড়েন। দরজা খুলে অদ্ভুত রকমের এক রাতের পাখির শিষ দিতেই যে এসে সামনে দাঁড়ায় তার হাতে একখণ্ড কাগজ গুঁজে দিয়েই তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

অমৃত কানন থেকে বেরিয়ে তিনি কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে অপেক্ষমান ঘোড়া গাড়িতে উঠে বসেন। গাড়ি যে রাস্তা ধরে অগ্রসর হচ্ছে তা শহরের উপকণ্ঠের দিকে প্রসারিত। অনেকক্ষণ চলার পর তিনি

রাস্তার ধারে একটা মাঠের সামনে নেমে গাড়ি ছেড়ে দেন। অতঃপর মাঠ পেরিয়ে তিনি গাছগাছড়া জংগলাকীর্ণ একটা হাজামজা জলাশয়ের ধারে এসে দাঁড়ান। জায়গাটা সাপ, ভূতপ্রেত ইত্যাদি দেখা অদেখা জন্তু জানোয়ার সহ নানা প্রাণীর আবাসস্থল বলে পরিচিত। কথিত আছে এ অঞ্চলটা এককালে আরাকানীদের এবং তাদের এক দুধর্ষ দুর্দান্ত সামন্তরাজার বাসভূমি ছিল। দিল্লীর বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের প্রতিভূ শায়েস্তা খাঁর আক্রমণে পরাভূত ও বিপর্যস্ত হয়ে আরাকান রাজ এক গভীর রাত্রে সসৈন্যে নগর পরিত্যাগ করেন। পলাতক রাজা স্বীয় পৃষ্ঠদেশ রক্ষার্থে নগর উপকণ্ঠস্থিত সামন্ত রাজার অধীনে শত্রু প্রতিরোধ কল্পে কিছু সংখ্যক সৈন্য রেখে যান। রাজার পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলমান সৈন্যের অগ্রগতি রুখতে গিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে সামন্তরাজা সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হন। মুসলমানগণ সামন্ত-রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করে সমুদয় ধনরত্ন লুণ্ঠনের পর অন্দরমহলে প্রবেশ করে। মেয়েদের গায়ের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে তাদের নানা ভাবে নির্যাতন করে। বিপত্নীক রাজার একমাত্র কন্যা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে প্রিয় পরিচারিকা সমভিব্যহারে ছদ্মবেশে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে অদূরবর্তী প্যাগোডায় আশ্রয় নেয়। প্রাসাদ লুণ্ঠন শেষে দুর্বৃত্তরা মণিমাণিক্যের লোভে মশাল হাতে হৈ হৈ করে প্যাগোডার দিকে অগ্রসর হয়। তাদের আসতে দেখে রাজকন্যা দাসীর হাত ধরে দৌড়তে দৌড়তে খানিক বিশ্রাম মানসে এই জলাশয়ের ধারে এসে দাঁড়ায়। এক দুর্বৃত্ত দেখতে পেয়ে তাদের অনুসরণ করে। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ধরবার মুহূর্তে রাজকন্যা ছোরা বের করে তার বুকে আমূল বসিয়ে দেয়। বিকট চিৎকার দিয়ে লুটেরা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে। ঐ চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে প্যাগোডা লুণ্ঠনরত দুর্বৃত্তের দল দীন দীন রবে মশাল হাতে চতুর্দিক থেকে জলাশয়ের দিকে এগোতে থাকে। রাজকন্যা পালাবার আর পথ পায় না। ভীত সন্ত্রস্ত অনন্যোপায় কন্যা আত্মরক্ষার্থে দাসীর হাত ধরেই জলে ঝাঁপ দেয়। গভীর নিশীথে অন্ধকারে অদৃশ্য কয়েকটি জলবুদবুদ তাদের সলিল সমাধি ঘোষণা করে।

অতঃপর মুসলমানরা যদৃচ্ছ লুটতরাজ চালিয়ে সারা অঞ্চলটাকে জনবসতিহীন করে ফেলে। তারপর থেকে এখানে আর বসতি গড়ে ওঠেনি। ফলে এই অঞ্চল ঘিরে বিশেষ করে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা

প্রাসাদ ও প্যাগোডা জড়িয়ে লোকমুখে নানা রকম ত্রাস সঞ্চারকারী কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। গভীর নিশীথে এখনো জলার ধারে কর্ণবিদারী আর্তচিৎকারের পর করুণ কণ্ঠে রাজকন্যার চাপা-কান্না নাকি শোনা যায়।

নালার ধারের জঙ্গলে বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠক পুলিশী হামলায় পণ্ড হবার পর থেকে নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে পুলিশের চক্ষে ধুলো দিয়ে এখন যত্রতত্র এমনকি শহর থেকে দূরেও বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক বসে।

জঙ্গলে প্রবেশ করে ভাঙা প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে আসা মাত্রই মহারাজ প্রহরীর হুঁশিয়ার ধ্বনির সম্মুখীন হন। স্বীয় কোড নং জানাবার পর তিনি ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করেন। বৌদ্ধ আমলের ভগ্ন প্রায় একটা বেদীর ওপর বিভাগীয় শীর্ষ ব্যক্তিগণ বসে—হয়ত তাঁরই অপেক্ষা করছিলেন। উপস্থিত সকলেই স্থানীয়, বহিরাগত কেউ নেই। মহারাজ আসন পরিগ্রহণ করতেই তাঁরা একে একে—জন সংযোগ, রিক্রুটমেন্ট, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণ, অর্থ সংগ্রহ ও বৃদ্ধি কল্পে ব্যবস্থাগ্রহণ, গোয়েন্দাগিরি, অনুসন্ধান ও সতর্কতা সংক্রান্ত নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেন। গুপ্তচর প্রধানের বিবৃতির পরেই মহারাজ আচম্বিতে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন—আপনার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমাদের মধ্যে কোন পুলিশের গুপ্তচর কিংবা সংবাদ সরবরাহক সক্রিয় নেই।

—এই বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র নিখুঁত এমন কথা বলতে পারলে খুশিই হতাম—তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এটা অবশ্যই বলা যায় যে এ যাবৎ দলের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কেউই রেহাই পায়নি।

মহারাজ উঠে দাঁড়ান—সকলকে সম্বোধন করে বলেন—ভারতের রাজনৈতিক গগনে প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস। শত্রুকে আঘাত হানার মাহেন্দ্রক্ষণ আসন্ন। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের একমন এক-প্রাণ হয়ে এগোতে হবে। শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা—টেলিগ্রাম, টেলি-ফোন, রেল, ইত্যাদি সমুদয় আদান প্রদান ও যানবাহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত বানচাল, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্মুখ সমরে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। কয়েকটা ব্লাণ্ডারবাস্ (বন্দুক) নিয়ে তো অমিতবলশালী শত্রুর মুখোমুখী হওয়া যায় না

বরণ ও আত্মহনন। এ সম্পর্কে আমাদের আরও একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সম্মুখ যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য যুদ্ধশাস্ত্রে পশ্চাদপসরণ বিধেয়। যদিও মৃত্যু উপেক্ষা করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলাই আমাদের প্রতিজ্ঞা তবুও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হলে অনর্থক লোকক্ষয় না করে পরাজয়ের গ্লানি এড়িয়ে সুকৌশলে পশ্চাদপসরণ করতে হবে এবং নিরাপদ গোপন আশ্রয়ে ঘাঁটি করে গরিলা যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে আপন লক্ষ্যে উপনীত হয়ে বিজয়-লক্ষ্মী বরণ করে নিতে হবে।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করে এই নগরকে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জনগণের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে—সীমানার গণ্ডীতে রাজ্যটি যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। বলতে বলতে তিনি উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। গুরু গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। অতঃপর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তিনি আপন বক্তব্য শেষ করেন। কক্ষস্থিত স্বল্পালোকে তাঁর গর্বোন্নত দেহ প্রচণ্ড শক্তিধর ভীমের মতোই বুঝি প্রতীত হচ্ছিল! মহারাজ-এর কণ্ঠধ্বনি শেষ হতে না হতেই সকলেই সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে উঠে দাঁড়ান। সে ধ্বনি ভগ্ন অট্টালিকার নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনি তুলে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নির্ঘোষিত হয়।

যাত্রাকালে সকলের উদ্দেশ্যে মহারাজের গুরু গম্ভীর কণ্ঠ থেকে গীতার মহৎবাণী নিসৃত হয়—"ধর্ম্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।" খানিক দাঁড়িয়ে হাত তুলে "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়" বলেই 'শুভমস্তু' জানিয়ে অন্ধকারে তিনি অন্তর্হিত হন।

অন্ধকার-বনপথে চলতে চলতে মহারাজ ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখেন। পূর্বাকাশে শুকতারার শুভ্র বিচ্ছুরিত নীল আলোর রেখায় তাঁর অন্তর আশার আলোকে উদ্ভাসিত। সুরলোকের দুন্দুভির রণ-নাদের সঙ্গে বুঝি হৃদি-স্থিত হৃষিকেশের যুদ্ধে এগিয়ে চলার পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ শোনা যায় —সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তেযুদ্ধমীদৃশম্। হৃষ্ট-চিত্ত মহারাজ আবৃত্তি করে চলেন—উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—ভয় নাই ওরে ভয় নাই!

অনুতোষের বাহু-বন্ধন-মুক্ত দেবযানী বড় রাস্তায় এসেই বাস্তবে ফিরে আসে। দয়িতের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ-লাভের পর বিনা দ্বিধায় নতজানু হয়ে তার নিকট আত্মসমর্পণ। বিনিময়ে প্রেমপ্রীতি অনুরাগ ভরে কাছে টেনে নিয়ে নিবিড় বাহুর বন্ধনে তাকে অনুতোষের বক্ষে ধারণ মুহূর্তটুকু সময়ের গণ্ডীতে নাতিদীর্ঘ হলেও দেবযানীর নিকট অনাস্বাদিত-পূর্ব হৃদয়-উদ্বেলিত বিস্ময়কর অনুভূতির সঙ্গে হৃদয়ে পরম আনন্দ-শিহরণ জাগে। যেন মধুর স্বপ্নময় এক গন্ধর্বলোকে বিচরণ। দুরন্ত আবেগে জড়িয়ে ধরা অনুতোষের বক্ষের উষ্ণ স্পর্শ এখনও দেবযানীর অন্তরে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চ ও পুলকের সঞ্চার করছে। মিলন মুহূর্তে অনুরাগে-মাখা অনুতোষের কণ্ঠ-নিসৃত—দেবযানী, দেবযানী—মৃদুকম্পিত কণ্ঠস্বর তার কর্ণে অশ্রুতপূর্ব শ্রুতিমধুর সুরের গুঞ্জন তুলছে। সায়ংকালীন কুলায় প্রত্যাবৃত্ত নানা পাখীর কূজনে বুঝি সেই সুরের অনুরণন শুনতে পাচ্ছে। এই গোধূলি লগ্নে উভয়ের মধ্যে যে মিলন-বন্ধন রচিত হলো তা রইলো চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য, অক্ষয় ও অনপনেয়।

গৃহাভিমুখী উৎফুল্ল দেবযানীর মনে আসে অধুনা চড়ুইভাতি কালে চাঁদমারীর কথা। ঐ সময়ে টারগেট—বিশেষ করে রাইফেল সুটিং সময়ে শিক্ষক মহাশয়ের আচার-আচরণে কোন প্রকার অশালীনতা প্রকাশ না হলেও ভূতের কানমলার মতো তার প্রতি সুপুরুষ বলিষ্ঠকায়, শিক্ষা-দাতার অত্যধিক মনোযোগ ও ঘনিষ্ঠতার প্রয়াস প্রতিমুহূর্তে অনুভূত হয়। ফলে মাঝে মাঝে তার নিজেকে খুবই দুর্বল অসহায় মনে হয়। এরূপ অস্বাভাবিক মনোভাব ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আর কয়েকদিন চললে তার পরিণতি কি হত তা অনুমান করে তার হৃৎস্পন্দন জাগে। কিন্তু আজ সে মুক্ত—সম্পূর্ণ মুক্ত—তার চেতন কিংবা অবচেতন মনে ভয় কিংবা দৌর্বল্যের আর কোন কারণ নেই। এ জীবনে অনুতোষকে পাওয়ার সুযোগ আর যদি না-ই বা মেলে তথাপি আজকের এই গোধূলি লগ্নের পরস্পরের মিলন ও বাহুর বন্ধন ছাঁদনাতলায় পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের

সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন থেকে কোন অংশেই ন্যূন নয়। এই মধুময় স্মৃতি চিরকালের মতো অমর ও তার জীবনে অক্ষয় পাথেয় হয়ে রইবে।

বাড়ি পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়তেই ঊর্মিলা দরজা খুলে দেয়। উঠোন পা দিয়েই দেবযানী চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে—শীগগির খেতে দাও মা, বড্ড খিদে পেয়েছে। তার চলন বলন কথা-বার্তা অন্য দিনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন—চোখে মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। ঊর্মিলার চোখে তা ধরা না পড়ে পারে না—মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মেয়েদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তিনি হেসে বলেন—যা হাতমুখ ধুয়ে রান্না ঘরে আয়। দেবযানী ঘর ও কলতলা হয়ে রান্না ঘরের গিয়ে খেতে বসে। তার নয়নে ব্রীড়ার আভাস, আননে চিত্তের আনন্দের ছায়া ঊর্মিলার চোখের আয়নায় প্রতিবিম্বিত! সে উচ্চবাচ্য কিছু করেনা—কিন্তু অন্তরে কেমন যেন অশুভের ছায়াপাত ঘটে, মন বিষাদে মলিন হয়ে ওঠে। মুখে শুধু বলে খিদে পেয়েছে বলেছিলি—আর দুটো দিই?

—না মা, আর দিও না, তা হলে রাতের খাবার আর খেতে পারবো না। কথা শেষ করেই সে উঠে পড়ে। হয়ত মায়ের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই সে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যায়। কিন্তু ঘরে এসেও শান্তি পায় না। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে কোন কথা বলতে পারেনি। আশ্চর্য, অদ্ভুত লজ্জা ও সংকোচ এসে যেন উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় বাধার দেয়াল ও দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে! স্বাভাবিক কথা বার্তায় প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটিয়েছে! মায়ের মনে তার এই ব্যবহার নিশ্চয়ই কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে! না, না এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না, মার নিকট তাকে অতি অবশ্যই স্বাভাবিক হতে হবে। যদিও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মতো তার এই গাঁটছড়া বন্ধন সংগোপন রাখা ভিন্ন অন্য পন্থা নেই। কেননা, ইহা সামাজিক প্রথা ও বর্ণাশ্রম ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেও অসিদ্ধ ও অপাঙতেয়। মায়ের মনেও ঘটনাটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বিষম আঘাতের কারণ হতে পারে!

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই দেবযানী উঠে যায়। দরজা খুলে সুদেবকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে। ঘরে এসে জিজ্ঞেস করে—ভ্রাতঃ, তোমার বৈকালিক আহার কি যথা সময়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে? উপস্থিত তোমার এই অত্যধিক বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

সুদেব হাসতে হাসতে জবাব দেয়—প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর—হাঁ। দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাখ্যা—মিশনে আশ্রমিক সঙ্ঘের অনুষ্ঠান। সেখানে ব্রজানন্দ মহারাজের স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও আমেরিকা সফর ও হিন্দুধর্ম প্রচার ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কন্যাকুমারিকা শিলা খণ্ডে তাঁর আরাধনা, তপস্যা ইত্যাদি নিয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

দেবযানী গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলে—সাধু! সাধু!! তারপর গুরুত্ব-পূর্ণ স্বরে বলে—অদ্যরাত্রি আহারান্তে দ্বিতীয় যামে শয়নকালে তোমার দীক্ষা—সত্যাশ্রয়ী ধীমান রূপে সেদিন তোমার কর্তব্য সম্পর্কে—কি করা উচিত লইয়া যে মহত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা উত্থাপন করিয়াছিলে তাহার সমাধান কল্পেই আজ তোমার জীবন-দীক্ষা।

—উত্তম! তথাস্তু, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য। সুদেব জামা-কাপড় পরিবর্তন করে কলতলায় যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে মায়ের সাড়া না পেয়ে তাঁর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে—তিনি ভেতরে নেই। বাবা তখনো আপিস থেকে ফেরেন নি। সুতরাং মা রান্নাঘরে অনুমান করেই সেখানে গিয়ে মায়ের পিছনে দাঁড়াতেই তিনি টের পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—সুদেব, কিছু খাবি?

—না, না, তোমার সাড়া না পেয়ে দেখতে এলুম। উনোনের আঁচে মায়ের উত্তপ্ত আননে স্পষ্ট একটু হাসির ঝিলিক।

—আমি যাচ্ছি মা। সুদেব বাইরে গিয়ে মায়ের শ্রবণ ও স্বজ্ঞাত হবার অদ্ভুত শক্তি দেখে অবাক না হয়ে পারেনা! দিদিকে ঘটনাটা বলতে হয়। ঘরে ঢুকে সুদেব দিদিকে লক্ষ্য করে বলে—আজ এক অত্যাশ্চর্য জিনিষ প্রত্যক্ষ করলাম—অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

দেবযানী বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে—কি এমন জিনিষ—বলে ফেল।

সুদেব ঘটনাটা পুনরাবৃত্তি করে। শুনে দেবযানী ভাইয়ের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমান করে। মুহূর্তটা খুবই শুভ—মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষা দেবার মাহেন্দ্রক্ষণ! ভাইয়ের চেয়ারটা কাছে টেনে এনে বলে—জানো, মা ছেলেমেয়ের মুখ দেখেই দৈবজ্ঞের মতো মনের কথা জানতে পারেন। পায়ের শব্দ শুনলেই বোঝেন—কে আসছে যাচ্ছে, কিংবা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন যিনি মা, তিনি সাক্ষাৎ পরম আরাধ্যা, ও বরণীয়া পূজনীয়া—স্বর্গের চাইতেও মহীয়সী ও গরিয়সী। তার সেবায় পরম পুণ্য-

লাভ। তুমি সেদিন জানতে চেয়েছিলে তোমার কর্তব্য কি! তদনুযায়ী বলছি—তুমি লেখা পড়া করবে, ক্লাব ও মিশনে যাবে, আর্তজনের সেবা শুশ্রূষা করবে কিন্তু বিপ্লবী দলে কখনও যোগ দেবে না আর পুলিশ ঠেঙাবার উৎসাহে মাতবে না। এই তোমার কর্তব্য। এখন আমাকে ছুঁয়ে শপথ নাও—মাকে কোনদিন কোন অবস্থাতেই ছেড়ে যাবে না। মায়ের অবাধ্য হবে না। আজীবন মায়ের কাছে থাকবে। দিদির আজ্ঞার পুনরুক্তি অক্ষরে অক্ষরে শেষ হতেই দেবযানী সুদেবকে চেয়ার থেকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। সুদেবের ভবিষ্যৎ জীবন বুঝি এভাবেই এক বালসুলভ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত হয়ে গেল! ভবিতব্য অলক্ষ্যে ভাইবোনের জীবন নাটকের এক মরমিয়া দৃশ্যাঙ্ক প্রত্যক্ষ করলেন!

উর্মিলা রান্নাঘরে শিকল দিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠতে গিয়ে ভাইবোনের কথোপকথন শুনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বারান্দায় উঠে ঘরে উঁকি দিয়ে ভাইবোনের জড়াজড়ি করে কান্না দেখে বিস্ময়ে হতবাক। চলৎশক্তি-হীন হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে ঢুকে দেখে স্বামী তখনও ফেরেনি। মায়ের প্রতি ভায়ের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে তাকে দিয়ে বোনের শপথ করানোটা উর্মিলার মনে খানিকটা তৃপ্তির সঞ্চার করলেও ব্যাপারটা তার কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য ও প্রহেলিকাময়। মনে স্বস্তির চেয়ে বুঝি অস্বস্তিই বেশী উদ্রেক করে—ভাবনা চিন্তা জাগিয়ে তোলে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে পাড়ার আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের তুলনা করে দেখে অবাক হয়! ও-বাড়ির সুধা স্বপন, তার পাশের বাড়ির বিরু গোপা—না আদৌ মেলে না। দেবযানী সুদেবের সব কিছুই যেন অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, খাপছাড়া! না, উর্মিলা আর ভাবতে পারে না। স্বামীরও অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে। সে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। হয়ত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। হঠাৎ মা, মা ডাক শুনে উর্মিলা চক্ষু মেলে। দেবযানী দৌড়ে এসে মায়ের কপালে হাত দিয়ে দেখে। জিজ্ঞাসা করে শরীর খারাপ হয়েছে তো?

—না রে না।

—একটু উঠে বসতো মা, সুদেব প্রণাম করবে।

—কেন, হঠাৎ আবার কি ঘটলো!

—সুদেব আজ দীক্ষা নিয়েছে মা। তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছে।

—কি বললি দীক্ষা!

—হাঁ মা, ওকে আজ দীক্ষা দিয়েছি—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছি। যাতে সে আজীবন তোমার দেখা-শোনা করে—তোমার কাছছাড়া না হয়।

—তোরা দু'জনে মিলে কি যে সব অনাসৃষ্টি করছিস—আমার মাথায় আসছে না। তোদের দেখে শুনে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি—নানা ভাবনা চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ছি।

—তুমি কেন যে খালি খালি দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট হও বুঝি না। আমরা ভাইবোন—কেউ তো আর ছোট্টটি নই। তবুও, সুদেবের সামনেই বলছি—তার এই শপথ নেবার প্রয়োজন ছিল মা—খুবই প্রয়োজন ছিল। দেশে আজ প্রবল জাগরণের জোয়ার এসেছে! পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন করে নানা বাদ—গান্ধিবাদ, বিপ্লববাদ—অহিংস, সহিংস সংগ্রাম। সমাজসংস্কার—উচ্চ নীচ প্রভেদ লোপ—আত্মশুদ্ধি—সন্ন্যাসবাদ—উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ। তার উপর ফরাসী বিপ্লবের মতো রুশ বিপ্লবের রঙিন হাতছানি—সাম্রাজ্যবাদ লোপ—ধন ঐশ্বর্যের সমবণ্টন—ধনী নির্ধনের অবলুপ্তি, ইত্যাদি নান বাদ-বিতণ্ডার ঢেউ-এর আঘাতে ভারতের জাগ্রত যৌবন দিশেহারা, বিক্ষিপ্ত! সুতরাং সুদেবকে আপন কর্তব্য বুঝে নিয়ে ধীর স্থির শান্ত চিত্তে এগোতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই মা। এতে ভাবনা চিন্তার কি আছে? লক্ষ্মী মা, উঠে বসো, পা-টা একটু নামাও। ঊর্মিলা উঠে বসে উভয়েই মাকে প্রণাম করে। ঊর্মিলা পুত্র কন্যা'কে দুই দিক থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেয়।

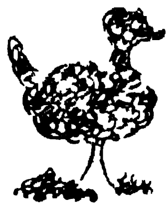
সদ্য আপিস থেকে আগত স্বামী, ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজায় পা দিয়ে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ায়। প্রথমে কোন কথাই তার মুখে জোগায় না। দুয়ারে দাঁড়িয়েই স্ত্রীকে সম্বোধন করে—ঊর্মি, এ কী ব্যাপার—ছেলে মেয়ে নিয়ে নাটক করছ নাকি।

ঊর্মিলা করুণ হেসে বলে—তা যা বলেছ। তবে সংসারটাই তো নাট্যশালা—তাতে ছোট বড় সকলেই আমরা নট কিংবা নটী—হাসি কাঁদি গান গাই; তারপর চলে যাই।

দেবযানী মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে মামার হাত ধরে ঘরে এনে হাতের কাগজপত্র ও ছাতাটা টেবিলে রেখে বলে—তুমি ঐ চেয়ারটায়

চুপটি করে বসো তো মামা। আয় সুদেব, বাবাকে প্রণাম কর। সুদেব প্রণাম করে উঠতেই দেবযানীও হাঁটু গেঁড়ে তাঁকে প্রণাম করে। মামা এতক্ষণে বুঝি কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেন—প্রণামের পরে আশীর্বাদ। তোদের কি বলে আশীর্বাদ করবো ?

—সারাটা-জীবন যেন ভাল হয়ে চলি, বলেই দেবযানী হাসতে হাসতে ভাইয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যায়।



ঘুম থেকে জেগে শুয়ে শুয়েই অনুতোষ তার সারাদিনের কাজের ছকটা মনে মনে পর্যালোচনা করে : কলেজের ক্লাশে এ্যাটেণ্ড করাটাই হবে মস্ত এ্যালিবাই (ওজর)। ঘটনাকালে তার অন্যত্র অবস্থানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কলেজের গেটের বাইরে অপেক্ষমান পরিতোষের সাইকেল চেপে তাকে নিয়ে জঙ্গলের ধারে রাস্তায় অবতরণ। অতঃপর জঙ্গলে অপেক্ষমান সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র হাতিয়ার ইত্যাদি সহ রাস্তায় প্রত্যাবর্তন। ইতিমধ্যে পরিতোষের পোস্ট আপিস থেকে ক্যাশিয়ার ও দারোয়ানকে কিয়দ্দুর সাইকেলে অনুসরণের পর তাদের আগমনবার্তা জানিয়েই শুরু হবে সাইকেলে তার রাস্তা ও জঙ্গলের চতুর্দিকে সতর্ক পরিভ্রমণ। ক্যাশিয়ার ও দারোয়ানের আগমনবার্তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ওধারে দলবল সহ অপেক্ষমান গুরখা ও টেংরাকে সতর্কীকরণ। ওদিকে প্রভাত ও নিরঞ্জন যথাক্রমে ট্রেজারীর রাস্তার মোড়ে ও পুলের ধারে ভিখারির বেশে অপেক্ষা করবে। প্রয়োজন বোধে তাদের পশ্চাদ্ধাবনরত পুলিশকে তারা বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করবে। পরিকল্পনাটা ভেবে চিন্তে যতদূর সম্ভব নিখুঁত করা হয়েছে। পরিতৃপ্ত মনে অনুতোষ শয্যা ত্যাগ করে।

আজ তার জীবনের এক ভয়ানক পরীক্ষার দিন। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সিংহের বিবরে প্রবেশ করে তার হিংস্র নখ-দন্ত উৎপাটন করে মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আনতে হবে। সুতরাং তাকে সমুদয় বলবীর্য বুদ্ধি

প্রয়োগ করে ধীর-স্থির সুস্থ মস্তিষ্কে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে সুকৌশলে এই ভীষণ বিপজ্জনক কর্ম নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন ব্যায়ামের পর অন্যান্য কাজ সেরে অনুতোষ পড়ার টেবিলে এসে বসে। ছোট বোনটি সেখানে নেই। বই খুলে বসতেই মায়ের ডাক আসে—অনু খেতে আয়। খাবার-জায়গায় বাবা ও বোন উপস্থিত। খেতে বসে মাকে বলে—মা, আমি আজ বাবার সঙ্গে দশটার মধ্যেই বেরিয়ে যাব। সকাল সকাল ক্লাশ। বোনের দিকে চেয়ে বলে—কিরে গীতি, তোকে যে পড়ার টেবিলে দেখলাম না। লেখাপড়া কেমন চলছে ?

—তবু ভাগ্যিস যে আজ তোমার মুখে কথা ফুটলো! কদ্দিন থেকেই বলছি,—দাদা, জিওমেট্রির কয়েকটা প্রবলেম আর অ্যালজেব্রার গোটা কয়েক অঙ্ক বুঝিয়ে দাও। কোন সাড়া নেই।

—আজ রাত্রে তোকে সব বুঝিয়ে দেব—ভাবিস না। তারপর বাবার দিকে চেয়ে বলে—আপনার সাইকেলটা নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি। ঠিক সময়ে ফিরে আসবো। বাবা রেলের চাকুরে। দূর শহরতলীতে আপিস। রোজ সাইকেলে যাতায়াত করেন—সাড়ে নটায় বেরতেই হয়। উত্তরে তিনি বললেন, ৯টার মধ্যে ফিরে আসবে।

অনুতোষ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। অনেকদিন সাইকেল চালায়নি—সুতরাং প্র্যাকটিস দরকার। বাড়ির গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোতে সম্মুখে বিরাট মাঠ। চারদিকে ছোট ছোট টিলার উপর সাহেবদের ছিমছাম বাংলো, ক্লাব ইত্যাদি। প্রাতঃকালীন মনোরম পরিবেশে মাঠে অনেক লোকের সমাবেশ—কেউ হাঁটছে, কেউ দৌড়চ্ছে, কেউবা তারই মতো সাইকেল প্র্যাক্টিস করছে। অনেকক্ষণ নানাভাবে সাইকেল চালিয়ে নিজেকে রপ্ত করে অনুতোষ যথাসময়ে বাড়ি ফিরে আসে।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষের মানসিক উত্তেজনাও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। স্নানাহারের পরে সে বই খাতা নিয়ে মাকে বলে কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে দুটো ক্লাশে হাজির থেকে বাকী পিরিয়ড প্রয়োজন বোধে বন্ধুকে প্রক্সি দিতে বলে সে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যায়। কলেজের গেটের বাইরে অপেক্ষমান পরিতোষের সাইকেল চেপে, তাকে সঙ্গে নিয়ে অনুতোষ জঙ্গলের ধারে রাস্তায় নেমে যায়। বই খাতা পরিতোষের জিম্মায় রেখে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে

নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষারত সহকর্মীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র ও হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে উভয়েই পরস্পর ব্যবধান বজায় রেখে রাস্তায় উঠে আসে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। কিন্তু পরিতোষের দেখা নেই। কি হলো! তবে কি ক্যাশিয়ার পায়ে না হেঁটে ঘোড়ার গাড়ির সোয়ারী হয়েছে? না কি আজ আদৌ ট্রেজারী আসছে না! মনের মধ্যে এরূপ নানা প্রশ্নে অনুতোষ খুবই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন বোধ করছে। রাস্তার ও ধারে গুরখা ও টেংরা সংকেতের অপেক্ষায় অস্থির চঞ্চল। অনুতোষ বারংবার দূরে রাস্তার বাঁকের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করছে। হঠাৎ দূরে এক সাইকেল আরোহী তার দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হয়। আরো এগোতেই বোঝা গেল—পরিতোষ। দূর থেকে ক্যাশিয়ার ও দারোয়ানের আগমন বার্তা অনুতোষকে সংকেতে জানিয়েই পরিতোষ অন্তর্হিত। আশ্বস্ত অনুতোষ সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ও-ধারে গুরখাকে শিকার আসার সংকেত জ্ঞাপন করে। রাস্তায় কাছেপিঠে কোন পথিক নেই—দূরে দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে। ক্যাশিয়ার দারোয়ান সহ জঙ্গলের ধারে রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে আসতেই রাস্তার ও-ধার থেকে দু' দল মারামারি হৈ-হল্লা চিৎকার করতে করতে ঝটিকা বেগে উভয়ের দু'ধার দিয়ে রাস্তা অতিক্রমকালে অনুতোষ ডান-হস্ত-ধৃত ক্লোরোফরম তুলো ক্যাশিয়ারের নাকে চেপে ধরে বাম হাত দিয়ে তাকে বগলদাবা করে জঙ্গলে নেমে যায়। অনুরূপ ভাবে অনুতোষের সহযোগী দারোয়ানকে আক্রমণ করে টেনে জঙ্গলে নিয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে কেউ টু শব্দটি করবার অবকাশ পায়নি। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কেউ কিছু বুঝবার আগেই ভোজবাজীর মতো দিন দুপুরে এক অসমসাহসিক অপহরণ কর্ম সমাধা হয়।

জঙ্গলের নির্দিষ্ট জায়গায় উভয়কে এনে গুরখার জিম্মায় রেখে অনুতোষ ক্যাশিয়ারের আইডেন্টিটি কার্ড (পরিচয় পত্র) ও রেকুয়িজিশন স্লিপ (অর্থসরবরাহের ফরমাশ পত্র) ও ব্যাগটা নিয়ে নেয়। তার সহযোগী দারোয়ানের লাঠিটি তুলে নেয়। অতঃপর অনুতোষ ক্যাশিয়ার এবং তার সহযোগী দারোয়ানের রূপ ধরে ট্রেজারী অভিমুখে রওনা দেয়। ট্রেজারীতে ঢুকবার মুখে তাদেরই মতো আরেক দল বেরিয়ে আসে। মাস-কাবারে টাকা তোলা এবং জমা দেওয়ার হিড়িকে সাহেব বোধহয়

পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ক্লান্তি অপনোদন মানসে হ্যাভারস্যাক থেকে বোতল খুলে কিঞ্চিৎ উত্তেজক পদার্থ গলাধঃকরণ করেছে। অনুতোষ ট্রেজারীর গরাদের মুখে পাহারা-রত সিপাহীর হাতে রেকুয়িজিশন স্লিপটি দিতেই সে সাহেবের ঘরে তার হাতে সেটি পৌঁছে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহেব বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী গেট খুলে অনুতোষকে ভেতরে ঢুকতে দেয়। সাহেব এক পলক অনুতোষের দিকে তাকিয়েই চলতে থাকে এবং স্ট্রংরুম-এর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। অনুতোষও তার পেছন পেছন দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে।

এদিকে গরাদের বাইরে অনুতোষের সহযোগী সিপাহীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। সিপাহী টহল দিয়ে গরাদের এদিকে আসতেই সে তাকে —রাম রাম, জী-সরকার বলেই অভ্যর্থনা জানায়। —তবিয়ৎ তো বহুৎ খোশ মালুম হোতা। শুনা হে, আখবারমে খবর নিকালা কি আয়েন্দা বরষকে পহেলে সে মেহেরবান রাজ আপলোগকো তঙ্খা বাড়ানেকা ফয়সালা কিয়া।

—ছোড়াজী, ইয়ে বাত তো হামেশাই শুনতা রহা; লেকেন কাম কুছ নেহি হোতা।

অনুতোষের সহযোগী সিপাহীর দৃষ্টি ও কান তার দিকে রাখবার উদ্দেশ্যেই নানা কথার অবতারণা করছে। সেই সঙ্গে লাঠিটা বাঁ হাতের বগলে চেপে রেখে খৈনি টিপছে আর সময় গুনছে। মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্ট্রঙরূমের দিকে তাকাচ্ছে।

ভেতরে তখন এক জীবনমরণের খেলা চলছে। সাহেব উঁবু হয়ে চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুকের ডালা টান মেরে খোলার সঙ্গেই অনুতোষ পেছন থেকে বিদ্যুৎ গতিতে আসুরিক শক্তিতে ডান হাতে ক্লোরোফরম-এর তুলো এবং বাঁ হাতের বেষ্টনি দিয়ে গলা চেপে ধরে তাকে আর টু শব্দটি করবার অবকাশ দেয় না। সাহেব নেতিয়ে পড়তেই তাকে মেজেতে ফেলে রেখে সিন্দুকের অভ্যন্তরস্থ নোটের তাড়াগুলো এবং চাবির গোছা থলেতে ভরে, তারপর কোমরের রিভলভারটির কর্ড কেটে এবং বেল্টের পকেট থেকে কার্তুজ কয়টি থলের ভিতরে রাখে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অদ্ভুত দুঃসাহসিক লুণ্ঠন-কর্ম সুকৌশলে সমাপ্ত করে অনুতোষ বীর দর্পে স্ট্রঙরূমের বাইরে আসে। তাকে দেখেই তার সহযোগী হাতের থাবড়া দিয়ে খৈনি পরিষ্কার করে হাত বাড়িয়ে সিপাহীকে দিয়ে নিজের

ঠোঁটের ফাঁকে কিছু পুরে দেবার ভান করে। অনুতোষ বেরিয়ে আসা মাত্রই রাম রাম জী, বলেই সে তৎক্ষণাৎ তার অনুসরণ করে। ট্রেজারীর রাস্তার মোড়ে আসতেই আর এক দল ঘোড়ার গাড়িতে ট্রেজারীর দিকে যাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ি দৃষ্টির আড়াল হতেই উভয়েই ত্বরিৎপদে চলে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। সেখানে পৌঁছেই অনুতোষ গুরখার হাত থেকে থলেটি নিয়েই তাকে চলে যেতে বলে। থলে থেকে কাগজ বার করে নোটগুলি প্যাকেটে মতো করে বাঁধে। কিন্তু বেশ বড় হওয়ায় সেটাকে থলেতে ভরে নেয়। তারপর নকল সাজ পোষাক ধরা চুড়া সহকর্মীর হাতে সমর্পণ করে। অতি বিপজ্জনক এক মরণ-খেলা সাঙ্গ করতে সময়ের হিশেবে অনুতোষের তিরিশ মিনিটের বেশি লাগেনি। বিপুল অর্থের সঙ্গে বিপ্লবীদের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সার্ভিস ওয়েবলি ৩০৩ বোর রিভলবার সংযোজিত হলো। নিজের শক্তি সামর্থ্য ও বিচক্ষণতার উপর অনুতোষের আস্থা সুদৃঢ় হয়। সাফল্যে উদ্ভাসিত অনুতোষ উৎফুল্ল চিত্তে আপন লক্ষ্য পথে প্রস্থান করে।

অনুতোষ অন্তর্হিত হতেই তার সাথী একটা রুমাল দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল অর্ধাবৃত করে বন্দীদের যে সব জিনিষ তারা কার্যব্যাপদেশে ব্যবহার করেছে সেগুলি কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে তাদের হাতের চিহ্ন বিলোপ করে যথাস্থানে রেখে দেয়। কিন্তু বন্দীদের চেতনা ফিরে আসছে না কেন! এতক্ষণে তো তা ফিরে আসা উচিত। ক্লোরোফরমের প্রভাব তো এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সে উভয়ের হাতের শিরা ও বুকের স্পন্দন অনুভব করে। তারপর একটা শিশি বার করে কয়েক সেকেণ্ড উভয়ের নাকের কাছে ধরে। এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের চেতনার লক্ষণ পরিস্ফুট হতেই সে জঙ্গল পরিত্যাগ করে।

এত বড় একটা বিপদ-সংকুল কর্মযজ্ঞের হোতাদের সঙ্গে আরো একজন—যিনি অনুতোষের অসীম সাহস, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েও নিজের মনের উদ্বেগ নিরসন কল্পে ছদ্মবেশে অলক্ষ্যে থেকে অভিযান প্রত্যক্ষ করে হৃষ্ট চিত্তে ফিরে যান।

পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রে "বাঘের ঘরে ঘোগের বাস।" শিরোনামা দিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়—তা যেমনি অভাবিত তেমনি রোমাঞ্চকর। সারা দেশ স্তম্ভিত এবং ক্ষুদ্র শহরটি চঞ্চল ও উদ্বেলিত।

সংবাদে প্রকাশ ট্রেজারীর স্ট্রঙ্‌রূম থেকে কয়েক লক্ষ টাকা, সিন্দুকের চাবির গোছা এবং স্ট্রঙ্‌রূম ইনচার্জ সার্জেন্ট সাহেবের সার্ভিস রিভলভার ও কার্তুজ লুণ্ঠিত ও অপহৃত! সার্জেন্ট এবং স্ট্রঙ্‌রূম-এর পাহারাদার সিপাহী সংজ্ঞাহীন! ঘটনাটা এতই চাঞ্চল্যকর, দুঃসাহসিক, কৌশল ও চাতুর্যপূর্ণ যে গোয়েন্দা চূড়ামণি শার্‌লক্‌ হোমস্‌-এর রোমাঞ্চকর কাহিনীকেও বুঝি হার মানিয়েছে। এই অমিত বিক্রম ও সাহসিক কীর্তিশালী কার্য লোক মুখে ফেঁপে ফুলে ও শাখা প্রাশাখা মেলে অতিরঞ্জিত বিস্ময়কর এক অসম্ভবের পর্যায়ে উপনীত। পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে, ঘরে ঘরে অনামী অজ্ঞাত আর অসম-সাহসিক এই অভাবনীয় বিরাট কর্মকাণ্ডের নায়ককে মহাবলী চতুর চূড়ামণি বীরের আসনে বসিয়ে তার উদ্দেশ্যে আবাল বৃদ্ধ-বনিতার সাবাস! সাবাস!! ধন্য ধন্য—সাধুবাদে চতুর্দিক্‌ মুখরিত।

শহরে প্রচণ্ড পুলিশি তাণ্ডবের মধ্য দিয়েই এর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত। সন্দেহ ভাজন বিপ্লবীদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। তাছাড়া গুণ্ডা বদমাশ এবং সন্দেহভাজন অনেককে ধরে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার ও নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন করেও পুলিশ এর কিছু কিনারা করতে পারছে না।

এদিকে বিপ্লবী মহলেও সাজসাজ রব। তাদের গোয়েন্দারাও তৎপর—চতুর্দিকে তাদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। পুলিশের গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি—খোদার উপর খোদকারি! অমৃত কাননেও তৎপরতা! সেখানের প্রবেশ পথ বিপ্লবী অনুসন্ধানীরা অলক্ষ্যে লক্ষ্য রাখছে। নবাগত কেহ এলেই তার পেছন পেছন ছায়ার মতো অনুসরণ ও অনুসন্ধান চলেছে! বিদ্যাপীঠের আবাসিক ছাত্র, মাষ্টার এবং মাষ্টারদের মধ্যে যাঁরা অতীতে অন্তরীণ ছিলেন তারা ব্যতীত বাইরে থেকে আসা ছাত্র ও মাষ্টারদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে সংযোগ সংশ্রব প্রমাণিত হলেই তার অন্তিমকাল অবধারিত। ইতিপূর্বে এরূপ ঘটনাও বিরল নয়। অমৃত কাননের তাঁত, গো ও কামারশালা ইত্যাদি অর্থকরী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-গুলি তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও খাস চৌহদ্দির বাইরে। সেখানে যাতায়াত পথ, পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি ভিন্ন ধরণের। সেখান থেকে অনুপ্রবেশ ঘটলে সহজেই ধরা পড়ে। আম্রকুঞ্জের পাহারা দিনে রাত্রে আরও জোরদার করা হয়েছে।

এইভাবে বিপ্লবী গুপ্তচরদের সঙ্গে পুলিশ গোয়েন্দাদের প্রবল

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক এযাবৎ পুলিশ ট্রেজারীর লুণ্ঠন ব্যাপারে কোন ক্লু বা তথ্য আবিষ্কারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ট্রেজারীর স্ট্রংরুমের সার্জেন্ট, পোস্ট আপিসের ক্যাশিয়ার ও দারোয়ানের উপর আক্রমণ খুবই অতর্কিত ও আকস্মিক। তাদের অজ্ঞান করতে ক্লোরোফরম এত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়েছে যে তজ্জনিত ক্ষত চিহ্ন এখনও তাদের চোখে মুখে বিদ্যমান। পাহারারত সিপাহীকে খৈনির সঙ্গে কোন সম্মোহক পদার্থ (হিপনোটিক ড্রাগ) মিশিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছে। ফলে আক্রমণকারীদিগকে দেখবার তাদের কোন অবকাশ ঘটেনি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য কিছুই মেলেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম পাহারাদার সিপাহী। সনাক্তকরণ উপলক্ষে সমবেত জনগণের মধ্যে সে ঐ পোস্ট আপিসের দারোয়ানকেই সনাক্ত করেছে—তার নিকট থেকেই সে খৈনি গ্রহণ করেছে, যদিও প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ সময়ে সে অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গলে শায়িত। ক্যাশিয়ার ও দারোয়ানের নথিভুক্ত উক্তি অনুযায়ী জানা যায় দু'দল লোক মারামারি করতে করতে তাদের দু'দিক থেকে পরস্পরকে আক্রমণ করে। কিন্তু তারা কারা? সনাক্ত করণ প্যারেডে উপস্থিত গুণ্ডা বদমাশদের মধ্যে কাউকে তারা আইডেন্‌টিফাই, চিনতে পারেনি। শহরে গুণ্ডা বদমাশ ছিনতাইকারীদের মারামারি, হানাহানি হামেশাই ঘটে। মাঝখানে নানা ক্লাবের ছেলেরা একত্র হয়ে তাদের শায়েস্তা করলেও সম্পূর্ণরূপে দমন করা যায়নি। কিন্তু কথা হচ্ছে গুণ্ডা বদমাশরা ক্যাশিয়ার ও দারোয়ানকে জখম করে তাদের সাজ পোষাক নকল করে ট্রেজারী লুণ্ঠন করবে তাও একরকম অবিশ্বাস্য। তার উপর ক্লোরোফরম প্রয়োগের ব্যাপারটাও খুবই রহস্যজনক ও গোলমেলে।

কানাঘুষায় জানা গেছে কলকাতা থেকে টেরর টেগার্ট সাহেবের এক বিশ্বস্ত সহকারী ধূর্ত গোয়েন্দা প্রবরের এমন কি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝানু গোয়েন্দার সাহায্য নিয়েও ট্রেজারী লুণ্ঠনের কোন কূল কিনারা পুলিশ করতে পারেনি। কারণ সিন্দুকে কিংবা সার্জেন্টের শরীর অথবা তার রিভলবারের খাপে কোন আঙুলের ছাপ নেই। তদরূপ ক্যাশিয়ার কিংবা দারোয়ানের শরীরে, লাঠিতে কিংবা অন্য কিছুতে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। তাছাড়া অকুস্থলে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি যার থেকে সন্ধান কার্য চালাবার মতো কোন সূত্র পাওয়া যায়। লুণ্ঠনের সমগ্র

ব্যাপারটাই এমন নিখুঁত সুচতুর পরিকল্পনার সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে যা সত্যিই অদ্ভুত বিস্ময়কর।

বিপ্লবীদের ভাণ্ডারে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রাগারও স্ফীত করবার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। এমন কি যেসব বিপ্লবীদের পিতা, জ্যেঠা, খুড়ো ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় স্বজনের বন্দুক আছে সেগুলিকেও তারা তাদেব অস্ত্রাগারে সামিল করে রেখেছে যাতে প্রয়োজন মত সেগুলি হস্তগত করে যুদ্ধকালীন অস্ত্রের ঘাটতি পূরণ করা যায়। আসন্ন সম্মুখ-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে গরিলা যুদ্ধ চালাবার গোপন আশ্রয় সন্ধানের তৎপরতাও চলেছে। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আশ্রয়দাতার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সুদেষ্ণা কর্মব্যাপদেশে নানা স্থানে যাতায়াত করে। সেও এ ব্যাপারে খুবই তৎপর।

এই সময়ে একদিন হঠাৎ সেই পাহাড়িয়া তীর্থের পোষ্ট আপিসের মাষ্টার মহাশয়ের এক জোর তাগিদপত্র আসে—আসন্ন পেন্সনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জীবন-বীমার ছিপে জব্বর এক রুই মৎস্য গেঁথেছেন। ফাতনা কেবল ডুবছে আর ভাসছে। মহাশয়া পাত্রপাঠ এলেই হেঁচকা টানে পাড়ে তুলে সদ্‌গতি করা হয়। তদনুযায়ী সুদেষ্ণা অনতিবিলম্বে দেবযানী সমাভিব্যাহারে শহর থেকে বিকালের গাড়িতে সেখানে পৌঁছে। গাড়ি থেকে বিছানাপত্র সহ প্ল্যাটফরমে নেমে কাউকে দেখতে না পেয়ে দেবযানীকে মালের জিম্মায় রেখে সুদেষ্ণা ছোটবাবুর কামরার সামনে গিয়ে হাজির। ছোটবাবু তাকে দেখেই অবাক হয়ে বেরিয়ে আসেন। নমস্কার বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করেন—হঠাৎ, এসময়ে!

—আমাদের আবার সময় অসময়, যখন তখন, বেলা অবেলা, সকাল বিকাল বলে কিছু আছে নাকি? যখনই যিনি এত্তেলা পাঠান তখনই হাজির হয়ে সেলাম জানাই। আমাদের অভিধানে গরহাজির বলে কিছু নেই।

—হুঁ, সবই বুঝলাম—তবে এক বিষয়ে এবার আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে—এই গরীবের কুটিরেই বুঝি এবার আপনাদের ক্ষুদান্ন গ্রহণ

করতে হবে। কারণ ডাকবাংলো তো গত দু'দিন ধরে সায়েবমেম-এর দখলে।

—তা যাক, সে সব কথায় পরে আসা যাবে। আগে বলুন আপনাদের সব কুশল তো? জমাদার রঘুর খবর কি? সে কোথায়?

—সে তো চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ঐ জঙ্গলেই আস্তানা নিয়েছে। হরকিষেণ এখন জমাদার, ছেদি তার মেট। বাইবে দাঁড়িয়ে কেন। ভেতরে এসে বসুন।

—না, না, এখন আর বসবার সময় নেই। আগে একবার পোষ্টমাস্টার বাবুকে সেলাম জানিয়ে আসি। ইতিমধ্যে আপনি দয়া করে একবার ছেদিকে পাঠিয়ে গফুরকে খবর দেন, বলেই সুদেষ্ণা প্ল্যাটফরম থেকে দেবযানীকে নিয়ে ধরাধরি করে বিছানাপত্র ছোটবাবুর ঘরে এনে রাখে। ছোটবাবু চিৎকার দিয়ে বলেন—করছেন কি, করছেন কি! আমি ছেদিকে দিয়ে ওসব তুলে আনাতাম।

সুদেষ্ণা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে হাসতে হাসতে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবযানীকে নিয়ে পোষ্ট আপিসের দিকে চলে যায়। সন্ধ্যা সমাগত। পশ্চিম গগনে সূর্যের শেষ রশ্মি আকাশে ছড়ানো ছিটানো মেঘগুলিকে লাল করে ফেলেছে। দূরে নেড়া পাহাড়টার গায়েও লালের ছোঁয়া লেগেছে। শীত যায় যায় করে তখনও সম্পূর্ণ বিদায় নেয়নি—ধরণীব গাছপালার গায়ে তখনও জড়িয়ে আছে। রাস্তার দু'ধার পত্রবিহীন বড় ছোট গাছগুলি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে খাড়া নেঙা দাঁড়িয়ে। এই রিক্ত সাজে বুঝি তারা বসন্তের পদধ্বনির প্রতীক্ষারত। পোষ্ট আপিসে যখন তারা পৌঁছয় ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যাদীপের আলো জ্বলে উঠেছে—সান্ধ্যমাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পোষ্ট মাস্টারবাবু রাতের ডাক গাড়ির বিলি ব্যবস্থা ও কাজ কর্মে ব্যস্ত। তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি চক্ষু তুলে সুদেষ্ণা ও তাব পাশে দাঁড়ানো দেবযানীকে দেখে তাঁর কবিত্ব বুঝি উথলে ওঠে। হেসে বলেন—ছিনু এত আশা করি দেখিনু যুগল রূপ আহা কিবা মরি! দেবযানী খিল খিল করে হেসে বলে—উত্তম, সমাস ব্যাকরণ সব কিছু নির্ভুল। তার সঙ্গে যোগ করুন—রজনী কাটিবে মোব ভালো।

—বেশ বেশ, মরি মরি! এখন ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। হাতের কাজ সেরে আমিও অন্দরমহলে আসছি।

সুদেষ্ণা বাধা দিয়ে বলে—মাফ করুন, এখন নয়। আমার অবস্থা তো বোঝেনই—ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। এদিকে এক বিভ্রাট ঘটেছে—আচ্ছা ষষ্ঠীকে দয়া করে একটু ডাকুন তো।

ষষ্ঠী তখন পার্টিশন-এর ওধারে বুঝি ডাকের থলেতে গালার সিল মোহর লাগাতে ব্যস্ত। ডাক শুনেই বেরিয়ে আসে। সুদেষ্ণাকে দেখেই বলে—দিদিমণি যে।

—শুনলাম ডাক বাংলোতে সাহেব মেম এসেছে—তুমি কিছু জান?

—আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু সাহেব মেম তো আজ বাংলোতে নেই। খোদ বড় ফরেস্ট রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে হাতি চড়ে লোক-লস্কর নিয়ে মাদার-ছড়ি গেছে—বন বিভাগের দুটি আর তারু মিঞার একটি হাতি নিয়ে। সেখানের জঙ্গলে আরাকান পাহাড় থেকে নেমে আসা হাতি-খেদা হবে। তাই দেখতে গেছে।

—ঠিক আছে ষষ্ঠী, ধন্যবাদ। তারপর মাষ্টারবাবুর দিকে চেয়ে বলে—আগামীকাল হাটবার—আমি দিন বুঝেই এসেছি। আপনি মক্কেল সহ রেডি থাকবেন। আমি আসতে না পারলে দেবযানী সব কিছু করবে—ভয়ের কিছু নেই।

—বেশ, কিন্তু একবার ভিতরে গেলে হত না। মাষ্টার সখেদে বলেন।

—না, না, মাপ করুন—শুনলেন তো সব। কালই একেবারে প্রণামী সহ দেবী দর্শন করবো। আমি কিন্তু আগামীকাল সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্ছি। আবার বলছি মক্কেল নিয়ে তৈরি থাকবেন। দেবযানী ঠিক সময়েই আসবে।

—যো হুকুম। তারপর তিনি হাসতে হাসতে দেবযানীর দিকে চেয়ে বলেন—কচ অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়েই থাকবে।

—খুব সাবধান! শেষকালে যেন দানব-চক্রান্তে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সারমেয়র আহার্যে পরিণত না হন! হাসতে হাসতে উভয়েই আপিসঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। মাষ্টারবাবু জবাব দিতে গিয়ে থেমে যান—হয়ত উল্লেখ্য পৌরাণিক প্রসঙ্গটি তিনি সম্যক ওয়াকিবহাল নন।

স্টেশনে এসে দেখে গফুর উপস্থিত। তাদের বিছানাপত্র সে আগেই বাংলোতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুদেষ্ণাকে দেখেই গফুর বলে,—চলো দিদিমণি—রাত্রি হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে সটান চলে গেলেই পারতে। অনর্থক হেনেস্থা হলে!

—যাই কি করে? শুনলাম ডাকবাংলোতে সায়েব মেম আছে। হুট করে সেখানে তোমাকে না জানিয়ে উঠি কি করে? তুমি হয়ত বিপাকে পড়তে।

—বিপাক আবার কি? হাজারগণ্ডা সাহেব মেম আসুক না কেন—তোমার স্থান সেখানে থাকবেই থাকবে—এ বান্দা যদ্দিন চৌকিদার আছে।

রাত্রে ডিনারে বসে সুদেষ্ণা গফুরকে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা গফুর ষষ্ঠীর নিকট শুনলাম—সাহেব মেমরা হাতি চড়ে হাতি-খেদা দেখতে গেছে। সে কোথায় এবং কত দূরে?

—মাদারছড়ি—সে অনেক দূর—পাহাড়-পর্বত-ঘেরা দুর্ভেদ্য জঙ্গল—তারপর কেবল পাহাড় আর পাহাড়ে ঘেরা—রুওটি। সে বড় কঠিন ঠাঁই—মগ আর কুকির বাসা। তার পরেই আরাকান পর্বত—তা পেরিয়েই বর্মা—আকিয়ার, প্রোম, বেসিন।

—যে-সব জায়গার কথা বললে সেখানে তুমি কখনো গেছ?

আজ্ঞে না, আমি দশহাজারি অবধি গেছি। ওখান দিয়ে যারা যায় আসে তাদের মুখ থেকেই সব জানতে পাই। সকলেই দলবদ্ধ হয়ে চলে—অনেক দূরের পথ কিনা। তা-ছাড়া বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু জানোয়ারের মেলা—সব চেয়ে মারাত্মক বন্য হাতির উৎপাত। জানো বড়দিমণি, হাতি একদিকে যেমন গায়ে গতরে মোটা বুদ্ধিহীন অপরদিকে তেমনি ধূর্ত ও মারাত্মক হিংস্র ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। সে অনেক কাহিনী।

—হুঁ, বলেই সুদেষ্ণা গফুরকে বিদায় দেয়। গফুরের হয়ত তাকে কিছু হাতি-কাহিনী শোনাবার বাসনা ছিল। গফুর চলে যেতেই সুদেষ্ণা দেবযানীকে শুতে বলে কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে বসে। এক ঘরে দুটো খাট বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা। দেবযানীর দিকের আলোটা কাগজ দিয়ে আড়াল করে সে কাজে মন দেয়। গফুর রাতের জন্য জলের জাগ ও গ্লাশ নিয়ে এলে সুদেষ্ণা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে—গফুর, স্টেশন জমাদার রঘুর খবর কি?

—আর বলেন কেন বড়দিমণি! এক তাজ্জব ব্যাপার! সে আর জমাদার রঘুনন্দন নেই—মস্ত বড় একজন পীর-দরবেশ, ফকির বনে গেছে। ওখানের বন জঙ্গল কেটে ফল ফুলের বাগান বানিয়েছে। ভৈরবীর কবরের ওপর ইট গেঁথে একটা মাজার বানিয়েছে—সকাল সন্ধ্যা ধূপ ধুনো বাতি

দেয়। মাজারের চার দিকে এমন সব গাছগাছড়া পুঁতেছে যার পাতার রস ওষুধের মতো অনেক উপকারে আসে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে রুগীদের দেখ ভাল করে—তার এখন চাষাভুষোদের কাছে মস্ত সুনাম। শনি মঙ্গলবারে বুড়ো শিবতলায় বসে। ভৈরবীর মতোই মায়ের কোল থেকে ছেলে-পুলে নিয়ে আশীর্বাদ করে সিঁদুরের কৌটা দেয়। ভৈরবীর ত্রিশূলখানা এখন তারই হাতে।

—খুবই ভাল কথা গফুর,—লোকের উপকার করছে, সেবা শুশ্রূষা করছে। এর চাইতে আর ভাল কি হতে পারে। গফুর বিদায় নিতেই সুদেষ্ণা আবার কাজ নিয়ে বসে, কিন্তু মন বসছে না। আসন্ন সংগ্রামের চিন্তাভাবনায় উৎকণ্ঠিত তার মন কেবল একই কেন্দ্রে ঘুরপাক খাচ্ছে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ব্রিটিশের কবল থেকে নগর উদ্ধার কল্পে যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তারই রূপায়ণে এই প্রথম স্বাধীন ভাবতে স্বশাসিত স্বরাজ প্রাপ্ত অঞ্চলে বিজয়-পতাকা উত্তোলনেব রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দ্রুত এগিয়ে আসছে। এর কোন বিকল্প নেই। জয় লাভের জন্য—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে", প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুর সম্মুখীন হবার উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। কিন্তু যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপৎকালে অপরিহার্য পরাজয়ের গ্লানি এড়িয়ে গরিলা যুদ্ধ চালাবার মতো গোপন আস্তানা একান্ত প্রয়োজন। দলেব নির্দেশ মতে এই মাত্র সংগৃহীত তথ্যাবলী অনুযায়ী এই অঞ্চলের বিস্তৃত অরণ্য—গরিলা যুদ্ধ চালাবার আদর্শস্থান। এমন কি প্রয়োজন বোধে শত্রুব্যূহ ভেদ করে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে সীমান্ত লঙ্ঘন করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান লাভেরও উজ্জ্বল সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে অনুতোষ এই অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল—সুতরাং সমীক্ষক হিসাবে সব কিছু ক্ষতিয়ে দেখতে সেই বোধহয় সক্ষম।

এই সব চিন্তাভাবনার ফাঁকে ফাঁকে সুদেষ্ণা আগামী দিনের বীমার কাগজপত্র তৈরির কাজ কোন রকমে শেষ করে বাতি কমিয়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত দেবযানী অনেকক্ষণ হল নিদ্রাগতা। সেও পরিশ্রান্ত কিন্তু তার চোখে ঘুমের শান্ত শীতল ছোঁয়া কিছুতেই লাগছে না। ফলে মস্তিষ্ক আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—এ যেন এক অন্তহীন জাগরণ। সঙ্গে সঙ্গে গীতার একটি শ্লোক—"যা নিশা সর্ব্বভূতা-

নাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"—মনে পড়ে সুদেষ্ণা চমকে উঠে। তার মানস পটে আসন্ন সংগ্রাম ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই হিমাচল সদৃশ ভাব-গম্ভীর অচল অটল, সংকল্পে অবিচল অনমনীয়, সৌম্য গৌড়কান্তি ভেসে ওঠে। একটা সূচীবিদ্ধ বেদনা-বোধে তার অন্তর থর থর করে কেঁপে ওঠে। মনে দারুণ আতঙ্ক জাগে—ছিঃ ছিঃ এতো কোন ভাবেই জিতেন্দ্রিয়া সাধিকার পুতঃ পবিত্র সমাহিত মনের জাগরণ নয়। এতো রাতের অন্ধকারে তার অন্তরের অন্তস্থলে সংগোপণে সংরক্ষিত সুপ্ত কামনা বাসনার চুপি চুপি অভিসারের জাগরণ! না, না, একে তো কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। নিজের দুর্বলতাকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে শাসন করে সুদেষ্ণা চক্ষুবুজে ঝিমধরে বিছানায় পড়ে থেকে কখন যেন অজ্ঞাতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

পরদিন ভোরবেলা ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বসে সুদেষ্ণা দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করে—কিরে রাতে তোর ঘুম ভালো হয়েছিল তো?

—হাঁ, তবে কি জানো দিদি—আগেও হয়তো তোমাকে বলেছি—আমি চক্ষু বুজলেই স্বপ্ন তার মোহময় রঙীন জাল বুনে চতুর্দিক থেকে আমাকে ঘিরে রাখে আর আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার মধ্যে ঘুরে মরি। এমন যে স্বপ্নাতুর আমি তার ছোঁয়া গত রাত্রে আমার একটুও লাগে নি। শেষ রাত্রে হঠাৎ তোমার কান্নার ফোঁস ফোঁসানী শুনে ঘুম ভেঙে যায়। কৌতূহল হলো, তুমিও কি আমার মতো স্বপ্ন দেখো নাকি দিদি? উঠে তোমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালাম। তুমি পাশ ফিরে শুলে। আমি ডাকলুম না। আবার এসে শুয়ে পড়লুম—আর ঘুম হলো না। আকাশ পাতাল নানা চিন্তা ভাবনা নিয়ে ভোরের পাখির কাকলির সঙ্গে বিছানা ছাড়লুম।

সুদেষ্ণা হেসে ফেলে—বেশ তো কাব্যের ছন্দে কথা বলতে শিখেছিস! মনে রাখিস, হয়ত আগেও বলেছি—স্বপ্ন-শুধু স্বপ্নই, অলীক। তার মাথা-মুণ্ডু কিচ্ছু নেই। সুপ্ত অবস্থায় মনের আরশিতে ঘুমের ঘোরে সাপ ব্যাঙ, হাতি ঘোড়া, সম্ভব অসম্ভব কত কিছুরই যে প্রতিফলন ঘটে তার ইয়ত্বা নেই। বুদ্ধি তখন আড়ষ্ট নির্জীব তন্দ্রাচ্ছন্ন! এই সব অবাস্তব জিনিসে আমার আদৌ মাথা ব্যথা নেই—তুইও মাথা ঘামাস নে। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে: স্বপ্নেতু সর্বজ্ঞানং স্মরণম্ অযথার্থং চ। স্বপ্নকালীন স্মৃতি

মিথ্যা ও ভ্রম। সুদেষ্ণা উঠে গিয়ে টেবিলে বসে। দেবযানীকে ডেকে বীমার কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে বলে—তুই পোষ্ট মাষ্টারের কাছে গিয়ে তাঁর মক্কেলকে দিয়ে কাগজপত্র সব সই করিয়ে টাকা পয়সা বুঝে নিবি। আমি কাজ সেরে ঠিক সময়ে পোষ্ট আপিসে পৌঁছব। বীমা সম্পর্কে কি বলে লোক ভজাতে হয় তার তালিম তো অনেক পেয়েছিস।

দেবযানী কাগজপত্র বুঝে নিয়ে ব্যাগে ভরে নেয়। গফুর ঘরে আসতেই সুদেষ্ণা তাকে সম্বোধন করে বলে—গফুর, তুমি তো বাজারে যাচ্ছ। আমরাও তোমার সঙ্গে বেরুচ্ছি। রঘুনন্দনের আশ্রমটা দেখবো। ওখান থেকে তুমি ছোটদিমণির সঙ্গে চলে যাবে। আমি সেখানে কিছু সময় থাকবো। সেখান থেকে মানুমিঞার বাড়ি যাব। দেখি যদি তার দেখা পাই। ওখানের কাজ সেরে পোষ্ট আপিস হয়ে ফিরবো। আমাদের জন্য লাঞ্চ-এর ব্যবস্থা রাখবে—ডিনার করোনা—সন্ধ্যার গাড়িতেই চলে যাচ্ছি।

গফুর সুদেষ্ণার আজ্ঞা মতো তৈরি হয়ে আসে। সকলে এক সঙ্গেই বার হয়। চতুর্দিকে তখনো পাতলা কুয়াশার আবরণ। বুড়ো শিবতলা পৌঁছে ভাঙাচোরা হাঁকরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। দীঘির ওপর তখনো ঘন কুয়াশার আবরণ ভাসছে। পাড়ের জঙ্গল ঝোপ-ঝাড় তখনো কুয়াশা জড়ানো। সিঁড়ির শেষ ধাপের বাঁ পাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা সরু পায়ে চলার পথ ধরে গফুর সুদেষ্ণা ও দেবযানীকে নিয়ে রঘুনন্দনের আস্তানায় উপস্থিত। দূর থেকে রঘু আগন্তুকদের প্রথমে চিনতে না পেরে ভড়কে যায়। নিকটে আসতেই রঘু তাদের দেখে অবাক,—গফুরভাই, বহিনজী, দিদিমণি বলে সে চেঁচিয়ে—সুক্রিয়া, সুক্রিয়া। মেরা জোর বরাত—আপলোক আয়া। ম্যায় বহুত খোশ হুঁ, বলে সম্ভাষণ জানায়।

—শুনলাম, তুমি একটা আশ্রম বানিয়েছ। লোকজনের খিদমত করছ। তাই দেখতে এলাম।

—ইয়ে সবকুচ্ আপকা দান বহিনজী—আপকো দেখকে ম্যায়নে শিখা।

—সে কী!

—হাঁ, বহিনজী। আপনি যে পরের দুঃখে কত কাতর হন, এবং তা দূর করার জন্য কত চেষ্টা করেন, কতভাবে পরের সেবা করেন তার জলন্ত দৃষ্টান্ত তো সম্মুখেই দণ্ডায়মান—কি বলো গফুর ভাই।

গফুর গদ গদ কণ্ঠে জবাব দেয়—যা বলেছ রঘু। বহিনজীর তুলনা নেই।

—রঘু, ওসব কথা বাদ দাও। এখন তোমার আশ্রমটা আমাকে একটু ঘুরে দেখাও।

রঘুনন্দন খেদের সঙ্গে বলে—মোতিয়াকে ফিরে পেয়েও চিরতরে হারিয়ে ফেললাম। সে তো আপনি জানেন। এখন এসব নিয়ে পড়ে আছি বহিনজী।

—খুবই ভাল কাজ করেছ রঘু, উত্তম কাজ করেছ।

ততক্ষণে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্য দেখা দিয়েছে। আস্তে আস্তে কুয়াশা সরে গিয়ে দীঘির চতুর্দিকের শ্যামল গাছপালা ঝোপঝাড় লতাপাতা রৌদ্রে ঝলমল করছে।

দেবযানীর এসবে কোন পাঠ নেই। সে নীরব দর্শক ও শ্রোতা। কিন্তু রঘুয়ার বাগানে প্রবেশ করে সে মুগ্ধ মুখর হয়ে ওঠে—আহা কি সুন্দর সাজানো ফুলের বাগান! ফুলে ফুলে হাত দিয়ে আদর করে গন্ধ শুঁকে—এটা কি ফুল, ওটা কি ফুল, বলে রঘুয়াকে ব্যতিব্যস্ত করে ঘুরে বেড়ায়।

রাখালগণ আসতে শুরু করেছে। গফুর ও দেবযানীকে বিদায় দিয়ে সুদেষ্ণা রঘুয়াকে ডাকে—চলো তোমার আস্তানাটা একটু ঘুরে দেখি। রঘুয়ার কুটিরের চতুর্দিক ঘুরে রাখালগণ যেদিকের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এখানে প্রবেশ করছে সেদিকেই অগ্রসর হয়। রঘুয়া তাকে অনুসরণ করে। সারা দীঘির পাড় ঘুরে ঘুরে দেখে। মাঠে নেমে বিস্তৃত মাঠের ওধারে অদূরে ও দূরে পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলির দিকে চেয়ে দেখে। পুনরায় দীঘির পাড়ে উঠে এসে ওপাড়ের বুড়ো শিবের বট গাছটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। ইতস্তত সঞ্চরমান গরু বাছুরের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে সুদেষ্ণা ফিরে আসে। রঘুয়ার দিকে চেয়ে বলে—খুবই সুন্দর জায়গা বেছে নিয়েছ। উপস্থিত রাখাল বালকেরা সুদেষ্ণাকে দেখে হাত তুলে নমস্কার জানায়। তাদের দিকে চেয়ে বলে—সাধুজী তোমাদের সকলকে খুবই ভালবাসে, তোমরাও তাকে ততখানিই ভালবাসো। সকলেই একবাক্যে জবাব দেয়,—হাঁ মাতাজী, হাঁ। খুবই আনন্দের কথা। এই যে লেংচা, কাছে এসো। লেংচা লজ্জা পেয়ে একটু দূরে সরে যেতেই সুদেষ্ণা খপ করে তার হাত ধরে কাছে টেনে এনে আদর করে। পাশে দাঁড়ানো

রঘুয়ার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলে—বাচ্চা লোককে মিঠাই খিলানা। সুদেষ্ণা সকলের দিকে চেয়ে বলে—আমি এখন যাচ্ছি, মাঝে মাঝে আসবো। রঘুয়া তার পেছন পেছন চলতে থাকে। বুড়ো শিবতলা পৌঁছে সুদেষ্ণা বলে আর তোমার আসতে হবে না রঘু। এই কয়টা টাকা তোমার সেবা ভাণ্ডারে দিয়ে গেলাম। আমি সন্ধ্যায় চলে যাচ্ছি। খুবই মহৎ কাজ করছ রঘু। গরীব দুঃখী আর্ত্তজনের সেবা মহা পুণ্যের কাজ। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিভূ। তার সেবা মানেই পরমেশ্বর পরমাত্মাব সেবা—খিদমত। যদি প্রয়োজন মনে কর আমি প্রতিমাসে ওষুধপত্র সহ একজন সেবাব্রতী তোমার নিকট পাঠাতে পারি। সে তোমাকে পোড়া ঘা, কাটা ঘা ইত্যাদি কিভাবে সারাতে এবং অন্যান্য জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয় তা তোমাকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেবে। ইচ্ছা কিংবা প্রয়োজন হলে তাকে রোগীদের বাড়িও নিয়ে যেতে পার।

উৎসাহে রঘুয়ার মুখ দিয়ে বাংলা বাত, বেরয়না—বহুৎ বড়িয়া বাৎ বহিনজী। হাম সবকুচ শিখনে মাঙ্‌তা।

আচ্ছা বলেই সুদেষ্ণা চলতে থাকে।—নমস্তে, নমস্তে বহিনজী। রঘুয়া খুশিমনে আপন ডেরায় ফিরে যায়।

বড় রাস্তায় পড়ে সুদেষ্ণা রেলের ঘুমটি ছাড়িয়ে স্টেশন ডাইনে এবং পোষ্ট আপিস বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলে। ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে বাঁয়ে কিছু দূর চলেই রাস্তা থেকে কিছুটা ভেতরে ঢুকে অনেকখানি চত্বর জুড়ে মান্নু মিঞাব বিরাট বাড়ি। ডানদিকে খামার—ধান চালের গোলা আর থাকে থাকে সাজানো বিচালির গাদা। বাঁয়ে গো-শালা ঘোড়া-শালা ইত্যাদি মিলে বর্ধিষ্ণু সম্পন্ন পরিবার। ছেলেরাও লায়েক—চাকুরি করে। খালাতো দাদা শহরবাসী—বিরাট প্রতিপত্তিশালী—বড়লাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বার।

সুদেষ্ণাকে বাড়ির দিকে এগোতে দেখেই একটি ছেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—কাকে চাই?

—মান্নু মিঞা। বলো, শহর থেকে এক বহিন এসেছে। সুদেষ্ণাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে ছেলেটি ভেতর চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মান্নু

মিঞা এসে হাজির। তাকে দেখেই মান্নু মিঞা অবাক। জিজ্ঞাসা করেন—আপনি ?

—হাঁ, সেদিন শহরে দাওয়াইখানায় দেখা। ছেলেদের জন্য বীমার আর্জি জানালাম। বললেন, আসবেন। ব্যস, তাই যথেষ্ট। আর কি বসে থাকা যায়! সুযোগ পেয়েই দৌড়ে এলাম—বীমা কোম্পানীর দালাল তো! বীমার দালাল আর জগন্নাথের পাণ্ডা—একই গোত্রের। খবর পেলেই উড়ে এসে জুড়ে বসবে! বুঝলেন মিঞাসাহেব ?

মান্নু মিঞা হা হা করে হেসে ওঠেন।—আরে ও সুলতান, এদিকে আয় বেটা। মাইজীর জন্য ভালো একটা ডাব নিয়ে আয় আর নাসের ও সোহ্‌রাবকে বল—আব্বাজান ডাকছেন। আপনি এয়েছেন এটা আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। তবে এতটা পরিশ্রমের দরকার ছিল না—এ তল্লাটে আপনাকে কে না জানে, কে না চিনে! গফুরকে দিয়ে খবর পাঠালেই আমি ছেলেদের আপনার নিকট পাঠাতাম। বলা স‌ঙ্গ হতেই ছেলেরা এসে হাজির।—দে বেটা বহিনজীকে সেলাম দে। সুদেষ্ণা ওদের কাছে টেনে এনে আদর করে বসায়।

—নিন, এবার ওদের দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে নিন—প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকার বীমা করুন। সে যুগে পাঁচ হাজার টাকা, বেশ বড় অঙ্ক বলেই গণ্য। খুশি হয়ে সুদেষ্ণা ওদের দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে বলে—বুঝলে বাপধনরা, এ হলো জমিজিরাতের মতোই ফলদায়ক। আখেরি ফায়দা পাবার নিশ্চিত নিরাপদ আশ্বাস! তারপর মান্নু মিঞার দিকে চেয়ে বলে—পলিসি দুটোর প্রত্যেকটা ২০ বৎসরের মেয়াদি বীমা করলাম। তাতে লভ্যাংশ মিলে মিয়াদ অন্তে অনেক টাকা আসবে। এই দেখুন তার হিসাবপত্র। ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রচারপত্র সহ তার হাতে এবং ছেলেদেরও একসেট করে দেয়।—প্রথম কিস্তির টাকা আমাকে দিতে পারেন কিংবা মনিঅর্ডার করে কোম্পানীর নিকটও পাঠাতে পারেন—যা অভিরুচি। আর একটা অনুরোধ প্রতি কিস্তির টাকাটা ঠিক সময়েই পাঠাবেন।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আর এই প্রথম কিস্তির টাকা মনিঅর্ডার কেন ? আপনি নগদ নিয়ে যান। সোহ্‌রাবকে বলে—যাতো বাবা, মায়ের নিকট হতে টাকাটা নিয়ে আয়। সুদেষ্ণা টাকা নিয়ে ডাবের জল খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়। সৌজন্য বিনিময়ের পর—খোদা হাফেজ বলে উঠে পড়ে।

পোষ্ট আপিসে সুদেষ্ণা যখন এসে পৌঁছয় বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। তাকে দেখেই মাষ্টার মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলেন—ধন্য আপনার গুরুগিরি আর ধন্য আপনার শাগরেদ। যা একখানা চেলা তৈরি করেছেন! পার্টিতো তার কথার ঘায়ে মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা। আপনাকে আর করে খেতে হবে না।

তা হলে তো খুব সুখের কথা, আনন্দের বিষয়। গুরুর শিক্ষা সার্থক। জানেন তো—গুরু মিলে লাখলাখ চেলা নাহি মিলে এক। যাক, মক্কেলকে দিয়ে যে টাকা কবুল করিয়েছিলেন সে টাকারই তো বীমা হয়েছে?

—আলবৎ, তা না হলে কেন বললাম যে, মক্কেল কথার ঘায়ে একেবারে কুপোকাৎ। দ্বিরুক্তিটি পর্যন্ত করলে না। প্রথম কিস্তির অতগুলো টাকা মবলগ ঝট করে ফেলে দিলে।

—ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ—আপনার মঙ্গল হোক, সব নিয়ে সুখী হন। মহাদেবীকে প্রণামীটা দিয়ে যাই। অনেক বেলা হয়েছে। আজই সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্ছি কিনা। যেতে যেতে কমিশনের টাকাটা হিশাব করে হাতে নিয়ে নেয়। ভেতরে ঢুকে সুদেষ্ণা অবাক হয়ে যায়। দেখে দেবযানী মাষ্টার গিন্নীর গা ঘেঁষে বসে পান চিবোচ্ছে আর তার মুখের দিকে চেয়ে কথা গিলছে।

সুদেষ্ণা মাষ্টার গিন্নীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন—এয়েছ? ধিঙ্গিপানা শেষ করে এতক্ষণে আসতে পারলে? কতদিন বলেছি এখানে এসো—একত্রে বসে খাই দাই, আমোদ আহ্লাদ করি, তা নয়, সব উল্টো ব্যাভার। বাংলোয় উঠবে—নেড়েদের খানা খাবে—যতসব অনাছিষ্টি। গা জ্বলে যায়। ওরে ও সৈরভী বাটাখানা নিয়ে আয় তো।

সুদেষ্ণা আরো সামনে এসে হেসে বলে—আগে তো পা-টা বাড়ান, গর্দানটা নামাই। ইচ্ছা হলে বলি দেবেন, বলেই 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—পাঠ করে পায়ের কাছে প্রণামীটা রাখে।

মাষ্টার গিন্নী তার চিবুক ধরে চুমো খেয়ে মাথায় হাত রেখে বলেন—সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক তো বলতে পারছি না এমনই পোড়া কপাল আমার। কবে যে তা হবে তা তুমিই জানো বাছা। তবু আশীর্বাদ করছি—হেসে খেলে পরম সুখে থাক।

সৈরভী এসে হাজির। বাটা ভরা মিষ্টি আর তারই এক কোনে

একটি সুন্দর করে সাজানো পানের খিলি। বাটা দেখেই সুদেষ্ণা মাষ্টার গিন্নীর পায়ে উবু হয়ে পড়ে—দোহাই মহাদেবী—ক্ষমা করুন। বেলা অনেক হয়েছে, এগুলি খেলে আর লাঞ্চ খেতে হবে না।

মাষ্টার গিন্নী তেড়ে ওঠেন—ছ্যোরি, নিকুচি করেছে তোমার লাঞ্চ-এর। ধমকে বলেন—খাও।

সুদেষ্ণা নিরুপায় হয়ে বলে—সত্যি পেট ভরা। ঐ যে আপনি কি যেন বলেন নেড়ে—তার বাড়িতে পেট ভরে জলাহার করেছি।

মাষ্টার গিন্নী শুনেই থমকে যান—ওঃ, এই ব্যাপার। আচ্ছা একটা মিষ্টি তো মুখে পুরো—তারপর ঐ পানটি খাও। অতি যত্ন করে বানিয়েছি। কর্তার মুখে শুনেছি তোমরা আসছো।

—আচ্ছা তাই খাবো। দিন একটা মিষ্টি মুখে পুরে দিন, বলেই সুদেষ্ণা হাঁ করে।

—মাষ্টার গিন্নী মহা খুশী। একটা সন্দেশ তার মুখে দিয়ে দেয়। তারপর পানটা নিয়ে বলেন এটা চিবিয়ে প্রথম রসটা ঐ পিক্‌দানীতে ফেলো। তারপর আস্তে আস্তে চিবিয়ে খাও, তবে তো পানের স্বাদ উপভোগ করবে। তারপর দেবযানীর দিকে চেয়ে বলেন—কি গো নাতনী, সত্যি কিনা? দেবযানী হেসে সায় দেয়।

সুদেষ্ণা মাষ্টার গিন্নীর কথামতো পান চিবোতে চিবোতে তাকে খুশি করবার জন্য বলে—পানটা অতি চমৎকার, অপূর্ব! এবার যাবার অনুমতি দিন। মহাদেব মহাশয় তো এলেন না। আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

—তা কি কখনো বলতে পারি? কর্তা তো শুনেছি এখান থেকেই রিটার করবেন। হয়তো এজীবনে আর দেখাই হবে না। তবু বলছি এসো, মনে রেখো। শেষ কথা বলতে গিয়ে তার গলা ধরে আসে। তিনি উঠে দাঁড়ান। সুদেষ্ণা ও দেবযানী তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে যায়—আর পেছন ফিরে তাকায় না। বর্ষীয়সী স্নেহবৎসলা তখনো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভোরের ট্রেনে সেদিন অনুতোষ পাহাড়িয়া রেল স্টেশনে এসে নামে। সঙ্গে তার রেড ক্রশ মার্কা ঝোলা ভর্তি প্রাথমিক চিকিৎসার নানা ওষুধ-পত্র ও সাজসরঞ্জাম। প্ল্যাটফরমের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে সে রেল পথ ধরে সোজা এগিয়ে চলে। রেল গুমটি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে আসে। পুব পাহাড়ের পেছনে সবে উদীয়মান সূর্যের বিচ্ছুরিত স্বর্ণচ্ছটায় গাছপালা মাঠ ঘাট উদ্ভাসিত। অনুতোষ মেঠো হাঁটা-পথ ধরে বুড়ো শিবতলার দিকে এগোয়। দূর থেকে নবারুণের সোনালি আভায় দীপ্ত জটাজুটধারী অতিকায় সবুজ বটগাছটাকে মনে হয় অদ্ভুত রহস্য রোমাঞ্চ-ঘেরা। গাছতলায় পৌঁছে অনুতোষের পূর্ব-স্মৃতি জেগে ওঠে। এখানেই সে একদিন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সাধু-বাবা সেজে তাবিজ কবজ মাদুলি ইত্যাদি দিয়ে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেছিল। স্থানটা গরিলা যুদ্ধের উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অনুতোষ গাছ-তলার চতুর্দিকের আনাচ-কানাচ ঘুরে ঘুরে দেখে ভাঙা ঘাটলার উপর এসে দাঁড়ায়। রৌদ্র-স্নাত বিশাল দীঘিটা চতুর্পার্শ্বস্থ উঁচু পাড়ের সবুজ শ্যামল তৃণলতা গুল্ম, গাছপালা, ঝোপঝাড়ের আচ্ছাদনে এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। দীঘির মাঝখানটা জলজ উদ্ভিদে ভর্তি। কয়েকটা প্রস্ফুটিত শ্বেত ও লাল পদ্ম কুঁড়ি সমেত তার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো তেরছা হয়ে তাদের উপর এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে তারা যেন খুশিতে হাসছে। বিমুগ্ধ নয়নে অনুতোষ সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর ভাঙা হাঁ-করা জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে সতর্কে নিচে নেমে যায়। প্রকাণ্ড সিঁড়ির শেষ ধাপের একটা অংশ ভেঙ্গে কাৎ হয়ে আছে। তার সংলগ্ন ঝোপের ভেতর একটা সরু পায়ে চলা পথ। ঐ পথ ধরে চলে সে রঘুর আস্তানায় উপস্থিত হয়।

রঘুয়া তখন বাগানে ফুল গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত। এত সকালে পিঠে একটা মস্ত বড় ঝোলা নিয়ে আচম্বিতে অপরিচিত এক আগন্তুকের আবির্ভাবে রঘুয়া সন্ত্রস্ত হয়ে আপন জবানিতেই জিজ্ঞাসা করে—আপ্ কোন্?

অনুতোষ কোন জবাব দেয় না। ফুলের শোভা দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে সে রঘুয়ার বাগানে প্রবেশ করে। এতে রঘুয়া আরো ঘাবড়ে যায়। কম্পিত কণ্ঠে বলে,—আপকা মতলব ?

অনুতোষ এবার রঘুনন্দনের সামনে এসে দাঁড়ায়। হেসে বলে—হামারা কোই মতলব নেহি, রঘু ভাই। ম্যায় তো এক দীন জন-সেবক হুঁ। তোমহারা বহিনজীনে বহুৎ দাওয়াইওয়াই দেকে মেরেকো ভেজা।

—আচ্ছা, ইয়ে বাৎ! আপনার জবাব না পেয়ে আমি বহুত ডর গিয়াথা। চলুন ঘরে চলুন। কুঠিরের ভেতর ঢুকে রঘু অনুতোষের বসবার জন্য একখানা আসন পেতে দেয়। তাতে না বসে অনুতোষ বলে, —রঘু এই ব্যাগের ভিতরের সব দাওয়াই কোথায় কি ভাবে রাখবে ? এর জন্য তো একটা বড় বাক্স কিংবা আলমারি চাই। তোমার ঐ ছোট কবিরাজি বাক্সে তো চলবে না।

—তা না হলে, কি হবে বাবু ?

—ঠিক হ্যায়, ঘাবড়াও মত। তোমাদের বাজারে কাঠের কিংবা টিনের বাক্স আবশ্যই পাওয়া যায়। কাউকে পাঠিয়ে তারই একটা নিয়ে এসো—এই নাও টাকা। টাকা নিয়ে রঘুয়া একজন রাখালকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

—চলো রঘু তোমার আস্তানাটা একটু ঘুরে দেখি। রঘুয়াকে সঙ্গে নিয়ে অনুতোষ সারা দীঘির পাড়টা ঘুরে ঘুরে দেখে তাকে ছেড়ে দেয়। দীঘির এ-পাড় থেকে ও-পাড়ের বুড়ো বটগাছটার দিকে চেয়ে দেখে। সেখানে লোকজনের ভিড়। কাঁসর ঘণ্টা ও বাদ্য ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দীঘির পাড় ছেড়ে অনুতোষ মাঠে নেমে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করে। মাঠের ও-ধারে গ্রাম এবং পাহাড়ের লাগোয়া গ্রামগুলির দূরত্ব অনুমান করে। তারপর মাঠ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বুড়ো বটের থান সহ দীঘির বাইরের চৌহদ্দি পরিমাপ ও পরিভ্রমণ করে। দীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোন থেকে রেল লাইনের দূরত্ব হেঁটে পরীক্ষা করে ফিরে আসে।

সূর্য মধ্য গগনে উপস্থিত। আতপ-ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত অনুতোষ রঘুয়ার কুঠিরে প্রত্যাবর্তন করে। ঘরে ঢুকে কাঠের বাক্সটি দেখেই অনুতোষ রঘুকে ডাকে। সাড়া না পেয়ে বাইরে এসে খোঁজ করে। একটি ছেলে তার সম্মুখে এসে বলে—আজ্ঞে, সাধুবাবা তো বুড়োবটের থানে গেছে—

আজ শনিবার কিনা—তার ফিরতে দেরি হবে। কথা শেষ ছেলেটি কয়েকটা টাকা অনুতোষকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে—বাক্স কেনার বাকী টাকা।

টাকা নিয়ে অনুতোষ ঘরে এসে বাক্সটার ডালা তুলে দেখে খুশি হয়। বাইরে বেরিয়ে একটা ছেলেকে ডেকে কয়েকখানা ইট আনিয়ে তার উপর বাক্সটা ঘরের এক কোনে বসিয়ে দেয়। রঘুয়া তখনো আসছে না দেখে সে ঝোলা থেকে শুকনো খাবার ও জল বের করে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর খাবারের থলিটা নিয়ে বাইরে এসে ছেলেদের ডাক দেয়। তারা সবাই ছোট্ট প্রাঙ্গণটিতে এসে ভিড় করে। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও বলতেই তারা পরপর এক লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। নাম জিজ্ঞাসা করে করে অনুতোষ প্রত্যেককে খেজুর বাদাম বিস্কুট খেতে দেয়। শেষের ছেলেটির নাম হাবুল। সে তার পট্টি বাঁধা ময়লা হাতটা বাড়াতেই অনুতোষ সেটা ধরে ময়লা নেকড়াটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলে দেখে ঘা-টা পুরানো—একটা সাদা পর্দামত পড়েছে। হাতটা ফোলা। গায়ে হাত দিয়ে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করে—না, গায়ে জ্বর নেই। তাকে নিয়ে অনুতোষ ঘরে আসে। একটা এলুমিনিয়াম পাত্র তার হাতে দিয়ে গরম জল নিয়ে আসতে বলে তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বের করে রাখে। রঘুয়া বুড়ো শিবতলা থেকে এসে ঘরে ঢোকে। অনুতোষ তাকে ছেলেটির নাম তার হাতের ঘা-টার বিষয় জানায়। রঘুয়া কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম জল ও ছেলেটিকে নিয়ে সে ফিরে আসে। অতঃপর অনুতোষের নির্দেশ মতো ক্ষত পরিষ্কার থেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পর্যন্ত রুগ্ন ছেলেটির শুশ্রূষা রঘুয়া মনযোগ দিয়ে সমাধা করে। এভাবেই রঘুয়ার আর্তজনের শারীরিক সেবা শুশ্রূষার হাতে খড়ি হয়।

ছেলেটি বেরিয়ে যেতেই অনুতোষ রঘুয়াকে বাক্সটার নিকট আসতে বলে। তারপর ঝোলা থেকে ওষুধ বার করে তার হাতে দিয়ে কোনটার কি নাম এবং কোন রোগের ওষুধ বুঝিয়ে তা বাক্সে রাখায় এবং পুনরায় ওষুধের নাম জিজ্ঞাসা করে তা বাক্স থেকে তুলে তাকে দেখাতে বলে। এভাবে তালিম দিয়ে অনুতোষ রঘুয়াকে ওষুধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে। অতঃপর গৃহস্থ ও চাষাভূষোর ঘরে সাধারণত যে রোগের বেশী প্রাদুর্ভাব ঘটে তা বিশদভাবে বলে ওষুধ বার করে নাম এবং ব্যবহার

পদ্ধতি তাকে বুঝিয়ে দেয়। এভাবেই রঘুয়া হাকিমিরও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

অনুতোষ অতঃপর রঘুয়ার নিকট আশপাশের গাঁয়ের খোঁজ খবর নেয়—লোকজন কি রকম, সাংসারিক অবস্থা, কোন অসুখবিসুখ আছে কিনা ইত্যাদি।

উত্তরে রঘুয়া জানায়, পাশের গাঁয়ে গুটি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোকজন অধিকাংশই চাষী। আর পাহাড়ের লাগোয়া গ্রামের লোকজনের বেশীর ভাগই কাঠুরিয়া। তবে কিছু কিছু চাষবাসও আছে। ঐ গ্রামের একটা লোকের সঙ্গে তার খুব দোস্তি। কাঠ কাটতে কুড়োল ছুটে গিয়ে পাটা খুব জখম হয়। নানা এলাজ করেও ঘা-টা সারছে না।—একবার গিয়ে যদি দেখেন বাবু।

আমার যাবার দরকার কি? ঐ ছেলেটিকে যেভাবে চিকিৎসা করলে সেভাবেই করবে।

—না বাবু, তবুও একবার দেখুন। ঘা-টা আমার কেন জানি ভাল মনে হচ্ছে না। আর একটা কথা বাবু- গুটি বেমারির দাওয়াই কি?

—প্রথম কথা হলো আমি সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্ছি। এখন ঐ দূর গাঁয়ে গেলে কি ফিরে গাড়ি ধরতে পারবো? দ্বিতীয় কথা গুটি বেমারিব কোন ওষুধ নাই—শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখতে হবে।

—গাড়ির জন্য চিন্তা করবেন না। আলবৎ আপনি গাড়ি ধরতে পারবেন—আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে দেব। চট্ করে কিছু খেয়ে নিন।

—আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি কিছু খেয়ে নাও বলেই অনুতোষ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ব্যাগে পুরে নেয়। রঘুয়া কিছু ফলমূল খেয়েই উঠে পড়ে। গ্রামে পৌঁছে অনুতোষ মুগ্ধ হয়—সুন্দর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেন ছবির মতো পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে আছে। তবে ঘরদোরের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় বাসীন্দারা গরীব। রঘুয়া একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দোস্ত দোস্ত বলে ডাকতে থাকে। বাড়ির সামনে দুটো গরু বাঁধা, কয়েকটা ছাগল, পাঁঠা চরে বেড়াচ্ছে। রঘুয়ার ডাকাডাকিতে একজন শক্ত সমর্থ মহিলা বেরিয়ে আসে, সঙ্গে দুটি বাচ্চা।

রঘুয়াকে দেখেই মহিলাটি বলে—একি ভাইজান। আসুন, আসুন।

আপনার দোস্ত বহুত কাবু হয়ে পড়েছে—পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে, ঘা-টা আরো ফুলেছে।

—চলো চলো, হেকিম লে আয়া—দেখি কি চিকিৎসা করেন।

অনুতোষ ঘরে ঢোকে। ঘর এবং রোগী যে বিছানায় শুয়ে আছে তা খুব অপরিষ্কার নয়। প্রথমেই গায়ে হাত দিয়ে দেখে—জ্বর আছে, পাটাও খুব ফুলেছে। রোগীর কণ্ঠস্বর ব্যথায় কাতর। পা থেকে নেকড়াটা খুলে অনুতোষ উদ্বিগ্ন চোখে দেখে ঘা-টা দক্‌দক্‌ করছে, চারিদিকে জমা পুঁজ থক্‌থক্‌ করছে এবং কষ ঝরছে। অনুতোষের ভয় হলো—ঘা-টা বুঝি বা বিষাক্ত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে পাত্র বের করে দিয়ে রঘুকে গরম জল আনতে বলে। গরম জল এলে পর রঘু অনুতোষের নির্দেশে ইতিপূর্বে রাখাল বালকের অনুরূপ পরিচর্যায় দোস্ত করিমের ঘা-টা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগায়। অতঃপর অনুতোষের সাহায্যে তুলো ও মেডিকেটেড ব্যাণ্ডেজ দিয়ে পায়ে পট্টি বাঁধে। হাত অবসর হতেই রঘুয়া করিমকে আশ্বাস দেয়—দোস্ত ঘাবড়াও মৎ, ইনি হেকিমিতে একজন ধন্বন্তরি। তুমি জলদি ভাল হয়ে উঠবে।

হাত ধুয়ে অনুতোষ রঘুয়াকে তার ভাজকে ডাকতে বলে। ভাজ উপস্থিত হতেই তাকে সাবধান করে—আপনার স্বামীকে হাঁটা চলা করতে দেবেন না। ঘায়ে জল কিংবা কোন চোট যেন না লাগে। রঘুয়ার হাতে যে বড়ি পাঠিয়ে দেব তা সকালে বিকালে একটা করে মুখে জল দিয়ে গিলে খাওয়াবেন। রঘুনন্দন প্রতি তিনদিন অন্তর এসে ঘাটা পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দেবে। আশা করি এভাবে চিকিৎসা চললে শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে। তারপর করিমের দিকে চেয়ে তাকে হুঁশিয়ার করে—হেলাফেলা হয়েছে বলেই ঘা-টা বেড়েছে। এখন থেকে রঘুনন্দনের নির্দেশ মতো চলবে। ভয়ের কিছু নেই। আচ্ছা চলি, তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সে রঘুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বেলা পড়ে এসেছে—সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। বাকী কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে। রঘুর আস্তানায় এসে অনুতোষ তাকে সাবধান করে—তোমার দোস্তের ঘায়ে মনে হয় পচন ধরেছে। যা যা করতে বলেছি সে ভাবে এলাজ করবে। ঠিক মতো চিকিৎসার পরেও যদি দেখ ঘা শুকোচ্ছে না এবং জ্বর কমছে না তখন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়ে অবশ্য রোগীকে দেখাবে এবং তাঁর ব্যবস্থা মতো চিকিৎসা করাবে। এই নাও

ডাক্তারের ফি দশ টাকা। বাইরে এসে অনুতোষ রাখাল বালকদের ডেকে বলে—বন্ধুগণ আমি যাচ্ছি। তোমরা খেলাধুলো করবে। দীঘির পাড়ের জঙ্গল কেটে মাঠ বানিয়ে হাডুডু, দাড়িয়াবাঁধা, ইত্যাদি নানা খেলা খেলতে পার। তাতে শরীর ভাল হবে, মনে ফুর্তি পাবে। সকলেই তার কথায় সায় দিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে তাকে বিদায় দেয়। একমাত্র ব্যতিক্রম লেংচা। সে দৌড়ে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। অনুতোষ তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে।

বাজারে এসে অনুতোষ ডাক্তারবাবুর নিকট দিদি সুদেষ্ণার উল্লেখ করে আপন পরিচয় দেয়। তারপর রোগীর অবস্থা বর্ণনা করে কিভাবে চিকিৎসা হচ্ছে তা তাঁর গোচরে আনে। সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন—জ্বর না কমলে বিপদের কথা বটে—গ্যাঙরিন হবার আশংকা। রঘুকে বললেন—এই বড়ি ঠিক মতো খাওয়াবে। তিন দিনের মধ্যে জ্বর এবং ফুলো না কমলে অন্য দাওয়াই ব্যবস্থা করতে হবে।

উভয়েই ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে আসে। গাড়ির সময় হয়েছে। অনুতোষ স্টেশন মুখি চলবার মুহূর্তে রঘুয়া জিজ্ঞাসা করে—আবার কবে আপনার সাক্ষাৎ পাবো বাবু।

—তার তো কিছু ঠিক নেই রঘু। আমার কাজই হলো ঘুরে ঘুরে লোকজনের সেবাশুশ্রূষা ও পরিচর্যা। তবে হাঁ, দিদি যদি হুকুম দেন তাহলে অবশ্যই আসতে হবে। তুমি আর দেরি করোনা—দুটো বড়ি আজ অবশ্যই খাওয়াবে। আশা করি তোমার সাঙ্গাত শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে।

•

সদর স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে সন্দেহ-ভাজন কাউকে নজরে না পড়াতে অনুতোষ প্রধান ফটক দিয়ে বেরোবার মনস্থ করে সে দিকে অগ্রসর হতেই হঠাৎ পেছন থেকে আকর্ষণ অনুভব করতেই সে ঘুরে গুরখাকে দেখতে পায়। কিছু না বলেই গুরখা যাত্রীদের জন্য যানবাহনের গেটের দিকে চলতে থাকে ঐ গেটটা অন্য দুই গেটের তুলনায় অন্ধকার ; অগত্যা সেও কয়েকটা মোটবাহী কুলির পিছে পিছে ঐ গেট দিয়েই বেরিয়ে যায়। চলতে চলতে কিছুটা কাছাকাছি হতেই গুরখা জানায় অন্য দুই ফটকে টিকটিকিগুলি শকুনের দৃষ্টি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাত্রীদের

লক্ষ্য করছে।' আপনাকে মহারাজ আজ রাত্রেই দেখা করতে বলেছেন জানিয়েই গুরখা ভিন্ন পথে অন্তর্হিত হয়।

মহারাজ-এর অস্বাভাবিক জরুরী তলবে অনুতোষ উদ্বিগ্ন। দ্রুত পদক্ষেপে অমৃতকানন অভিমুখে চলে অনতিবিলম্বে আম্রকুঞ্জে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। কুশল প্রশ্নের পর মহারাজ অনুতোষের সফর বৃত্তান্ত শুনে খুশি হয়ে বলেন—হাঁ, এভাবেই জন-সংযোগ দ্বারা আমাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি প্রসার ও গোপন আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে। তুমি আমাদের সেবাদলের অন্যতম প্রধান। সেবাকর্মী হিশেবেই তোমার প্রকৃষ্ট পরিচয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মের সঙ্গে তোমার এই ঠাট পোশাক অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মহারাজা জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ক্লাশের সবাইকে তুমি চেন, জান?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ভুবন সরকার ছেলেটিকে তুমি জান?

—আজ্ঞে হাঁ, ওতো সদর আদালতের নাজিরের ছেলে। সহজ সরল, লেখাপড়ায় ভাল।

—ছেলে ভালো, বাবা গভর্নমেন্ট চাকুরিয়া—এ সুযোগই পুলিশ নিয়ে ওকে ইন্‌ফরমার হিশেবে ব্যবহার করছে—যাতে কারো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। ছেলেটি নিয়মিত ক্লাশের ছেলেদের কথাবার্তা—কে কখন আসে যায়, প্রক্সি দিয়ে ক্লাশে কে উপস্থিতি দেখায়, ইত্যাদি পুলিশের গোচরে আনে। তা ছাড়া পুলিশ অধুনা ঐ ট্রেজারী লুণ্ঠন দিনের সঠিক খোঁজ খবর পাবার উদ্দেশ্যে পুরস্কার ঘোষণা করে থানায় থানায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। গুরখা টেংরার উপর নজর রাখার প্রয়োজন নেই তবুও রাখতে হচ্ছে। বলা তো যায় না—টাকার লোভ বড় বিষম লোভ। সেদিনের দাঙ্গায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের উপর এবং থানায় যাতায়াতকারীদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। ঐ ভুবন ছেলেটির পকেট থেকে যে নোটবই উদ্ধার করা হয়েছে তাতে অনেকের মতো তোমার নামের সঙ্গে এমন দিনের প্রক্সির উল্লেখ রয়েছে যে দিন সরকারী কোষাগার লুণ্ঠিত হয়। কাজেই তোমাকে সদাসর্বদা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। আর একটি বিষয় হলো কয়েকটি নতুন রিক্রুট-এর প্রশিক্ষণের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কথা শেষে মহারাজ উঠে দাঁড়ান। অনুতোষ বিদায় নিয়ে আম্রকুঞ্জ পরিত্যাগ করে।

এর পরে কলেজে অন্য এক ঘটনা মহারাজ-এর সাবধান বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। সেদিন ক্লাশ শেষে কলেজের গেট দিয়ে বেরোবার কালে আচম্বিতে মনে হলো কিছু একটা যেন সট্ করে গেটের পাশে মাধবীলতা গুচ্ছ-এর আড়ালে সরে গেল। অনুতোষ দাঁড়িয়ে পড়ে। চেয়ে দেখে মাধবীলতার আড়ালে কোন কিছু নেই। তা হলে ঘটনাটা কি? তবে কি চোখের ভ্রম! না, তাও নয়, নিশ্চয়ই কোন লোকের ছায়া—অন্য কিছু নয়। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষ মাধবীলতাগুচ্ছের পেছনে গিয়ে বাগানের দিকে তাকায়। হঁা, ঐ তো! বাগানের মধ্যে অন্তর্হিত হবার মুহূর্তে অনুতোষ লোকটার পেছন দেখতে পায়! আশ্চর্য, এই প্রথম অনুতোষ কলেজ গেটে সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপস্থিতি টের পায়। তার সংকটাকাঙ্ক্ষী মনে লোকটাকে অনুসরণের প্রবল ইচ্ছা জাগা সত্ত্বেও সে বিরত হয় কেননা লোকটা হয়ত এতক্ষণে বাগানেব পেছনের নালা ডিঙিয়ে পালিয়েছে। সে আর দেরি করে না, আখড়ার অভিমুখে রওনা দেয়। নবাগতবা সেখানে তার অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যারাতে আখড়া থেকে বেরিয়েই বিকালে কলেজ গেটের ঘটনাটা অনুতোষের মনে পড়ে। ক্ষণিক-দেখা অপসৃয়মান মূর্তিটা যে টিকটিকি এ বিষয়ে সে যতই ভাবছে ততই তা দৃঢ়তর হচ্ছে। সি. আই. ডি. কিংবা পুলিশের ইনফরমার ব্যতীত কেউ এভাবে আত্মগোপন করতে পাবে না। তার পেছনে টিকটিকি লাগাবার কর্মটি নিশ্চয়ই ঐ ভুবনেবই কীর্তি। কিন্তু সে কোথায়! তাকে তো হালফিল সে ক্লাশে দেখেনি! তবে কি সে আরও নানাভাবে পুলিশ-চক্রে জড়িত! ফলে নানা অপরাধ-দুষ্ট লোকের মতোই সে কি গুম হয়ে গেছে!

এইরূপ চিন্তা-ক্লিষ্ট, শ্রান্ত ক্লান্ত অনুতোষ অমৃতকাননের মাঠ পেরিয়ে গেট খুলে গলিপথে পা দিতেই বিগত দিনের এমনি সময়ের এক মধুর স্মৃতি তার মনে জাগে। সেই ভালোলাগা, আনন্দ-জাগা স্মৃতি সেবাব্রতী ও স্বদেশের স্বাধীনতায় উৎসর্গিত পুরুষের নিকট ব্রাত্য হলেও লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলার পথে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি এবং এ যাবৎ তার নানা গুরুত্বপূর্ণ কর্মানুষ্ঠানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে দলের অনু-শাসন ভঙ্গ জনিত অপরাধ বোধ আপন বিবেকের নিকট লঘু বিবেচিত হয়। সব চাইতে বড় কথা দেবযানীর সান্নিধ্য তার কর্তব্য-নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র হানি ঘটাতে পারেনি।

আপন ক্ষমতায় গভীর আস্থা নিয়ে অনুতোষ হৃষ্টচিত্তে গাছপালা লতাপাতা ঘেরা অন্ধকার পথে চক্ষুকর্ণ সজাগ রেখে বলদর্পে এগিয়ে চলে। পথের ডান দিকে-ঘেষা অমৃতকাননের কলাবাগান ছাড়িয়ে যেতেই অনুতোষ উৎকর্ণ হয়। তার শিক্ষিত শ্রবণেন্দ্রিয়ে নৈশশ্বাপদের মতো কারো লঘু পদ-শব্দ ধ্বনিত হয়। অনুতোষ সতর্ক হয়। কোমর বন্ধে ছোরায় হাত রেখে পেছন পানে না তাকিয়েই এগিয়ে চলে। দূরে বড় রাস্তার মিটমিট আলো দৃষ্টিগোচর। বড় রাস্তার কাছে আসতেই পেছন থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা তিরোহিত হয়। বুঝলো এ নিশ্চয়ই সেই টিকটিকি যাকে পুলিশ তার গতিবিধি লক্ষ্য ও অনুসন্ধান কল্পে নিযুক্ত করেছে।

বড় রাস্তায় পড়ে অনুতোষ পেছনে না তাকিয়েই চলতে থাকে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। টিলাটার কাছে এসে রাস্তাটা যেখানে দুমুখো সেখানে পৌঁছে সে ইচ্ছা করেই রুমালটা ফেলে দেয়। পেছন ফিরে রুমালটা তুলতে গিয়ে সে তার পাশ্চাদানুসরণকারীকে দেখেই মুহূর্তমধ্যেই বাঁক নিয়ে ভিন্ন পথে চলতে থাকে। স্বল্পালোকে তার পার্শ্বদেশ আগে দেখা মূর্তির মতোই মনে হলো। এবার তার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে পুলিশের টিকটিকি অনুক্ষণ তাকে অনুসরণ করে চলেছে এবং তার গতি-বিধির খবর তাদের জানাচ্ছে। টেজারী লুণ্ঠনের দিনে তার প্রক্সির ব্যাপারটা সম্পর্কে পুলিশ কি আঁচ করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সঠিক কিছু জানতে পারলে এতদিনে তাকে আর শ্রীঘরের বাইরে থাকতে হতো না। মহারাজ-এর হুঁশিয়ারি—সাবধানের মার নেই, তাৎপর্যবোধের সঙ্গে লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার প্রবল বাসনাও মনে জাগে। দুষ্টুমি করে লোকটাকে ভুল পথে চালিত করে হয়রান ও নাকাল করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে তার চলার গতি পরিবর্তন করে ঘুরো পথে মেয়েদের হোস্টেলের সামনে গিয়ে হাজির। দারোয়ানকে ডাকাডাকির সময় সে একবার পাশ ফেরে। দেখে লোকটা হোস্টেলের দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে। দারোয়ান এলে পর তার সঙ্গে কথা বলে অনুতোষ হোস্টেল গেট ছেড়ে রাস্তায় নেমে চলতে থাকে। এদিকের রাস্তায় লোক চলাচল এমনিতেই কম, এখন একেবারেই নেই। ফাঁকা রাস্তায় সে তার অনুসরণকারীকে আগে, পিছে, ধারে কোথাও আর দেখতে পায় না।

পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে এবং তাদের টিকটিকিটাকেও আচ্ছা শিক্ষা দেবার মতলব এঁটে পরদিন কলেজে যাবার সময় বাড়িতে পড়া লুঙ্গি ও

একটা মুসলমানী টুপি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। আগেই বলা ছিল—তদনুযায়ী পরিতোষ তার স্কুল ছুটির পর সাইকেল নিয়ে কলেজের পেছনের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ক্লাশ শেষে অনুতোষ সেখানে আসে এবং অপেক্ষমান পরিতোষকে সাইকেল নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের আশেপাশে কিংবা মাধবী লতাগুচ্ছের আড়ালে দাঁড়ানো লোকটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে ফিরে আসতে বলে। অনুতোষের নির্দেশ মতো লোকটাকে সম্মুখ থেকে দেখবার উদ্দেশ্যে পরিতোষ সাইকেলে চেপে ঘুরো পথ ধরে। বাঁক ঘুরে কলেজের প্রধান ফটকমুখি আসতে আসতে সে দূর থেকেই লক্ষ্য করে একটা লোক ফটকের ডান দিকে মাধবী লতাগুচ্ছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। লোকটাকে দেখা মাত্রই পরিতোষ সাইকেলের গতিবেগ বাড়িয়ে এমন কৌশলে চালায় যার ফলে দণ্ডায়মান লোকটার অনতিদূরে চেনটা সাইকেল থেকে খসে পড়ে। নেমে পড়ে সাইকেলে চেন পরাবার ফাঁকে পরিতোষ মাথা নিচু করে এমনভাবে লক্ষ্য করছে যাতে লোকটা বুঝতে না পারে। চেন পরানো হতেই পরিতোষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে হাত মুছতে মুছতে লোকটা আরও একবার ভালো করে দেখে। তারপব সাইকেলে উঠে প্রস্থান করে।

পরিতোষ ফিরে আসতেই অনুতোষ কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মাথায় টুপি পরে কালো চশমা এঁটে সাইকেলে চেপে বসে। কলেজের প্রধান ফটকের সামনে দিয়ে কয়েক চক্কর ঘুবে লোকটা ভালো করে লক্ষ্য করে ফিরে আসে। পরিতোষকে সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে তাকে ভিন্ন পথে চলে যেতে বলে পোষাক পরিবর্তন করে সে পুনঃ কলেজে প্রত্যাবর্তন করে। অতপর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে কলেজেব সদর গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। চলতে চলতে সঙ্গীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় লক্ষ্য করছে যে ঐ লোকটা ফেউ-এর মতো তাদের পেছন পেছন আসছে। কি করে এর হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায় অনুতোষ অনুক্ষণ সে চিন্তাই করে চলেছে। অবশেষে যে মতলব তার মাথায় আসে তা হাসিল করতে গেলে বয়সের দিক দিয়ে পরিমল, পরিতোষ কিংবা গুরখা দ্বারা সম্ভব নয়। কেন-না, বিষয়টা সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু অশালীনই নয় ধিক্কার জনকও বটে। কিন্তু সব কিছু বিবেচনার পর নিজেকে এই রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে বিকল্প কোন পন্থা তার মাথায় আসছে না। সুতরাং পরিকল্পিত নাটকে প্রধান নট-এর ভূমিকা তাকেই নিতে হবে।

বাড়ি ফিরে বৈকালিক আহার সেরে অমুতোষ যথা সময়ে আখড়ায় উপস্থিত হয়। সেখানে শরীর চর্চা ও অন্যান্য দৈনন্দিন কর্ম শেষ করে। অতপর বিষয়টা নিরঞ্জনের নিকট ব্যক্ত করে তা দলের প্রধানের গোচরে আনতে বলে সে খগেন ও আনন্দকে নিয়ে মাঠে বসে তার মতলব তাদের নিকট ফাঁস করে। বয়স অনুপাতে উভয়েই গাট্টাগোট্টা ষণ্ডামর্ক। বিষয়টা জেনেই তারা লাফিয়ে উঠে। পুলিশের গুপ্তচরকে ঠেঙানোর এমন সুযোগ কি তারা ছাড়তে পারে! তা স্থানকাল যতই কুখ্যাত এবং দৃষ্টিকটু মনে হোক না কেন। তাদের গায়ে তো কোন আঁচ লাগছে না, ফোস্কা পড়ছে না। দিন ক্ষণ, কর্ম পদ্ধতি ও কৌশল স্থির করে অমুতোষ তাদের বিদায় দেয়।

মাঠ ছেড়ে ভিন্ন পথে অমৃত কানন থেকে বেরোবার মতলব করে সে তাঁতশালার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে তখনো মাকুর খটাখট আওয়াজ আসছে। সুতরাং তাঁতশালার পেছনের ছোট দরজাটা অবশ্যই খোলা। বাঁশের চেঁচাড়ির বেড়াটার ধার ধরে হেঁটে তাঁতশালার পেছনের ছোট্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে ভিন্ন পথ ধরে। এভাবেই বিরক্তিকর অনুসরণকারীর চোখ এড়িয়ে ঐ রাতে সে ঘরে ফেরে।

পরদিন কেবল ভোরেই অমুতোষ সাইকেল নিয়ে পুরনো কিল্লার পথ ধরে নদীর পারঘাটের দিকে এগোয়। পারঘাট-এর কিছু আগেই নদীর পাড় ঘেঁষে নিষিদ্ধ পল্লী। সাইকেল হাতে নিয়ে সে তার ভেতরে প্রবেশ করে। সবে ভোর—সবত্রই সদ্য-বিলুপ্ত রজনীর উচ্ছৃঙ্খল সমাজ-জীবনের এক কুৎসিৎ নারকীয় দৃশ্য তখনো বুঝি পচা ঘায়ের মতো দগদগ করছে। গলিতশব-এর দুর্গন্ধের মতো নানা দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছে। তবু ঘৃণা লজ্জা ভয় পরিহার করে স্বীয় কর্মসাধনে দৃঢ়-পতিজ্ঞ অমুতোষ নির্বিকার চিত্তে গলিঘুঁজি ঘুরে ভিন্ন পথে বেরিয়ে আসে। ঐ দিনই যথা সময়ে সে কলেজে আসে। প্রতিটি ক্লাশেই হাজির থাকে। ক্লাশ শেষে কমনরুমে গিয়ে বসে। ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করার পর সে কলেজের গেটে এসে দাঁড়ায়। দারোয়ানের নিকট বই, খাতা পেন্সিল জমা রেখে সে বেরিয়ে যায়। পুলিশের গুপ্তচর পূর্ববৎ তাকে অনুসরণ করে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নেমে এসেছে। গুপ্তচরটাকে হয়রানির করার উদ্দেশ্য নিয়েই অমুতোষ এ-পথ সে-পথ নানা পথ ঘুরে নদীর পারঘাট-এর দিকে অগ্রসর হয়। কিল্লার পথে লোক চলাচল অন্য রাস্তার তুলনায়

অধিক। দু'দিকের দোকানপাট আলো ঝলমল। খদ্দেরের আনা-গোনায় ব্যবসা জমজমাট। অনুসরণকারীর বিভ্রান্তির উদ্দেশ্যে অনুতোষ পথের ধারের একটা সরাবখানায় সট্‌ করে ঢুকে পড়ে। সেখানে বেজায় ভিড়। তার মধ্যেই অনুতোষ লক্ষ্য করে লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে উৎসুক নয়নে এদিকে চেয়ে তার অপেক্ষা করছে। পূর্ব নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট সময়ে আনন্দ ও খগেন ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে। অনুতোষ উভয়কেই রাস্তায় দণ্ডায়মান খয়েরি শার্ট গায়ে লোকটাকে দেখিয়ে দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা দুজনে দূরত্ব বজায় রেখে লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। আশ্চর্য লোকটার দৃষ্টি কেবল এদিকেই নিবদ্ধ—কখন অনুতোষ বেরয়। আশে পাশে অন্য কোন দিকে তার নজর নেই। পকেটে কিছু একটা গুঁজে রাখার ভান দেখিয়ে অনুতোষ রাস্তায় নেমে চলতে থাকে।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমেই কমে আসছে। অনুতোষ চলতে চলতে লোকজনের পাশ কাটাতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখছে লোকটা তার পেছনে আসছে এবং আনন্দ ও খগেন তাকে অনুসরণ করছে কিনা। দূরে নদীর পারঘাটে যাত্রী পারাপারের উদ্দেশ্যে মাঝি-মাল্লার উচ্চকণ্ঠের আহ্বান কানে আসছে। অনুতোষ নিষিদ্ধ পল্লীতে ঢোকার পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে যায়। অদূরে পল্লীর অভ্যন্তরে মদো-মাতালের চিৎকার হৈ হল্লা, গান বাজনা, নূপুরধ্বনির সঙ্গে হার-মোনিয়ামের কর্কশ সুর, তবলার চড়া চাটি—সব মিলে একেবারে নরক গুলজার! কিছুক্ষণ ইতস্তত ভাব দেখিয়ে অনুতোষ পল্লীতে প্রবেশ করে। চলতে চলতে ইচ্ছে করেই সে কোন বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দেয়, কোন ঘরের পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। পুলিশের চর কিন্তু তার পেছনে লেগেই আছে। তারপর অনুতোষের একটা গলিতে ঢোকবার মুহূর্তে চোর চোর চিৎকার দিয়ে পেছন থেকে দুই ব্যক্তি দৌড়ে এসে পুলিশের চরটাকে জাপটে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। ওদিকে চোর চোর চিৎকার শুনেই সারা পাড়ার মত্তমাতালের দল স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সেখানে এসে ভেঙে পড়ে। ধরাশায়ী লোকটাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আধমরা করে ফেলে তারা আপন বিবরে ঢুকে যায়। এই ফাঁকে আনন্দ ও খগেন সরে পড়ে। অনুতোষ ও আপন মতলব হাসিল হওয়ায় খুশি মনে পাড়া ছাড়ে।

এই ঘটনার পর থেকে অনুতোষ যাতায়াতের পথে পেছনে আর কোন কেউ দেখেনি। কুখ্যাত নিষিদ্ধপল্লী প্রবেশ করে অনুতোষ নিজের ভাবমূর্তি যেভাবে মসীলিপ্ত দেখিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ হয়তো অনুতোষের পেছনে পুনরায় কেউ লাগাবার প্রয়োজন বোধ করেনি—নাকি অন্য কিছু—কে জানে। আর অনুতোষ অবশ্যই বিরক্তিকর গুপ্তচরের অনুসরণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তি অনুভব করে।

•

এই ছোট্ট শহরের জনমানসে ট্রেজারী লুণ্ঠনের অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ কাহিনী জনিত যে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছিল তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও দেবযানীর অন্তরের আবেগ উত্তেজনার বুঝি সীমা পরিসীমা নেই। কে এই মহাবলী বীরচূড়ামণি রহস্যময় পুরুষ—যে পুলিশের সুরক্ষিত ব্যূহে প্রবেশ করে তাদের চোখে ধূলি দিয়ে এক মহাকীর্তি স্থাপন করেছে! আর পুলিশ ও তাদের গোয়েন্দা বাহিনীর পাতা জালে ধরা না দিয়ে বীরদর্পে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মাঝমাঝে তার চিন্তাকাশে সন্দেহের কুয়াশার আবরণ ভেদ করে যে বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্তি ভেসে ওঠে তা অবিকল অনুতোষের! ডাকগাড়ি ও ট্রেজারি লুণ্ঠন ঘটনা পারম্পর্য বিচারে একই কেন্দ্র-বিন্দুতে মিলিত হয়। ফলে উভয়ই যে একই জনের কীর্তি তা বুঝতে ভুল হয় না। ডাকগাড়ি লুণ্ঠনের পূর্বরাত্রে অনুতোষের উক্তি তার স্মরণে আসে। গভীর নির্জন নিশীথে ডাকবাংলোতে তার ঘরে অনুতোষের অপ্রত্যাশিত চুপিচুপি আগমনের পর প্রেম নিবেদন—ফিরি আর নাই বা ফিরি আমি তোমায় ভালোবাসি। আর এতো সেদিনের কথা—ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যারাতে অমৃতকাননের পথে তার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতের পর অনুতোষের উক্তি—জীবন তো পদ্মপত্রের নীরের মতোই টলমল চঞ্চল, যেকোন দিন যেকোন মুহূর্তে ঝরে পড়তে পারে—বিশেষ করে বিপ্লবীদের জীবন। এই সব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ঘটনা মিলিয়ে দেখলে অনুতোষকে উভয় কর্মকাণ্ডের হোতার আসনে বসিয়ে কল্পনা করতে ভালো লাগার সঙ্গে গর্বে ও আনন্দে তার বুক ফুলে ওঠে।

এই সব বিক্ষিপ্ত এলোমেলো চিন্তাতরঙ্গ দেবযানীর অন্তরের তটদেশে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ে তাকে উন্মনা করে তুলছে। সে শয্যায় কেবল এপাশ ওপাশ করছে, কিছুতেই নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে না।

সুদেবেরও সাড়া নেই। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে নচেৎ দাদা দিদি ডেকে উত্ত্যক্ত করতো। আগামীকাল আর এক কঠোর পরীক্ষা—সীতার অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়। স্যুটিং ও (টারগেট) লক্ষ্য ভেদ-এর আখেরী পরীক্ষা। সেই সঙ্গে শিক্ষকের নিকটেও তার জীবনের আর এক বিষম পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। কি উপায়ে তাঁর মনের বিলাসের বিলয় ভদ্র ও সুষ্ঠুভাবে করে গুরু শিষ্যার পারস্পরিক সম্বন্ধ মধুরেণ সমাপায়েৎ করা যায় তার একটা ছক মনে মনে এঁকে দেবযানী শান্ত সমাহিত চিত্তে নিদ্রা যায়।

পরদিন প্রভাতে চড়ুইভাতির কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের লক্ষ্য-ভেদের পরীক্ষা চলেছে। অবশেষে পালাক্রমে দেবযানী চাঁদমারী টিলার পাদদেশে এসে উপস্থিত। চাষাভুষা ও কাঠুরিয়া-দের দৃষ্টির বাইরে জঙ্গলাকীর্ণ এই জায়গাটা বিপ্লবীদের নিকট গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র-চালনা শিক্ষার উত্তম স্থান। শিক্ষক দেবযানীব পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান। তাঁর নির্দেশ মতো দেবযানী এমন নিখুঁত নির্ভুল ভাবে পরপর প্রতিটি লক্ষ্য ভেদ করে যে, শিক্ষক মহাশয় সহর্ষে সাবাস সাবাস বলে তাকে অভিনন্দিত করেন। সাফল্যে উল্লসিত দেবযানী তাঁর আশীর্বাদ যাচ্ঞা করে নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই শিক্ষক মহাশয় হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে সে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। সম্মুখে দণ্ডায়মান হৃত-আশ মুহ্যমান শিক্ষকের উদ্দেশ্যে দেবযানী সবিনয় উক্তি করে—অতীতে গুরু শিষ্যা সম্বন্ধে বহু কল্পিত মুখরোচক মর্মস্পর্শী আখ্যান আমাদের পুরাণে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে কল্পনার অবকাশ অতি সামান্য—প্রত্যক্ষই বিবেচ্য। তা ছাড়া আমরা—আমায় ক্ষমা করুন—যে শপথ নিয়ে দলে সভ্য সভ্যা হয়েছি তাতে স্ত্রী পুরুষে কোন সম্বন্ধ তো দূরের কথা অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ সুদ্ধ ব্রাত্য। এখানে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা যোদ্ধা—দেশোদ্ধাব যুদ্ধের সৈনিক। আপনি আমার শিক্ষাদাতা গুরু। আপনার শিক্ষার গুণে আমি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছি। সেজন্য সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গুরু প্রণাম করেছি। অতঃপর আর গুরু শিষ্যার সম্পর্ক নয়। এখন উভয়ের মধ্যে মধুর ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনাকে দাদা সম্বোধন করে প্রণাম করছি। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, বলেই দেবযানী উবু হয়ে তাঁর পায়ে হাত রাখে।

কিংকর্তব্য বিমূঢ় শিক্ষক মহাশয় কিছুক্ষণ নিশ্চুপ নিশ্চল থেকে দেবযানী-কে দু'হাতে তুলে ধরে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে—তুমি সার্থক ও সুখী হও বোন। এভাবেই দেবযানী স্বীয় বুদ্ধিমত্তার গুণে তার জীবনের এক ক্লান্তিকর নাটকীয় ঘটনার ছেদ টেনে আনে।

সেদিন আখড়ায় থাকাকালীন অনুতোষের নিকট মহারাজ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জরুরী তলব আসে। সন্ধ্যা সমাগত। অনুতোষ তার পরি-চালনাধীন শিক্ষার্থীদের বিদায় দিয়ে মহারাজ সমীপে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করে। আম্রকুঞ্জে প্রবেশের মুখে অন্যদিনের মতো অলক্ষ্য থেকে কোন প্রহরীর সতর্ক ধ্বনি নেই। অনুতোষ অবাক না হয়ে পারে না। কুটিরেব দিকে কিছুদুর এগোতেই অন্ধকারে অলক্ষ্যে মৃদুবাক্যালাপ তার কর্ণ-গোচর হয়। পরক্ষণেই তাকে সম্বোধন করে মহারাজ-এর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—তুমি ভেতরে গিয়ে বসো। কিছু সময় পরেই মহারাজ কুঠিরের দুয়ারে উপস্থিত। তার গম্ভীর আননে চিন্তার বলিরেখা সুস্পষ্ট। স্থিতধী সদাহাস্যময় পুরুষের এরূপ অস্বাভাবিক পরিবর্তন অনুতোষের চোখে এই প্রথম। সে অবাক হয়। তাকে বসতে বলেই মহারাজ ভেতরে ঢুকে অন্য ঘরে চলে যান। অনুতোষ এক চাপা মানসিক অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে এসে তাকে দাঁড়ানো দেখে মহারাজ বসতে বলে, আসন পরিগ্রহণ করেন।

পকেট থেকে ডায়রিখানা বের করে তিনি তাতে মনোনিবেশ করেন। অনুতোষ তাঁর আননে পূর্ব-দৃষ্ট চিন্তার গ্লানির পরিবর্তে এখন গম্ভীর, সৌম্য ও প্রশান্ত ভাব দেখতে পায়। মহারাজ মুখ তুলে ভণিতা না করেই বলেন —দলকে এখন যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় রূপান্তরিত ও সংগঠিত করতে হচ্ছে। তদনুযায়ী এখন থেকে দলের ক্যাডারদের পল্টন ভিত্তিক বিন্যাস করে একজন করে অধিকর্তা নিয়োগ আবশ্যক। এই নীতি অনুযায়ী তোমার পরিচালনাধীন শিক্ষার্থীদের অধিকর্তা হলে তুমি। তাদের

শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শীকরণ এবং আপৎকালে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী তাদের পরিচালন ইত্যাদি সব কিছু তোমার উপর ন্যস্ত হলো।

মহারাজ উঠে দাঁড়ান। অনুতোষ প্রণাম করতেই তিনি তার মাথা স্পর্শ করে বলেন—যে পন্থায় তুমি পুলিশের চর থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় খুঁজে নিয়েছ তা সত্যই অভিনব ও প্রশংসনীয়। তবুও সাবধান—পুলিশের খাতায় একবার যখন নাম উঠেছে তখন সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং বিচার বিবেচনা করে চলবে। পুলিশ বেশ কিছু পঞ্চমবাহিনী তৈরি করেছে। স্কুল কলেজ আখাড়া ইত্যাদি সর্বত্রই তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এই অবস্থায় পাল্টা অনুসন্ধায়ক ব্যবস্থা (Counter espionage) এক কঠিন সমস্যা। কতকটা স্বগতোক্তি করেই মহারাজ ভিন্ন ঘরে চলে যান। অনুতোষও কুঠির ত্যাগ করে। আম্রকুঞ্জ ছেড়ে গোশালার পথ ধরেই বেরোবার মনস্থ করে। কলাবাগানে এসেই মহারাজের সাবধান বাণী মনে পড়ে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশেপাশে অস্বাভাবিক কোন শব্দ কিংবা নৈশ হিংস্র শ্বাপদের মতো লুক্কায়িত কোন শত্রুর সতর্ক পদচারণ ধ্বনি কানে আসে কিনা। না, একমাত্র অদূরে গোশালা থেকে গয়লাদের কথাবার্তা আর মাঝে মাঝে মশক বিতাড়ণের জন্য গরুর লেজ সঞ্চারণ জনিত শব্দ ভিন্ন অন্যকিছু কর্ণগোচর নয়। অনুতোষ কলাবাগানের মধ্যে নিজেকে আড়ালে রেখে মুখ বাড়িয়ে একবার রাস্তাটা দেখে—না, কেউ কোথাও নেই। রাস্তায় নেমে আর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে অগ্রপশ্চাৎ, আশপাশ দেখে গৃহাভিমুখী চলতে চলতে অনুতোষ এইমাত্র মহারাজ প্রদত্ত দায়িত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়।

রাত্রির প্রথম যাম তখনো উত্তীর্ণ হয়নি। মহারাজ পাগড়ি জড়িয়ে হাতে এক অদ্ভুত ধরণের লাঠি ও বর্হিবাসের অভ্যন্তরে কোমরে বেল্টের সঙ্গে ছোট্ট একটি রিভলবার নিয়ে অদ্ভুত অস্বাভাবিক পোষাকে কুঠিরের

দুয়ারে এসে দাঁড়ান। ঘড়ি দেখে বাইরে এসে অদ্ভুত রকমের শিষ দিতেই এক মূর্তির আবির্ভাব ঘটে। তাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি অন্ধকারে অন্তর্হিত হন। মাঠ দিয়ে হেঁটে তিনি বিদ্যাপীঠের সামনে এসে হাজির। অমৃতকাননের কোন কোন অংশ তখনও কর্মচঞ্চল—তাঁতশালে মাকুর খটাখট, কামারশালে হাপরের ভোঁস ভোঁস আর নেহাই-এর উপর লোহাপিটুনির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মহারাজ বিদ্যাপীঠের পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঘোড়ার গাড়ি উপস্থিত। গাড়ি থেকে একজন নেমে আসে। সব ঠিক আছে জানিয়ে সে স্কুলের ঐ দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকে যায়। গাড়ির গতিপথ সম্পর্কে গাড়োয়ানকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে মহারাজ গাড়িতে উঠে বসেন। রাস্তায় লোক চলাচল তখনো বিরল হয়নি। কিন্তু রাস্তার বাতিগুলি এত ক্ষীণপ্রভ যে তা উভয়দিকে গাছ-পালার ওপর পড়ে অন্ধকার দূর না করে এক রহস্য-ঘন আবছা আলোর সৃষ্টি করছে। গাড়ি নিয়ামতগঞ্জের ভেতর দিয়ে পীরবদর. পাহাড়ে পাশ দিয়ে চলাকালে মহারাজ গাড়ি থামাবার সংকেত দেন। গাড়ি থেমে যেতেই রাস্তার ধারে অপেক্ষমান এক ব্যক্তি গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ি আবার চলতে শুরু করে এবং আঁকাবাঁকা পথ ধরে পশ্চিমে নদীর মোহনার দিকে এগোতে থাকে। মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দূরে নদীতে নোঙর-ফেলা বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজের আলোর ঝিকি-মিকি নজরে আসে—মনে হয় নদীর কালো জলে যেন আলোর বিচিত্র উল্কি। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে মহারাজ সঙ্গীসহ নেমে পড়ে গাড়োয়ানকে বিদায় দেন। সেখান থেকে কিছুদূর হেঁটে মাঠে নেমে পড়েন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঠের ওধারে প্রকাণ্ড জমাট বাঁধা একটা কালো রেখা। ওটা দৃষ্টিপথে রেখেই উভয়েই এগিয়ে চলেন। নদীর কিনারে ভগ্নপ্রায় পুরনো পরিত্যক্ত জেটির ধারে জীর্ণশীর্ণ অব্যবহৃত একটা টিনের গুদামের নিকটবর্তী হতেই সারমেয়র চিৎকার তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়। মহারাজ-এর সঙ্গী অনুরূপ ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর দিতেই তা থেমে যায়। মহারাজ সঙ্গীকে গুদামের বাইরে পাহারায় রেখে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে যান। কতগুলি ভাঙা ড্রাম ও জঞ্জাল ইতস্তত ছড়ানো। কয়েকটা ড্রাম-এর ওপর তক্তা পেতে মন্ত্রণা সভা বসেছে। মাঝখানে ছোট্ট একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। তাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ

সকলের মুখ দেখা যায় না। মহারাজ তাদের মধ্যেই বসে পড়েন এবং টর্চ জেলে উপবিষ্ট সকলকে দেখে নেন। অতঃপর অস্ত্রাধ্যক্ষ অস্ত্রসংগ্রহ-কালীন দালাল মারফৎ জ্ঞাত বিভ্রাট সবিস্তারে বর্ণনা করেন: তখন সবে সন্ধ্যা। দালালেরা ডিঙি বেয়ে নদীতে অপেক্ষমান নির্দিষ্ট জাহাজ অভিমুখে চলেছে। আচম্বিতে নদীতে জোয়ার আসার ফলে ডিঙির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কথা ছিল জাহাজের পেছনে লারবোরড্-এর বাঁয়ে হালের ধারে ডিঙি রাখতে হবে। তদনুযায়ী ডিঙিটা জাহাজ থেকে আর মাত্র কিছু দূরে। এমনি সময়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে জলপুলিশের স্পিডবোট ঐ জাহাজটার দিকে সার্চলাইট ফেলে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসে। জাহাজটার চারধারে কয়েক চক্কর দিয়ে বোটটা আরেকটা জাহাজের দিকে ধেয়ে যায়। অল্পের জন্য ডিঙিটা স্পিডবোটের সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়। পুলিশ বোধ হয় খবর পেয়েছে জাহাজ থেকে অস্ত্র পাচার হচ্ছে। সে কারণে তারা জলেস্থলে সজাগ সতর্ক। আগে এরূপ কচ্চিৎ কদাচিত ঘটেছে—খুবই আপশোষের ব্যাপার। শত্রুর সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দুক রাইফেল সংগ্রহের এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল!

সব শুনে মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন ঐ জাহাজ এখানে আর ক'দিন থাকবে সে খোঁজ করুন। বন্দুক রাইফেল যাতে আমাদের হাতে আসে সে ব্যবস্থা নিন। পিস্তল রিভলবার বোমা দ্বারা কেবল চোরাগোপ্তা আঘাত হানা, হত্যা কিংবা যাকে বলে skirmish—ক্ষুদ্র হাতাহাতি দাঙ্গা, লড়াই চলে। সুসজ্জিত সুদক্ষ পুলিশ কিংবা মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করা চলে না। বন্দুক রাইফেল আমাদের চাই-ই। আমাদের সভ্যদের প্রত্যেককে বন্দুক রাইফেলে সুসজ্জিত করা সম্ভব না হলেও যুদ্ধের প্রয়োজনে যতটা সম্ভব তা অবশ্যই করতে হবে—এর বিকল্প নেই। প্রয়োজন বোধে আরও অর্থ কবুল করুন। বক্তব্যের শেষে মহারাজ যোগ করেন—এমনও তো হতে পারে ঘটনাটা স্রেফ জল পুলিশের রুটিন মাফিক চেক আপ অথবা স্মাগলাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। গুপ্তচর প্রধানকে এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করেন।

অতপর মহারাজ আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি, দলের ক্যাডারদের পল্টন (প্ল্যাটুন) ভিত্তিক সংগঠন, তাদের প্রশিক্ষণের অগ্রগতি, পুলিশের পঞ্চম বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি ও তার প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনায়

ব্যাপৃত হন। পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে গুপ্তচর প্রধান আপন বক্তব্যের পর যোগ করেন—আক্রমণের দিনক্ষণ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি থানা, আই. বি. আপিস, এমন কি সন্দেহ নিরসণের জন্য সভ্যদের, বিশেষ করে নবাগতদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে ও হবে। অতপর অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনান্তে অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

অস্ত্রশস্ত্র তত্বাবধায়কের সঙ্গে মহারাজ গুদাম থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বাইরে অপেক্ষমান প্রহরীকে নিয়ে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ান। নদীতে অপেক্ষমান এক নৌকা থেকে মাঝি তাদের দেখেই নৌকা পাড়ে ভেড়ায়। মহারাজ সঙ্গীদের নিয়ে তাতে উঠে বসেন। ভাটার টানে নৌকা পশ্চিমমুখী নদীর মোহনার দিকে ছুটে চলেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দূরের পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড কালো একটা দৈত্য বুঝি নদীর প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে দিবারাত্রি অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে। আরো দূরে কালিদহের শোঁ শোঁ গর্জন বাতাসে ভেসে আসছে। উত্তাল তরঙ্গরাশি ফুঁসে ফুঁসে উন্মত্ত বেগে দৈত্যটার পশ্চিম প্রান্তের পাদমূলে আছড়ে পড়ছে। আরো কিছুদূর যেতেই মহারাজ নৌকাটাকে নদীর কিনারে ভিড়তে আদেশ দেন। নৌকা পাড়ে লাগতেই তাঁরা নেমে পড়েন। অতপর বালিয়াড়ি মত অনেকেটা জায়গা হেঁটে পাহাড়ের জংগলে প্রবেশ করেন। ঘন অন্ধকারে গাছগাছড়া ঝোপঝাড়-এর ভেতর দিয়ে চলতে অসুবিধা হলেও তাদের চলার বিরাম নেই। সারাটা অঞ্চলই যেন তাদের নখদর্পণে—দিকভ্রমের আশঙ্কা নেই। অবিরত চলে অবশেষে তারা উঁচু-পাড় এক জলাশয়ের ধারে এসে দাঁড়ান। লোকে বলে 'সনকার' দীঘি। কিংবদন্তী—সনকা মনসা মঙ্গলের নায়ক চাঁদসদাগরের মহিষী। এই অঞ্চলে চাঁদসদাগরের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখান থেকে স্লুপ নিয়ে তিনি বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকুলবর্তী বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য করে বেড়াতেন। এখান থেকেই একদা তিনি মধুকর সহ সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে বহির্গত হন। দেবী মনসার কোপে ঐ সপ্তডিঙা সহ তিনি কালিদহে (বঙ্গোপসাগরে) নিমজ্জিত হন। এই পাহাড়ের উপরেই চাঁদসদাগরের কোঠা-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এখানে পর্তুগীজ বোম্বেটেদেরও একটা প্রধান আড্ডা ছিল। এখান থেকেই তারা নিকটে কিম্বা দূরের গ্রাম

গঞ্জে, নগরে লুণ্ঠন কার্য চালাত। এই পাহাড়ের উপরেই তারা দিক-নির্ণয়ের জন্য একটা লাইট হাউস (বাতিঘর) তৈরি করেছিল। পরবর্তী-কালে শ্বেতদ্বীপের ইংরেজ বণিকেরাও তার সদ্ব্যবহার করে। অতীতের এই ধ্বংসস্তূপ বর্তমানে নানা বন্য পশুপাখী, হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও সরীসৃপের আবাস স্থল। সেই সঙ্গে অশরীরী ভূত পেত্নী, দৈত্য দানো নিয়ে নানা ভীতিপ্রদ লোমহর্ষক কাহিনী প্রচলিত। বিপ্লবীরাও এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। এই অঞ্চলটাকে লোকজনের অনধিগম্য করাব উদ্দেশ্যে আরো নানা রকম ভয়ঙ্কর ভয়াল গুজব আশপাশের গ্রাম গঞ্জে ছড়িয়েছে। গরু বাছুর নিয়ে রাখালেরা ক্বচিৎ কদাচিত এখানে এলে তাদের এমন ভাবে ভয় দেখানো হয় যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে তারা পালিয়ে বাঁচে। ফলে এখান থেকে ফিরে যে সব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তারা বর্ণনা করে তাই লোকমুখে ফেঁপেফুলে শাখা প্রশাখা মেলে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের অতীত ধ্বংসস্তূপের আড়ালে বিপ্লবীরা তাদের কর্মকাণ্ডেব এই গোপন আস্তানায় একটা বোমা তৈরির কারখানা, ক্ষুদ্র অস্ত্রাগার, এবং নদীতে যাবার দীর্ঘ গোপন প্রশস্ত ভগ্ন প্রায় সুরঙ্গ পথে ছোট্ট এক চাঁদমারী ক্ষেত্র (স্মল স্যুটিং রেঞ্জ) ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। যাতায়াতের জন্য নদীতে দু'খানা নৌকা রাখা আছে। অবসর সময়ে ঐ নৌকা ভাড়া খেটেও অর্থ উপার্জন করে।

দীঘির উঁচু পাড়ে উঠতে গিয়ে মহারাজ তাঁর বিশেষ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দিয়ে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ উপলব্ধি করেন। হাতের মৃদু ধাক্কা দিয়ে সঙ্গীদের হুঁশিয়ার করে তিনি একাই দীঘির পাড়ে উঠে লতা গুল্মে আচ্ছাদিত একটা তালগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। দীঘির ধারে এসেই নিশ্বাসে তিনি এমন একটা গন্ধ পান যা কোন পশুর—হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ শেয়াল ইত্যাদির গন্ধের সঙ্গে মেলে না। হাতের মুঠোয় বাতাস নিয়ে নাকের কাছে ধরতেই গন্ধটা কিসের তা সম্যক উপলব্ধি করেন। মনে পড়ে আত্মগোপন করে টিপরাদের সঙ্গে থাকাকালীন শিকারের সময়ে কাছে পিঠে কোন বন্যজন্তুর উপস্থিতি তারা এভাবেই গন্ধ শুঁকে নাম বলে দিত। কিভাবে নিশ্বাস নিয়ে গন্ধ শুঁকতে হয় তার ক্রিয়া কৌশল তাকে তারা শিখিয়ে দিয়েছিল। বারুদের গন্ধ যেরূপ অলক্ষিত ঘাতকের কিংবা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গুপ্ত শিকারীর

উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে তদ্রূপ সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ কোন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির আভাস দিচ্ছে। এই তৃতীয় পক্ষ পুলিশ না কি তাদের গুপ্তচর? এই প্রশ্নে মহারাজ নিদারুণ উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করেন। আশ্চর্য এখানেও পুলিশের আবির্ভাব। আগে তো এমন ঘটেনি।' নিশ্চয়ই পঞ্চম বাহিনীর কাজ। মহারাজ বিশাল দীঘিটার চতুর্দিকের গাছপালা ঝোপঝাড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেন—অন্ধকারে কোথাও আগুন কিংবা আলোর ফুলকি দৃষ্টি গোচর হয় কিনা। না, তাও নয়। অতপর তিনি মাটিতে শুয়ে কিছুক্ষণ কানপেতে অপেক্ষা করেন যদি নিকটবর্তী কোনখান থেকে পদশব্দের কম্পন অনুভূত হয়। না, তাও নয়। এই পরিস্থিতিতে মহারাজের নিকট দুটি পথ উন্মুক্ত—হয় আক্রমণ করে শত্রু নিশ্চিহ্নকরণ। কিন্তু তার অবস্থান নিরূপিত না হলে তাও বা কি করে সম্ভব! আর নয় তো চুপি চুপি বিনা আলোড়নে নিজেদের অপসারণ। দ্বিতীয় পন্থাই তিনি শ্রেয় মনে করেন। তাতে এখানে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব ও আস্তানা সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহের নিরসন হয়তো হতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মহারাজ অতি সাবধানে চুপি চুপি স্বদলে দীঘির পাড় থেকে সরে পড়েন। তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি এখানের পাহারাদাররা টের পেয়েছে কিনা—বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং বিষয়টা তাদের গোচরে আনার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গোপন আস্তানায় যাবার পথে কিছুদূর উঠেই মহারাজ সঙ্গীদের পেঁচকের কণ্ঠস্বরে ধ্বনি দিতে বলে নিজেও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলান। নিচে জলাশয়ের দিক থেকে তার প্রত্যুত্তর আসে। তার পরমুহূর্তেই ঐ দিক থেকেই নির্জন বনাঞ্চল প্রকম্পিত করে প্রচণ্ড ব্যাঘ্র গর্জনের সঙ্গে মনুষ্য কণ্ঠের কানফাটা আর্ত চীৎকার—বাঁচাও বাঁচাও, শোনা যায়। ঘটনাটা খুবই আকস্মিক ও চমকপ্রদ। কিন্তু তার তাৎপর্য উপলব্ধি করে মহারাজ উৎফুল্ল হন এবং মনে মনে প্রহরীদের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের ভূয়সী প্রসংশা করেন। পুলিশের হাতে থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নিতে হলো না এই ভেবেই স্বস্তি বোধ করেন। কিছুদুর এগিয়ে তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গীদের না বলেই তিনি নিজে কয়েকবার খোক্কর খোক্কর ধ্বনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে একই সুরে দূর থেকে প্রত্যুত্তর শোন যায়। বোঝাগেল অঞ্চল শত্রু মুক্ত। তবে তারা ফিরে আসবে কিনা বলা শক্ত।

মহারাজ সদলে একটা ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকার ইট পাথরের স্তূপের কাছে এসে দাঁড়ান। পেছনটা ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। তিনি একজন সঙ্গীকে সেখানে রেখে অস্ত্রাগার অধ্যক্ষকে নিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্তূপের উপর উঠে যান। প্রহরীকে এখানে অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে তিনি সঙ্গীসহ স্তূপের পেছনের জংগলে অদৃশ্য হয়ে যান। লাঠি ঠুকে ঠুকে সাপখোপ তাড়িয়ে ঝোপঝাড় জংগল ভেঙে তাঁরা একটা ভগ্ন দেয়ালের ধারে এসে দাঁড়ান। দেয়ালের এদিকটার ইট, চুন সুরকী খসে পড়ে একটা বড় ফোকর তৈরি হয়েছে। টর্চ জ্বেলে এখান দিয়েই তাঁরা একটা ছাদ বিহীন কোঠাঘরে প্রবেশ করেন। ঘরটার ডানদিকের দেয়ালের কোণে একটা সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে একটা চত্বরে এসে পৌঁছেন। সম্মুখে একটা লম্বা দেয়াল। মাঝখানটায় একটু উঁচুতে কিছুটা অংশ ভাঙা। বোধ হয় এককালে জানালা ছিল। ওখানটায় জঞ্জালের স্তূপ-এর ওপর দাঁড়িয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখতেই বাতুর চামচিকে পেঁচা ইত্যাদির উড়ে বেড়াবার পতপত শব্দ কানে আসে। দু'একটা পেঁচা বাতুর ঐ ফোকর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে যায়। বোঝা গেল ভিতরটা একটা অন্ধ কোঠা—নিশাচর পাখি ইত্যাদির আস্তানা। দিনেও ওখানে আলো প্রবেশ করে না। হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিতে ওদের ভেতর সাড়া জেগেছে!

মহারাজ অস্ত্ররক্ষককে সঙ্গে নিয়ে দেয়ালের ঐ ভগ্ন অংশের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করেন। ভেতরে খেচর প্রাণীরা খুবই চঞ্চল—তারা বৃত্তাকারে ঘরের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাদের ডানার ঝাপটা মহারাজ-এর পাগড়ি ও অস্ত্ররক্ষকের মাথায় এবং গায়ে লাগছে। অস্ত্ররক্ষক টর্চ জ্বেলে দেয়ালের একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে আঙুল ঠুকে পরীক্ষা করেন। তারপর পকেট থেকে নানা রকম ফলা বিশিষ্ট একটা চাকু বার করেন। সরু মাথার মোটা ফলাটা ইটের ভেতর ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই একখানা ইট আলগা হয়ে যায়। দেয়ালের ইটের বাঁধন থেকে এভাবে দু'খানা ইট সরাতেই একটা প্রকাণ্ড কুলুঙ্গি—ভেতরে খড় বিছানো। হাত ঢুকিয়ে ভেতর থেকে দুটো রবারের থলি বের করে আনেন। থলির মুখ খুলে একে একে প্রত্যেকটি পিস্তল ও রিভলবার বার করে Safety catch (রক্ষণ ছিটকিনি) Trigger (বন্দুকের ঘোড়া) bore (ছিদ্র) ইত্যাদি পরীক্ষা করেন। তারপর তৃতীয়

ব্যাগটা খুলে গুলি (Cartidge) বার করে দেখেন। সব কিছুই উত্তম অবস্থায় আছে। মহারাজ আশ্বস্ত হন। সেগুলিকে যথাস্থানে রেখে কুলুঙ্গীটাকে পুনরায় ইট দিয়ে বন্ধ করে দেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা আর একটা অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ-এর ভেতরে প্রবেশ করেন। লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলে সম্মুখের দেয়ালের ধারে একটা ভগ্ন-প্রায় সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে একটা খোলা চত্বরে এসে দাঁড়ান। সামনে একটা ভাঙা খোলা দালান কোঠা। ছাদের উপরে গজানো গাছপালার শেকড় তিন দেয়ালের কোঠাটাকে বজ্র আঁটুনিতে বেঁধে রেখেছে। তার ভেতরে সামনেই আর একটা জীর্ণ দালান-কোঠা। তার মধ্যখানে ভগ্ন-প্রায় প্রকাণ্ড একটা বেদী। তার সামনের ইটের জঞ্জাল সরাতেই পরপর বিছানো তিনখানা লম্বা পাথর। সেগুলি তুলে ফেলতেই দেখা গেলো একটা চৌবাচ্চা। বোধহয় বেদীর উপব সর্প-পূজারী চাঁদ সদাগরের আরাধ্যা দেবী মনসা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। নিচের চৌবাচ্চাব গড়নও এমন যে এর মধ্যে হয়ত দেবীর সহচর সহচরী সর্পবৃন্দ খেলাধুলো করতো। এই চৌবাচ্চার মধ্যেও খড় বিছানো। তার ওপর টিনের কেনেস্তার মধ্যে তৈরি বোমা আর পাশের হাঁড়ি-কুঁড়ির মধ্যে বোমা বানাবার নানা মালমশলা। তারই অদূরে ভাগে ভাগে রয়েছে বোমা তৈরির জন্য অত্যাবশ্যক লোহার টুকরো, পেরেক, পাথর কুঁচি, কাঁচেব টুকরো ইত্যাদি। পাশেই আর একটা থলের মধ্যে রয়েছে বোমা বানাবার যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য জিনিষ। সব দেখে মহারাজ নিশ্চিন্ত। আসন্ন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আরো বোমার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন—বিশেষ করে যেখানে রাইফেলের অভাব।

মহারাজ সঙ্গী সহ পূর্ববর্তী স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন যেখান থেকে এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে লোক চক্ষের অন্তরালে তাঁর গড়ে-তোলা কর্ম কেন্দ্র পরিদর্শন ও পরিক্রমণ শুরু হয়েছিল। সেখানে অপেক্ষমান প্রহরীদেব নিকট সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পর্যবেক্ষণ বুরুজ (Watch Tower) থেকে দু'জন লোককে বনে প্রবেশ করতে দেখে সনকার দীঘির ধার পর্যন্ত তাদের অনুসরণ ও পরবর্তী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ অবগত হন। মহারাজ তাদের সতর্কতা ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্য বাহবা দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেন—মনে রেখো একবার যখন পুলিশের নজর পড়েছে তখন তারা আবার হানা দেবে সুতরাং সাবধান—সদা সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকবে

এবং আগামী বদলী কর্মীদেরও হুঁশিয়ার করে দেবে। মনে রেখো—সাবধানের মার নেই।

নগরে প্রত্যাবর্তনের পথে মহারাজ সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় সনকার দীঘির ধারে এসে দাঁড়ান। উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে অনুমান করেন রাত্রির তৃতীয় যাম অবসান প্রায়। পুলিশের লোক চিৎকার করতে করতে যে দিকে পালিয়েছে সেদিকেই তারা অগ্রসর হন—যদি তাদের কোন সন্ধান মেলে। না, নির্জন নিস্তব্ধ বনভূমি—মাঝে মাঝে পাখির ডাক আর শুকনো পাতার ওপর তাদের পায়ে চলার মশমশ খসখস শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রুতি গোচর নয়। নদীর পাড়ে এসে দেখেন—সব ফাঁকা। দূরে ভাসমান জাহাজগুলির উজ্জ্বল আলোর প্রতিবিম্ব প্রবল জোয়ারে উচ্ছলিত স্রোতে নদীর বুকে যেন আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। নদীর ওপারে উঁচু উঁচু বালিয়াড়ির পেছনের পুব আকাশে উষার আভাস। অপেক্ষামান ডিঙিতে চড়ে যখন তারা শহরের পারঘাটে পৌঁছেন তখন যাত্রী পারাপার শুরু হয়েছে। ওপার থেকে এপারে দুধওয়ালা সব্জিওয়ালার ভিড় জমেছে। আকাশের তারারা ফিকে হয়ে প্রায় দৃষ্টির অগোচর। ধরিত্রীর বুকে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ডিঙি থেকে নেমে তারা শহরের জনারণ্যে মিশে যান।

বিপ্লবীদের মধ্যে অত্যাসন্ন সংগ্রামের জন্য চলেছে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা—অস্ত্র সংগ্রহ, খাদ্য সঞ্চয়, প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম গোছানো ইত্যাদি—যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে। নিজেদের কার্যকলাপ, চলাফেরায় যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রচেষ্টার সমান্তরালে চলেছে শত্রুপক্ষের পুলিশের কার্যকলাপ, চলাচলের ওপর প্রখর সতর্কদৃষ্টি ও খবরদারী!

আম্রকুঞ্জ কুটিরের অভ্যন্তরে সেবাদলের ঘরে সুদেষ্ণা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ক্রীত ওষুধ পত্র সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদির হিসাব মেলাতে আর অনুতোষ লিস্ট অনুযায়ী প্রতিটি রেড ক্রশ মার্কা বাক্সে সে-সব গুছিয়ে রেখে আলমারি-জাত করতে ব্যস্ত। কর্ম-অন্তে অনুতোষ দিদির টেবিলের সামনে এসে—আর কোন কাজ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করে।

—না ভাই, আপাততঃ তো এখানে করবার কিছু নেই। তুমি যেতে

পার। হাঁ, আর একটা কথা—যদি তোমার ফুরসৎ হয়, অবশ্য অন্য কাজের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, তাহলে একবার হাতি-চরায় রঘুনন্দনের আশ্রম এবং অন্যত্র যাদের চিকিৎসা করেছ তাদের খোঁজ খবর নিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সদ্ভাব ও সম্প্রীতির ভিতটা আরো দৃঢ় করতে পার। মনে হয় ঐ অঞ্চলটা আপৎকালে ব্রিটিশ মিলিটারি ও পুলিশের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং আত্মরক্ষার দুর্গ কিংবা আশ্রয় স্থল হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে তোমার পূর্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ত এই কথার সায় দেবে।

—হুঁ দিদি, জায়গাটা লুকিয়ে থাকবার মতো বটে। তবে গরিলা যুদ্ধ চালাবার মতো নয়। কেননা শত্রু-বেষ্টনি রুখবার মতো কোনো প্রতিরোধ প্রাচীর নেই এবং পৃষ্ঠদেশ রক্ষারও সুযোগ সুবিধা নেই। তবু আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। আজ রাতের ট্রেনে ওখানে যাচ্ছি। বিকেলে আখড়ার কাজ সেরে বাড়ি। সেখান থেকে এখান হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার একটা বাক্স নিয়ে যাবো। আগামীকাল রাতের ট্রেনে ফিরবো।

—এসো ভাই, বলেই সুদেষ্ণা হিসাবে মনোনিবেশ করে। সেবাদলের ওষুধপত্র ক্রয়, দলের খরচ, অস্ত্রশস্ত্র খরিদ এবং তার আনুসঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি এক বিরাট অঙ্কের খতিয়ান। তার উপর রাহা খরচ ও বর্তমান নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি পল্টনের অধিনায়ক ও তার অধীনস্থ প্রত্যেক যোদ্ধার এবং সর্বাধিনায়কের জন্য বরাদ্দ অর্থের বিলিব্যবস্থার সার্বিক হিসাব এক গুরুদায়িত্ব-পূর্ণ ব্যাপার। এ সবের পর বাকি অর্থ তাব নিজের হেফাজতে রেখে আপৎকালে দলের প্রয়োজনে যোগানো এবং অন্যান্য জরুরী কর্ম সম্পাদন।

এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের ব্যস্ততার মধ্যে অন্য এক চিন্তায় সুদেষ্ণা মাঝে মাঝে কেমন যেন উতলা উন্মনা হয়ে পড়ছে। পরিকল্পনা মতো ব্রিটিশের কবল থেকে শহরের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে এক দুঃসাহসিক অসীম বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন বুঝি বর্তমান ভারতের ইতিহাসে তুলনাহীন। এই বিরাট অসমসাহসিক কর্মকাণ্ডে তার একমাত্র ভূমিকা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, পেছন থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান। আপৎকালে পশ্চাৎভাগ রক্ষার সঙ্গে পুরো-ভাগে যুদ্ধরত সৈনিকদের ঠিক মতো যোগান দেওয়াটাও কম গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার নয়। কিন্তু তারপর, তারপর কী? এক বিরাট জিজ্ঞাসা তার সম্মুখে উপস্থিত। এর কোন সদুত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না। যাঁকে ঘিরে দীর্ঘকাল যাবৎ তার মনে পলে পলে, তিলে তিলে কল্পনার এক সপ্নিল রঙীন সৌধ গড়ে উঠেছে তা বুঝি তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হায়রে অবুঝ মন! যা কোন দিনও সম্ভব নয়—তাই চেয়ে বসলি? কিন্তু সেও তো নিরুপায়—মনের গহনে যে দাগ কেটে বসেছে তাকেও তো খড়ির আঁকের মতো মুছে ফেলা যায় না। না, সে আর ভাবতে পারছে না। সম্মুখে এক দুস্তর পারাবার—উত্তাল কলকল্লোলে দুরন্ত দুর্মদ বেগে ধেয়ে আসছে, সব বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে সুদেষ্ণা পুনরায় হিসাব মেলাতে ব্যস্ত হয়।

বিদ্যাপীঠে দৈনন্দিন শিক্ষকতা সেরে মহারাজ নিজ কুটিরে না ফিরে আম্রকুঞ্জ কুটিরে এসেছেন। সময় আর অধিক নেই অথচ কাজ যেন অন্তহীন। হিসেবটাও খুব জরুরী। অর্থের অভাবে প্রচুর মূল্যেব বিনিময়েও অস্ত্র কেনা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া আরও কিছু জরুরী কাজ বাকী। মহারাজ পাশের ঘরে ঢুকে চালার ভেতর লুক্কায়িত স্থান থেকে একটা ফাইল বার করে নিয়ে আসেন। ফাইলটা খুলে ভেতর থেকে একটা পাতলা কাগজ বের করে মেলে ধরেন। তাতে শহরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, রাস্তা, আশপাশের পাহাড় পর্বত, নদী নালা, রেল লাইন, পুল ইত্যাদি আঁকা। নোট বইতে ম্যাপ থেকে কিছু টুকে নিয়ে পুনরায় ফাইলে রেখে সেটা যথাস্থানে রেখে ফিরে আসেন। ঘড়িটা বের করে দেখে উঠে দাঁড়ান—বেলা অনেক। সেবা কেন্দ্রে সুদেষ্ণার হিসেব-নিকেশের এবং অনুতোষের প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স গুছনোর কাজ করার কথা। কিন্তু ঐদিক থেকে তো কোন সাড়াশব্দ আসছে না! তবে কি তারা কাজ শেষ করে চলে গেছে? মহারাজ সেদিকে এগিয়ে যান। ঘরের সামনে গিয়ে বন্ধ দরজায় আস্তে টোকা দেন। সুদেষ্ণা দরজা খুলে মহারাজকে দেখে—আসুন বলে তাকে আলমারির কাছে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে সাজানো প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সগুলি দেখায়। একটা বাক্স খুলে ভেতরের ওষুধ পত্রাদি দেখে সেটা যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করে তিনি সুদেষ্ণার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ান। হিসেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসার পর সুদেষ্ণার উত্তর থেকে বুঝলেন যে মজুদ অর্থ থেকে চড়া-

দামে চোরাকারবারীদের নিকট অস্ত্র কেনার আর সঙ্গতি নেই। এই অবস্থায় নতুন করে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনারও আর সময় নেই। তিনি খুবই চিন্তিত। কিছু না বলে বেরিয়ে যাবার মুখে সুদেষ্ণার ডাকে ফিরে তাকান।

সুদেষ্ণা কাছে এসে তাঁকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই জিজ্ঞাসা করে—কথা প্রসঙ্গে আপনি একদিন তীর্থক্ষেত্রের ঘাঁটিটা দেখবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। সেটা দেখবার এখন কি আপনার অবকাশ হবে ?

—অনুতোষই তো সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

—হ্যাঁ, তবে তার দেখার সঙ্গে আপনার পর্যবেক্ষণের সমন্বয় ঘটবে কিনা তা একবার সরজমিনে পরীক্ষা করলে বোধহয় ভালো হতো।

তা যা বলেছ। কিন্তু সময় যে খুব সংকীর্ণ! পুলিশ ও তার গুপ্তচর খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের একটা খুবই গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান তারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। ফলে বিভীষণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ঘটেছে। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে দেখলে বিলম্বে সর্বনাশের আশঙ্কা খুবই বেশী। তাছাড়া আমাদের লোকজনের মনোবল এখন তুঙ্গে। তাজী ঘোড়া যেরূপ ছুটবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পা ঠুকতে থাকে তারাও তদ্রূপ উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রচণ্ড চঞ্চল। রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে অস্থির। রণোন্মাদনায় তারা সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে। বিলম্বে মনোবলে চিড়ধরা অস্বাভাবিক নয়—ফলে তারা নৈরাশ্যের শিকার হয়ে পড়বে। এর সঙ্গে আর এক ফেঁকড়া জুটেছে—যে কোন দিন আমাকে বিদ্যাপীঠ ও আশ্রমের কাজে কলকাতায় যেতে হতে পারে গভর্নিংবডির বিশেষ অনুরোধে। অথচ এই সময়ে শহর পরিত্যাগ খুবই বিপজ্জনক! তবুও যেতে হবে—না গিয়ে উপায় নেই। তবে মন্দের ভালো এই যে সেখানে পুরনো কম্রেডদের এবং মাননীয় পরিচিতদের সাক্ষাৎ ও সক্রিয় সাহায্যলাভের আশা আছে—ফলে রথ দেখা ও কলা বেচা কিছু বিচিত্র নয়। জানি শহর পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও গোয়েন্দারা পিছু নেবে। সবকিছু ভালয় ভালয় কাটলে ফেরার পথে তোমার তীর্থঘাঁটি দেখে আসবার বাসনা আছে, এটুকু আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি। ও জায়গায় তোমার সাকরেদের নামোল্লেখ সহ একটা সংক্ষিপ্ত মানচিত্র আমাকে বুঝিয়ে দাও।

মহারাজের জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিয়ে সুদেষ্ণা সেই সঙ্গে অস্তরাত্রে

প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ পত্রাদিসহ অনুতোষের সেখানে যাওয়ার এবং পরিতোষের উপর তার রেলের টিকিট কাটা ও যাতায়াতের উপর নজর রাখার ভার অর্পণের কথার উল্লেখ করে।

মহারাজ অন্যমনস্কের মতো—হুঁ, বলে সায় দিয়ে যেতে যেতে বলেন—আমাদের আক্রমণের দিনক্ষণ এখনও অবধি পাকা না হলেও একপ্রকার স্থির হয়েই আছে। দলের ভিত যে কয়টি শক্তপোক্ত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি তুমি। মনে রেখো রণক্ষেত্রে শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার মতোই তার পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষণাবেক্ষণ—ইংরেজিতে যাকে বলে Rearguard action-এর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আশা করি তুমি তোমার নারী ও বাল-বাহিনী নিয়ে সম্মুখে যুদ্ধরত বাহিনীর পশ্চাৎভাগ রক্ষণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে।

—আপনার আশীর্বাদে অবশ্যই পারবো। তবে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে দেবযানী, সুধীরা, ধীরা ওদের বশে রাখা যাবে কিনা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। যুদ্ধের নামোল্লেখ মাত্রই সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ওদের মধ্যে যে দারুণ অস্থিরতা ও বিস্ময়কর উন্মাদনা দেখা দেয়।

—বিষয়টা ভাববারই বটে। তিনি গম্ভীর আননে দরজার দিকে এগিয়ে যান। সুদেষ্ণাও তাঁর অনুসরণ করে। পেছনে না ফিরেই তিনি বলেন—তোমার কি আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

—আজ্ঞে, অনুমতি দেন তো বলি।

—সে কী! সুদেষ্ণার কথার ভঙ্গীতে মহারাজ অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ান। সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন—কৈ, আগে তো তুমি এরূপ অনুমতি কখনো চেয়েছ বলে মনে পড়ে না। হাসি বজায় রেখেই বলেন—তা তোমার যা বলবার ইচ্ছা বলতে পার—সে স্বাধীনতা অবশ্যই তোমার আছে। দেশের মুক্তি সংগ্রামে আমরা সকলেই একনিষ্ঠ আত্মত্যাগী সৈনিক—সে সুবাদে আমরা পরস্পর পরস্পরের কম্রেড—সঙ্গী বা সহযোগী।

—আসন্ন যুদ্ধে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ি তা তো জানা নেই। তাই যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে আপনাকে শুভকামনা জানিয়ে প্রণাম নিবেদন করতে চাই।

সুদেষ্ণার কণ্ঠস্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক আকুতিমাখা। মহারাজ

চমকে ওঠেন। নিজেকে সামলে নিয়ে স্মিত আননে স্বাভাবিক সহজ সরল কণ্ঠেই উত্তর দেন—তোমার আবেদনের অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হয় সুদেষ্ণা। আমাদের শপথ-বাক্যে অনেক কিছুই ব্রাত্য। তা সত্বেও মাঝে মাঝে তার ব্যত্যয় যে না ঘটে এমন নয়। আমার কথাই ধর—ছেলেমেয়েরা আমাকে প্রণাম করে খুশি হয়। আমি বাধা দিই না। তাদের খুশির মর্যাদা রক্ষাকল্পে প্রাণভরে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করি। সুতরাং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলে উচ্চহেসে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। তন্মুহূর্তেই সম্মুখে আগত আনত-নেত্র হাঁটু-গেড়ে গলবস্ত্রে নতমস্তকে প্রণামোদ্যত সুদেষ্ণাকে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক। যে অকুতোভয়া, স্থির অচঞ্চল-বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি কর্মনিপুণা বীরাঙ্গণা সুদেষ্ণাকে তিনি জানেন—এতো সে নয়! এ যেন স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লী-বাংলার এক মোহণীয়া কমণীয়া চিরন্তনী নারী—শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শুভ-কামনায় মঙ্গলঘটে আপন ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করছে! এ এক অভাবনীয় দৃশ্য! পায়ে হাত দিয়ে মাথা রেখে প্রণামকালে সুদেষ্ণার কয়েকফোঁটা অশ্রু ঝরে মহারাজ-এর পা সিক্ত করে দেয়। তিনি কেঁপে উঠে ক্ষণেকের জন্য বুঝি বিচলিত বাক্-শক্তি হীন হয়ে যান। আর সেই মুহূর্তেই অতীতের এক দুর্যোগপূর্ণ রাতের অনুরূপ ঘটনার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে। সুদেষ্ণাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সহাস্য তার মাথায় হাত রেখে শুভমস্তু জানিয়ে পা সরিয়ে নিয়ে মহারাজ সেবাকেন্দ্র পরিত্যাগ করেন। নিজের ঘরে এসে অবিচলিত চিত্তে ডাইরিখানা খুলে পরবর্তী কর্মসূচী দেখে তিনি স্নানাহারের জন্য আপন কুটিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুদেষ্ণা উঠে বসে। প্রণামকালে অশ্রুপাত শত চেষ্টা করেও সে রোধ করতে পারেনি। একদিকে পাওয়ার আনন্দ আর একদিকে বিচ্ছেদ বেদনার মিশ্র প্রতিক্রিয়া! ধরা ছোঁয়ার বাইরে বহু আকাঙ্ক্ষিত জনের স্পর্শলাভে এতো তৃপ্তি ও প্রশান্তি! এ তো আত্মসমর্পণ নয়, এ শুধু আত্ম নিবেদন। জৈবিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে এক নারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ। পরিতৃপ্ত অন্তরে সুদেষ্ণা টেবিলে ফিরে আসে। হিসাবের কাজ সম্পূর্ণ করে নির্দেশ মতো তার একটা সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে। তারপর হিসেবের কাগজ ও খাতাপত্র সব নষ্ট করে সেগুলি বাইরে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে পুলিশ হানা দিলেও যাতে কোন কিছু

আবিষ্কার করতে না পারে। সেবাকেন্দ্র পরিত্যাগের পূর্বে সুদেষ্ণা আলমারি খুলে অনুতোষের জন্য কম্বল চাদর ও একটা ফার্স্ট এইড বাক্স টেবিলের উপর রেখে দেয়। অতপর সেখানে দাঁড়িয়ে সবকিছু ঠিক আছে কিনা একবার দেখে সে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে যায়।

স্নানাহার শেষে মহারাজ বিশ্রামের জন্য মেঝেতে আসন পেতে বসেন। ডাইরি-খানা খুলে বাকি দিনের কর্মসূচীর ওপর দৃষ্টিপাত করেন —বেলা তিনটায় গভর্নিংবডির মিটিং, রাত্রি দশটায় মঘপুরীর জঙ্গলে দলীয় প্রধানদের মিটিং—হয়তো শেষ অধিবেশন। এর জন্য একটা খসড়া তৈরি করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। ঘড়ি দেখে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য ঘরের কোন থেকে একটা মাতুর এনে মেজেতে পেতে মাথায় হাত রেখে শুয়ে পড়েন। ঘরে আসবাব বলতে কিছুই নেই। একখানা জল চৌকি, কয়েকখানা কম্বলের আসন আর মাটির দেয়ালের ধারে একটা দড়িতে ঝুলছে দুখানা কম্বল, চাদর, বহির্বাস ও গামছা। একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। যেন সাংসারিক অশন-বসন ও ব্যয় বহুল বিলাসিতায় পরাঙ্‌মুখ নির্লোভ, নিরাশক্ত কঠিন তপস্যারত মহান ব্রতচারী এক সন্ন্যাসী!

মাতুরে গা এলিয়ে দিতেই কিছুক্ষণ পূর্বে আম্রকুঞ্জের সেবা কেন্দ্রে সুদেষ্ণার ঘটনাটা স্মরণে আসে। এক স্থিতধী, কর্মকুশলী অনলস, সাহসিকা ও দেশোদ্ধারে উৎসর্গিত-প্রাণা বীর্যবতী নারীব একি অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে অশ্রুপাত। নারীর চিন্তা তার নিকটে ব্রাত্য। তথাপি তিনি বুঝি তা এড়াতে পারেন না! হৃদয়ের গভীর গোপন অন্তরের অন্তপুরে কুশের অঙ্কুরসম সুক্ষ্ম বেদনা-বোধ অনুভূত হয়। এই কণ্টকাকীর্ণ কঠোর বন্ধুর চলার-পথে মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে যা স্মৃতির-পটে রেখাপাত করে। বহুদিন আগে ফেলে-আসা দিনগুলির এক দুর্যোগপূর্ণ রাতের অনুরূপ ঘটনা—এক দেহাতী কিশোরীর হৃদয়-নিঙরানো অশ্রুপাত কাহিনীর প্রতিচ্ছবি একে একে তার মনশ্চক্ষের সম্মুখে উন্মোচিত হতে থাকে :—

কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শোচনীয় রক্তাক্ত ঘটনায় ব্রিটিশ-রাজ বিচলিত। ফরিদপুর প্রাদেশিক অধিবেশনে (Provincial Conference) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-উত্থাপিত দেশের রাজবন্দী ও রাজনৈতিক অপরাধীদের নিঃশর্ত মুক্তিদানের প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করে না। অত্যাচারিত বন্দীদের তারা বক্সার,

দেউলী ইত্যাদি ভারতের দূর দূর দুর্গম অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে। তার কপালে জুটলো সুদূর দুর্গম মরুভূমি অঞ্চলে এক বাসস্থান।

যশল্মীর থেকে কেবল ভোরে পুলিশের উষ্ট্রবাহিনী তাকে উটে চড়িয়ে নিয়ে যাত্রা করে। তার উটে চড়ার অভ্যাস নেই, সুতরাং এক প্রাণান্তকর দুর্ভোগ ভুগতে ভুগতে সে চলেছে। পুলিশের নিকট আগেই খবর গেছে যে সে এক দুর্দান্ত মহা বিপজ্জনক ব্যক্তি। সুতরাং আগে পিছে পাশে থেকে পুলিশ তাকে সতর্ক পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। যেখান দিয়ে তাদের কাফিলা চলেছে তার আশপাশ কিংবা সম্মুখে গাছপালা তো দূরের কথা একটা পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। যেদিকেই চোখ ফেরাও কেবল ধু-ধু উত্তপ্ত বালুরাশি। গরম হাওয়ার সঙ্গে তপ্ত বালুকণা ছুটে এসে ছুঁচের মতো শরীরে বিঁধছে। চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের চোখে কালো চশমা। তার চোখ নগ্ন। তপ্ত বালুব আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্য রুমাল ব্যবহার ভিন্ন অন্য উপায় নেই। তাতেও নিস্তার নেই—মার্তণ্ডের তপ্ত রশ্মি শুষ্ক অম্বর থেকে গলে পড়ে শরীরের প্রতিটি জলকণা বুঝি শুষে নিচ্ছে।

এভাবেই কয়েকঘণ্টা অবিরত চলার পর তারা এক বিক্ষিপ্ত মরু-বসতিতে এসে পৌঁছয়। সকলেই পরিশ্রান্ত আতপতপ্ত ও তৃষিত। বিশ্রামের জন্য একটা সরাইতে প্রবেশ করে। পুলিশ দেখেই সরাইয়ের মালিক তাদের অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়নের ক্রুটি করে না। পানের জন্য যে ঠাণ্ডা জল সরবরাহ করা হলো তা এই অত্যধিক শুষ্ক গরম মুল্লুকে কি করে সম্ভব—তাও এক বিস্ময়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুলিশ বাহিনী তাদের উটগুলি দেখভালের জন্য সরাই মালিকের জিম্মায় রেখে তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা পথে এক স্কুল বাড়িতে এসে উপস্থিত। সেখানে এক সিপাহী কাগজপত্র বের করে সরকার বাহাদুরের আদেশ সম্পর্কে হেডমাষ্টারকে ওয়াকিবহাল করে। তদনুযায়ী রাজবন্দী হিসেবে এখানে অন্তরিত অবস্থায় তার থাকা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি কিভাবে হবে তাও সে হেড-মাষ্টারকে বুঝিয়ে দেয়। ততক্ষণ সে স্কুলটা ঘুরে দেখে। অতপর পুলিশ তাকে হেডমাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং সরকার বাহাদুরের আদেশপত্র হেডমাষ্টারকে দিয়ে সই করিয়ে একটা কাগজ তাঁর হাতে গুঁজে দেন। তারপর পুলিশ তার মাসিক ভাতা তার হাতে অর্পণ করে রসিদ সই করিয়ে নেয়। বোঝা গেল রাজবন্দীদের অন্তরিত করার

ব্যাপারে সরকার ও তার পুলিশ বাহিনী যারপরনাই তৎপর। যাবার সময় পুলিশ তাকে 'রাম রাম' জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়—ভাগনে কা কোসিশ মত করোজী, তব তো বহুত খত্‌রা পয়দা হোগা। এ দেশে পুলিশ দেহাতি জনের নিকট প্রচুর মর্যাদা অধিকারী। তারা পুলিশকে ধর্মাবতার এবং হুজুর সরকার বাহাদুরের প্রতিভূ বিবেচনা করে। স্বয়ং হেডমাষ্টার তাদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে সসম্মানে বিদায় দেন।

অজানা অচেনা পরিবেশে শুরু হলো তার এক নতুন জীবন। পুলিশ বাহিনী অদৃশ্য হতেই হেডমাস্টার ফিরে আসেন। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুল সংলগ্ন একটা খুপরির কাছে নিয়ে যান। পাকে-প্রকারে এটাই যে তার বাসস্থান তা তিনি বুঝিয়ে দেন। ঘরের ভাঙা দরজাটা টেনে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বোটকা গন্ধে সে দু'পা পিছিয়ে আসে। মনে হলো ছাগল ভেড়া কিম্বা উটের বাথান। গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছে। বিষয়টা বুঝতে পেরে মাষ্টার মহাশয় এগিয়ে ঘরে ঢুকে যান। অগত্যা সেও তার পেছন পেছন চলে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট্ট মাটির ঘর—দেয়ালের উপর দিকে একটা মাত্র ঘুলঘুলি মতো আর একটা ভাঙা দরজা—ব্যস, ঘরে আলো হাওয়া ঢোকা ও বেরবার একমাত্র ব্যবস্থা! সেখান থেকে মাষ্টার তাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসেন। এবং একটা কমন রুম মতো ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে উপবিষ্ট কয়েকজন মাষ্টারের সঙ্গে তিনি তার পরিচয় করিয়ে দেন। এতক্ষণ হেডমাষ্টারের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতেই কথা হচ্ছিল। কিন্তু ঘরে উপবিষ্টগণ তার পরিচয় পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য যে ভাষায় কথা বললেন তা ধ্বনি-বিকৃতি হেতু তার নিকট একেবারেই অবোধ্য। তবে তাদের বলার ভঙ্গি ও মুখের রেখায় সুস্পষ্ট সমীহের আভাস। কিন্তু সেও নিরুপায় ভাষা বুঝতে না পেরে মাথা দুলিয়ে বোঝার ভান করা ভিন্ন আর কিই বা সে করতে পারতো?

স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়েছে। উপবিষ্ট মাষ্টাররা বেরিয়ে যান। বাইরে ছেলেদের কলকোলাহল কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যায়। হেডমাষ্টার সেই যে ঘর থেকে বেরোলেন এখনো অবধি ফিরছেন না। তবে তিনিও কি লোক ঠিক না করে গৃহভিমুখী হলেন! না এভাবে ঘরে বসে থাকা যায় না। ঘর ছেড়ে সে বারান্দায় আসে। দেখা গেল হেডমাষ্টার একজন বুড়ো লোককে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে

এসে পেছনের লোকটিকে দেখিয়ে বলেন—এই চৌকিদার। হাতের বালতি, ঝাঁটা রেখে লোকটি তাকে নমস্কার জানায়। মাষ্টার তাকে সঙ্গে নিয়ে খুপরির দিকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন—বয়েস হয়েছে বটে চৌকিদারের কিন্তু খুবই কাজের লোক। আপনার রান্নাবান্না করবে, ফাইফরমাস খাটবে আর কিছু না বলতেই আপনার কি চাই তা বুঝে নেবে। সত্যিকারের তুখর খাঁটি চৌকোশ আদমি। এভাবেই চৌকিদাবের ব্যাখ্যান করে মাষ্টার বিদায় নেন। সে তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। এক ভিন্‌দেশী—সবেমাত্র পরিচয়। কিন্তু এই সল্প-পরিসর সময়ে মধ্যেই তাঁর কথা বার্তা আচার-আচরণে স্পষ্টতই শালীনতা ও হৃদ্যতার উষ্ণস্পর্শ সে অনুভব করে। অপরিচিত এই ধূলি-ধূসর রুক্ষ উষ্ণ উষর মরু অঞ্চলে এক ওয়েসিস বলেই মনে হয়। বাইরে তখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তাণ্ডব। লোক চলাচল একেবারে নেই বললেই হয়—চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে।

চৌকিদাব এসে জানায় খুপরির ময়লা সাফাই হো চুকা। উস্‌কে বাদ আচ্ছা সে চূনা লাগায়া। আভি যো গ্যাস নিকলেগা উহ্‌তো অন্দরকা সব গান্দা হাওয়া বিলকুল হটাকে আচ্ছা নয়া তাজা হাওয়া বনায়েগা। লেকেন আপ আজ উহ্‌ কুটিমে রহেনে নেহি সেকেগা। এভাবেই চৌকিদার তার ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দি জবানীতে আপন বক্তব্য পেশ করে তার বিছানা ও সুটকেশটি তুলে নিয়ে—আইয়ে, বলে স্কুলের কমন রুম এ ঢোকে। একটা কুর্শিতে তাকে বসতে বলে চৌকিদার পাশের কামবা থেকে দুটো লম্বা বেঞ্চি এনে পাশাপাশি বসিয়ে বিছানাটা তার উপর রাখে। কাছে এসে বলে আপকা খাটিয়া, মচ্ছরদানি, পানিকা সুড়াই, বর্তন, চউল, ডাল, আটা—বহুত কুছ খরিদ করনে হোগা। আউর টুটা হুয়া দরোয়াজাভি মেরামত করনে পড়েগি। সে টাকা বের চৌকিদারের হাতে দিয়ে নিজের হাত মুখের কাছে নিয়ে খাবার জল চায়।

—ঠিক হ্যায় বাবুজী, আভি পিনেকা পানি ভেজ দেগা, লেকেন গোছলকা পানি আভি মিলনা তো মুশকিল। শুখা হুয়া মুল্লুক পানিকা বহুত তকলিফ্‌। তবভি সামকা বখত কুরসিশ করুঙ্গা। যাবার সময় চৌকিদার তাকে সাবধান করে দিয়ে বলে—বাহার মত যাইয়ে। আভি হাওয়াকা সাথ সাথ আগ চলতি রহে। উহ্‌ বদনমে লাগ যায়গা তো শখ্‌ত বিমার পয়দা হোগা।

চৌকিদার প্রস্থান করতেই সে বিছানাটা বেঞ্চির ওপর পাতে। অত্যধিক গরম ও পথশ্রমে সে এতই ক্লান্ত বোধ করে যে দরজা না ভেজিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ে। চক্ষু বুজে আসছে এমন সময়ে মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ—বাবুজী, পানি। মাথা তুলে দেখে একটি কিশোরী এক হাতে ঘটি অন্য হাতে রেকাবি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে ঘটি ও রেকাবিখানা টেবিলের ওপর রেখে দূর থেকেই মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। সে উঠে বসে। জলের জন্য হাত বাড়াতেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে কাছে এসে প্রথমেই রেকাবিখানা এগিয়ে ধরে। তার উপর একটি লাড্ডু। হাত নেড়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেই কিশোরীটি কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। রেকাবিখানা তখনো ধরে আছে। অসহায়ের মতো বড় বড় চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নত করে নম্র স্বরে বলে—নেহি বাবুজী, মিঠাই তো আপকো লেনেই পড়েগি। নেহি তো মেরা বহুৎ গুনা হোগা।

সে হেসে বলে—এই বাৎ। আচ্ছা থোরা দাও। বলে লাড্ডুর কিছুটা অংশ ভেঙে নিয়ে মুখে পোরে। এবার মেয়েটি বোধহয় আশ্বস্ত হয়। রেকাবিখানা রেখে জলের ঘটিটা এগিয়ে ধরে। ঘটিটা নিয়ে সবটুকু জল পান করে সে ফিরিয়ে দেয়। কিশোরীটি ঘটি এবং রেকাবি খানা নিয়ে—নমস্তে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। জলটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা—পান করে সে পরিতৃপ্ত। আর মেয়েটিও বয়স কম হলে কি হবে—আদব-কায়দা-দূরস্ত।

বিগত কয়েকদিন তার বিশ্রাম বলতে কিছু ছিল না। পুলিশ তাকে নিয়ে নানা জায়গা ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে আসে। ফলে সে এতই পরিশ্রান্ত যে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এর ভেতর কেউ এসেছে কিম্বা ডেকেছে কিনা সে জানে না। হঠাৎ বাইরে উচ্চকণ্ঠে বাবুজী, বাবুজী ডাক শুনে সে চোখ মেলে দেখে ঘর অন্ধকার। ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ রগড়ে কিছুটা ধাতস্ত হয়ে দরজা খুলে দেয়। হারিকেন হাতে চৌকিদার দাঁড়িয়ে। তার পেছনে স্কুলের বারান্দায় আরো লোকজন বসে। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার চৌকিদার, ওরা সব কারা?

—জী, উহ্ সব বস্তিকা আদমি। আপকো দেখনে আয়া। শুনাহে এক জবরদস্ত স্বদেশীওয়ালা লড়াকু বাঙালী বাবুকো সরকার বাহাদুর

পাকড়াকে ইধার লে আকে নজর-বন্দী কিয়া। শুনে সে হতবাক! তৎক্ষণাৎ সামনে এগিয়ে করজোড়ে তাদের সুক্রিয়া জানায়। উপবিষ্টরা উঠে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। তারপর নমস্তে বলতে বলতে একে একে তার সম্মুখ দিয়ে মিছিল করে চলে যায়। স্বল্প অন্ধকারে তাদের মুখের ভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর ও হাবভাবে সমীহা ও হৃদ্যতার প্রকাশ। এ এক অভাবনীয় নাটকীয় দৃশ্য! শুষ্ক মরুর সহজ সরল অধিবাসীদের হৃদয়ের কোমল সহানুভূতি ও উষ্ণ মধুর স্পর্শ অনুভব করে সে অভিভূত। আলোআঁধারে অপসৃয়মান মূর্তিগুলির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—বাবুজী, ডাক শুনে সে পেছনে তাকায়। চৌকিদার একটা চারপাই ধরে দাঁড়িয়ে। চলিয়ে বাবুজী, গোসল করনে চলিয়ে। ঘরে ঢুকে সুটকেশ থেকে জামাকাপড় গামছা নিয়ে চৌকিদারের অনুসরণ করে। স্কুল সংলগ্ন মাঠের ধাবে একটা মেটে ঘর। শৌচাগার রূপে ব্যবহৃত। দুর্গন্ধে ভরা। উপায় নেই। এক কেনেস্তারা জলে স্নানাদি শেষ করে। ছাড়া কাপড়চোপড় ধোবার আর জল নেই। এখন কি করা? বেরিয়ে এসে চৌকিদারকে ডেকেও সারা পায় না। অগত্যা ভিজে কাপড় নিয়েই সে মাঠ ছেড়ে বাবান্দায় উঠে আসে। লণ্ঠনের আলোতে দেখে চৌকিদার বারান্দার ওদিকে দাঁড়িয়ে কিছু করছে। কাছে এসে বলে—চৌকিদার কাপড়া ধোনে কা পানি নেহি।

—ফিকৃব মত কিজিয়ে। কাপড়া খাটিয়া ওপর রাখিয়ে। আপ কুর্শিকা ওপব ব্যাট যাইয়ে। হাম খানা তদ্বির করকে আভি আয়েগা। চৌকিদার অদৃশ্য হতেই তার মনে হয়—লোকটার বয়স হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত কর্মকুশল! সবে পরিচয়, এরই মধ্যে সে তার মনের কথা বুঝে ফেলে সব কিছু হাজির করছে! সত্যিই মাস্টার মশাই এর সম্পর্কে কিছুই অত্যুক্তি করেন নি।

স্নানের পর বিগত কয়েকদিনের ক্লান্তি ও জড়তা অপনীত। শরীরও মনে সুস্থ সতেজ-ভাব ফিরে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে বাইরে দৃষ্টি-পাত করে। চাঁদের আলোকে সম্মুখের বালুকাময় প্রান্তরের ছোট ছোট গাছপালা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘর বাড়ি সব কিছুই রূপালি আভায় উজ্জ্বল—এক মোহময় স্বপ্নিল পরিবেশ! বিমুগ্ধ নয়নে সে প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য উপভোগ করছে—শুষ্ক কাঠিন্যের সঙ্গে ভারত মাতার যেন আর

এক উজ্জ্বল অপরূপ নমনীয় কমনীয় রূপ। চৌকিদারের ডাকে তার মোহাবেশ টুটে যায়। পেছন ফিরে চায়—দেখে সে জলের সোরাই ও লোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।—চলিয়ে বাবুজী, অন্দর চলিয়ে, খানা তৈরি। সে চৌকিদারকে অনুসরণ করে। হারিকেনটা টেবিলের ওপর, জলের সোরাই দেয়ালের ধারে রেখে এক ঘটি জল গড়িয়ে সেটা তার হাতে দিয়ে চৌকিদার বেরিয়ে যায়। হাতমুখ ধুয়ে সে এসে চেয়ারটায় বসে। কিছুক্ষণের মধ্যে চৌকিদার খানা নিয়ে হাজির। একটা থালায় চাপাটি, ভিণ্ডি ভাজি, মরিচের আচার ও এক বাটি ডাল। খানা রেখে চৌকিদার সরে যায়। খেতে খেতে সে দেখে চৌকিদার তখনও দরজার ধারে দাঁড়িয়ে। তার আর কিছু চাই না শুনে সে—জী, বলে বেরিয়ে যায়।

খাওয়া শেষে সে স্কুলের বারান্দায় চেয়ারটায় এসে বসে। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখের মাঠে নেমে পাইচারি করতে থাকে। চৌকিদার এসে জানায় তার শোবার বিছানা তৈরি। সুবা ছ'বাজে স্কুল শুরু এবং বেলা সাড়ে দশ বাজে ছুট্টি। সে ভোর পাঁচটার মধ্যে এসে তার কুটি সাফ করে সমান সব ওখানে নিয়ে রাখবে। চিন্তার কিছু নেই।

—না, তার কোন কারণ দেখছি না। তুমি তো না চাইতেই আমার প্রয়োজনীয় সব কিছু এনে হাজির করছো। আমি কিন্তু খুব সকালে উঠে ডন করি, লাঠি ভাজি, দৌড়াই—তার কি হবে?

—কোই চিন্তা নেহি। ইয়ে স্কুল চৌহদ্দিকা অন্দর আপ খুশি মাফিক ডন করিয়ে, লাঠি ভাজিয়ে, দৌড় ঝাপ করিয়ে, বোলনেওয়ালা কোই নেহি। লাঠিকা বাত বোলতে হে—আভি হাম বন্দোবস্ত কর দেগা। সমজিয়ে ম্যায় চৌকিদার হুঁ—বলেই সে অন্তর্হিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক লাঠি নিয়ে হাজির—বেশ তেলতেলে মজবুত লাঠি। খুশি হয়ে লাঠির সামনে দাঁড়িয়ে তার উচ্চতা মাপে—না, ঠিক মাপ সই। হাত বাড়িয়ে চৌকিদারের কাছ থেকে লাঠিটা নিতেই তার রূপান্তর ঘটে। লাফ দিয়ে মাঠে পড়েই লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে জোর কদমে বাড়িয়ে চলে। মাঝে মাঝে বীরদর্পে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠছে—চক্রাকারে বন্‌বন্ শব্দে লাঠি ঘুরছে। জ্যোৎস্নালোকে এক অদ্ভুত দৃশ্য। শরীরের পেশী সমূহ স্ফীত হয়ে উঠেছে, মাথার বাবড়ি চুল চোখ মুখ ঢেকে ফেলেছে। চৌকিদারের মনে হলো আচম্বিতে চক্রধারী আবির্ভূত হয়ে বুঝি হস্তধৃত সুদর্শন চক্রের আঘাতে শত্রু সংহারে

মেতে উঠেছে। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে—বাবুজী রুখ্ যাও রুখ্ যাও, চিৎকার দিয়ে চোখ বুঁজে বসে পড়ে।

চৌকিদারের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। এক লাফে বারান্দায় উঠে আসে। চৌকিদারের পাশে গিয়ে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ক্যা হুয়া ?

তাকে দেখেই চৌকিদার উঠে দাঁড়ায়।—ম্যায় তো বিলকুল ঘাবড়া গিয়া। আপকো সুরৎ দেখ কর বহুত ডর লাগা। জিন্দিগী মে তো হাম বহুত ছা লড়াই হামলা দেখা, মোকাবেলা ভি কিয়া, লেকেন কোভি এ্যায়সা নেহি দেখা। মালুম হোতা কি চাঁদনিমে আসমান সে কোই চক্রধারী দেওতা মিট্টি পর আকে দৈত্য দানোকো সংহার কে লিয়ে উনকো পিছুপর ছুট রহা।

সে হেসে ফেলে—ইয়ে তো স্রেফ লাঠিকা খেল। আউর ভি বহুৎ কিসিম খেল হ্যায়। দেখনে মাঙতা ?

—মাফ কি জিয়ে বাবুজী। আভি আপ শো যাইয়ে।

—ঠিক হ্যায়। হাম বোলনে চাতা তোম তো মেরা খিদমত করতা। সরকার যো রূপয়া হামকো দিয়া উহ তোমারা হিপাজত মে রাখো। হামারা জরুরৎ হোগা তো তোমসে মাঙকে লেগা। কথা শেষে সে ঘরে ঢুকে সুটকেশ থেকে টাকা নিয়ে এসে চৌকিদারের দিকে হাত বাড়ায়।

—বাবুজী, হামারা দিল তো আপকো রূপয়া লেনে নেহি চাতা। লেকেন আপ বোলতে হে—আপকো হুকুম মাননেই পড়েগা। টাকা নিয়ে সে হারিকেনটা কমিয়ে চারপাইয়ের পাশে রাখে।—চারপাই দেয়াল সে ফারাক রাখিয়েগা, হুঁশিয়ারি দিয়ে নমস্তে বলে দরজা বন্ধ করে চৌকিদার চলে যায়।

খাটিয়ার নিকট যেতেই চৌকিদারের হুঁশিয়ারি মনে পড়ে। কথাটা তার মনে খটকা সঞ্চার করলেও তাতে কোন গুরুত্ব দেয়নি। তথাপি সে দেয়ালের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। স্বল্প-অন্ধকারে একমাত্র দেয়ালের ফাটল ও গর্তগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তবে কি চৌকিদারের হুঁশিয়ারি নিরর্থক। না, তাও বা কি করে হয় ? সুতরাং লণ্ঠনটা তুলে আলো বাড়িয়ে দেখে দেয়ালের ফাটলে গর্তের মধ্যে কালো কালো অসংখ্য পোকা জড় হয়ে আছে। কতগুলি দেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লণ্ঠনটা আরো কাছে নিয়ে গিয়ে দেখে সে স্তম্ভিত—আরে এগুলি যে

ছার-পোকা। একে তো রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মশকের উপদ্রব বেড়ে চলেছে। তার উপর ছারপোকা ঢুকলে আর দেখতে হবে না—ঘুমটুম সব উবে যাবে। সে খাটিয়াটা তৎক্ষণাৎ সরিয়ে মাঠে নিয়ে যায়। দেয়ালের গায়ে ঠেকানো লাঠিটা নিতে গিয়ে দেখে তার ওপর ছারপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা মাটিতে ঠুকেঠুকে ছারপোকাগুলি ঝেড়ে ফেলে মাঠে নিয়ে খাটিয়ার পাশে রাখে। এত উচ্চ ডিগ্রি গরমে কি করে এত মশা মাছি, ও ছারপোকার প্রজনন—এও এক দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক বিস্ময়। কলকাতার কর্চা মনে পড়ে—রেতে মশা দিনে মাছি এ নিয়ে কলকাতায় আছি। এর সঙ্গে ছারপোকার উল্লেখ থাকলে সেদিনের কলকাতার দুর্বিসহ জীবনের চিত্রটা নিশ্চয়ই আরো খোলতাই হতো। তবে কি তখন সেখানে ছারপোকা ছিল না। দূর ছাই, যত সব বাজে চিন্তার গ্রন্থি মোচন! গামছা নিয়ে মশা তাড়িয়ে সে মশারির ভেতর ঢুকে যায়। বিছানায় গা দিয়ে অস্বস্তি অনুভব করে। এত নড়বড়ে নরম বিছানায় তার শোবার অভ্যাস নেই। তবু ঝিম ধরে পড়ে থাকে। ঘুম আসে না। দুপুরে অনেক ঘুমিয়েছে। শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে সে প্রকৃতির মন-মোহিনী লীলা প্রত্যক্ষ করছে। অদ্ভুত বিচিত্র দেশ। সারাদিন মার্তণ্ডের প্রচণ্ড অগ্নি বিকিরণের সঙ্গে উত্তপ্ত প্রভঞ্জন মিশে সারা দেশটাকে একটা তপ্ত কটাহে পরিণত করে। আর রাতে জ্যোৎস্নার নির্মল রূপালী ধারার সঙ্গে হিম শীতল মৃদুমন্দ হাওয়ার চামর ব্যজনে সারাদিনের অবসাদ ঘুচিয়ে এক স্বপ্ন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই বিপরীতধর্মী আবহাওয়া এখানের জনমানসে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে শারীরিক ও মানসিক সংগঠন—কঠোর ও কোমলের সংমিশ্রণে চরিত্র গড়ে ওঠে। চৌকিদার তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হায়, এদের মধ্যে যদি এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ পেতাম। এসব চিন্তার মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

রাত্রির অন্তিম কাল। পাখির কাকলিতেই বুঝি প্রথম আলোর চরণধ্বনি শোনা যায়। সে উঠে বসে। বিছানার চাদর, মশারি ও গায়ের জামাকাপড় বেশ ঠাণ্ডা— মনে হলো সেঁতসেঁতে শিশিরার্দ্র। খুব অবাক হয়—তবে কি এই শুষ্ক রুক্ষ কঠিন মরু অঞ্চলে শিশিরপাত ঘটে শ্যামল কোমল নদনদী-বিধৌত তার সোনার বাংলার মতো! খাটিয়াটা বারান্দায় এনে রাখে। তারপর নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা ও লাঠি ভেজে পরিশ্রান্ত হয়ে খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে। রাতের অন্ধকার ক্রমেই

বিলীন হচ্ছে। দিবালোক দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করে ধরণীর নিম্নাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে।

চৌকিদার এসে—নমস্তে, বলেই রাতে কোন তকলিফ এবং ঠিকমত নিদ্রা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। তারপর তার শুকনো জামা কাপড় খাটিয়ার ওপর রেখে হাতে একটা দাঁতন দিয়ে গোছলখানায় যেতে বলে। প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দায় এসে দেখে তার খাটিয়া সেখানে নেই। ইতিমধ্যে স্কুলের ছেলেদের আসা শুরু হয়েছে। সে খুপরির দিকে এগোয়। ছুতোর মিস্ত্রি ঘরের দরজা সারাচ্ছে। ঘরে ঢুকে সে ভিজে জামা-কাপড় খাটিয়ার ওপর রাখে। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার। তার পাশে জলের সোরাই এলুমিনিয়াম গ্লাশ দিয়ে ঢাকা। ভেতরটায় আগের দিনের মতো দুর্গন্ধ নেই বটে কিন্তু একটা ভেপসা গন্ধের সঙ্গে চুনের ঝাঁজ নাকে আসছে। ঘর থেকে বেরোবার মুখে চৌকিদার এসে হাজির। তার হাতে একগাছা দড়ি আর তালা চাবি। মিস্ত্রিকে নিয়ে ঘরের এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল অবধি একটা দড়ি টাঙিয়ে ভিজে জামাকাপড় তাতে মেলে দেয়। যাবার সময় বলে—বাবুজী, অব স্কুল শুরু হোগা। সাড়ে দশ বাজনেকা আগারি মেরা ছুট্টি নেহি মিলেগি। লেড়কী আপকো নাস্তা লে আয়েগা। চৌকিদার প্রস্থান করতেই সে সুটকেশ থেকে গীতাখানা বের করে মেজেতে আসন পেতে বসে পাঠ শুরু করে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

(জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রই সমাহিত চিত্তে শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ মান অপমানে অচঞ্চল থাকেন।)

স্কুল আরম্ভের ঘণ্টা পড়তেই ছেলেদের কলরব থেমে যায়। সেও ডেরা থেকে বেরিয়ে যায়। স্কুলে এসে প্রথমে মাষ্টারদের ঘরে ঢোকে। কোন কেউ নেই। ঘরে একটা বড় টেবিল, খানকয়েক চেয়ার আর দুটো বন্ধ আলমিরা। বোধহয় একাধারে বসার আপিস ও লাইব্রেরি। ঘরের গড়ন কতকটা তার খুপরির মতোই। তবে প্রশস্ত, উঁচু দেয়াল এবং উপরের দিকে দুটো ঘুলঘুলি। সে ভেবে পায়না ঘরে হাওয়া ঢোকে এবং বার হয় কি ভাবে। ঘর থেকে বার হতেই দেখে হেডম ষ্টার আসছেন। তাকে দেখেই নমস্কার জানিয়ে বলে—কুশলে আছেন তো। চৌকিদার

ঠিক মতো দেখভাল করছে তো? প্রতি নমস্কার জানিয়ে সে জবাব দেয়—চৌকিদারের তরফে কোন গাফিলতি নেই। শুনে খুশি হয়ে তিনি পেছন ফিরে সঙ্গীদের বলেন—ইনিই স্বদেশীওয়ালা বাঙালী বাবু—বহুৎ জবরদস্ত লড়নেওয়ালা। সরকার বাহাদুর ইনকো বহুৎ ডরতা। তার পরিচিতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে হাত তুলে সবাইকে নমস্কার জানায়, তারাও তার মুখের দিকে চেয়ে সসম্ভ্রমে নমস্তে বলতে বলতে একে একে প্রস্থান করে। তারা অদৃশ্য হতেই সে মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে—স্কুল লাইব্রেরিতে বই আছে কিনা এবং রোজকার সংবাদপত্র আসে কিনা।

মাষ্টার বিষণ্ণকণ্ঠে বলেন—নেহিজী, নেহি। তঙ্‌খা কাহাসে আয়েগা। সরকার বাহাদুরনে যো রূপিয়া দেতা, আউর বাচ্চা লোকসে মাহিনা বাবদ যেতনা তঙ্‌খা আতা—কুল মিলাকে খর্চা নেহি উঠতা। তিনি গম্ভীর মুখে ক্লাশে প্রবেশ করেন। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে—পুঁথি পুস্তক ও সংবাদপত্র-বিহীন হয়ে অন্তরীণ থাকা কালীন দিনগুলি তার কিভাবে কাটবে! চিন্তা পীড়িত হয়ে স্কুল থেকে সম্মুখের মাঠে নেমে যায়। প্রকৃতি ক্রমেই ভিন্ন রূপ ধারণ করছে। প্রভাতের অস্বচ্ছ কুয়াশার আবরণে পূর্ব দিগন্তে কাশ্যপ নন্দন মহাদ্যুতি রক্তকাঞ্চন-নিভকে প্রকাণ্ড একটা রক্তবর্ণ থালার মতোই দেখাচ্ছিল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গগন পরিক্রমায় তিনি যতই উর্ধ্বমুখী হচ্ছেন ততই তার আয়তন ও রূপের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার অগ্নি-কান্তি বিশাল অনল-শিখায় পরিব্যাপ্ত! মুহূর্তে মুহূর্তে তার থেকে লক্ষ কোটি অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হয়ে ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার গতি ও বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার সঙ্গে অগ্নিকণা মিশে জনজীবনকে দগ্ধ ও পীড়িত করছে।

বাইরে টিকতে না পেড়ে সে আপন ডেরায় ফিরে আসে। চেয়ারে বসে এই মরু অঞ্চলের দুর্গত অধিবাসীদের প্রতি তার সহানুভূতি জাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গতকালের কিশোরীটি হাজির। —নমস্তে বাবুজী, বলেই হাতের থালা ও মগটা টেবিলের ওপর রেখে সে রাই থেকে জল গড়িয়ে আনে। থালায় পূর্বদিনের মতোই দুখানা পড়োটা, ভাজি আর মগে চা। খেতে খেতে সে মেয়েটির দিকে চেয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটি সপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দেয়—মেরা নাম, শুনাহে পিতাজীনে সোহিনী রাখা থা। লেকেন চাচাজী মেরেকো সোনিয়া বোলতে হে।

—আচ্ছা, তব চৌকিদার তোমারা চাচা। তোমারা দুসরা ভাই বহিন কোই নেহি ?

—নেহি জী, ম্যায় তো সিরিফ একেলাই হুঁ। চাচাজী মেরেকো বহুৎ পেয়ার করতা।

—তোমারা পিতা মাতা কাঁহা ? জবাব না পেয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে যায়। মেয়েটির মুখে যুগপৎ ক্রোধ, ঘৃণা, ভয়ভীতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের ছায়াপাত। কিছু না-বলে মেয়েটি থালাবাসন নিয়ে সাশ্রু-নয়নে বেরিয়ে যায়। পিতামাতার কথা জিজ্ঞাসা মাত্রই নীরবতার সঙ্গে মেয়েটির চোখে মুখের এই অদ্ভুত নাটকীয় পরিবর্তন সত্যই বিস্ময়কর। তবে কি তার পিতামাতাকে নিয়ে কোন রহস্য কিংবা মর্মন্তুদ কাহিনী জড়িয়ে আছে! কিন্তু তা জানবার কোন উপায় নেই যদি না মেয়েটি কিংবা তার চাচা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু না বলে। মেয়েটির জন্য সে দুঃখ বোধ করে।

ঘরে বসে তার অস্বস্তি বোধ হয়। পুনরায় ঘর ছেড়ে স্কুলে গিয়ে উপস্থিত। মাষ্টারদের ঘরে ঢুকে দেখে তাদের কয়েকজন বসে আছেন। তাকে দেখে—আইয়ে বৈঠিয়ে, বলে সম্বর্ধনা জানান। একজন তো উঠে তার দিকে চেয়ার এগিয়ে দেন।

—নেহি নেহি, আপ বৈঠিয়ে, বলে সে অদূরবর্তী একটা টুলে গিয়ে বসে। একজন বলেন—হামারা মুল্লুক আপকা পছন্দ হ্যায় ? খানা-পিনাকো কোই তকলিফ্ তো নেহি। তবিয়ত আচ্ছা হে তো ? একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর সম্ভব নয়। প্রশ্নগুলির একে একে যথাযথ উত্তর দেবার পূর্বক্ষণে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজে। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তারা একসঙ্গে—নমস্তে, ফের মোলাকাত হোগা, বলেই বেরিয়ে যায়। গৃহাভিমুখী ছাত্রদের কলরব ততক্ষণে থেমে গেছে। সব নিঝুম নিস্তব্ধ। একমাত্র বাতাসের হু হু শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর নয়। এখানে বসে থেকে আর কি হবে। পড়াশোনার বই নেই, কথা বলার লোক নেই, কাজ করার অবকাশ নেই, এমনকি বাইরে হাঁটা চলার পর্যন্ত উপায় নেই। এমন দেশে এভাবে জীবনযাপন। দু'দিনেই সে হাঁপিয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে গরম হাওয়া আসছে। সে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে আপন ডেরায় ফিরে যায়। ঘরের আগল এঁটে চিন্তাক্লিষ্ট অবসন্ন মনে শুয়ে পড়ে। দরজায় খটখট শুনেই সে উঠে দরজা খুলে দেয়।

চৌকিদার খানা নিয়ে উপস্থিত। খাবার থালা টেবিলের ওপর রেখে গ্লাসে জল ভরে তার হাতে দিয়ে সে মাটিতে বসে পড়ে। তার খাওয়া শুরু হতেই চৌকিদার জিজ্ঞাসা করে—কোই তকলিফ্ তো নেহি বাবুজী ?

—তোম তো আচ্ছাসে খানাপিনা দেতা, তদবির তদারক ভি করতা। লেকেন মেরা তকলিফ্ তো দুসরা কিসিম—কেতাব নেহি, আখবার নেহি, পড়নেকা কুছ্ নেহি। বাহার নিকালনে শক্তা নেহি আদমিকা সাথ বাতচিত হোতা নেহি। আভি সমঝো মেরা সময় ক্যায়সে গুজরতা! ইসসে তো সরকারি কয়েদখানা আচ্ছা।

—ঘাবড়াইয়ে মত বাবুজী। থোবা রোজ বাদ সবকুছ্ ঠিক হো জায়গা। উস সময়, মেরা শির কবুল, আপ ইয়ে মুল্লুক ছোড়নে ভি নেহি চাহিয়েগা। চৌকিদার উঠে দাঁড়ায়, একটু কাছে এগিয়ে বলে—আপকো পাশ মেরা এক আরজি—ইধারকা জেনানা মর্দানা আপকো খেল দেখনে চাতা। আপকো নেহি বোলকে ম্যায় তো জবান দে দিয়া। মেরা কসুর হো গিয়া, মাফ কি জিয়ে।

—নেহি নেহি, কসুরকা কোই বাতই নেহি। তুমারা জবান জরুর রাখেগা। ইসপর হামারা ভি এক বাত শোনো—নওজোয়ান নওজোয়ানী লেড়কা লেড়কী লে আও। লাঠি, ছোড়া বন্দুকবাজী, সবকুছ্ তালিম দেকর এ্যায়সে এক জবরদস্ত স্বদেশী লড়াকু পল্টন বনা দেগা য্যায়সে ইয়ে হারামি সরকারকো সাথ লড়কে হামারা দেশকা স্বাধীনতা ছিন লেনে সেকে। বলতে বলতে সে এতই উত্তেজিত যে খানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার রোষ-কষায়িত চোখ মুখ রক্ত-রাঙা আর মাথার কোঁকড়া বাবরি ফুলে উঠে এক ভীষণ উগ্র মূর্তি ধারণ করে।

চৌকিদার ভয় পেয়ে হাত জোর করে বলে—ম্যায় মাফেই মাঙতা বাবুজী, মেরা গোস্তাকি মাপ্ কি জীয়ে।

খুবই উত্তেজিত হয়েছে বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বসে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে—ডরো মৎ, ডরনেকা কোই বাতই নেহি। কোভি কোভি মেরা য়্যায়সা হো জাতা। যেতনা আদমি আনে চায় তো আনে দো। এক ছোরা ভি চাহিয়ে—নেহি তো ছোরাকা খেল ক্যায়সে হোগা। আউর এক টৈকা ভি বন্দোবস্ত করনা। হাম উসপর সোয়ার হোকে সাম সুবা তোমারা সারা মুল্লুক ঘুমকে দেখনে চাতা।

—আচ্ছা, বাবুজী। তার খাওয়া শেষ হতেই চৌকিদার থালা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

চৌকিদার চলে যেতে সে দরজায় আগল দিতে গিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে মার্তণ্ডের লেলিহান শিখা বাতাসে সওয়ার হয়ে উন্মত্তের মতো ছুটছে। সম্মুখে চাওয়া যায় না—চক্ষু যেন কোটর থেকে বেরিয়ে যাবে। ঠাস করে দরজা বন্ধ করে ঘরময় কিছুক্ষণ পাইচারি করতে করতে গীতার একটি শ্লোক :

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ

আবৃত্তি করে। মরু অঞ্চলে তার অখণ্ড অলস অবসর বিনোদনের একটা পন্থা মনে মনে উদ্‌ভাবনের সঙ্গে সে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে। খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে চক্ষু বুজে আসে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই, দরজায় খটাখট শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলে দিতেই চৌকিদার নমস্তে, বলে সোহিনীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বাইরে তাকিয়ে দেখে প্রকৃতি ইতিমধ্যেই যেন ভোল পাল্টে ফেলেছে। পড়ন্ত বেলা—তপন দেবের রক্তচক্ষু ম্রিয়মান। অনুচর তপ্ত-প্রভঞ্জনও অনেকটা শান্ত। চৌকিদারের দিকে ফিরে তাকাতেই সে খাপশুদ্ধ একটা ছোরা তার দিকে এগিয়ে ধরে। সেটা হাতে নিয়ে খাপ থেকে বার করতেই সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ এহাত ওহাতে ঘুরিয়ে এমন কায়দায় ছুঁড়ে মারে যে সেটা তিন পাক খেয়ে দেয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হয়। চৌকিদার দেয়াল থেকে ছোরাটা খুলে এনে তার হাতে দিয়ে বলে—বাবুজী, বাহার স্কুলকা সামনে বহুত আদমি—জেনানা মর্দানা, আপকো খেল দেখনো কো আয়া।

—ঠিক হ্যায়, তোম যাও, হাম আভি আ রহা। বাক্স খুলে গেরুয়া রঙের বহির্বাস, ফতুয়া পরে এবং মাথার বাবরি চুলে পাগড়ি বেঁধে হাতে লাঠি এবং কোমরে ছোরা গুঁজে স্কুলের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। চেয়ে দেখে সম্মুখের মাঠে রাজস্থানী নানা বিচিত্র বেশ ও রঙিন পাকানো মস্ত পাগড়ি পরিহিত পুরুষ এবং নানা রঙের ঘাগড়া ও কাচুলি পরিহিতা কিশোরী, যুবতী ও অবগুণ্ঠন-বতী মহিলা অপেক্ষা করছে।—ভাইয়ো বহিনো সম্বোধন করে সকলকে শুক্রিয়া জানিয়ে এক অদ্ভুত অভাবনীয় ক্ষিপ্র নাটকীয় ভঙ্গিতে লাঠি খেলা শুরু করে। মনে হচ্ছে চতুর্দিক থেকে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করে এক চক্রব্যূহ রচনা করে তারই ভেতরে সে

বীরবিক্রমে নর্তন কুর্দন লম্ফঝম্ফ দিয়ে আত্মরক্ষা করে চলেছে। তারপরই চলে তার আক্রমণাত্মক কৌশল প্রদর্শন। দর্শকবৃন্দ স্তব্ধবিস্ময়ে বুঝি এক জাদুকরের ভোজবাজিতে বশীভূত হয়ে নির্বাক অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। খেলা শেষে বীর কেশরীর মতো এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলেই হাততালির সঙ্গে এক অবোধ্য ভাষায় তাকে অভিনন্দিত করে। সেই মুহূর্তে সে কোমরের খাপ থেকে একটানে শানিত ছোরাটা বার করে উর্ধ্বমুখী হয়ে এক অদ্ভুত কৌশলে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে। কয়েক পাক খেয়ে সেটা মাটি স্পর্শ করবার পূর্বেই সে হাতলটা ধরে ফেলে। তারপর ছোরা হাতে ডাইনে বাঁয়ে চক্রাকারে ঘুরে অদৃশ্য শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত হেনে চলে। অকস্মাৎ সিংহ-গর্জনে নরসিংহের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে জানুদ্বয়ের ওপর কল্পিত হিরণ্যকশিপুকে রেখে নখাঘাতে তার উদর-বিদীর্ণ-দৃশ্য দেখিয়ে তৃপ্ত নরসিংহ পুনরায় সিংহ-নাদে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে ছোরাটা এমন ভাবে নিক্ষেপ করে যে সেটা দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে ছুটে গিয়ে পেছনের মাটিতে বিদ্ধ হয়। তার সিংহনাদে স্তম্ভিত দর্শকবৃন্দ-সাবাস! সাবাস!! বলে চেঁচিয়ে উঠে। এভাবেই সে লাঠি ও ছোরা খেলা সমাপ্ত করে বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দকে নমস্কার জানিয়ে তাদের সম্মুখ থেকে স্কুলের বারান্দায় এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। দর্শকগণ একে একে—নমস্তে বাবুজী বলে,—কেউ বা তার সম্মুখে ফলমূল রেখে—চলে যায়। প্রস্থান-রত মেয়েদের কেউ কেউ অবগুণ্ঠন তুলে তাকে এক পলক দেখে লাজে আরো অনেকখানি টেনে দেয়। পশ্চিম গগনে তখন দিবাকর বিরাট সোনার থালা হয়ে পাটে বসে ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলেছেন। সারা পশ্চিম গগন যেন রক্তগুলালে ছেয়ে গেছে। সে এক অদ্ভুত রমণীয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য!

চৌকিদার এসে বলে—বাবুজী, আপতো কেল্লা ফতে কর দিয়া। সবকো যাদু কিয়া। পেছন ফিরে সোহিনীকে বলে—যা বেটি, ইয়ে সব লে যা। বাবুজীকো ওয়াস্তে এক গ্লাশ আচ্ছা সরবৎ বনাকে লে আ। তারপর চৌকিদার স্কুল থেকে একটা কুর্শি এনে বলে, ব্যাঠো বাবুজী। আপকা বহুৎ পেরেশানি হুয়া। ম্যায় মাফই মাঙতা। সে কুর্শিতে বসতেই পুনরায় বলে—বাবুজী, থোরা বাদ উট-ওয়ালা উট লেকে আয়েগা। দু'তিন রোজ মে আপকো আচ্ছা সোয়ারী বনা দেগা—

ঘাবড়াইয়ে মৎ। ইসকে বাদ আপ্ ইতমিনান সে সাম শুবা ঘুমতে ফিরতে রহে—কোই বলনেওয়ালা নেহি। লেকেন, এক বাত বাবুজী, আপকো ইয়ে বস্তিকা চৌহদ্দিকা অন্দর রহেনে চাহিয়ে। বাহার যানে সে বহুত খতরা পয়দা হোগা—মেহেরবাণী করকে খেয়াল রাখিয়ে।

চৌকিদারের কথায় তার মনে সংশয় জাগে—কেন তাকে এই বস্তির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকতে হবে? বাইরে গেলে বিপদ হবে—এর মানে কি? যাক্‌গে, আগে তো উট-চড়াটা রপ্ত করেনি, তারপর কি হয় দেখা যাবে।

সোহিনী কিছু ফলসহ সরবত নিয়ে হাজির। পান করে সে পরিতৃপ্ত—সরবতটা সত্যিই সুস্বাদু এবং ঠাণ্ডা। উট এসে গেছে। উট দেখেই সোহিনী বালিকা সুলভ চাঞ্চল্যে লাফিয়ে ওঠে। আনন্দে নৃত্যের ভঙ্গিতে দৌড়ে গিয়ে বলে—দেও লক্ষণ ভাই, মেরেকো রশি দেও। তারপর একরকম টান দিয়ে রশি হাতে নিয়ে বলে—হীরা মোতি ব্যাঠ যা, ব্যাঠ যা। আশ্চর্য উট দুটো যেন ওর ডাক শুনেই বাধ্যের মতো বসে পড়ে। সোহিনী তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে গালে গাল লাগিয়ে কিরকম যে আদর করতে থাকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে মানুষের সঙ্গে পশুর স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন কতখানি। চাচাজী আ যাইয়ে বলে সোনিয়া উটে চড়বার উদ্যোগ করতেই চৌকিদার তাকে নিষেধ করে—রুখ যা সোনিয়া। উট বাবুজীকো ওয়াস্তে আয়া।

—ঠিক হ্যায় চাচাজী, বাবুজীকো আনে বোলিয়ে। ম্যায় উনকো উট চড়না, চালানা, ঘুমনা সব কুছ্ শিখা দেগা।—তোম ইধার ঠারো লক্ষণ ভাইয়া, বলেই সে উটে চড়ে বসে। চৌকিদার একেবারে হতভম্ব। তাকে কিছু বলবার ফুরসত না দিয়ে মহারাজ বারান্দা থেকে নেমে উটের পাশে দাঁড়ায়। সোহিনী উট থেকে নেমে যায়। তারপর বাবুজীর পাশে গিয়ে গিয়ে কিভাবে উটে চড়তে বসতে চালাতে হয় তা তাকে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়। তাকে হীরার কাঁধে বসিয়ে সোহিনী মোতির উপর চড়ে বসে। চলবার মুখে চাচাকে ডেকে বলে—চিন্তা মৎ কিজিয়ে চাচাজী। হামলোগ জলদি লোটেগা। উত্তরে চৌকিদার তাকে বস্তীর বাইরে না যাবার জন্য সাবধান করে দেয়।

সেদিন সোহিনীর পাশে চলে চলে সে উঠ চড়বার, নামবার, আগে পিছে চালাবার, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাবার প্রাথমিক কায়দাগুলি রপ্ত করে

বস্তি ঘুরে ফিরে আসে। উট থেকে সে চৌকিদারকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে —তোমারা লেড়কী বহুত হুঁশিয়ার আউর ওস্তাদ। হামকো উটকা বারে মে বহুত কুছ, শিখায়া। হাম খোশ হ্যায়। কাল সুবা একঠো উট বন্দোবস্ত করনা, বলেই সে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

চৌকিদার—হাঁ জী, বলেই উঠে দাঁড়ায়। লক্ষণকে কাল সকালে উট আনতে বলে—সোনিয়া, আ যা, হাঁক দিয়েই সে পা বাড়ায়। সোহিনী লক্ষণের হাত থেকে শুকনো ঘাস নিয়ে তখন উট দুটোকে আদর করে খাওয়াচ্ছিল। চাচার ডাক শুনে—আই, বলেই দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে চলতে থাকে।

লাঠি-খেলা, উট-চড়া ইত্যাদি নানা কসরতের পর ঘরে ফিরে সে বেশ ক্লান্তি বোধ করে। খানিকক্ষণ বসে হারিকেন নিয়ে স্নান ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। স্নানের পর শরীরের ক্লান্তি দূর হলেও সুদূর মরুভূমিতে নির্বাসন হেতু অধ্যয়ন ও কর্মবিহীন নিরবলম্ব দিনগুলির অবসাদ দূরীকরণ ও মানসিক শান্তি আনয়ন কল্পে গীতাখানা খুলে :

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তিভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

(বিবেক যুক্ত পুরুষ নিজ স্বভাব অনুরূপ কর্মানুষ্ঠান করেন। জীব প্রকৃতির বশীভূত, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে তার কি করবে ?) পাঠ করে মনে কিছুটা শান্তি আনে।

দরজায় খটাখট আওয়াজ কানে আসে। গীতাখানা বন্ধ করে দরজা খুলে দেখে চৌকিদার। খানা নিয়ে হাজির। রাত্রি যে অনেক চৌকিদারের আগমনে তার খেয়াল হয়। টেবিলের ওপর খানা রেখে জল গড়িয়ে দিয়ে চৌকিদার মাটিতে বসে পড়ে। খেতে খেতে সে বলে—চৌকিদার, তোম মেরা খানা বনাতা, তদ্বির তদারক করতা, ইসকে লিয়ে তোমকো ভি মজুরি দেনা চাহিয়ে। সরকার হামকো যো রূপয়া দেতা উসসে সব হো যাতা ? নেহি তো সরকার কো লিখনে পড়েগি। ইয়াদ হে কি সরকার হেডমাষ্টারজীকো হামারা ওপর নজর ওউর খবরদারীকা ভার দিয়া। রুপিয়াকো জরুরৎ হো তো বাতাও। এক খত লিখকে উনকো পাশ দেনে হোগা।

—বাত তো ঠিক হ্যায় বাবুজী, লেকেন আপকো খিদ্‌মত কে লিয়ে তো মেরা কুছ, নেহি চাহিয়ে। চৌকিদার চুপ হয়ে যায়। কিন্তু খেতে

খেতে চৌকিদারের মুখের ভাব দেখে মনে হয় সে যেন আরো কিছু বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না বলে উশখুশ করছে। চৌকিদারের সংকোচ দূর করার উদ্দেশ্য সে জিজ্ঞাসা করে—তোম আউর কুছ বোলনে চাতা?

—জী হাঁ, মালুম হোতা আপ বহুত দিল-দরদী আদমী। আপকো হামারা এক দুখ্‌কা কাহানী শুনানে চাতা। তার সম্মতির অপেক্ষা না করে চৌকিদার যে কাহিনী শোনায় তা যেমনি করুণ তেমনি হৃদয় বিদারক। প্রারম্ভে সোহিনী যে তার লেড়কী নয়, ভাই-ঝি এবং শালী-কন্যা, এক সময়ে সে যে এই বস্তির চৌকিদার ছিল এবং তার নওজোয়ান ভাই নওয়লকে উচুমহলে বলে কয়ে চৌকিদার করে শালীর সঙ্গে সাদি দিয়ে চার ক্রোশ দূরে এক মরুবস্তিতে পাঠিয়েছিল তার উল্লেখ করে। সেই সঙ্গে মরুদস্যুরা কিভাবে আগের ভাগে গোপনে চর পাঠিয়ে ঐ বস্তির খবরাখবর সংগ্রহ করে গভীর নিশুতিতে ঝড়ের বেগে বস্তির উপর চড়াও হয়ে ধনরত্ন এবং সোমত্ত নওজোয়ানী মেয়েদের লুট করে নিয়ে পালায় এবং ঘটনাটা সরকার বাহাদুরের গোচরে এনেও যে তার কোন কূল-কিনারা হয়না ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করে।

চৌকিদার বর্ণিত সেই কালরাত্রির মর্মস্পর্শী বিষাদময় কাহিনী :

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি। দিনের আতপতাপদগ্ধ জনগণ রাত্রির সুশীতল ক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন। আচম্বিতে ভয় ভীতিকর হুঁ হুঁ আওয়াজে চতুর্দিক মথিত করে উল্কা-গতিতে উষ্ট্রবাহী দস্যুদল বসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতর্কিত আক্রমণে নিরস্ত্র নিদ্রিত জনগণ দিশেহারা। তবু টাঙ্গি, বল্লম, তলোয়ার ইত্যাদি' যে যা পেরেছে তাই হাতে নিয়ে এককভাবে দস্যুদের বাধা দানে ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যস্ত। সম্মিলিতভাবে দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ ও সময় তারা পায়নি। নওয়ল চৌকিদার—জনগণের ধন প্রাণ ও গ্রাম রক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে সে খুবই সচেতন। স্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে লোকজন জড় করবার উদ্দেশ্যে হাঁক ডাক দিতে দিতে নওয়ল বল্লম হাতে বেরিয়ে পড়ে। বৃথা—কেউ এগিয়ে আসে না বা আসবার অবসর পায়না। সকলেই—চাচা আপন বাচাতে ব্যস্ত। চতুর্দিকে হৈ হল্লা চেঁচামেচি কান্নাকাটি। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। নওয়ল ব্যর্থ ও নিরুপায়—একা সে দস্যুদের কিভাবে রুখবে। এই গোলমাল ও বিভ্রান্তির মধ্যে তার নিজের অরক্ষিত ঘরের কথা মনে পড়ে। সেখানে

মালতি তার শিশুকন্যা নিয়ে একা—তাদের রক্ষা করবার কেউ নেই। সে তখন পাগলের মতো মালতি হুঁশিয়ার হো, হুঁশিয়ার হো চিৎকার দিতে দিতে গৃহাভিমুখী ছুটতে থাকে। ঘরের দুয়ারে সামনে এসেই সে পশ্চাতে এক দস্যুর পদধ্বনি শুনতে পায়। মালতি ভাগ যা—ভাগ যা, ভাগ যা, ধ্বনি দিয়েই সে পেছন ফিরে দস্যুকে বাধা দিতে দরজা আগলে দাঁড়ায় এবং অস্পষ্ট আলোতে ছুটে আসা দস্যুকে লক্ষ্য করে সজোরে বল্লম ছুঁড়ে মারে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি ছুটে এসে তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। নওয়াল মালতি হুঁশিয়ার চিৎকার দিয়েই পড়ে যায়। স্বামীর চিৎকার শুনে তাকে রক্ষা করার জন্য বুঝি শিশুকন্যা কোলে নিয়ে মালতি ছুটে আসে। স্বামীকে পড়ে থাকতে দেখে কন্যাকে কোল থেকে নামিয়ে সে চিৎকার দিয়ে তার বুকের উপর আছড়ে পড়ে। রক্তাপ্লুত নওয়লের মৃত দেহের উপর পড়ে থাকা ক্রন্দনরত মালতিকে দস্যু জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে যায়। বন্দিনী মালতির আর্তচিৎকার শুনে কেউ এগিয়ে আসে না। গভীর নিশীথে মালতিব মতোই বিপন্না বহু নারী বন্দিনীর কাতর ক্রন্দন শুষ্ক মরুতে সামান্য আলোড়ন তুলেই দিগন্তে মিলিয়ে যায়। নওয়লের হামাগুড়ি-দেওয়া শিশুকন্যা মৃত পিতার পাশে মা মা বলে কাঁদতে কাঁদতে তারই রক্তাপ্লুত দেহের উপর ঘুমিয়ে পড়ে। সে এক করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য বাবুজী। বলতে বলতে বৃদ্ধ চৌকিদারের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে যায়।

এতক্ষণ খাওয়া দাওয়া ভুলে এই করুণ কাহিনীতেই সে ডুবে ছিল। চৌকিদারেব কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হতেই সে আপন সত্তায় ফিরে আসে। খাওয়া শেষ না করেই সে উঠে পড়ে। শোকাশ্রু-আপ্লুত বাক-রহিত বৃদ্ধ থালা বাসন নিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ঘটনাটা তার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় সেদিন কি প্রকারে জনতার পক্ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল তা সে ভেবে পায় না। কেননা তলোয়ার, বল্লম টাঙ্গি নিয়ে আর যাই হোক নির্মম বন্দুকধারী মরুদস্যুদের মোকাবেলা করা যায় না। অধিকন্তু আরও কতগুলি নিরীহ মানুষ বলি হতো। সোহিনীর পিতার মরণ ও মায়ের অপহরণ খুবই মর্মান্তিক ও শোকাবহ। তার জন্য সে সহানুভূতি ও মমত্ব বোধ করে। ঘরের গুমোট ছেড়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। রাত্রি বোধ হয় অনেক। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ম্লান জোছনা শুষ্ক মরু

অঞ্চলে এক রমণীয় মোহনীয় কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। দিনের রুদ্র-আতপে দগ্ধ ধরণীকে রজনী যেন শান্ত শীতল মলয় চামর ব্যজনে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ঘর থেকে খাটিয়াটা বাইরে এনে সে শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুম আসে না। দিনের বেলার প্রকৃতির তাণ্ডবে ঘরে অবরুদ্ধ থাকা নির্জন পাষাণ কারাবাসেরই সামিল। তার উপর এই অলস অবসর তার মনে ও শরীরে যেন জগদ্দল পাথর চেপে বসে তাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। নিজ কর্মভূমি, সহযোগী ও সহকর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর কতকাল তাকে এই মরুদ্বীপে কাটাতে হবে! খবরের কাগজের অভাবে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার অজ্ঞাত। স্বাধীনতা সংগ্রামে একদিকে গান্ধিজীর আন্দোলন অপরদিকে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা কোথায় কি ঘটছে কিছুই তার জানবার উপায় নেই। তবে কি আবার সে পূর্বের ন্যায় পলায়ন করবে? কিন্তু সে ছিল জল, জংগল-ভরা পাহাড়িয়া দেশ—এ যে দিগন্ত বিস্তৃত জনবসতিহীন দগ্ধমরু! শেষকালে না দিশেহারা হয়ে হায় জল, হায় জল করতে করতেই মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হয়! এইসব চিন্তা করতে করতেই সে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে জানে না—হঠাৎ একটা কান-ফাটা চিৎকারে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে চায়—কিছুই বোঝা গেল না। হয়তো কোন পাখি কিংবা পশু—এখানে যাদের গিদর কিংবা গিদ্ধর বলে। তাদেরই জ্ঞাতি গোত্রের কেউ হবে। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। উষার প্রাদুর্ভাবে রজনী তার কালো ঘোমটাখানি গুটিয়ে ধীরে ধীরে বিলীয়মান। ঠাণ্ডা শীতল হাওয়া শুষ্ক ধরিত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে চলেছে। শুয়ে শুয়েই সে প্রত্যূষের এই ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ পরিবেশের প্রাণময় স্পর্শ উপভোগ করছে। পরমুহূর্তেই উষার অনুসরণকারী মহাদ্যুতি রথারূঢ় মহাকাশচারী অগ্নিময় মহাপুরুষের কথা স্মরণ হতেই সে শয্যা পরিত্যাগ করে। খাটিয়াটা ঘরে রেখে আসে। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা লাঠিখেলা শেষ হতে না হতেই লক্ষণ উট নিয়ে হাজির। ওদিকে পুব-গগনে সূর্য ঝিকিমিকি দিয়ে উঠছে। সে আর দেরি করে না। লাঠিটা ঘরে রেখে এসে লক্ষণের হাত থেকে রশি নিয়ে কায়দা মত তাতে টান দিতেই উট হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। লক্ষণকে এখানে বিশ্রাম করতে বলে সে উটে চেপে চলতে থাকে। লক্ষণ তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে বলে—নেহি বাবুজী আপকো একেলা ছোড়নেকা হুকুম নেহি। ইসকো সাথ আপকো

পহিলে জান পয়চান হোনে দিজিয়ে। আউর এক বাত। ইস সময় ইয়ে জানোয়ারকা মেজাজ কোভি কোভি বহুত বিগড় যাতা। অগত্যা লক্ষণকেও উটের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়। এভাবেই মিনিট চল্লিশের মতো উট-চড়া অভ্যাস করে সে ফিরে আসে। লক্ষণ উট নিয়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে স্কুল শুরু হয়েছে। ছাত্রদের সুর করে পাঠাভ্যাসের সঙ্গে মাষ্টারদের গলাও শোনা যাচ্ছে। ঘরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কাপড় গামছা সহ স্নানের ঘরে চলে যায়। স্নানাদি শেষে পরিতৃপ্ত মনে ঘরে ফিরে আসে। তারপর আসন পেতে গীতা পাঠে মগ্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন:

অথ চেত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিস্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্সৎসি॥

(আর যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি উভয়ই ত্যাগ করায় তুমি পাপ-ভাগী হবে।) কিন্তু কিভাবে সে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে? কর্মক্ষেত্র ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে সে অন্তরিত। দেশেরও দশের সংবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একরকম অন্ধকারেই সে ডুবে আছে। আর এই মরু অঞ্চলের দুঃখ দারিদ্র্য অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনমানসকে স্বাধীনতা মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করে কোন সংগঠন গড়ে তোলা একপ্রকার দুরূহ বলেই মনে হয়। জনগণ স্বদেশীওয়ালা লড়াকু বাঙালীবাবুকে দেখতে আসে। তার শারীরিক ক্রিড়া কৌশল, লাঠি ও ছোরা খেলা দেখে তাজ্জব বলে যায়। কিন্তু তা শিখবার আগ্রহ নিয়ে কেউ এখনো অবধি এগিয়ে আসে নি। যাকগে, আগে তো উট-চরাটা রপ্ত করে নি তারপর দেখা যাবে কি করতে পারি। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। গীতা হাতে নিয়ে যখন সে এইসব চিন্তায় মগ্ন তখন বাইরে দরজায় খটখট আওয়াজ শোনা যায়। দরজা খুলে দেখে সোহিনী। নাস্তা নিয়ে এসেছে। সোহিনীকে দেখেই বিগত রজনীতে চৌকিদারের নিকট শ্রুত তার পিতা-মাতার মর্মান্তিক বিয়োগান্ত কাহিনী মনে পড়ে তার জন্য বেদনা ও সহানুভূতি জাগে। —আও, বলেই সে সরে এসে গীতাখানা বাক্সের উপর রেখে চেয়ারে গিয়ে বসে।

—নমস্তে বাবুজী, বলেই সোহিনী হাতের থালা ও জলের ঘটি টেবিলের ওপর রাখে। বাবুজীর গম্ভীর ভাব দেখে আর কিছু বলতে সাহস করে না। যে কথা বলবে বলে ভেবে রেখেছে তা আর বলা হয় না। সে মাটিতে বসে পড়ে।

খেতে খেতে মনের ভার কিছুটা লাঘব হতেই সে সোহিনীকে সকাল বেলার উটে চড়ে তার ভ্রমণ কাহিনী শোনায়—যখনই সে লক্ষণের হাত থেকে রাশি টেনে নিয়ে একলা চলতে চেয়েছে তখনই সে বাধা দিয়েছে। অথচ তার ইচ্ছা গাঁও ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে আসে।

—মুশকিল ইয়ে হ্যায় বাবুজী, একদফে আপ গাঁওকা বাহার যাকে আপনা খেয়াল পর দূর চলা যায় তো বহুৎ খতরা পয়দা হোগা। আপ বেদিশা হো যায়গা—উসকে বাদ আওয়ারা বনকে মরুমে স্রিফ ঘুমতেই রহেগা, ঘুমতেই রহেগা। গাঁওকা পাত্তা আউর কোভি নেহি মিলেগি। ইস লিয়ে আপকা সাথীকা জরুরৎ হ্যায়। সোহিনী তাকে হুঁশিয়ার করে।

মনে মনে সোহিনীর বলার ধরন সে প্রশংসা না করে পারে না। মুখে বলে আভি হাম সমঝা। আচ্ছা সোহিনী, ইয়ে গাঁওকা বাহার মুলুককা তোমারা কুছ পাত্তা হ্যায়?

—হাঁ জী, হাম তো হিয়াসে বহুৎ দূর মেরা পিতাজীকা গাঁও তক ভি একেলী যানে আনে শক্তা।

—তবতো তোম বহুৎ বাহাদুর লেড়কী হো—মেরেকোভি গাঁওকা বাহার ঘুমাকে লে আনে শকতা।

—জী হাঁ, জরুর।

—ঠিক হ্যায়, ইস বারেমে ম্যায় তোমারা চাচাজীকা সাথ বাতচিত করেঙ্গে। সে খাওয়া শেষে চেয়ার ছেড়ে খাটিয়ায় গিয়ে বসে। কিন্তু সোহিনী তখনও উঠছে না। একই ভাবে বসে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করে—তোমরা কুছ বোলনা হ্যায়?

—জী হাঁ, ম্যায় আপকো পাশ লাঠি আর ছোরাকা খেল শিখনে মাঙতা।

সোহিনীর কথা এক নাবালিকার খেয়াল খুশি ভেবে তার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করে হেসে বলে—কেঁউ, তোমারা মতলব?

চোখ মুখের ভাব গম্ভীর করে হাত পা নেড়ে জবাব দেয়—মেরা মতলব? মেরা মতলব তো স্রিফ ইয়ে হ্যায় বাবুজী, ছোরা আউর লাঠিসে মারনেকা কসরত শিখকে ম্যায় ডাকুকা মোকাবেলা করেঙ্গে—যোনে মেরা পিতাকো মারডালা, মাতাকো ছিনলিয়া। ডাকুকা সাথ লড়কে মেরা পেয়ারী মাতাকো খালাস করকে লে আউঙ্গা। শুনা হে

আপ এক জবরদস্ত ডাকু সে ভি বহুৎ উচা এক খানদানি লড়নেওয়ালা। সরকার বাহাদুরকা সাথ লড়তে হে। সবকার আপকো বহুত ডরতা। ইস্ ওজেসে আপকো ইধার লে আকে আটক কিয়া। বলতে বলতে তার চোখে অদ্ভুত এক বীরত্বব্যঞ্জক কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

সোহনীর কথা শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক। এতো শুধু বালিকাসুলভ খামখেয়ালী কথা নয়। এ যেন এক পরিণত বয়স্কার অন্তর্দাহের স্ফুরণ— এক বীরাঙ্গনা নারীর কঠিন শপথ পাঠ। পিতার মৃত্যু মাতার অপহরণ জনিত দুঃখ ও ক্ষোভ বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে দানা বেঁধে ক্রমে ক্রমে এবয়সেই তার মধ্যে এক অভাবনীয় প্রতিশোধ-পরায়ণতা-বৃত্তি জাগিয়ে তুলছে। বাধা পেলে মারাত্মক বিপত্তি ও অঘটন কিছু অসম্ভব নয়। এই ভেবে সে কিছুক্ষণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে থাকে। তারপর হেসে উৎসাহ ব্যঞ্জক সুরে বলে—সোহিনী তোমরা মতলব ম্যায় বিলকুল সমঝা। তোমারা চাচাজীকা অনুমতিকা সাথ দশ বারো সহেলী ভি লে আও। হাম সবকো ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকা মাফিক জবরদস্ত লড়নেওয়ালী এক ফৌজি দল বনা দেগা যায়সে ডাকুউকু চ্যায় তো সরকারকা সাথ ভি লড়নে সেকে। বলতে বলতে তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

সোহিনী কি বুঝলো মুখ দেখে বোঝা গেল না। সে তার দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে টেবিল থেকে থালা ঘটি তুলে—বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া বাবুজী, বলেই মনে হলো, হৃষ্ট-চিত্তে বেরিয়ে যায়।

সেদিন দুপুরে চৌকিদার খানা নিয়ে এসে তার সঙ্গে কয়েকখানা সংবাদপত্রও টেবিলে রাখে। কাগজ দেখেই সে লাফিয়ে উঠে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শিরোনামাগুলি দেখে আবার তা ভাঁজ করে রেখে দেয়। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে বলে,— বহুৎ আচ্ছা কাম কিয়া চৌকিদাব, সুক্রিয়া।

—আপকা খুশিসে ম্যায় ভি বহুৎ খোশ হো। ইয়ে সব আপকা পড়া হোনে কা বাদ ঘুমা দেকে দুসরা লে আয়েগা।

সে খেতে আরম্ভ করতে চৌকিদার খানিকটা এগিয়ে এসে বলে— বাবুজী মেরা এক আর্জি হ্যায়—হুকুম হো তো পেশ করে।

—সেকি, সে বাংলাতেই বলে ফেলে।—তোমাকে আবার সম্মতি নিতে হবে নাকি? বলো, কি বলবে।

কোন ভনিতা না করে চৌকিদাব বলে—লেড়কি নে বহুৎ তঙ্ শুরু কিয়া। আপকো পাশ লাঠি আউর ছোরাকা খেল শিখনে চাতা। হাম

আউর উসকা চাচী বহুৎ সে সমঝায়া—ইয়ে তো স্রিফ লেড়কালোগোকা খেল। তোম লেড়কী হোকে ইয়ে খেল শিখনেকা ক্যা কাম হে? লেকেন উহ্ শুনতা নেহি। আখেরি চাচীকা গোদপর ব্যাঠকে রোনে লাগা। ম্যায় তো উসকা মতলব সমঝতা নেহি, বিলকুল থক গিয়া।

—ঠিক হ্যায় চৌকিদার। ইয়ে খেল লেড়কা লেড়কী ছুনো শিখনে শকতা। উহ চাহে তো শিখনে দো। শরীর মজবুত হোগা, তাগাদ বাড় যায়গা আউর দিল ভি চাঙা হোগা। ঘাবড়ানেকা কোই বাতই নেহি। লেকেন ইসকে লিয়ে লাঠি আউর ছোরা চাহিয়ে। লাঠিকা লম্বাই সোহিনী সে এক ফুট উঁচা হোনা চাহিয়ে। ছোরা নকলি হো তো আচ্ছা।

—সমঝা বাবুজী, বলেই চৌকিদার বসে পড়ে।

—তোম সে হাম এক বাত পুছ্‌নে চাতা। তোমারা মুল্লুক হাম ঘুম ঘুমকে দেখনে মাঙতা। লেকেন তোম হামকো রোক দেতা—গাঁওকা বাহার যানে মানা কিয়া। ঠিক সে বাতাও চৌকিদার ইসকা ক্যা মতলব?

—কসুর তো জরুর হোতা—লেকেন, ইসমে হামারা কোই মতলব নেহি বাবুজী—ইয়ে স্রিফ সরকার বাহাতুরকা হুকুম।

—আভি ম্যায় সমঝা। শোনো চৌকিদার—হাম লোগ হামারা মাতৃভুমি ভারতকো অংরেজকা হাত সে ছিন লেকর স্বাধীন বনানে চাতা। মাতা কা জঠর সে পয়দা হোনে কা বাদ মা বাচ্চাকো ইয়ে ধরিত্রীকা মিট্টিপর ছোড় দেতা। বাচ্চালোগ ইয়ে ধরিত্রী পর খানা পিনা করতা, চলতা ফিরতা ঘুমতা আউর বড়া হোতা। তব ইয়ে ধরিত্রী—মেরা জন্মভুমি সবকো মাতা। ইনকে মুক্তিকে লিয়ে হামলোগ জান কবুল কিয়া—জিন্দিগী ভর লড়নেকো শপথ লিয়া। অংরেজকা সাথ বহুৎ রোজসে লড়াই চল রহা। অংরেজ হামারা বহুৎ আদমিকো মার ডালা, ফাঁসি দিয়া। শহিদকা খুন সে সারা ভারতভুমি লালে লাল হো গিয়া। তবভি লড়াই চলতে রহে। অংরেজ মেয়েকো বহুৎ কষ্ট দিয়া—ডাণ্ডাবেবি লাগায়া, ঠাণ্ডা ঘরমে রাখা, ইসকে বাদ বহুৎ দূর দূর গান্দা বন্দীশালামে রাখা। আভি হামকো ইধার ভেজা। হাম ভাগনে চাতা তো তোমারা সরকার বাহাতুরকা হামকো রুখনেকা কোই হিম্মত নেহি, বলেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখ মুখ লাল, মাথার বাবরি ফুলে উঠেছে, শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। ভয় পেয়ে চৌকিদার চেঁচিয়ে ওঠে—আপকো গোড় পাকড়তা—মাফ কিজিয়ে বাবুজী, মাফ কিজিয়ে।

চৌকিদারের চিৎকার শুনে তার সম্বিত ফিরে আসে। চৌকিদারের হাত ধরে সে চেয়ারে বসে পড়ে।—ডরো মৎ। তারপর হেসে বলে—কোন্তি কোন্তি হামারা য্যায়সা হো যাতা। খাওয়া শেষ করে সে উঠে পড়ে। চৌকিদার থালা বাসন নিয়ে যেতে যেতে বলে—বাবুজী দিপহরকা বাদ জমিন ঠাণ্ডা হোনেসে লক্ষ্মণ ছু'উট লেকে আয়েগা। আপ সোনিয়াকা সাথ গাঁওকা বাহার যাকে ঘুমকে আইয়ে। যাদা দুর মৎ যাইয়ে। দিক ভুল হোনে শকতা—লেকেন লেড়কী বহুৎ হোঁশিয়ার।

চৌকিদার চলে যেতেই সে দরজা ভেজিয়ে খবরের কাগজ খুলে পড়তে থাকে। পুরনো হলেও এগুলি তার কাছে নূতন। কেননা বহুদিন তার সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক নেই। সংবাদ পাঠান্তে সে বর্তমানে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি কে কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে তা বিচার বিশ্লেষণ করে মনে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়বার চেষ্টা করে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন তিনটি সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত। প্রথম : উনবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই যে জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র সহিংস সংগ্রামের শুরু তারই অব্যাহত গতি। দ্বিতীয় : জাতীয় কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত ও পরিচালিত অহিংস নীতি অবলম্বনে স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলন। তৃতীয় : রুশ মদতে মানবেন্দ্র রায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ১৯২০ সালের অক্টোবরে তাশখন্দে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি গঠিত হবার পর তাদের পরিচালিত মার্কসবাদী কমুনিষ্ট আন্দোলন—যদিও তার এখনও শৈশব অবস্থা। ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কতিপয় খ্যাতনামা বিপ্লবীদের আলোচনার পর তাঁরই সবিশেষ অনুরোধে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের সাময়িক বিরতি সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক আটক বিপ্লবীদের মুক্তি ঘোষণার অনিচ্ছা হেতু ১৯২১ সালের মধ্যেই উক্ত বিরতির অবসান হয়।

বর্তমানে দেশের এইরূপ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুদূর অজানা অচেনা মরুভূমিতে তার নির্বাসিত জীবনের কর্মহীন অলস অবসর তাকে অস্থির করে তোলে—মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পায় না। এইরূপ অশান্ত চিন্তার আবর্তে কতক্ষণ ধরে যে সে ঘুরপাক খাচ্ছে তার সে খেয়াল নেই। দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে সে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে দেখে সোহিনী বৈকালিক আহার নিয়ে এসেছে। খানা টেবিলের উপর রেখে

সোহিনী উৎসাহের সঙ্গে বলে—আপকো দো খুশ খবর শুনানে চাতা। চাচাজী ছোরা আউর লাঠি-খেল শিখনেকো অনুমতি দে দিয়া। সাথ সাথ আপকো লেকে গাঁওকা বাহার ঘুমনে কোভি সম্মতি দিয়া। অব বাতাইয়ে কবতক মেরা শিক্ষা শুরু হোগি ?

তোমারা চাচাজীসে লাঠি আউর ছোরা মিলনে কা সাথ সাথ শুরু হোগা।

—কেঁউ জী, আপকো পাশ তো লাঠি হ্যায়।

—উহু তোমারা নাপ কা নেহি।

—আচ্ছা, ইয়ে বাত। বাসন নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় জানায়—লক্ষণ উট লেকে আরহা। আপ তৈয়ার হো যাইয়ে। ম্যায় জলদি লোটেগি।

সোহিনীর কথামত তৈরি হয়ে দরজায় আগল এঁটে সে বেরিয়ে পড়ে। পড়ন্ত বেলা—রৌদ্র-দগ্ধ পৃথিবী তখনো বুঝি উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ধুঁকছে। স্কুলেব বারান্দায় এসে সে সামনের মাঠে নেমে যায়। এক প্রান্তে ছোট ছোট কাঁটা গাছ ও লতাপাতা। বিশাল শাল্মলি, বট, অশথ, আম, জাম বৃক্ষ বলতে যা বোঝায় তা এখানে বিরল। পশ্চিম গগনে অস্তাচল গমনোন্মুখ সূর্য রক্তিম তির্যক রশ্মি ছড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্নিমেষ নয়নে সে এই শুষ্ক মরুতে প্রকৃতির এক বিচিত্র লীলা দেখছে। হঠাৎ—বাবুজী শব্দে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। উট নিয়ে লক্ষণ হাজির। হৃষ্ট চিত্তে লক্ষণের হাত থেকে একটা উটের রশি নিয়ে পূর্বের তালিম মত কায়দা করে টান দিতেই উট বসে পড়ে। পরমুহূর্তে আবাব ভিন্ন কায়দায় রশির টানে উট উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু সোহিনী এখনও আসছে না কেন ? এদিকে যে সূর্য ডুবুডুবু—দিনের আলো নিবুনিবু। হঠাৎ—আই বাবুজী, সোহিনীর হাঁক শোনা যায়। দৌড়তে দৌড়তে সে এসে হাজির।—মাফ কিজিয়ে বাবুজী, থোরা দের হো গিয়া, লেকেন ঘাবড়ানেকা কোই বাতই নেহি। ইয়ে মুল্লুকমে সুরযকা রশ্মি বহুৎ দেরতক ঠারতা। সোহিনীর চলনে বলনে সপ্রতিভতার সঙ্গে পোষাক-আশাকে পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। ঘাগড়া ও চোলির পরিবর্তে সালোয়ার কামিজ এবং একটা উড়নি কাঁধের উপর কোনাকুনি পরে নিচে একটা গেড়ো—যেন এক ডাগর রাজপুতানী! উটের কাছে এসে বলে—ম্যায় হীরাকা ওপর চড়নে মাঙতা, আপ মোতিকা ওপর সোয়ারি হো যাইয়ে।

লক্ষণকে অপেক্ষা করতে বলে উভয়েই উটে চড়ে স্কুলের চৌহদ্দি ছেড়ে

পশ্চিমাভিমুখী চলতে থাকে। দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ-ক্লিষ্ট গৃহবন্দী জনগণ এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসেছে। ছেলেপুলেরা নগ্ন অনাবৃত দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মেয়েরা মলিন ছিন্ন বস্ত্রে দেহাবৃত করে মাথার উপর প্রকাণ্ড কলসী চাপিয়ে সার বেঁধে জলকে চলেছে। এক অদ্ভুত দৃশ্য! ক্ষেতখামার, কলকারখানা নেই, তার উপর জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ যে জল তাও দুরূহ-লভ্য। কি ভাবে এরা জীবিকা অর্জন ও নির্বাহ করে সেটা তার নিকট দুর্বোধ্য। তাদের এই কঠোর জীবনযাপনের প্রণালী ও দুস্থ অবস্থা দেখে তার মনে বেদনা জাগে। এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে জনবসতি বিরল থেকে বিরলতর হয়ে আসে। তারপর আর কিছু নেই। যত দূর অবধি দৃষ্টি চলে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত গাছপালা হীন শুষ্ক মরু আর তার শেষ প্রান্তে—দিক্‌বলয়ে অস্তাচলগামী বিলীয়মান সূর্যের শেষ রশ্মি ঊর্ধ্ব-গগনে সোনাগুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। শুষ্ক মরু অঞ্চলের এক পরম বিস্ময়কর দৃশ্য। মানব সভ্যতার আদি থেকে স্তবে স্তোত্রে, গানে গাথায়, স্থাপত্যে ও নানা শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মানুষ সূর্য-বন্দনা করে আসছে। তার চলার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে সে ঐ দিকে চেয়ে থাকে।

চলতে চলতে সোহিনী হঠাৎ পেছন ফিরে চেয়ে দেখে বাবুজী নেই। সন্ধ্যা তার অবগুণ্ঠনখানি মেলে দিয়ে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ঢেকে ফেলছে। লক্ষ্য করে দেখে বাবুজী দূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। বোঝা যাচ্ছে না। সোহিনী উটের মুখ ঘুরিয়ে—বাবুজী, ডাক দিয়ে ছুটে আসে। —আপ ক্যা দেখ রহে?

—কুছ্ নেহি। উটের রশি ধরে টান দিয়ে সে চলতে শুরু করে। তার পাশে চলতে চলতে সোনিয়া বলে—বাবুজী, ইধারকে ডাইনে দু'ক্রোশ ফরাক মেরা পিতাজীকা গাঁও। চাচাজীকো বোলকে একরোজ ম্যায় আপকো লেকে উধার যাউঙ্গা।

—ঠিক হ্যায়, জরুর যায়েগা। তোমারা মুল্লুককা সব কুছ হাম দেখনে চাতা। কথার ফাঁকে চেয়ে দেখে সূর্য ইতিমধ্যে পশ্চিম গগনে অন্তর্হিত। কিন্তু তার দীপ্তি ঊর্ধ্ব গগনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর নিম্নে, ধরিত্রীর বিস্তীর্ণ বালুভূমির উপর তা প্রতিভাত হয়ে স্বচ্ছ গৈরিক আভা ছড়িয়ে রাতের অন্ধকার দূরে সরিয়ে রাখছে।

চলতে চলতে সোহিনী হঠাৎ উটের মুখ ঘুরিয়ে বলে—আভি ওয়াপস

চলিয়ে, নেহি তো চাচাজী বহুত সোচ্‌তে রহেগা। সোহিনীর দেখাদেখি সেও উটের মুখ ঘুরিয়ে চলতে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। সম্মুখে যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে শুধু ধু-ধু মরুপ্রান্তর দিগন্তে মিশে আছে। কোথা থেকেও কোন আলোর ফুলকি কিংবা জনবসতির চিহ্ন নজরে আসছে না। কোন দিক থেকে এসেছে কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে—কিছুই তার ঠাহর হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে যদি সোহিনীর দিক্‌ভ্রম ঘটে তাহলে কি হবে? মনের ভাব গোপন রেখে সে সোহিনীর পাশে পাশে চলেছে। লক্ষ্য করে সোহিনীর চোখ মুখে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ কিংবা ভয়ভীতির বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই। তার দিকে চেয়ে সে উৎফুল্ল কণ্ঠেই বলে—বাবুজী কাল তো আপ হামকো ছোরা আউর লাঠি খেলকা দীক্ষা দেগা। হাম তো আপকো এক জবরদস্ত চেলা বনেগি—ইয়ে, মেরা ধ্যান হ্যায়। আপ ইয়ে খেয়াল মে রাখিয়েগা, বলেই সে উটের রশিতে টান দিয়ে দ্রুত চলতে থাকে। দিনের শেষ আভাটুকু অন্ধকার গ্রাস করেছে। এই মরুভূমিতে পথ ভুলে নানা বিপদ, আপদ, বিপত্তি বিপাক এবং মর্মান্তিক মৃত্যু কাহিনী তার জানা আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐ সব ভয় ভীতিকর কাহিনী তার অবচেতন মনে হয়তো একটা অশান্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফলে সে সোহিনীর কথার জবাব না দিয়ে তার সঙ্গে সমান গতিতেই চলেছে। কিন্তু চলতে চলতে যেই মুহূর্তে দূরে একটা আলোর ফুলকি তার নজরে আসে সেই মুহূর্তে দিক্‌ভ্রমের ফাঁড়াটা কেটে যায়। মনের অবস্থা স্বাভাবিক হতেই সে সোহিনীকে জিজ্ঞাসা করে—তোম ক্যায়সে ইয়ে আঁধার মে দিশা ঠিক করকে চলতা? মেরা তো কুছ্‌ মালুমই নেহি হোতা।

—কেঁউ জী, য্যায়সে গাঁও সে নিকালা, এ্যায়সে সিধা গাঁও মে লোট রহা।

সোহিনীর বক্তব্যে দিক্‌ নির্ণয়ের ব্যাপারটা তার নিকট অস্পষ্টই থেকে যায়। ততক্ষণে তারা গাঁয়ে প্রবেশ করেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হয় না। অন্ধকার আরো জাঁকিয়ে বসেছে। বস্তির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বুঝি ঘরের বাইরে। হেথা হোথা দু'একটা আলো টিম টিম করে জ্বলছে। স্কুল প্রাঙ্গণে এসে সে উট থেকে নেমে পড়ে। লক্ষ্মণ স্কুলের দাওয়ায় নিদ্রিত। সোহিনী উট থেকে না নেমেই—লক্ষণ, লক্ষণ ডাকতেই সে উঠে পড়ে।—চলো শুনেই সে বারান্দা থেকে নেমে উটে চড়ে সোহিনীর অনুগমন করে।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ উটে চড়ে তার পায়ে ও মাজায় আড়ষ্টত বোধ হচ্ছিল। বারান্দায় উঠে সে জোর কদমে হাঁটতে থাকে। চৌকিদার এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করে—ক্যা বাবুজী মহারাজ —সফর করকে আনন্দ হুয়া ?

—হাঁ, লেকেন হামারা নামকা পাত্তা তোমরা ক্যায়সে আ গিয়া ? চৌকিদারের মুখে নিজের ডাক নাম শুনে তার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

চৌকিদার তার মুখের ভাব দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলেও মিটিমিটি হেসে বলে—কসুর হো তো মাপ কি জীয়ে। লেকেন মেরা কহেনা হে কি—আপ চলা যানে কা বাদ বড়া থানাসে এক কনস্টেবল ইধারকা পুলিশ চৌকিসে এক সিপাহী লেকে হেড মাষ্টারকা পাশ আয়া থা। এক মাহিনা হো চুকা আপনে ইধার আয়া। পুলিশ মাসহারা লেকে আপকো ভেট করনে আয়া। আপ নেহি—মুশকিল কা বাত। পুলিশনে পুছা—বাবু কাহা? হামারা জবাব শুননেকা বাদ পুলিশ আপকো নাম লেকে রূপয়া হেডমাষ্টার সাবকো দেকে রসিদ লেকে চলা গিয়া।

—আচ্ছা, ইয়ে বাত। আভি হাম সমঝা।

—কুটিকা অন্দর লণ্ঠন জ্বালাকে রাখ দিয়া। আপ গোসল বনাইয়ে, বিশ্রাম করিয়ে। হাম ঠিক সময় পর খানা লেকে আয়েগা, বলেই চৌকিদার চলে যায়।

স্নানাদির পর সে স্কুলের বারান্দার চেয়ারে এসে বসে। এখানের এই একঘেয়ে অলস মুহূর্তগুলিকে যে কর্মদ্বারা ভরে তুলবার কথা ভেবেছে তা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা খুবই অনুজ্জ্বল। এই শুষ্ক কঠিন দেশে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন, অশিক্ষা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জন-মানসে স্বাধীনতার মুক্তির বাণী এবং পরাধীনতা গ্লানির মধ্যে প্রভেদ হয়ত বুঝতে পারবে না। এসবের উপরে আছে স্বার্থান্বেষীদের ধর্মবুলির আড়ালে আবডালে ভণ্ড যুক্তির বেড়াজাল—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, জরা, আদিব্যাধি, এমন কি না খেয়ে এবং অচিকিৎসায় মরা ইত্যাদি সবই যখন পরমাত্মার ইচ্ছাধীন তখন আর দুঃখ শোক করে লাভ কি ? এর ফলে জনমানসে চিন্তার দৈন্য ও পুরুষাকারে অভাব ঘটে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কি হবে, কিরূপ নেবে সে চিন্তা তার

অন্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। নিজেকে যারপরনাই বিচলিত এবং অসহায় বোধ করতে গীতার বাণী :

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ-সুখং ধীরং……॥

স্থিতধী ব্যক্তি সমস্ত বিষয়-স্পর্শ জনিত সুখদুঃখ শান্তভাবে গ্রহণ করেন…স্মরণে আসতেই মনের অস্থিরতা হ্রাস পায়। চেয়ার ছেড়ে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে। চৌকিদার খানা নিয়ে এসে বলে—চলিয়ে বাবুজী মহারাজ, ঘব চলিয়ে। খেতে খেতে সে চৌকিদারকে তার লেড়কির জন্য ছোরা লাঠি আর ঘরের বন্দোবস্ত করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

—সব কুছ হো যায়েগা, লেকেন বাবুজী মহারাজ ইয়ে তো মেরা ধ্যানমে নেহি আতা লাঠি আউর ছোরা-খেল শিখকে ক্যা হোগা। লেড়কি তো বচপন্‌সে থোড়া জিদ্দি, তবভি উমরকা হিশাবসে জাদা হুঁশিয়ার আউর সমজদার। লিখাই পড়াই মে ভি বহুৎ আচ্ছা। ইয়ে স্কুলকা সভি পাঠ তো খতম কর চুকা। নজদিক কোই বড়া স্কুল নেহি যো উধার ভেজে। হামারা মুল্লুক মে তো ছোটি ছোটি লেড়কি কো সাদি হোতা। ম্যায় তো উসকো আভি সাদি দেনে চাতা লেকেন জেনানা রাজী নেহি হোতি। বোলতি আউর বড়া হোনে দো।

—শোন চৌকিদার, লিখাপড়া য্যায়সে বুদ্ধি খোল দেতা, এলেমদার বনাতা, লাঠি আউর ছোরাকা খেল শিখনা ভি এক জবরদস্ত কসরৎ হ্যায়, ইসমে তাগাদ বাড় যাতা। হামলাবাজ বদমাসকো ভি রোখ দেনে সকতা। তোমারা ঘাবড়ানেকা কুছ্‌ নেহি। যদিও সোহিনীর ছোরা ও লাঠি চালনা শেখার পেছনে কিসের প্রেরণা খেলা করছে সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না।

—ঠিক হ্যায় বাবুজী মহারাজ। থালাবাসন নিয়ে যাবার কালে বলে আগামীকাল বিকেলে সে মহারাজকে নিয়ে বেরবে। ডাক ঘর, পুলিশ চৌকি দেখিয়ে যে ভদ্রলোক তাকে সংবাদপত্র দেন তার সঙ্গে মোলাকাত করাবে। তার সম্মতির অপেক্ষা না করেই চৌকিদার বেরিয়ে যায়।

চৌকিদার চলে যেতেই সে ঘর ছেড়ে স্কুলের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছে। সে মাঠে নামে। অন্ধকার রাত্রি তবে বাংলার

মতো অতো ঘন নিরেট নয়—দৃষ্টি ফিরে আসে না। আকাশ অস্বচ্ছ। স্থল ও অন্তরীক্ষের মধ্যে কেমন যেন একটা পাতলা ঘোলাটে আবরণ ভেসে বেড়াচ্ছে। নক্ষত্রগুলি অনুজ্জ্বল, নিহারীকা অদৃশ্য। রাতের প্রহরে প্রহরে পাখীর ডাক শোনা যায় না। ফলে রাত্রি কত অনুমান করা অসম্ভব। মাঠের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘর থেকে খাটিয়া এনে শুয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ খাটিয়ার অদূরে একটা খচ্‌খচ্‌ ভোঁস-ভোঁস শব্দে সে জেগে উঠে বসে। শব্দটা তখনো হচ্ছে। শিয়রের নিচ থেকে টর্চটা নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে আলো ফেলে। আলো দেখা মাত্রই কুকুরের মতো একটা জন্তু পালিয়ে যায়। পলকের-তরে দেখা—কুকুরের মতো দেখালেও বুঝি কুকুর নয়। তবে কি শেয়াল জাতীয় কিছু। আশ্চর্য বনবাদার ও জল হীন শুষ্ক মরুর প্রচণ্ড উত্তাপে এরা কোথায় কিভাবে থাকে, কি খেয়ে বাঁচে। এও এক দুর্বোধ্য ব্যাপার ও বিস্ময়। এসব চিন্তার মধ্যে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের কাকের কর্কশ কলরবে ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে পড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম, লাঠি-খেলা ও দৌড়নোর পর স্কুলের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। তারপর ঘর থেকে গামছা নিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ফিরে আসে। তার বর্তমান কর্মহীন ক্লান্তিকর অবসন্ন মুহূর্তগুলির অবসাদ ও জড়তা এড়াবার ও প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে সে গীতাপাঠে মনোনিবেশ করে। পার্থকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আসনে বসেই সে আগন্তুককে ভেতরে আসতে আহ্বান করে। দরজা ঠেলে হেডমাষ্টারকে প্রবেশ করতে দেখে সে আসন থেকে উঠে—আইয়ে বৈঠিয়ে। বলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে চেয়ারে বসতে অনুরোধ করে। হেডমাষ্টার বসতেই সে গীতাখানা স্যুটকেশে রেখে পুনরায় আসনে এসে বসে। হেডমাষ্টার নিজ-ভাষার সঙ্গে টুকরো টুকরো ইংরেজি মিশিয়ে যা বললেন তা হলো সরকারের বন্দী হয়েও তিনি এই ক্ষুদ্র মরু-বসতির একজন সম্মানিত অতিথি। সময়ের অভাবে মোলাকাত হয় না। এজন্য তিনি খুবই দুঃখিত। মাষ্টারি ছাড়াও তাকে গ্রাম পঞ্চায়েতি কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। আজ পবিত্র পরব উপলক্ষে তার বাড়িতে দেওতা কা পূজা, উৎসব, খানা-

পিনা। দয়া করে (রাজবন্দী) মহাশয় এই উৎসবে যোগদান করলে তিনি ও বস্তিবাসী সকলেই বাধিত হবে। কথা শেষ করে হেডমাষ্টার নমস্কার জানিয়ে যাবার সময় বলে যান যে চৌকিদারই তাকে নিয়ে যাবে যাতে তার কোন তকলিফ না হয়।

হেডমাষ্টারের সঙ্গে দরজার বাইরে এসে সে তাঁকে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢোকবার সময় পেছন থেকে ডাক শুনে চেয়ে দেখে সোহিনী নাস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে সে খাবার রেকাবিখানা টেবিলের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। সে চেয়ারে বসার উপক্রম করতেই—জাড়া ঠাড়িয়ে, বলেই সোহিনী সামনে এসে উবু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে—গুরুজী মহারাজ সম্বোধন করে উঠে দাঁড়াতে তার হাত স্বভাবতই সোহিনীর মাথা স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ থেকে—'শুভমস্তু' উচ্চারিত হয়। সে চেয়ারে বসতেই সোনিয়া অদূরে তার পায়ের কাছে বয়ে পুনরায় প্রফুল্ল কণ্ঠে—গুরুজী মহারাজ, উচ্চারণ করে।

সে স্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—তোম্ ইয়ে ক্যা বোল রহা সোহিনী ?

—জী হাঁ, আজসে আপ মেরা গুরু, দীক্ষাগুরু। আজ বহুৎ শুভ দিন। মেরা সফলতা জরুর মিলেগি, আশা পুরণ হোগী।

—হাম ভি চাতা। লেকেন তোম একেলী। তোমারা একেলী হিম্মৎছে ক্যা হোগা ? কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব এনে বলে—ডাকুকা সাথ লড়নে চাহিয়ে তো তোমকো ভি ডাকুকা মাফিক এক জবরদস্ত লড়াকু দল তৈয়ার করনে পড়েগি। য্যায়সে উসকো সাথ লড়কে তোম মাতাজীকো ছিন লে আনে শকতা।

—ইয়ে তো সাচ্ বাত। পাহিলেতো আপ হামকো এক জবরদস্ত লড়নেওয়ালী বনাইয়ে।

—আউর এক বাত—ছোরা, লাঠিকা সাথ সাথ তোমকো আচ্ছা বন্দুকবাজভি হোনে পড়েগি। নেহি তো কুছ্ নেহি হোগা—ইয়ে ধ্যান মে রাখো।

—ম্যায় কুর্সিস করুঙ্গা, বাবুজী মহারাজ। থালা নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় জানায় যে চাচাজী ছোরা লাঠি সহ তাকে নিয়ে তিন বাজে স্কুল ঘরে আসবেন।

সোহিনী বেরিয়ে যেতেই সে ভাবে এই বয়সেই মেয়েটা আশ্চর্য রকম দৃঢ়চিত্ত জেদি ও তেজি। ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারলে একে এক কঠিন

ইস্পাতে তৈরি করা অসম্ভব কিছু নয়। নিরাশার অন্ধকারে সে বুঝি এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইংগিত দেখতে পায়। ডাকু লুটেরার বিরুদ্ধে মেয়েটির প্রচণ্ড বিদ্বেষ, হিংসা ও প্রতিশোধ-পরায়ণতার মধ্যে যদি সুকৌশলে ধীরে ধীরে বৃটিশ ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে—কেননা তার পিতার মৃত্যু এবং মাতার অপহরণ ইত্যাদি অপকর্মের জন্য পুলিশের ব্যর্থ-তাই দায়ী—বিদ্বেষ বীজ বপন করা যায় তা'হলে এই নবীন তরু শাখা প্রশাখা মেলে এক বিরাট বিপ্লবী মহীরুহে পরিণত হতে পারে। এ ভাবেই তার নির্বাসিত জীবনের অলস অবসর মুহূর্তগুলিকে নিরলস প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা ভরিয়ে তুলে বিরাট এক কর্মযজ্ঞে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনে কিভাবে তাকে শনৈঃ শনৈঃ এগোতে হবে তার একটা তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা মনে মনে করে সে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়।

বাইরে স্কুল ছুটির কোলাহল কানে আসে। ঘর থেকে বেরতে গিয়ে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে থমকে দাঁড়ায়। মার্তণ্ডদেব ইতিমধ্যেই প্রভঞ্জন সহ লু ইত্যাদি সঙ্গী সাথী নিয়ে তাঁর তাণ্ডবের মহড়া শুরু করেছেন। চাইতে গেলে চক্ষু যেন অগ্নি-শলাকা বিদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই পাইচারি করতে থাকে। বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে হাওয়ার দাপট ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রকৃতির এতটা উগ্রমূর্তি ইতিপূর্বে সে প্রত্যক্ষ করেনি। এই অবস্থায় করবার এমন কি ভাববারও যেন কিছু নেই। নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় নিরবলম্ব মনে হয়। শরীরের ওপর এর প্রতিক্রিয়া বেশ অনুভূত হচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একগ্লাশ জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে শুয়ে পড়ে। হয়ত তন্দ্রাবিষ্ট হয়েছিল। দরজায় খটাখট শব্দ শুনে উঠে বসে। দরজা খুলে চৌকিদারের ভিন্ন মূর্তি দেখে সে অবাক। পায়ে তার জিবতোলা নাগরা, মাথায় পেচানো কাপড়ের বিরাট এক পাগড়ি। খানা টেবিলের ওপর রেখে সে সরে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে তার পোষাকআশাকের পরিবর্তনের সঙ্গে থালায় রকমারি ব্যঞ্জনাদিও পরিবেশিত হয়েছে। খেতে খেতে সে সহাস্যে বসে—ক্যা বাৎ চৌকিদার, আজ তোমারা বহুৎ জেল্লাই মালুম হো রহা।

—জী হাঁ, আজ হামলোগকা বহুৎ বড়িয়া পড়ব। ইস লিয়ে খানা-পিনা, সাজ পোষাক সব কুছ আচ্ছাই হোনা চাহিয়ে। আউর এক বাত বাবুজী মহারাজ—আজ সে গর্মি বাড়তেই রহেগা। সাথ সাথ হাওয়া ভি জোর

চলেগা, আগভি ছুটতে রহেগা। ইস্‌মে আগ বদনমে লাগ যায়েগা তো বহুৎ খতরা পয়দা হোগা। এগারো সে চার বাজনেকা অন্দর ঘরসে নিকালনা নেহি চাহিয়ে। পানিভি কাফি পিনা জরুরৎ হ্যায়—খেয়াল রাখিয়ে গা। খাওয়া শেষ হতেই থালা বাসন নিয়ে যাবার সময় চৌকিদার বলে যে সে বেলা চারটার পর সোনিয়াকে নিয়ে স্কুলে আসবে। তিনি যেন তৈয়ার হয়ে থাকেন।

চৌকিদার প্রদত্ত আবহাওয়া সংবাদ তার নিকট আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। এতো নির্জন কারাকক্ষে বন্দী থাকার সামিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে ঘরময় পায়চারি করতে করতে গীতার বাণী :

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

মনে পড়তেই তার মনের প্রশান্তি কিছুটা ফিরে আসে। অতপর বিছানায় গা এলিয়ে চিন্তাভাবনাহীন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলে দেখে চৌকিদার। তার নিজের অপ্রস্তুতির জন্য লজ্জা বোধ হয়।—আভি আ রহা, বলে চৌকিদারকে বিদায় দিয়ে তড়িঘড়ি মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে বাইরে বেরতেই মার্তণ্ডের তাণ্ডবের শেষ আঁচ তার গায়ে লাগে।

স্কুলে পৌঁছেই দেখে চৌকিদার তার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে—আইয়ে, বলেই স্কুল-ঘরে নিয়ে যায়। ঘরটা বেশ বড়। ক্লাশের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি একদিকে জড় করা। ঘুরতে-ফিরতে ছুটতে অসুবিধা হবে না। সোহিনীর পরনে আঁট পাজামা, কুর্তা। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে ছোরা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই সে নিকটে এসে ছোরা লাঠি মাটিতে রেখে হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে। সে গম্ভীর কণ্ঠে—শুভমস্তু, সিদ্ধির্ভবতু, উচ্চারণ করে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে। অতপর সোহিনীকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে বলে নিজেকে স্বীয় লাঠির মাপের দূরত্বে সরিয়ে নেয়। প্রথমে কিভাবে লাঠি মাঝখানে ধরতে, কিরূপ পদক্ষেপে এগোতে পিছুতে, ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে হয় তা সোহিনীকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে বলে। তারপর তার অনুকরণ করে সোহিনীকে চলতে বলে মুখে এক দো, এক দো, ডাহিন বাম, ডাহিন বাম, ঘুম যাও উচ্চারণ করে। আবার একইভাবে সম্মুখে মুখ রেখে পেছনে চলার তালিম দেয়। এ-

তারপরই অনেকক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষা চলাকালে সে আচম্বিতে—রোখ যাও, বলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সোহিনীও তার অনুকরণে থমকে দাঁড়ায়।—বাহবা বাহবা, বলে সে তাকে উৎসাহিত করে।

চৌকিদার এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে সোনিয়াকে বাবুজীর শিক্ষাদান পদ্ধতি লক্ষ্য করছিল। বাবুজী থেমে যেতেই সে তার কাছে এসে বলে—ম্যায় অব যা রহা। পাঁচ বাজে আকে আপকো লেকে বাহার যাউঙ্গা। চৌকিদার চলে যেতেই সোহিনীকে পুনরায় কদম কদম আগু পিছু হওয়া এবং ঘুরপাক খাওয়ার সঙ্গে কিভাবে লাঠি ঘোরাতে হয় তা ধীরে ধীরে নিজে করে দেখিয়ে দেবার পর তাকে তার অনুকরণে লাঠি ঘোরাতে বলে। কিন্তু সোহিনীর হাত ঠিকমতো ঘুরছে না। সে দাঁড়িয়ে পড়ে। —ক্যা বাত সোহিনী? উত্তরে সে বলে—মেরা হাত ঘুমতাই নেহি বাবুজী, থক যাতা।—আচ্ছা, বলেই সে চক্রাকারে কিভাবে ডান এবং বাঁ হাত ঘোরাতে হয় তা দেখিয়ে দিয়ে তাকে অভ্যাস করতে বলে। এই ফাঁকে সে নিজে কতক্ষণ লাঠি ভেঁজে নেয়। সোহিনী পরিশ্রান্ত হয়েছে বুঝতে পেরে সেদিনের মতো তার প্রশিক্ষণের ক্ষান্তি দেয়। আগামী দিন এসময়েই তাকে এখানে আসতে বলে সে আপন ডেরায় ফিরে যায়।

কিছুসময় বিশ্রামের পর সে তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। উত্তপ্ত প্রভঞ্জন নেই বটে কিন্তু তার আঁচ তখনও গায়ে লাগছে। উর্ধ্বাকাশ ধূলিধূসর। হন্তদন্ত হয়ে চৌকিদার এসে হাজির।—থোড়া দের হো গিয়া বাবুজী, মাফ কিজীয়ে। আর দেরি না করে সে চৌকিদারের সমভিব্যহারে গাঁও পরিক্রমার সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বেরিয়ে পড়ে। যে পথ দিয়ে চলেছে তার উভয় দিকেই কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় আর ঘরবাড়ি সব প্রায় একই ছাঁচের। পরিবেশ কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং লোক-জনের বসনভূষণ ও ভদ্রোচিত। গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তের জনবসতি থেকে একেবারে আলাদা। এদিকটা ভদ্রজন এবং ঐ দিকটা গান্ধিজীর সংজ্ঞানুসারে হরিজন পল্লী। যদিও এদেশের সমাজে শ্রেণীভেদ বিষয়ে সে অজ্ঞ। পথে যেতে যেতে দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয় তাদের কেউ কেউ —নমস্তে, জানিয়ে সম্ভাষণ করে। বোধহয় এরা তাকে পূর্বে দেখেছে কিংবা তার পরিচয় জানে। এভাবেই চলে তারা পুলিশ চৌকিতে এসে পৌছে। স্থানটা মনে হলো গ্রামের শেষ প্রান্তে। চৌকির ঘরখানাতে সরকারি ছাপ সুস্পষ্ট। বারান্দায় একটা বড় ঘণ্টা ঝুলছে। এক সিপাহী

লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে একটা লম্বা টুলের ওপর বসে আছে। রাজস্থানী বলে মনে হয় না। চৌকির কাছে পিঠে বোধ হয় কোথাও কুয়ো আছে। মেয়েরা কলসী মাথায় জলকে চলেছে এবং ফিরে যাচ্ছে। তবে কি এই সারা অঞ্চলে ঐ একটিমাত্র কুয়ো! চৌকিদার সিপাহীকো নমস্তে জানিয়ে বাঙালী বাবুজী মহারাজার পরিচয় দেয়।

—আইয়ে বাবুজী বৈঠিয়ে। চৌকিদার তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

বাবুজীর হয়েই চৌকিদার জবাব দেয়—মাপ কি জীয়ে সিপাহীজী, আউর বহুৎ আদমীকো ভেট করনা হে। বড় মাষ্টারজীকা মোকামভী যানে পড়েগা। অতপর নমস্কার বিনিময়ের পর চৌকিদার তাকে নিয়ে ডাকঘর অভিমুখী রওনা দেয়। এসে দেখে বন্ধ—মাষ্টার নেই। সেখান থেকে যে ভদ্রলোক তাকে সংবাদপত্র দেন, তার বাড়ি। তিনিও নেই। সর্বত্রই বিফল মনোরথ হয়ে চৌকিদার ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে বলে—মালুম হোতা সব কোই বড় মাষ্টারজীকা ঘরমে গিয়া।

দিনের শেষ আভাটুকু নিঃশেষিত। রাত্রি তার কালো অবগুণ্ঠনখানি মেলে দিয়েছে। তবে অন্ধকার ঘন ঘোরঘুট্টি নয়। অজানা পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখে আকাশের রঙ ঘোলাটে ধূসর। তারই ভেতর দিয়ে দু'একটা উজ্জ্বল তারার ঝিকিমিকি নজরে আসছে। হেডমাষ্টারের বাড়ি পৌঁছে দেখে লোকজনের বেজায় ভিড়। তাকে দাঁড় করিয়ে চৌকিদার হেড মাষ্টারকে ডেকে আনে।—সুক্রিয়া, আইয়ে বৈঠিয়ে বলেই হেডমাষ্টার তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে বসতে অনুরোধ করেই তিনি চলে যান। সেখানে বসে হেজাক লণ্ঠনের আলোতে দেখতে পায় দূরে সিংহাসনে আসীন কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি। পুরোহিতদের মন্ত্রোচারণ শোনা যাচ্ছে। সামিয়ানার নিচে প্রথম সারিতে মেয়েরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বসেছেন। তাদের পেছনে বেটা ছেলেরা। বিশেষ অতিথি অভ্যাগতদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্বীয় অবস্থিতি থেকেই বোঝা গেল। পূজো শেষে পুরোহিতরা উঠে দাঁড়াতেই জনতা সমবেত কণ্ঠে দেবতার নাম নিয়ে জয়ধ্বনি দেয়। অতপর বয়স্কা মেয়েরা গান গেয়ে দেব-মঞ্চ দু-পাক ঘোরে। বেটাছেলেরাও জয়ধ্বনি দিতে দিতে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে। পূজার্চনা শেষে ভোজন। প্রথমে প্রত্যেকের হাতে একটা করে শালপাতার ঠোঙা। তারপর খাবার। পরিবেশিত

খাদ্য অধিকাংশই ছাতুর তৈরি। অবশেষে যাবার পালা। চৌকিদার এসে বলে—চলিয়ে বাবুজী। কিছুদূর যেতেই সোহিনী এক বয়স্কা মহিলাসহ তাদের অনুসরণ করে। অনুমান অবগুণ্ঠনবতী মহিলা তার চাচী। স্কুল প্রাঙ্গণে এসেই নমস্তে, বলেই তারা বিদায় নেয়। ঘরে না ঢুকে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর সে খাটিয়া বাইরে এনে শুয়ে পড়ে।

এভাবেই তার সুদূর রাজস্থান মরু অঞ্চলের বৈচিত্রহীন একঘেয়ে অন্তরীণ দিনগুলি অতিবাহিত হচ্ছে। সকালে শরীর চর্চার পর উষ্ট্রারোহণে ঘণ্টাখানেক ভ্রমণ। বিকালে সোহিনীর শিক্ষা, তারপর কখনো-সখনো একা কিংবা তার সমভিব্যহারে উটে চড়ে মরু-ভ্রমণ। একা হলে দিক ভ্রমের ভয়ে মরুতে বেশিদূর না গিয়ে গাঁয়ের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ানো। সোহিনী সঙ্গে থাকলে মরুর দূর দূর অঞ্চল ভ্রমণের ফলে প্রত্যাগমণে অনেক সময় রাত্রি হয়ে যায়। ছোরা খেলায় সোহিনীর উন্নতি হলেও লাঠিখেলায় আশানুরূপ নয়। এরজন্য হাতের কব্জি মজবুত করতে তাকে নানাপ্রকার বায়ামাভ্যাস করনো হচ্ছে। একদিন সোহিনী মহা উৎসাহে পাখিমারা এক পুরনো বন্দুক নিয়ে উপস্থিত হতেই সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—ইয়ে তোমারা ক্যায়সে মিলা?

—মিলাহে বাবুজী বহুৎ পেরেসানছে মিলা। ইসকো লিয়ে ম্যায় তো চাচাজীকো বহুৎ রোজছে খোশামোদ করনে লাগা। লেকেন চাচাজী শুনতাই নেহি! আজ উনকো গোড় পাকড়কে রোনে লাগা পর উনোনে ইয়ে মেরে হাতপর দিয়া। অব আপ মেরেকো এক আচ্ছা বন্দুকবাজ বনাইয়ে। ওর চোখে মুখে উৎসাহ উদ্দীপনা যেন ফেটে পড়ছে!

এটা যে সত্যিকারের লড়াইয়ের বন্দুক নয় তো প্রকাশ না করে আশ্বাসের সুরে বলে,—ঠিক হ্যায় সোহিনী। পহিলে তো গুলি নিকালো। উসকে বাদ একটো বড়া কাগজ, কালি, লোহেকা কাঁটা আউর এক হাতুড়ি লে আও। কামিজের পকেট থেকে এক প্যাকেট সিসার ছড়রা-গুলি বার করে দিয়ে উপরুক্ত জিনিশগুলি আনতে সে দৌড়ে চলে যায়। বন্দুকটা হাতে নিয়ে সে নেড়েচেড়ে দেখে। পুরনো হলেও সযত্নে রেখেছে। চাপ দিতেই নলটা খুলে যায়। তারপর পিন, স্প্রিং, লক ইত্যাদি পরীক্ষা করে গুলি ভরে নলটা তুলে তাক করে ট্রিগার টিপতেই ছড়রাটা ছুটে গিয়ে দেয়ালের যথা স্থানে বিদ্ধ হয়। যাক, বন্দুকটা প্র্যাকটিস করাবার মতো ভালো অবস্থাতেই আছে। সোহিনী ফরমাশ

মতো জিনিশপত্র নিয়ে হাজির। তাকে নিয়ে একপাশে জড় বেঞ্চির ওপর কাগজখানা রেখে তার মাঝখানে কালি দিয়ে কিভাবে ছোট্ট গোলাকার একটা চাঁদ আঁকতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে সোহিনীকে অপেক্ষা করতে বলে সে বাইরে চলে যায়। সেখান থেকে একটা গাছের ডাল কেটে কলমের মতো বানিয়ে এনে তার হাতে দিয়ে পূর্ব নির্দেশ মতো কালি দিয়ে একটা চাঁদ আঁকতে বলে। আঁকা শেষ হতেই সেটা নিয়ে তাকে দেয়ালে ধারে গিয়ে তার মাথা সমান উঁচু করে ধরতে বলে। সে তখন কাগজটার চার কোণে চারটি পেরেক ঠুকে সেটাকে দেয়ালে সেঁটে দেয়। সেখান থেকে মাপ মতো দূরত্বে পিছে হটে সোহিনীর হাতে বন্দুক তুলে দেয়। কিভাবে দাঁড়িয়ে সে । ধরে তাক করতে, খুলতে বন্ধ করতে এবং গুলি ভরে ঘোড়া টিপতে হয় সে সব ক্রিয়া কৌশল তাকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়। তারপর গুলি ভরে দেয়ালে আঁটা কাগজটার গোল কালো দাগ লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপতে বলে। এভাবেই বার তিনেক তালিম নেবার পর সেদিনকার মতো সোহিনীর শিক্ষা শেষ হয়। সোহিনী বন্দুক কাঁধে নিয়ে অন্যান্য জিনিষপত্র সহ বীরদর্পে খোশ মেজাজে—নমস্তে বাবুজী মহারাজ বলে বেরিয়ে যায়।

এসব শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে সোহিনীর অন্তরে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বীজ বপণের চেষ্টারও বিরাম নেই। তার পিতৃ-হত্যা মাতার অপহরণ জনিত অপরাধে দস্যুদের খুঁজেপেতে তার মাকে মুক্ত করা এবং তাদের শাস্তি দানের গাফিলতি ও ব্যর্থতার জন্য সরকার ও তার পুলিশ বাহিনী যে কতদূর দায়ী তা সে সোহিনীর নিকট ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ব্যক্ত করে চলেছে। এর একমাত্র প্রতিবিধানের পন্থা হলো তাকেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটা দল গড়ে অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হয়ে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়া। তবেই তার পিতার মৃত্যু এবং মাতার অপহরণের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব। পাকেপ্রকারে সে সোহিনীকে এভাবেই উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আশ্চর্য, তার এত কথা সোহিনী মাথা নেড়ে নেড়ে শুধু শুনছে। কোন উত্তর কিংবা আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করেনি। কথা কিংবা কার্যের মাধ্যমেও তার ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করেনি এবং কার্যত কোন বন্ধুবান্ধব নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়নি। সুতরাং সোহিনীর মাধ্যমে কোন প্রকার বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলার আশাও বুঝি আকাশ কুসুমে পর্যবসিত হয়। তথাপি সে হাল

ছাড়েনি—সোহিনীকে যথাসাধ্য অস্ত্র-চালনায় সুশিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সোহিনীও টারগেট সুটিং, ছোরা খেলায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে যদিও লাঠি খেলায় তদরূপ নয়।

এভাবেই এখানে তার নির্বাসিত জীবনের তিনমাস অতিক্রান্ত হয়ে চতুর্থমাসে পড়েছে। এমনি সময় একদিন সকালবেলা পুলিশ চৌকি থেকে এক সিপাহী হেডমাষ্টার সমভিব্যহারে এসে যে অপ্রত্যাশিত সংবাদ পরিবেশন করে তাতে সে উল্লসিত হয়ে স্বস্তি অনুভব করে। তার এই অলস নিরালম্ব ক্লান্তিকর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে এবং আপন কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার সুযোগ সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। আগামীকাল খুব ভোরেই উষ্ট্রবাহী পুলিশ এসে তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেবে। এই সংবাদ এই ছোট্ট মরু বসতিতে অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে। চেনা অচেনা লোকজন এসে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যায়।

সকালবেলা সোহিনীর বদলে চৌকিদার নাস্তা নিয়ে আসে। যথারীতি টেবিলে তা রেখে সে নিঃশব্দে মাটিতে বসে থাকে। মুখ তার বিষাদে মলিন ও দুঃখে ম্রিয়মান। চৌকিদারের এই অবস্থা দেখে সেও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়। নাস্তা খাওয়া কালে তারও কোন বাক-স্ফূর্তি হয় না। চৌকিদার বাসন নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতেই সেও তার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে অবাক হয়ে যায়। যে স্থান পরিত্যাগের জন্য সে সদাই অধৈর্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আজ সেখান থেকে চলে যাবার সংবাদে কেমন একটা পেছুটান অনুভব করছে। এই মুহূর্তে এখানের প্রতিটি জিনিস—আলোবাতাস হীন এই অন্ধ খুপরি, চেনা অচেনা মানুষগুলি, উট-চালক লক্ষ্মণ, উট দুটো, এমনকি অদূরবর্তী শুষ্ক কঠিন দুস্তর মরু-প্রান্তরও যেন তাকে আকর্ষণ করছে। আর বৃদ্ধ চৌকিদার ও কিশোরী সোহিনী তার এই অসহ্য ক্লান্তিকর নির্বাসিত জীবনের অনেকখানি তাদের সহৃদয় আচার আচরণ কথাবার্তা, ঐকান্তিক সেবাযত্ন ও স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল। তারা যে তার হৃদয়ে কতখানি জায়গা জুড়ে বসেছে তা এই আসন্ন যাবার কালে অনুভূত হচ্ছে। তাদের ছেড়ে যেতে হবে মনে হতেই হৃদয় ব্যথায় টনটন করছে। কিন্তু সোহিনীর প্রাত্যহিক সকালবেলার খাবার নিয়ে আসার আজ হঠাৎ ব্যতিক্রম হলো কেন? এমনতো কোনদিন ঘটেনি। তবে কি সে অসুস্থ, না অন্য কিছু।

এইরূপ হার্দিক চিন্তায় তার অনেকটা সময় ব্যয় হয়। দরজা খুলে বাইরে বেরোতে গিয়ে মুখ সরিয়ে সেটা বন্ধ করে হটে আসে। বাইরে মার্তণ্ড ও প্রভবঞ্জনের সম্মিলিত প্রচণ্ড তাণ্ডব শুরু হয়েছে। দমকা হওয়ার সঙ্গে আগুনের হল্‌কা ছুটোছুটি মাতামাতি করছে। অসহায় অবস্থায় ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে সে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। মনে প্রশ্ন জাগে—সরকার এখান থেকে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তবে কি বন্দী শিবিরের সেদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিচারের জন্য কোন বিশেষ আদালত বসিয়েছে? তার সক্রিয় অংশ তাতে থাকলেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছে। তার সম্পর্কে কোন প্রমাণ কিংবা সাক্ষীসাবুদ পুলিশের হাতে নেই। বিচারে প্রহসন না হলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেনা। যাক গে, কোথায় নিয়ে যায় আগে তো দেখি।

বাইরে ঠক্‌ঠক্ শুনে সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে চৌকিদার। খানা নিয়ে হাজির। সঙ্গে কয়েকখানা সংবাদপত্র। দরজা বন্ধ করে সে খাটিয়ার উপব গিয়ে বসে। চৌকিদার খানা টেবিলে রেখে সংবাদপত্রগুলি তার হাতে দিয়ে জল গড়িয়ে নিঃশব্দ মাটিতে বসে। চৌকিদারের কাছ থেকে চেয়ারে বসবার আহ্বানের অপেক্ষায় সে ইচ্ছা করেই খাটিয়ায় ওপর বসে আছে। কিন্তু চৌকিদারের সাড়া নেই। তার মুখ ভাষাহীন বিষাদে মলিন। অগত্যা সে মুখে কিঞ্চিৎ হাসি এনে বলে—ক্যাবাৎ চৌকিদার, তোম মেরা সাথ বাতচিত বিলকুল বন্ধ কর দিয়া! মেরা কোই কসুর হুয়া?

চৌকিদার ছুটে এসে তার হাত ধরে বলে—এ্যয়সা বাত মৎ বলো বাবুজী, মেরা গুনা হোগা। কসুরকা কোই বাতই নেহি। মগর ম্যায় তো বিলকুল থক গিয়া। আপকো ম্যায় আপনা আদমি সমঝকে পেয়ার-কা সাথ খিদমদ কিয়া। আপ আভি চলা যা রহা, সরকার নে আপকো ইধার সে দুসরা কোই মুলুক লে যায়েগা। ম্যায় ক্যা করু! দুখ্ তো হোগাই, দিলকা রোনা তো ম্যায় রোকনে শক্‌তা নেহি, বাবুজী।

—হাঁ, ইয়ে তো সাচ্ বাৎ হ্যায়।—সুখ দুখ্ হাসনা রোনা, ইয়ে তো জিন্দগী কা খেল। মেরা হাল দেখো—ম্যায় তো মুশাফিব সন্ন্যাসী হুঁ। মেরা এক আশ, অংরেজকা হাতোপর বন্দিনী হামরা পিয়ারী দেশ মাতাকো মুক্ত করকে স্বাধীন বনানা। যবতক উহ্ স্বোয়াধীনতা নেহি মিলেগী তব তক তো অংরেজকা সাথ্ লড়াই চলতেই রহেগা। তবভী সুখ আউর

দুখ্—দিলকা দর্দ—রোখনে নেহি সকৃতা। তোম লোগকো ছোড়কে যানে পড়েগা—মেরা ভি বহুৎ দুখ্ হোতা। কথা শেষে সে চৌকিদারের হাত ধরে তার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে সে খেতে বসে। খেতে খেতে এক সময় বলে—লেড়কি কো চারবাজে বন্দুক, গোলি, নিশান কো সাথ দো লাঠি আউর থোরা রশি লেকে আনে বোলনা। আজ উসকা দূর সে নিশানো পর গোলি চালানেকা আখেরি ইম্তাহান।

লেড়কির কথা বলতেই সে লক্ষ্য করে চৌকিদারের মুখে কেমন একটা ইতস্তত ভাব ফুটে উঠেছে। তথাপি সে বলে—ঠিক হ্যায় বাবুজী। হাম তো লেড়কিকো আপকা জবান জরুর শুনায়েগা। আর কিছু না বলে চৌকিদার থালা বাসন নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

চৌকিদারের মনের বেদনা ও বিষাদ তাতেও বুঝি সংক্রামিত হয়েছে। তার মুখে কেমন একটা জড়তা এসেছে। নির্বাক নিঃশব্দে সে চৌকিদারের বহির্গমনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর দরজা বন্ধ করে খাটিয়ায় বসে মনের বিক্ষিপ্ততা এড়াবার জন্য সংবাদ পাঠে মন দেয়। দেশ তখন স্বরাজিষ্ট ও নো-চেঞ্জারদের দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত। আর দিল্লী, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, কোহাট, কলকাতা ইত্যাদি অঞ্চল হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় বিধ্বস্ত। তার মধ্যে একমাত্র সুসংবাদ—গান্ধিজী দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করে চিত্তরঞ্জন দাশের ১৪৮ নং রাসা রোডের বাসভবন দায় মুক্ত করে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং সেখানে শিশু ও নারী সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত করে চিত্তরঞ্জনের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। সারা দুপুর সংবাদপত্র পাঠ করে সে বোধহয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে। দরজা খুলে বাইরে তাকায়। মনে হলো বেলা পড়ে এসেছে। রৌদ্রের তাণ্ডব কিছু হ্রাস হয়েছে। চারটায় সোহিনীর আসবার কথা। সে ছড়ানো কাগজগুলি গুছিয়ে টেবিলের ওপর রেখে মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে বেরিয়ে যায়। সঠিক সময় নিরূপণের জন্য আকাশ পানে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থান দেখে। বেলা চারটের কম নয়। স্কুল ঘরে ঢুকে দেখে সোহিনী অনুপস্থিত। স্কুলের বারান্দায় তার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে। না সে এলো না।

শৈশবে পিতার মৃত্যু এবং মাতার অপহরণের কারণ জ্ঞাত হয়ে সোহিনীর অবচেতন মনে মরুদস্যুদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিরাগের উৎপত্তি হয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা প্রচণ্ড বিদ্বেষে পরিণত হয়ে তার অন্তরে

প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ বৃত্তি জাগিয়ে তোলে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোন পন্থা জানা না থাকায় কিংবা তার সম্মুখে কোন সুযোগ সুবিধা উপস্থিত না হওয়ায় এতদিন তা সুপ্ত ছিল। এখানে তার আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে শারীরিক ক্রিড়া কৌশল দেখে উক্ত সুপ্ত বৃত্তি জেগে ওঠে এবং তারই সহযোগিতায় উহা সার্থক রূপায়ণের ইচ্ছা সোহিনীর বলবত্তী হয়ে ওঠে। ফলে অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত হয়ে দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে মাকে মুক্ত করে আনবে এবং পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। তাকে ঘিরে কিশোরী সোহিনীর অপরিণত মনের এই রঙীন স্বপ্ন তার চলে যাওয়ার সংবাদে হয়তো ভেঙে গেছে। অবশ্য ডাকুদের প্রতি সোহিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সুকৌশলে ইংরেজের বিরুদ্ধে চালিত করতে তার প্রচেষ্টারও কমতি ছিল না। তবে এটা সত্য যে এই পিতৃমাতৃহীন কিশোরীর জন্য সে দুঃখ ও মমত্ব-বোধ এবং তার সপ্রতিভ আচার- আচরণ ও কথাবার্তা হেতু সহানুভূতি পোষণ করে আসছে। ফলে তাব মনেও দ্বন্দ্ব জেগেছে। না, না, আর এই সাংসারিক বন্ধন ও মেয়ে চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।—কাম এষ, মোহ এষ—ইহা কাম, ইহা মোহ—জ্ঞানীজনের বৈরি। মনের জড়তা কাটাবার জন্য সে লাঠি নিয়ে মাঠে নামে। সেই মুহূর্তেই লক্ষণ উট নিয়ে উপস্থিত। লাঠি ছেড়ে লক্ষণের নিকট থেকে রশি নিয়ে উট দুটোকে উঠ বোস করিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদব করে। আশ্চর্য উট দুটোও তার আদর হয়তো শেষ বিদায়ের সম্ভাষণ ভেবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে। অতপর লক্ষণের কাছে এসে সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে উটসহ তাকে বিদায় দেয়। তারা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তার দৃষ্টি তাদের অনুসরণ করে। লাঠি ভাজা এবং ব্যায়ামাদির পর তার মনের ক্লেদ ও গ্লানি অনেকটা কেটে যায়। স্কুলের বারান্দায় বসে বিশ্রাম করছে এমনি সময় হেডমাষ্টার অন্যান্য মাষ্টারদের এবং বসতির কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হন। পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ ও শুভ কামনা জানিয়ে তাঁরা চলে যান।

পশ্চিম গগনে দিবাকর ধূলিধূসর বর্ণের আড়ালে বিষাদ ছড়িয়ে অস্তা-চলে চলেছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সেও তার ডেরাভিমুখী চলতে থাকে। ঘরে ঢুকে স্নানের জন্য কাপড় গামছা নিয়ে বেরবার মুহূর্তে সোহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে হাজির। টেবিলের উপর লণ্ঠন রেখে সে নিশ্চুপ সরে দাঁড়ায়। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোকে

সোহিনীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে। সে মুখ জল ভারাক্রান্ত মেঘের মতো গম্ভীর বর্ষণোন্মুখ। চেয়ারে বসে সে মুখে জোর করে হাসি এনে জিজ্ঞাসা করে—ক্যা সোহিনী, মেরে পর নারাজ হো?

সোহিনী তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—কিস লিয়ে আপ ইয়ে বোল রহা জী? নারাজ হোনেকা কোই বাতই নেহি। মেরা তবিয়ত থোড়া বিগড় গিয়া, বলেই সে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাপা মৃদু বিষাদ-জড়ানো স্বরে বলে—চাচাজীনে বোলা আপ সুবা চলা যায়েগা। অব ম্যায় আপকো আখেরি দর্শন আউর প্রণাম করনে আয়া। মেহেরবানী করকে থোড়া খাড়া হো যাইয়ে। তার মনে হলো সোহিনীর কণ্ঠস্বর যেন কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। সে অন্যমনস্কের মতো উঠে দাঁড়ায়। সোহিনী এগিয়ে এসে উবু হয়ে মাথা নিচু করে পায়ে হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে তার পা সিক্ত করে দেয়। সে শিউরে ওঠে। অশ্রুমুখী সোহিনীকে দু'হাত ধরে তুলে তার মাথায় হাত রেখে বলে—সোহিনী, ম্যায় তো এক মুসাফির সন্ন্যাসী। মেরা আশীর্বাদ—তোমারা মনকা আশা পূরণ হোগা, জিন্দগী সফল হোগী।

সোহিনী ছিটকে পেছনে সরে অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলে—নেহিজী, নেহি, নেহি; এ্যায়সা আশীর্বাদ না করো। ইয়ে কোভি সফল নেহি হোগী, মেরা মনকা আশ পূরণ হোগী নেহি। তারপর উচ্চ কণ্ঠে নমস্তে গুরুজী মহারাজ, নমস্তে বাবুজী, নমস্তে, নমস্তে বলতে বলতে দৌড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়। সোহিনীর বেদনার্ত কণ্ঠধ্বনির অনুরণন তাকে বুঝি আত্ম-বিস্মৃত করে। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে অন্ধকারের দিকে শূন্য *দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।*

স্মৃতিচারণ শেষে আত্মস্থ হতেই তার মনে হয় সেদিনের কিশোরী সোহিনীর অপরিণত মানসতার সঙ্গে আজকে পরিণত বয়স্কা স্থিতধী সুলেখার মানসতার বুঝি কোন প্রভেদ নেই। জৈবিক ক্ষুৎলালসার অপ্রতিরোধ্য বহিঃপ্রকাশ—রক্ত মাংসে গড়া নরনারীর পক্ষে এড়ানো

[illegible]-বিক্ষেপকারী অলস কর্মনাশা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মহারাজ ঘড়ি খুলে দেখেন গভর্নিংবডির মিটিং-এর সময় হয়েছে। ঝোলাটা নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। মিটিং-এ নানা

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তাঁকেই কলকাতা পাঠানো স্থিরীকৃত হয়। বিদ্যাপীঠকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সরকারী অনুদান ও ব্যবসাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব বুঝে নিয়ে তিনি আগামীকাল কলকাতা রওনা হবেন জানিয়ে সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েন। আম্রকুঞ্জের কুটিরে এসে ভেতরের ঘর থেকে একটা ফাইল পেড়ে আনেন। তারপর পকেট থেকে ডাইরিখানা বের করে তাতে কিছু টুকে নিয়ে ফাইলটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে দেন। আসনে বসে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার পর একটা কাগজে রাতের মিটিং-এর এ্যাজেণ্ডা সম্পূর্ণ কোড-এ তৈরি করে প্রত্যেকটি বিষয় আবার আলাদা আলাদা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে মনে পর্যালোচনা করেন। অনেকটা সময় এভাবেই ব্যয় হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তিনি উঠে পড়েন। কুটিরের বাইরে এসে সাংকেতিক আহ্বান করা মাত্রই রক্ষী হাজির। তাকে দরকারী নির্দেশ দিয়ে তিনি ব্যায়ামাগারের দিকে প্রস্থান করেন। সেখানে শিক্ষার্থীদের ব্যায়াম ও অন্যান্য শারীরিক কসরৎ পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যায়াম চর্চার সঙ্গে টারগেট সুটিং একান্ত অপরিহার্য। অল্প সময়ের মধ্যে তা সমাপ্ত করতে শিক্ষা-দাতাদের যত্নবান হতে বলেন।

ছেলেদের ওখানেই অনেকটা সময় ব্যয় হয়। রাত্রি হয়েছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের ওখানে আর যাওয়া হল না। আগামীকাল থেকে তিনি অনুপস্থিত থাকবেন। সুদেষ্ণা এটা জানে। সে নিশ্চয়ই ঐ দিকটা দেখবে। ঘড়ি দেখে আর কোথাও না গিয়ে সটান আপন কুটিরে ফিরে আসেন। সায়ংকৃত্য ও আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেরবার জন্য তৈরি হন। সাধারণ বেশে গায়ে চাদর জড়িয়ে সশস্ত্র হয়ে লাঠি হাতে তিনি বেরিয়ে যান। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও আলো দেখা যায় না। চতুর্দিক নিথর নিস্তব্ধ। রাতের প্রহরীদের রোঁদে বেরবার সময় আসন্ন। মহারাজ স্কুলের মাঠ পেরিয়ে তার পেছনের সরু দরজা দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান। টর্চের আলোতে ঘড়ি দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেই একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে একজন নেমে ঐ দরজা দিয়েই আনন্দ কাননে ঢুকে যায়। গাড়োয়ানকে গন্তব্যস্থলের নির্দেশ দিয়ে মহারাজ গাড়িতে উঠে বসেন। রাস্তায় লোক চলাচল বিরল। গাড়ি জনবসতি ছাড়িয়ে উত্তরে চলেছে। অবশেষে রাস্তার ধারে একটা টিলার

নিকট তিনি নেমে গাড়োয়ানকে বিদায় দেন। গাড়ি অদৃশ্য হতেই মহারাজ বাঁয়ে ঘুরে টিলাটার পেছনের জংগলে প্রবেশ করেন। তার ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে চলে একটা আবাদী মাঠে নেমে পড়েন। নিরেট অন্ধকার। ঊর্ধ্বে নির্মল গগনে অসংখ্য নক্ষত্রের মতো নিম্নে মাঠের উপর জোনাকির ঝিকিমিকি। আর দূরে মাঠের ওধারে গাছপালা ঘেরা বনাঞ্চলটাকে নদীর কালো তটরেখার মতোই দেখাচ্ছে। মাঠ ছাড়িয়ে জংগলে প্রবেশের মুখে মহারাজ খানিক দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয় করে লাঠি ঠুকে ঠুকে জংগলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হন। লক্ষ্য স্থলের চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছতেই অদূরবর্তী ঝোপ থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে। সমস্বরে প্রত্যুত্তর দিয়ে মহারাজ এগিয়ে চলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনি জংগলাকীর্ণ ভগ্ন প্রাসাদে প্রবেশ করেন। জংগল-ভর্তি ভাঙা দালান কোঠা ও স্তূপীকৃত আবর্জনার ভেতর দিয়ে তিনি একটা খোলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সেখান থেকে সম্মুখে আর একটা ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করেন এবং কয়েকটা ভাঙা কোঠার ভেতর দিয়ে একটা জীর্ণ বড় কক্ষে এসে তিনি দাঁড়ান। মেঝেতে কয়েকটা ভাঙা বেদী। হয়তো কোনকালে উপাসনা-কক্ষ ছিল। এখানেই চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র সতর্ক পাহারায় আজকের মন্ত্রণা বৈঠক বসেছে।

মহারাজ একটা বেদীতে বসে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে হারিকেন লণ্ঠনটা কাছে এনে সভার কর্মসূচী পাঠ করেন। তদনুযায়ী বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ আসন্ন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একে একে তাদের প্রস্তুতির বিবরণ দেন। অস্ত্রাধ্যক্ষ কিভাবে অস্ত্রাগারগুলিকে সতর্ক পাহারাধীন এবং নির্ধারিত দিনে আক্রমণের জন্য অস্ত্রশস্ত্রগুলি কোথায় এনে মজুত রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তা বলেন। তাছাড়া দলের সভ্যদের মধ্যে যাদের বাড়িতে বন্দুক রয়েছে তাহাও কার্তুজ সঙ্গে নিয়ে ঐ দিন আসার নির্দেশ সহ সংখ্যারও উল্লেখ করেন। গুপ্তচর প্রধান কি ভাবে পুলিশের থানা, আপিস ও গুপ্তচরদের চলাচল ইত্যাদির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার এবং আসন্ন যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এই সতর্কতা কি ভাবে রক্ষা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ আজকের ঘটনার উল্লেখ করেন :

—সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একটা লোক জঙ্গলের ধারের রাস্তা ধরে এগিয়ে

আসছে। ঐ রাস্তায় লোক চলাচল এমনিতেই কম। সুতরাং এ সময়ে এখানে লোকের আগমন। প্রহরীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। সে দূর থেকেই লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করে। লোকটা চলে চলে জঙ্গলের ধারে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তারপর আরও খানিক এগিয়ে হঠাৎ জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে এসময়ে কেউ জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং প্রহরীর সন্দেহ ঘনীভূত হয়। লোকটার গতি কোন দিকে তা লক্ষ্যে রেখে প্রহরী অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার অনুসরণ করে। ভুতুড়ে দীঘির ধারে পৌঁছতেই লোকটার আসল মতলব ধরা পড়ে। আর এগুতে দেওয়া ঠিক নয়। সুতরাং সে অতর্কিতে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক হাত দিয়ে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরে তার কণ্ঠরোধ করে অন্য হাতে আঘাতের পর আঘাত হেনে কাবু করার চেষ্টা চালায়। এভাবেই কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর লোকটাকে ল্যাংমেরে ফেলে দিয়ে উপুড় করে মাথাটা মাটিতে চেপে ধরে পিঠে হাঁটু গেড়ে বসে প্রহরী সংকেতিক ধ্বনি দিতেই অন্য প্রহরী অকুস্থলে উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতে প্রহরী আমার নিকট এসে ঘটনাটা বলতেই আমি লোকটাকে দীঘির জলে চুবিয়ে মারার নির্দেশ দিই। নিশ্চয়ই পুলিশের চর—সুতরাং তারা তন্ন তন্ন করে লোকটাকে খুঁজবে। দীঘির জলে তার লাশ পাওয়া গেলে সে যে অতর্কিতে পা ফসকে দীঘির জলে ডুবে মরেছে সে ধারণাই বলবতী হবে। জঙ্গলের যে জায়গাটায় ধস্তাধস্তি হয়েছে সে চিহ্নও বিলোপ করে ফেলার আদেশ দিই।

সব শুনে মহারাজ সপ্রশংস কণ্ঠে বলেন—উত্তম, যুদ্ধকালীন অবস্থায় দয়া দাক্ষিণ্য অনেক সময় দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। আরো সার্বিক আলোচনার পর মহারাজ আশ্রমের কাজে কয়েকদিনের জন্য তাঁর অনুপস্থিতির কথা প্রকাশ করেন। ফিরে এসে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনার দিন ধার্য করে কিভাবে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রেললাইন উৎপাটন, টেলিগ্রাফ টেলিফোন আপিস ইত্যাদি ধ্বংস সাধনের পর নগর দখল করে কোতোয়ালী এবং কালেক্টরির শীর্ষস্থ ইয়ুনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন ভারতের তেরঙা পতাকা উত্তোলনের কথা ঘোষণা করেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিতে ভারতমাতার বন্দনা করেন।

মহারাজ ঘড়ি বার করে দেখেন। রাত্রি নিঃশেষিত প্রায়। বাইরে

গাছে গাছে কাকের কর্কশ কণ্ঠ আসন্ন প্রভাত ঘোষণা করছে। সভা ভঙ্গ হয়। সাংকেতিক ধ্বনিতে প্রহরীদের তা জানিয়ে দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উষালোকে ভিন্ন ভিন্ন পথে নগর প্রবেশের জন্য তাঁরা বেরিয়ে পড়েন।

·

পরদিন শিক্ষকতার পর আশ্রমের দপ্তর থেকে মহারাজ রেলে যাতায়াতের মাশুল ও অন্যান্য রাহা খরচ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আম্রকুঞ্জে এসে কলকাতার একটা সংক্ষিপ্ত সফরসূচী এবং বিদ্যাপীঠ ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ের একটা খসড়া তৈরির পর তা ফাইলবন্দী করে ঘড়ি দেখে উঠে পড়েন। ঘরের সবকিছু যথাস্থানে আছে কিনা তা এক নজরে দেখে বেরোবার মুহূর্তে—একটু দাঁড়ান, শুনেই পেছন ফিরে দেখেন: সুদেষ্ণা।

—কি ব্যাপার, তুমি এতক্ষণ সেবাকেন্দ্রে ছিলে!

—হাঁ, ওখানের সবকিছু আর একবার খুঁটিয়ে দেখলাম—যদি কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যায়! তা ছাড়া অমুতোষ প্রদত্ত সমগ্র চম্পকারণ্যের, পাহাড়ের রাস্তা, চড়াই উৎড়াই এবং চৌকিদার প্রদত্ত সুদূর আরাকান পর্যন্ত সমতল ও পাহাড়িয়া রাস্তা সহ তীর্থক্ষেত্রে রঘুনন্দনের আশ্রম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের একটা খসরা নক্সা করা হয়েছে। তাছাড়া ওখানের জনসংযোগ কার্যাবলির তথ্য ইত্যাদির একটা সংক্ষিপ্ত বয়ান ও আপনার অবগতির জন্য তৈরি করা হয়েছে।

—উত্তম, তুমি দেখছি ও নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে এবং পরিশ্রম করেছ!

—হ্যাঁ, যুদ্ধ জয় সম্পর্কে একান্ত আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তার বিপরীতটাও ভেবে রাখা প্রয়োজন। কেননা যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। যুদ্ধ জয়ে নিশ্চিত হয়েও সামান্য ভুল ত্রুটির জন্য প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে ও পরাজয় বরণ করতে হয়। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। সেক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে পশ্চাদপসরণেও বিশেষ দক্ষতা ও সুকৌশল আবশ্যক।

—সাধু! সাধু!! বলে মহারাজ সুদেষ্ণাকে উৎসাহিত করেন। তুমি দেখছি একজন সমরবিদ (স্ট্র্যাটীজিস্ট) হয়ে উঠেছ! কিন্তু তোমার ঐ জয় পরাজয় সংজ্ঞার মধ্যে আর একটা শব্দের উল্লেখ তো নেই! গীতার ভাষ্যে সেটা 'হত'—মানে মৃত্যু। সুতরাং ঐ শব্দটা প্রথমে প্রয়োগ করলে বিষয়টা

কি দাঁড়ায়। যুদ্ধের পরিণতি মৃত্যু কিংবা জয়। গীতার ভাষায় "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" মানে মৃত্যু কিংবা জয় একই পর্যায় ভুক্ত। প্রথমটায় স্বর্গ লাভ, দ্বিতীয়টায় রাজ্য ভোগ। সেখানে তোমার তৃতীয় শব্দের উল্লেখ মাত্র নেই। পরাজয়, পরাভূত মানে বিজয়ীর নিকট বিজিতের আত্মসমর্পণ নয়তো বিজয়ীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পলায়ন। পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন একই পর্যায়ভুক্ত হলেও তোমার উক্ত ঐ পশ্চাৎ অপসরণ ইংরেজি রিট্রিট-এর সঙ্গে সুকৌশল কথাটার প্রয়োগ মানে নিশ্চয়ই শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে অপ্রস্তুত হয়ে নতুন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পুনরায় শত্রুর সম্মুখীন হয়ে আঘাত হানা। কিন্তু শত্রুর আক্রমণে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে আর পশ্চাৎ অপসরণ হয় না। তার একমাত্র সংজ্ঞা পলায়ন—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। বলেই তিনি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেন। যাকগে, এসব শব্দার্থের কচকচানি বৃথা—সময় নষ্ট ও মনের দুর্ভোগ ও দুর্ভাবনা। তোমার কাগজপত্রগুলি দাও। সময় মতো অবশ্যই দেখবো। কথা শেষে তিনি গম্ভীর আননে কুটির ত্যাগ করেন। আর সুদেষ্ণা—মহারাজার ব্যাখ্যা শুনে তার চোখে মুখে উদ্বেগের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠে। সে চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসে উদাসী দৃষ্টিতে হাঁ-করা দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে।



দিদির সঙ্গে মফস্বল ঘুরে আসার পরে দেবযানী সেদিন কলেজ ফেরতা আখড়ায় না গিয়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দেয়। একে কয়েকদিন বেশ খাটা খাটুনি গেছে তার উপর সামনে পরীক্ষা। মামী দরজা খুলে দেবযানীকে দেখেই বলে—কিরে, শরীরটরীর খারাপ হয়নি তো, বলেই কপালে হাত দেন।

—না গো না, কি যে বলো! কয়েকদিন ঘোরাঘুরি হয়েছে তো—সামনে পরীক্ষা!

—যা যা, হাতমুখ ধুয়ে খেতে আয়।

দেবযানী ঘরে বইখাতা রেখে কলতলা থেকে সোজা রান্না ঘরে উপস্থিত। খাবারে হাত দিয়েছে এমনি সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দেবযানী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে সুদেব।

—ওমা, দিদি যে! আজ বড্ড সকাল সকাল ফিরেছ।

—এখন কথা নয়, হাতমুখ ধুয়ে রান্না ঘরে এসো একসঙ্গে বসে খাবো। দেবযানী ফিরে এসে খাচ্ছে না দেখে উর্মিলা জিজ্ঞাসা করে—কিরে, হাত গুটিয়ে বসে আছিস যে?

—সুদেব এলে দু'জনে একসঙ্গে তোমার সম্মুখে বসে খাবো। বিকেলে এমন সুযোগ তো বড় একটা হয় না। ও আসে তো আমি আসিনা, আমি আসি তো ও আসে না।

উর্মিলা হেসে বলে—কি জানি তোদের মনে কখন যে কি ভাবের উদয় হয়—হদিশ পাইনা।

সুদেব এসেই বলে—দাও মা, খাবার দাও। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

—বোস, তবে তো দেবো। এত তাড়াহুড়া কিসের? উর্মিলা খাবার থালা সুদেবের সম্মুখে রাখে।

খেতে খেতে সুদেব বলে,—জানো দিদি, ক্লাবে এখন বড্ড কড়াকড়ি—স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন—সময় মতো হাজিরা। শরীর চর্চার সঙ্গে ড্রিল-এর উপরও বেশ জোর দেওয়া হচ্ছে। বন্দুকের মতো লাঠি কাঁধে নিয়ে কুচকাওয়াজ চলেছে—এক, দো, তিন, ঘুম যাও। বেশ ফুর্তি লাগে।

—তাই নাকি! তোদের মতো সব ক্লাবেই কি এরকম হচ্ছে?

—শুনছি তো হচ্ছে। তবে তোমাদের আখড়ার কথা জানি না। খেয়ে দেয়ে সুদেবের সঙ্গে দেবযানীও ঘরে আসে। টেবিলের ওপর বইগুলি গুছিয়ে শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শরীরের সঙ্গে মনটাও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। এই ভর-সন্ধ্যার শুয়ে থাকলে মামী রাগ করবেন। সে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখে মামী ধূপ ধুনো প্রদীপ নিয়ে তুলসী মঞ্চের দিকে চলেছেন। সেও তার পিছু পিছু চলে। উর্মিলা মঞ্চের উপর প্রদীপ রেখে ধূপ ধুনো

নিয়ে তার চতুর্দিক ঘুরে হাঁটু গেড়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে। দেবযানীও তদরূপ করে। কিন্তু মামী উঠে দাঁড়াতেই সে তার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে। ঊর্মিলা দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরে বলে—কি যে ছেলে-মানুষী করিস। দেবী প্রণামকালে যতসব অনাছিষ্টি। এতে দেবী রুষ্ট হন।—অনাছিষ্টি কি ছিষ্টি, দেবদেবী রুষ্ট কি তুষ্ট জানিনা। তুমি মা—। আমার নিকট সাক্ষাৎ দেবী।

ঊর্মিলা আর কথা না বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—চ, ঘরে চ। দাওয়ায় উঠতেই বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দেবযানী পিছিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখে মামা।—তুমি যে আজ বড্ড সকাল সকাল ফিরলে।

—হাঁ, কাজকর্ম হয়ে গেল, তাই চলে এলাম। শরীরটা যে ক্লান্ত তার উল্লেখ করেন না।

মামার সঙ্গে বারান্দায় উঠে এসে দেবযানী বলে—তুমি ঐ চেয়ারটায় বসো, আমি পাখা নিয়ে আসছি।

মামা আপত্তি জানায়—না না পাখাটাখার দরকার নেই।

কি যে বলো। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। তুমি চুপ করো। দেবযানী পাখা নিয়ে এসে হাওয়া দিতে থাকে। হাওয়াটা সত্যিই মিষ্টি লাগে।

মামী ঘরে ধূপ ধুনো দিয়ে ও প্রদীপ দেখিয়ে বারান্দায় এসে দেবযানী-কে হাওয়া করতে দেখে জিজ্ঞাসা করে—কিরে যানী, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

—না, না, সারাদিন খেটেখুটে এসেছেন তাই একটু হাওয়া করছিলাম।

ঊর্মিলা দেবযানীর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বলেন—তুই যা।

দেবযানী ঘরে এসে বই খুলে পড়তে বসে। খানিক বাদে সুদেব দিদিকে শুনিয়ে বলে—বাব্বা, কুচকাওয়াজ যে কি সাংঘাতিক জিনিষ—না করলে বোঝা যায় না। লাঠি কাঁধে কদম কদম বাড়ায়ে যাও, ডাইনে বাঁয়ে ঘুম যাও, হাঁটু গেড়ে লাঠিটাকে বন্দুকের মতো ধরে তাক করো। সব শেষে শুয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে লাঠিটাকে বন্দুকের মতো ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোও।

—এখন পড়ার সময় ভাই। সামনে পরীক্ষা, মন দিয়ে পড়ো। ভাই বোন অনেকক্ষণ অবধি পাঠাভ্যাস করে। ঊর্মিলা দরজার ধারে এসে ডাক দেয়—যানী, সুদেব খেতে এসো, রাত্রি অনেক।

দেবযানী বই গুছিয়ে ঊর্মিলার পেছন পেছন রান্না ঘরে গিয়ে হাজির। মামা পিঁড়িতে বসে তাদের অপেক্ষা করছেন। সুদেব আসতেই ঊর্মিলা সকলের ভাত বেড়ে আনে। খেতে খেতে সুদেবকে বাবা জিজ্ঞাসা করেন—এখন তো খেলার মাঠ নেই। বিকেলটায় করো কী ?

—কেন, ক্লাবে শরীর চর্চা, আশ্রমের কাজ, তাছাড়া সপ্তাহে তিন দিন ড্রিল—বন্দুকের মতো লাঠি হাতে সামরিক কুচকাওয়াজ—সে যে কি পরিশ্রম বাবা !

—তাই নাকি ! তিনি আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান। আপসোসের সঙ্গে বলেন—দেশের কি যে হলো ! চতুর্দিকে গণ্ডগোল—আজ এখানে পুলিশ খুন, কাল ওখানে পুলিশের গুলি, ধরপাকড়, বোমা-বাজী এক ভয়ভীতির রাজত্ব। খবরের কাগজ খুললে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই তো অবস্থা ! তার মধ্যে আজকের ইংরেজি খবরের কাগজে আর এক আতঙ্কজনক সংবাদ—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। খবরে বলছে—রাশিয়া থেকে এক বাদ—কম্যুনিজম্ (সাম্যবাদ) আমদানী হয়েছে। উদ্দেশ্য—দেশে ধনী নির্ধন থাকবে না। কলকারখানা শস্যোৎপাদন ইত্যাদি সব সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সম-বন্টন হবে ! বোঝো কাণ্ড ! কতগুলি ছেলে ছোকরা এতে মেতে উঠে যুদ্ধের পাঁয়তারা কষছে। রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী অভিযোগে কতগুলিকে পাকড়াও করেছে। তাদের বিচার চলেছে।

মামার কথা শেষ হতেই দেবযানী বলে—ইংরেজি কাগজে কত খবর যে থাকে ! মাঝে মাঝে ঐসব কাগজ বাড়ি আনলে আমাদের জ্ঞান-গম্যিও বাড়ে।

—হ্যাঁ বাবা, দিদির সঙ্গে আমি একমত।

—ঠিক আছে, তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যাক। তারপর বিষয়টা বিবেচনা করা হবে।

খাওয়া শেষে সবাই উঠে পড়ে। ঘরে এসে সুদেব বলে—বাবা যে সব খবর বললেন, সমাজে উঁচু নিচু, ধনী নির্ধন থাকবে না—সবাই সমান। এতো বিবেকানন্দের অনেক বাণীর সঙ্গে মিলে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার তো দিদি ! তারপর দেখ গান্ধিজীর অচ্ছুৎ বর্জন—মেথর মুর্দাফরাশ নীচ-জাতদের হরিজন আখ্যা দিয়ে সমাজভুক্ত করণের প্রচেষ্টা—তাও দেখ

বিবেকানন্দ-বাণী-প্রভৃত। তাহতে অবাক লাগে দিদি তিনি কত বড় মনীষী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন।

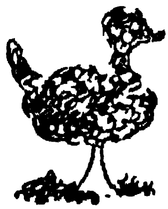
—চমৎকার। চমৎকার!! উত্তম। তোমার মাথা একদম পরিষ্কার। আমিও এত ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারতাম না। ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলে—চলো এবার শুয়ে পড়ি। রাত্রি অনেক। মা রাতের টহলে এসে আমাদের জাগা দেখলে ভীষণ রাগ করবেন। দেবযানী বাতিটা কমিয়ে টেবিলের নিচে রেখে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়েই সুদেব বলে—কিন্তু দিদি ক্লাবে হঠাৎ সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ শেখানোর অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—এতে বোঝবার কি আছে? এতো শরীর চর্চার অঙ্গ।

—তা যা বলেছ। কিন্তু, কিন্তু……সুদেবের আর বাকস্ফূর্তি হয় না। দেবযানী বুঝলো সুদেব ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সুদেবের ঐ "কিন্তু" উক্তির মধ্যে দিয়ে সে কি বলতে চেয়েছে? দেবযানী তা অনুধাবনের চেষ্টা করে। তবে কি এই সামরিক কুচকাওয়াজের মধ্যে সে আসন্ন সংগ্রামের কোন ইঙ্গিত পেয়েছে? না, না, সুদেবকে এর মধ্যে সে কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে দেবে না, কখনোই না। আগামীকাল আখড়ায় গিয়ে ওখানের আবহাওয়া থেকে সে নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পারবে। তবে সুদেব সম্পর্কে ভাবনারও বা কি আছে? সে তো তাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে যে দেশোদ্ধারের এই মরণ-যজ্ঞে সে নিজেকে জড়াবে না। এর থেকে দূরে থাকবে এবং মাকে কখনও কোন অবস্থায় ছেড়ে যাবে না। এভাবেই দেবযানী নিজেকে আশ্বস্ত করে জটিল চিন্তা ভাবনাগুলো দূরে সরিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন কলেজ ফেরৎ আখড়ায় গিয়ে দেখে সেখানেও শরীর চর্চার সঙ্গে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ চলেছে। সকলেই প্রচণ্ড উৎসাহে উদ্দীপ্ত। সে উপস্থিত হতে তাকেও তাদের সামিল হতে হয়। হঠাৎ এই প্রথার প্রবর্তনের কারণ জানার ইচ্ছা থাকলেও অনুসন্ধিৎসা দলের বিধি নিষেধের আওতায়। সুতরাং তাকে মূক হয়ে থাকতে হয়। সন্ধ্যাবেলা গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে তার মনে যে চিন্তাভাবনার উদয় হয় তা এই সামারিক কুচকাওয়াজকে ঘিরেই। ঈশান কোণে মেঘের ঘনঘটা যেরূপ আসন্ন ঝড়ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস সেরূপ সামরিক কুচকাওয়াজ কি তবে আসন্ন সংগ্রামের সূচনা। পরক্ষণেই মনকে প্রবোধ দেয়—এতো শরীর চর্চার

একটা অঙ্গ। তাতে এত চিন্তাভাবনারই বা কি আছে। অস্ত্রশস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ তো ভালভাবেই তার রপ্ত হয়েছে। এখন সামরিক কায়দা রপ্ত করে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য তৈরী হওয়াই তো তার কর্তব্য। তবে হাঁ, এ নিয়ে সুদেবের সঙ্গে আর আলোচনা নয়। আর এ সম্পর্কে তার উৎসাহ যাতে বৃদ্ধি না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।



দিদির কাছ থেকে অর্থ, ওষুধপত্র ইত্যাদি নিয়ে বেরবার সময় অশুতোষ তাঁকে আজ রাত্রেই রঘুব আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার এবং আগামীকাল ফেরার আশ্বাস দেয়। দিদির ইচ্ছা এবং কি জানবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত তা সে তাঁর বক্তব্যের ধারা থেকেই স্পষ্ট আঁচ করে। সুতরাং আম্রকুঞ্জ থেকে বেরিয়েই তার সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মনে চম্পকারণ্য পেরিয়ে, জনবসতি ছাড়িয়ে পূর্ব সীমান্তবরাবর পার্বত্য অঞ্চলটা অনুসন্ধানের বাসনা জাগে। যতদূর শুনেছে বরাকল এবং মুতামোহারী অঞ্চলটা নিরাপদ আশ্রয় এবং গরিলা সংগ্রাম চালাবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। তবে সেখানে হিংস্র বন্যপ্রাণী—বাঘ, ভাল্লুক, বিশেষ করে বন্য হস্তীর প্রচণ্ড উৎপাত। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা যোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব হলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে—ঐ জনবসতিহীন অঞ্চলে যুদ্ধকালে রসদের কি হবে? কে রসদ যোগাবে? একমাত্র জল আর বুনো ফলমূল খেয়ে কি তা সম্ভব? একদিনের যুদ্ধ হয়তো তাতে চলে। কিন্তু ঐ একদিনের যুদ্ধে যদি জয় পরাজয় নির্ণীত না হয়? সেক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখ থেকে সরে গিয়ে লুকিয়েচুরিয়ে চোরাগোপ্তা আক্রমণে তাকে ব্যতিব্যস্ত ও বিধ্বস্ত করার সংগ্রামই দিদির বক্তব্য অনুসারে গরিলা পদ্ধতির সংগ্রাম। এই লড়াইয়ের রসদ ও শত্রুপক্ষের খোঁজ-খবর সরবরাহের জন্য জন-সংযোগ এবং জনগণের সহানুভূতি একান্ত অপরিহার্য। বিষয়টা যে কতখানি

গুরুত্বপূর্ণ ইতিপূর্বে ভেবে দেখার তার অবকাশ ঘটেনি। সুতরাং জন-সংযোগ পদ্ধতির উপর দিদির সমধিক গুরুত্ব আরোপণ যে কত দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক তা উপলব্ধি করে সে অবাক হয়ে যায়। সুতরাং গুপ্ত আস্তানার সন্ধানে অন্যত্র দূরদূর অঞ্চলে খোঁজাখুঁজি না করে দেবস্থানের পাহাড়িয়া অঞ্চলটাকেই দিদির ইচ্ছানুযায়ী গরিলা যুদ্ধের একটি শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করার চেষ্টায় সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তদনুযায়ী রাতের ট্রেনের পরিবর্তে পরবর্তী শেষ রাতের ট্রেনে রঘুর আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাবার সময় গুরখাকে বলে—দিদিকে জানাস আমার ফিরতে দেরী হতে পারে।

অনুতোষ তীর্থক্ষেত্রের স্টেশনে যখন নামে পুব পাহাড়ের পিছনে তখন সূর্য ঝিকিমিকি দিয়ে উঠছে। নবারুণের সোনালী আলোকচ্ছটায় গাছে গাছে পাতায় পাতায় যেন রাঙা হাসির ফোয়ারা ছুটেছে। বুড়ো শিবতলা যখন এসে পৌছে নানা পাখীর কূজনে প্রভাতের আগমনী চলেছে। জংগলাকীর্ণ বিশাল দীঘিটার ওপর একটা স্বচ্ছ কুয়াশার আবরণ ভেসে বেড়াচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রবিরশ্মি তির্যক রেখায় তার উপর পড়ে অসংখ্য সোনাকণায় রূপান্তরিত হয়ে ঝলমল করছে। অনুতোষ ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দীঘির ধারের পরিচিত পথে রঘুর আশ্রমে এসে উপস্থিত। কিন্তু কোন জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই—যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা! প্রথমেই সে রঘুর বাগানের ধারে যায়—না, সেখানেও রঘু নেই। অবাক কাণ্ড। অতপর সে রঘু, রঘুনন্দন বলে ডাক দেয়। কুটির ভেতর থেকে সাড়া আসে—কোন্? অনুতোষ আমি বলেই ভেতরে ঢোকে। দেখে রঘু বসে আছে। পাশে আলো জ্বলছে। তার সম্মুখে চাদর-ঢাকা হয়ে কেউ শুয়ে আছে। অনুতোষ হতভম্ব।—ক্যা বাত রঘু?—আপ আয়া দাদাজী, বলেই রঘু কেঁদে ফেলে। অনুতোষ কাছে গিয়ে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে রঘু? রঘু কাঁদতে কাঁদতে বলে—লেংচাকে কাল রাতে সাপে কেটেছে।—কি বললে সাপে কেটেছে—কোথায়, বলেই অনুতোষ কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে লেংচার গায়ের চাদরটা সরিয়ে দেখে তার বাঁ পায়ে হাঁটুর নিচে বাঁধন। রঘু আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখায় বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় সাপের ছোবল। অনুতোষ লেংচার গায়ে হাত দিয়ে দেখে—গা তখনো কিঞ্চিৎ উষ্ণ, হাতের শিরার স্পন্দনও ক্ষীণ। সে ঝোলা থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটা খুলে

একটা দড়িতে নিয়ে লেংচার পায়ের বাঁধনের নিচে আর একটা কষে বাঁধন দেয়। তারপর আয়োডাইন মাখিয়ে ছুরি দিয়ে সাপে কাটা জায়গাটা চিড়ে দেয়। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে। বোঝা গেল গায়ের রক্ত তখনো জমাট বাঁধেনি। এই দেখে সে আশ্বস্ত হয়ে রঘুকে বলে এক্ষুণি পাঁচ ছয়টা মুরগী নিয়ে এসো আর সাপেকাটা ইন্‌জেকশন সহ ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাও। দেরি করবে না। রঘুয়া অনুতোষের নির্দেশ মতো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরোয়। রাখালরা সবে আসতে শুরু করেছে। তাদের একজনকে গাঁ থেকে ৫/৬ মুরগী নিয়ে আসার জন্য এবং আর একজনকে সাপেকাটা ইন্‌জেকশন সহ বাজার থেকে ডাক্তার আনবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে রঘু ঘরে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে অনুতোষ লেংচার ঘুমঘোর ভেঙে চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তার চক্ষু মেলে ধরে অনেকক্ষণ জলের ঝাপটা দেয়। কোন ফল হয় না। দু'জন রাখাল ছয়টা মুরগী নিয়ে উপস্থিত। অনুতোষ তাদের হাত থেকে একটা মুরগী নিয়ে ওটার মলদ্বার চিড়ে সাপেকাটা খতস্থানে চেপে ধরে। ছটফট, কোঁ কোঁ করতে করতে ওটা অল্পক্ষণের মধ্যেই মরে যায়। এ ভাবেই পর পর চারটা মুরগীর বিষাক্ত রক্ত টেনে টেনে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। পঞ্চম মুরগীটাকে একই অবস্থায় চেপে ধরে। সেটা ছটফট করছে, কিন্তু মরে না। অনুতোষ ঐ মুরগীটাকে বেঁধে রাখতে বলে লেংচার পায়ের আঙুলটা আয়োডাইন দিয়ে পরিষ্কার করে তুলো চেপে দেয়। ডাক্তার আসছে না। বেলা বেড়ে চলেছে। অনুতোষ অস্থির। তার আর কিছু করণীয় নেই। সে লেংচার শিরা ধরে আছে আর মাঝে মাঝে চক্ষুর পাতা মেলে দেখছে ঘোলাটে হয়েছে কিনা। অবশেষে ডাক্তার এলেন। তিনি রোগীর ক্ষতস্থান, পায়ের বন্ধন, গায়ের উত্তাপ, হাতের শিরা ও চক্ষুর অবস্থা পরীক্ষা করে প্রথমেই একটা ইন্‌জেকশন দেন। তারপর রোগীকে কখন সাপে কেটেছে, কতক্ষণের মধ্যে পা বাঁধা হয়েছে এবং রোগীর চৈতন্য ফিরিয়ে আনার জন্য কি কি করা হয়েছে তা অনুতোষের নিকট শোনেন সেই সঙ্গে মুরগী দ্বারা অনুতোষের হাতুড়ে চিকিৎসার প্রণালী ও পদ্ধতি তিনি অবগত হন। সব শুনে ডাক্তারবাবু— হুঁ, বলে পুনরায় রোগীর হাতের শিরা এবং স্টেথিসকোপ দিয়ে হার্ট পরীক্ষা করে চোখের পাতা টেনে দেখেন। অতপর আর একটা ইন্‌জেকশন্ দিয়ে বলেন—রোগী বাঁচবে। তবে খুব সাবধান, রোগীর

যেন কোন উত্তেজনা না ঘটে। চৈতন্য ফিরে এলে অল্প অল্প গরম দুধ দেবে, পায়ের বাঁধন আজ খুলবে না। বিকেলে রোগীর অবস্থা জানাবে। তখন আর কি করতে হবে তিনি বলে দেবেন। অনুতোষ রঘুকে ডাক্তারের নির্দেশ মতো লেংচার শুশ্রূষা করতে বলে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

ডাক্তারের আশ্বাসে রঘুয়ার অন্তরে আশার সঞ্চার হয়, শরীরে বল ফিরে আসে। বিগত সন্ধ্যা রাত্রি থেকে লেংচাকে নিয়ে একটানা বসে থেকে নিরাশার অন্ধকারে ডুবে ছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। নিজের এই অসহায় অবস্থার হা হুতাশ আর নীরবে অশ্রু মোচন ভিন্ন আর কিছুই তার করবার ছিল না। বহু দিন আগেকার বুড়ো শিবতলায় অহি-নকুলের যুদ্ধের কথা তার মনে পড়ে। লেংচাকে সাপে কাটার ঘটনার পর এই অঞ্চলের অহিকুলের ওপর তার প্রতিহিংসা তীব্র আকার ধারণ করে। মনে মনে সে তাদের নির্বংশ করে পুরাণে কথিত জনমেজয়ের মতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুতোষের আগমন এক দেবদূতের আবির্ভাব মনে করে নিরাশার অন্ধকারে রঘু কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখতে পায়। অতঃপর লেংচার চৈতন্য ফিরিয়ে আনার জন্য অনুতোষের সার্বিক প্রচেষ্টা ও ক্রিয়াকলাপ, ডাক্তারের আগমন ও ইন্‌জেকশন্ ইত্যাদির পর লেংচার পুনর্জীবন লাভের আশ্বাস দান তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে তাকে আপন সত্তায় ফিরিয়ে আনে। রঘু লেংচার শিয়র থেকে উঠে দু'জন বালককে তার পাশে বসতে বলে, এবং অন্য একজনকে দুধ আনতে গাঁয়ে পাঠিয়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং যেখানে লেংচাকে সাপে কেটেছে সেখানটায় এসে মনের আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। সারা দীঘির জংগলে আগুন লাগিয়ে সর্পকুলের ধ্বংস সাধনে প্রবল ইচ্ছা জাগে।

অনুতোষ ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে বাজারের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতের খাবার—রুটি বিস্কুট ফল মূল ইত্যাদি কিনে ঝোলা ভর্তি করে নেয়। বড় রাস্তা বরাবর পাহাড়ের বাঁ দিকের অঞ্চলটা তার নখ দর্পণে। পাহাড় সংলগ্ন ডান দিকটায় কোন জনবসতি নেই। মকবুলের গ্রামে গিয়ে দেখেছে—একদিকে খাড়াই পাহাড়ের গা যেমনি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আকীর্ণ তেমনি তার পাদদেশের কিছু দূরে রয়েছে জনবসতি। এরূপ পরিবেশই গরিলা যুদ্ধের পক্ষে কাম্য যদি গ্রামবাসীদের সহায়তা লাভ করা যায়। সুতরাং ঐ দিকটা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য সে বেরিয়ে

পড়ে। বন-বিভাগের আপিস ডাইনে রেখে সে সুবাদকে গাঁয়ের পথ-ধরেই অগ্রসর হয়। গ্রামে বয়স্কদের বড় একটা দেখতে পায় না। হয় তারা বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গেছে কিংবা অন্যত্র কাজ করছে। অর্ধনগ্ন ছেলেপুলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও ছেলেরা ডাংগুলি লুকোচুরি খেলছে। বৃদ্ধদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের নিকট নিজেকে সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের লোক বলে পরিচয় দিয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে। যাবার সময় গ্রামের নাম টুকে নিয়ে সরকারি ডাক্তার পাঠাবার আশ্বাস দেয়। জড়ো হওয়া কৌতূহলী ছেলেপুলেদের হাতে ঝোলা থেকে বিস্কুট ও খেজুর খেতে দেয়। ফলে গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় হেমলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তারা তার পিছু নেয়। সে আর এক দৃশ্য। এভাবেই পাহাড় এবং তার পাদদেশে অবস্থিত গ্রামগুলি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতে করতে অনুতোষ যখন মকবুলের গ্রামে এসে পৌঁছে সূর্য তখন পাটে বসেছে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় পেছনের উত্তুঙ্গ পাহাড়ের গাছপালা সব লালে লাল হয়ে গেছে। গ্রামটার দূরত্ব পাহাড় ও জঙ্গল থেকে অন্যান্য গ্রামের তুলনায় কম। সুতরাং গ্রামের ভেতর না ঢুকে অনুতোষ প্রথমে পাহাড় অঞ্চলটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে। তারপর গ্রামে প্রবেশ করে মকবুলের বাড়ির সামনে যখন এসে পৌঁছে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ছোট্ট গ্রামটুকুকে গ্রাস করছে। মকবুল বাড়ির বাইরে গরুছাগলকে ঘাসকুটো খাওয়াতে ব্যস্ত। দূর থেকে তাকে আসতে দেখেই মকবুল মাথা তুলে তার দিকে চায় এবং তাকে চেনা চেনা মনে হয়। কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর মকবুল দৌড়ে এসে তার হাত ধরে বলে—ভাইজান, আপনি, এ সময়ে?

—হাঁ, নানা জায়গা ঘুরে তোমাকে দেখতে এলাম, অনেকদিন এদিকে আসা হয়নি। বল কেমন আছ?

—আপনার দোয়ায় ভালই আছি। মকবুল তার হাত ধরে চলতে চলতে বাইরে থেকেই হাঁক দেয়—আরে ও রোস্তমের মা, দেখে যাও কে এয়েছে। রোস্তমের মা ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে দেখেই লজ্জায় মাথার কাপড় টানে। চলুন, ঘরে চলুন বলে মকবুল আগেই ঘরে ঢুকে একটা কেরোসিন কুপি জ্বালায়। অনুতোষকে ঘরে বসিয়ে—আমি আসছি, বলেই সে বেরিয়ে যায়। মকবুলের ছেলে ও মেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। বাচ্চাদের কাছে ডেকে অনুতোষ তাদের বিস্কুট ও খেজুর খেতে

দেয়। তাদের মা বাবুকে সেলাম দিতে বলতেই বড়টি হাত তুলে সেলাম দেয় আর ছোটটি বড়টির নকল করে হাত তোলার ভঙ্গি করে। অমুতোষ হেসে তাকে কাছে টেনে নেয়। মকবুল একটা ডাব ও পাকা পেঁপে নিয়ে হাজির। পেঁপেটা রোস্তমের মায়ের হাতে দিয়ে ডাবটা কেটে অমুতোষকে দেয়। রোস্তমের মা একটা কলাপাতায় কয়েকখণ্ড কাটা পেঁপে নিয়ে আসে। সারাদিন পরিশ্রমের পর অমুতোষ ডাবটা খেয়ে সত্যই পরিতৃপ্ত। মুখেও তা ব্যক্ত করে। তারপর কয়েকখণ্ড পেঁপে তুলে নিয়ে বাকীটা বাচ্চাদের দেয়। মকবুলকে বলে—তোমার ক্ষতস্থানটা কেমন আছে দেখি।

—আপনার দোয়ায় ভালই আছে।

—সেকি, আমার দোয়া আবার কি? বলো আল্লাব দোয়া।

—তা তো ঠিকই। তবে আল্লাকে তো দেখিনি। আপনার মধ্যে দিয়েই তাকে দেখলাম। কাজেই আপনার দোয়া ছাড়া আর কার দোয়া বলবো বলুন।

অমুতোষ আর কথা না বাড়িয়ে তাকে কাছে ডেকে টর্চ জেলে ক্ষত-স্থানটা ভাল করে দেখে। মুখের দিকটা এখনো বেশ নরম, একটা ছিদ্রের মতো আছে। ভেতরটা শুকিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। তবু ওখান দিয়ে কোন পুঁজ কিংবা রস ঝরে কিনা এবং হাঁটা চলায় ব্যথা কিংবা অন্যকোন অসুবিধা বোধ করে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

—না, আপনার দোয়ায় ওসব কিছু হয় না।

—বেশ, বেশ। তবে পা-টা এখনো সম্পূর্ণ শুকোয় নি। সাবধান, কোন চোট না লাগে। সর্বদা একটা পরিষ্কার নেকড়া জড়িয়ে রাখবে যেন মাছি না বসে কিংবা ময়লা না লাগে। আমি রঘুর নিকট একটা মলম, ব্যাণ্ডেজ, তুলো, এবং কয়েকটা বড়ি রেখে যাবো। মলম লাগিয়ে তুলো দিয়ে বেঁধে রাখবে। দিনে একটা করে বড়ি খাবে। সাবধানে থেকো বলেই অমুতোষ উঠে পড়ে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মকবুল তাকে গ্রামের শেষ অবধি পৌঁছে দেয়। যাবার সময় তার হাতে একটা লাঠি দিয়ে বলে—সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে যাবেন ভাইজান।' এ সময়টা মাঠে ঘাটে নাগনাগিনীর বড় উপদ্রব। সাপের উল্লেখ করতেই অমুতোষের লেংচার কথা মনে পড়ে—হাঁ, কাল রাতে রঘুর আস্তানায় লেংচাকে সাপে কেটেছে। অনেক খিদমত করা হয়েছে। তারপর ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিয়েছেন। মনে হয় বাঁচবে।

—তাই নাকি? কাল একবার রঘুর কাছে যেতে হয়। বলেই সে অনুতোষকে বিদায় দেয়।

মাঠে নেমে অনুতোষ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এ মাঠ দিয়ে সে একবার মাত্র আসা যাওয়া করেছে—তাও দিনের বেলায়। সুতরাং দিক ভ্রমের ফলে যদি বিপথগামী হয়ে পড়ে সেটা হবে খুবই মারাত্মক। সুতরাং ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই পুবের পাহাড় এবং পশ্চিম গগনের তারা দেখে দিক ঠিক করে নেয়। দিনের বেলায় দূর থেকে ঝোপঝাড় গাছপালা আচ্ছন্ন দীঘিটাকে একটা টিলার মতো দেখায়। সুতরাং রাতে মাঠের শেষ প্রান্তে সেটাকে নিশ্চয়ই একটা প্রকাণ্ড নিরেট ঘোর কালো একটা স্তূপ বলেই মনে হবে। এইভাবে নিশানা ঠিক করে সে চলতে আরম্ভ করে। যথা সময়ে দূর থেকে একটা কালো নিরেট স্তূপ তার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। কাছে এসে দীঘির কোণ নির্ণয় করে রাখালদের পথ ধরেই রঘুর আস্তানায় পৌঁছে। সব অন্ধকার কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। রাত তো বেশী হয়নি। রঘু কি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকি অন্য কিছু! সে টর্চ জ্বেলে চতুর্দিক দেখে কুটিরের কাছে গিয়ে রঘু রঘু বলে ডাকতে থাকে। সাড়া নেই। শেষে দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে যায়। ঘরে ঢুকে দেখে বাতি জ্বলছে। রঘুয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন —পাশে লেংচা। অনুতোষ তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে—শরীর উষ্ণ। নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক, পায়ে বাঁধন রয়েছে। রঘুকে ডাকবে, কি ডাকবে না? কিন্তু আগামীকাল কেবল কাক-ভোরেই যে তাকে চলে যেতে হবে। এখানে আসবার অবকাশ হয়তো আর হবে না। সুতরাং দোমনা ভাব ছেড়ে অনুতোষ রঘু রঘু. বলে ডাকতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। চক্ষু মেলে অনুতোষকে দেখেই সে উঠে বসে।—দিনভর আপনার ইন্তেজারি করছিলাম। লেংচার বেহুঁশভাব এখনো কাটেনি। ডাক্তারবাবুকে খবর দেবার পর কম্পাউণ্ডারবাবুকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আর একটা ইন্‌জেকশ্‌ন দিয়ে বলে গেছেন—ফাঁড়া কেটে গেছে। ভয় নেই, ভাল হয়ে উঠবে। গত রাত্রি আমার যে কি ভয় ভাবনা আতংকে কেটেছে। ভোরে আপনি এলেন—স্বপ্নেও যা ভাবিনি! মনে বল ভরসা এলো— লেংচা তাহলে বাঁচবে। ছেলেটাকে ভৈরবী কি যে ভালোবাসতো! ছায়ার মতো ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। ওর মৃত্যুর পর লেংচার সে কি কান্না! দৌড়ে গিয়ে ওর কবরের ওপর আছড়ে পড়েছে। জোর করে

তুলে নিয়ে এসেছি। এখন ওর নিত্য কর্ম, সকাল সন্ধ্যায় ভৈরবীর কবরের ওপর ফুল ছিটানো আর ধূপ ধুনো দেওয়া। মাঝে মাঝে ওখানে চুপটি করে বসে থাকে—রাতেও। মানা শোনে না। বলে—ভয় কি, মরতেই তো চাই—তাহলেই তো মাতাজীর কাছে যেতে পারবো শুনুন কথা! —ফলে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে। ছেলেটার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে। মুসলমান হলে কি হবে, মনে হয় নিজের ছেলে। বাপ মা নেই। এখন আমার কাছেই থাকে—খায়দায় শোয়। যাই আপনার খাবার ব্যবস্থা করি।

অনুতোষ তাকে বাধা দিয়ে বলে—কিছু করতে হবে না। আমার সঙ্গে খাবার রয়েছে। বসো কথা আছে। তোমাদের ঐ পাহাড়ের গায়ের গ্রামগুলি দেখতে গিয়েছিলাম। তোমার সাঙ্গাৎ মকবুলের সঙ্গে দেখা। খুব আদর আপ্যায়ন করলো। ওর জখমী জায়গাটা দেখলাম। ভেতরটা শুকিয়েছে বলেই মনে হলো। ব্যথা বেদনা নেই—এটাই সুলক্ষণ। তবু এখনো সাবধানতা দরকার—কোন চোট যেন না লাগে এবং মাছি না খোঁটে। তোমাকে একটা মলমের কৌটো, কিছু তুলো, ব্যাণ্ডেজ এবং কয়েকটা বড়ি দিয়ে যাচ্ছি। ঐ কৌটো থেকে কিছু মলম ওকে দেবে। মলমটা ঘায়ের জায়গায় লাগিয়ে ঘষবে তারপর তুলো দিয়ে বেঁধে রাখবে। আর একটা করে বড়ি রোজ জল দিয়ে গিলে খাবে। তোমার আর সব রোগীর খবর কি?

—সকলেই প্রায় সেরে উঠেছে। তবে এক বুড়ো—রক্ত আমাশয় ভুগছিলো। তাকে বাঁচানো গেলো না।

—আচ্ছা রঘু, পাহাড়ের লাগোয়া অন্যান্য গ্রামে কি তুমি যাও? এই প্রশ্নের সঙ্গে গ্রামের নামগুলিও অনুতোষ একে একে তাকে শোনায়। রঘুর উত্তরে অনুতোষ বুঝলো সব না হলেও প্রায় গ্রামেই তার যাতায়াত আছে। গ্রামে গ্রামে সেবা শুশ্রূষার জন্য তুমি কয়েকজন শিক্ষানবীশ নাও না কেন? তোমার কাজের অনেক সাহায্য ও পরিশ্রমের লাঘব হবে। দিদি বলছিলেন, প্রয়োজন হলে দু'এক জন লোক তোমার সাহায্যের জন্য পাঠাতে পারেন।

—ঠিক বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে বিষয়টা ভাবি। লেংচা সেরে উঠলে তাকেই প্রথমে সেবাকর্মে তালিম দিই, কি বলেন? ছেলেটা কর্মপটু ও বুদ্ধিমান। আর লোকের কথা যা বললেন তা পেলে তো

রীতিমতো একটা সেবাশ্রম গড়ে তোলা যায়। এখানে থাকা খাওয়ার তো অসুবিধা নেই।

—হুঁ, বলেই অনুতোষ রঘুকে আর এক প্রশ্ন করে—আচ্ছা রঘু, তুমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকজনের দেখভাল করো, তারাও কি তেমনি তুমি অসুস্থ হলে তোমাকে দেখবে ?

অনুতোষের এই আচমকা প্রশ্নে রঘু ভেবাচাকা হয়ে বলে—তা তো কোন দিন ভাবিনি দাদাজী। আমার এরূপ কিছু তো ঘটেনি। তবে তারা সকলেই আমাকে মানেগণে, আদর আপ্যায়ন করে আর কলামূলা শাকসব্জি যখন যা পারে পাঠিয়ে দেয় কিংবা নিয়ে আসে। তবে হাঁ, এই রাখালরা আমার জন্য সব কিছু করতে পারে। এর মধ্যে লেংচা হঠাৎ গোঙানি দিয়ে নড়ে ওঠে। অনুতোষ কাছে গিয়ে দেখে সে চক্ষু মেলে তাকে দেখছে। রঘু তা দেখে কিছু না বলে উঠে গিয়ে গরম দুধ নিয়ে এসে চামচ দিয়ে লেংচার মুখে দিতে থাকে। কিছুটা খেয়ে লেংচা পুনরায় চোখ বোজে।

অনুতোষ উঠে পড়ে টর্চ হাতে গামছা নিয়ে বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে দেখে রঘুয়া ফলমূল সাজিয়ে দুধের বাটি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনুতোষ আপন ঝোলা থেকে বিস্কুট খেজুর ইত্যাদি বার করে উভয়ে ভাগাভাগি করে খায়। খাওয়া শেষে অনুতোষ রঘুয়ার ওষুধের বাক্সটা খুলে দেখে এবং যে যে ওষুধের প্রয়োজন তা নিজের ব্যাগ থেকে তুলে তাতে রেখে মকবুলের ওষুধ তার হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। অতঃপর ছেলেদের খেলাধুলো কেমন চলছে সে খোঁজ নিয়ে শুয়ে পড়ার আগেই বলে—রঘু, কাল খুব ভোরেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে আর হয় তো শীঘ্র আসতে পারবো না।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই অনুতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে দেখে রঘু তখনো নিদ্রামগ্ন আর লেংচা চক্ষু মেলে চেয়ে আছে। কথা বলতে নিষেধ করে অনুতোষ তার পাশে বসে হাতের শিরা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দেখে রঘুকে ডাক দেয়। সে উঠে বসতেই লেংচার অবস্থা জানিয়ে নিজের ঝোলা থেকে লেংচার জন্য খেজুর বিস্কুট ইত্যাদি রঘুর হাতে দিয়ে বলে—ডাক্তার বাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে তার অনুমতি পেলেই লেংচার পায়ের বাঁধন খুলবে—নচেৎ নয়। অতঃপর অনুতোষ লেংচার মাথায় হাত বুলিয়ে শীঘ্রই সেরে উঠবে, এই সান্ত্বনা দিয়ে ঝোলা কাঁধে

বেরিয়ে পড়ে। রঘুও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। কথা প্রসঙ্গে অনুতোষ রঘুকে প্রশ্ন করে—লোকজনের সেবা শুশ্রূষার মধ্যে সে আনন্দ পায় কিনা।

—নিশ্চয়ই। লোকজনের দেখভাল করা ছাড়া আমার তো অন্য কোন কর্ম নেই। আমি মুখ্যুস্থখ্যু মানুষ—আমার তো কোন ধর্ম নেই। মোতিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেব, ধর্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি একেবারে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি। মন থেকে ঐ সব বিশ্বাস একেবারে উপড়ে ফেলেছি। আপনি তো জানেন না দাদাজী বচ্‌পনছে সারাটা জীবন আমার কি কষ্টে কেটেছে! সে অনেক কথা—এক মহাভারত। কিন্তু মোতিয়াকে শেষমেষ যখন পেলাম তখন কত আরাধনা, প্রার্থনা, মানৎ করলাম—ভগবান আর যেন ওকে হারাতে না হয়! কিন্তু কে ভগবান, কোথায় ভগবান! সব বিফল হলো! একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঘু চুপ হয়ে যায়।

অনুতোষ রঘুয়ার মর্ম বেদনা অনুভব করে দাঁড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার হাত ধরে বলে—রঘু যাত্রা দেখেছ? আমাদের জীবনটা ঠিক যেন একটা যাত্রার আসর। আমরা সকলে জীবনব্যাপী নানা ভাবে, নানা রূপে নেচে-কুঁদে এখানে অভিনয় করি,—কখনো রঙচঙ মেখে কখনো মুখোস পরে কখনো বা খালি সাদা মুখে। যাক্‌গে ওসব অনেক বড় বড় কথা—হয়তো আমাদেব সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাইরে। যা করছো—পর সেবাই পরম ধর্ম। এর চাইতে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। তাই মন প্রাণ দিয়ে চালিয়ে যাও। এমন দিনও হয়তো আসতে পারে যখন আমাদের শুশ্রূষার জন্য তোমার ডাক পড়বে। অনুতোষ আর দাঁড়ায় না। বুড়োশিবতলা থেকে মাঠে নেমে পড়ে। একটা অস্বচ্ছ কুয়াশা মাঠের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্য পুবপাহাড়ের পেছন থেকে উঠি উঠি করছে। অনুতোষ তার অভিযানের—অনুসন্ধান সমীক্ষার—অন্তিম পাদ—চম্পকারণ্য অভিমুখে চলতে থাকে। রঘুয়া অনুতোষের শেষ কথার ইংগিত বুঝতে না পেরে বাক্যহীন হত বুদ্ধি হয়ে অনুতোষের চলমান অস্পষ্ট মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে।

পুলিশ ও তার গুপ্তচরদের সতর্ক দৃষ্টি ও বিরক্তিকর অনুসরণ এড়াবার উদ্দেশ্যেই মহারাজ রাতের মেল ট্রেনের পরিবর্তে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভিন্ন বেশে কলকাতা রওনা হন। আগে থেকেই স্টেশনে গুরখা ও বাঘা পুলিশ কিংবা গুপ্তচর ঐ ট্রেনে ওঠে কিনা তা সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রেখেছে এবং ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে মহারাজকে তা অবহিত করে। তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত মনে ভোর নাগাদ ট্রেন থেকে নেমে ষ্টীমারে এসে ওঠেন। ষ্টীমারের যাত্রা শেষে দুপুর নাগাদ আবার ট্রেনে চেপে বসেন। ট্রেনেই তিনি কলকাতা থাকাকালীন স্বীয় কাজ কর্মের সুপরিকল্পিত একটা ছক তৈরি করেন। সন্ধ্যার পর কলকাতা এসে পৌঁছান। স্টেশনের গেট দিয়ে বেরোবার কালে তিনি সারিবদ্ধ যাত্রীদের পেছন পেছন চলতে থাকেন। গেটের বাইরে এবং আশপাশের লোকজনদের মধ্যে তার অভিজ্ঞ চোখ পুলিশের গুপ্তচরদের লক্ষ্য করে। তাদের সম্মুখ দিয়েই তিনি গেট পেরিয়ে বাইরের প্ল্যাটফরমের যাত্রীদের মধ্যে মিশে যান। কেহ তাঁকে লক্ষ্য কিংবা অনুসরণ করেনি। এখন সমস্যা হল কিভাবে বেশ পরিবর্তন করা যায়। কেননা এ-বেশে হোটেলে ওঠা উচিত নয়। সুতরাং উপস্থিত বুদ্ধি মতো তিনি বাইরের প্ল্যাটফরমের এক কোণে সাধারণ যাত্রীদের শৌচাগারে প্রবেশ করে চট্ করে একটার মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করেন। কিছুক্ষণ পর ভিন্ন বেশে বেরিয়ে আসেন। অতঃপর স্টেশনের সন্নিকটস্থ একটা সাধারণ হোটেলে ভিন্ন নামধাম লিখিয়ে একরাত্র ও এক দিনের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঘরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহারাদি সারেন। তারপর হোটেলের দরজা রাত্রি ক'টায় বন্ধ হয় জেনে ঘড়ি দেখে বেরিয়ে যান।

হ্যারিসন ও সারকুলার রোডের মোড়ে এসে আপার সার্কুলার রোড ধরে মির্জাপুর ছাড়িয়ে কিছুদূর চলে বাঁহাতি একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপর ডানদিকে মোড় নিয়ে ছোট একটা অন্ধ গলিতে প্রবেশ করে গলির শেষ দিকের একটা বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়েন। কিছুক্ষণ পরে ভেতর থেকে বামা কণ্ঠের—কে, প্রশ্নের উত্তরে নিজ পরিচয় দিয়ে মহারাজ পাকরাশি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরের

প্রত্যাশায় আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে যায়। এক মহিলা—আসুন, আসুন বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।—একে রাত্রি তার উপর পরিচয়টা ঠিক ধরতে পারিনি। ফলে আপনার হয়রানি হলো।

—না না, ও কিছু নয়। তোমরা সব কেমন আছ বলো।

—বৈচিত্র্য কিছু নেই। জীবনযাত্রার ধারা সেই একই খাতে বয়ে চলেছে। তবে দাদার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। কথা বলতে বলতে উভয়ে ঘরে ঢোকে। মহারাজকে দেখেই পাকরাশি খাট থেকে নেমে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে খাটে নিয়ে বসিয়ে বলেন —কেমন আছ, কবে এসেছ, কোথায় উঠেছ ইত্যাদি এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করেন।

উত্তরে মহারাজ জানান—ঘণ্টা তিনেক পূর্বে শেয়ালদায় নেমে স্টেশনের নিকটে একটা হোটেলে উঠেছি। তারপর স্নানাহারাদি সেরে সটান তোমার এখানে এসে হাজির। আমার কথা থাক। নিরুপমা বললে,—তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। কেন, কি হয়েছে ?

—সে তো তোমাকে জানিয়েছি। সেই যে ক্যাম্পে সংঘর্ষের সময় পুলিশের লাঠি পেটা। তারপর চললো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও অত্যাচার। ফলে শরীরটা গেল ভেঙ্গে। এখনো মাঝে মাঝে পেটে তীব্র ব্যথা এবং পিঠের শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা অনুভব করি। ডাক্তার দেখাই সাময়িক বিরতি হয়, কিন্তু সারে না। যাক, আমার পাঁচালি তো শুনলে, এখন তোমার কাহিনী বলো, শুনি।

—আগে বলো মা কোথায় ? তাঁকে তো দেখলাম না। ভাল আছেন তো ?

—না, শরীর ভাল নয়। বৃদ্ধা হয়েছেন। আমার মতো একটা না একটা লেগেই আছে। তার উপর নানা দুশ্চিন্তায় জর্জর। সংসারের হাল নিরুপমা একাই টেনে চলেছে। মা হয়তো ঘুমিয়েছেন। জাগা থাকলে তোমার নাম শুনে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন।

—হুঁ, আমি এসেছি বিদ্যাপীঠ আর আশ্রমের কাজে। এই রথ দেখার সঙ্গে যদি কলাটা মূলাটা—বেচা নয়, কিনে নিয়ে যেতে পারি।

—ভাল কথা। তোমার চিঠির বয়ানে বায়রণের যে কবিতাটা কোট (quote) করেছ তা ডিকোড (বিশ্লেষণ) করে যা বুঝেছি তার উত্তর চিঠিতে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এসেছ ভালই হয়েছে। ঐ যা বললে—কলা

মুলার বেসাতি—তা নিজেই সরজমিনে দেখে শুনে বুঝবে—কিনতে পারবে কিনা। এখানে সব কিছুরই বিক্ষিপ্ত অবস্থা—যে যাঁর গাঁয়ে আপনি মোড়ল। তবে হাঁ, দত্ত ও মুখুজ্যেদা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যথাযথ সাহায্য ও সংহতি রক্ষার চেষ্টা করছেন। এসব ছাড়া আর একটা ব্যাপার ঘটেছে —এই যাকে বলে গোদের উপর বিষ-ফোড়া। বিষয়টা তুমি ভাসা ভাসা জানলেও বিষদভাবে হয়তো ওয়াকিবহাল নও। ভারতের বাইরে রুশ মদৎ-প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান মানবেন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টি এদেশের মাটিতে সবে এসে শেকড় গাড়বার চেষ্টা করছে। এখন তার শৈশব অবস্থা। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন আন্দামান ও জেল-ফেরৎ বিপ্লবীদের আকৃষ্ট করেছে। যারা মুখে বলশেভিকদের গুণ কীর্তন ও মার্কসিস্ট বুলি কপচানো ছাড়া মূলতঃ আর কিছুই করতো না তারাই মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হয়ে দল ভারি করবার তালে আছে। তাদের এই সুযোগ মুখ্যত বৃটিশ সরকারই এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে সরকার ভারতের এই শিশু কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। আন্তর্জাতিক বলশেভিক চক্রান্তের ধুয়ো তুলে সারা দেশে হানা দিয়ে মণ মণ কম্যুনিষ্ট পুঁথিপত্র বাজেয়াপ্ত এবং কয়েকজন কম্যুনিষ্টদের ধরপাকড় করে মীরাট ষড়যন্ত্র নাম দিয়ে এক কেস খাড়া করে। সেখানে তাদের বিচার কিংবা তাব প্রহসনই বলো কয়েক বৎসর ধরেই চলছে। ব্রিটিশ রাজ এইভাবে making mountain of a mole hill—তিলকে তাল করে—কম্যুনিষ্টদের অহেতুক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কম্যুনিস্টদের দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি বয়ান এবং কর্মের ফিরিস্তি কম্যুনিজম প্রচারের মস্ত সুযোগ এনে দিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অধিকারীর নাম হয়তো তোমার স্মরণে আছে। তিনি জেলেবন্দীদের মুখপাত্র হয়েছেন এবং এই সুযোগে নানা বুলি কপচাচ্ছেন। তার মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর ধোঁকাবাজ বুলি হলো বিপ্লবীদের দেশোদ্ধার ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ। তাঁর বক্তব্য হলো ওটা ভুল এবং ভুয়া। কেননা ধর্মের ভিত্তি হলো বিশ্বাস নির্ভর এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোঁড়ামি প্রসূত। উভয়েই সমাজে কুসংস্কার, কুআচার, এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী। তা ছাড়া ধর্মের বুলি একান্তই সাম্প্রদায়িক—যা গান্ধিজী করে চলেছেন। তাতে সাম্প্রদায়িকতা—সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি, হিংসা দ্বেষ ও ঈর্ষা বাড়ছে বই কমছে না। সর্বস্তরে ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে

সংযোগ ও মিলন ঘটছে না। স্বাধীনতা লাভের জন্য একমন একপ্রাণ হয়ে জনযুদ্ধের ভিত তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু কম্যুনিজম একান্ত যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মার্কসবাদের সমগ্র ইমারতটির অবিনাশী ভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সেজন্য মার্কসীয় দর্শন কুম্যুনিষ্টদের নিকট বিপ্লবীদের গীতার মতোই অবিসংবাদী আদর্শ। এই আদর্শের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েই রাশিয়ায় পৃথিবীর এক অভূত-পূর্ব সর্ববৃহৎ বিপ্লব সংঘটিত ও ফলপ্রসূ হয়েছে। সেখানে সমাজের শোষকশ্রেণীর উৎখাত করে সমতা সমানাধিকার—যাকে বলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মার্কসিষ্টদের সম্পর্কে পাকরাশীর এই বিশ্লেষণী বক্তব্য শেষ অবধি মহারাজ মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং কিছুক্ষণ নির্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে থাকেন। তারপর—হুঁ, বলেই ঘড়ি দেখে উঠে পড়েন।—এখন চলি ভাই। আর দেরী করলে হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। মাকে আমার প্রণাম জানিও। তাঁর সঙ্গে পাকরাশি দরজা অবধি তাঁকে বিদায় দিতে এসে বললেন—কেবল আমার কথাই শুনে গেলে। তোমার কথা তো কিছু জানলাম না।

মহারাজ দরজার বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—হাঁ, এক মহা-যজ্ঞানুষ্ঠানের চেষ্টায় ব্যাপৃত আছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে তার স্বাক্ষর রেখে যেতে চাই। এই রক্তযজ্ঞে সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্তই কাম্য। কিন্তু তুমি যা বললে তা হতাশব্যঞ্জক। যাক্‌গে এসব বাধার সম্মুখীন সত্বেও—যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয় হয়ে আমাদের এগোতেই হবে। যাবার আগে সময় পেলে আবার আসবো। নিরুপমাকে আশীর্বাদ দিও। শুভমস্তু বলেই মহারাজ দরজার বাইরে গলিতে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

পরদিন খুব ভোরেই স্নানাদি সেরে মহারাজ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েন। আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হয়ে উড়ে বাজারের পেছনে উড়ে বস্তির গলিতে এক মেসে গিয়ে উপস্থিত হন। মহারাজ যার খোঁজে এসেছেন তিনি সম্প্রতি এ অঞ্চলেরই অন্য এক গলির মেসে উঠে গেছেন। ঠিকানা নিয়ে মহারাজ এক এঁধো গলির মেসের চিলে কোঠায় গিয়ে হাজির। ঘরের কর্তা তখন খাটে বসে দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছেন। মহারাজকে

দেখেই তিনি অবাক। খাট ছেড়ে দুয়ারে এসে হাত ধরে তাঁকে নিয়ে খাটে বসিয়ে বলেন—কেমন আছ, কবে এলে?

স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় জবাব দিয়ে মহারাজ বললেন—ঠিকানা বদলের সংবাদ এবং আমার ইতিপূর্বেকার চিঠির তুমি তো কোন জবাব দাও নি।

—আরে ভাই, বল কেন। ওখানে হঠাৎ টিকটিকিদের এত উপদ্রব শুরু হলো যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তার উপর অন্যদের সঙ্গে এক রুমে থাকা আর এক ঝকমারি বিশ্রি ব্যাপার। তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর এঁধো গলির এই চিলে কোঠার সন্ধান পেয়ে তড়িঘড়ি উঠে এসেছি। তোমাকে সংবাদ দিতে পারিনি। তাছাড়া তোমার চিঠির উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। তাই চুপ করে থেকে ভাবছিলাম বিঘ্ন কিছু না ঘটলে তুমি অবশ্যই একদিন সশরীরে উপস্থিত হবে। তা আমার আশা সফল হলো তো। কলম মারফৎ না জেনে নিজেই এখন সব দেখে শুনে ওয়াকিবহাল হতে পারবে। একটু বসো ভাই। আমি মুখ ধুয়ে চায়ের কথা বলে আসছি। ভাল কথা তোমার আবার চা-টাতে আপত্তি নেই তো! যা কট্টর গোঁড়া সন্ন্যাসী তুমি! কথা শেষে হাসতে হাসতে তিনি গামছা কাঁধে বেরিয়ে যান। ফিরে এসে খাটের ও-পাশ থেকে ছোট্ট একটা কাঠের টুল সামনে এনে বসে পড়েন।

গৃহকর্তার বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের সময়টুকুর মধ্যে মহারাজ ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদটা ঘুরে পাড়ার পরিবেশ লক্ষ্য করে ফিরে এসেছেন। গৃহকর্তা খাটে বসতেই তিনি বলেন—খুঁজেপেতে পাড়াটা ভালোই আবিষ্কার করেছ। বাড়ির ছাদগুলো অত কাছাকাছি যে একজন এ-ছাদ থেকে ও-ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকদূর চলে যেতে পারে। মনে পড়ে চিৎপুরের সেই ছাড়াবাড়িটার কথা? রাতের মিটিং-এ আচম্বিতে বাড়ি ঘিরে পুলিশের হানা! সে সময় কি ভাবে আমরা ছাদের পর ছাদ ডিঙিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে সরে পড়ে পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়েছি!

—হাঁ, কিন্তু এখন আর পারবো না হে। শরীর ভারি হয়ে গেছে। যৌবনের টগবগে উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়েছে। ইচ্ছা থাকলেও হয়তো পারবো না। যাক্‌গে, তোমার চিঠির বয়ান—ভৃত্য চা-টা নিয়ে হাজির হওয়ায় কথায় বাধা পড়ে। খেতে খেতে পূর্ব-কথার জের টেনে আরম্ভ করেন—ছোট খোকা—রিভলবার পিস্তল ইত্যাদি Short range weapons যোগাড় করা সম্ভব। কিন্তু বড়খোকা—বন্দুক রাইফেল ইত্যাদি Long range

weapons-এর সোর্স হলো—ডক আর মিলিটারি। পুলিশ ঐ সব জায়গায় জাল পেতে রেখেছে। ঐ জাল কেটে ওসব বের করে আনা খুবই কষ্টসাধ্য এবং বর্তমান অবস্থায় প্রায় দুঃসাধ্য বলা যায়। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় যে কোন আর্মারি—তা পুলিশ কিংবা মিলিটারি যাই হোক না কেন—রেইড করা। ভাল কথা, এতবড় দুঃসাহসিক কর্ম—ট্রেজারি লুট করতে পারলে কিন্তু ব্যাঙ্কে হাত দিলে না কেন?

মহারাজ হেসে বলেন—ওতে নগদ মাল বেশি কিছু থাকে না। পোস্ট আপিসের মতো সিংহভাগই থাকে খাজানাখানায়, বুঝলে হে। এখন বলো এখানের বিপ্লবীদের সংগঠনের অবস্থাটা কি? পাকরাশীর কাছে যা শুনলাম তা আশা ব্যঞ্জক মনে হলো না। মীরাট কন্‌স্‌পিরেসি মারফৎ দলের মধ্যে নাকি বলশেভিজম, কম্যুনিজম্ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ—যাকে বলে ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন ঘটেছে।

—হ্যাঁ, পাকরাশি এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। কাজেই সে এ-সব বিষয়ে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। তবে কি জান, আমাদের যে কয়জন বন্ধু এতে ঝুঁকেছে তারা সত্যই মার্কসীয় দর্শন বিশ্বাস করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই দলে এমন কিছু বুদ্ধিজীবী—প্রফেসর, মাষ্টার ইত্যাদি ধনপতিদের দুলাল জুটেছে তাদের দ্বারা একমাত্র আত্মপ্রচার ছাড়া বলশেভিকধারায় সর্বহারাদের বিপ্লব কতদূর সার্থক ও সফল হবে তা যথেষ্ট সন্দেহাত্মক। এসব তত্ত্ব বিচারের কচকচানি করে এখন লাভ নেই। ভবিষ্যতই এসব তত্ত্বের সার্থকতা প্রমাণ করবে। যাক্‌গে, তুমি ম্যান চাও না, মেটিরিয়েল চেয়েছো। মার্কস-এর কথায় ম্যাটার মানে বস্তু—অর্থাৎ তুমি একজন যথার্থ বস্তুবাদী। এতে কোন দ্বন্দ্ব নেই —বলেই তিনি হাহা করে হাসেন। তবে তোমার বিষয়টা মুখুজ্যে মশায়ের গোচরে এনে দেখি।

উত্তরে মহারাজ বলেন—দেখো। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেনন' আমার অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ আর মাত্র একদিন। এরপর আত্মপ্রকাশ করে বিদ্যাপীঠ ও আশ্রমের কাজ শেষ করে চলে যাবো। তাও সময়ের সীমারেখায় মাত্র তিন দিন। এই ফাঁকে যদি কিছু বেসাতি নিয়ে ফিরতে পারি। কথা শেষে তিনি ঘড়ি দেখে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করেন— ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে কখন দেখা করা যায়?

—কে, কোন ঘোষ? ঘোষ তো অনেকেই আছেন।

—আরে বুঝতে পারলে না—যাঁর কার্যকলাপ ও কলম থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি।

—ওঃ বুঝেছি। তৃতীয় আশ্রমোর্ধ্ব বয়সী ঘোষ মশাই। কেন তাঁর সম্পর্কে কিছু জান না ?

—শুনেছি, কিন্তু জানি না।

—আরে বসো বসো। হাঁ, ভক্তি ও সম্মান জানাতে নিশ্চয়ই যাবে। তবে দুঃখ-পূর্ণ ঘটনা, মোষ্ট ট্র্যাজিক—সাক্ষাতের পর মনে হবে নিট ফল—একেবারে শূন্য—হতাশা! না এলেই হয়তো ভালো হতো। কারণ ঐ বয়সে তিনি পঞ্চাশোর্ধ্বা, পুত্রপুত্রী সহ এক বিধবা শিক্ষয়িত্রীর পাণিপীড়ন করেছেন! বৃদ্ধস্য তরুণী—যিনি বহু বৎসর আগেই তারুণ্য ফেলে এসেছেন—ভার্যা মনে মনে করে তাঁকে নিয়ে তিনি মশ্‌গুল! এমন কি বলেন—রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সিনেমা না দেখলে তাঁর ভালো ঘুম হয় না! অতঃপর সখেদে—কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্—বলেই তিনি গম্ভীর হয়ে যান। মহারাজ আর বাক্য ব্যয় না করে বিষণ্ণ চিত্তে চিলেকোঠা ত্যাগ করেন।

রাস্তায় নেমে চলতে চলতে মহারাজার কানে তখনো ব্যানার্জির দুঃখার্ত কাতর কণ্ঠোক্তি বাজছে—কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্! একজন লক্‌আপ-এ ভগবৎ মহিমা উপলব্ধি করে বিপ্লবকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাণপ্রস্থে গিয়ে আশ্রম গড়ায় মত্ত হলেন! আর একজন এতবড় বিপ্লবী—ঘোর সংসারী হয়ে সংসার চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এর চাইতে আশ্চর্য আর কি হতে পারে! কিন্তু কেন এই অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম! এই কি তবে মানব মনের স্বাভাবিক বিবর্তন ও তার প্রতিক্রিয়ার পরিণতি! এক জায়গায় এক কর্মে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে অপারগ! এক লক্ষ্য থেকে আর এক লক্ষ্যে—কেবলই নতুনের সন্ধানে খুঁজে মরে! ভালো কি মন্দ সে বিচার তার নিকট তখন গৌণ ও অবান্তর! বৈপ্লবিক সত্তা ও চিন্তাধারা বজায় রেখে ভিন্ন পথের মাধ্যমে মূল লক্ষ্য—স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ঐ আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়াটা আশ্চর্য নয় কি ? এই সব আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ব্যাপার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মাপকাঠিতে নাগাল পাওয়া যায় না। বিপ্লবীদের জীবন—যেখানে নিয়তই চলেছে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি; অস্ত্রের ঝণৎকার, "জীবন মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য" সেখানে এই সব চিন্তা অবান্তর ও তাদের গণ্ডীর বাইরে।

বৌবাজারের মোড়ে এসে ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করে মহারাজ শ্যাম-বাজারগামী একটা ট্রামে উঠে পড়েন। শ্যাম পুকুরের সামনে নেমে গলির মধ্যে ঢুকে একটা বাড়ির দুয়ারে এসে কড়া নাড়েন। একটি ছেলে দরজা খুলে দিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে ভেতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি মহারাজের হাত ধরে—এসো এসো, বলে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—বহুদিন তোমার কোন খবর নেই। কেমন আছ, কবে এলে, কোথায় উঠেছ ?

তাঁর জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিয়ে মহারাজ বলেন—এসেছি বিদ্যাপীঠ ও আশ্রমের কাজে। এই ফাঁকে পুরনো সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা, আলাপ আলোচনা করে জানবার ইচ্ছা—বৈপ্লবিক কাজকর্ম কিভাবে এগোচ্ছে। কোথায়, কিভাবে সরকারকে আঘাত হানার পরিকল্পনাও প্রস্তুতি চলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যদি কিছু পাথেয় নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এখানে এসে এ যাবৎ যাঁদের যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে তাঁদের মুখে যা শুনলাম তা খুব উৎসাহ ও আশাব্যঞ্জক নয় বলেই মনে হলো। দলের মধ্যে নানা মতভেদ। অবশ্য তা আগেও যে না ছিলো এমন নয়। আর আমার মতে মতভেদ থাকাও দরকার। কেননা তাই একপ্রকার কষ্টিপাথর যার মাধ্যমে একটা খাঁটি সিদ্ধান্তে আসা যায়, তুমি কি বলো ?

অতি সত্যি কথা। এর জন্য দরকার একটা আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা। এই নিয়ে আমি চিন্তাভাবনা করছি।

মহারাজ উৎসাহের সঙ্গে সায় দিলেন—অতি উত্তম প্রস্তাব। বর্তমান পরিস্থিতিতে সময়োপযোগী ও একান্ত জরুরী। এর ফল হবে সুদূর-প্রসারী।

—হাঁ। তবে ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ। কেননা স্থান কাল নির্ধারণ, নির্ঘণ্ট প্রণয়ন ইত্যাদি সব কিছুই করতে হবে পুলিশ ও তাদের টিকটিকি-দের চোখের অন্তরালে। ভাল কথা, তুমি এখানে কয়দিন আছ ?

—আমার এখানের মেয়াদ আর বড় জোর চাররাত্রি।

—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তো তা সম্ভব নয়, ভাই। কারণ সবাইকে খবর দিতে হবে। তাদের মধ্যে কিছু আত্মগোপণকারীও রয়েছে। পুলিশের হামলার আশঙ্কায় সব কিছুই আটঘাট বেঁধে করতে হবে। না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে

একটা বিকল্প আমার মাথায় এসেছে। আমাদের কিছু নতুন রিক্রুট এবং শুভাকাঙ্ক্ষী আছে। তারা অধিকাংশই ছাত্র। এদের মধ্যে মেডিকেল ছাত্রও আছে। তাদের নিয়ে বিপ্লবী কর্মধারা আলোচনার জন্য একটা অধিবেশন ডাকলে কেমন হয়? তুমি শিক্ষক—ছাত্রদের কি ভাবে বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং বিপ্লবী কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাতে তুমি সুদক্ষ। বর্তমানে কিছু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পুঁথিপত্র পড়ার ঝোঁক এসেছে। আমরা যেরূপ গীতা পাঠ করে অনুপ্রাণিত হচ্ছি তারাও নাকি তদরূপ ঐসব পাঠ করে প্রেরণা পাচ্ছে। গীতা ধর্মপুস্তক সুতরাং তাদের নিকট তা ব্রাত্য ও বর্জনীয়।

—কিন্তু ঐ যা বললে—বলশেভিজম্ কিংবা কম্যুনিজম সম্পর্কে আমার স্পষ্ট জ্ঞান কিংবা ধারণা কিছুই প্রায় নেই। কেননা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অবকাশ আমার ঘটে নি।

—এ প্রশ্ন তো এখানে অবান্তর। আমরা আমাদের ধ্যান, ধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। এ ভাবেই সংগ্রাম চালিয়ে শত্রুর কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। নবাগতদেরও সে-ভাবে প্রেরণা যুগিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্প তো কিছু নেই। দেশের অন্যান্য দল তাদের নিজস্ব ধারায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, করুক। আমরা তো তাতে বাগড়া দিচ্ছি না। এই তো দেখ গান্ধিজী—তিনি কত কিছুই না করে চলেছেন! স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এখন আবার লবণ আইন ভঙ্গ করার তোড়জোর শুরু করছেন। হালে কম্যুনিষ্ট ভাবধারা সম্পর্কে কিছু কিছু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী আগ্রহান্বিত হয়েছেন। এতো সত্যি কথা ফরাসী বিপ্লবের পর এতবড় বিপ্লব পৃথিবীতে আর ঘটে নি। ফরাসী বিপ্লবে রাজতন্ত্র খতম করে প্রথম সাধারণতন্ত্র যাকে বলা যায় প্রায় মধ্যবিত্ত (কম্যুনিষ্ট আখ্যায় বুর্জোয়া) শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করে। সমাজব্যবস্থায় বিশেষ কিছু অদল বদল ঘটায় নি। কিন্তু রুশ বিপ্লবে রাজতন্ত্র, মধ্যবিত্ত, কুলাকতন্ত্র ইত্যাদি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ভাষাগত ভাবে (প্রলেতারিয়া) কৃষক, মজদুর গণসমাজবাদীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

—বাবা, তুমি দেখছি ওসব থিওরি একেবারে গুলে খেয়েছ।

—আমরা স্বাধীনতার পূজারী। পৃথিবীতে এতবড় একটা ভাবধারার

বন্যা কিভাবে পুরনো ধ্যান ধারণা চিন্তা একবারে ভাসিয়ে নিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলো তার সবটা না হলেও কিছু কিছু জানা দরকার বৈকি। কারণ আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে তা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা।

—তা জেনে কি বুঝলে? বিষয়টা আমি তর্কের খাতিরে তুলছি না। আমার জ্ঞানাহরণের উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করছি।

—দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ মতবাদ প্রয়োগ করে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন খুবই দুরূহ। বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকখানায় এ বিষয়ে আলোচনার তুফান তুলতে পারা যায় বটে। কেন না তাদের তো কর্মক্ষেত্রে নেমে তা প্রয়োগ করবার বালাই নেই। কিন্তু ভাই চিন্তা করে দেখ, যে দেশে বর্তমানে ৮০ শতাংশ লোক অশিক্ষিত, ধর্মীয় কুসংস্কার, কুআচার কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন সেখানে সাম্যবাদী তত্ত্ব ধাতে সইবে কেমন করে! কম্যুনিষ্ট থিওরিতে ধর্ম হলো আফিং-এর মতো সাংঘাতিক। ফলে ঐ নেশায় মত্ত জনগণ ধর্মের কানা গলিতে অন্ধের মতো ছুৎ-অছুৎ ভেদাভেদ নিয়ে পরস্পর ঠোকাঠুকি করে ঘুরে মরছে! এর উপর রয়েছে আবার শাসক ও শোষক শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থ। যারা ধর্মধ্বজা ও ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিসম্বাদ জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটছে। পরিস্থিতি কোন দিকে চলেছে লক্ষ্য করো—স্বাধীনতা, স্বাধিকাব লাভের জন্য হিন্দু মুসলমান একমন একপ্রাণ হয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই না করে নেশাখোরের মতো উন্মত্ত হয়ে পরস্পর দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি করে সাম্প্রদায়িকতার পাঁকে হাবুডুবু খেয়ে মরছে! গান্ধিজীর জনগণকে নিয়ে অসহযোগ, বিদেশীবর্জন, সত্যাগ্রহ, অনশন, লবণ আইন ভঙ্গ, রাম রহিমকে যুদা না করো ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ও স্লোগান পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বোধকে তো দৃঢ় করতেই পারেনি বরং নড়বড়ে করে দিয়েছে। অধিকন্তু ঐ সব জিগির ধর্মীয় মৌলবাদ ও গোঁড়ামির পাষাণ খণ্ডে আছড়ে পড়ে উল্টোফল ফলিয়ে চলেছে। এবং স্বার্থান্বেষিদের উসকানিতে নিত্য নতুন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কম্যুনিষ্ট মত—বস্তুবাদ (অবজেক্টিভিজম্) ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদ (সাবজেক্টিভিজম্) ও অদৃষ্টবাদ (ফেটালিজম্)-এর নিকট পরাভূত হওয়া অবধারিত। সুতরাং সরকার ও স্বার্থান্বেষিরা যা নির্দেশ (প্রেসক্রাইব) করছে ঘটনা (ইভেন্টস্) তদরূপই ঘটে চলেছে আর জনগণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ

(সাবস্ক্রাইব) করে মারদাঙ্গায় ব্যাপৃত হয়ে দেশটাকে অনিবার্য এক মারাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সুতরাং এই দারুণ বিপর্যয় প্রতিরোধ কল্পে আগে চাই আমাদের স্বাধীনতা ও স্বরাজ। এবং তা রক্তাক্ত বিপ্লব ব্যতীত ছিনিয়ে আনবার অন্য কোন পন্থা নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সে বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতোই মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) দের দ্বারাই সম্ভব এবং করতে হবে। অটল বিশ্বাস নিয়ে আমাদের সেদিকেই এগিয়ে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। স্বাধীনতা স্বরাজ অর্জিত হলে দেখবে এই সব আত্মঘাতী সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, হিংসা দ্বেষ সব কর্পূরের মতো উবে যাবে—ধর্মান্ধতার ভূত পেত্নিরা সব আমাদের কাঁধ থেকে নেমে চিঁ-চিঁ করতে করতে ঝেঁটা মুখে নিয়ে পালাবার পথ পাবে না।

বাহবা। সাধু সাধু!! তোমার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল ভাষণের জন্য ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আলোচনা সভা যদি কার্যত নতুন রিক্রুটদের নিয়ে করতে চাও তা হলে আজ কিংবা আগামী রাত্রের মধ্যেই তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে স্ব-নিবাস থেকে বেরিয়ে পড়েছি এবং এখানে ভিন্ন সাজে ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে এক এক রাত্রি যাপন করছি। আগামী তৃতীয় দিনে স্বনামে স্ব-মূর্তিতে অন্য এক হোটেলে উঠবো। তারপর দু'দিনের মধ্যেই বিদ্যা-পীঠ ও আশ্রমের কাজ কর্ম সমাধা করে প্রত্যাবৃত্ত হবো।

—তোমার পাত্তা কি ভাবে পাবো বলো। আর মাল কড়ির ব্যাপারে তুমি নিজেই তা সরজমিনে দেখে ঠিক করতে পার। পছন্দসই হলেই টাকা ও মাল নিয়ে যাবার ব্যবস্থার কথা উঠবে। এ ব্যাপারে আমার লিঁয়াজো (সংযোগকারী) জানা আছে। সুতরাং তোমাকে কখন কোথায় কিংবা আমার এখানে পাবো বলো।

—আমার পাত্তা তো হোটেলে পাবে না। সেখানে তো শুধু নামকো-ওয়াস্তে। সারা দিনমান তো কেবল টোটো করি। সুতরাং আমাকে তোমার কাছে আসতে হয়। আজ সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমি এখানে আসতে পারি। রাত্রি বারোটার মধ্যে আমাকে অবশ্যই হোটেলে ফিরতে হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভালো হয় যদি তোমার প্রস্তাবিত আলোচনা সভার স্থান ও কাল আমাকে এখন জানিয়ে দাও এবং তোমার উল্লিখিত যোগবাহীর সঙ্গে কখন কোথায় দেখা

হতে পারে বলে দাও। তদনুযায়ী আমি যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হতে পারি।

—বেশ বেশ। প্রথমটার ব্যাপারে তুমি যদি আগামীকাল ব্যানার্জির মেসে তার সঙ্গে দেখা কর তা হলেই সব জানতে পাবে। দ্বিতীয়টা সম্পর্কে আজই রাত্রি আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে যাতে যোগ-বাহীর সঙ্গে তোমার দেখা হয় সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। জায়গাটা বুঝতেই পারছো—খিদিরপুর ডক এরিয়ার এঁদো গলি। যত সব কুখ্যাত গুণ্ডা বদমাস, চোর ডাকাত, জোচ্চোর, মদোমাতাল, জুয়া সাট্টা আর সমাজ-বিরোধীদের আড্ডা। তার উপর রয়েছে একাধারে পুলিশী মদত ও হানা। সেখানে হিন্দু মুসলমান, শিখ খৃষ্টান ইহুদি ইত্যাদি নানা জাত এক সঙ্গে মিলে মিশে আছে। কোন ভেদাভেদ নেই—বলা যায় একেবারে—এক-দেহে লীন। তাই সেখানে যাতায়াতকারীদের সর্বদাই সশঙ্ক সচকিত ও সতর্ক থাকতে হয়। দিবা রাত্রি যে কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে। আগন্তুকদের তখন পালানোর জন্য অ্যাক্রোবেটিক ফিট্স, দড়াবাজীর কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়—দৌড়নো, লাফদেওয়া, দেয়াল ডিঙনো, সাঁতার কাটা, ড্রেনে নামা, এমন কি ডুবে থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্ভাব্য যতরকম-ভাবে পালানো সম্ভব। নচেৎ হাত-কড়ার সঙ্গে চলে পুলিশের নানা ডিগ্রীর অত্যাচার।

—ঠিক আছে। তবে ভাই এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। আমার কাঁধে যে সব দায়িত্ব অর্পিত আছে তজ্জন্য আমি বর্তমানে কোন কারণে কোন অবস্থাতেই পুলিশের খপ্পরে পড়তে রাজী নই, বুঝেছ। তোমার সংযোগরক্ষাকারী পুলিশী হামলা হলে যদি আমাকে নিরাপদে বের করে দেবার কৌশল ও পন্থা জানে তবেই আমি যাব নচেৎ নয়। এসব বিবেচনা করেই তাকে নিয়োগ করবে। সে হিন্দু, মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান, কি পোষাকে কোথায় কখন থাকবে—সব ঠিক করে বলো। আমার পাস-ওয়ার্ড (সাংকেতিক শব্দ) যথা ক্রমে—হিন্দু হলে—রামরাম, উত্তর—সীয়ারাম, মুসলমান হলে—ইনস্ আল্লা, উত্তর—খোদা হাফেজ; আর খ্রীষ্টান হলে—ও গড্, উত্তর—বাই যোভ্!

—তা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে তো তুমি কম ওস্তাদ নও। তোমার অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্রিয়া কৌশল তো বহু বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রবর শার্লক্ হোম্স্-এর কল্পনা শক্তিকেও হার মানায়। শোনো, যোগবাহী

একজন মধ্যবয়সী অ্যাংলো—বেশ ধূর্ত ও চতুর। হাওয়া দেখেই বুঝতে পারে কখন কোন দিক থেকে ঝড় ঝঞ্ঝা আসছে। আশংকার কারণ নেই। তথাপি তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো। এখন শোনো—খিদিরপুর ব্রিজ পার হলেই তার লাগোয়া ডান দিকে একটা ছোট মসজিদ। তার খানিকটা পরেই একেবারে রাস্তা ঘেঁষে একটা মাজার। সেখানে ঢুকবার মুখে বাঁদিকে রেলিং-এর ধারে নোংরা খাকি-পরা ও সোলা হ্যাট মাথায় তাকে দেখতে পাবে। তুমি কি বেশে সেখানে যাচ্ছ সে সংবাদ সহ তোমার পাশ-ওয়ার্ড তাকে জানিয়ে দেব। জিনিশ দেখে পছন্দ হলে তাকে বলবে। আনার ব্যবস্থা হবে।

—ঠিক হ্যায়। তোমার সংযোগরক্ষাকারীকে বলবে আমি মুসলমানের বেশে যাচ্ছি—মাথায় থাকবে সাদা গোল টুপি। ঘড়ি দেখে—যাচ্ছি, বলেই তিনি বেরিয়ে যান। বেলা হয়েছে। ট্রামে চেপে মেছুয়ায় নেমে দোকান থেকে একটা সস্তা লুংগি ও টুপি কিনে কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে শেয়ালদহ-গামী একটা ট্রামে চেপে বসেন। হোটেলে পৌঁছে স্নানাহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ঘড়ি দেখে আবার বেরিয়ে পড়েন।

ট্রাম রাস্তায় এসে আপার সারকুলার রোডের-দিকে-চলা একটা ট্রাম ধরেন। শ্যামবাজারে নেমে বরানগর যাবার একটা বাসে উঠে বসেন। টবিন রোডে নেমে বাঁ হাতি গঙ্গার দিকের রাস্তা ধরে একটা বড় কারখানা ডাইনে রেখে এগিয়ে যান। বহুদিন পর এসেছেন। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছে—চেনাই দায়। রাস্তা এবং বাড়ির নম্বর জানা না থাকলে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছনো কষ্টকর হতো। বড় রাস্তা ছেড়ে ডাইনে একটা গলিতে প্রবেশ করেন। গলিটা আগের মতোই আছে—বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। চেনা বাড়িটার সামনে এসে দরজা ধাক্কা দেন। দরজায় কড়া নেই সুতরাং ধাক্কা দেওয়া ভিন্ন উপায় কি। কিছুক্ষণ ধাক্কা দেবার পর উপর থেকে মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শোন যায়—কে? মহারাজ একটু উচ্চ কণ্ঠেই বলেন—দরজাটা খুলেই দেখুন—কে। তারপরেই দরজা খুলে যায়। ছোট্ট একটি ছেলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢুকে নিজের নাম বলতেই একটি শীর্ণকায় মহিলা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। তাকে দেখেই মহারাজ হতভম্ব! ঢোক গিলে বলেন—একি অতসী, তোমার এই বেশ? এটি তোমার ছেলে? তাকে

কোলে নিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞাসা করেন—দাদা বৌদিরা সব এবং বিনু কোথায়? অতসী প্রণাম করে বলে—দাদা বদলী হয়ে অন্যত্র গেছেন। মেজদা আপিসে আর ছোড়দা? তিনি ফেরার। আসুন, ঘরে আসুন। ওদিকে ঘর থেকে মা হাঁকছেন—হাঁরে অতু কে এলো রে?

—দেখ কে এসেছে, বলেই অতসী ছেলেকে মহারাজার কোল থেকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। পেছন পেছন মহারাজ ঘরে এসে খাটে উপবিষ্টা বৃদ্ধাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর হাত ধরে পাশে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—কতযুগ পরে তোমাকে দেখলাম বলো তো? জীবনে যে আর দেখবো এমন আশা করি নি। বিনু ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করতাম—হাঁরে, মহাদেবের খবর জানিস?

—তোমার যেমন কথা মা! খবর পেলে তো জানাবো। কে কোথায় আছে, কি করছে তা কি করে বলবো বলো? আর এই যে খবর খবর করো—আমাদের আবার কিছু খবর থাকে নাকি? খবর হবে সেদিন যেদিন ফাঁসি কাঠে ঝুলবো! নয়তো গুলি খেয়ে মরবো—তাও পুলিশ যদি লাশ গুম না করে। আর গুম করলে তো চিরকালের তরে বালাই শেষ হয়ে গেলো—বলেই পাগলের মতো হা হা করে হাসতো। শোনো যতসব অলক্ষুণে কথা! বলেই বৃদ্ধা আর একবার মহারাজার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

—হাঁ, অতসীর মুখে সব শুনলাম। কিন্তু ওর এ-দশা কি করে ঘটলো!

—সে কথা বলতে বুক ফেটে যায়, বাবা। বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিছুক্ষণ পর চোখের জল মুছে বলেন—গেল বছরের আগের বছর সেই কালরূপী বন্যায় সর্বনাশ ঘটলো। তিনদিন তিন রাত্রি অঝোরে বৃষ্টি। সরকার সবাইকে হুঁশিয়ার করছেন। রেডিও মারফৎ সতর্ক বার্তা ঘন ঘন প্রচার করছেন। প্রবল জলস্রোতে নদী ভরপুর। যে কোন মুহূর্তে বাঁধ ভাঙতে পারে। সরকারি চাকুরি, হয়তো শেষ মুহূর্ত অবধি আপিস আগলে থাকা অসীমের মতলব ছিল। আপিসের অন্যরা আগেই পালিয়েছে। অবশেষে সন্ধ্যানাগাদ অবশিষ্ট এক পিওনকে দিয়ে অতসীও বাচ্চাটাকে বাঁধের উপর পাঠিয়ে দেয়। আপিস থেকে নদীর বাঁধ বড় জোর মাইল্ খানেক। অতসী কিছুতেই যাবেনা। অনেক বুঝিয়ে-পড়িয়ে, আপিস সামলে সেও তাদের পেছন পেছন আসছে ইত্যাদি নানা স্তোকবাক্য ও

আশ্বাস দিয়ে এবং পরিশেষে বাচ্চাটার উল্লেখ করতেই অতসী রাজী হয়। কিন্তু বাঁধ রক্ষার সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বাঁধ ভেঙে প্রবল বেগে নদীস্রোত গ্রামগঞ্জে ঢুকে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শত চেষ্টা করেও অসীমের খোঁজ পাওয়া গেল না, বলেই বৃদ্ধা আবার কেঁদে ফেলে।

মহারাজার নানা প্রবোধ বাক্যে বৃদ্ধা শান্ত হন। পরমুহূর্তেই আবার চেঁচিয়ে বলেন—আরে ও অতসী তোরা সব কোথায় গেলি? মহাদেবকে কিছু খেতে দে। এতদিন পরে এলো, ওকি উপোসী থেকেই চলে যাবে! মেজ বৌমাকে নিয়ে আয়। ও তো অজুর বৌকে দেখেনি।

—না না, কিছু খেতে পারবো না, জ্যেঠাইমা। বড্ড অবেলায় খেয়েছি।

—তা কখনো হয়? তোমাকে আমি না খাইয়ে ছাড়তে পারি! কত যুগ পরে দেখা! ওরে ও অতসী শিগগীর আয়—শোন মহাদেব কি বলছে!

মহারাজ বুঝলেন বলা বৃথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিনুর কিছু খবর পেয়েছেন?

—না, কে দেবে, আর কোথা থেকে পাব? ফিরে এসে কয়েকদিন বেশ চুপচাপ ছিল। বললাম ভাল করে খা দা, একটা কিছু করবার চেষ্টা কর। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। আবার যেকে সেই—স্বমূর্তি ধারণ করলো। শুরু হলো দিবারাত্রি টোটো—এই আসে এই যায়। রেতেবিরেতে আনাগোনা। তারপর এই তো কয়েকদিন আগে দুপুর রেতে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে দরজায় ঠক্ঠক শুরু করে। ও বুঝতে পেরেছিল। কাউকে কিছু না বলে ছাদে উঠে পাশের বাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ে পেছনের ময়লা পাইপ বেয়ে নেমে নর্দমা পেরিয়ে না-পাত্তা। আর কোন খবর নেই। কথা শেষে বৃদ্ধা চোখের জল মোছেন।

সব শুনে মহারাজ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলেন—ও যে সে ছেলে নয়! ও একটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। গর্বে তখন আমাদের বুক ফুলে উঠবে। যাক্ ভাববেন না—ওর খবর পেলে যাবার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে যাব—কথা দিচ্ছি।

—বেঁচে থাক, বলেই বৃদ্ধা আর একবার মহারাজার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন।

অতসী থালায় করে খাবার নিয়ে এসেছে। তার পেছনে একটি অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা বধূ। কাছে এসে প্রথমেই শাশুড়ি ও পরে মহারাজকে প্রণাম করে। মহারাজ 'শুভমস্তু' বলে বউটির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। বধূটি শাশুড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি পরিচয় করিয়ে দেন—এটি অজুর বৌ, আর বৌমা, ইনি তোমার একজন ভাসুর। অতঃপর শাশুড়ীর অনুমতি পেয়েই উভয়কে পুনরায় প্রণাম করে বধূটি বেরিয়ে যায়। অতসী একটি ছোট টুল এনে তার ওপর খাবারের থালা আর এক গ্লাশ জল রেখে সবে দাঁড়ায়। ওজর আপত্তি বৃথা জেনেই মহারাজ কিছু না বলে অতসীর পাশে দাঁড়ানো বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে লুচি ও হালুয়া পুরে দিয়ে নিজে একখানা লুচির ওপর একটু হালুয়া নিয়ে মুখে দেন। তারপর একগ্লাশ জল খেয়ে কোলের বাচ্চাটাকে লুচি হালুয়া খাওয়াতে থাকেন।

অতসী বলে—একি আপনি আর খেলেন না?,

—না, আমার বয়স হয়েছে। অসময়ে কিছু খেলেই শরীর খারাপ হয়।

বৃদ্ধা বলেন—ঠিক আছে। ওকে আর খাবার জন্য চাপ দিস না অতু। যা খেয়েছে তাই আমার ভাগ্য।

—কি যে বলেন! মহারাজ বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই উঠে পড়েন। অদূরে দাঁড়ানো অতসীর নিকট গিয়ে বলেন—তোমাকে আর কি বলে আশীর্বাদ করবো বোন? শুধু এই আশীর্বাদ করছি একে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোল। দেশে মানুষের বড় অভাব। বাচ্চাটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে অতসীর কোলে তুলে দেন। বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে মহারাজকে প্রণাম কালে অতসী কেঁদে ফেলে। মহারাজ তাকে দু'হাত ধরে তুলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—কেঁদোনা বোন। জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা সব নট নটী। যে যার খেলা সাঙ্গ করে যবনিকার আড়ালে চলে যাই। বৃদ্ধার কাছে এসে প্রণাম করে বলে—আশীর্বাদ করুন জেঠাইমা। বৃদ্ধা তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেন—তোকে আর কি আশীর্বাদ করবো মহাদেব! সেই একদিন দুপুর রাতেই তো আশীর্বাদ করে রেখেছি—তোর জয়যাত্রা হোক, মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। বয়সের ভারে তার উপর রোগে শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েছি। আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—আর বেশীদিন নেই। হয় তো তোকে আর দেখতে পাবো না, বলেই বৃদ্ধা কেঁদে ফেলেন।

মহারাজ উঠে দাঁড়ান। কোন দিকে না চেয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি পথে অদৃশ্য হয়ে যান। অতসী ছেলে কোলে তাঁর পেছনে পেছন এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে।

বড় রাস্তায় পড়ে মহারাজ একটা বাস ধরে শ্যামবাজার। সেখান থেকে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক ডাক্তারের খোঁজে এসে জানতে পারেন যে তিনি এখন আর হাসপাতাল এ্যাটেণ্ড করেন না। নিজের চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন। ঠিকানা নিয়ে সেখান থেকে ট্রাম ধরে ঠনঠনে কালিতলায় নেমে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে ডাক্তারের চেম্বারে এসে হাজির। সন্ধ্যা উতরে গেছে। ডাক্তারের চেম্বারে তখনো কয়েকজন রোগী। মহারাজকে দেখে ডাক্তার প্রথমে চিনতে না পেরে অবাক হয়ে বলেন—আপনি!

—হাঁ আমি। ভেতরে যাচ্ছি। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ঘড়ি দেখে মহারাজ একটা সোফায় বসে পড়েন।

ডাক্তার মিনিট কয়েকের মধ্যেই রোগী দেখা সেরে এ্যাসিস্টেন্টকে বলে ভেতরের চেম্বারে আসেন। ড'ক্তারের ইতস্ততভাব তখনো কাটেনি যদিও আগন্তুকের গলার স্বর কিছুটা চেনা চেনা মনে হয়েছে। তবুও কাছে এসে তিনি আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু এই বেশ কেন?

—তা না হলে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে কি ভাবে? তবে কথায় যে বলে—অদর্শন মৃত্যু তুল্য তা দেখছি মিথ্যে নয়। কি বলো?

ডাক্তার তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন—সত্যি ভাই—তোমার বেশ-ভূষা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে অস্বীকার করছি না। তোমার সম্পর্কে লিজেণ্ড্যারির মতো অনেক কিছুই কানে আসে। তা দেখছি মিথ্যে নয়।

—যা শোনো তা হয়তো সব সত্যি নয়। যতটা রটে ততটা কি বটে। তবে হাঁ একটা বড়রকম ইনসারেকশন্-এর তোড়জোড় করছি। সেজন্ত বস্তুত তোমাদের সক্রিয় সাহায্য প্রার্থী—সেটা অর্থ কিংবা বস্তু যা দিয়েই সম্ভব। এখন শোনো—কিছু লঙ-রেঞ্জ বন্দুক রাইফেল এবং পিস্তলের দরকার। তাদের খোঁজেই তোমার এখান থেকে সটান স্মাগলার ডেন-এ যাচ্ছি। যদি পাই তা হলে অর্থ চাই—সেটার পরিমাণ এখন বলতে

পারি না। সুতরাং অর্থের সংস্থান রেখো। এখন তোমার খবর বলো। মনের স্থিতাবস্থা বজায় আছে তো? না কি কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। বিপাশা কোথায়? ভালো আছে তো?

—হাঁ, তাকে দিয়ে একটা সেবা প্রতিষ্ঠান মিনি স্কেলে স্টার্ট করেছি, ফার্স্ট-এইড ইত্যাদি শিখিয়ে নিয়েছি। কঠিন কিছু হলে এখানে পাঠায়। একে দলের কাজ তার উপর এই প্র্যাকটিস (ক্রমেই বাড়ছে) নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে আদৌ সময় পাই না। কিন্তু হঠাৎ আমার মন নিয়ে তোমার এই অদ্ভুত প্রশ্ন কেন?

—সময় পেলে বলবো। এখন তোমার নিকট আর একটা বিষয় জানতে চাই। কয়েকদিন আগে বিনয়কে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ গভীর রাতে তার বাড়িতে হানা দেয়। সে টের পেয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়ে।

—হাঁ, সে এখন ছদ্মবেশে ও নামে একটা হস্টেলে এ্যাটেণ্ডেণ্ট হয়ে আছে। এভাবে কতদিন পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকতে পারবে জানি না।

—হুঁ বলেই মহারাজ ঝোলা গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান। যাচ্ছি ভাই, বড্ড দেরি করে ফেললাম। ঐ যে বললাম—অর্থ ও বস্তু। তাদের প্রাপ্তি-যোগ ঘটলেই হয়ত আবার আসবো। নচেৎ এখানেই ইতি।

ডাক্তার আশ্বাসের সুরে বলেন—হতাশ হয়ো না এসো—তব ইচ্ছা হবে পূর্ণ।

মহারাজ হৃষ্টচিত্তে গীতার একটা শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে দরজার দিকে এগিয়ে যান।—অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কর্মং করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ…।

—আরে থামো থামো। আমার তো যন্ত্রপাতি, কাটা ছেড়া, মাল মসলা, কেমিক্যাল ইত্যাদি নিয়ে কারবার, তোমার ঐ দেব-বুলির মর্ম আমার অনধিগম্য। সুতরাং ব্যাখ্যা করে যাও।

মহারাজ হেসে বলেন—কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করত যিনি কর্তব্যকে ঐকান্তিক ভেবে কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনি যোগী। জয়তুঃ, জয়তুঃ উচ্চারণ করতে করতে তিনি দরজা ঠেলে বেরিয়ে যান।

ডাক্তার—অঃ রিভর (au rivoir) বলে দরজা অবধি এসে তাকে বিদায় দেন।

মহারাজ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রামস্টপে এসে দাড়ান। কিন্তু বীরশক্তি

ট্রামে সময়ের অপব্যয়। সুতরাং সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই মহারাজ ডাইনে এগিয়ে মহৎ আশ্রমের পাশে রাস্তার বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ান। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কালিঘাটগামী একটা বাস আসতেই তাতে উঠে পড়েন। বাস থেকে এসপ্ল্যানেড-এ নেমেই রাস্তা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে খিদিরপুরগামী একটা ট্রাম ধরেন। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যারাত্রি—সাড়ে সাতটা। মহারাজ উদ্বিগ্ন হন। প্রথমদিকে মনুমেণ্টের পাশ দিয়ে ট্রাম শ্লথ গতিতে চললেও আউটরাম ও রেড রোড ছাড়িয়ে ময়দানের লাগোয়া পথে দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। ডাইনে মাঠের শেষে ফোর্ট উইলিয়ম, বাঁয়ে ব্রিগেড প্যারেড ময়দান। তারপরেই রেসকোর্স। তারই বাঁয়ে দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল গেটের বাতি দেখা যাচ্ছে। সারা মাঠ জুড়ে রাস্তার গ্যাসের বাতিগুলি জ্বলছে। তারই মধ্যে দিয়ে ট্রামগাড়ি হুহু করে ছুটে চলেছে। বেশ একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। মাঠের শেষে রেসকোর্সের ঘোড়ার আস্তাবলের ধারে এসে যখন ট্রাম দাঁড়ায় ঘড়িতে তখন পোনে আটটা। ব্রিজ পেরিয়ে ট্রাম থামতেই মহারাজ নেমে যান। রাস্তা অতিক্রম করে ব্রিজের লাগোয়া ডাইনে একটি ছোট্ট মসজিদ। তারপরেই দক্ষিণমুখী কিছুটা এগোতেই একেবারে রাস্তার গায়েই একটা মাজার। রাস্তার আলোগুলি ক্ষীণপ্রভ। এই স্বল্প আলোতে মসজিদের কাছ থেকেই মহারাজ দেখতে পাচ্ছেন মাজারের রেলিং-এর ধারে ঘোষ-বর্ণিত কোট প্যাণ্ট ও সোলার হ্যাট-পরা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আশপাশে কিংবা রাস্তায় লোকজন কম। কিছুটা এগিয়ে মহারাজ অনুচ্চ কণ্ঠে—ওঃ গড্ বলতেই লোকটা বাই জোভ্ উত্তর দিয়েই হাঁটা শুরু করে। মহারাজ বিনাবাক্যব্যয়ে দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করছেন। ট্রাম রাস্তা ধরে না গিয়ে লোকটা শিবের মন্দিরটা ডাইনে রেখে পশ্চিমাভিমুখী গঙ্গার দিকে ওয়াটগঞ্জের রাস্তা ধরে চলতে থাকে। তার চলার যেন আর বিরাম নেই। মহারাজ ঘড়ি দেখেন—রাত সাড়ে আটটা। আচম্বিতে লোকটা চলার গতি কমিয়ে পেছন ফিরে মহারাজের দিকে এক পলক চেয়ে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় বলতে বলতে চলতে থাকে।—ওয়াক ভেরি স্লোলি লাইক এ ড্রাঙ্কার্ড। হোয়েন আই উইল সাউট—ওকে, ফলো মি স্ট্রেইটওয়ে। অতঃপর লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে একটা পান সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে উচ্চকণ্ঠে—ওকে, বলেই পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে। মহারাজ একইভাবে

টলতে টলতে গলিতে ঢুকে যান। অন্ধকার গলি—দু'দিকে সারি সারি খোলার ঘর। সেখান থেকে টুকরো আলো রাস্তায় এসে পড়ছে। লোকজনের কথা বার্তাও কানে আসছে। মহারাজ অতিকষ্টে লোকটাকে দৃষ্টিপথে রেখে স্বাভাবিকভাবেই চলেছেন। দূরে রাস্তার উপর একটা টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। কাছে আসতেই দেখা গেল একটা ল্যাম্পপোষ্টে কাঁচে-ঢাকা কেরোসিনের আলো। তাব তিন দিকে—ডাইনে বাঁয়ে এবং সামনে সেঁতসেঁতে গলি। মনে হয় গঙ্গার বানের জল এখানে ঢোকে। লোকটা বাঁয়েব গলি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মহাবাজ কাছে যেতেই বলে—Remember the yonder light post. In case of emergency due to police raid you must runaway through this lane to that big road we just passed over. কথা শেষে লোকটা পুনরায় ল্যাম্পপোষ্টটাব দিকে ফিবে যায়। মহারাজ সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গলিটাব নিশানা ঠিক কবে লোকটার অনুগমন করেন। ল্যাম্পপোষ্টটার কাছে এসে তিনি তাড়াতাড়ি গলিটা ভাল করে লক্ষ্য কবেন যাতে ফিরতি পথটা চিনতে কোন ভুল ভ্রান্তি না হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এতগুলি বড় বড় খোলার ঘবের বস্তি সে অনুপাতে লোক চলাচল, গোলমাল, চেঁচামেচি কম বলেই মনে হয়। যোগবাহী ততক্ষণে সম্মুখেব গলিতে প্রবেশ করেছে। তাকে অনুসরণ করে মহারাজ গলিটাতে ঢুকে খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন। কাদায় তাঁর পায়ের ক্যানভাসের জুতো কেবল আটকে যাচ্ছে। দ্রুত হাঁটতে পারছেন না। অথচ লোকটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। অন্ধকার গলি—ভয়, যদি নর্দমার পাঁকে পা আটকে যায়। অথচ টর্চ জ্বালতেও সাহস হচ্ছে না। তবুও যতদূব সম্ভব সন্তর্পণে দ্রুত পা চালিয়ে লোকটাকে ধরবার চেষ্টা করছেন। কোথায় যেন জল পড়াব শব্দ হচ্ছে। হয়ত নিকটে কোথাও নর্দমায়, নালায় কিংবা খালে জল পড়ছে। অন্য গলির তুলনায় এ গলিটা অনেক সরব—লোকজনের কথাবার্তা এবং মাঝে মাঝে চিৎকার চেঁচামেচিও কানে আসছে। আগের লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। মহারাজ কাছে যেতেই বলে—Be careful, when the door opens after my knock you follow me without delay. or hesitation. এবার লোকটা একটা খোলার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের ভিটেটা গলির রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। কোন ধাপ নেই। লোকটা দরজায় নানা রকম ঠুকঠুক

আওয়াজ করে—হয়ত সাংকেতিক শব্দ। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে অনুরূপ শব্দ আসতেই লোকটা অদ্ভুত এক ধ্বনিতে তার প্রত্যুত্তর দেয়। হয়তো কোনো পাস-ওয়ার্ড। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যেতেই লোকটা ঢুকে যায়। মহারাজ ও তৎপরতার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে। ভেতরে নিঃসীম অন্ধকার। লোকটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। অথচ ভেতরের ফিসফিস কথার আওয়াজ কানে আসছে। পরমুহূর্তেই হঠাৎ বাতি জ্বলে উঠতে তিনি দেখতে পান ছোট্ট একফালি বারান্দায় তিনি দাঁড়িয়ে। লোকটা সম্মুখের ঘর থেকে হাত ইসারা দিতেই মহারাজ ঘরে ঢুকে যান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের সামনে একটা টানা বারান্দা তার দুদিকে ঘর। ভেতরে লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মহারাজ লোকটার পেছন পেছন বারান্দা ধরে চলে একটা উঠনে এসে দাঁড়ান। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এমন কি তাঁর সঙ্গীকেও নয়। খুবই অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আচম্বিতে উঠনের শেষ প্রান্তে একটা খোলার ঘরের কোণে আলো জ্বলে উঠে। তাতে দেখা গেল ঐ দিকেই একটা বাথান। সেখানে কয়েকটা মোষ আর একপাশে খড়, ভুষির ছালা সহ অনেক কিছু আবর্জনা জড় হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর যোগবাহী কোথাও নেই। এই অবস্থায় মহারাজ ঐ আলোর দিকেই এগিয়ে যান। গোয়াল ঘরের নিকটবর্তী হতেই তার যোগবাহী হঠাৎ ভেতর থেকে মাথা বের করে তাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেই আবার মাথা সরিয়ে নেয়। অনেক সময় কেটে যায়। ভেতরে নানা রকম খুটখুট, ঠুকঠুক শব্দ হচ্ছে। মহারাজ লুঙ্গির আড়ালে টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখেন—রাত্রি দশটা। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। আর তো দেরী করা যায় না। তাকে যে অনেক দূর যেতে হবে। এতরাত্রে যানবাহন পাওয়া খুবই মুশকিল। হঠাৎ ভেতর থেকে ডাক আসে—come in. আলো লক্ষ্য করে তিনি গোয়ালে ঢোকেন। খড়ের ওপর বিছানো একখণ্ড ক্যানভাস, তার ওপর কয়েকটা রিভলবার ও লম্বা নলের একটি পিস্তল। পাশেই যোগবাহীর সঙ্গে আরো দু'জন ষণ্ডামর্ক লোক দাঁড়িয়ে। মহারাজ টর্চ জ্বেলে সব কয়টি দেখে লম্বা নলের পিস্তলটা হাতে তুলে নেন। মার্ক দেখে বোঝা যাচ্ছে—চেকোশ্লোভাকিয়ার তৈরি। পুরনো হলেও ভাল অবস্থাতেই আছে। মহারাজ সেটা নেড়েচেড়ে খুলে নল, ট্রিগার, স্প্রিং ইত্যাদি পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেন এই (bore) বোর-এর [illegible] আছে কিনা এবং কি

পরিমাণ? উত্তর শুনে তিনি তার সঙ্গীকে সেটা নেবার ইচ্ছা জানান। লোকটা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কি যে হল! একটা তীক্ষ্ণ শিষ বেজে উঠতেই সব ওলটপালট হয়ে বাতি নিভে গেল। কোন জিজ্ঞাসার ফুরসৎ না দিয়েই যোগবাহী তাকে অন্ধকারে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। কাদা আবর্জনার মধ্যে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ একটা দরজা খুলে যায়। কিন্তু দরজাটা এত সরু যে সে তাকে কোনরকমে ঠেলে ঠুলে একটা সরু গলিতে বার করে দিয়ে ডান দিকে চলে ল্যাম্প-পোষ্টের গলিতে উঠে যেভাবে বড় রাস্তা ধরতে বলেছে সেভাবেই চলবার নির্দেশ দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। সেই তীক্ষ্ণ শিষ তখনো উঁচু নিচু পর্দায় বেজে চলেছে।

প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও মহারাজ অন্ধকার গলিতে পা দিয়ে হুঁশিয়ার হন। চলতে গিয়ে বুঝলেন এটা কোন গলি পথ নয়—একটা কর্দমাক্ত-আবর্জনাপূর্ণ, মলমূত্র পূতিগন্ধময় নর্দমা। দু'দিকেই খোলার বস্তি। অন্ধকারে টর্চ জ্বালতে সাহস হচ্ছে না। সেই তীক্ষ্ণ শিষ তখনও মাঝে মাঝে কানে আসছে। অগত্যা তিনি অতি সাবধানে, পাছে কোন গর্তে না পড়ে, সেজন্য প্রতিটি পদক্ষেপে জায়গাটা অনুভব করতে করতে এগিয়ে চলেন। এভাবেই অনুমান ১৫/২০ মিনিট হেঁটে নির্দেশিত গলিটায় এসে পৌঁছান। পায়ের জুতো কাদা ময়লায় ভর্তি। আস্তে আস্তে পা দুটো ঝেড়ে এবং মাটিতে জুতো ঘষে কিছু পরিমাণ ময়লা মুক্ত হয়ে মহারাজ ল্যাম্প পোষ্টটার দিকে এগিয়ে চলেন। হঠাৎ বাঁ দিকের বস্তিতে চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈ হল্লা শোনা যাচ্ছে। মহারাজ জোরে হাঁটতে শুরু করেন। পিচ্ছিল রাস্তা পা ফসকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দূরে ল্যাম্প পোষ্টের আলো দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। আরও এগিয়ে যেতে বোঝা গেল পুলিশ সব কটা গলি মুখ ব্যারিকেড (অবরোধ) করে রেখেছে। কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দিচ্ছে না। সেজন্য চেঁচামেচি, ধাক্কাধাক্কি ও গণ্ডগোল চলেছে। পেছনে আরও লোক জড় হচ্ছে। ভিড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। হঠাৎ কি হলো বোঝা গেল না। লোকজন ব্যারিকেড-ভেঙ্গে ছুটছে। পুলিশ এলোপাথাড়ি লাঠি চালাচ্ছে। তিনিও ছুটছেন, ল্যাম্প পোষ্টটার গা ঘেঁষে ছুটছেন। সম্মুখের গলিমুখে লোকজনকে রুখবার জন্য পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসতেই একটা পুলিশের লাঠির বাড়ি dück (মাথা নিচু) করে এড়িয়ে বাঁয়ের গলিতে ঢুকে

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকেন। পুলিশের ট্যাক্‌টিক্‌স্ (কৌশল) সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। তাদের কাছ থেকে পালাবার সময় পেছন থেকে পা লক্ষ্য করে ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারে। সে কারণে মহারাজ ডাইনে বাঁয়ে একে বেঁকে দৌড়তে থাকেন। প্রায় মিনিট দশেক দৌড়ে পুলিশের নাগালের বাইরে এসেছেন বুঝে তিনি হাঁটা শুরু করেন। কেননা অনেক সময় দৌড়ে পালাবার সময় লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে অহেতুক বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণ চলার পর বড় রাস্তায় এসে পড়েন। এত রাত্রে রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম। তিনি ফুটপাত ধরে দ্রুত ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতে থাকেন। জুতো জোড়া ময়লা ও কাদায় মাখা। এতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। রাস্তার ধারে ড্রেনের জলে জুতো জোড়া ধুয়ে নেন। ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে দেখেন রাস্তা একেবারে ফাঁকা—ট্রাম বাস কিছু নেই। মনে মনে বিপদ গণলেন। অগত্যা তিনি হাঁটা শুরু করেন। ব্রিজ পেরিয়ে রেস কোর্সের বাঁ পাশে রাস্তায় এসে দাঁড়ান। ব্রিজের ওপর ঘড়ঘড় শব্দ শুনে ট্রাম আসছে অনুমান করে তিনি ট্রাম স্টপে গিয়ে দাঁড়ান। হা হতোস্মি! ট্রামই বটে কিন্তু যাত্রি-বাহী নয়—মাল-বাহী। মহারাজ হাত তুলে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন। সেটা দাঁড়ায় না। ব্রিজের ওপর থেকে আবার গাড়ির শব্দ আসছে। দেখা গেল একটা লরি। ব্রিজ থেকে নেমে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গার দিকে চলে যায়। এখন উপায়! রাস্তা দিয়ে ট্রাম, বাস, লরি, এমন কি প্রাইভেট গাড়ি—যে কোন দ্রুতগতি যানই হোক না কেন তাকে তিনি দাঁড় করাবেনই। এই সংকল্প নিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার ব্রিজের ওপর গাড়ির শব্দ। তিনি তৈরি হন। দেখা গেল একটা বাস ব্রিজ থেকে নেমে ছুটে আসছে। হাত দেখাতেই থেমে যায়। যাত্রীতে বাসটা একেবারে ঠাসা। বাইরে শুদ্ধ লোক ঝুলছে। অতিকষ্টে মহারাজ শারীরিক শক্তি দ্বারা ফুটবোর্ডে কোনরকমে দাঁড়ান। বাসটা প্রচণ্ড বেগে ছুটে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে। বাস ছেড়ে মহারাজ ধর্মতলার মোড়ে মসজিদের নিকট এসে দাঁড়ান। চেয়ে দেখেন ট্রাম ঘুমটি ফাঁকা। এত রাত্রে ডালহৌসি ঘুরে কোন ট্রাম আসার আশা নেই। সুতরাং বাস ছাড়া গতি নেই। অদূরে রাস্তার ওপারে চার্চ-এর ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। আর দেরী করা সমীচীন নয়। তবে কি হেঁটেই রওনা দেবেন! ওয়েলিংটন

স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে জেলেপাড়া, নেবুতলা, বৌবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রীট হয়ে একেবারে শেয়ালদা। কিন্তু এত রাত্রে এ-বেশে পুলিশের জেরায় পড়লেই তো চিত্তির! এই সব সাত পাঁচ ভাবাকালীন ভোঁ ভোঁ করতে করতে সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ধীর গতিতে যাচ্ছে দেখে তিনি সেটাকে দাঁড় করান। কিন্তু কোথায় যেতে হবে শুনে ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চায় না—নেহি বাবু আভি সিনেমা টুটেগা, হাম যায়েগা নেহি। তখন মহারাজ এবং অন্যান্য যারা পাশে দাঁড়ানো ছিল তারাও ঐ দিকে যাবে। সুতরাং সকলে মিলে ট্যাক্সিওয়ালাকে চেপে ধরে। অবশেষে প্রতি জনে এক টাকা করে ভাড়া দিতে স্বীকৃত হলে পর ট্যাক্সিওয়ালা রাজী হয়।

. শেয়ালদা পৌঁছে মহারাজ টুপিটা ঝোলায় রেখে লুঙ্গির ওপরই কাপড় পরে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাত্রি সাড়ে বারোটা। হোটেলের দরজা বন্ধ। কি উপায়! সারারাত্রি কি তবে শেয়ালদায় কাটাতে হবে! অগত্যা তিনি জোরে হোটেলের সদর দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর দোতলা থেকে সাড়া আসে—কে? নিজের নাম সহ কোন রুমের বোর্ডার বলতেই উত্তর আসে—দাঁড়ান। অনেকক্ষণ পর ঘুম জড়ানো চোঁখ রগড়াতে রগড়াতে এবং মুখে বকর বকর করতে করতে একটা চাকর এসে দরজা খুলে দেয়। মহারাজ ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকেন। চাকরটা সদর দরজা বন্ধ করে যাবার সময় তিনি তাকে ডাকেন —নিশি আমার সারাদিন খাওয়া হয়নি রে। একটা থালা নিয়ে গরম রুটি ডাল তরকারি নিচের হোটেল থেকে নিয়ে আয়।

—না বাবু, আমি পারবো না। এত রাত্রে না হক ঝঞ্ঝাট। আমি পারবো না।

—পারবি, পারবি, ব্রাহ্মণকে কি উপোষী রাখবি? অকল্যাণ হবে যে। এই নে টাকা। খাবার খরিদ করে যা থাকে তা সব তোর। সে আর দ্বিরুক্তি করে না। মহারাজ বুঝলেন ওষুধে ধরেছে।

—আচ্ছা দিন, যখন এত করে বলছেন।

মহারাজ তার হাতে টাকা দিয়ে বলেন—আমি উপরে যাচ্ছি। কলে জল আছে তো।

—আজ্ঞে আছে।

—বেশ, আমি চান সেরে আসছি। তুই খাবার নিয়ে ঘরে আয়।

মহারাজ দোতলায় উঠে যান। ১০ নং কামরা বন্ধ। কিছুক্ষণ ঠক ঠক করার পর দরজা খুলে যায়। ঘরে ঢুকে ঝোলা সহ গামছাখানা নিয়ে বাথরুমে যান। প্রথমে পায়ের জুতো জোড়া ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। তারপর স্নানাদি সারেন। শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হয়। ঘরে ফিরে দেখেন চাকরটা ইতিমধ্যেই খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি আসতেই বলে—বাবু, খেয়ে দেয়ে বাসনকোসন সব টেবিলের নিচে রেখে দেবেন। আমি যাচ্ছি। খাওয়াদাওয়া সেরে মহারাজ ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আগামী দিনের কর্মসূচী মনে মনে তৈরি করেন। আগামীকালই তার অজ্ঞাত-বাসেব শেষ দিন। ঐ দিনের মধ্যেই তাকে ধন, জন প্রহরণ ইত্যাদি যতটা সম্ভব যোগাড় করতে হবে। তবে ধন ও প্রহরণের মতো জনের তাগিদ ততটা নয়। তবে সে-জন সংগ্রামী ও দক্ষ হলে অবশ্যই গ্রহণীয়।

রাত্রি অনেক, রাস্তায় লোক চলাচল বিরল। ট্রামের ঘর্ঘব, বাস ট্যাক্সির হুশ হুশ ভোঁ ভোঁ, ঘোড়ার গাড়িব টগবগ শব্দ নেই। রাস্তার বাতিগুলি আগের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হয়। জনবহুল কর্ম-মুখর নগরীর এ আর এক ভিন্নরূপ। মহারাজ ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েন।

পরদিন ভোরে উঠে মহারাজার স্নানাদি যত তাড়াতাড়ি শেষ করার ইচ্ছা ছিল লোকের ভিড়ে তা হয় না। নিচের হোটেলে জলযোগ করে তিনি ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে বলেন—আমি আগামী কাল সকালে চলে যাচ্ছি। আজ রাত্রে আমার এক গেষ্ট আসার কথা আছে। তিনি রাত্রিটা আমার সঙ্গে থেকে পরদিন ভোরে শেয়ালদায় ট্রেন ধরবেন। আপনার আপত্তি নেই তো!

—বলেন কি মশাই! আপত্তি নেই মানে? জরুব আছে। এইতো মশায়, কাল রাত্রে পুলিশ এসে কি হাঙ্গামা হুজ্জতই না করে গেল। রেজিস্ট্রি ঘেঁটে কি যেন খুঁজলো। আমি তো ভয়ে তটস্থ। কি সব টুকে নিলে—কে জানে! যাবার সময় সাবধান করলে—খবরদার নাম ধাম, হাল সাকিন না লিখে কাউকে থাকতে দেবে না—তা একঘণ্টা, একদিন, একহপ্তা, একমাস কিংবা এক বৎসরই হোক না কেন। পরে জানলাম আশে পাশে অনেক হোটেলেই পুলিশ এরকম হুজ্জত করেছে।

—হুঁ, বলেই মহারাজ চলে যান। কিন্তু মনে খটকা লাগে—বিষয়টা হোটেলওয়ালা বানিয়েছে না সত্যি! ঘটনাটা হয় তো পুলিশের রুটিন

চেক। আবার এমনও হতে পারে পুলিশ কোন সোর্স থেকে জেনেছে আমি আশ্রমে নেই। তাহলে কোথায়? কলকাতায়? সেজন্যই হয়ত হোটেলে মেসে খোঁজাখুঁজি চলেছে। যাই হোক হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। আর তো মাত্র আজকের রাত্রিটা এর মধ্যেই তাকে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। ঘড়ি দেখেন। আটটা বেজেছে। আর দেরি না করে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি কিছুটা হেঁটে, কিছুটা ট্রামে চলে ডাক্তারের চেম্বারে এসে উপস্থিত হন। ডাক্তার সবে এসে চেম্বার খুলেছে। তখনো রোগীর ভিড় জমে নি। তাঁকে দেখেই ডাক্তার বলেন—সুপ্রভাত স্বাগত, স্বাগত। সেদিন এমন তাড়াহুড়া করলে যে কোন কথাই হলো না, কতদিন পরে দেখা—মনে হয় যেন কত যুগ পেরিয়ে এসেছি—সুখ দুঃখ জড়ানো কত স্মৃতি! এখন আরাম করে বসো। পান তামাক খাও। তুমি তো আবার মিতাহারী।

ঐ যে বললে আরাম। ওটা আমার নিকট হারাম, ওটা যে সত্যিই কি তা বুঝিনা। তবে তুমি যখন বলেছো বসলাম। আর ঐ পান তামাক —তাও যৎকিঞ্চিৎ।

ডাক্তার বেরিয়ে যান এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসেন। পাশে বসেই জিজ্ঞাসা করেন—আগে বলো, এখানে এসে এই মহানগরীর ইতিকথা কিছু অবগত হয়েছ কি? তোমার ঐ পাহাড়িয়া নদনদী বিধৌত ছোট্ট নগরীর কথা পরে শুনবো।

—মহানগরীর কথা তুমি কি মিন করছো জানিনা। তবে দলের কথা, কাজকর্ম ইত্যাদি পাকরাশি, ব্যানার্জি ও ঘোষের নিকট কিছু কিছু জেনেছি। শুনলাম রাশিয়া থেকে হালে আমদানি হওয়া বলশেভিজম, মেনশেভিজম ও কম্যুনিজম ইত্যাদির কথা! ঐসব বাদ কিছু কিছু দলের মধ্যেও নাকি infilitration (অনুপ্রবেশ) হয়েছে! ফলে সবই কেমন যেন খাপছাড়া সঙ্গতিবিহীন! অবশ্য তুমি এখানে পেশায় ও কর্মে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছ। তা ছাড়া being a man on the spot নিশ্চয়ই সবকিছু ভাল ভাবেই জানো।

—হাঁ, তা তো বটেই। যা শুনেছ তা অসত্য নয়। তবে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা অব্যাহত আছে যাতে সকলেই মিলেমিশে লক্ষ্য এক রেখে এগিয়ে যাওয়া যায়। মাঝখানে আর এক কেঁকড়া বাঁধিয়েছে কংগ্রেস। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোলাহলে আমাদের ছেলেরাও জড়িয়ে

পড়েছে। জানো তো সুভাষবাবু ও সেনগুপ্ত মহাশয়ের ঝগড়া, কাজিয়া এখন তুঙ্গে! উভয়ের মধ্যে আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক! বিগত করাচি কংগ্রেসে মতিলালজীর সঙ্গে সুভাষবাবুর বাংলা কংগ্রেস নিয়ে কথা কাটাকাটি ও মন কষাকষি। এই গোদের উপর আর এক বিষ-ফোড়া হলো কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গঠন। ওটা ইলেকশন মারফৎ না হয়ে সিলেকশন-এর মাধ্যমে গঠিত হওয়ায় নেহেরু ও গান্ধিজীর জয় ঘোষিত হলো বটে কিন্তু ঘটনাটা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতার চরম পরাকাষ্ঠা! এর প্রতিবাদে সুভাষবাবু দক্ষিণী বন্ধু শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং অন্যান্য সহমতাবলম্বীদের নিয়ে ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস নামে আর এক নতুন দল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এদিকে প্যাটেল মহাশয় এখানের কংগ্রেসে সেনগুপ্ত মহাশয়কে সমর্থন ও মদত দিচ্ছেন। ফলে তাঁর সঙ্গে সুভাষবাবুর গজ কচ্ছপের যুদ্ধ চলেছে—কে কাকে টেনে নামাবেন। এসব ডামাডোলের মধ্যে সুভাষবাবু ইয়ং বেঙ্গল অনেককেই আকর্ষণ করেন। তাঁর মিটিং-এ তারা জমায়েত হয় এবং পুলিশের হাতে বেধড়ক ঠেঙানি খায়। এই তো সেদিন অক্টেরলোনি মনুমেণ্টের নিচে সুভাষবাবুর মিটিং-এ পুলিশের ঠেঙানির ফলে মাথা ফাটাফাটি ও বিভৎষ রক্তারক্তি কাণ্ড! ঐ সভাতে সুভাষবাবু ১৪৪ ধারা অমান্য করে মনুমেণ্টের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবারকালে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে উদ্যত পুলিশের লাঠি আমাদেরই একটি ছেলে ধরে ফেলে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ব্যাস্, আর যায় কোথায়! শুরু হয় রাম রাবণের যুদ্ধ! এতে ঐ ছেলেটি সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকা কালে পুলিশ বিশেষ করে যে ছেলেটি পুলিশের লাঠি কেড়ে নিতেই লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়, তার নাম ধাম নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার বিরুদ্ধে চলেছে পুলিশী দৌরাত্ম্য। ছেলেটি মেডিকেল স্টুডেণ্ট হস্টেলে থাকে। এখন ধরা পড়ার ভয়ে কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে আমার প্রিয় পাত্র, চৌকোষ ছেলে—ডরভয় হীন। বেশ শক্তিধর লেখা-পড়ায়ও ভালো। যাক আমার কথাটি ফুরলো, এখন তোমার কথা শোনাও বন্ধু, শোনাও।

মহারাজ হাহা করে হেসে বলেন—বেশ রসালো হয়ে উঠেছ দেখছি! এমনটি তো আগে দেখিনি। বুঝেছি সংসর্গ জা দোষা গুণা ভবন্তি। বিপাশার সঙ্গে দেখা হলো না, দেখা হলে বলতাম। যাক, তাকে আমার

স্নেহাশীষ জানিও। আমার কথা বিশেষ কিছু নেই ভাই। জানোই তো আমি চিরকাল চরমপন্থী—টিকিয়ে টিকিয়ে চলা আমার কুষ্ঠিতে নেই—মারি তো হাতী লুঠি তো ভাণ্ডার! সে খবর কিছু কিছু হয়তো পেয়েছ। সুতরাং সব কিছুই নির্ঘণ্ট মাফিক এগিয়ে চলেছে। এমন কিছু ঘটবে যা ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞশালায় নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো যুগ যুগ ধরে জ্বলবে অনির্বাণ তেজে। আর যার থেকে ভারতের ভাবী বংশধরগণ শক্তি আহরণ করে দেশকে জাতিকে গড়ে তুলবে। বলতে বলতে মহারাজ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, তাঁর বজ্র কঠিন সঙ্কল্প যেন চোখে মুখে ঠিকরে পড়ছে। মুখমণ্ডল রক্তাক্ত অগ্নিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। ডাক্তার অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। তারপর তাঁর হাত ধরে বাহবা বাহবা বলে ঝাঁকি দিয়ে অভিনন্দিত করেন

আত্মস্থ হয়ে মহারাজ উঠে পড়েন। ডাক্তার সরে গিয়ে আলমারি খুলে একটা কাগজের মোড়া প্যাকেট নিয়ে মহারাজের হাতে দিয়ে বলেন—তোমার ১২ ঘণ্টার নোটিশে যে অর্থ যোগাড় করতে পেরেছি তা এর মধ্যে আছে। বিশেষ নিকটেও কিছু নেই। মহারাজ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন—তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে ভাই। আমি গত বছর স্মাগলারদের থেকে একটা লং ব্যারেল চেক্ পিস্তল কার্তুজ সহ সিলেক্ট করেছি। যে কোন কাজে সেটা আসবে। সেজন্য যদি তার অর্থের প্রয়োজন হয় তুমি দিয়ে সেটা তোমার কাছে এনে রেখো। খবর পেলে আমি নেবার ব্যবস্থা করবো। যদি সেটা নেবার সুযোগ আমার আর না হয় তবে তুমিই তার সদ্ব্যবহার কোরো। ঘোষের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না। তবুও বিষয়টা তার গোচরে আনতে পারবো। কেননা ঘোষ ও ব্যানার্জি যৌথভাবে রিক্রুটদের জন্য এডুকেশন ক্লাশ করবার পরিকল্পনা করেছে। সেখানে সমবেত ইয়ং ইনটেলিজেন্ট-শিয়াদের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে।

—বেশ বেশ, অতি উত্তম প্রস্তাব। তারপর সহাস্যে বলেন—পেশায় তুমি মাষ্টার না হয়েও একজন সুদক্ষ কুশলী মাষ্টার বনে গেছ! ছেলেদের বুঝিয়ে পড়িয়ে আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছ। তা ছেলেদের কাছে কি বলবে বলে মনস্থির করেছ? দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—তোমার সঙ্কল্পিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্ধন যোগাতে প্রচুর কাঠ খড়ের আবশ্যক। এখান থেকে তা কিছু নিয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করছ কি।

—তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলছি—তুমি, আমি এবং আমরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কঠিন মরণপণ সংকল্প নিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে নিজেদের উৎসর্গ করে সংগ্রাম করেছি ও করছি তারই একটা প্রাণবন্ত চিত্র তাদের সামনে উপস্থাপিত হবে। সেইসঙ্গে কম্যুনিস্টদের মার্কস্ সাহেবের দাস্ কেপিটাল, খ্রীষ্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরান এবং গীতা থেকে প্রেরণা আহরণ এবং সে প্রেরণা যে আদর্শের প্রেরণা সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা সহ মন্তব্য রাখা হবে। কারণ সত্যিকারের আদর্শ (ideal) তো কোন (idol) মূর্তি নয়। তার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি—আমার আসন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে তো খড়ের আগুনে পোড়ে জল নেই ভাই। সজন্য চাই কাঠ, দৃঢ় কাষ্ঠ খণ্ড—চন্দন হলেই উত্তম। তা কি তোমার হেফাজতে আছে!

বিপদ হলো এখান থেকে কাষ্ঠ-খণ্ড রপ্তানি নিয়ে। এই ব্যাপারে পুলিশের নজর এড়ানো মুশকিল। ফলে যজ্ঞশালে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পরিণামে আমাদের উদ্দেশ্যই শুধু বিফল হবে তা নয়, আমাদের এতদিনের তিলে তিলে গড়া সব আয়োজন বিনষ্ট হয়ে যাবে। শেষ ফল—ইন্দ্রজিতের মতো আমাদের পতন ও মৃত্যু!

—তোমার বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। তবে তোমার উল্লিখিত কাষ্ঠ সম্পর্কে আমার সন্ধানে একটি দৃঢ় কাষ্ঠ-খণ্ড—চন্দন কাঠের চেয়েও মজবুত বললেও অত্যুক্তি হয় না—আছে। বিষয়টা তোমাকে আগেই বলেছি। ছেলেটি থার্ডইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট। বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণে একান্ত উৎসাহী ও উদ্‌গ্রীব। তোমার অনেক কাজে লাগবে ও সহায়ক হবে। পুলিশ তাকে হান্ট করে বেড়াচ্ছে। এখন বলো কিভাবে তুমি তাকে এখান থেকে রপ্তানি করতে পারো।

মহারাজ বসে পড়েন। চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ঠিক আছে ডাক্তার—তথাস্তু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমার নানা এক্সপেরিমেন্টের মতো এও একটা হোক। ছেলেটিকে দেখতে পারলে ভাল হতো। তা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। একটা কাগজ পেন্সিল দাও। কাগজ নিয়ে তাতে কি সব লিখলেন এবং আঁকলেন। তারপর সেখানা ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন কয়েক-

দিনের মধ্যেই যে রেল স্টেশনের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসবে। প্রায় মাসখানেক ধরে চলবে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, সাধুসন্ত, বৈরাগী এমন কি নাগা বাবাদেরও সমাবেশ ঘটবে। এখন থেকেই তারা সমাগত হচ্ছে। ছেলেটিকে দু'এক দিনের মধ্যেই [illegible]—[illegible] গা—[illegible] সমবেশে [illegible]। বৈরাগী [illegible] একটা [illegible] দিও এবং [illegible] জয়ে গাইবার [illegible]। সেখানে [illegible] উল্লেখ করা [illegible]। [illegible] সেখানে [illegible] এক- [illegible] ছিল [illegible]! [illegible] ঐ পুণ্য [illegible] জন্য [illegible], ব্যারাকপুর, [illegible] যাত্রা [illegible] শুরু [illegible] মতো [illegible] স্টেশনে [illegible] দলগুলি [illegible] নই [illegible] এ [illegible] [illegible] কি [illegible] হয় [illegible] [illegible] জন [illegible] শুরু [illegible] [illegible] ফেলে দিও

সে কি? এ-ব্যবস্থা কি ইনসপেক্টর (হয়তো)!

- হ্যাঁ, যা বলছি শোন। তোমার শত্রুর চোখে ধুলো। আর মুক্তি চাই [illegible] এবং [illegible]। [illegible] শেষ হতেই মহারাজ উঠে দরজার দিকে এগোন। পেছন থেকে ডাক্তার বলেন—দাঁড়াও বন্ধু দাঁড়াও। তুমি এখানে আর ক'দিন আছ? ছেলেটিকে তোমার [illegible] দিতাম।

সর্বনাশ, ও কম্মটি করো না বন্ধু। পুলিশ ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে আমি স্বস্থানে নেই। তবে কোথায়—কলকাতায়? ফলে এখানে হোটেলে মোটেলে মেসে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। সুতরাং আগামীকাল থেকে আত্মপ্রকাশের পর তোমাদের সংসর্গ পরিহার্য। তোমার এখানে আসবার কালে দূর থেকেই আমার অভিজ্ঞ চোখ তোমার চেম্বারের উল্টোদিকে রাস্তার ওপর ওয়াচার দেখতে পেয়েছে। টুপিটা

আরও একটু তেরছা করে তোমার চেম্বারে ঢুকেছি। এখন দরজার বাইরে আর মুখ বাড়িও না, কেননা কোন ডাক্তার রোগীকে দরজা অবধি এগিয়ে দেয় না। এখান থেকেই বিদায় দাও বন্ধু, বিদায়। বন্ধন ছিন্ন করো ছিন্ন করো, আর বিলম্ব নয়। বলেই তিনি দরজা ঠেলে বেরিয়ে যান।

ডাক্তার হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনের মধ্যে একটা অশান্তির ঢেউ ওঠে—উঃ, যেন একটা ধূমকেতু! কি যে করবার মতলবে আছে—কে জানে!

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট পড়ে মহারাজা চতুর্দিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘড়িটা বার করে দেখেন। অফিসের সময়—ট্রামে বাসে বেজায় ভিড়! এসপ্লানেড-গামী একটা ট্রামে কোনরকমে ঠেলেঠুলে উঠে পড়েন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণে নেমে পশ্চিমমুখী গণেশ এভিনু্য ধরে কিছুটা এগিয়েই ছোট্ট একটা ত্রিকোণ পার্ক। তার কাছে আসতেই মহারাজ পার্কের কোণের দিকে চেয়ে দেখেন একটা লোক ওখানে দাঁড়িয়ে পার্কের পাশের গলিতে লোকজনের যাতায়াত লক্ষ্য করছে। মহারাজ সাবধান হন। মাথার টুপিটা কান অবধি নামিয়ে গলিতে ঢোকেন। চলতে চলতে লক্ষ্য রাখছেন কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। গলিটা যেখানে ডান দিকে মোড় নিয়েছে তাই ধরে এগিয়ে দু'খানা বাড়ি ছেড়ে তৃতীয় বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ান। আশ্চর্য, দরজা খোলা! তবে কি যাকে খোঁজ করছেন তিনি বাড়ি বদল করেছেন, নাকি বাড়ি নেই! দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভেতরে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়েই মহারাজ দরজার কড়া নাড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বয়ং গৃহস্বামী এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করেন—কাকে চাই?

—আজ্ঞে আপনাকেই চাই। বাড়িতে প্রবেশ করবার মুখে বলেন—এদিকে দরজা খোলা, আর ও-দিকে গলির মোড়ে টিকটিকি পাহারা! ব্যাপারটা মন্দ নয়!

গৃহস্বামীর অবাক হওয়ার পালা বুঝি তখন তুঙে! তিনি দাঁড়িয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন—কিন্তু মহাশয়ের পরিচয়টা তো জানলাম না।

—আজ্ঞে অধীনের নাম—বলতেই গৃহস্বামী এগিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন—আরে তুমি—এই বেশে! এসো এসো, বলেই তাঁকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করেন।

—এ-বেশ না ধরলে বন্ধুবান্ধব এবং আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার অন্য পন্থা তো নেই।

—হুঁ, বসো বসো। আমার রক্ষক কিংবা পরিচারক (ভক্ষক), যাই বলো, সেই সবেধন নীলমণিটি কিছু একটা আনতে বাইরে গেছে এবং দরজাটাকে এভাবে হা-পাট খোলা রেখে গেছে। অবশ্য তাতে কিবা এ সময়! আমার এখানে কেই-বা ঢুকবে আর কিই-বা হাতড়াবে? আমি তো এ সময়ে দোকানে যাই। ফিরি সেই রাত দশটায়। যাকগে, ঐ যে টিকটিকির উল্লেখ করলে, তারা ওখানে দাঁড়িয়ে অবসর বিনোদন করে আর আমার গলি দিয়ে কে এলো কে গেলো—সত্য মিথ্যা বানিয়ে—ওদের সদর দপ্তরে সংবাদ সরবরাহ করে। আমি সব জানি। তবে কি জান, ওদের সে-গুড়ে বালি! কারণ আমার কাছে দিনের বেলা তো মার্কামারা কেউ আসেনা। যারা আসে তারা রাতের অন্ধকারে নিশাচরের মতো চুপি চুপি আসে যায়! তাদের টিকিটিও ওরা ধরতে পারে না। টিকটিকির ব্যাপারে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারি না। ভাল কথা, তোমাদের ওখানের সব খবর আমি রাখি হে। ডাক গাড়ি লুণ্ঠনের কথা বাদ দিয়ে ঐ ট্রেজারি-লুণ্ঠন কর্মটি বিপ্লবীদের ইতিহাসে এক বিরাট কীর্তি। ঐ কম্মটি এ যাবৎ কেউ করেছে এমন নজির নেই। সাবাস! সাবাস!! হ্যাঁ, এগিয়ে চলো। ভয়-ভয়-হীন নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে যাও—বিজয় নিঃসংশয়! কথাশেষে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—কেবল আমিই কথা বলে যাচ্ছি। এ হলো বয়সের দোষ, বুঝলে হে। তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসেন, বলেন এখন তোমার কথা বলো—কবে এলে, কেন এলে—সব শুনি।

মহারাজ কথা বলতে যাবেন এমন সময় পরিচারক এসে খবর দেয়—দাদাবাবু, দরজার ধারে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কাকে খুঁজছে জিজ্ঞাসা করতেই সে আপনার নাম বলে। তাকে ভেতরে আসতে না দিয়ে, অপেক্ষা করতে বলে আপনাকে খবর দিতে এলাম।

গৃহস্বামী বিস্মিত কণ্ঠে বলেন—কিন্তু এসময়ে আমি যে বাড়ি থাকি না—দোকানে যাই, তা তো সবাই জানে। নিশ্চয় কোন নতুন আগন্তুক, নয় তো ঐ শয়তানদের উচ্ছিষ্ট কেউ যারা মাঝে মাঝে নানা ছলে এসে খোঁজ খবর করে। আচ্ছা তুমি যাও। তারপর মহারাজকে বলেন—একটু বসো ভাই, দেখছি কে। বেগতিক কিছু বুঝলে আমি আর ফিরছি

না। তুমি হরেকেষ্টকে বলে সদর দরজা বন্ধ করিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিতে বলো। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এগলি ও-গলি সে-গলি দিয়ে একেবারে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে গিয়ে পড়বে। রাত্রি দশটার পর এসো। নির্মল চন্দ্রের বাড়ির উত্তরে একটা গলি। ঐ গলি দিয়ে কিছুদূর এগোলেই বাঁয়ে বেঁকে সম্মুখে একজন চলার মতো অপ্রশস্ত গলি। ঐ গলি ধরে এগোলেই আমার গলিতে এসে পড়বে। দরজা বন্ধ থাকবে। দরজায় দু'বার জোরে টক টক করে আস্তে একবার ছোট করে ঠক করলেই আমি বুঝতে পারবো।' মহারাজকে আর কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ না দিয়েই তিনি বেরিয়ে যান।

গৃহস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে দেখেই বুঝলেন এই অপরিচিত জন মাঝে মাঝে ঢুঁ দেওয়া ঐ শরৎনাদের দলেরই একজন ছাড়া আর কেউ নয়। কাছে এসেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন আমাকে আপনার কি দরকার? এ সময়টা তো আমি বড় একটা বাড়ি থাকি না। [illegible]

লোকটা আরো [illegible] বিনীত কণ্ঠে বললে, আজ্ঞে আমি ঠিক আপনাকে চাইনে। আমার এক বন্ধু বন্ধুর খোঁজে এসেছি। [illegible] এ সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো [illegible] কথা। [illegible] আমার বন্ধুর একটা [illegible] জন্যে [illegible] পাঠিয়েছেন।

—হুঁ, বলেছ [illegible] দরজা [illegible]

বন্ধুর বন্ধু বাড়িতে তো এখানে আসেনি [illegible] নাম বললে [illegible] আমাকে [illegible] যদি তিনি দোকানে বসে থাকেন নাহলে [illegible] সঙ্গে দেখা [illegible] চলুন।

লোকটা যেন ফাঁপরে পড়েছে। কিছুক্ষণ [illegible] কণ্ঠে বললে [illegible] চলুন। কিছুদূর চলে [illegible] বললে —আপনি এগোন আমি আসছি। তিনি [illegible] গৃহস্বামী বলেন —আপনি যাচ্ছেন কোথায়? [illegible] বেশি দূর নয়, আসুন।

—আমি আসছি বলেই লোকটা সটকে পড়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে যায়। তিনি মুচকি হেসে দোকানের দিকে এগিয়ে যান।

গৃহস্বামীর ফিরে না আসার কারণ অনুমান করেই মহারাজ হরেকেষ্টকে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে পেছনের দরজাটা খুলে দিতে বলেন। ঐ দরজা দিয়ে বার হয়ে মহারাজ এ-গলি ও-গলি সে-গলি ঘুরে

বড় রাস্তায় এসে পড়েন। বহুবাজারের মোড়ে এসে শিয়ালদাগামী একটা ট্রামে চড়ে হোটেলে ফিরে আসেন। খাওয়া দাওয়ার পর বাকী দিনের কর্মের ফিরিস্তিটা মনে মনে একবার আলোচনা করেন। প্রথমে ব্যানার্জির মেসে গিয়ে আলোচনা-বৈঠকের স্থান কাল নির্ণয় করণ তারপর বৈঠক শেষে মুখুজ্জো মহাশয়ের আস্তানায় গমন। হঠাৎ মনে পড়ে—কিন্তু বরানগরের কি হবে? সেখানে যে জেঠাইমাকে বিনুর খবর জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। ওখানে যেতে আসতে কম্‌সে কম তিন ঘণ্টা লাগবে। ডাক মারফৎ এ সব খবর দেওয়ার পরিণতি মারাত্মক। কেননা পুলিশ ঐ ঠিকানার চিঠি পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। এখন উপায়! কিন্তু সেখানে না গিয়েও উপায় নেই। সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে পড়েন। রাস্তায় এসে শ্যামবাজারের দিকে একটা বাসে উঠে পড়েন। যথাসময়ে বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়েন।—কে, জিজ্ঞাসার উত্তরে পরিচয় দিতেই অতসী দরজা খুলে দেয়। সতর্কতার সঙ্গে এ-দিক ও-দিক দেখে তিনি ভেতরে ঢুকে অতসীকে বলেন—আমি আর যাচ্ছি না। মাকে বলো—বিনু পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে ভালই আছে। কোন চিন্তা যেন না করেন। আমার আর সময় নেই। অতসীকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই বাইরের দিকটা একবার লক্ষ্য করে বেরিয়ে যান। অতসী তাঁর পেছন পেছন এসে গলির মোড়ে তিনি অদৃশ্য না-হওয়া পর্যন্ত নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে।

বরানগর থেকে পর পর দুটো বাস বদল করে বৌবাজারে যখন এসে নামেন রাস্তার আলো তখন জ্বলে উঠে দিনের শেষ ঘোষণা করছে। বড় রাস্তা থেকে উড়ে গলিটার দিকে এগোতেই দেখা গেল সেখানের বাতি তখনো জ্বলেনি। এক উড়ে গলির গ্যাসের বাতি জ্বালাতে মই কাঁধে ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়চ্ছে। শীত শেষের সায়াহ্ন। হাওয়া নেই। হিমের চাপে চতুর্দিকের ধোঁয়া আর রাস্তার ধুলো মিশে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। ফলে গলির মধ্যে চলার গতি পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। এঁধো গলিটার মুখে গ্যাসের বাতিটা জ্বলে উঠেছে। ঐ দিকে এগোতেই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গ্যাসপোস্টের অদূরে দাঁড়ানো একটা লোকের উপর নিবদ্ধ হয়। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দৃষ্টি ও হাবভাবে সে যে একজন গুপ্তচর এ ধারণাই দৃঢ় হয়। এ অবস্থায় ঐ সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে লোকটার

এড়িয়ে কিভাবে ঢোকা যায়! হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। একা না ঢুকে কয়েক জনের সঙ্গে মিশে ঢুকলে কেমন হয়। তিনি সে সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে ও-ধারের বস্তি থেকে অবিরল ধোঁয়া বেরিয়ে সারা গলিটাকে ঢেকে ফেলে। গ্যাসের আলো অস্পষ্ট। সটকে পড়ার এই স্বর্ণ সুযোগ। মহারাজ আর দেরী না করে গলিটার ও-ধারে গিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে চলে চলে একেবারে ব্যানার্জির মেসের দুয়ারে হাজির। খোঁজ নিয়ে জানলেন তিনি নেই। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবেন। চাবি রেখে গেছেন। কেউ এলে ঘর খুলে বসতে বলেছেন। অগত্যা মহারাজ চাবি নিয়ে চিলে কোঠার দরজা খুলে অপেক্ষা করবার মনস্থ করেন। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছেন। হয়তো তার দেরির জন্যই এমনটা হলো। ঘরে ঢুকে তিনি ইলেকট্রিকের সুইচ খুঁজে পান না। তবে কি বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই! অবাক কাণ্ড! এখন মনে পড়ছে ম্যানেজারের ঘরে তিনি হারিকেনের আলোই দেখেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি ছাদটা ঘুরে দেখেন। চতুর্দিকে একটা ধোঁয়ার আবরণ ভেসে বেড়াচ্ছে। এ ছাদ থেকে ও-ছাদ স্পষ্ট দেখা যায় না। বহু পুরনো বাড়ি। নেড়া ছাদ—আলসের চুন সুরকির পলস্তারা খসে খসে পড়ছে। হঠাৎ তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে—ব্যানার্জির এ-বাড়িটাও যে তার পুরনো বাড়ির মতোই পুলিশের লক্ষ্য পাচ্ছে না কি সে জানে কিংবা দেখেছে! যদি এই স্পাই সম্পর্কে সে সত্যিই ওয়াকিবহাল না হলে ছেলেদের নিয়ে এসে এখানেই আলোচনা সভা করে তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তিনি তাঁর অজ্ঞাতবাসের শেষ রাত্রিতে পুলিশের হেফাজতে কোনভাবেই যেতে রাজী নন। রাত্রি দশটায় মুখুজ্যে মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা। ঘড়ি দেখেন—রাত্রি সাতটা। এমনও তো হতে পারে ব্যানার্জি আলোচনা সভার স্থান নির্ণয় এবং ছেলেদের এক সঙ্গে জড় করাতে সক্ষম হয়নি—না কি অন্য কিছু! এই সব সাতপাঁচ ভেবে মহারাজ যখন তার পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না সে সময়েই ব্যানার্জি এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই মহারাজ বলেন—কি হে, এত দেরী করলে যে? আমি তো যাবো যাবো করছিলাম।

—আর বলো কেন ভাই, সভা করবার জায়গা খুঁজে পেলাম না। পাকরাশি, ঘোষ, ডক্তার এত অল্প সময়ের মধ্যে নিরাপদ স্থানের সংস্থান করাতে ব্যর্থ হলো। শেষে কুমারি তার বাড়ির ঐ দিকে চিৎপুরে একটা

জায়গার সন্ধান দিলে। খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল তাতেও প্রচণ্ড বাধা ও ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং বাকি রইলো একমাত্র সবেধন নীলমণির এই চিলে কোঠাটুকু। তাতেও রয়েছে বিষম বিপদের আশংকা। টিকটিকিরা দিবারাত্রি গলিমুখে শিকারের অপেক্ষায় শকুনের মতো বসে আছে। ফলে প্রস্তাবিত আলোচনা সভা বাতিল বলে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আসতে দেরি হলো। আসার সময় ডাক্তার আবার এক ফেঁকরা বাঁধালে। এমন একটি ছেলেকে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আমাকে ধরিয়ে দিলে যাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে মরছে।

—সে কি! ছেলেটি কোথায়?

—তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তো আর বাঘের মুখে ফেলতে পারি না। কি করি? এ সময় আবার পার্কে স্কোয়ারে টিকটিকির উপদ্রব বাড়ে। তারা ঘুরঘুর করে বেড়ায়—কে কোথায় বসে আছে। কে কার সঙ্গে কথা বলছে এবং কি বলছে। কয়েকদিন আগে কলেজ-স্কোয়ারে এরূপ এক ঘটনায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক বেটা টিকটিকিকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়ে স্কোয়ারের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। ঘটনাটা হলো হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের দু'টি ছেলে প্রায়ই কলেজ স্কোয়ারের বিকেলে বেড়াতে আসে। গোল দীঘিটা কয়েক চক্কর দিয়ে উভয়ে রেলিং-এর ধারে, গাছের নিচে কিংবা মেহেদি ঝোপের মধ্যে বেঞ্চিতে গিয়ে বসে গালগল্প করে। স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠদেহ যৌবন-দীপ্তিতে পরিপূর্ণ দুটি ছেলে! আর যায় কোথায়! এক টিকটিকি বেটার নজর তাদের উপর পড়ে। নতুন শিকার ভেবে ঐ বেটা তাদের পেছনে লাগে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটায় ছেলে দু'টি কোন গুরুত্ব দেয়নি; কিন্তু যখন দেখতে পেল লোকটা তাদের পেছনে অবিরত আঠার মতো লেগে আছে, এমন কি হোস্টেল পর্যন্ত ধাওয়া করছে তখন তারা লোকটাকে আচ্ছা শিক্ষা দেবার মনস্থ করে। একদিন বিকালে দীঘিটাকে কয়েক চক্কর দিয়ে দু'জনে সুইমিং ক্লাবের পাশে পুবদিকে একটা বেঞ্চিতে বসেছে। সন্ধ্যা হয় হয়। স্কোয়ারে সন্ধ্যা-ভ্রমণকারীদের ভিড়। ঐ মূর্তি হাজির। ওদের কাছে পিঠে ঘুর ঘুর করছে। একবার বেঞ্চের সামনে দিয়ে যাবার কালে হঠাৎ দু'জনে দু'দিক থেকে পথ অবরোধ করে হাত চেপে ধরে—তুমি কে বলতো বাপধন! আমাদের পেছনে লেগেছ কেন? মতলবটা কি? প্রথমে সে তেড়িমেড়ি করে ওঠে। তৎক্ষণে লোকজন জড় হয়েছে। কেউ বলে বেটা

গাঁটকাটা, কেউ বলে পকেট-মার, পকেটমারার তালে আছে, কেউ বা বলে ফেউ লেগেছে পেছনে। আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে বের করে দিন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে কিল, চাপড়। ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে তাকে বের করে দেয়। হায়রে এভাবেই স্কোয়ার-এ, মাঠে টিকটিকির অত্যাচার চলছে। সুতরাং কি করি? ছেলেটিকে কোথায় রাখি? অবশেষে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো: গলিতে ঢুকে বাঁ দিকে যে তেলে-ভাজা মুড়ি মুড়কির দোকান সেখানে নিয়ে ছেলেটাকে বসিয়ে মুড়িমুড়কি কিনে খেতে দিয়ে এসেছি। তুমি ঐ লোকটাকে ঢুকে জিজ্ঞাসা করবে গরম বেগুনি আছে? তখনই ছেলেটি বুঝবে তুমি কে। ছেলেটির নাম চিরঞ্জীব কেওরা কুশারি চিৎপুর।

মহারাজ ঘড়ি দেখে তক্তাপোশের উপর থেকে ঝোলাটা তুলে নিয়ে বললেন—তোমাদের নিকট এখানকার পরিস্থিতি যা যা শুনলাম তাতে মনে হয় বর্তমানে একটা ডামাডোল অবস্থা চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবাগত ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা কালে যা বলবো স্থির করেছিলাম, তারই কিছুটা সংক্ষেপে বলে যাই: বিলম্বে অসহিষ্ণু পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশ্বাস না হয়ে সেই সঙ্গে বুদ্ধির পার্থক্য, মত ও পথের অনৈক্যকে জয় করতে সক্ষম হলেই স্বাধীনতা ও স্বরাজের দুর্গ তোরণে তোমাদের প্রবেশ করা সম্ভব হবে, মাভৈঃ। চলি ভাই দেখা হবে হয়তো। ফের যদি না হয়, যদি ফিরে আসি। শুভমস্তু!

—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। মহারাজ ঠিক, বলে ব্যানার্জি তাঁকে মোসাহেবি দরজা অবধি জড়িয়ে ধরে এসে তাকে বিদায় দেয়। গলির অন্ধকারে সে অদৃশ্য না হওয়া অবধি দাঁড়িয়ে থেকে তার কানে বুঝি এখনো বাজছে মুহূর্তে মহারাজের শেষ হাসির কথা—যদি আসি ফিরে; যদি ফিরে আসি—প্রত্যাবর্তন হচ্ছে।

মহারাজ গলিতে পা দিয়ে আরো দাঁড়িয়ে চলতে থাকেন। গলির অন্ধকার এখনো কাটেনি—তবে আগের মতো নিবিড় নয়। দূর থেকে ল্যাম্পপোষ্টটা দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য করেন—আশে পাশে কেউ নেই! আশ্চর্য ব্যাপার! তবে কি ব্যানার্জির মেসে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গেই ওয়াচারের বিট শেষ! তথাপি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে তিনি ল্যাম্প পোষ্টটা ছাড়িয়ে যান। সন্দেহ ভাজন কাউকে নজরে আসে না।

কলকাতা নিশ্চিন্ত হওয়াই তিনি উড়ে গলির মুখে এসে দাঁড়ান। সেখান থেকেই তিনি দেখতে পান বাদানাড়ির নির্দিষ্ট দোকানে একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক বসে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি আর দেরি করেন না। দোকানে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করেন, গরম বেগুনি আছে? দোকানীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি যুবকটির পাশে গিয়ে বসেন।

দোকানী বলে—বাবু এখনও বেগুনি ফুলুরি হয়নি। বললে তো গরম গরম অন্য কিছু করে দিই।

থাক, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। একটু ঠোঙায় আনা চারেকের মুড়ি মুড়কি দাও। ঠোঙা হাতে উঠবার সময় ছেলেটির হাত টিপে তিনি বেরিয়ে যান। ছেলেটিও দোকান ছেড়ে নিঃশব্দে দূরত্ব বজায় রেখে তাঁর অনুগমন করে। মহারাজ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট ধরে পশ্চিম দিকে চলে কলেজ স্ট্রীটের ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ইডেন হসপিটাল রোড ধরে এগিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তারপর ঘড়ি দেখে হাসপাতালের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। যুবকটিও তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে। কিছুদূর এগিয়ে হাসপাতালের দুই দালানের মধ্যবর্তী টিনের ছাউনি দেওয়া করিডর ধরে পশ্চিম দিকে চলে ছাউনির পেছনে লাগোয়া পাম গাছের নিচে একটা বেঞ্চির নিকট এসে ছেলেটির হাত ধরে বলে—বসো ভাই। এখানে টিকটিকির উপদ্রবের ভয় নেই। বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে তিনি পুনরায় যুবকটির [illegible] নিজের হাতের উপর রেখে, অঙ্গ-শক্তি পরীক্ষা করে খুশি হয়ে তার ছেড়ে কুস্তিগিরের মতো [illegible] থাকেন। ছেলেটি নিরুত্তর—বুঝলেন এক শাক্ত বাড়ির। মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন বন্দুক, ছোরা, রিভলবার নিয়ে স্যুটিং প্র্যাকটিস করেছ কিনা। ছেলেটি উত্তর—না। শুনে মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—গলায় সুর আছে? গান গাইতে পার? জবাবে—হাঁ, কিছু কিছু অভ্যাস আছে। শুনে মহারাজ—বেশ বেশ, বলে ছেলেটিকে উৎসাহ দেন। তুমি যেখানে কার কাছে যাবে সব কিছু ডক্টরকে বিশদ ভাবে জানিয়েছি। তারই কিছুটা তোমার কাছে পুনরুক্তি করছি। রঘুর কাছে পৌঁছে—দিদি তোমায় তাকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছেন, কথাটি অবশ্যই বলবে। ওর সঙ্গে থাকবার জন্য নিজেকে তৈরি করে নেবে এবং পীড়িত-জনের সেবাশুশ্রূষা কিভাবে করতে হয় তা শিখে নেবে। আর এখন থেকেই তুমি নিজেকে একজন বাউল বলে ভাবতে থাকো।

এবং সেভাবেই তার স্বভাব বেশ ভূষা, গান ইত্যাদি রপ্ত করো। একটা একতারা বাজিয়ে কৃষ্ণ লীলা গাইতে শেখো। নাক থেকে কপাল অবধি টানা শ্বেত চন্দনের ফোঁটা, বহির্বাস, গেরুয়া আলখাল্লা, কোমরে গেরুয়া চাদরের বন্ধন ও গলায় তুলসী মালা। মনে রেখো—এই বাউল বেশই তোমার আত্মরক্ষার একমাত্র কবচ! ডাক্তার তোমার সঙ্গে বুলেট সহ একটা পিস্তল দিলে সেটা তোমার বৈরাগী ঝোলার মধ্যে কিংবা আলখাল্লার নিচে কোমরে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নেবে। আশ্রমে পৌঁছে সুযোগ সুবিধা মতো রঘুর অসাক্ষাতে একটা বাবার ব্যাগে কিছু খড়ের মধ্যে পিস্তল ও বুলেটগুলি রেখে রঘুর স্ত্রীর কবরের পুবে জংগলের মধ্যে মাটির নিচে কোথাও পুঁতে রাখবে। সাবধান, ব্যাপারটা যেন রঘু কিংবা তার চেলা রাখালদের অগোচরে থাকে। কাজের ফাঁকে ঐ অঞ্চলের রাস্তাঘাট, পাহাড় পর্বত গ্রাম গঞ্জগুলি চিনে নিও। মনে রেখো রঘু প্রতি শনি মঙ্গলবার দীঘির পাড়ে বুড়ো শিবতলায় মানতকালীদের পুজো-আচ্চা করতে যায়। মহারাজ ঘড়ি দেখে বলেন—আমার আর সময় নেই ভাই। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে নিরাপদে তোমার ডেরায় পৌঁছতে পারবে তো? যুবকটির নিশ্চিত উত্তর শুনে তিনি বলেন—তোমার সঙ্গে আবার কবে কখন দেখা হবে বলতে পারি না। তবে তোমার অস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থা বুঝে করা হবে। মনে রেখো আমাদের বিপ্লবী জীবন অতীব কঠোর। নিত্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। আরাম আয়েসের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সুতরাং সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলবে। আশীর্বাদ করি তুমি সর্বতোভাবে সফল হও। ছেলেটির মাথা ছুঁয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। ছেলেটি উঠে প্রণাম করবার জন্য মাথা নিচু করবার মুহূর্তে তিনি তাকে দু'হাত দিয়ে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর—শুভমস্তুঃ, বলেই দ্রুবিৎপদে হাসপাতাল থেকে বেরোবার জন্য ভিন্ন পথ ধরেন।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটের নির্দেশিত গলি মুখটার দিকে দূর থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মহারাজ এগিয়ে আসেন। ঘড়িতে রাত্রি দশটা। রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমেই কমে আসছে। রাস্তার দু'পাশে লোহা লক্কড়ের দোকান। তাদের সামনে রাস্তার ধারে সার বেঁধে পর পর ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে। তাদের উপর মুটে মজুররা শুয়ে বসে। কোথাও বা ফুটপাথের

ওপর তাদের রান্নাবান্না চলেছে। মাঝে মাঝে ট্রামগাড়ি ঘড়-ঘড় আর বাস হুঁশহুঁশ শব্দে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করছে। সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখে মহারাজ টুক করে গলির মধ্যে ঢুকে যান। মিটমিট করে একটা গ্যাস বাতি জ্বলছে। তিনি এগিয়ে যান। গ্যাস পোষ্টটার কাছে গলিটা বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। ও গলিটা আরো সরু এবং অন্ধকার। পেছনে গ্যাসবাতির আলো এবং পাশের বাড়ির বন্ধ জানালা দিয়ে যে টুকরো টুকরো আলো আসছে তাতে রাস্তার কিছুই প্রায় দেখা যায় না, অধিকন্তু দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাচ্ছে। চলতে চলতে বাড়ি গুলির দেয়ালের গায়ে ধাক্কা লাগছে। ফলে চলার গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে। হঠাৎ একটা নিরেট দেয়ালে ধাক্কা লেগে তিনি দাঁড়িয়ে যান। সামনে আর কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। অথচ অনুভূত হচ্ছে, কোথা দিয়ে যেন হাওয়া আসছে। মহারাজ ধাঁধায় পড়েছেন। নিশ্চয় কাছে পিঠে কোথাও কোন ফাঁক আছে—গলি কিংবা সুরঙ্গ বা অন্য কিছু। এতক্ষণ অবধি প্রতিপদে এত বাধার সম্মুখীন হয়েও তিনি টর্চ জ্বালেননি। এখন বাধ্য হয়ে টর্চ জ্বেলে দেখেন যে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন সেটা কতটা ইস্কুলি বাঁকের মতো অন্য বাড়ির দেয়ালের দিকে বেঁকে গেছে। এবং ঐখান দিয়েই হাওয়া আসছে। তিনি এগিয়ে যান। দু'দেয়ালের মাঝখানে একফালি সঙ্কীর্ণ গলি তাঁর নজরে পড়ে। ঘড়ি দেখে মহারাজ তার ভেতরে ঢুকে যান। একজনের চলার মতো পথ। বিশেষ নোংরাও নয়। গলির শেষ প্রান্তে এসে সামনের রাস্তাটা চিনতে তাঁর অসুবিধা হয় না। ওপারের দু'খানা বাড়ির পরে তৃতীয় বাড়িটাই তার গন্তব্যস্থল। গলির মুখ এবং আশপাশটা মহারাজ আর একবার ভাল করে দেখে চিনে নেন কেননা এখান দিয়েই তো তাকে ফিরতে হবে। রাস্তাটা পার হবার আগে তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার লোক চলাচল লক্ষ্য করেন। ঐ বাড়িটার আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে কিংবা ঐ দিকের রাস্তার আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে থাকতে কাউকে দেখতে পান না। রাস্তাটা পার হয়ে তিনি নির্দিষ্ট বাড়িটার নিকটে এসে দাঁড়ান। দরজা বন্ধ। এত রাত্রে কড়া নেড়ে কিংবা দরজায় ধুপধাপ শব্দে ধাক্কা দিয়ে গৃহস্বামীকে তাঁর উপস্থিতি জানিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের বিরক্তি ও সন্দেহ উৎপাদন করতে তিনি অনিচ্ছুক। দেয়াল টপকেও ভেতরে অনায়াসে ঢোকা যায় কিন্তু

পাড়াপ্রতিবেশী কিংবা রাস্তার লোকের চোখে পড়লে এক বিষম অনর্থ হবে। এই অবস্থায় গৃহস্বামীকে তাঁর আগমন জ্ঞাত করবার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে তিনি যখন চিন্তা করছেন সেই সময়ে ভেতর থেকে কারো পদধ্বনি কানে আসতেই তিনি ছোট করে দরজায় কয়েকটা সাংকেতিক টোকা দেন। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যায়। গৃহস্বামী স্বয়ং দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখেই বলেন—যা ভেবেছি! কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ?

—না, কিছুক্ষণ হয়েছে।

—এসো, [illegible] খবর নিয়ে এগিয়ে যান। মহারাজ দরজা বন্ধ করে [illegible] অনুসরণ করেন। [illegible] ঘরে ঢাকবার মুখে [illegible] দাঁড়ান। দরজার [illegible] একজন বসে, অপরজন ঘরের ভেতরে যাবে [illegible]টাই শুধু দেখতে পাচ্ছেন। গৃহস্বামী [illegible] মহারাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে [illegible] বুঝে [illegible] বলেন— Come, come, [illegible] that melancholy figure. এসো, [illegible], দেখবে [illegible]! You will not only be surprised but also [illegible]ed.

গৃহস্বামী [illegible] দেখে [illegible] শারীরিক কুশল, [illegible] ইত্যাদি এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। আগন্তুক যথাযথ উত্তর দিয়ে বলেন— এসকট [illegible] শুধু তোমাকে দেখবার জন্যই এতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছি। এখন উঠি—so far until we meet

মহারাজ উঠে দাঁড়ান, বিদায় মুহূর্তে পুনরায় আলিঙ্গনের পর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেন— *March indefatigably on, and for the last* effect still keep thy sword erect. Like as the waves make forward the pebbled shore, so do our minutes hasten to the end.

আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গে দরজার ধারে অপেক্ষমান একটি সিপাহীও উঠে দাঁড়ায়। গৃহস্বামী উভয়কে সঙ্গে নিয়ে দরজা অবধি এগিয়ে তাদের বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসেন। তিনি আসতেই মহারাজ

বলেন—এ এক শুভ যোগাযোগ। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত! আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর ঘড়ি দেখে বলেন—আমিও চলি দাদা, রাত্রি এগারোটা। বারোটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে।

—দুপুর বেলা তো কোন কথাই হয়নি। সেজন্য রাত্রে আসতে বলেছিলাম! রাত্রি বেলাই শলাপরামর্শের প্রশস্ত সময়।

—আমার বলার বিশেষ কিছু নেই। এসেছি প্রধানতঃ শ্রদ্ধা জানাতে—সেটা শেষ প্রণামও হতে পারে। আর সেই সঙ্গে যদি কিছু বেসাতি মেলে—সেটা অর্থে কিংবা অস্ত্রশস্ত্রে যাতেই হোক না কেন। বিপ্লবীদের জন্য রক্তাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় একটা জলন্ত সাক্ষর রেখে যেতে চাই। যার থেকে দেশোদ্ধার কাজে, তারা অনুপ্রেরণা পাবে, স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হবে। সূচী অনুযায়ী ঐ মরণপণ যুদ্ধ-যজ্ঞের—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—অনুষ্ঠান চলেছে। এখন তা শেষ পাদে! তাছাড়া ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষা-লব্ধ জনের ঃ

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

আশীর্বাদ করুন যেন সফলকাম হই, সিদ্ধিলাভ করি।

—আমি তো ভাই তোমাদের ক্রিয়া কর্মের উপর সবক্ষণ সবিশেষ নজর এবং খোঁজ খবর রাখছি। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তোমাদের উপর ফল্গুধারায় অনুক্ষণ বর্ষিত হচ্ছে। শুধু আশীর্বাদ কেন, এখন ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাদের সঙ্গে মিলে এত বড় একটা অভিযানে—যাকে ধর্মযুদ্ধ বলা যেতে পারে—সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি। কিন্তু বয়সের ভারে দিন দিন তনুক্ষীণ ও বলহীন হয়ে পড়ছি। তথাপি সরকার আমার উপর সবক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে। পাছে অতীতের মতো অধুনা আবার কোন অস্ত্রআমদানীকারকের গুদাম লুণ্ঠন করি।

মহারাজ ঝোলা কাঁধে উঠে পড়েন। গৃহস্বামী সঙ্গে সঙ্গে—দাঁড়াও, বলে ভেতরে চলে যান। কিছু সময় পরে বেল্ট শুদ্ধ হোলস্টারে একটা লম্বা পিস্তল, একটা ছোট ঝোলায় কার্তুজ এবং কাগজে মোড়া ছোট্ট একটি প্যাকেট হাতে নিয়ে উপস্থিত হন। মহারাজ-এর কাছে এসে বেল্টসুদ্ধ পিস্তলটা তার হাতে দিয়ে বলেন—এই নাও আমার অনেকদিনের সঙ্গী, সাথী ও রক্ষী—আমার তূণ-এর শেষ শায়ক। বহুদিন এটি নির্ভুল লক্ষ্যে আপন কার্য সাধন করেছে। আর এই ধরো যৎকিঞ্চিৎ

[illegible] যা এই অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে পেরেছি। মহারাজ [illegible]তেই তিনি তাঁকে দুহাতে ধরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। —জয় যাত্রায় যাও, বলে হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে মাথায় হাত রেখে—সিদ্ধির্ভবতু: উচ্চারণ করে তাঁকে বিদায় দেন। যতক্ষণ অবধি না মহারাজ রাস্তা পেরিয়ে গলির আঁধারে অদৃশ্য হয়ে যান ততক্ষণ অবধি এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভাবেন—উঃ, যেন একটা আগ্নেয় গিরি! যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে বিদেশী শাসন ধ্বংস করে স্বদেশের মুক্তি সাধনে উন্মুখ! কি অটল বিশ্বাস, অচঞ্চল ধৈর্য! মূর্তিমান বলবীর্যপূর্ণ এক বীরসিংহ, পুরুষর্ষভ !!

সে রাত্রে মহারাজ হৃষ্টচিত্তে হোটেলে ফিরে আসেন। এখানে তার সফর অনেকাংশে সফল। বিশেষতঃ এই সময়ে সুরেশের মুক্তি এবং তার সাক্ষাৎলাভ এক অভাবনীয় ঘটনা! আসন্ন অভিযানের পক্ষে পরম শুভ সূচনা।

স্নানাহারের পর মহারাজ বারান্দায় পায়চারি করতে করতে মনে মনে পরবর্তী দিনের কর্মের একটা ছক তৈরী করেন তারপর ঘরে ফিরে বাতি নিবিয়ে ঝোলাটা মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়েন। পরদিন খুব ভোরে উঠে প্রাতকৃত্য সেরে জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে হোটেলের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেন। তারপর ঘরে এসে নিশিকে ডেকে বকশিস দিয়ে ঝোলা কাঁধে সুটকেশ হাতে বেরিয়ে যান।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে নতুন হোটেলে প্রবেশের পূর্বে তার নকল সাজ পরিবর্তন আবশ্যক। পার্কের ভেতরে গিয়ে পোষাক পরিবর্তন সম্ভব; এই ভেবে তিনি ঐ দিকেই এগোন। কাছে এসে তিনি অবাক। এত ভোরে সেখানে প্রাতভ্রমণকারী যুবা বৃদ্ধের ভীড়! তাদের কেউ জোরে কেউ বা আস্তে হাঁটছে, কেউ বা দৌড়চ্ছে। আবার কেউ বা মাঠে ঘাসের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে প্রাণায়াম করছে—এই পরিস্থিতিতে তাঁর পোষাক পরিবর্তন লোক চক্ষুর আড়ালে কিভাবে করা যায় তাই ভাবতে ভাবতে তিনি পার্কে প্রবেশ করে একটা বেঞ্চিতে বসেন। পার্কের কোথাও ঝোপঝাড় আছে কিনা তা দেখতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি পার্কের এক কোণে অবস্থিত কর্পোরেশনের উড়ে মালির ঘরটার উপর নিবদ্ধ হয়। ঘরের একপাশে ছোট ছোট গাছগাছড়া ও লতাপাতা ঘেরা—ছোট একটা কুঞ্জের মতো। তিনি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে

ঐ দিকে অগ্রসর হন। এত সকালে ঐ [illegible] নিকুঞ্জে [illegible]
থাকার কথা নয়। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে কেউ নেই দেখে এবং
কারো কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর উপর নেই লক্ষ্য করে তিনি চট করে ভেতরে
ঢুকে পড়েন। তাড়াতাড়ি নকল পোষাক ছেড়ে বহির্বাস পরে, [illegible]
গায়ে, বাবড়ি চুল এলিয়ে দিয়ে চটি পায়ে, ঝোলা কাঁধে ও হাতে [illegible]
নিয়ে তিনি বেরিয়ে আসেন। পার্কে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা ইতিমধ্যে কমে
গেছে বলেই তাঁর মনে হলো। যাক, পোষাক বদলের পালা অনায়াসে
সুষ্ঠুভাবেই চুকলো। খুশি মনে তিনি পার্ক থেকে বেরিয়ে যান।

হোটেলে এসে একটা সিঙ্গল কামরা তিন দিনের জন্য ভাড়া করেন।
যথারীতি নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়ে অগ্রিম অর্থ দিয়ে পরিচারক সমভি-
ব্যহারে তিনি নির্দিষ্ট ঘরে আসেন। ছাদের ওপর দক্ষিণমুখী একটানা
পৃথক পৃথক কয়েকটা ঘর, উপরে এ্যাজবেস্টস। ছাদের দুই কোণে
বাথ ও প্রিভি। ঘরে তক্তপোষ, ফ্যান, টেবিল, চেয়ার এবং পাশের
দেয়ালে টাঙানো একটা আর্শি। একজনের ব্যবহার যোগ্য ঘর—তবে
আরামদায়ক নয়। কেননা খোলা ছাদ, দিনে অত্যধিক গরম অনিবার্য।
পরিচারক ঘর দোর পরিষ্কার করে হোটেলের তালা চাবি দিয়ে চলে যায়
এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কুঁজো জল এবং গ্লাস নিয়ে হাজির। তাকে
খাবার সময় এবং খাদ্যের তালিকা বলে দিতেই সে চলে যায়। মহারাজ
তার জিনিষপত্তরের মধ্যে একমাত্র পিস্তলটার নিরাপত্তা সম্পর্কেই
চিন্তিত। দরজা বন্ধ করে তিনি সেটা বার করে ন্যাকড়া দিয়ে ভাল করে
পরিষ্কার করেন। একটা খবরের কাগজে কার্তুজ সহ সেটা মুড়ে
দড়ি দিয়ে বেঁধে তোষকটা তুলে তক্তপোষের নিচের দিকের বাজুতে
সুকৌশলে বেঁধে তোষকটা পুনরায় যথা স্থানে রেখে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত
হন। নকল সাজের কাপড় চোপড় টুপি ইত্যাদি কাগজে মুড়ে, সুটকেশের
ভেতর রেখে দেন। কলকাতায় তাঁর বিগত কয়েকদিনের [illegible] পরি-
ক্রমণের পরিসমাপ্তি হলো।

স্নানাদির পর খাওয়া দাওয়া সেরে দরজায় তালা দিয়ে মহারাজ
হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। ডালহৌসিতে সরকারি সদর দপ্তরে এসে
যখন পৌঁছান বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। দপ্তরে ঢুকবার প্রধান ফটকে
আসতেই সান্ত্রী বেয়নেট যুক্ত বন্দুকটা কাত করে রাস্তা [illegible]
পেছনে দাঁড়ানো লাল মুখো এক পুলিশ সার্জেন্ট এগিয়ে এসে [illegible]

[illegible] পত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে নেই শুনে, সার্জেন্ট কি প্রয়োজনে কার কাছে যাবেন, কোথা থেকে আগমন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে কাগজপত্র দেখতে চায়। মহারাজ ঝোলা থেকে কাগজপত্র বের করে সার্জেন্টের হাতে দেন। সার্জেন্ট কাগজপত্র দেখে ফিরিয়ে দিয়ে একটা স্লিপে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখে তাঁর হাতে দেয় এবং কোন তলা, কত নম্বর ঘর বাৎলে দেয়। মহারাজ এগিয়ে আসতেই সার্জেন্ট তার ঝোলা এবং শরীর পরীক্ষা করে ছেড়ে দেয়। ডি. পি আই-এর আপিসে এসে মহারাজ জানতে পারেন যে তিনি ট্যুরে গেছেন। আগামীকাল ফিরবেন। ঐদিন আপিসে না এলেও আগামী পরশু অবশ্যই আসবেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি কি করবেন? সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী কর্মপদ্ধতি স্থির করে ডি. পি. আই-এর ডেপুটির সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে কাগজপত্র সব দেখিয়ে এ সম্পর্কিত ফাইলটা বের করিয়ে এনে তাতে নোট লিখিয়ে সেটা ডি. পি. আই-এর টেবিলে রাখবার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় আগামী পরশু আসবেন বলে ডেপুটি মহাশয়কে ধন্যবাদ সহ নমস্কার জানিয়ে রাইটারস্ ত্যাগ করেন।

ডি. পি. আই-এর অনুপস্থিতি হেতু মহারাজার পরিকল্পনা মতো কর্মসূচী রূপায়ণে বিঘ্ন ঘটলো। ফলে আজ এবং আগামীকালের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম সব কিছু সমাধা করতে হবে। তৃতীয় দিনে মানে আগামী পরশু ডি পি. আই-এর ব্যাপারটা চুকাতেই হবে। রাস্তায় নেমে মহারাজ ঘড়ি দেখে একটা ট্রাম ধরে হোটেলে ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র বার করে প্রথমে কোথায়-কোথায় যাবেন তা স্থির করে হ্যারিসন রোডে হাওড়াগামী একটা বাসে ওঠেন। উদ্দেশ্য হাওড়া এবং ফিরতি পথে বড়বাজারের কাজ একই দিনে শেষ করা। কিন্তু বাস গঙ্গার সেতু মুখে এসে আটকে পড়ে। ষ্টীমার চলাচল হেতু সেতু বন্ধ। কখন সেতু খুলবে এবং বাস চলবে ঠিক নেই। একবার ইচ্ছা হলো বাস ছেড়ে মল্লিক ঘাট থেকে নৌকায় ওপারে যান। কিন্তু ঘাটের জল কাদার অবস্থা দেখে বিরত হন।

ওপারে যাবার যাত্রী, বাস, মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি মিলে প্রকাণ্ড জট পাকিয়েছে সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কোলাহল। প্রায় কুড়ি মিনিট পর পুল খুলে যায়। হাওড়া এসে যান বাহনের অসুবিধা হেতু কাজকর্ম সারতে নির্ধারিত সময়ের অধিক ব্যয় হয়। বড়বাজারে

এরপর যখন পৌঁছান তখন বেলা শেষ। ব্যবসায়িক কাজ—অর্ডার পত্র দিয়ে নিয়ে, টাকা পয়সা আদায় উশুল করতে রাত্রি অনেক হয়। মির্জাপুর ও হ্যারিসন রোডের ট্রাম থেকে যখন নামেন ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত্রি ৯টা। হোটেলে ঢুকে নিজের কামরায় পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ান। সম্মুখের পার্কে লোকজন ও তেরঙ্গা পতাকার ছড়াছড়ি। পার্কে বক্তৃতা চলেছে এবং মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কি হলো এতদূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে লোকজন ছুটোছুটি করছে আর পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাদের তাড়া করছে এবং যাকে পাচ্ছে বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে—রক্তারক্তি কাণ্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্ক এবং আশপাশের রাস্তা খালি—অবশিষ্ট কেবল জুতো পাগড়ি ও লাঠি। পুলিশের অত্যাচার দেখে মহারাজ রাগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন—ইচ্ছা হলো এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পুলিশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে পিটিয়ে তাদের শায়েস্তা করেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবেন হয়তো ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবার মিটিং—এ হলো কংগ্রেস পলিটিক্স। এতে উত্তেজিত না হয়ে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়। তিনি ঘরে ফিরে যান।

স্নানাদি সেরে ঘরে ফিরে সবে পাখাটা খুলে বসেছেন এমনি সময় পরিচারক এসে বলে—ম্যানেজার বাবু সেলাম দিয়েছেন। তিনি পরিচারককে খাবার আনবার আদেশ দিয়ে বলেন—খাওয়াদাওয়া সেরে তিনি ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁকে বলো। খাওয়াদাওয়ার পর মহারাজ ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখেন অন্ধকার। তিনি [illegible] ম্যানেজারের অনুপস্থিতি সাক্ষাতের বিষয়টা গুরুত্বহীন বিবেচনা করে তিনি ফিরে আসেন। কেননা গুরুতর কিছু হলে তিনি নিশ্চয়ই তার জন্য অপেক্ষা করতেন। ফিরে এসে কিছুক্ষণ খোলা ছাদে পায়চারি করেন। বাতাসে শীতের আমেজ। আকাশ বাতাস কুয়াশা ও ধোঁয়া-হীন নির্মল। [illegible] কিংবা দূরের ঘর বাড়ি গাছপালাগুলি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। [illegible] এবং অদূরবর্তী পার্কের আলোগুলি অনেক উজ্জ্বল। দূর গগনের নক্ষত্রগুলিও যেন অনেক দীপ্তিময়। সব মিলিয়ে দিবসের কল্লোলিনী মহানগরীর রাতের বেলায় ভিন্ন এক মনোমুগ্ধকর রমণীয় কমনীয় রূপ। তিনি রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ান। পার্কের দিকে চাইতেই সন্ধ্যাকালে পুলিশের বেপরোয়া নিষ্ঠুর লাঠি-পেটার কথা স্মরণ হতেই তাঁর মনে [illegible]

[illegible] নষ্ট হয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি আরো নিজে [illegible] [illegible]। পরদিন খুব সকালে উঠে শরীর চর্চার পর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঘরে এসে বসেছেন। পরিচারক প্রাতরাশের তালিকা জানিয়ে কি পরিবেশন করবে জিজ্ঞাসা করে। নির্দেশ অনুযায়ী খাবার এনে পরিবেশক ম্যানেজার বাবু তাকে নমস্কার জানিয়েছেন বলে চলে যায়।

প্রাতরাশের পর মহারাজ ম্যানেজারের ঘরে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখেই ম্যানেজার বসতে বলে কেমন একটা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকে দেখেন। মহারাজ তা লক্ষ্য করে বলেন গতকাল রাত্রিতেও তিনি একবার এসেছিলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—যাক্‌গে, এখন কি প্রয়োজনে আমাকে ডেকেছেন?

ম্যানেজার মহারাজ-এর কণ্ঠস্বরে বোধহয় কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। সুতরাং বিষয়টাকে লঘু করার উদ্দেশ্যে হেসে বলেন—প্রয়োজনটা আমার নয় স্যার, আপনার।

মহারাজ একটু অবাক হয়ে বলেন—সে কি?

—আজ্ঞে হাঁ। তাহলে বিষয়টা খুলেই বলি। গত রাত্রে পুলিশ রুটিন মতো বোর্ডারদের রেজেষ্ট্রি চেক করতে আসে। নবাগতদের মধ্যে আপনার নাম দেখে কি যেন একটা পেয়েছে এমন ভাবকরে আপনার নামটা তাদের ডাইরিতে টুকে নিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—ইনি কখন এসেছেন। ভুল বশতঃ আপনার নামের পাশে সময়ের উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং আমার উপর এক চোট তম্বি করে—বলুন, ইনি কখন এসেছেন। আমি বললুম যে ভুল বশতঃ সময়ের উল্লেখ করা হয় নি, তবে অনুমান সকাল সাড়ে সাত কি আট। উত্তর শুনে পুলিশ আর একবার চোটপাট করে বলে—ওসব অনুমান টনুমান চলবে না, ঠিক সময়টা লিখুন। আমি তো ভয়ে ভয়ে আটটা লিখে ফেললুম। তারপর ওরা ওদের নোট বইতে কি সব লিখে নিয়ে আমাকে আর একবার সাবধান করে চলে যায়।

—আমি তো হতবাক! এরকম ঘটনা পূর্বে ঘটেনি। আপনার সত্য পরিচয় আমি জানি না। তবু বিষয়টা আপনার গোচরে আনা আমার কর্তব্য। কেননা, জানেন তো বাঘে ছোঁয়ার মতো পুলিশের ছোঁয়ায় শুধু আঠারো ঘা নয় বরং তার চেয়ে বেশী। পুলিশের হাবভাবও আমার ভালো লাগলো না। কোন একটা গণ্ডগোল পাকাবার তালে

রয়েছে কিনা কে জানে। সেজন্যই বলছিলাম প্রয়োজনটা আমার নয়, আপনার।

সব শুনে বিষয়টা লঘু করবার জন্য মহারাজ হেসে বললেন—[illegible]টা এমন কিছু গুরুতর নয়—কেননা পুলিশকে একপ্রকার আমার নিত্য সহচর ধরে নিতে পারেন। আমার খোঁজ পেলেই তারা আমার [illegible] ছাড়ে না। তবু আপনার খবরের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

মহারাজ-এর উক্তি শুনে ম্যানেজার সবিস্ময়ে তার দিকে চাইলেই তিনি তাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ঘরে ফিরে এসে মহারাজ সারা দিনের কর্মসূচী তৈরী করেন। তারপর স্নানাহার সেরে হোটেল থেকে বেরোবার মুখে লক্ষ্য করেন দু'জন লোক রাস্তার ওধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে কথা বলছে। তিনি বুঝলেন এরাই স্পটার—তাঁর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য নিযুক্ত। সাবধানতা কিংবা গোপনীয়তার কিছু নেই—সবই খোলামেলা আশ্রমের ব্যবসা ও স্কুল সংক্রান্ত কাজকর্ম। সুতরাং ওদের কর্তব্যের মধ্যে না এসে তিনি মির্জাপুর ধরে কলেজ স্ট্রীটে এসে শ্যামবাজারগামী একটা ট্রাম ধরেন। তারপর সারাদিন ব্যাপী উত্তর, মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতায় [illegible] সংক্রান্ত কাজকর্ম—অর্ডার নেওয়া দেওয়া, আদায় উশুল ইত্যাদি সেরে পরিশ্রান্ত হয়ে রাত্রি নয়টা নাগাদ হোটেলে ফিরে আসেন।

বিশ্রামের পর স্নানাদি সেরে তিনি আশ্রমের কাগজপত্র টাকা [illegible] ইত্যাদির হিসাব নিয়ে বসেন। সব কিছু গুছিয়ে ফেলে টাকা [illegible] আগামী কাল ভি. পি. ওতে আশ্রমের নামে মনিঅর্ডার করবার [illegible] নিয়ে স্বস্তি বোধ করে ঘর থেকে ছাদে বেরোবার মুখে চাকর এসে খাবার [illegible] কিনা জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে—হাঁ, শুনেই সে চলে যায়। [illegible] মধ্যেই সে খাবার নিয়ে উপস্থিত। খাওয়া শেষ হলে পর সে [illegible] নিয়ে যাবার সময় ম্যানেজার বাবু সেলাম দিয়েছেন জানিয়ে চলে যায়। খবর শুনে আবার কি ঘটলো জানবার জন্য কৌতূহলী হয়েই [illegible] ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাকে দেখেই ম্যানেজার [illegible] বসুন, বসুন। কত [illegible]ই তো আসে [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] কাণ্ড [illegible] হয়েছে। [illegible]

[illegible]

খোঁজ করেন।—না শুনেই তিনি ফের আসবেন বলে চলে যাবার সময় পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর উত্তর—নাম ধামের দরকার নেই মশাই। বলবেন একজন বন্ধু,—আবার আসবেন।

—হুঁ, বুঝলাম। তারপর হেসে বলেন—তা বন্ধুবান্ধব থাকলে তারা অবশ্যই খোঁজ খবর নেবেন ও দেবেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি আমার সহচরই বলুন বা বন্ধুই বলুন সংখ্যায় অনেক। তারা নানা সময়ে নানা বেশে নানা ছলে আমার খোঁজ খবর নেবে, সাক্ষাৎ চাইবে, তাতে আপত্তির বা ঘাবড়াবার কিছু নেই বলেই ম্যানেজারবাবুকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই মহারাজ বেরিয়ে যান।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই শরীর চর্চা ও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঘরে এসে বসে সারাদিনের কর্মের ফিরিস্তি তৈরি করেন। কিন্তু কি ভাবে কখন কি বেশে কোন গাড়িতে কলকাতা ছাড়বেন তা ঠিক করতে পারছেন না। সামনে শিবরাত্রির মেলা। ঐ সময়ে তীর্থক্ষেত্রের পাহাড়িয়া অঞ্চল সহ রঘুর আশ্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করবার উপযুক্ত সময়। সুদেষ্ণাকেও তিনি সেরূপ আভাস দিয়েছেন। মেয়েরা স্বভাবতই আশ্রয়াভিলাষী। তদনুযায়ী আশ্রয়ের গুণাগুণ বিচার করে থাকে। দেখাযাক আপৎকালীন আশ্রয়স্থল হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতখানি। তবে একটা বিষয়ে খুব সতর্কতার দরকার—রঘুর আশ্রমকে কোন অবস্থাতেই পুলিশের নেক নজরে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। সেবাশ্রম হিসেবেই এর প্রচার ও প্রসার আবশ্যক। তাতেই স্বার্থ রক্ষিত হবে।

এভাবেই ভালোমন্দ মিলিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখেন। তারপর কোথা দিয়ে কিভাবে যাবেন মনে হতেই যাবার পথে অতীতের সঙ্গে দেখা করে এখানকার মতো বিপ্লবের পথে সেখানের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেবার ইচ্ছা জাগে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আজ রাতেই ছদ্মবেশে কলকাতা ত্যাগ করা স্থির করেন। তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছে কিভাবে চিরঞ্জীব-এর সঙ্গে যোগাযোগ সাধন, আশ্রম ও তার চতুর্দিকের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি অবস্থানুযায়ী বিবেচনা করা হবে। পরিচারক সকালের খাবার নিয়ে উপস্থিত। তিনি তাকে দাঁড়াতে বলে নাম জিজ্ঞাসা করেন। নাম শুনেই মহারাজ বলেন—হরিচরণ এ খাবার তুমিই খেয়ে নিও। আমার এখন খাবার অবসর নেই। তুমি ঠিক একবেলা দশটায় আর রাত্রে ঠিক আটটায় আমার খাবার দেবে। [illegible]

নিয়ে তাঁর মধ্যেকার কাগজপত্র বার করে দেখে দেখে গোছাতে থাকেন। পরিচারক খুশি মনে বেরিয়ে যায়।

স্নানাহারের পর মহারাজ হোটেল ছেড়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেলা এগারোটার মধ্যে ডালহৌসী পৌঁছেন। প্রথমে জি. পি. ও-তে গিয়ে আশ্রমের নামে টাকা মনি-অর্ডার করে পাঠান। তারপর মহাকরণে সদর দপ্তরে এসে উপস্থিত হন। দপ্তরে ঢোকবার মুখে প্রধান ফটকে আগের দিনের মতো পুলিশী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডি.পি. আই-এর দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে আগের দিনের অফিসারের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন যে তাঁর ফাইল ডি. পি. আই-এর টেবিলেই রয়েছে। তিনি মহারাজ-এর হাতে একটা স্লিপ দিয়ে সেটাকে ফিল আপ করিয়ে বেয়ারা দিয়ে ডি. পি. আই-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিজিটার্স রুমে অপেক্ষা করতে বলেন। সেখানে এসে আরও কয়েকজনকে অপেক্ষারত দেখে বুঝলেন বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। তিনি ঘড়ি দেখেন—বেলা বারোটা। একটায় আবার বাবুদের টিফিন। সুতরাং কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে! এই বিরক্তিকর মুহূর্তগুলি তিনি কিছুক্ষণ পরপরই ঘড়ি দেখে কাটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে অপেক্ষারত দু'জনের ডাক এসে গেছে। বেলা পৌনে একটায় তাঁর ডাক আসে। ঘরে ঢুকতেই ডি. পি. আই. তাকে চেয়ে দেখে বললেন—এ্যাফিলিয়েশন পাবার পূর্ণ যোগ্যতা আপনাদের বিদ্যাপীঠের রয়েছে। তবু কেন যে এতদিন হয়নি। যাক্, স্যাংশনটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেটা আমি দেখছি। আপনি টিচিং স্টাফ-এর সংখ্যা কোয়ালিফিকেশন সহ এ্যাসিস্টেন্ট জলধর বাবুকে দিয়ে যাবেন। সেখান থেকে এ্যাসিস্টেন্ট জলধর বাবুর ঘরে এসে ডি. পি. আই-এর নির্দেশ মতো বিষয়টা একটা কাগজে লিখে তারিখ দিয়ে সই করে জলধর বাবুর হাতে দিয়ে এ্যাফিলিয়েশনটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সে অনুরোধ করে নমস্কার জানিয়ে মহারাজ বেরিয়ে যান। বিদ্যাপীঠের সংক্রান্ত কাজ শেষে সরকারী দপ্তর থেকে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ান, ঘড়িতে তখন বেলা দুটো। তাঁর কলকাতা আগমনের উদ্দেশ্যের সফল-সমাপ্তি হলো।

হোটেলে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মহারাজ বিদ্যাপীঠের এ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত সমুদয় কর্মের একটা রিপোর্ট তৈরি করেন। [illegible] মহারাজ ঘড়ি দেখে উঠে পড়েন। [illegible]

[illegible]

শেষে তিনি বাইরের ছাদে বেরিয়ে আসেন। অপরাহ্ণের অন্তিমকাল— সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিচের রাস্তা থেকে প্রচণ্ড গোলমাল হৈ হল্লা চিৎকার চেঁচামেচির সঙ্গে মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম ধ্বনিও তাঁর কানে আসছে। তিনি ছাদের আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ান। আধো আলো অন্ধকারে যতদূর দেখা যাচ্ছে পার্কের ভেতর ও বাইরের জমায়েত লোকজনকে পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করছে ও বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে। আজকের পুলিশী তাণ্ডব ও অত্যাচার সেদিনকার চাইতেও প্রচণ্ড ও পৈশাচিক। সেদিন পুলিশ মাঠ এবং তার চতুপার্শ্ব থেকে লোক সরাবার জন্য লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে ও পিটিয়েছে। কিন্তু আজকে পুলিশ লাঠিপেটা করে অচৈতন্য রক্তাপ্লুত লোকগুলিকে কুকুরের মতো টেনে হিঁচড়ে পার্কের পাশে দাঁড়ানো কালো গাড়িগুলিতে তুলছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মহারাজ ক্রোধে ক্ষিপ্ত। কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। ক্রুদ্ধ রক্তরাঙা অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ঘরে ফিরে যান। লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি ও আর্তনাদ তখনও চলেছে সেই সঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত।

ঘরে এসে রাগটাকে হজম করবার জন্য গুম হয়ে বসে থাকেন। তারপর ঘড়ি দেখে উঠে জিনিষপত্র গুছোতে শুরু করেন। খাটের বাক্স থেকে বুলেট সহ পিস্তল হাতে নিতেই ইচ্ছা হলো ছাদের রেলিং-এর ধারে গিয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। পরক্ষণেই এই প্রতিহিংসার ইচ্ছা দমন করে মহারাজ বুলেট সহ পিস্তলটা কোমরে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখেন কোথাও কিছু পড়ে আছে কিনা। পরিচারক খাবার নিয়ে এসেছে। খাওয়া শেষ হলে পর সে থালা বাসন নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মহারাজ ঝোলা কাঁধে স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ম্যানেজারের ঘরে আসতেই তিনি অবাক হয়ে বলেন—এ কি আপনি চলে যাচ্ছেন? এক ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলা এসে আপনার খোঁজ করতেই আমি তাকে রাত্রি ৯টায় আসতে বলেছি।

—আমার দুর্ভাগ্য তার সঙ্গে দেখা হলো না। ভদ্রলোক যদি আসেন বলবেন যে তিনি অন্যত্র চলে গেছেন। তারপর হোটেলের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এসে সম্মুখের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। ম্যানেজার তাঁর প্রস্থানরত মূর্তির দিকে চেয়ে অবাক

হয়ে ভাবেন—অদ্ভুত লোক। পুলিশ তার পেছন পেছন হন্তে হয়ে ঘুরে মরছে অথচ তিনি কেমন নির্বিকার নিঃশঙ্ক! কিন্তু এও তো আশ্চর্য ব্যাপার তারা তাঁকে ধরছে না কিংবা ধরতে পারছে না। নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। না কি কোন খানদানি, গণ্যমান্য স্বদেশীওয়ালা বাবু! কে জানে! বা একখানা চেহারা—গড়ন ও ঔজ্জ্বল্য!

হোটেল থেকে নিচে নেমে এসে দেখেন রাস্তা এবং অদূরে পার্কের দিকটা একেবারে খালি। সেখান থেকে সটান শিয়ালদহ স্টেশনে এসে প্ল্যাটফরমে গাড়ি ছাড়বার বোর্ড দেখে ছাড়বার মুহূর্তে একটা লোকাল ট্রেনে উঠে কলকাতা ত্যাগ করেন।



সেদিন সন্ধ্যারাতে কিছু সময়ের জন্য মহারাজ-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য চিরঞ্জীবের যুব-মানসে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর কথাবার্তা আচার আচরণে তাঁকে অতি আপনজন বলেই তার মনে হয়েছে এবং নতুন করে বিপ্লবী প্রেরণা পেয়েছে। তিনি চলে যেতেই তার নিজেকে কেবলই সঙ্গী বিহীন এক একা মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মনের জড়তা কাটিয়ে সে উঠে পড়ে এবং মহারাজ-এর নির্দেশ মতো নিজেকে তৈরি করতে মনস্থ করে। আপন গোপন আড্ডায় এসে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে যে শোভাবাজারের ঐ দিকে এক রাধা-কৃষ্ণের মন্দির আছে। সেখানে অহরহঃ বৈরাগীদের নাম কীর্তন ইত্যাদি হয়। উল্লিখিত জায়গাটা খুব বেশী দূরেও নয়। সুতরাং নিজেকে একজন পাকা বৈরাগী-তে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে। খুঁজে খুঁজে যথাস্থানে এসে দেখে সেখানে স্ত্রী পুরুষের মেলা ভীড়। চিরঞ্জীব জনতার সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলে। মন্দিরের সমুখের আসরে বৈরাগীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বসে আছে। যে দল তখন কীর্তন করছে তাদের কাছে

গোপীযন্ত্র পায়ে ঘুঙুর। তারা কীর্তন করছে আর মাঝে মাঝে নৃত্যের ছন্দে উবু হয়ে কয়েক পাক ঘুরছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মনে তাদের সাজ পোষাক, কথাবার্তা, গানবাজনা, নৃত্য, হাবভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করে। এই ভাবেই সেখানে তার অনেক সময় কাটে। ফেরার পথে চিৎপুরের বড় রাস্তার ওপর তখনও যাত্রা গানের সাজ পোষাক ইত্যাদি বিক্রয়ের দোকান খোলা দেখে ঢুকে পড়ে। সেখানে নিজ মাপের গেরুয়া রং-এর দু'খানা, আলখাল্লা, দুটো ফতুয়া,বহির্বাস, লেঙোট, পাগড়ির কাপড়, তুলসীর মালা কেনে। বাকী তিলকমাটি, খঞ্জনী ও একতারা কোথায় কিনতে পাওয়া যায় জেনে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। পরদিন সকাল থেকেই কয়েকবার ড্রেস রিহার্সাল দিয়ে আরশীতে দেখে যখন বুঝলো যে তার সাজসজ্জা বৈরাগীর মতো নিখুঁত হয়েছে তখন ঐ বেশেই সে দিনের বেলাই সাহস করে রাস্তায় বেরোয়। দোকানে ঢুকে একটা বৈরাগীর ঝোলা, এক জোড়া খঞ্জনী, একটা একতারা, ও গোপীমাটি কেনে। গোপীযন্ত্রটার তার ছিঁড়ে গেলে কিভাবে তার লাগাতে হয় এবং খারাপ হলে সারতে হয় তা জেনে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। তারপর শুরু হলো তার গুন গুন করে গান যা সে গতরাত্রে বৈরাগীদের মুখে শুনেছে। গানের সঙ্গে তাল রেখে টুংটাং একতারা বাদন। মাঝে মাঝে একতারা রেখে খঞ্জনী বাজিয়ে গান সাধনা। যে বাড়িতে তাকে রাখা হয়েছে তার কর্তা কলকাতার একজন বিশিষ্ট খানদানী, অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী। বিপ্লবী কিংবা স্বদেশীওয়ালা না হয়েও তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের জন্য অর্থব্যয়ে কুন্ঠিত নন। এই নিরাপদ আশ্রয়ে গান বাজনাকালে তাকে ঘিরে তার ঘরে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেপুলেদের ভিড় জমছে। তারাও তার সঙ্গে নেচে কুঁদে তাকে উৎসাহিত করছে। এভাবেই সারাদিন ব্যাপী নবীন ব্রতীর সংগীত সাধনা চলে।

ঐদিন রাত্রিতেই কুশারী আসেন। তাঁর হাতে একটা বৈরাগীব ঝোলা। তার মধ্যে ফলমূল, রুটি বিস্কুট ইত্যাদির নিচে কাগজে মোড়া পিস্তল ও কিছু কার্তুজ। পিস্তলটা বের করে এনে কিভাবে খুলতে ও আটকাতে হয়। কিভাবে কার্তুজ ভরে গুলি ছুড়তে হয় তার কলা কৌশল এবং দাঁড়াবার ভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে তালিম দিয়ে কুশারী পিস্তলটা তাকে সমর্পণ করেন। পিস্তলটা হাতে নিয়ে চিরঞ্জীব খুবই রোমাঞ্চিত। জীবনে এই তার প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র স্পর্শন, দর্শন ও ধারণ। আজ থেকেই

তার সত্যিকার বিপ্লবী জীবন শুরু! সে প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করে এবং উৎসাহে উদ্দীপ্ত। উবু হয়ে কুশারীকে প্রণাম করতেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। অতপর তিনি মহারাজ প্রদত্ত কাগজখানা হাতে নিয়ে কোথা দিয়ে যাবে—কিভাবে গঙ্গাবক্ষে স্টীমার যাত্রা শেষে কোথায় পৌঁছবে, তারপর রেলগাড়ি চড়ে তীর্থক্ষেত্রে কোন স্টেশনে নামবে। সেখান থেকে কিভাবে রাস্তা ধরে কার কাছে যাবে। কেন যাবে, কে পাঠিয়েছে ইত্যাদি বারংবার বলে তাকে ওয়াকিবহাল করেন। কথা শেষে কুশারী তার সমুদয় উক্তি চিরঞ্জীবকে পুনরাবৃত্তি করতে বলেন। আদ্যোপান্ত শোনার পর চিরঞ্জীব তার যাত্রা শুরু এবং শেষ কোথায় কিভাবে করবে ইত্যাদি সব ঠিক মতো ওয়াকিবহাল হয়েছে বুঝে কুশারী কাগজখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেন। অবশেষে আগামীকাল সন্ধ্যারাত্রে শিয়ালদহ থেকে একটা লোকাল ট্রেন ধরে রানাঘাট পৌঁছে পরদিন ভোরে সকলের সঙ্গে মিলে কোন ট্রেন ধরে গন্তব্য স্থল অভিমুখে যাত্রা করবে তার নির্দেশ দিয়ে কুশারী তার হাতে টাকার একটা প্যাকেট দিয়ে বিপ্লবের পথে তার জয় যাত্রা হোক বলে আশীর্বাদ করেন। আগামীকাল ডাক্তার একবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে বলে তিনি চিরঞ্জীব-এর কাছ থেকে বিদায় নেন।

ঘটনা স্রোতে যে বিপ্লবী জীবন এতদিন সে কামনা করে এসেছে তা যেন অতর্কিতে অকস্মাৎ এসে হাজির হলো। সর্বোপরি মহারাজ-এর সাক্ষাৎলাভ এক অভাবনীয় ঘটনা—তার ধ্যান ধারণা সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল!

পরদিন ভোরে উঠে সঙ্গীত সাধনার পর ইচ্ছা হলো একবার বাড়ি গিয়ে কাকা, দাদা, ভাইবোনদের কাছে শেষ বিদায় নেয়। তাদের সঙ্গে ছদ্মবেশ পরিহার করে নিজ পরিচয়ে সাক্ষাৎ করা তো আর সম্ভব নয়। কাকা তো তাকে একরকম বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন—বলেছিলেন লেখা পড়ার সময় এ সব সখের বিপ্লবীয়ানা ছেড়ে হোস্টেলে গিয়ে মন-যোগ দিয়ে লেখাপড়া কর। ডাক্তারী বিদ্যা বড় কঠিন বিদ্যা! কিন্তু তিনি তো জানেন না যে তার পক্ষে হোস্টেলে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। ফলে তাকে ফেরারী হতে হলো। বাবা মা মফঃসল শহরে থাকেন। সেখান হয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও সে যাবে না। কেননা মায়ের কাছে

ধরা পড়লে তাঁর স্নেহের জাল কেটে বেরিয়ে আসা শক্ত হবে। সুতরাং আর সময় নেই—farewell my beloved parents, brothers, sisters and uncle, The Trumpets of Revolution sound, the banners fly.

সে ঝোলা কাঁধে একতারাটা হাতে নিয়ে ভিক্ষার ছলে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির দুয়ারে এসে জয় রাধা-কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো বলে একতারাটা নিয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে গান শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরজা খুলে যায়। দাদা, ভাই, বোনেরা এবং আশপাশে বাড়ির ছেলে মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। গান শেষ হলে—জয় রাধেকৃষ্ণ বলে বারান্দা ছেড়ে রাস্তায় নেমে হাঁটতে থাকে। বাড়ির ছোট মেয়েটি দৌড়ে এসে ভিক্ষা নাওগো ঠাকুর বলে তার আলখাল্লা ধরে টানতে থাকে। চিরজীব পেছন না-ফিরে মেয়েটির হাত ধরে সামনে নিয়ে এসে টাকাটা হাতে নিয়ে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে টাকাটা পুনরায় মেয়েটির হাতে গুঁজে তার হাত ধরে অতি কষ্টে চোখের জল সংবরণ করে—দিদি-ভাই, এ দিয়ে তুমি মিষ্টি খেয়ো, বলে আর কোন দিকে দৃকপাত না করে ত্বরিৎ পদে রাস্তা বরাবর হাঁটতে থাকে। ওদিকে মেয়েটি বৈরাগীর গলার স্বর শুনেই কেঁদে ফেলে। টাকাটা হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে ফিরে আসতে দেখে সকলেই তাকে ঘিরে ধরে—তুই কাঁদছিস কেন, জিজ্ঞাসা করতেই মেয়েটি—সেজদা সেজদা বলে আবো জোরে কাঁদতে থাকে।—সে কি! সকলেই অবাক হয়ে রাস্তার দিকে চায়। নবীন বৈরাগী ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখার সাক্ষাতের পাট সাঙ্গ করেছে সত্যি কিন্তু ছোটবোনটার জন্য বেদনা ও মমত্ববোধ ক্ষুদ্র কাঁটার মতো তার অন্তর বিদ্ধ করছে। কিন্তু টাকা ফেরৎ নিতে গিয়ে বোনটা কেঁদে ফেললো কেন? তবে কি তার মনের অপরিণত সহজাত প্রেরণা ও বৃত্তি দিয়ে তার গলার স্বর শুনেই সে তাকে তার সেজদা বলেই ধরে নিয়েছে! না হলে তার কান্নার ভিন্ন কোন অর্থ হয় না। যাকৃগে, এসব মায়া মমতার বিশ্লেষণ ঝেড়ে ফেলে সে যাত্রার জন্য তৈরি হয়। যে বাড়িতে সে এতদিন অজ্ঞাতবাস করেছে সেখানেও ছেলে মেয়ে যুবা বৃদ্ধ সকলেরই বিমর্ষভাব। অরুণা তো ছলছল চোখে কেবল ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছে। মাঝে মাঝে জিনিষপত্র গুছিয়ে দেবার ছলে কাছে বসে—কোথায় যাচ্ছ, কবে ফিরছো

ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করছে। এত মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে তাকেও যথেষ্ট কষ্ট পেতে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? যেতেই হবে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে কর্তা গিন্নীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই গিন্নি জপমালা রাখবার মতো একটা থলে তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে—এর মধ্যেকার অর্থ শেষ হলে আরো অর্থের জন্য লিখো। অর্থাভাবে কষ্ট পেয়ো না বলেই তিনি ছলছল চোখে তার কপালে চুমো দিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। কর্তার ইচ্ছা ছিল তাকে গাড়ি করে শিয়ালদা পৌঁছে দেন। কিন্তু ড্রাইভারদের অধিকাংশই সন্দেহবাজ। সুতরাং সে প্রচেষ্টা ছেড়ে সকলে দরজা অবধি এসে তাকে বিদায় দেন। অরুণা এবং আরো কয়েকজন মিলে কাঁদতে থাকে। সে ফিরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে, বাচ্চাদের চুমো দিয়ে, আবার আসবে বলে সান্ত্বনা দিয়ে সজল-নয়নে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শুরু হলো এক নবীন যুবকের বহু প্রতীক্ষিত, একান্ত অভিলষিত বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে পদ যাত্রা। যে বিপ্লব তার স্বপ্ন, যে বিপ্লবের কল্পনা তার অন্তরে গাঁথা, যে বিপ্লবের শপথ সে নিয়েছে তাতে রয়েছে—বিদেশী বিতাড়ন, স্বাধীনতা অর্জন, স্বরাজ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকরণ, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন ও তার রূপায়ণ-কল্পে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চিরঞ্জীব আজ আত্মপরিজন গৃহসংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে, লেখাপড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

কুশারীর নির্দেশ মতো শিয়ালদা স্টেশনে এসে বোর্ড দেখে রানাঘাট-গামী শেষ লোকাল ট্রেনে উঠে বসে। মাঝে মাঝে বহু দূরপাল্লার ট্রেনের পথ করে দিতে দিতে ট্রেনটি যখন রানাঘাট পৌঁছে রাত্রি তখন অনেক। স্টেশনে নেমে দেখে মালপত্রে, লোকজনে এতবড় স্টেশন চত্বর ছয়লাপ। সবাই যে তীর্থযাত্রী দেখে তা মনে হয় না। কোথাও সাধারণ যাত্রীরা-স্ত্রী, পুরুষ ছেলে মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। কোথাও সাধু সন্ন্যাসী সন্ত বৈরাগী বোষ্টম দল বেঁধে শুয়ে বসে। তার উপর চোর জোচ্চোর পকেটমার আর ভিখারীর দল ঘুর ঘুর করছে। পুলিশ ও আছে। তারা একটা বেঞ্চ দখল করে বসেছে আর খৈনি টিপছে। তাদের কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে এবং সকলকে হুঁশিয়ার করে চিৎকার দিচ্ছে। এ যে কি দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এত বড় চত্বরে তিল-ধারণের

[illegible] নেই। এই অবস্থায় সে কি করবে? তার পক্ষে একা কোথাও বসে থাকা নিরাপদ নয়। সুতরাং পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য বৈরাগীরা যেখানে দল বেঁধে বসেছে সেখানে যে করেই হোক তাকে ঠাঁই নিতে হবে। সেও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! তবু অতি কষ্টে এবং সন্তর্পণে নানা ভাবে পাশ কাটিয়ে একদল বৈরাগীর কাছে কোন রকমে একটু জায়গা করে বসে পড়ে। বৈরাগীরা মেয়ে পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবে শুয়ে। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে যুবক যুবতী এমন কি অল্প বয়সী বালকও রয়েছে। তারই অদূরে একদল দেশোয়ালী ঢোল করতাল সহযোগে গলা ফাটিয়ে সীয়ারাম সীয়ারাম গানে মত্ত। তারই পাশে ভিন্ন ভিন্ন দলে চলেছে সুর করে তুলসী রামায়ণ, কিংবা কবিরের দোঁহা পাঠ। কোথাও বা হচ্ছে দলে দলে কিংবা একাকী গঞ্জিকা সেবন। চতুর্দিকে এইরূপ গান বাজনা হৈ-হুল্লোর আর ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে সে একাকী বসে কি করবে? শুয়ে থাকার জায়গা নেই চুপ করে বসে থাকার যো নেই। তার উপর ঘুমিয়ে পড়াটা তার পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং গোপী-যন্ত্রটি বার করে নিয়ে টুং টাং করে মৃদু কণ্ঠে গান ধরে—কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধারী রাধেশ্যাম। কাছে পিঠে অনেকেরই তার মৃদু কণ্ঠের গান শুনে ঘুমে ভেঙে যায়। তারা একবার ঘুম জড়ানো চোখে চেয়ে দেখে আবার চোখ বোজে। কিন্তু এক বৈষ্ণবী উঠে বসে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে এগিয়ে এসে বলে—ওমা, এযে দেখছি একেবারে আনকোরা বোষ্টম গো! তা কবে কোথায় কার কাছে নাড়া বেঁধেছ গা? এত জায়গায় ঘুরি—তোমাকে তো আগে কোথাও দেখিনি!

চিরঞ্জীব বুঝলো চুপ করে থাকা বিপদ। সুতরাং হেসে বলে—এতই যখন বুঝলে বাকীটা আন্দাজে বুঝে নাও না। তাছাড়া সবাই কি আর সব জায়গায় ঘোরে এবং সকলকে মনে রাখতে পারে? এই তো দেখ, আমিও তো কত জায়গায় ঘুরি ফিরি, কৈ তোমাকে তো আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

—তা যা বলেছ। কিন্তু ঠাকুর গলাখানা তো সেধেছ বেশ!

—গলার আর দোষ কি বলো! যার যেমন গলা সে সেই ঢঙে কথা বলে। তাতে সুর থাকলে সুর সাধে আর গান গায়। তোমার কথার স্বরে তো মনে হচ্ছে গলাখানা মিষ্টি—তাতে সুর আছে গান আছে।

বোষ্টমী খুব খুশি। বলে তোমার সঙ্গে একত্রে গান গাইতে খুব সাধ

হচ্ছে গো। কিন্তু সকলে হৈ চৈ করে বাধা বাধবে। আর ঐ যে ডান দিকে শুয়ে তুলসী-মালা-গলায় হোঁতকা কেলো গোপাল সে তো শুনেই 'এই মারি কি তেঁই মারি' করে ছুটে আসবে। যাক গে, মনের সাধ মনেই থাক। তা ঠাকুর চলেছ কোথায়?

—মনে হচ্ছে তোমরা যেখানে যে তীর্থে চলেছ আমিও সেথায় চলেছি। যাক, আমি এবার উঠি—ভোর হয়ে আসছে। কলতলার কাজ সেরে আসি। এর পরে আর ফাঁকা পাবো না।

—দাঁড়াও ঠাকুর, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। বলে সে কয়েকজন বৈষ্ণবীকে ডেকে তুলে তার অনুগমন করে। চিরঞ্জীব কিছুটা নিশ্চিন্ত। একা ঘোরা-ফেরা করলে পুলিশের সন্দেহ ও জেরায় জেরবার হবার ভয় থাকে দলবদ্ধ হয়ে বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে থাকলে পুলিশের হয়রানি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কলতলাতে অনেক দেরী হয়। ভোর হয়েছে। লোকজনের ভিড় আরও বেড়েছে। ইতিমধ্যে দু'খানা রেলগাড়ি এসে চলে গেছে।

বোষ্টমীদের ছেড়ে দিয়ে চিরঞ্জীব টিকিট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ভিড়। ঐ ভিড়ের মধ্যেই টিকিট কেটে বেরিয়ে এসে চতুর্দিকে চেয়ে দেখে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। না, তেমন কিছু তার নজরে পড়ে না। সেখান থেকে ফিরে আবার সে বোষ্টমদের দলে এসে ভিড়ে। গাড়ি আসার ঘণ্টা বেজেছে। দলের সকলের জিনিসপত্র ইতিমধ্যে বাঁধাছাঁদা শেষ। ঠিক হলো সকলে একসঙ্গে গাড়ির এক কামারায় বসবে। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই সকলে সেই ভাবেই হুড়মুড় করে গাড়িতে ওঠে। গাড়িতে বসা তো দূরের কথা দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই—এমন অবস্থা। কোন রকমে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে বসেছে। দুপুরের পর গাড়ি শেষ রেল স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। স্টেশন বলতে যা বোঝায় তা নয়—ধুধু বালুচর। তার ওপর মাঝে মাঝে হোগলার ছাউনি—ব্যস। দূরে গঙ্গা বক্ষে কয়েকটা স্টীমার ও ... স্টীমারের সঙ্গে লম্বালম্বা তক্তা দিয়ে বাঁধা নড়বড়ে সেতু। তার ওপর দিয়েই অগণিত যাত্রী লটবহর নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে স্টীমারের উপরের ডেক থেকে যাত্রীদের জন্য সতর্কীকরণ বাঁশি বাজছে। স্টীমারটিও প্রকাণ্ড—গাড়ির সব যাত্রি নিয়েই নোঙর তুলে রওনা দেয়। স্টীমার ছাড়তেই দেখা গেল আরও কয়েক দল বৈরাগী ডেকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ হয়ে বসেছে। পাকরাশি

তাকে সাবধান করে দিয়েছে—নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছনো পর্যন্ত দল-ছুট কিংবা দলভ্রষ্ট হবে না। সুতরাং শোয়া ভিন্ন খাওয়াদাওয়া সে দলের সঙ্গে বসেই সমাধা করেছে। দলের সকলের যখন নিদ্রামগ্ন তখন সে টুংটাং করে একতারাটা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে গান সাধে। স্টীমারেরও চলার বিরাম নেই। চলতে চলতে কোথাও বা সে নদীর পাড় ঘেঁষে থেমে যায়। লম্বা সিঁড়ি ফেলে যাত্রীদের তুলে কিংবা নামিয়ে দেয়। কোথাও বা পাড় থেকে দূরে নদীতে নোঙর ফেলে দাঁড়ায়। পাড় থেকে যাত্রী নিয়ে নৌকো এসে তার গায়ে ভিড়ে যাত্রী তুলে দিচ্ছে কিংবা নিয়ে নিচ্ছে। পড়ন্ত বেলা। ফেনিল তরঙ্গ-রাশি কেটে স্টীমার এগিয়ে চলেছে। সূর্যের রক্তিম আভা তার উপর পড়ে বিচিত্র রঙ-এর সৃষ্টি করছে। মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ সম্মুখের ডেকে আছড়ে পড়ছে। ডেকে অবস্থানকারী যাত্রী-দল জিনিষপত্র সামলাতে ব্যস্ত হয়। তাদের দলের সকলেই জেগে উঠে বসেছে। গতরাত্রে বোষ্টমী অঙুলি নির্দেশে যাকে তাদের দলপতি বলে পরিচয় দিয়েছে সে শুয়েশুয়ে হাঁক দেয়—ওরে ও হরে, এক ছিলিম তামাক সাজ, গলা শুকিয়ে যে কাঠ হয়ে গেল রে। হরে নামক ধরা চূড়া পড়া ছেলেটি হুকুম মাত্রই কিছুক্ষণের মধ্যে তামাক সেজে নিয়ে হাজির। বোঝা গেল ছেলেটি দলপতির হুঁকা-বরদার। উঠে বসে দলপতি হুঁকা টানতে টানতে একবার সিংহের ন্যায় মাথা তুলে দলের সকলকে অবলোকন কালে তার দৃষ্টি হঠাৎ চিরঞ্জীব-এর উপর নিবদ্ধ হতেই সে পাশের লোকটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। সেও তাকে জানে না বলতেই দলপতি লোক পাঠিয়ে চিরঞ্জীবকে ডেকে আনে। নানা জিজ্ঞাসার পর দলে সে কখন এসে যোগ দিয়েছে সাক্ষী হিসেবে গত রাতের বোষ্টমীকে ডাকে।—হাঁরে পদ্মা তুই এর সম্পর্কে কি জানিস? পদ্মা বিগত রাত্রির ঘটনা দলপতিকে সবিস্তারে বলে। সব শুনে দলপতি বলে—বুঝলাম তুমি একজন কীর্তনিয়া। বেশ বেশ, একটা কীর্তন শোনাও তো। ওরে পদ্মা তুই খঞ্জনী ধর। ঠিক মত তাল দিস। চিরঞ্জীব একতারাটা নিয়ে কিছুক্ষণ সুর ভেজে গান ধরে—

কৃষ্ণ মুরারী মোহন বংশীধারী নওল কিশোর শ্যাম

গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ছন্দ একতারা ও খঞ্জনীর সুর মিলে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। চতুর্দিকে লোকজন এসে জড় হয়। গান শেষে হাততালি দিয়ে সকলে তাকে অভিনন্দিত করে।

দিনের শেষ আলোটুকু নিবে গেছে। স্টীমারের সব আলো জলে উঠেছে। নদীর জলে তার প্রতিবিম্ব পড়ে আলোর বন্যা হয়ে স্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেকের সম্মুখস্থ বিরাট সন্ধানী আলো জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত দৃশ্য—যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে শুধু অফুরন্ত ফেনিল তরঙ্গ শত সহস্র নাগিনীর মতো ফুঁসে ছুটে আসছে। মাঝে মাঝে নদীর নাব্যতা নির্ণায়ক নিদর্শন—আড়কাটি। এ ভাবেই চলে চলে স্টীমার থেকে হঠাৎ সতর্কীকরণ বংশী বেজে ওঠে। তারপরেই সন্ধানী আলো নিবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দূরে নদীর তটদেশের আলোগুলি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। বোঝা গেল স্টীমার তার গন্তব্য-স্থলের দিকে এগোচ্ছে। স্টীমারের গতিও ক্রমে ক্রমে কমছে। যথা সময়ে স্টীমার নোঙর ফেলে নদার ঘাটে এসে ভিড়ে। যাত্রীদের নামার জন্য সিঁড়ি লাগিয়ে দেয়। চিরঞ্জীব দেরি না করে সকলের সঙ্গে স্টীমার থেকে নেমে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ায়। পাশাপাশি দুটি ট্রেন দাঁড়ানো। কোন ট্রেন তীর্থক্ষেত্রের দিকে যাবে তা জেনে নিয়ে সে সকলের সঙ্গে হুড়মুড় করে এক কামরায় উঠে পড়ে এবং তড়িঘড়ি একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। এতটা পথ সে নির্বিঘ্নেই এসেছে বাকী পথটাও নির্বিঘ্নে অবশ্যই যেতে পারবে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই গাদাগাদি ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছে। কামরাতে অন্যরাও আছে তবে তারাই দলে ভারি। খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা নেই। সে পাট সকলেই স্টীমারে চুকিয়ে এসেছে। বেঞ্চিতে অনেকেই হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কেউ বা ঘুমের ঘোরে একে অন্যের গায়ে হেলে পড়াতে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগছে। কেউ বা চাদর পেতে দুই বেঞ্চির মাঝখানে শুয়ে পড়েছে। কারো বা নাক ডাকছে। ঘুমের এক বিচিত্র দৃশ্য চিরঞ্জীব বসে উপভোগ করছে। তার চোখে ঘুম নেই। নিরাপত্তার খাতিরে তাকে সজাগ ও হুঁশিয়ার থাকতে হচ্ছে। রাত্রি অনেক। হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠ শোনা যায়

—কি গো ঠাকুর, তোমার চোখে কি ঘুম নেই? চেয়ে দেখে সেই খঞ্জনী ওয়ালী বোষ্টমী পদ্মা। সামনের বেঞ্চিতে কিছু দূরে অন্যের মধ্যে বসে আছে।

—রাস্তাঘাটে চলাকালে আমার চোখে ঘুম আসে না। এটা একটা ব্যাধিই বলতে পারো।

পদ্মা ওর জায়গা থেকে উঠে আসে। চিরঞ্জীবের মুখোমুখি সামনের বেঞ্চিতে যে বোষ্টম বসে ঘুমুচ্ছে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে—ওরে নন্দ তুই উঠে গিয়ে আমার জায়গায় বোস। ওখানে আমার ভীষণ অস্বস্তিবোধ হচ্ছে—আদৌ ঘুম আসছে না। ঠেলা খেয়ে নন্দ চোখ মেলে পদ্মাকে দেখেই সিধে হয়ে বসে। কোন প্রতিবাদ না করে আড়চোখে একবার চেয়ে বাধ্যজনের মতো উঠে গিয়ে তার জায়গায় বসে। চিরঞ্জীব বুঝলো দলের মধ্যে পদ্মার প্রতিপত্তি খাতির কতখানি। নন্দের জায়গায় বসেই পদ্মা বলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, চোখ মেলে দেখলাম তুমি জেগে আছ। ব্যস্—আমার আর ঘুম আসে না। অনেক চেষ্টা করলাম। শেষে ভাবলাম কাছে গিয়ে বসে সুখ দুঃখের কথা বলে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিই। তোমার আপত্তি নেই তো?

—তা কেন। একা বসে রাত জাগার চাইতে দোহে বসে রাত কাটানো ভালো নয় কি!

—বেশ, বেশ! তা হলে জিজ্ঞাসা করি—ঠাকুর এই কচি বয়সে বিবাগী হয়ে এ বেশে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? কি এমন জ্বালা—না কি এই বয়সেই এত প্রেমের জ্বালা যে ঘর ছেড়ে বেরোতে হলো!

—তা যা বলেছ। সে বড় বিষম জ্বালা গো, ঘরে রইতে নারলাম। তাই রাধামাধবের শরণ নিলাম। জয় গোপাল গোবিন্দ গিরি-গোবর্ধনধারী, কালিয়া দমন হরি, কংস নিধনকারী রাধা মাধব, গোপিনী-বল্লভ শ্যাম।

—সবই বুঝলাম ঠাকুর। কিন্তু তীর্থে—সেই মুহূর্তেই গাড়ি একটা রেল সেতুর উপর দিয়ে চলেছে। গাড়ির প্রচণ্ড ঘর্ঘর গুমগুম শব্দে বোষ্টমীর বাকী কথা ডুবে যায়। মিনিট দশেক এই শব্দে অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। বোষ্টমী কি বলতে চেয়েছিলো তা অনুমান করেই গাড়ির শব্দ থেমে যেতেই চিরঞ্জীব বলে—রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র দু স্টেশনের পরেই তীর্থের স্টেশন। সুতরাং তোমার আমার পরিচয় যে গানের মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল সে গানের মধ্যেই তা স্মরণীয় হয়ে থাক। তোমার খঞ্জনী বের কর। বোষ্টমীকে কোন কথার অবকাশ না দিয়ে চিরঞ্জীব ঝোলা থেকে গোপীযন্ত্র বের করে গান ধরে—

জয় গোপাল গোবিন্দ রাধা মাধব গোপীনী-বল্লভ শ্যাম।

বোষ্টমী খানিক চুপ করে থাকে তারপর খঞ্জনী বাজিয়ে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে থাকে। গাড়ির সকলেই জেগে উঠেছে। বাইরে

ভোরের আভাস। যাত্রীরা সব তল্পিতল্পা বাঁধতে ব্যস্ত কিন্তু নবীন বোষ্টম আর যৌবনোত্তর বোষ্টমী যুগলের গান তখনো চলেছে। গাড়ির গতি কমে আসতেই তাদের গান থেমে যায়। রাধামাধব বলে চিরঞ্জীব গোপীযন্ত্র ঝোলায় পুরে উঠে পড়ে। বোষ্টমীও উঠে দাঁড়ায়। গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। বাইরে প্ল্যাটফরমের গায়ে ভাসা ভাসা অন্ধকার তখনো লেগে আছে। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নামতে শুরু করেছে। চিরঞ্জীবও তাদের সঙ্গে বোষ্টমীর অলক্ষ্যে আগেই নেমে যায়।



বিপ্লবের সার্থক রূপায়ণ-প্রয়াসে আখেরী সংগ্রামের প্রস্তুতি প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে সর্বত্র সকল স্তরে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। দলের সভ্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই।

সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চিত্ত তাদের জীবন মৃত্যু সম্পর্কে ভয়-ভাবনা-হীন! এইরূপ অবস্থায় দেবযানীর চিত্ত-বিক্ষেপও বুঝি অনিবার্য। এক দিকে কৃত-সংকল্প সংগ্রামের নেশা আর একদিকে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা! আখড়া থেকে বাড়ি ফেরার কালে সারাটা পথ সে নিজেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। বাড়ির দরজা খুলে দিতেই উর্মিলাকে বলে—তাড়াতাড়ি খেতে দাও মা, আমি আসছি। উর্মিলা দেবযানীর কথা শুনে এবং হাবভাব দেখে অবাক! দেবযানী রান্না ঘরে খেতে আসতেই জিজ্ঞাসা করে—কিরে যানী, আজ যে বড্ড তাড়া!

—হ্যাঁ মা, সামনে পরীক্ষা অথচ পড়াশোনা এখনও অবধি ঠিক মতো হচ্ছে না। মাঝে মাঝে দিদির সঙ্গে মফঃসল যাওয়া, তার উপর রয়েছে কলেজ ও আখড়া এ্যাটেণ্ড করা। আজ একটু সকালে ফিরেছি তাই সময়টা যতটা সম্ভব পড়াশোনায় ব্যয় করতে চাই। দেবযানী খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়ে। উর্মিলাও কিছু না বলেই রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়। দেবযানীর কথা তার মন মেনে নিলো কিনা বোঝা গেল না।

দেবযানী ঘরে এসে বই পত্র গুছিয়ে পড়তে বসে। কিন্তু কেমন একটা

অনবধানতা ও আলস্য—পাঠে মন-সংযোগ করা যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে সে ড্রয়ার থেকে গীতাখানা বার করে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটার উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। এর বাংলা অনুবাদটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে সারাংশটা মনে গেঁথে রাখে—সঙ্কটপূর্ণ সময়ে মোহাবেশ কোথা থেকে এলো! তারপর তৃতীয় শ্লোকটা পড়ে—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ···ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বো'ত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ—এর বাংলা মানেটা হৃদয়ঙ্গম করে মনে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। গীতাখানা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। এমনি সময় সুদেব হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত। দিদিকে গীতা হাতে বসতে দেখে অবাক—কি দিদি, এই সময়ে—মানে এই অসময়ে গীতা পাঠ! এতো জানি সকালবেলা স্নানাদির পর পূত পবিত্র হয়ে শুভ্র শুদ্ধ চিত্তে ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময়।

সুদেবের বাক্যবিন্যাসে দেবযানী চমৎকৃত! সেটা প্রকাশ না করে বলে—এই ধর্মগ্রন্থখানাকে আমি উপদেশামৃত বলেই মনে করি—বুঝলি? সুতরাং উপদেশ যে কোন সময় পাঠ করা চলে। কি বলিস?

—তা যা বলেছ। এ সম্পর্কে আর কিছু না বলে যে বিষয়টা বলার জন্য সে ছটফট করছে তা উত্থাপনের প্রয়াসেই জিজ্ঞাসা করে—আজ আখড়ায় গিয়েছিলে? সেখানে কিছু শোনোনি? তার চোখে মুখে প্রচণ্ড ব্যগ্রতার অভিব্যক্তি।

—না তো। যথা পূর্ব তথা পরং—নতুন কিছু তো কানে আসেনি।

—বলো কি? তাজ্জব ব্যাপার! এ দিকে শহরময় রটে গেছে, যে বড়দাকে পুলিশ কয়েকবছর আগে এখান থেকে তুলে নিয়ে জেলে পোরে, তাঁকে আবার এখানে নিয়ে এসেছে। তিনি নাকি একদিন রাত্রে শহরের বাসায় এসে সকলের সঙ্গে গোপনে দেখা করে গেছেন।

খবরটা শুনে দেবযানী অবাক হলেও সেটা চেপে গিয়ে হাল্কা সুরে বলে—বাব্বা, তুমি এতো সব খবর কিভাবে যে পাও!

—ক্লাবের কানাঘুষো কানে এলো।

খবরটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। দেবযানী তা ব্যক্ত না করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—সুখ-সংবাদ। তবে এ নিয়ে যেখানে সেখানে প্রকাশ্য আলাপ আলোচনা ঠিক নয়। তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আর পালশের গোচরে এলে বিভ্রাট ও বিপদ ঘটবে, কেননা তাকে সাত্যই

এখানে আনা হয়েছে কিনা, তিনি মুক্ত না অন্তরীণ এসব কিছুই যখন জানা নেই। তারপর আদেশের সুরে বলে—খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি এসো। সময় নষ্ট করো না—সামনে পরীক্ষা। সুদেব চলে যেতেই দেবযানী আবার বই নিয়ে বসে কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না। বড়দার আগমনের সংবাদ মনের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি এসে থাকলে কিভাবে এসেছেন—মুক্ত নাকি অন্তরীণ। তবু তাঁর এখানে উপস্থিতিতে সকলের মনের বল বেড়ে যাবে—দলের শক্তি বৃদ্ধি হবে। যাকগে কাল আখড়ায় গিয়ে হয়তো জানা যাবে—রটনাটা সত্যি কিনা। সুতরাং মন থেকে এ চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেবযানী পাঠে মন দেয়। সুদেব এসে আর কোন কথা না বলে বই খুলে পড়তে বসে। উভয়ে একটানা অনেকক্ষণ পাঠাভ্যাস করে।

উর্মিলা এসে দরজায় দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবার পর বলে—কিরে যানী আজ তোদের খাওয়া-দাওয়া নেই? রাত্রি তো অনেক হয়েছে, তোর মামা রান্না ঘরে বসে আছেন।

—আগে ডাকোনি কেন? তুমি যাও, আমরা আসছি। দেবযানী সুদেবকে নিয়ে রান্না ঘরে এসে খেতে বসে। খেতে খেতে মামা দেবযানী-কে বলে—এ বৎসর তোমার ইণ্টারমিডিয়েট ফাইন্যাল পরীক্ষা। তারও তো বেশী দেরি নেই। আগামী বৎসর সুদেবের ম্যাট্রিক ফাইন্যাল। লেখাপড়া কেমন চলছে?

—তার জন্য ভেবো না মামা। লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে সত্যিই—একদিকে চাকুরি আর একদিকে আখড়া। তবে পরীক্ষার আগে দুটোই বন্ধ থাকবে। সুদেবের ও তেমনি ক্লাব আর মিশন। একটায় শরীর চর্চা ডিবেট ইত্যাদি আর একটা চ্যারিটেবল ইনস্টিটউশন—দানশীলতা, পরসেবা, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি। আমার মতে ওর একটা ছেড়ে দেওয়া উচিত—সেটা ক্লাব, কি বলো—বলেই দেবযানী সুদেবের দিকে চায়। সুদেব নিরুত্তর। সে একবার বাবার দিকে, একবার দিদির দিকে অসহায়ের মতো চায়। খাওয়া শেষ হতে সকলেই উঠে পড়ে।

ঘরে এসে সুদেব বলে—এ তুমি বাবার সামনে কি বললে! তুমি আমাকে ক্লাব ছাড়তে বলছো, এতো আমি ভাবতেই পারছি না।

—হাঁ ভাই, আমি যা ভালো বুঝেছি তাই প্রকাশ করেছি। এবং ভেবে চিন্তেই করেছি। সুদেব হাঁ, না কিছুই বলে না। কেবল করুণ

দৃষ্টি মেলে দিদির দিকে চেয়ে থাকে। দেবযানী ভাইয়ের দুঃখভরা মুখের দিকে চেয়ে সে নিজেও বুঝি বিচলিত। কিন্তু কঠিন কর্তব্য-বোধে হৃদয়ের স্নেহ-প্রবণতা রুদ্ধ করে বলে—আমার কথার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে ভাই। সবই তোমাকে খুলে বলছি। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই যুক্তি-গ্রাহ্য বলে মনে করবে। প্রথমতঃ আগামী বৎসর তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষায় তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে যাতে প্রথম সাত জনের মধ্যে তোমার নাম থাকে। নচেৎ বড় হবার জন্য কেরিয়ার তৈরি করতে পারবে না। আমি চাই কেরানীর ছেলে কেরানী না হয়ে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বড় কিছু একটা হোক। এই পথে ক্লাব ও মিশন দুটো রাখলে কিছুতেই এগোতে পারবে না—দু'কূল রক্ষা হবে না। তা ছাড়া ক্লাব—সেটা জিমন্যাস্টিকস কিংবা ডিবেট যাই হোক না কেন সেখানে রাজনীতি—বিশেষত স্বদেশের স্বাধীনতা-লাভের বিষয় আলোচনা হবেই। ফলে পুলিশ সব ক্লাবের উপরই নজর রাখছে। সেখানে তারা ওয়াচার রাখে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের লোককে মেম্বার করে ঢুকিয়ে দেয় গোয়েন্দাগিরির জন্য। ক্লাবের স্বাস্থ্য-বান, লেখাপড়ায় ভাল এমন ছেলেদের উপর তাদের নেক-নজর পড়ে। এই যে, আজ ক্লাবে যা শুনে এলে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। পুলিশের কানে নিশ্চয়ই এটা গেছে কিংবা যাবে। এই কারণে পুলিশ যদি তোমার পেছনে লাগে তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে অনুমান করো। কোনো অজুহাতে এ্যারেষ্ট করে থানায় নিয়ে গিয়ে অনেক কিছুই করতে পারে। তোমার বাবা সরকারি এবং সাহেবদের ক্লাবের কর্মচারী। এরকম একটা কিছু ঘটলে ব্যাপারটা কতদূর অবধি গড়াতে পারে—এমন কি শেষ পর্যন্ত বাবার চাকুরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখো। তুমি এই সংসারের একমাত্র ছেলে। বাবা মাকে দেখা শোনা ভরণপোষণ ইত্যাদি সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্মের ভার তোমার উপর। আমি তো উটকো, আজ আছি কাল নেই। মেয়েরা তো আর বাপ মায়ের সংসারের চিরকাল থাকে না। তাকে পরের ঘরে যেতে হয়। আমাকেও যেতে হবে।

সুদেব দিদির সব কথা এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে শুনছিলো। দিদিকে চলে যেতে হবে শুনে সে বুঝি আর চুপ করে থাকতে পারে না—না দিদি, তুমি কোথাও যাবে না, যেতে পারবে না। তোমার সব কথা শুনবো

দিদি, বলে সে কেঁদে ফেলে। এতক্ষণ উভয়ে মুখোমুখি বসে কথা বলছিলো। ভাইয়ের কান্না দেখে দেবযানী উঠে গিয়ে ভাই-এর গলা জড়িয়ে ধরে আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলে—কেঁদোনা ভাই কেঁদোনা। চুপ না করলে আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলবো। দেবযানী সুদেবকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নির্বাক হয়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকে। তার চোখের জল আর বাধ মানে না—নীরবে ঝরে পড়ে। ওদিকে ঊর্মিলা তার নিয়মিত রাতের টহলে এসে ছেলে মেয়ের ঘরে বাতি-জ্বালা দেখে দরজার ধারে এসে দাঁড়ায়। তাদের কথাবার্তা ও আলোচনার বিষয় বস্তু শুনে সে থ হয়ে যায়! তাদের কিছু না বলেই বিহ্বল চিত্তে ঘরে ফিরে আসে। কর্মক্লান্ত স্বামী ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেও শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না—চোখের জলে তার শিথান ভিজে যায়। এ পরিবারের জীবন-নাটকের আর এক দৃশ্যের যবনিকা পাত!



যাত্রীদের সঙ্গে মিশে চিরঞ্জীব টিকিট দিয়ে গেট পেরিয়ে হাঁটতে থাকে। রাস্তার দু'ধারে দোকানপসার হাট বাজার। তার মাঝ দিয়ে অসংখ্য যাত্রীর চলাচল। সম্পূর্ণ এক অপরিচিত পরিবেশে চিরঞ্জীব সম্পূর্ণ দিশেহারা। চলতে চলতে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছবার নির্দেশগুলি প্রাণপণে স্মরণ করবার চেষ্টা করছে—কিন্তু গুলিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বুড়োশিবতলা যাবার পথের হদিশ মেলে। কিন্তু তারা কারা? যাদের দেখছে সকলকেই তার মনে হচ্ছে বহিরাগত। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি আসে—কোন দোকানে ঢুকে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? এই প্রশ্ন জাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে পথের ধারের একটু দূরে একটা মিষ্টির দোকানে প্রবেশ করে। সেখানেও বেজায় ভিড়, লোকজনের ডাক চিৎকার আর পরিবেশনকারী ছোকরাদের ছুটোছুটি। দূরে ঘরের এক কোণে আধখানা বেড়ার আড়ালে

প্রকাণ্ড উনুন জ্বলছে। তাতে লুচি পরোটা ভাজা হচ্ছে। লোকজনের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে হালুইকর ভেজে কুলোতে পারছে না আর ছোকরারা দিয়ে শেষ করতে পারছে না। চিরঞ্জীব দাঁড়িয়ে। বসবার কোন জায়গা নেই। এই অবস্থায় একটা ছোকরা পাশ দিয়ে যাবার কালে সে তাকে পাকড়াও করে বলে—বসবার তো জায়গা পাচ্ছি না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে হবে। একগ্লাশ জল তো দাও মুখটা ধুয়ে নি। তারপর খাবার দিও। ছোকরার দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। সে যেতে যেতেই বলে খাবার জল ছাড়া কোন জল নেই। মুখ ধুতে হয় তো কিছু দুর গেলেই ডান হাতি একটা পুকুর পাবে। নচেৎ রেল লাইন পেরিয়ে কিছু দূরেই প্রকাণ্ড এক শান-বাঁধানো দীঘি দেখবে। সেখানে যত পারো মুখ ধোও, পেট ভরে জল খাও আর মনের সুখে চান করে শরীর ঠাণ্ডা করো। রেল লাইনের কথা শুনেই চিরঞ্জীবের তৎক্ষণাৎ কুশারির নির্দেশ মনে পড়ে। একটা ছোকরাকে ধরে কয়েকখানা লুচি, দুটো সন্দেশ একটা কলাপাতায় নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। বাজারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কিছু দূর যেতেই সে ডান পাশে একটা পুকুর দেখে। সেখানেও লোকের বেজায় ভিড়। আরো এগোতেই দূরে রেল লাইন এবং পাশেই ঘুমটি নজরে আসে। রেল লাইন পেরিয়ে রাস্তা ধরে সে পুব দিকে চলতে থাকে। যেতে যেতে সে বাঁয়ে ছোকরা উল্লিখিত দীঘি দেখতে পায়। এখানেও অসংখ্য লোক। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। প্রকাণ্ড দীঘিতে স্বচ্ছ জল টল টল করছে। কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে পাড়ে উঠে মুখ ধোয়। তারপর আর এক কমণ্ডলু জল নিয়ে উপড়ে উঠে খাবার খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে সূর্য দূর পাহাড়ের পেছন থেকে ঝিকিমিকি দিয়ে উপরে উঠে এসেছে। সোনার-বরণ নবারুণের আলোক-ছটায় পাহাড় পর্বত, গাছপালা, মাঠঘাট ঝকঝক চকমক করছে। দূরে পর্বত শীর্ষে মন্দিরের চূড়াটা জ্বল জ্বল করছে। এমন দৃশ্য বুঝি সে আগে কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি। বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর দীঘির পাড় ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। অফুরন্ত জনস্রোত—ভদ্রেতর, ভিখিরি, সাধু সান্ন্যাসী, সন্ত, বোষ্টম বোষ্টমী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারি, বিহারী, রাজস্থানী—সর্বভারতীয় মেলা। রাস্তা পার হয়ে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ায়। পাকরাশির নির্দেশ মতো পুব পাহাড়ের দিকে মুখ রেখে দক্ষিণ পূর্ব-কোণ বরাবর মাইল খানেক মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে হেঁটে গেলেই

শেষ-মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে ঝোপঝাড় পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষই বুড়োশিব।

চিরঞ্জীব মাঠে নেমে তদনুযায়ী হাঁটতে থাকে। আখ ক্ষেতের পাশ দিয়ে, ছিম বরবটির ঝোপের ভেতর দিয়ে, চাষীদের জীর্ণ চালাকুঠী এড়িয়ে দিক ঠিক রেখে সে এগিয়ে চলে। এইভাবে মিনিট কুড়ি হাঁটার পর সম্মুখে বড় মাঠের শেষ প্রান্তে ঝোপঝাড় সহ প্রকাণ্ড একটা বটগাছ তার দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হয়। ঐদিকে লক্ষ্য রেখেই সে চলতে থাকে। দূর থেকেই বাদ্য কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনি কানে আসছে। মহারাজ-এর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন শনি মঙ্গলবার মানতকারীরা ওখানে এসে বুড়ো শিবের পুজো দেয়। হিসেব করে দেখে আজ মঙ্গলবার। সে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চলে। ঝোপঝাড়ের ধারে এসে দেখে ঢোকবার কোন পথ নেই—কাঁটা জঙ্গলে ভরা. ডাইনের দিকের জঙ্গল আরো গভীর। বাঁয়ে পুব দিকে চেয়ে দেখে। মনে হলো ঐ দিকের জঙ্গল কিছুটা পাতলা। সে ঐ দিকেই এগিয়ে যায়। ঝাড় জঙ্গল পাতলা হলেও ভেতরে ঢোকার কোন পথ খুঁজে পায় না। অগত্যা সে ওর ভেতর দিয়েই একে বেঁকে গা বাঁচিয়ে বহু কসরতের পর বুড়ো বটের তলায় এসে দাঁড়ায়। অসংখ্য ঝুড়ি সহ প্রকাণ্ড এক বট গাছ। তার নিচে লোকজন জড় হয়েছে। ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। চিরঞ্জীব তাদের পেছন দিয়ে বাঁ দিকে এগোতেই প্রকাণ্ড দীঘিটা তার নজরে আসে। ঐ দিক দিয়ে চলে চলে দীঘিটার ভাঙা ঘাটলার উপর দাঁড়িয়ে পরিবেশটা লক্ষ্য করে। তারপর ফিরে গিয়ে গাছতলার বেদীটার নিকট দাঁড়ায়। বেদির উপর মহারাজ বর্ণিত রঘুনন্দন বসে আছে। তার বাঁ পাশে মাটিতে একটা সিঁদুর মাখা ত্রিশূল। তার চতুর্দিকে ফুল বিল্বপত্র ছড়ানো। মেয়েরা কোল থেকে বাচ্চাকে রঘুর দিকে বাড়িয়ে ধরে। রঘু দু'হাতে বাচ্চা নিয়ে ত্রিশূল থেকে সিঁদুর নিয়ে তার কপালে টিপ দিয়ে ফুল বেলপাতা হাতে গুঁজে তাকে মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেয়। মেয়েরা ফলমূল, টাকা পয়সা যে যা পারে বেদীতে রেখে প্রণাম করে সরে যায়।

এভাবেই মানতের পুজোআচ্চা ক্রিয়াকর্ম সমাধা হয়। অনেকেই ইতিমধ্যে চলে গেছে। যারা যায়নি তারা বুড়ো শিবতলা থেকে দূরে দলে দলে খাওয়াদাওয়া করছে। কয়েকজন আবার বেদীর ধারে এসে বুড়ো বটের চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রণাম করছে এবং বিস্ময় দৃষ্টিতে গাছটাকে

দেখছে। মনে হয় এরা স্থানীয় লোক নয়—তীর্থযাত্রী। বেদীর নিচে বসা ছেলেটি উঠে রঘুর কাছে জড়করা ফলমূল টাকা পয়সা ইত্যাদি একটা ব্যাগে পুরছে। রঘু উঠে দাঁড়িয়েছে। চলতে গিয়ে বেদীর ধারে দাঁড়ানো চিরঞ্জীবের উপর নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়ায়। এই সুযোগ। চিরঞ্জীব একতারাটা বের করে গান ধরে—

হরে মুরারী মোহনবংশীধারী গোপীগণ বল্লভ রাধেশ্যাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। চারদিক থেকে লোকজন এসে জড় হয়। রঘুও দাঁড়িয়ে যায়। গান শেষ হতেই সে একতারাটি ঝোলায় পুরে হাঁটতে হাঁটতে দীঘির পাড়ে ভাঙা ঘাটলার উপর গিয়ে বসে। রঘুও তার পেছন পেছন এসে তার দিকে একবার চেয়েই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকে। চিরঞ্জীব হাঁকপাড়ে—আরে ও ভাই রঘুনন্দন, ঠাড়ো, ঠাড়ো। ডাক শুনে রঘু অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়ায়। চিরঞ্জীব হাত ইশারায় তাকে কাছে আসতে বলে। রঘু তার সঙ্গী ছেলেটাকে চলে যেতে বলেই তার নিকট এগিয়ে আসে। রঘুর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে—আপ কোন? উত্তরে চিরঞ্জীব বলে—আপ নেহি জী, তোম কহো। তোম তো বহুত পেয়ার কা বাত। রঘুর বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। সে বলে—লেকেন ম্যায় তো তোম কো পয়চানতা নেহি। হাম'রা নাম তোমকো ক্যায়সে ইয়াদ হুয়া? চিরঞ্জীব হেসে বলে—ইয়ে তো সাচ্ বাত হ্যায়। শোনো জী ম্যায় তো এক মুসাফির বাউল হো। সারা মুলুক ঘুমতা আর প্রভুজীকা নাম লেকে গানা গাতা। মরজি হো তো কিসিকা পাশ রহা যাতা, নেহি তো চলা যাতা। থোরা রোজ আগে দিদিনে মেরেকো পাকড় লিয়া। বোলা—প্রেম, তীর্থক্ষেত্রে যানে মাঙতা তো রঘুকা পাশ চলা যাও। বেচারী একেলা হ্যায়। গাঁও গাঁও ঘুম ঘুমকে উসকো বহুত সেবা কাম করনে হোতা। উধার চলা যাও। উসকা আশ্রম পর রহো আউর সেবা কামমে রঘুকো মদত দেও। সাথ সাথ সারে তীর্থস্থান ভি ঘুমকে দেখো। আউর রঘুনন্দনকা আশ্রম পর উসকা জেনানা কা কবর কা পাশ বৈঠকে সাম সুবা কীর্তন শুনাও। রঘু দৌড়ে এসে তার হাত ধরে টেনে তুলে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—চলো ভাই চলো। দিদির নাম আগে করলেই হত। এত কথার দরকার ছিল না।

শুরু হলো চিরঞ্জীবের আশ্রম বাস—বিপ্লবের পথে আরো এক ধাপ পদক্ষেপ—the die is Cast—Cross the Rubicon—



লোকাল ট্রেনে কলকাতা ছেড়ে মহারাজ নৈহাটি জংশনে এসে নামেন। যাত্রা পথে মাঝখানে অতীনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মধ্যরাত্রির মেল ট্রেন ধরে ভোর রাত্রে স্টীমার স্টেশনে এসে নামেন। স্টেশন বলতে নামে মাত্র। নদীর ভাঙন হেতু স্টীমার ঘাট এদিক ওদিক সরাতে হচ্ছে। ফলে রেল পথ স্টেশন ইত্যাদির সব কিছুরই সাময়িক ব্যবস্থা। রেল গাড়ি থেকে অনেকখানি হেঁটে মহারাজ স্টীমার ঘাটে এসে পৌঁছেন। পর পর দুটো স্টীমার গায়ে গায়ে লেগে ঘাটে বাঁধা। তিনি প্রথমটায় না থেমে দ্বিতীয়টা গিয়ে ওঠেন। তারপর স্টীমারের উপরের ডেকে উঠে রেলিং-এর ধারে কম্বল পেতে বসেন। উর্ধ্ব গগনে ক্রম-বিকশিত আলোকছটা নিম্ন স্থলে জলে লেগে থাকা অন্ধকারকে ক্রমেই দূর করছে। ভাসমান স্টীমার দুটোর আলো নদীর তরঙ্গ স্রোতে পড়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁশী বাজিয়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে নোঙর তুলে স্টীমার ছেড়ে দেয়। প্রভাতের সূর্যা-লোকে জল স্থল অন্তরীক্ষ্য উদ্ভাসিত। স্টীমার মাঝ নদী দিয়ে স্রোতের অনুকূলে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। দূরে দৃশ্যমান তটভূমিও যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে স্টীমার ভোঁ ভোঁ শব্দে নদী-বক্ষে চলমান নৌকোগুলিকে সতর্ক করছে। মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে প্রকৃতির এই অপূর্ব শোভা বিমুগ্ধ নয়নে দেখছেন। এক যুবক অদূরে রেলিং-এ ধারে দাঁড়িয়ে মহারাজকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে। তারপর কাছে এসে—ক্ষমা করবেন, বলে তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করে উবু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। মহারাজ অবাক! ছেলেটির মুখের দিকে এবং আশপাশের লোকজনের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলেটিকে প্রথমে—আপনাকে এবং পরক্ষণেই তোমাকে তো ভাই ঠাহর করতে পারছি না। উত্তরে ছেলেটি নিজের পরিচয় সহ বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে বলে—আজ্ঞে আপনাকে আমি অতীনদার সঙ্গে অতীতে অনেকবার দেখেছি।—ওঃ, আচ্ছা! তিনিও যে অতীনের সঙ্গে দেখা

করার উদ্দ্যেশ্যেই চলেছেন তা চেপে গিয়ে আর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে আশপাশের লোকজনকে দেখে নিয়ে নিচুগলায় জিজ্ঞাসা করেন—সে কেমন আছে? ছেলেটি মহারাজ-এর মনোভাব বুঝে আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে সিধে জবাব না দিয়ে ভিন্ন ভাবে বলে—আজ্ঞে আমি তাঁর অতি কাছের লোক। তিনি আমার সংসারের দুর্দশা দেখে নবাবের দপ্তরে একটা চাকুরি জুটিয়ে দিয়েছেন। সেখানের কাজ উপলক্ষ্যেই কলকাতা গিয়েছিলাম। কাজ সেরে ফিরছি। ছেলেটির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে মহারাজ তাকে কম্বলের উপর বসতে বলে নিজেও বসে পড়েন। তারপর কথায় কথায় মহারাজ ছেলেটির লেখাপড়া কতদূর, বাবা মা আছেন কিনা, অতীনের সঙ্গে কি সম্পর্ক এবং এখনও তা বজায় আছে কিনা ইত্যাদি জেনে নেন। সেই সঙ্গে অতীন যে বর্তমানে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ফলে সমিতির কাজ ব্যাহত হচ্ছে, তাও অবগত হন। বুঝলেন এ যাত্রায় অতীনের সঙ্গে দেখা হলো না—আর দেখা হবে কিনা—কে জানে! ছেলেটির সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। অতীনের খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশের খপ্পরে পড়া অসম্ভব ছিল না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। স্টীমারের গতি পাড়মুখী দেখে বোঝা যাচ্ছে ঘাটে পৌঁছতে দেরি নেই। ঘড়িতে বেলা দেড়টা। মহারাজ ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ডাইনিং রুমে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ছেলেটিকে বিদায় দিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসেন। নিচের ডেকে যাবার আর প্রয়োজন নেই। ততক্ষণে সেখানে খুখানি, খালাসিদের আর উপরে সারেঙ-এর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি চলেছে। স্টীমার এসে জেটিতে ভিড়ে। মহারাজ উঠে দাঁড়ান। রেলিং-এ ভর দিয়ে যাত্রীদের ওঠা নামা দেখেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর স্টীমার নোঙর তুলে ঘাট ছেড়ে পরবর্তী স্টেশন অভিমুখে রওনা দেয়। এখনকার দৃশ্য সকাল-বেলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পড়ন্ত-বেলা, নদীর জল ঘোলা। তেরছা সূর্য-রশ্মিতে নদীর জলে রঙ-এর কোন হেরফের নেই। স্টীমার মাঝ দরিয়া দিয়ে না চলে এখন দূরত্ব বজায় রেখে নদীর কিনারা দিয়ে চলেছে। স্রোতের আবর্তে গাছপালা ভিটে মাটি সহ নদীর কুল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কোথাও ভিটে-হারা লোকজন অসহায়ের মতো দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এক বেদনা-দায়ক মর্মান্তিক দৃশ্য। রাত্রি হয়েছে, রাতের আঁধারে স্টীমারের সন্ধানী আলোতে কুল-ভাঙা দৃশ্য আরও করুণ।

স্টীমার কিনারা থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে সন্ধানি আলোতে বোঝাযাচ্ছে নদীর মোহনায় ঢুকছে। দূরে স্টেশনের আলোগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর মালার মতো দেখাচ্ছে। ভোঁ ভোঁ শব্দে স্টীমার যাত্রীদের সতর্ক করে পাড়ের দিকে এগোচ্ছে। যাত্রীদের তল্পিতল্পা বাঁধা ও হাঁক-ডাকের মধ্যে স্টীমার এসে জেটিতে ভিড়ে। মহারাজ নেমে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ান। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন—রাত্রি আটটা। চলতে চলতে তিনি চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন—কেউ তাকে লক্ষ কিংবা অনুসরণ করছে কিনা। তেমন কিছু চোখে পড়ে না। প্ল্যাটফরমের একটা দোকানে ঢুকে ফল রুটি বিস্কুট ইত্যাদি কিনে তিনি বেরিয়ে আসেন। আরেকটা স্টীমারের ঘাটে ভেড়ার শব্দ আসছে। তার যাত্রী নিয়েই রেলগাড়ি ছাড়বে। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে গাড়িতে ভিড় বাড়ার আগেই তিনি একটা কামরায় উঠে জানালার ধারে একটা বেঞ্চির কোনে বসে পড়েন। যাত্রীর ভিড় বেড়েই চলেছে। শেষে একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। মহারাজার বসার স্থান ও সংকুচিত হয়। অবশেষে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দেয়—রাত্রি তখন ন'টা। সারাটা পথ মহারাজ জেগে থাকাই স্থির করেন। জানালার ধারে বসে রাতের আঁধারে ট্রেন চলার দৃশ্য উপভোগ করতে করতে তিনি পরবর্তী কর্মের একটা সূচী মনে মনে তৈরি করেন। মাঝ-রাত্রে টিকিট চেকার উঠে গাড়ির যাত্রীদের বিঘ্ন ঘটায়। কয়েকজন বিনা-টিকিটের যাত্রীকে ধরে নিয়ে পরবর্তী স্টেশনে নেমে যায়।

ট্রেন তীর্থধামের স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। মহারাজ নেমে যান। ভোরের আলো তখনো সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে নি। স্টেশনের আনাচে কানাচে, ঝোপে ঝাড়ে অদূরবর্তী ছোট ছোট টিলার গায়ে অন্ধকার লেগে আছে। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে মহারাজ এ অঞ্চল সম্পর্কে অমুতোষের আঁকা মানচিত্র আর সুদেষ্ণার বর্ণনা মনে মনে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করেন। কিন্তু এখান থেকে বেরোবেন কি ভাবে! চারদিকে জনারণ্য—ঘর-মুখো তীর্থ যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা। রেল লাইনটাই হলো গন্তব্য স্থলের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। সুতরাং ভিড়ের মধ্যে যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে ঠেলেঠুলে রেল লাইন ধরে চলে চলে রেল গুমটির সামনে এসে দাঁড়ান। এদিক ওদিক দেখে পুবদিকের রাস্তা ধরে এগোতে থাকেন। দু'পাশে বিচিত্র পণ্য-সম্ভারের দোকান—এত ভোরেও সেখানে ভিড়! মহারাজ

এগিয়ে চলেন। কিছু দূরে যেতেই দোকান পাট আর চোখে পড়ে না। রাস্তার ডান দিকে মাঠের ধারে তিনি দাঁড়িয়ে যান। মাঠের অবস্থান মনে মনে তিনি মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। তারপর পুব পাহাড়ের দিকে মুখ রেখে দক্ষিণ-পুব-কোণ বরাবর হাঁটতে থাকেন। মাঠের পর মাঠ চলে অবশেষে বুড়ো শিবতলা তার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। মাঠের শেষ প্রান্তে বুড়ো বটবৃক্ষ চতুর্দিকের গাছপালা ঝোপঝাড় নিয়ে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের শেষে ঘন কাঁটার জঙ্গল। ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে যেখানটায় জঙ্গল অপেক্ষাকৃত পাতলা তার ভেতর দিয়ে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে চলে বুড়োশিবতলা উপস্থিত হন। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য ঝুড়ি সবুজ পাতা-ভরা ডালপালা সহ বুড়ো বট গাছটা গর্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাত অরুণের কোমল স্নিগ্ধ আলোয় অভিষিক্ত হয়ে তাকে খুবই ভাব-গম্ভীর জাঁকালো দেখাচ্ছে। মহারাজ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশটা উপলব্ধি করে চমৎকৃত হন। তারপর প্রকাণ্ড বট গাছটার চতুর্দিক ঘুরে দেখে দীঘির পাড়ে ভাঙা ঘাটলায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের গাছপালা ঝাড় জঙ্গল পরিবেষ্টিত বিশাল দীঘিটা পর্যবেক্ষণ করে নিচে নেমে যান। জলজ উদ্ভিদে ভরা দীঘিটার মাঝখানে সাদা লাল পদ্মফুল উঁকি দিচ্ছে। ভাঙা সিঁড়িটা শেষধাপের বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলা একটা সরু পথও দৃষ্টিগোচর হয়। সব কিছুই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসেন। ইতিমধ্যে বুড়ো বটের তলায় তীর্থযাত্রীর ভিড় জমেছে। মহারাজ আর সেখানে দাঁড়ন না। পুবদিকে কিছুদূর চলে ডান দিকের মাঠে নেমে যান। দীঘিটার চারদিক ঘুরে তার পাড়ের আশপাশে জঙ্গলের দুর্ভেদ্যতা ও গভীরতা পর্যবেক্ষণের পর নিকট ও দূরের গ্রাম, পাহাড় ও রেললাইনের দূরত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে দীঘির পাড়ে উঠে আসেন। সেখানে গরু আছে রাখাল নেই। ওখান থেকে বুড়ো বটের দিকে দৃষ্টিপাত করে রঘুর আশ্রমের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে পাড় ছেড়ে পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে এগোন। বেলা আটটা।

মাঠে নেমে মহারাজ দূরবর্তী পর্বত ও তার পাদস্থ লোকালয় পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে চলতে থাকেন। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকজন—কেউ বা বেসাতি নিয়ে, কেউ বা ছেলেপুলে পরিবার সহ মাঠ দিয়ে মেলায় চলেছে। লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে

তিনি পর্বতের চড়াই উৎরাই, সন্নিহিত গ্রাম, তার রাস্তা ঘাটও অধিবাসীদের দেখে পুনরায় মাঠে নেমে উত্তর-পশ্চিম কোন বরাবর চলতে থাকেন। মন্দিরগামী রাস্তা অতিক্রম করে বনের ভিতর দিয়ে কিয়দ্দূর চলে বন-আপিস বাঁয়ে রেখে পূর্বদিকগামী সরকারী সরকে এসে পৌঁছান। এ রাস্তায় লোকজন ও পণ্যবাহী গরুরগাড়ি চলাচল নজরে পড়ে। রাস্তা ধরে পুবদিকে আরো কিছুদুর যেতেই বাঁয়ে ডাক বাংলোর টিলা। তা ছাড়িয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। পথের দুদিকে বন জঙ্গল আর ছোট ছোট টিলা। পথটা যেখানে পাহার ভেদ করে গিয়েছে সেখানে পৌঁছে তিনি থেমে যান। পার্শ্ববর্তী এক উঁচু টিলায় উঠে চারদিকের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিচে নেমে আসেন। মনে মনে এই অঞ্চলের একটা চিত্র এঁকে নিয়ে তিনি ফিরে চলেন। বাংলোর টিলাটার সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। তারপর কি মনে করে টিলা বেয়ে উপরে উঠে আসেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাংলোর অবস্থান ও চতুর্দিকের পরিবেশ লক্ষ্য করেন। দূ'ব পশ্চিম দিকে মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্র-সৈকত ও তরঙ্গমালা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখান থেকে বাগানের ভেতর দিয়ে বাংলোর সম্মুখ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান। কাউকে দেখতে না পেয়ে পরিচারকদের ঘরের ধারে গিয়ে—কে আছ, হাঁক দিতেই ডানদিকে বাংলোর ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে দেখেই এক ব্যক্তি অবাক হয়ে বারান্দা পেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে তাঁর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কাকে চান?

—বাংলোর চৌকিদার কোথায়? আমি তাকেই চাই।

—আজ্ঞে, আমিই চৌকিদার।

—ওঃ, আচ্ছা চৌকিদার আমি আজ রাত্রের জন্য এখানে থাকতে চাই।

চৌকিদার কেমন বিব্রত বোধ করে ইতস্ততঃ করে বলে—রৌদ্রে না দাঁড়িয়ে বারান্দায় চলুন। চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার বের করে বারান্দায় এনে রাখে। মহারাজ বারান্দায় উঠে ঝোলা নামিয়ে চেয়ারে বসে বলেন—তুমি খুবই হুঁশিয়ার লোক, বুদ্ধি শুদ্ধিও আছে দেখছি। এখন আমার কথার জবাব দাও।

চৌকিদার কাঁচমাচু হয়ে বলে—আজ্ঞে, আপনি এই ভরদুপুরে পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। আপনাকে কি বলি। বড়ই আপশোষ ও

সরমের কথা—বাংলোতে ঘর খালি নেই। দু'খান ঘরে দুই সরকারী বড় কর্মচারী। তাঁরা মেলার তদ্‌বিরতদারকে আছেন। আর একখানা ঘরে আমাব বড়দিমণি এসে রয়েছেন। তিনি আজ সকালে এসেই খাওয়া দাওয়া সেরে রেলে চড়ে সামনের স্টেশনের পরের স্টেশনে গেছেন। সেখান থেকে জমিদার বাড়ি—স্টেশন থেকে চার মাইল পথ। গরুব গাড়ি না পেলে হেঁটেই যেতে এবং ফিরে আসতে হবে। সঙ্গে ছোড়দিমণি আসেন নি। তাই আমার বেটা সাবুকে সঙ্গে নিয়েছেন। তিনি বেটাকে বড় পেয়ার করেন।

বড়দি ও ছোড়দিমণিব নামোল্লোখে মহারাজার মনে কেমন যেন সন্দেহের উদ্রেক হয়। এদের সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে তিনি বলেন—তোমার কথা শুনলাম। বুঝলাম তুমি নাচার। ভালো কথা, তোমার নাম কি হে চৌকিদার ?

—আজ্ঞে, আমার নাম গফুব আলি—লোকে গফুব বলেই ডাকে।

—খুব ভালো নাম। পয়গম্বরের পেয়ারের আদমী। আচ্ছা আমি চলি, বলে তিনি উঠতেই চৌকিদাব বলে—আমাব খুব আপশোষ হচ্ছে সাধু মহারাজ—আপনি এভাবে বিশ্রাম না করে চলে যাচ্ছেন। আমি বলি কি, আপনি দয়া করে এখানে গোছল করে বিশ্রাম করুন। বলেন তো নেয়ামতকে পাঠিয়ে বাজার থেকে আপনার খাবার আনিয়ে দি।

মহাবাজ খানিক চিন্তা করে বলেন—কিন্তু চৌকিদার, এ কাজ তো বে-আইনি। তুমি বাইরের লোককে এভাবে সরকারী জিনিশ—ঘর-দোর, গোছলখানা ইত্যাদি ব্যবহার করতে দিতে পারো না।

—কিন্তু অসময়ে কেউ এসে থাকবার ঘর না পেলে তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত এবং আমি দিয়ে থাকি। এটা বে-আইনি কিনা জানি না। তবে সাহেবরা জানেন। আমি বাচ্চাকাল থেকে এখানে আছি। তাবা আমাকে ভালোবাসেন।

—ঠিক আছে চৌকিদার, তোমার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু তোমার সাহেবদের ঘর আর দিদিমণির ঘর বাদ দিয়ে আর কোন ঘর খালি আছে যেখানে আমি জিনিসপত্র রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারি।

—কেন, আপনার জিনিসপত্তর মাঝখানের খানা কমরায় কিংবা বৈঠকখানায় থাকবে। আপনি সেখানেই বিশ্রাম করবেন।

—আচ্ছা। গোছলখানাটা দেখিয়ে দাও। বৈঠকখানায় আমার

জিনিষপত্তর রেখে দিয়ো। আমি মুসাফির—খানা আমার সঙ্গেই থাকে। চৌকিদার তাকে নিয়ে গোছলখানা দেখিয়ে দেয়। যাবার সময় বলে আপনার খাবার পানি খানাকামরায় টেবিলের উপর থাকবে। আবো কিছুর প্রয়োজন হলে ডাকবেন। মহারাজ চানের ঘরে প্রবেশ করেন। চান করতে করতে তিনি আজকের কাজের কথা চিন্তা কবেন। চিরঞ্জীব-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই তিনি আজ এখানে থাকা স্থির করেছেন। সেটা রঘুব আশ্রমে না গিয়ে কিভাবে সম্ভব! চৌকিদারের মুখে বড়দিমণিব উল্লেখে মহারাজার মনে আগে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তাহা চৌকিদারের পরবর্তী ছোড়দিমণির নামোল্লেখে দৃঢ় হয়। বড়দিমণি সুদেষ্ণা ভিন্ন কেউ নয়। সে নিশ্চয়ই দেবযানীকে না নিয়েই জরুরী কোন জীবন বীমার কাজে এখানে এসেছে। এই ধারণা বদ্ধমূল হতেই তিনি সঞ্জীব সম্পর্কে তার পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করে চান সেবে বের হন। যাবার পথে চৌকিদারের বড়দিমণির ঘরটা এক পলক দেখে নেন। কামরার একটা জানালা খোলা। তারই অদূরে বিছানা, পাশে টিপয় ইত্যাদি নানা আসবাব। ড্রইংরুমে এসে তিনি সুদেষ্ণা ওরফে বড়দিমণিব মাধ্যমেই রঘুব আশ্রমে চিরঞ্জীবকে সংবাদ দেবার ঝুঁকি নেওয়া স্থির কবেন। তাহলে সুদেষ্ণাও চিরঞ্জীবকে চিনতে ও জানতে পারবে এবং রঘুব আশ্রমের আওতার বাইরে তার পক্ষেও চিরঞ্জীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হবে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুটকেশ খুলে কাগজ নিয়ে লেখেন—রঘুব সেবা কর্মের সাহায্যের জন্য তোমার পরিচয়ে এক নওজোয়ান বাউল সেখানে গেছে। তাকে জেনে নিও আর আগামীকাল বেলা একটায় পর্বতশীর্ষে মহাদেবের মন্দিরে আসতে বলো। লেখা শেষে একটা শিশির তরল পদার্থে তুলো ভিজিয়ে আস্তে আস্তে লেখার ওপর বুলিয়ে দেন। শুকোবার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা অদৃশ্য হয়ে যায়। অতঃপর লিপিটাকে গোল করে পাকিয়ে মহারাজ বারান্দায় আসেন। সেখানে এবং সামনের চত্বরে কেউ নেই দেখে সুদেষ্ণার জানালার ধারে গিয়ে তিনি সেটা তার বিছানা তাক করে ছুড়ে ফেলে ফিরে আসেন। এ উপায়ে চৌকিদারের বড়দিমণি সুদেষ্ণা না হলেও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। আগামীকাল বেলা একটার পর তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবেন।

ড্রইংরুমে বসে মহারাজ ফলাহার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। তারপর ঘড়ি দেখে উঠে পড়েন। তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিনি বারান্দায় এসে

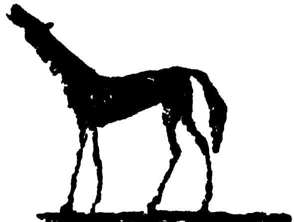
—গফুর গফুর বলে হাঁক দেন। কোন সাড়া নেই। খোলা চত্বরে নেমে পরিচারকদের ঘরের সামনে এসে গফুর বলে ডাক দেন। ডাক শুনে গফুর হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। মহারাজ ঝোলা থেকে দশটা টাকা নিয়ে গফুরের দিকে হাত বাড়াতেই সে সরে যায়। মহারাজ এগিয়ে আসতেই গফুর বলে—না সাধুজী, ও আমি নিতে পারবো না। আমার গুনা হবে।—না, না, গফুর আমি খুশি মনে জলপানির জন্য তোমাকে দিচ্ছি। টাকাটা চৌকিদারের হাতে গুঁজে দিয়ে—তোমার মঙ্গল হোক, খোদা হাফেজ, বলে চৌকিদারকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে তিনি পেছন ফিরে চলে টিলার ঢালু পথে অদৃশ্য হয়ে যান। চৌকিদার থ হয়ে সাধুমহারাজের অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ডাক বাংলোর টিলা থেকে নেমে মহারাজ অনুতোষ-প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাকী দিনটা পার্বত্য-অঞ্চল পরিক্রমা শেষ করেন। দিবাবসানে তিনি মিশনের সেবা কেন্দ্রে উপস্থিত হন। এক সাধু তাঁকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে বলে—আপনি ?

—হ্যাঁ, তীর্থে দেব-দর্শনে এলাম।

—কিন্তু লগ্ন শেষে !

—ভক্তজনের দেব-দর্শনে লগ্ন-শেষ কোন প্রতিবন্ধকই নয়। দেব-দর্শনের প্রতিটি মুহূর্তই তার নিকট পুণ্য-লগ্ন। সেই রাত্রিটা মিশনে কাটিয়ে পরদিন প্রাতকৃত্যাদি সেরে প্রতিষ্ঠানের দানের বাক্সে দশ টাকা রেখে সাধুদের মঙ্গল-কামনা করে তিনি বেরিয়ে যান।



বিপ্লবীদের উৎসাহ উদ্দীপনা এখন তুঙ্গে। বড়দার আগমন তাতে প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছে। সুদেষ্ণাও তার নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে ব্যস্ত। এই সময়ে

তার পক্ষে মফঃস্বল যাওয়া কঠিন। তথাপি যেতেই হবে। কেননা জমিদারের চিঠিতে একটা বড় অঙ্কের জীবন বীমার আশ্বাস রয়েছে। এ যাত্রায় দেবযানীকে সঙ্গে নেওয়া যাবেনা। সে পরীক্ষার পাঠে ব্যস্ত। মুশকিল হলো স্টেশন থেকে জমিদার বাড়ির দূরত্ব ক্রোশ খানেক। রেল স্টেশনে গরুর গাড়ি না পেলে অতটা রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে। সঙ্গী-বিহীন অতটা রাস্তা চলা খুবই বিরক্তিকর। আগে-ভাগে জমিদারকে তার আসার খবর দিতে পারলে তিনি তাঁর ঘোড়ার গাড়ি পাঠাতেন। এই সব সাত-পাঁচ ভাবার পর সুদেষ্ণা নিজ পরিকল্পনা মতো ভোর-রাতের ট্রেনেই যাত্রা করে। পথে তীর্থক্ষেত্রের স্টেশনে অবতরণ করে। সেখানে তখনও মেলার জের চলেছে। স্টেশনে কুলির অভাব নেই। একটা লোকের কাঁধে বিছানপত্র চাপিয়ে সুদেষ্ণা ডাক বাংলোতে এসে ওঠে। চৌকিদার মহাখুশি! তার আসার কারণ জেনে চৌকিদার তাকে তাড়া-তাড়ি খাইয়ে দাইয়ে সাবুকে সঙ্গে দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়। সুদেষ্ণা গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে দেখে তীর্থযাত্রীর আশায় স্টেশনে তখনও কয়েক-খানা গরুর গাড়ি আছে। তার একটাতে চেপে সুদেষ্ণা জমিদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছে। সেখানের কাজকর্ম সেরে অভ্রতা-ভদ্রতা রক্ষা করে জমিদারের গাড়িতেই স্টেশনে আসে। সেখান থেকে রেলে চেপে সন্ধ্যারাতে ডাক-বাংলো ফিরে আসে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহটাকে বিশ্রাম দেবার মানসে ঘরের বাতিটা কমিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে দেখে বিছানার উপর কি একটা পড়ে আছে। বাতিটা বাড়িয়ে দিতেই দেখে গোল করে পাকানো একটা কাগজ। সুদেষ্ণা ঘাবড়ে যায়! এটা এখানে কি ভাবে এলো, কে ফেললো, এবং কেন? আস্তে আস্তে কাগজখানা খুলে দেখে একখানা সাদা কাগজ—কিছু লেখা নেই! তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। সে টেবিল ল্যাম্পটা একটু কমিয়ে তার ওপর কিছুক্ষণ ধরে তাপ দিতেই লেখা ফুটে ওঠে। বুঝলো দলীয় নির্দেশ। কিন্তু সে ভেবে অবাক হয়—তার এবারকার যাত্রা একান্ত আকস্মিক এবং এই বাংলোতে এসে ওঠাও অপ্রত্যাশিত। দলের কারো জানার কথা নয়। কেননা সে কাউকে জানিয়ে আসার অবসর পায়নি। তা সত্ত্বেও বিষয়টা কি করে দলের গোচরে এলো! কেইবা এই সংবাদদাতা! মহারাজ এখনো ফেরেন নি। যতদূর জানা আছে অন্যান্যরাও স্ব স্ব স্থানে রয়েছে। যাকগে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ! হুকুম যখন মানতেই হবে।

হুকুমনামা খানা আবার পড়ে সুদেষ্ণা সেটা জ্বালিয়ে ফেলে। তবে কি তার অবর্তমানে কেউ ডাকবাংলোতে এসেছে? চৌকিদারের নিকট খোঁজ নেওয়া সংগত নয়—তাতে তার সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু না বললে বিষয়টা রহস্যেই আবৃত থাকবে!

সুদেষ্ণা উঠে স্নানে যায়। সারা দিনের খাটাখাটুনির পর স্নানান্তে শরীরটা সতেজ মনে হয়। ঘরে ফিরে প্রসাধন সেরে ড্রইংরুমে গিয়ে বসে কয়েকটা ম্যাগাজিন নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। কিন্তু কেবলই এক চিন্তা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে—কে এই সংবাদদাতা। চৌকিদার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে।– বড্ড দেরি হয়ে গেল বড়দিমণি। সাহেবদের খানা যেন আর শেষ হয় না। আমি ইব্রাহিমকে খানা দিতে বলি—সাবু দেখা শোনা করবে। আমাকে এক্ষুণি মোমিন মিঞার কাছে ছুটতে হচ্ছে। সাহেবরা কাল সকালেই চলে যাচ্ছে। তারা বিল চাইছে। সুতরাং এত রাত্রে মোমিনকে ডেকে তুলে বিল করিয়ে আনতে হবে। কি ঝামেলায় পড়েছি!

ঠিক আছে গফুর, খানা দিতে বলে তুমি চলে যাও। আমি যাচ্ছি। সুদেষ্ণা ঘরে গিয়ে ব্যাগ খুলে দশটা টাকা নিয়ে খানা কামরায় গিয়ে বসে। খাওয়া শেষে সাবুকে ডেকে বলে—বাবাকে এই দশটা টাকা দিস। আর বলিস খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে একটার গাড়িতে চলে যাব।—ঠিক আছে মেমসাব, বাবাকে বলবো। সাবু সেলাম দিয়ে বেরিয়ে যায়। সুদেষ্ণা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রাতে পৃথিবীর গা থেকে যে সামান্য আলোর আভাটুকু নিসৃত হয় আজ যেন তমসাচ্ছন্ন রাত্রি সেটুকুও শুষে নিয়েছে। দূর গগনে তারাগুলিও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—ঔজ্জ্বল্য নেই। নিঃসীম অন্ধকার—চতুর্দিকের গাছপালা-গুলিতেও যেন জমাট বেঁধে আছে। উড়ে-বেড়ানো জোনাকির ক্ষণিক আলো তাকে আরো গাঢ় করেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে। এক মন-উদাস-করা রজনী। তার অন্তরেও জমাট বাঁধা নিরাশার অন্ধকার। সুদেষ্ণা দাঁড়িয়েই আছে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তার যেন একটা হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। হঠাৎ বাগান থেকে পেঁচকের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে সুদেষ্ণার খেয়াল হয়। সে ঘরে ফিরে বাতিটা কমিয়ে দেয়। কর্মক্লান্ত দেহটা আর বুঝি চিন্তার অবসর পায়না। বিছানায় গা দেবার সঙ্গেসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সাবু চা নিয়ে হাজির। চা খেয়ে

এখানেই সাবুকে নাস্তা দিতে বলে সুদেষ্ণা স্নান-ঘরে যায়। স্নানাদি সেরে ঘরে ফিরে বেরোবার জন্য তৈরি হয়। সাবু নাস্তা নিয়ে এসেছে। নাস্তা খেয়ে সুদেষ্ণা বেরিয়ে বুড়ো শিবতলার পথে চলতে থাকে। দূর থেকেই বুড়ো বটগাছটা দেখা যাচ্ছে। প্রভাত সূর্যের সোনা-রঙ গাছের কচি পাতায় ছড়িয়ে পড়ে সোনালি আভায় চিকচিক করছে! আরো এগোতেই ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। মনে পড়লো আজ মঙ্গলবার—গাছের নিচে মানতকারীরা স্ত্রী পুরুষ বাচ্চাকাচ্চা সহ জড় হয়েছে। রঘুও এসে পড়বে। সুদেষ্ণা পা চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়। তারপর সরুপথ দিয়ে আশ্রমে পৌঁছে।—রঘু, রঘু, রঘুনন্দন বলে হাঁক পাড়তেই লেংচা দৌড়ে এসে ঢিপ করে প্রণাম করে বলে সাধুজীরা বাগানে। বাগানের ধারে গিয়ে দেখে রঘু বাউল বেশী এক যুবকের সঙ্গে বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত। লেংচার ডাকে ফিরে চেয়ে রঘু সুদেষ্ণাকে দেখেই দৌড়ে এসে বলে—সুক্রিয়া বহিনজী সুক্রিয়া। আমার আজ জোর বরাত আপনি এসেছেন। বাউল যুবকটি বুঝলো ইনিই দিদি। সে কাছে এসে প্রণাম করবার জন্য উবু হতেই সুদেষ্ণা তার হাত ধরে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে—কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, বলেই জিজ্ঞাসা করে—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে ভাই? রঘু তার জবাব দেয়—বহুৎ আচ্ছা আদমী দিয়েছেন বহিনজী। এ দাদাজীর মতোই সেবা-কর্মে খুব হুঁশিয়ার ও ওস্তাদ, বলে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করে। ওদিকে বুড়ো শিবতলা থেকে জোর ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি আসছে। রঘু কাছে এসে বলে—আমাকে এখন যেতে হচ্ছে বহিনজী।—তোমার সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না রঘু। আমি আজই চলে যাচ্ছি। রঘু ঘরে ঢুকে বেশ ভূষা পরিবর্তন করে ঝোলা কাঁধে ত্রিশূল হাতে বেরিয়ে আসে।—নমস্তে বহিনজী, বলে সে লেংচাকে নিয়ে বুড়ো শিবতলা চলে যায়। রঘু চলে যেতেই সুদেষ্ণা বাগানের ধারে গাছের গোড়ার উপর বসে চিরঞ্জীবকে তার পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে—তোমার নামটি কি ভাই?

—আমার আসল নাম, না হালের নকল নাম বলবো দিদি?

—দুটোই বলো। কখন কোনটা কাজে লাগে বলা তো যায় না।

—আমার নাম চিরঞ্জীব, হালের নাম প্রেমদাস বাউল বলে সে হেসে ফেলে।

—হুঁ, বলে সুদেষ্ণা তাকে পর্বত শীর্ষে দেবাদিদেবের মন্দিরে কখনও গিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

—না দিদি, আমি এখানে হালে এসেছি। রাস্তাঘাট আমার চেনা জানা নেই।

—ঠিক আছে ভাই, তোমাকে রাস্তা বাৎলে দিচ্ছি। সুদেষ্ণা ব্যাগ থেকে একখণ্ড কাগজ নিয়ে পেন্সিল দিয়ে এঁকে মন্দিরমুখী রাস্তা ও তার অবস্থান বুঝিয়ে কাগজখানা তার হাতে দিয়ে বলে—এখানে এখনো দেরীতে আসা যাত্রীর দল দিবারাত্র মন্দিরের পথে যাতায়াত করছে। সুতরাং মন্দিরে যেতে তোমার মতো ছেলের অসুবিধা হবার কথা নয়।

কাগজখানা ভাল করে দেখে ও বুঝে নিয়ে চিরঞ্জীব সেটা দিদিকে ফিরিয়ে দেয়। সুদেষ্ণা সেটা ছিঁড়ে ফেলে চিরঞ্জীবকে বলে—বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে তুমি পর্বতচূড়ায় দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকবে। এর যেন কোন ব্যত্যয় না হয়।

—ঠিক আছে দিদি। আপনার নির্দেশ মতো আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হবো। কিন্তু তারপর ?

—তারপরটা তো আমার জানা নেই ভাই। দলীয় নির্দেশ—তাতে কেন, কিংবা, কি-র কোন অবকাশ নেই। our duty is to obey not to question. সুদেষ্ণা উঠে পড়ে। চিরঞ্জীবও উঠে দাঁড়ায়। প্রণাম করবার জন্য মাথা নিচু করতেই সুদেষ্ণা দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরে মাথার হাত বুলিয়ে কপালে চুমো দিয়ে—কল্যাণ হোক, সার্থক বিপ্লবী হও ভাই, বলেই সে আর দাঁড়ায় না। পেছন ফিরে চলে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। চিরঞ্জীব দিদির চলার পথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। জীবনে এই বুঝি সে প্রথম এক বিপ্লবী দৃঢ়চেতা স্নেহশীলা নারীর সাক্ষাৎ পেল !

এইমাত্র দিদি যে সংবাদ দিয়ে গেলেন তাতেই বুঝি তার বিপ্লবী জীবনের উদ্বোধনের ইঙ্গিত রয়েছে। বিপ্লব যজ্ঞে যজ্ঞসূত্র ধারণের আহ্বান। অধীর উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে যথা সময়ে যথাস্থানে পৌঁছবার জন্য চিরঞ্জীব তৈরি হয়। রাখালগণ এসে গেছে। সে তাদের নিকট গাঁয়ের খোঁজ খবর নিয়ে তাদের বাগানের কাজে লাগিয়ে স্নান সেরে আসে। রঘু ফিরে আসতেই সে আর দেরি করে না। কিছু ফলাহার করে রঘুকে বলে বেরিয়ে যায়। বুড়ো বটতলা দিয়ে না গিয়ে

রাখালদের চলার পথ ধরে দীঘির কোণ দিয়ে সে মাঠে নামে। দূরে পূর্ব দিগন্তে যে মন্দিরের চূড়াটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটাই তার গন্তব্য স্থল। মাঠটা কোণাকুণি অতিক্রম করে সে রাস্তায় ওঠে। দিদির আঁকা রাস্তাটার চিত্র মনে রেখে সে এগিয়ে চলে। প্রথম যে দিন সে এখানে আসে সেদিনের তুলনায় পথে লোক চলাচল আজ অনেক কম। তবে রাস্তার দু'ধারে বড় বড় বট, অশ্বত্থ, দেবদারু ইত্যাদি গাছগুলির নিচে সাধু সন্ত বৈরাগীর আস্তানা এখনও আছে। আকাশের দিকে চেয়ে বেলা অনুমান করে সে পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর এগোতেই রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে যায়। সে ডানদিকের দক্ষিণ পূর্ব কোণ বরাবর পর্বতাভিমুখী রাস্তা ধরে এগোতে থাকে। রাস্তাটা ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। রাস্তার দু'দিকে ঝোপঝাড় উঁচু নিচু টিলা। কোথাও বা রাস্তার মাঝ দিয়ে ঝরণার জল বয়ে চলে পাশের খাদে বিকট শব্দে ঝরে পড়ছে। কোথাও বা রাস্তার পাশে পাষাণের ফাটল দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। এক অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! জীবনের সে এই প্রথম দেখলো। দিদির আঁকা পথের রেখা স্মরণে রেখেই সে চলেছে। সম্মুখে রাস্তার ধারে ডাইনে অনল কুণ্ড। যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে আর উঠছে। আরও কিছুদূর যেতেই বাঁয়ে পাতালপুরী। রাস্তা এখন পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে। ডাইনে উঁচু পাহাড়, বাঁয়ে অতলস্পর্শী খাদ! দেখতে ভয় লাগে। আরো এগোতেই ডাইনে কয়েকটা ইট-বাঁধানো সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে নির্মাতাদের মার্বেল স্মৃতি-ফলক। বাঁ দিকে আর একটা রাস্তা ঝোপঝাড়, বৃক্ষরাজির মাঝ দিয়ে চলেছে। চিরঞ্জীব বাঁয়ের পথ ধরেই অগ্রসর হয়। সম্মুখে কতগুলি বাঁধানো সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি দিয়ে একটা টিলার উপর উঠে দেখে রাস্তার ধারেই একটি ছোট্ট পাথরে তৈরি মন্দির। এতক্ষণ ধরে রাস্তায় অতি অল্প লোকেরই সাক্ষাৎ মিলেছে। কিন্তু মন্দির চত্বরে যাত্রীদের বেশ ভিড়! চারদিকে গাছে গাছে অনেক বাঁদর। দু'একটা উল্লুক ও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। মন্দিরে না দাঁড়িয়ে সে ঢালু রাস্তা বেয়ে চলতে থাকে। দু'দিকে বেতস বন। রাস্তাটা আবার ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে এবং দক্ষিণমুখী মোড় নিয়েছে। গাছ গাছড়া ক্রমেই বিরল হচ্ছে। আরো কিছুদূর এগোতেই সম্মুখে পর্বতশীর্ষস্থ উন্মুক্ত বিরাট চত্বর। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। চতুর্দিকে প্রকৃতির অবর্ণনীয় শোভা! চিরঞ্জীব বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। চত্বরের ঠিক

মধ্য দেশে দেবাদিদেবের মন্দির। তার আশপাশে এবং সম্মুখে নাট-মন্দির। দেবদর্শনার্থীদের প্রচুর ভিড়। তাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চস্বরে নিসৃত হর হর বম্‌বম্‌ ধ্বনি দূর দূরান্তে প্রতিধ্বনি তু'লে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সে ধীর পদক্ষেপে চারদিকে দৃষ্টি রেখে মন্দিব অভিমুখে এ'গিয়ে চলে। যাত্রীদের ভিড়ে মিশে নাট-মন্দিরে এসে দাঁড়ায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেব দর্শন করে মন্দির দুয়ারে উবু হয়ে প্রণাম নিবেদন কালে পাশে প্রণাম-রত এক ব্যক্তির নিম্ন কণ্ঠস্বর কানে আসে—চিরঞ্জীব ফলো মি। কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে সে অহ্বায়কের দিকে চায়। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে উঠে তাঁর অনুগমন করে। যাত্রীর ভিড়ে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য দু'বার মন্দির পরিক্রমা করেন। কারো নজর নেই বুঝে মহারাজ নিশ্চিন্ত মনে পাহাড় থেকে নামবার পথে কিছুদূর গিয়েই অবতরণকারী অন্যান্য যাত্রী-দের দৃষ্টি এড়িয়ে সট্ করে বাঁয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যা'ন। দু'দিকের ডালপালা সরিয়ে কাঁটাগাছ এড়িয়ে তাঁরা অনেকদূর চলে একটা বড় গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এতক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি। চিরঞ্জীব সম্মুখে এগিয়ে প্রণাম করবার জন্য উবু হতেই মহারাজ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশে কেমন লাগছে ? উত্তরে চিরঞ্জীব জানায় যে তার খারাপ লাগছে না। কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। মহারাজ কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা খুলে চিরঞ্জীবের হাতে দিয়ে বলেন—এটা খুলে ম্যাগাজিনে বুলেট ভরে কিভাবে দাঁড়িয়ে তাক করতে হয় দেখাও। চিরঞ্জীব সবই ঠিক মতো করে কিন্তু হাত তুলে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ব্যতিক্রম ঘটায়। সেটা ঠিক মতো দেখিয়ে দিয়ে মহারাজ বলেন—চলো, ঢালু পাহাড়ের আরো নীচে নেমে যাই যা'তে গুলির শব্দ উপরে না আসে। নিচে সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরে একটা গাছের গুঁড়ি তাক করে চিরঞ্জীবকে গুলি ছুঁড়তে বলেন। নির্দেশ মতো চিরঞ্জীব গুলি করে। গুলিটা টারগেটে না লেগে ফসকে বাইরে দিয়ে চলে যায়। সে খুবই লজ্জিত হয়। মহারাজ তাকে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় ঠিকমত হাত তুলে দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়তে বলেন। এবার গুলি ঠিক মতো টারগেটে গিয়ে বেঁধে। এভাবে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ে চিরঞ্জীব টারগেট ভেদ করে। মহারাজ কাছে এসে তার পিঠ চাপড়ে—বাহাদুর ছেলে বলে তাকে

অভিনন্দিত করেন। এভাবেই গভীর বনে কিংবা পর্বতের নিম্ন দেশে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবে।

—চলো যাই, বেলা পড়ে আসছে। চলতে চলতে মহারাজ বলেন—রঘুর আশ্রমে থেকে পীড়িত জনের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা লোকের মন জয় করবে। এভাবেই জন-সংযোগ রক্ষা করে চলবে যাতে তোমার আপদে বিপদে তারাও এগিয়ে এসে তোমাকে সাহায্য করে। ডাক বাঙলোর চৌকিদার গফুরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে। তার কাছ থেকে সীমান্তের ওপারে যাবার রাস্তা ঘাট, জনবসতি ও লোকজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবে। সম্ভব হলে কয়েকদিনের জন্য উক্ত অঞ্চলটা ঘুরে দেখে সব কিছু জেনে নেবে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, কোন অবস্থাতেই নিজেকে প্রকাশ করবে না। স্বকার্য সিদ্ধির জন্য রঘুর আশ্রম আমাদের বিপ্লবীদের আওতার বাইরে রাখতেই হবে। বিপ্লবের দামামা করে বাজবে এবং সংগ্রাম করে কখন শুরু হবে আপাততঃ বলতে পারছি না। তবে যথা সময়ে খবর অবশ্যই পাবে এবং সেভাবেই তৈরি হবে। কথা বলতে বলতে উভয়েই রাস্তার দিকে এগোয়। লোকজনের কথাবার্তা কানে আসছে। রাস্তা আর বেশী দূর নয়। মহারাজ বলেন—আমি আগে যাই, কেননা সন্ধ্যার গাড়িতে আমি চলে যাচ্ছি। তুমি একটু বাদে রাস্তায় এসে লোকজনের সঙ্গে মিশে আস্তানায় ফিরে যাবে। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীবের মাথায় হাত রেখে শুভমস্তু বলে তাকে প্রণামের অবসর না দিয়ে ত্বরিত পদে বন-পথে অদৃশ্য হয়ে যান। চিরঞ্জীব নির্বাক হয়ে তার অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে।



কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর বিদ্যাপীঠ ও আশ্রমে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে মহারাজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আম্রকুঞ্জে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আখড়ায় উপস্থিত হন। ছেলে এবং মেয়েদের বিভাগ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে তিনি খুশি। সকলেই নিয়ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার

আশা আকাঙ্ক্ষা যেন চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। বুঝলেন, তাদের ইচ্ছা শীঘ্র রূপায়িত না হলে হৃত-আশ ও হীন-বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। বিপ্লবের পক্ষে তা খুবই অশুভ ও ক্ষতিকর।

আম্রকুঞ্জে ফিরে মহারাজ প্রথমে কলকাতা থেকে সংগৃহীত টাকাকড়ির একটা হিসেব কষে সেগুলি ঐ কাগজখানা সহ সুদেষ্ণার জন্য একটা থলেতে ভরে যথাস্থানে রেখে দেন। অতঃপর গুপ্তস্থান থেকে একটা ফাইল পেড়ে এনে অনেকক্ষণ ধরে পাতা উল্টে উল্টে দেখেন। তার থেকে ক্ষুদ্র ডাইরিতে কিছু টুকে নিয়ে সেটা যথাস্থানে রেখে আসেন। ঘড়ি দেখে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে আম্রকুঞ্জ থেকে পেচকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা যায়। পরক্ষণেই দরজায় সাংকেতিক টোকা পড়ে। মহারাজ উঠে দরজা খুলে দেন। অস্ত্রাধ্যক্ষ ভেতরে আসেন। উভয়ের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হয়। আক্রমণের দিন সভ্যদের বাড়ি থেকে কয়টা বন্দুক নিশ্চিত পাওয়া যাবে তারও হিসাব হয়। তা-ছাড়া বোমার স্টক কি পরিমাণ এবং যোদ্ধাদের মধ্যে কিভাবে তা বণ্টন করা হবে তাহাও স্থির করা হয়। অবশেষে অস্ত্রাধ্যক্ষ বোমা তৈরি কালে নবেন্দুর আহত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে অনুতোষ কি ভাবে ফার্স্ট এইড দিয়ে সেবা কেন্দ্রে এনে চিকিৎসার পর তাকে বাড়ি দিয়ে আসার চমকপ্রদ কাহিনীটাও বর্ণনা করেন। ঘটনাটা শুনে মহারাজ বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—ওর বাবা মা কিছু সন্দেহ করেনি ?

—না, না, সে ভার নবেন্দু নিজেই নিয়ে তার বাবা মাকে বুঝিয়েছে। কথা শেষে অস্ত্রাধ্যক্ষ বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যান। দরজা বন্ধ করে মহারাজ ভেতরে ঢুকে আরেকটা ফাইল পেড়ে এনে খুলে ডাইরিতে নোট করার সময় বাইরে প্রথমে নিচু এবং পরে উঁচু স্বরে শিষ শোনা যায়। মহারাজ তাড়াতাড়ি ফাইলটা যথাস্থানে রেখে আসেন। দরজায় খট্‌খট আওয়াজ হতেই খুলে দিয়ে পরিতোষকে দেখে তিনি বলেন—এসো ভাই এসো। পরিতোষ প্রণাম করতেই মহারাজ তাকে সামনের আসনে বসিয়ে খবর জিজ্ঞাসা করেন।

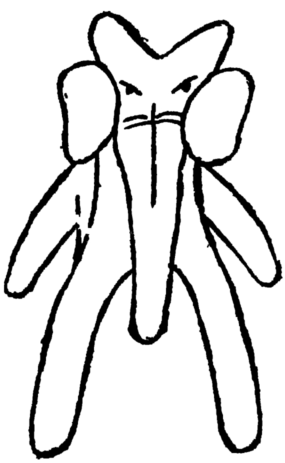
উত্তরে পরিতোষ জানায়—বড়দা আজ আসেন নি। বাড়ির লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আসবেন কিনা তারা বলতে পারলে না। তবুও আমি অপেক্ষা করলাম। তিনি এলেন না। রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে আপনাকে খবর দিতে এলাম।

—ভাবনার কথা। পুলিশ কি তবে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে! যাকগে, তুমি তার গাঁয়ের বাড়ি চেনো?

—গাঁ-টা জানি, তবে বাড়ি চিনি না। তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। আমি ঠিক বার করে নেবো।

—বাহাদুর ছেলে! তার সঙ্গে দেখা করে জানবে তিনি আগামীকাল রাত্রে কখন কোথায় আসবেন। এই সংবাদ আমাকে এখানেই বিকেল চারটের পর এসে জানাবে। পরিতোষ উঠে দাঁড়াতেই মহারাজ তাকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন—দাদা দেব-এর মতো ধীর স্থির, কর্তব্য-নিষ্ঠ, কর্মে অনলস ও স্বাধীনতা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে একজন বীর সৈনিক হও।

পরিতোষ চলে যেতেই মহারাজ দরজা বন্ধ করে ভেতরের ঘরে চেয়ার নিয়ে টেবিলের ধারে গিয়ে বসেন। টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে আগামী কাল সুরেশ ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়সূচী তৈরি করেন। বারংবার দেখে সংযোজন ও সংশোধনের পর তিনি পুনরায় নতুন করে লিখে শেষবারের মতো দেখে কাগজগুলি ঝোলায় ভরে নেন। ডাইরিখানা বের করে আরো কিছু লিখে তিনি ঘড়ি দেখেন। রাত্রি অনেক—আর দেরী করা যায় না। ঝোলা কাঁধে নিয়ে তিনি উঠে পড়েন। ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে এসে হাততালি দিয়ে প্রহরীদের সতর্ক করে তিনি নিজ কুঠিরাভিমুখী প্রস্থান করেন।



শৈলমালা শোভিত, উর্মিমালী বিধৌত ছবির মতো সুন্দর এই ছোট্ট নগরীতে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দ্বারা এক মহান

গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি রচিত হবে! এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বিপ্লবীদের উঁচু মহলে চলেছে প্রচণ্ড কর্ম তৎপরতা। তার আঁচ বুঝি নিচু মহলেও লেগেছে। দলের সাধারণ সভ্যদের নিকট কোন নির্দেশ না এলেও তাদের অনুমান সংগ্রাম অত্যাসন্ন। ফলে যারা আগতপ্রায় পরীক্ষা দেবার মানসে পড়াশোনা করছে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি জেগেছে—সংশয় ও অনিশ্চয়তা উঁকি দিচ্ছে—পরীক্ষা দেওয়া যাবে তো! যদিও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা অধীর উদ্‌গ্রীব।

সেদিন আখড়া থেকে দেবযানী বেলাবেলি বেড়িয়েছে। কিছু দূর যেতেই সে রাস্তায় দিদির মুখোমুখি হয়। কিন্তু অবাককাণ্ড দিদিব চলনে এতই তাড়া যে তিনি বুঝি তাকে দেখেও দেখলেন না! অপবিচিতের মতো পাশ কাটিয়ে যেতেই দেবযানীর মনে আঘাত লাগে। সে পেছন ফেবে—দিদি, বলে ডাক দেয়। ডাক শুনে সুদেষ্ণা থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে দেবযানীকে দেখেই বলে—আমার খুব তাড়া আছে বোন। পরে কথা হবে বলেই তিনি চলে যান। দেবযানী হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ তার চলমান মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে। অতঃপর পেছন ফিরে মাঠে নেমে বাড়ি যাবার সোজা পথ ধরে। চলতে চলতে দেবযানী দিদির এরূপ অভাবিত অস্বাভাবিক আচরণের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। ব্যস্ততা সত্ত্বেও পরিচিতরা পরস্পব মুখোমুখী হলে কি একে অন্যকে এভাবে অচেনার মতো পাশ কাটিয়ে যেতে পারে! বিষয়টা ভেবে ভেবে সে খুবই বিষন্ন বোধ করে। কিন্তু পরক্ষণেই দিদির চিন্তা-ক্লিষ্ট গম্ভীর মুখখানা তার চোখে ভেসে ওঠে। নিশ্চয়ই তাঁর খুব তাড়া ছিল এবং এমন গভীব চিন্তামগ্ন ছিলেন যে অন্য কিছু তাঁর নজরে আসেনি। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবযানীর মনে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। ইতিমধ্যে সে মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। দু'দিকের বড় বড় গাছগুলি তাদের প্রকাণ্ড বাহু বিস্তার করে পশ্চিম গগনে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি ঢেকে রেখেছে। তার ছায়া আর দু'দিকের ঝোপঝাড় মিলে রাস্তাটাতে সন্ধ্যার ঘোর এগিয়ে এনেছে। চলতে চলতে আচম্বিতে তার মনে হয় কেউ যেন তাব পেছন পেছন আসছে। এখানেই বহুদিন আগেকার এক বিশ্রী, অসৎ ঘটনার কথা মনে পড়ে। দেবযানী পেছন ফিরে না তাকিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পেছনের পদশব্দ আরও নিকটবর্তী হচ্ছে। দেবযানী আব দেরি না করে কোমরে কোষবদ্ধ ছোরাখানার

বাঁট-এ হাত রেখে চট্‌করে পেছন ফিরে দাঁড়াতেই সে তার অনুসরণকারীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্—একি তুমি! আমি তো ভেবেছি কোন ষণ্ডা গুণ্ডা।

অনুতোষ বিমর্ষ কণ্ঠে বলে—তা দলীয় শপথ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তুমি অবশ্যই আমাকে সে পর্যায় ফেলতে পারো।

—এরকম শপথ ভঙ্গ ইতিপূর্বেও যে না ঘটেছে এমন নয়। সুতরাং তার পুনরুল্লেখ এক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র। দেবযানী রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে সরে আসে। অনুতোষও তার অনুগমন করে। উভয়ে নির্বাক নিস্পন্দ—আধো আলো অন্ধকারে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। উভয়ের অন্তরেই বুঝি চলেছে একাধারে শিহরণ ও বিষাদ-ঘন নানা ভাব নানা প্রশ্ন ও নানা জিজ্ঞাসার ঘোর আবর্তন! দেবযানী ভাবে কিছুক্ষণ পূর্বে দিদির সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনার সঙ্গে অনুতোষের এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আগমনের কি কোন মিল আছে! উভয়ই কি একই কারণ সম্ভূত, না কি অন্য কিছু! দেবযানীর অন্তরে আনন্দের শিহরণ জাগে—ইতিপূর্বে এখানেই এক গোধূলি লগ্নে সে অনুতোষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। আজ আবার একই সময়ে একই লগ্নে একই স্থানে অনুতোষের সাক্ষাৎ লাভ—কিসের ইঙ্গিত! কিন্তু অনুতোষ চুপ করে আছে কেন? তবে কি সে কোন বিষম বিষাদ বার্তা বয়ে এনেছে! ভয়ে দেবযানীর বুক দুড়দুড় করে কাঁপছে! সে আর স্থির থাকতে পারে না। অনুতোষের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—তুমি, তুমি চুপ করে আছ কেন? কথা কও, যা বলতে এসেছ বলো।

অনুতোষ দেবযানীর হাত ধরে কাছে টেনে এনে মৃদু হেসে বলে—কি বলবো এতক্ষণ ধরে তাই ভাবছিলাম। দেখলাম আমাদের সব কিছুই ইতিপূর্বেই বলা হয়ে গেছে—নতুন করে কিছু বলার নেই। তোমার আমার মধ্যে রোগ শয্যা থেকে এই মুহূর্ত অবধি যে সম্পর্ক যে বন্ধন গড়ে উঠেছে তা এক কথায় বলা যায়—অমর বন্ধন—যার লয় ক্ষয় নেই—যাকে অস্ত্র ছেদন কিংবা পাবক দহন করতে পারে না। গীতার উক্তি অনুযায়ী—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।

কামনা বাসনা ও মৃত্যুকে জয় করার শপথ নিয়েই আমরা বিপ্লবী হয়েছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিদেশী বিতাড়ন স্বাধীনতা অর্জন ও

স্বরাজ প্রতিষ্ঠা-করণ। নাহি ভয় রণে কি মরণে! শনৈঃ শনৈঃ আমরা সে দিকেই চলেছি। যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে ক্রান্তিকারী একটা কিছু ঘটতে চলেছে। আদেশ মাত্রই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তার জন্য আমাদের সর্বক্ষণ তৈরি থাকতে হচ্ছে। সুতরাং উত্তরার মতো তুমি হাসি মুখে আমাকে বিদায় দাও যাতে মনে বল পাই—অরিকুল ধ্বংস করে সিদ্ধিলাভ করি।

সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু রাত নামতে তখনো দেরী। উভয়েই হাত ধরাধরি করে নির্বাক দাঁড়িয়ে। অনুতোষের শেষ কথার জের টেনে দেবযানীর বলে—তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না। তোমার মতো আমিও এক বিপ্লবী সৈনিক। সংগ্রামের ডাক এলে তুমি আমি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বো, একই সঙ্গে লড়াই করবো। সে তো মহা আনন্দ ও উল্লাসের কথা।

—না, তা হয় না দেবযানী। তোমাদের সম্মুখ সমরে যেতে মানা।

দেবযানী প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। —সে কী! তোমার কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করছি না। কিন্তু তা হলে এতদিন ধরে শরীর চর্চা, অস্ত্র শিক্ষা, কুচকাওয়াজ ও সংগ্রামের মহড়া সবই কি বৃথা—সবই কি আমার বিফলে যাবে! উজ্জ্বল বৈশাখী সন্ধ্যার ছায়া বিষাদ-ঘন হয়ে নেমে আসে! উত্তেজিত দেবযানী অনুতোষের হাত ছাড়িয়ে ছিট্‌কে দূরে সরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে—না, না। তা আমি হতে দেবো না—কক্ষনো হতে দেবো না। যুদ্ধে আমি যাবোই যাবো। আমাকে যেতেই হবে। এর জন্য দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধের বিচার আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে আমার যুদ্ধ করা কেউ রুখতে পারবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতেই আমরা পরস্পর থেকে বিদায় নেবো। চুম্বনে আলিঙ্গনে ঐ যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হবে আমাদের বাসর শয্যা। মনে রেখো এ আমার মরণপণ—এর ব্যত্যয় হবে না—হতে দেবো না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে—যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হবে আমাদের বাসর শয্যা বাসর শয্যা—বলতে বলতে দেবযানী অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আর অনুতোষ—দেবযানী দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলে ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার কানে তখনো দেবযানীর সন্তপ্ত কণ্ঠের শেষ কথার প্রতিধ্বনি বেজে চলেছে—যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হবে আমাদের বাসর শয্যা, বাসর শয্যা॥



ইংরেজি ১৯২৯ সালের শেষার্দ্ধে এবং ১৯৩০-এর প্রথমার্ধে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্মরণীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। লাহোর কংগ্রেসে নরমপন্থী, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদের ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভোটের দ্বারা না হয়ে গান্ধিজী ও জহর-লালের স্বৈর-নেতৃত্বে মনোনীত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রতিবাদে সুভাষ বোস দক্ষিণী বন্ধুদের সহযোগিতায় লাহোরেই কংগ্রেস ডেমো-ক্রেটিক পার্টি নামে কংগ্রেসের মধ্যেই এক নতুন দল গঠন করেন। এদিকে বাঙলা কংগ্রেস নিয়ে মোতিলালজীর সঙ্গে সুভাষবাবুর প্রচণ্ড মতদ্বৈধ ও বাতবিতণ্ডা। সুভাষবাবু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস, কলকাতা কর্পোরেশন নিয়ে চলেছে গজ কচ্ছপের যুদ্ধ! ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী গান্ধিজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী পূর্ণ স্বরাজ আন্দোলন উৎসব পালিত হয়। মার্চ-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আরউইনের নিকট তাঁর সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক চিঠি। অতঃপর লবণ সত্যাগ্রহ এবং লবন আইন ভঙ্গ কল্পে ঐ বৎসরেই ৩০শে মার্চ গান্ধিজীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডিযাত্রা। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বিপ্লবীদের এক দল স্বাধীনতা লাভ তরান্বিত করার সংকল্প নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের এক দুঃসাহসিক কর্মসূচী তৈরির উদ্দেশ্যে তাদের এক গোপন আড্ডায় সমবেত।

গভীর তমসাচ্ছন্ন নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী। গাছ থেকে ঝরে-পড়া শুকনো পাতার ও অদূরে নালায় জল পড়ার শব্দ কানে আসছে। দূরে কুকুরের চিৎকার আর মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। এই পরিবেশে এবং বিপ্লবী গুপ্তচরদের সতর্ক পাহারাধীনে বিপ্লবী দলপতিরা একে একে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে জড় হচ্ছেন। দুটো গাছের গুঁড়িকে তারা আসন করেছেন। মাঝখানে ছোট্ট একটা কেরোসিন বাতি। তার স্তিমিত আলোতে উপবিষ্ট জনের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। প্রথমেই সম্প্রতি জেল থেকে আগত গৃহে অন্তরিত সুরেশ ওরফে বড়দা তাঁর

স্বভাবসুলভ ওজস্বী ভাষায় সংগ্রাম কিভাবে পরিচালনা করে এখানে ব্রিটিশ শাসন কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাদের পর্যুদস্ত ও পঙ্গু করে নগর দখলের পর ভারতে প্রথম স্বাধীন বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও তার শাসন পরিচালনা করতে হবে তা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। অতপর মহারাজ সংগ্রামের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেন—কিভাবে কখন কোথায় আক্রমণ শুরু হবে তার একটা স্পষ্ট চিত্র তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভ্যদের সম্মুখে মেলে ধরেন। তারপর দলের বিভাগীয় প্রধানগণ আপন আপন বিভাগের প্রস্তুতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সব শেষে গুপ্তচর প্রধান এ যাবৎ সরকারী গোয়েন্দাদের কর্ম তৎপরতা কিভাবে ব্যর্থ ও প্রতিহত হয়েছে তা বলে সেই সঙ্গে দলের সভ্যদের উপরও সতর্ক নজর রাখার বিষয়টাও উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে বাল বাহিনীর বিচক্ষণতা ও ঐকান্তিকতার তিনি সবিশেষ প্রশংসা করেন।

সকলের বক্তব্য শেষ হলে বড়দা পুনরায় বলেন—আক্রমণের দিনক্ষণ ধার্য হওয়ার পূর্বে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল (টারগেট) গুলি এবং আক্রমণ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা অক্সিলিয়্যারী ফোর্স-এর অস্ত্রাগার, পুলিশ লাইনও তাদের অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ টেলিফোন অপিস, কোতোয়ালি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিভাগগুলি অধিকাংশই টিলার ওপর অবস্থিত। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কিভাবে চুপিচুপি এগিয়ে শত্রুর উপর আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ ও ঘাঁটিগুলি দখল করতে হবে তার জন্য মহড়া একান্ত জরুরী ও অবশ্যই করণীয়। এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য বন্দুক এবং নির্দিষ্ট স্থানে যথা সময়ে পৌঁছবার জন্য চাই মোটরগাড়ি। তাছাড়া রেল সেতু ও সড়কের সঙ্গে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন যোগাযোগও ধ্বংস করা দরকার। অস্ত্রাগার দখলের পর রাইফেল লুইস্ গান ইত্যাদি সমর সম্ভারে সজ্জিত হয়ে আমাদের পক্ষে অনায়াসেই নগর দখল সম্ভব বলেই তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। উপরোক্ত বক্তব্য অনুসরণ করে সক্রিয় সভ্যদের কিভাবে প্লাটুন ভিত্তিক ভাগ করে যুদ্ধের মোহড়া দেওয়া হচ্ছে ও হবে এবং ঐ প্লাটুনই যথা সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তু আক্রমণ করবে মহারাজ তা সাবিস্তারে বর্ণনা করেন। কথা শেষ করে তিনি ঘড়ি দেখেন। রাত্রির দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ। নদীতে জোয়ার এসেছে। নদী পেরিয়ে সুরেশের গাঁয়ে পৌঁছবার এখনই প্রশস্ত সময়। দেরী হলে

জোরের টহলদারী পুলিশ তাকে গৃহে না দেখতে পেলেই বিপত্তি হবে। সুতরাং সভাভঙ্গের সংবাদ তিনি অদ্ভুতভাবে শিষ দিয়ে অদূরবর্তী প্রহরীদের জানিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নেতৃবৃন্দ অন্ধকারে মিলিয়ে যান।



রেলগাড়ির দেরির জন্য সেদিন সুদেষ্ণা সন্ধ্যার পর শহরে এসে পৌঁছয়। পরদিন কোম্পানীর কাজের ব্যস্ততা হেতু আখড়ায় যাওয়া হয়নি। কিন্তু খবর পেয়েছে মহারাজ ফিরেছেন। ফেরার পথে সুদেষ্ণা তাঁকে তীর্থক্ষেত্রের অবস্থান ও পরিবেশ রণ-কৌশলের সহায়ক কিনা তা সরজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের অনুরোধ করেছিল। ডাক বাংলোতে রঘুব আশ্রমের প্রেমদাস বাউল সম্পর্কে তার নিকট সংবাদ প্রেরণের ঘটনার মধ্য দিয়ে তীর্থক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু তারপর, তারপর কি ? এ জিজ্ঞাসা সেবা প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র চুকিয়ে দেবার পর থেকেই তাকে নিরন্তর অস্থির ও উদ্বিগ্ন করছে। আখড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে সুদেষ্ণা অমৃত কাননে এসে উপস্থিত। সেখানের অবস্থা সবকিছুই স্বাভাবিক দেখতে পায়। বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা চলেছে, তাঁত-শালে, কামারশালে, আঁশমাড়াই কলে কাজ হচ্ছে। আম্রকুঞ্জে এসে সেবা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তার মানস পটে এই ঘরের মাঝে একদিন মহারাজকে প্রণামকালে তার অশ্রুপাতের দৃশ্য ভেসে ওঠে। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে সেদিন ঐ ঘটনা কি করে ঘটে গেলো। নিঃসন্দেহে তার অন্তরের অন্তরালে সঞ্চিত জৈবিক কামনা বাসনার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশই ঐ নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছে। নানা, ঐ চিন্তা আর এরূপ ভাবোন্মাদনা আর নয়। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয় —ছিঃ ছিঃ, কি সব ছাইপাশ তার মনে আসছে। তার কি এতই অধঃপতন হয়েছে। গীতার বাণী স্মরণে আসে—ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ···ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে ধনুর্বাণ হাতে নাও। নিজেকে সংযত করে সুদেষ্ণা উঠে দাঁড়ায়। আলমারির দেরাজ খুলে কাজে মন দেয়। এখানে টাকা পয়সা, হিসাবপত্র ইত্যাদি রাখা বারণ। সুতরাং মহারাজ-এর কলকাতা থেকে সংগৃহীত অর্থ গুণে দেখে। টাকার অঙ্ক মহারাজ-এর লেখা চির-

কুটিরে সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যাবার পথে তা নিয়ে যাবে মনস্থ করে সুদেষ্ণা টাকাগুলি চিরকুট সহ থলেতে ভরে দেরাজে রেখে আলমারি বন্ধ করে আখড়ার মেয়েদের বিভাগ রুটিন মাফিক ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। পথে ছেলেদের লাঠিখেলার জায়গায় দাঁড়ানো মহারাজ তাকে দেখে ফেরার পথে আম্রকুঞ্জ হয়ে যেতে বলে তিনি ভিন্ন দিকে চলে যান।

মেয়েদের শরীর চর্চার ঘরে ঢুকে সুদেষ্ণা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখে। শিক্ষিকা মণীষার সঙ্গে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলে দীঘির দিকে চলে যায়। সেখানে দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সাঁতার-কাটা দেখে তাদের উৎসাহ দেয়। শিক্ষিকা ধীরা ও সাবিত্রীর সঙ্গে ঘাটলার সিঁড়িতে বসে কথা বলে ওদের বিদায় দিয়ে সে ওখানেই চুপ করে বসে থাকে। আজ সারা দিন তার কেমন একটা উন্মনা ভাব—সেই সঙ্গে আলস্য জড়ানো। সিঁড়ির উঁচু ধাপ থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে আখড়ার পরিবেশ ও পরিধি লক্ষ্য করে। বেলা অবসান। তার মনে হয় এতদিনে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানেরও বুঝি অন্তিম আসন্ন। চাক্ষুষ না হলেও মানস চক্ষে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঈশান কোণে ঘন কালো মেঘের আড়ম্বর। শুনতে পাচ্ছে তাদের প্রকম্পিত গুরু গম্ভীর নাদ। যে কোন মুহূর্তে ঝড় ঝঞ্ঝার সঙ্গে বানের আবর্তে সব কিছু ধুয়ে মুছে যাবে। এখানের গাছপালা, লতাপাতা, বালক বালিকা, নরনারী, পশুপাখী সব কিছুর জন্যই তার প্রচণ্ড মমত্ববোধ। তাদের স্নেহ ভালবাসা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে। এইরূপ গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় সে ঘাটলা ছেড়ে চলতে থাকে। পথে তার সম্মুখ দিয়ে কে আসছে যাচ্ছে তার খেয়াল নেই। মাঠের ধারে রাস্তার উপর হঠাৎ পেছন থেকে দিদি ডাক শুনেই থতমত খেয়ে ফিরে তাকায়। দেবযানীকে দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে—পরে কথা হবে বোন, বলেই সে পেছন ফিরে চলে যায়।

দিনের শেষ—সন্ধ্যার ঘোর ক্রমেই নেমে আসছে। আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করে তরু-বীথি দিয়ে চলতে চলতে সুদেষ্ণার মনে হলো শাখা-প্রশাখার আচ্ছাদনে এখানের আঁধার ঘন-ঘোর। প্রহরীর হুঁশিয়ারে সাড়া দিয়ে সে কুটিরের দিকে এগোয়। যতই এগোচ্ছে নিজেকে ততই দুর্বল লাগছে—হৃদয়ের স্পন্দনও দ্রুততর হচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে এখানেই বসে পড়ে। তারপর ফিরে যায়। আজ তার হলো কি! নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুদেষ্ণা অবাক! রক্ত চক্ষু দেখিয়ে নিজেকে শাসন করে

সুদেষ্ণা কুটিরের দুয়ারে গিয়ে দরজায় সাংকেতিক টোকা দেয়। ধীরেশ দরজা খুলে দেয়। দিদিকে দেখে বলে—আপনাকে সেবা-কেন্দ্রে অপেক্ষা করতে বলেছেন। সুদেষ্ণা আর দাঁড়ায় না। এক পলকে ধীরেশ ছাড়া ভেতরে অনুতোষ, অবনী প্রভাত ইত্যাদি প্রথম সারির সভ্যদের দেখতে পায়। বাতির অল্প আলোকে ওদের পেছনে কারা আছে তা বোঝা গেল না।

পেছনের দরজা দিয়ে সুদেষ্ণা ঘরে প্রবেশ করে। ভেতরে বাতি জ্বলছে। বোঝা গেল এটাকেও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমেই সে আলমারির দেরাজ থেকে টাকার থলেটা বের করে ব্যাগে পুরে নেয়। এরপর এখানে আর তার করার কিছু নেই। উদ্দেশ্য বিহীন ঘরময় ঘুরে এটা নাড়ে ওটা দেখে। পর পর প্রাথমিক চিকিৎসার আলমারি-গুলি খোলে। দেখে একটার ভেতর থেকে গোটা কয়েক ফাস্ট-এইড ব'ক্স নেওয়া হয়েছে। সময় আর কাটে না। হঠাৎ মনে হয় ঘরটায় প্রচণ্ড গুমোট। দক্ষিণে মাঠের দিকের দুটো জানালা খুলে দেয়। ফুরফুরে হাওয়া আসছে। শরীর তাতেও ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কেমন একটা অস্থির চাঞ্চল্যের ছটফটানি! আর কতক্ষণ এভাবে অধীর প্রতীক্ষায় থাকবে! টেবিলের ড্রয়ার খোলে—একেবারে ফাঁকা! সেখান থেকে সরে পুনরায় জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘন ঘোর অন্ধকার যেন মাঠটার উপর স্তরে স্তরে জমে আছে। শেষ প্রান্তের গাছপালাগুলি কালো দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। নিঃসীম অন্ধকারে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলে সারা মাঠ জুড়ে জোনাকিরা দলে দলে উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ খুট করে আওয়াজ হতেই সুদেষ্ণা পেছন ফিরে চায়। দেখে মহারাজ টেবিলের ধারে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সুদেষ্ণা এগিয়ে আসতেই তিনি স্মিত কণ্ঠে বলেন—তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। আমি খুবই দুঃখিত। তবে শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে। যে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের রূপরেখা এতদিন যাবৎ তৈরি করা হয়েছে তা এখন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে! বহু আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত সশস্ত্র অভিযানের দিন ক্ষণ নির্ধারিত! মহারাজ-এর চোখ মুখ উৎসাহ উদ্দীপনায় জ্বল জ্বল করছে। মুখাবয়বে রাঙা আভা ফুটে বেরুচ্ছে। তাঁর দীর্ঘ দেহের পেশীগুলি স্ফীত হয়ে উঠেছে। তাঁর এ রূপ সুদেষ্ণা আগে কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নি। বিস্মিত বিস্ফারিত নয়নে তাঁর দিকে ক্ষণিক

চেয়েই সে চক্ষু আনত করে। খুবই উত্তেজিত হয়েছেন বুঝে মহারাজ নিজেকে সংযত করে ঈষৎ হেসে বলেন তোমাকে যে কারণে অপেক্ষা করতে বলেছি তা হলো এই চরম ক্রান্তিকারী বিষয়টা তোমার গোচরে আনা প্রয়োজন। যুদ্ধ করে নগর দখলের পর বালবাহিনী ও নারীবাহিনী নিয়ে বিস্তর আবশ্যকীয় কাজে কর্মে তোমাকে ব্যাপৃত হতে হবে। মূল বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান, বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাগবিকদেব বিপ্লবের বাণী ও তার অপরিহার্যতা ও সার্থকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং বিপ্লবীদের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির হস্ত প্রসাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করা। ভারতে প্রথম বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র নগরের ঘরে ঘরে ঘুরে পৌঁছে দেওয়া। তাছাড়া আর একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পুলিশ ও তাদের গুপ্তচর, ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদার ও খয়েরখাঁদের ওপর তীক্ষ্ণ সতর্ক নজর রাখা যাতে তারা নিজেদের সংঘবদ্ধ কবে অতর্কিতে নগর দখলকারী বিপ্লবী বাহিনীকে আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করতে না পাবে।

মহারাজ কথিত সংবাদে সুদেষ্ণার মধ্যেও বুঝি উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগে। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—সে শুভদিন কবে বলুন?

—তা বেশী দূব নয়। তুমি সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত না হয়েও পূর্বোল্লিখিত কর্ম দ্বারা বিপ্লবী বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি যোগাবে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করা থেকে তোমার এ-ভূমিকাও তুচ্ছ কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অবধি বলেই মহারাজ ক্ষণিক চুপ করে থাকেন। তাঁর উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে নানা ভাবের খেলা চলছে। সুদেষ্ণা বিস্মিত নয়নে তা দেখছে। হঠাৎ তুষ্ণীম্ভাব ছেড়ে তিনি গুরু গম্ভীব কণ্ঠে সুদেষ্ণাকে সম্বোধন করে বলেন—আজ থেকে আগামী তিন দিনের দিন রাত্রে ঠিক দশটায় শুরু হবে আক্রমণ। একই সঙ্গে করা হবে রেল সেতু ও সড়ক, টেলিগ্রাফ টেলিফোন আপিসের ধ্বংস সাধন, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পুলিশ লাইন ও সায়েবদের ক্লাব আক্রমণ করে তাদের নিরস্ত্রী ও বন্দী করণ। তার পরেই লুণ্ঠিত অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত ও বলীয়ান হয়ে শুরু হবে নগর আক্রমণ। কোতোয়ালী সহ সমস্ত থানার পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে লকআপে বন্দী করে ট্রেজারী লুণ্ঠন। সায়েবদের বাংলো থেকে তুলে নিয়ে তাদের জেলে পুরে সেখানের সমস্ত বিচারে ও বিনা-বিচারে আটক রাজদ্রোহী বন্দীদের মুক্ত করে দলভুক্ত করণ। এভাবেই সমগ্র শহর দখলের পর জাকজমকের সঙ্গে

বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে কালেক্টরী শীর্ষে ভারতে প্রথম স্বাধীন তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন। বন্দেমাতরম্ বলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় মহারাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে তিনি সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো। কিছু বলার থাকে তো বলো।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার কথা আপনাকে ইতিপূর্বেই জানিয়েছি। আপনিও তার যথাযথ উত্তর দিয়ে আমাকে অবহিত করেছেন। এখন আপনার বক্তব্য থেকে আরও একটা জিনিস স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রথম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও পুলিশ লাইন আক্রমণ শুরু হবে তা দ্বারা নগর আক্রমণ ও দখল করা সম্ভব নয় যদি না অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হওয়া যায়! এই অবস্থায় আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম অস্ত্রাগারের লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল! আমাদের সাফল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েও একটা প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে—অভাবিত কোন কারণে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ফলপ্রসূ না হলে পরিণামে কি দাঁড়াবে! এতদিনে গড়ে ওটা সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব, সমগ্র সশস্ত্র সংগ্রামাভিযান ইত্যাদি সব কিছুই কি তাসের ঘরের মতো ভেঙে খান খান হবে? এতগুলি মূল্যবান জীবন নষ্ট হবে!

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত হওয়া সম্পর্কে মহারাজ এতই আশাবাদী যে এর বিপরীত নঞর্থক কোন ভাবনা চিন্তা তাঁর মনে স্থান পায়নি। এখন এ-ব্যাপারে সুদেষ্ণার মনের অভিব্যক্ত চিন্তাধারা একেবারে অযৌক্তিক ও অহেতুক বলে উড়িয়ে দেবারও নয়। সুতরাং সুদেষ্ণার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত প্রশ্নটা সম্পর্কে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহারাজ হাঃ হাঃ করে হেসে তার আশংকা উড়িয়ে দিয়ে বলেন—মা ভৈঃ। মনে রেখো আমাদের সমগ্র সশস্ত্র অভিযান পরিকল্পনা এতই নিখুঁত ও নিচ্ছিদ্র যে তা ব্যর্থ হবার কোন আশঙ্কা নেই। সুতরাং তোমার মনে সন্দেহের ছায়া অহেতুক—তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার আমরা মরণপণ করেই প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি। অভাবিত অঘটন কিছু ঘটলে পিছপাও হব না —শত্রুকে মেরে মরবো। এর বিকল্প কিছু নেই। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। নাহি ভয় রণে কি মরণে!

মহারাজ-এর শেষ ঘোষণা সুদেষ্ণার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ঘটনার শেষ কোথায় তা বুঝেও নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যই বুঝি বলে—কেন, সম্ভাব্য বিকল্প তো ইতিপূর্বেই আপনার গোচরে এনেছি। তবে তার প্রয়োজন যেন কখনো না হয় মনে প্রাণে আমি সে কামনা করছি। সশস্ত্র বীরবৃন্দ সহ নগরে প্রবেশ করে বৃটিশের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ জনগণকে মুক্ত করুন কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি। কবির গাথা সংক্ষেপে নিজ মনোমত গড়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি ঃ

জয়-যাত্রা পথে উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদি রথে।
চাকা ঘুরছে ঝনঝনিয়ে শুনছি বুকের মাঝে।
রক্তে আমার তুলছে প্রাণ, গাইছি মনে মরণ-জয়ী গান।
আকাঙ্ক্ষা মোর বন্যা-বেগে ছুটছে বিপুল ভবিষ্যতের পানে!

—বাঃ বাঃ, চমৎকার! সাধু সাধু! কল্যাণ হোক। হ্যাঁ, আর একটা বিষয়ও তোমার জানা দরকার। নগর প্রবেশের পূর্বে আমাদের অগ্রগামী অনুসন্ধানী দলের সবুজ সংকেত পেলেই মূল বিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হবে। অস্ত্রাগার ও টেলিগ্রাফ টেলিফোন আপিস থেকে নগর প্রবেশের উভয় সড়ক ধরেই সাঁড়াশির মতো আক্রমণ চলবে। সুতরাং এই দুই সড়কের ওপর বালবাহিনীকে খবর আদান প্রদানের জন্য নিয়োগ করবে। তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে। কেননা, নরেন রঘুর আশ্রম থেকে প্রেমদাসকে নিয়ে রেল সেতু, সড়ক ও টেলিগ্রাফ টেলিফোন যোগাযোগ ধ্বংস করে বুড়ো শিবতলার জঙ্গলে ছদ্মবেশে সাময়িক আশ্রয় নেবে। মহারাজ উঠে দাঁড়ান। ঘড়ি দেখে বলেন—চলি। দলের জন্য তোমার কর্তব্যবোধ ও ঐকান্তিক সেবাপরায়ণতার উজ্জ্বল স্মরণীয় দৃষ্টান্ত দেশোদ্ধারকারী বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে! শুভমস্তু, সুখী ভব ॥

—না, না, শত আশীর্বাদ করুন কিন্তু সুখের উল্লেখ কদাপি নয়। সুখের পথ বহু বাধা-বিঘ্ন-সংকুল। সে পথ আমার নয়। মনের কথা—মনের ইচ্ছা—আশা, আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি যদি মুকুরের মধ্যে বাইরে প্রতিফলিত হতো তা হলে আমার মনের এক ভিন্ন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হতো!

—সে কী! দ্বিরুক্তি না করে তিনি গম্ভীর আননে দরজার দিকে পা বাড়ান।

—একটু দাঁড়ান। সুদেষ্ণার আকূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে মহারাজ চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান। ইতিপূর্বে তার এরূপ আর এক অনুরোধের কথা স্মরণ

হতেই তিনি অস্বস্তিবোধ করেন। সুদেষ্ণা এগিয়ে এসে উবু হয়ে প্রণাম করে। কয়েক ফোঁটা অশ্রু মহারাজ-এর পা সিক্ত করতেই সুদেষ্ণার মাথায় হাত রেখে তিনি বলেন—দেশের মুক্তি যুদ্ধ আসন্ন। এখন আমাদের অশ্রুপাতের দিন নয়। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির লীলাভূমি এই ছোট্ট শহরের পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান স্বাধীনতা সূর্যের রক্তরঙিন আলোতে সারা ভারত রঞ্জিত হয়ে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ পরাধীন ভারতের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে। ওঠো জাগো, মনের ক্লেদ গ্লানি ঝেড়ে ফেলে স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে চলো। জয় আমাদের হবেই হবে, নাহি ভয়। মহারাজ আর দাঁড়ান না। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যান।

সুদেষ্ণা তখনো উবু হয়ে বসে আছে। এক অদ্ভুত অবসাদ, শ্রান্তি ক্লান্তি তাকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। তার আপন সত্ত্বা শুষে নিয়ে তাকে রিক্ত ও নিঃস্ব করে ফেলেছে। কিন্তু কেন? এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান দেশের মুক্তি-সাধন তাঁর নিকট নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার কল্পনা বাতুলতা বৈ আর কিছু নয়। অতীতে নানা কাজের ফাঁকে, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে। কখনো তো এমনটি ঘটেনি। তবে কি তাঁর এই আসন্ন যুদ্ধ যাত্রা জয়-যাত্রার পরিবর্তে কাল-যাত্রা, যার থেকে প্রত্যাবর্তন মহাকালের গর্ভে নিহিত এই আশঙ্কা করেই তার এই ঘন ঘন অশ্রুমোচন। এই শুভ বিদায় মুহূর্তে এমন অশুভ অকল্যাণকর চিন্তা তার মনে ঠাঁই পেল কি করে! সে কি এতই ভীরু, ঘৃণ্য অপদার্থ! মনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে সুদেষ্ণা সগর্বে উঠে দাঁড়ায়। মহারাজ-এর শেষ কথা—জয় আমাদের হবেই হবে, নাহি ভয়—ভাবতে ভাবতে সে কুটির ত্যাগ করে।

উত্তেজিত দেবযানী অশুতোষের কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে ছুটতে ছুটতে বড় রাস্তা অবধি এসে থমকে দাঁড়ায়। তারপর সটান বাড়ির দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর 'অসহিষ্ণু' হয়ে আরো জোরে কড়া নাড়তেই ঊর্মিলা দরজা খুলে বলে

—আমি তুলসীমঞ্চে ধূপ ধুনো দিচ্ছিলাম। দেবযানী উর্মিলার কৈফিয়তের কোন জবাব না দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে গম্ভীর মুখে ঘরের দিকে চলে যায়। তুলসীমঞ্চের মিটমিট আলোতে দেবযানীর মুখের বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে উর্মিলাও অধিক কিছু না বলে শুধু—খেতে আয়, ডাক দিয়েই রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

দেবযানী ঘরে এসে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। বর্ত্তমানে তার একমাত্র চিন্তা কি উপায়ে সব দিক সামাল দিয়ে সে ছেলেদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে সামিল হবে। মা রান্না ঘরে তার অপেক্ষায় বসে আছে মনে পড়তেই সে কলতলায় হাত মুখ ধুয়ে ঐ দিকে যেতে যেতে মা কিছু জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে তা একরূপ ঠিক করে ফেলে। যুদ্ধ-যাত্রা সংকল্পে গৃহত্যাগ জনিত মায়ের মনোবেদনা নানা ছলে লঘু করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। কেননা তার আচমকা গৃহত্যাগের বেদনা মাকে পঙ্গু করে ফেলতে পারে। সুদেবকে বুঝিয়ে পড়িয়ে উৎসাহিত এবং মাকে দেখা শোনা সেবা শুশ্রূষার ভার অর্পণ করতে হবে। মামা সবই বোঝেন সুতরাং মামাকে বুঝিয়েপড়িয়ে প্রবোধ দিতে অবশ্যই পারবেন। এখন সব চাইতে জরুরী হলো—কবে কখন কোথায় সংগ্রাম শুরু হচ্ছে তা জানা। রান্নার ঘরে ঢুকে দেখে মা বিরস বদনে গালে হাত দিয়ে নিঃস্ব অসহায়ের মতো বসে আছে। সম্মুখে তার খাবার থালা। তা দেখে কান্নায় দেবযানীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। অতি কষ্টে তা সংবরণ করে বলে—বড্ড দেরী হয়ে গেল! তুমিও তো একবার ডাকতে পারতে মা, বলেই মায়ের কোল ঘেঁষে বসে খাবারে হাত দেয়।

উর্মিলা দেবযানী পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—তোর কি হয়েছে? কয়দিন যাবৎই লক্ষ্য করছি তুই কি যেন ভাবছিস! আজ যে ভাবে মুখ ভার করে ঢুকলি তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে একটা কিছু অবশ্যই ঘটেছে কিংবা ঘটতে চলেছে!

দেবযানীর খাওয়া শেষ হয়েছে। তখনো সে মায়ের দিকে পিঠ রেখেই বসে। তার কথায় দেবযানী উদ্গত অশ্রু রোধ করে তার দুর্ভাবনা হালকা করবার জন্য কণ্ঠে মৃদু-হাসি এনে হালকা সুরে বলে—আচ্ছা মা, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি যাত্রা-কালে তোমার মা আর তুমি কেমন করছিলে। তোমার মনের ভাব কেমন ছিলো?

—এ আবার কি উদ্ভট প্রশ্ন তোর যানী? মেয়ে যখন তখন পরের

ঘরে যেতেই হবে। মা মেয়ে বিয়ে দিয়ে খুশি। কনে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে—সেটা আনন্দ ও খুশির ব্যাপার। তবে হাঁ, বিচ্ছেদ বেদনা—তা তো এড়ানো যায় না। সেজন্য তো কান্না আসে। কাঁদতে কাঁদতে মা ও মেয়ে পরস্পর থেকে অশ্রু জলে বিদায় নেয়।

—হাঁ, সবই বুঝলাম মা। একে আসন্ন পরীক্ষার চিন্তা তার উপর এমন সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তবে তোমাকে না জানিয়ে কিছুই হবে না মা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। কথা শেষে মায়ের দিকে না ফিরেই দেবযানী উদ্গত অশ্রু রোধ করতে করতে তাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

উর্মিলা দেবযানীর চলমান মূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে না যাওয়া অবধি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে মেয়ের মনের কথা আঁচ করে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। ভাবপ্রবণ একগুঁয়ে মেয়ে। ছোট বেলা থেকেই নানা ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়েই তার চরিত্রের এই বিশেষত্ব উর্মিলার পরিচিত। যাই হোক বিষয়টা স্বামীর গোচরে আনা একান্ত প্রয়োজন। শেষে কি করতে না কি করে বসে!

মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আচমকা রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে দেবযানী ঘরে ঢুকে পরিশ্রান্তের মতো একটা চেয়ারে বসে পড়ে। টেবিলের উপর বইগুলির দিকে চেয়ে মনে মনে বলে—না, এবার আর তোদের পড়ে শেষ করতে পারলাম নারে। পড়ার পাট বোধ হয় চিরকালের মতো চুকেই গেল। এক একটা বই তুলে খুলে দেখে তা বন্ধ করে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে আবার যথা স্থানে রেখে দেয়। এভাবেই সব বইগুলি খুলে দেখে গুছিয়ে রাখে। সুদেব ঘরে ঢুকে দিদির গোছানো বইগুলির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—এরই মধ্যে তোমার পড়া হয়ে গেল দিদি?

হাঁ, ভাই। তবে তুমি এমনিতেই রাত্রি করে ফেলেছো। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে এসে পড়তে বসো। মা তোমার জন্য নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে রান্না ঘরে বসে আছে। পরীক্ষার তো আর বেশী দেরী নেই। মনে রেখো পরীক্ষায় তোমাকে প্রথম স্থান অধিকার করতেই হবে। না হলে তোমার সঙ্গে চিরকালের মতো আড়ি হবে।

—না দিদি, না। তারপর কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলে—লক্ষ্মী

দিদি ভাই আড়ি করো না। আমি তোমার কথা মতো ক্লাব ছেড়ে দিয়েছি। এখন একমাত্র মিশনে যাতায়াত করি। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি। এবারে পরীক্ষার ফল দেখেই বুঝবে। এখন তোমাকে একটা জরুরী খবর না জানিয়ে পারছি না।

গলা থেকে হাত খুলে ভাইকে কোলে বসিয়ে বলে—না ভাই, তোমার সঙ্গে কি আড়ি করতে পারি! তবে তোমাকে আমার কথা সব সময় শুনতে হবে। কথা মতো চলতে হবে—বিনা দ্বিধায় তা মানতে হবে। কেমন?

—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই !!

—এখন তোমার জরুরী খবরটা বলে ফেলো।

—সে খবর খুবই সাংঘাতিক দিদি! ক্লাবে না গেলেও ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হলে তাদের মুখ থেকে কাণাঘুষোয় শোনা নানা জব্বর জব্বর খবর শুনি। সব বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু এই মাত্র ফেরার পথে উকিল পাড়ার আমার সহপাঠী টোনা যে খবর দিলো তা খুবই গুরুতর। সে আমাকে দেখে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে—সুদেব খুব সাবধান! তুই বন্ধু বলে তোকে যা বলছি তা কাউকে বলিস নি যেন। তাহলে মহা বিপদে পড়বি। সন্ধ্যেবেলা আমি মায়ের কাছে রান্না ঘরে যাচ্ছি। ডান দিকে মনাদার ঘর। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতর থেকে ফিসফিস্ কথা কানে এলো। কৌতূহল হলো। দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি ব্যাপার এই সময়ে দাদার ঘরে লোক! কি কথা হচ্ছে! বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কান পেতে যতটুকু শুনলাম তা কেবল গোলা বারুদ, বন্দুক, পিস্তল রিভলবার আর মাঝে মাঝে খট্ খট্ আওয়াজ! বুঝি গুলি ছোড়াছুড়ি হচ্ছে! ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠলো! হঠাৎ খুট করে দরজা খোলার শব্দ শুনেই সরে বেড়ার সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি অনুতোষদা। তারপর পচার প্রভাতদা। আর কাউকে ঠাহর করতে পারলাম না। একে একে পর পর জনা ছয়েক বেরিয়ে গেল! —সব শুনে টোনাকে বললাম, আমি তো এসব সাংঘাতিক কথা কাউকে বলবোই না, তুইও কাউকে এমন কি বাবা মাকে পর্যন্ত না, খবরদার! সুদেবের কথা শেষ হতেই দেবযানী বলে—সবই শুনলাম ভাই। মারাত্মক বিপজ্জনক কিছু একটা হয়তো ঘটতে চলেছে। খুব সাবধান, এ সব খবর ঘুণাক্ষরেও কোথাও প্রকাশ

করবে না, এমন কি বাবা মাকেও না। যাও এবার হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে এসে পড়তে বসো।

সুদেব প্রদত্ত খবর তার কাছে নতুন কিছু নয়। কি ঘটতে চলেছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত সে ইতিপূর্বেই পেয়েছে। এখন যেটা তার জানা একান্ত প্রয়োজন, তা হলো কবে কখন কোথা থেকে আক্রমণ শুরু হবে। কিন্তু এসব একান্ত গোপনীয় সংবাদ দলের কর্তা ও অধিকর্তা ছাড়া কাক পক্ষীরও জানার উপায় নেই। আর এসব একান্ত গোপনীয় তথ্য যার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে তাকে চরম দণ্ড অবশ্যই নিতে হবে। সুতরাং সে কি করবে! ভাবতে ভাবতে সে কূল কিনারা পাচ্ছে না। তার বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসে! সে চেয়ার ছেড়ে ছুটে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। সুদেবকে আসতে দেখে পুনরায় ফিরে এসে চেয়ারে বসে পড়ে। সুদেব ঘরে ঢুকে দিদিকে অমনি বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে—পড়ছো না যে?

না ভাই, পড়ায় আদৌ মন বসছে না। তোমার খবরে ভীষণ অশান্তি উদ্বেগ অনুভব করছি। বরং আমি গিয়ে একটু শুই। মা খেতে ডাকলে তুলে দিও। শুয়ে শুয়ে দেবযানী ভেবে দেখলো তার অভীষ্ট পূরণ করতে হলে একমাত্র মহারাজ-এর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য গতি নেই। কিন্তু তিনি যে রূপ কঠোর প্রকৃতির তাতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত অপরাধের শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেবেন না। ফলে তার প্রতিজ্ঞা, আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু পণ্ড হয়ে আকাশ কুসুমে পরিণত হবে! এইভাবে যখন সে নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন হঠাৎ তার দিদির কথা মনে পড়ে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে দিদি—পরে কথা হবে বলে তড়িঘড়ি চলে গেলেন। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন। আসন্ন বিপ্লবের অভ্যুত্থান বিষয়ে নিশ্চয়ই তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল! তা ছাড়া তিনি তখন তাকে কি বলতে চেয়েছিলেন তাও জানা দরকার। সুতরাং আগামীকাল দিদিকে বলে কয়ে, প্রয়োজন হলে তাঁর হাতে পায়ে ধরে আক্রমণ আরম্ভের দিন ক্ষণ জানতে পারবে ভেবে তার মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে।

রান্না ঘরে ঊর্মিলা জড়ের মতো বসে আছে। দেবযানীর কথা শুনে তার সমস্ত শক্তি যেন উবে গেছে। বাইরে থেকে হঠাৎ সুদেবের—

মা খেতে দাও, ডাক শুনে তার সম্বিত ফিরে আসে। সে উঠে দাঁড়িয়ে —আয় বোস. বলে তাকে খেতে দিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়। সুদেব মায়ের গম্ভীর মুখ দেখে খাওয়া শেষে কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি রান্না সেবে স্বামীর সঙ্গে দেবযানীর বিষয়টা আলোচনার জন্য ঊর্মিলা ঘরে আসে। স্বামী বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে কি একটা কাগজ দেখছে। কিছু না বলে ঊর্মিলা চেয়ারে বসে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে থাকে। ঊর্মিলার গম্ভীর বিষাদ-ঘন মুখ দেখে স্বামী বুঝে নিয়েছে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। তবুও ঊর্মিলা কিছু বলে কিনা তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর রমেশ বলে কলতলা থেকে ফেরার পথে ওদের ঘরে একমাত্র সুদেবকে পড়তে দেখে দেবযানীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে, দিদির শরীর ভাল না, শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে আমি আর ঘরে যাইনি। ভাবছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো ওর কি হয়েছে। আমিও সে একই কারণে তোমার সঙ্গে কথা বলবো বলে এসেছি। তারপর দেবযানীর সঙ্গে তার কথোপকথনের আদ্যোপান্ত স্বামীর গোচরে আনে। সব কিছু শুনে সে বলে—এ তো শুধু আভাস—অস্তি নাস্তি, হাঁ না, অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা চলে। এ প্রসঙ্গে দেবযানীর মায়ের কথা মনে পড়তেই সে গম্ভীর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে— বিষয়টা যদিও খুব ভাববার তথাপি বর্তমানে আমাদের করণীয় কিছু আছে কিনা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, যদি না ও নিজের থেকে কিছু বলে। ও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, কাণ্ডজ্ঞানহীন আদৌ নয়। কাজেই ও যে ছিছি করবার মতো কিছু করবে বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে হাঁ, লক্ষ্য রাখা দরকার বলেই সে চুপ হয়ে যায়।

ঊর্মিলা এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে স্বামীর কথা শোনে। কিন্তু তার মন বুঝি তাতে সায় দেয় না। এক মহা অমঙ্গল আশঙ্কায় তার অন্তর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা অব্যক্ত বেদনায় অন্তরটা হু হু করছে, মন গুমরে গুমরে কাঁদছে। ইচ্ছা হলো রান্না ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে কেঁদে কেঁদে মনে ভার লাঘব করে। স্বামীকে কিছু না বলেই ঊর্মিলা উঠে পড়ে। রান্না ঘরে না গিয়ে সে ছেলে মেয়ের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। দুয়ারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কেবল সুদেবকে দেখে—দিদি কোথায় রে, বলেই সে ঘরে প্রবেশ করে। মায়ের গলার আওয়াজ পেয়ে দেবযানীর চোখের জল আর বাঁধ মানে না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বিছানায় উঠে বসে। ঊর্মিলা কাছে

আসতেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নিজের মনের ভার চেপে রেখে বলে—তুমি আবার কেন এলে মা। আমিই তো যাচ্ছিলাম। চলো মা, বলে মায়ের হাত ধরে এগিয়ে সুদেবের কাছে গিয়ে বলে—চলো ভাই, খেতে চলো। ঘর থেকে নেমে মায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে মামার ঘরে ঢুকে দেখে মামা শুয়ে আছেন। তাঁর কপালে হাত দিয়ে তারপর হাত ধরে বলে—চলো মামা, খেতে চলো। আজ আমি সকলকে পরিবেশন করবো তারপর এক সঙ্গে বসে খাবো। বাঃ বাঃ কি মজা হবে, বলে দেবযানী নিজের মনের ব্যথা চেপে কৃত্রিম উৎসাহ প্রকাশ করে।

বিছানা ছেড়ে দরজার ধারে ঊর্মিলা ও সুদেবকে দাঁড়ানো দেখে মামা দেবযানীকে বলে—তোরা এগো আমি আসছি। ঘর থেকে বেরিয়ে দেবযানী সুদেব ও মায়ের হাত ধরে রান্না ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। ঊর্মিলা দেবযানীর এই উৎসাহ কেবল চোখ দিয়ে দেখছে। কিন্তু তার মন বলছে এহ বাহ্য—শুধু লোক দেখানো। ওর মনের সত্যিকার অভিব্যক্তি নয়—একান্তই নিজেকে লুকোবার ছল। শেকল খুলে রান্না ঘরে ঢুকে দেবযানী বলে—দাঁড়াও মা, আসন পেতে দিচ্ছি। প্রথমেই মায়ের আসন পেতে দিয়ে বলে তুমি এখানে বসো। তারপর সুদেবের এবং মামার আসন পেতে সব শেষে নিজের আসন খানা মায়ের বাঁয়ে রাখে। মায়ের মতো সুদেবও দিদির কাণ্ডকারখানা নিঃশব্দে দেখে, কিছু বলে না। অতঃপর দেবযানী থালা বাসন গ্লাস ধুয়ে এক গ্লাশ করে জল গড়িয়ে প্রত্যেকের সামনে রাখে। মামা ঘরে ঢুকে হাঁক দেয়—কৈ রে যানী খেতে দে, দেখি কেমন রান্না করেছিস। উত্তরে দেবযানী বলে—এ তুমি কি বলছো মামা? রান্না তো করেছে মা, আমি শুধু মায়ের হয়ে পরিবেশন করছি। তবে হ্যাঁ, কাল আমি নিজে রান্নাবান্না করে সকলে খাইয়েদাইয়ে নিজে খেয়ে কলেজ যাবো। রান্না করে করে মায়ের শরীর কালি হয়ে গেল। কদ্দিন বলেছি মা এখন তো আমি রোজগার করছি। একটা রান্নার লোক রাখো। না তা নয়, দেখি আর ক'দ্দিন। তারপর লেখাপড়া ছেড়ে আমিই রান্নার হাল ধরবো। রান্না ঘরে আর ঢুকতেই দেবো না—দেখো। বলতে বলতে দেবযানীর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। দেখে সকলে অবাক। সুদেব উঠে দিদির হাত ধরে বলে—এ কি দিদি, তুমি কাঁদছো। দেবযানী ঈষৎ হেসে বলে—নারে না, এ আমার কান্না নয়, আনন্দের অশ্রু। মা আমাকে আজ বিনা প্রতিবাদে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করতে দিয়েছে।

দেবযানী সবার সম্মুখে পরিমাণ মতো খাবার দিয়ে বলে—তোমরা খেতে আরম্ভ করো আমি কলতলা থেকে চোখ মুখ ধুয়ে আসছি। মামা বলে—মারে তা হবে না। তুই তো বলেছিলি সবাই এক সঙ্গে বসে খাবো। যা চট্ করে চোখ মুখ ধুয়ে আয়। কথা না বাড়িয়ে দেবযানী তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কলতলার দিকে যায়। সে নিরুপায়! একদিকে তার আত্মপরিজন—মা, মামা, ভাই আর, আর একদিকে তার জীবনমরণের সাথী যার সঙ্গে সে গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং যে দেশোদ্ধার কল্পে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। না, সে আর ভাবতে পারছে না। কোন রকমে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রান্না ঘরে ফিরে খেতে বসে। এতক্ষণ সকলেই হাত গুটিয়ে ছিলো। দেবযানী আসনে বসতেই সকলে থালায় হাত দেয়। ঊর্মিলা একপলক দেবযানীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে। কারো মুখে কোন কথা নেই। খাওয়ার শব্দ ব্যতীত কোন শব্দ নেই। মায়ের পাশে দেবযানী কথা বলা দূরে থাক তার মুখের দিকে পর্যন্ত চাইতে পারছে না। রান্না ঘরে ঢুকে ঊর্মিলা এখন অবধি একটি কথাও বলেনি—গভীর গম্ভীর আনন! যে সুদেব খেতে বসে বকর বকর করে সকলের কান ঝালাপালা করে সেও কিছু বলতে গিয়ে সকলের মুখ দেখে বিরস মুখে চুপ হয়ে যায়। এই অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটাবার জন্যই বুঝি মামা হঠাৎ প্রশ্ন করে—হারে, তোদের পরীক্ষা তো এসেগেল। পড়াশোনা কেমন হলো? সুদেবই প্রথমে জবাব দেয়—পড়া ভালই তৈরি হচ্ছে। এটা বলতে পেরে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শান্তি পায়। সুদেব চুপ করতেই দেবযানী বলে—পড়াশুনা একরকম হয়েছে। ফেলের প্রশ্নই ওঠে না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মামা।

খাওয়া শেষ হতেই ঊর্মিলা উঠে প্রথমেই স্বামীর এঁটো থালার দিকে হাত বাড়াতেই দেবযানী নিষেধ করে বলে—না মা, আমিই রান্না ঘরের সব কাজ সেরে তালা দিয়ে আসবো। কিচ্ছু ভেবো না। তুমি মুখ ধুয়ে ঘরে যাও। ঊর্মিলা বেদনা-ভরা করুণ দৃষ্টিতে দেবযানীকে দেখে বেরিয়ে যায়। মামা যাবার সময় বলে—বেশী দেরি করিস নি। বাবা মা চলে যেতেই সুদেব বলে—আমি থাকি দিদি? দেবযানী কাজ করতে করতে ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলে—না ভাই, তুমি থেকে কি করবে? যাও,

গিয়ে পড়তে বসো। আমি কাজ সেরে এক্ষুণি আসছি। সুদেব আর কথা না বাড়িয়ে বেজার মুখে বেরিয়ে যায়।

রান্না ঘরের কাজ সেরে দেবযানী তালা দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। অন্ধকার রাত্রি। জোনাকিরা সারা উঠোনময় নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছপালাগুলি কালো ছায়া ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এখানের সব কিছুই যেন আপনজনের মতো তাকে ঘিরে রেখেছে। এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালিকাকে মামা মামী অকৃত্রিম স্নেহে লালন পালন করেছে। ভাই সুদেব দিদি বলতে অজ্ঞান। এদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। আজ রাত্রিই হয়তো তার এই গৃহের শেষ রাত্রি। বুক-ভরা ব্যথায় হৃদয় টন টন করছে। দেবযানী ধীরে ধীরে তুলসী মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলে। কাছে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে বলে—ঠাকুর আমি চলে যাচ্ছি। মা, ভাই, মামা রইলো। এদের রক্ষণাবেক্ষণ করো। দেখো কোন অমঙ্গল অকল্যাণ যেন এদের না হয়, বলে সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর চোখ মুছে ঘরের দিকে এগোয়। এদিকে উর্মিলা, দেবযানী তখনো রান্নাঘর থেকে ফেরেনি দেখে অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেবযানী দাওয়ায় উঠে আসতেই বলে—বড্ড দেরী হলো যে?

—হাঁ মা, সব কাজ কর্ম সেরে এলাম তো, বলেই সে আর সেখানে দাঁড়ায় না। এসে নিজের ঘরে ঢোকে। সুদেব তখনো পড়ছে দেখে পা টিপে টিপে চলে একেবারে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। দিদিকে টেবিলের ধারে না দেখে সুদেব ডেকে বলে—পড়বে না দিদি?

—না ভাই, শরীরটা ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে। মনটাও ভালো নয়। পড়তে আদৌ মন বসছে না। তোমার পড়া হলে ডেকো। তোমাকে ঘুমপাড়িয়ে আমি শোবো। দিদি ঘুমপাড়িয়ে দেবে শুনে সুদেব উৎফুল্ল চিত্তে পড়ায় মন দেয়। দেবযানী শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে। সে ভাবনার বুঝি আর অন্ত নেই। কিভাবে দলের একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নেবে এবং অনুতোষের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করবে। এর জন্য দলের বিধান অনুযায়ী যে শাস্তিই হোক সে মাথা পেতে নেবে—এমন কি মৃত্যু দণ্ডও। সুতরাং কবে কখন কোথায় বিপ্লবীদের আক্রমণ শুরু হবে তা জানাটাই এই মুহূর্তে একান্ত জরুরী। নচেৎ কিছু হবে না। তার সকল কামনা

বাসনা সংকল্প একেবারে বিফলে যাবে। এইসব নানা চিন্তার মাঝখানে সুদেব ডেকে বলে—আমি শুতে যাচ্ছি দিদি। দেবযানী উঠে এসে ভাইয়ের বিছানায় বসে। তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অতীত স্মৃতি ছায়া ছবির মতো তার চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে। সুদেব মায়ের কোলে আসার পর একটু বড় হতেই তাকে নিয়ে সে এক বিছানায় শোয়। ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে তার গায়ে আলতো হাত না রাখলে তার ঘুম হতো না। এই সব ভাবতে ভাবতে তার কপোল বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সুদেব দিদির কোল ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দেবযানী চোখের জল নিয়েই বিছানায় এসে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরে দেরিতেই দেবযানীর ঘুম ভাঙ্গে। যুদ্ধ বিগ্রহ, কান্নাকাটি ইত্যাদি বিচিত্র স্বপ্নের মধ্যে তার রাত কাটে। ঘুম ভাঙতেই কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে। মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়ে সারা দিনের কার্যাবলীর একটা ছক কাটে। কঠিন দৃঢ়চিত্তে তাকে এখন থেকে এগোতে হবে। একটুও দুর্বল হলে চলবে না। কান্নাকাটি তো কিছুতেই নয়—অনেক কেঁদেছে আরও কত কাঁদতে হবে ভবিষ্যতের গর্ভেই তা নিহিত। সে উঠে পড়ে। সুদেবকে ডেকে দিয়ে কলতলা থেকে একেবারে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির। মাকে দেখে বলে—তুমি যাও মা। আমাকে সব কিছু করতে দাও। দেবযানীর কণ্ঠস্বরে উর্মিলা বিস্মিত। তবু বলে—কি পাগলামী করছিস যানী? তুই কি পারবি?

—কেন পারবো না? দেখো, পারি কিনা। দেবযানীর কথার ঢং-এ উর্মিলা বুঝলো বাধা দেওয়া বৃথা। সুতরাং—সাবধানে রান্নাবান্না করিস। হাত পা পোড়াস না, হুঁশিয়ারী দিয়ে উর্মিলা ঘর ছাড়ে। ঝি এসে উনোনে আঁচ দিয়ে, ঘর নিকিয়ে থালা বাসন নিয়ে কলতলা চলে যায়। উনোনে আঁচ উঠতেই দেবযানী সেটা ঘরে নিয়ে আসে। সকাল বেলা মা কি খেতে দেয় তা মনে করে লুচি ও বেগুন ভেজে মা ও সুদেবকে খেতে ডাকে। তারপর চাল ধুয়ে ভাত বসিয়ে দেয়। মা ও সুদেব রান্না ঘরে আসতেই দু'খানা রেকাবিতে খাবার রেখে এগিয়ে দেয়। উর্মিলা বলে আমি তো এত সকালে খাইনা। তোর মামা খেয়ে আপিসে গেলে পর চান টান করে কিছু মুখে দিই।

—তা না হলে চেহারার এমন শ্রী আর শরীর কাঠি কাঠি হবে কেন? আয়রে সুদেব আমরা একসঙ্গে খাই। ঊর্মিলা খুশি মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাই বোনের খাওয়া দেখে। ওদিকে ভাতের হাঁড়ি টগবগ করতেই ঊর্মিলা ঢাকনা তুলতে এগিয়ে যায়। দেবযানী হা হা করে ওঠে—তুমি হাত দেবে না, সর। দেবযানী হাতা নিয়ে ঢাকনা তুলে হাঁড়ির ভেতরটা ঘেঁাটে এবং ভাত তুলে দেখে সেদ্ধ হয়েছে কিনা। মামা বাজার নিয়ে এসেছে। থলেটা মাটিতে রেখে বলে আজ তুই রাঁধবি সেজন্য কাটা মাছ এনেছি। আর তরিতরকারিও এমন এনেছি যা বেশী কাটা-ছেঁড়া করতে হবে না। ঊর্মিলা এগিয়ে ব্যাগটায় হাত দিতেই দেবযানী বাধা দেয়—আবার তুমি হাত দিচ্ছ মা? মামা তা দেখে হেসে বলে—না, না, ওটা ঠিক নয়, বলেই তিনি চলে যান। কিন্তু কি ঠিক নয় তা তার কথা থেকে বোঝা গেল না। খাওয়া শেষ হতেই সুদেব উঠে পড়ে। ঊর্মিলাও তার সঙ্গে ঘর ছাড়ে।

দেবযানী ভাত নামিয়ে, ডাল চাপিয়ে, মাছ ধুয়ে তরকারি কেটে সব তৈরি করে রাখে। তারপর একে একে রান্না শেষ করে। মামা এসে বলেন—যানী খেতে দে, দেখি কেমন রান্না করলি! দেবযানী মামাকে আসন পেতে জল গড়িযে ভাত বেড়ে এনে তার সম্মুখে রাখে। মামীও এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। মামা খেতে খেতে বলেন—রান্না সত্যি ভাল হয়েছে রে, তুই রান্নায়ও পাশ করলি। মামার কথা শুনে দেবযানী হেসে বলে—তোমাকে, মা ও সুদেবকে একদিন রান্না করে খাওয়াবো—আমার বড্ড সাধ ছিল। তা আজ মিটলো। আমি তৃপ্ত, আনন্দিত। মা তুমি এসো। মামার আব কি লাগবে দিও। আমি চললুম—আমার কলেজ আছে।

দেবযানী চলে যেতেই স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে—সত্যিই ভালো রেঁধেছে। মেয়েটা একেবারে চৌকোষ। যখন যা ওর মন চায় তাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, বুঝলে।

—আর এই জন্তই তো আমার ভয়। যখন যা মর্জি হলো তা করে কখন যে কি সর্বনাশ ডেকে আনবে! সে ভয়ে সর্বদা আমার বুক কাঁপে!

—না, না ঊর্মি, ও অন্যায় কিছু করবে না, করতে পারে না। এ বিশ্বাস আমার আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

স্বামীর আশ্বাসে ঊর্মিলার মন সায় দেয় না। মনে হয় শুধু স্তোক

বাক্য। হালফিল দেবযানীর কথাবার্তা আচার আচরণ ও এক-গুয়েমি খেয়াল খুশির মধ্যে সে বুঝি এক মহা অনর্থপাতের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছে! ফলে দেবযানী চোখের আড়াল হলেই—এই বুঝি কিছু অঘটন ঘটলো ভেবে ভয়ে উর্মিলা শিউরে ওঠে। না, সে আর ভাবতে পারছে না। নির্জীবের মতো রান্না ঘরে বসে থাকে। হঠাৎ বাইরে থেকে—মা, খেতে দাও, হাঁক শুনে উর্মিলা মনের উন্মনা ভাব ও জড়তা ঝেড়ে ফেলে ছেলে মেয়েকে খাবার দিতে ব্যস্ত হয়। খেতে খেতে দেবযানী সুদেবকে জিজ্ঞাসা করে রান্নাটা কেমন লাগছে? সুদেব হেসে বলে, তুমি যা করো দিদি তা কি কখনো ভালো ছাড়া খারাপ হয়? সুদেবের কথায় দেবযানী কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। তার কথার উত্তর এড়িয়ে মায়ের দিকে চেয়ে কণ্ঠে যথাসম্ভব স্বাভাবিকত্ব এনে বলে—মা, আমার আজ ফিরতে একটু দেরী হবে। তুমি কিচ্ছু ভেবোনা। সুদেব সকালেই ফিরবে। দেবযানীর কথা শুনে উর্মিলার মুখ ঘন মেঘের মতো কালো হয়ে যায়। মুখে কোন কথা সরে না। খাওয়া শেষে ভাই বোন চলে যায়। আর একটা অজানা ভয় ও আতঙ্কে উর্মিলার শরীর যেন হিম হয়ে যায়!

বিপ্লবীদের রণসজ্জা প্রায় সম্পূর্ণ। আক্রমণের আর তিন রাত্রি মাত্র বাকী। আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সভ্যদের ইতিপূর্বেই প্লাটুন ভিত্তিক ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু প্লাটুন অধিনায়কগণ কিভাবে অভিযানের লক্ষ্যস্থল নির্ভুল ও সার্থকভাবে আক্রমণ চালিয়ে দখল করা যায় স্বদলে তার শেষ মোহড়া দিচ্ছে। অনুতোষ তার সহযোগী দেবেশকে নিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মোহড়ার জন্য সনকা দীঘির অদূরে পর্তুগীজদের পরিত্যক্ত ভগ্ন পুরণো কেল্লা ও বাতিঘর বেছে নিয়েছে। মোহড়ার দিন ক্ষণ ঠিক করে অনুতোষ সভ্যদের একে একে নদী পেরিয়ে সনকা দীঘির ধারে সমবেত হতে বলে। পল্টনের সেনারা একত্র হতেই অনুতোষ তাদের অস্ত্রাগারের অবস্থান এবং তার পাহারাদার ফৌজ কোথায় কোথায় মোতায়েন থাকে এবং কি ভাবে টহল দেয়, তাদের আড্ডাঘর কোনখানে, অস্ত্রাগারের দরজা কি রকম এবং কিসের তৈরি, কিভাবে কিদিয়ে ঐ দরজা ভাঙতে হবে তাও

বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেয়। সন্ধ্যানাগাদ দল দু'ভাগ হয়ে যায়। কয়েকজনকে নকল অস্ত্রাগার রক্ষী ও প্রহরী রূপে যথা স্থানে মোতায়েন করা হয়। কয়েকজন অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখলের ভূমিকা নিয়ে তৈরি হয়। সংকেত দেওয়ার সঙ্গেই শুরু হয় নকল যুদ্ধ—আক্রমণ ও প্রতিরোধ। অবশেষে আক্রমণকারীরা প্রতিরোধ বাহিনীকে কাবু করে অস্ত্রাগার (কেল্লার ঢুকবার পথ) দখলের পরে যুদ্ধের মোহড়ার পরিসমাপ্তি হয়।

ভগ্ন কেল্লা থেকে সকলে নেমে এসে জড় হয়েছে। অন্ধকার রাত্রি। চতুর্দিকে গাছপালা তাকে আরো ঘনীভূত করেছে। দলের সকলের মুখ চেনা দায়। অগত্যা অনুতোষ একে একে সকলকে নাম ধরে ডাকে। নিবারণ ছাড়া সকলেই সাড়া দেয়। অনুতোষ শঙ্কিত—নিবারণ কোথায়! এ জিজ্ঞাসা তার মন তোলপাড় করছে। তবে কি সে পুলিশের চর! সকলকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশকে খবর দিতে আগে থেকেই ভেগেছে! তাও বা কি ভাবে সম্ভব! তাকে সে এতদিন ধরে চেনে, জানে। তবে কি অন্য কিছু! সে মহা চিন্তিত। এমনও তো হতে পারে ঝাড় জঙ্গলে অতর্কিতে তাকে সাপে কেটেছে! রাত্রি বেড়ে চলেছে। জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নদী পার হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সকলকে আটকে রাখা ঠিক নয়। একমাত্র সুধীরকে রেখে অনুতোষ অন্যদের দেবেশের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেয়।

ওরা চলে যেতেই অনুতোষ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনুসন্ধানের পন্থা ঠিক করে। গাছের দুটো ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে সুধীরকে নিয়ে কেল্লার দিকে এগোয়। ভেতরে ঢোকার মুখে নিবারণকে কোথায় মোতায়েন করা হয়েছিল তা স্মরণ করে অদূরে বুরুজের দিকে টর্চ ফেলে দেখে। সেখানে কেউ নেই। তারপর ভেতরে ঢুকে অতি সাবধানে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে বুরুজে এসে দাঁড়ায়। নিবারণ বুরুজের যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল তা অনুমান করে সেখানে এসে দেখে কতকটা জায়গা ধ্বসে গেছে। সর্বনাশ তবে কি নিবারণ ধ্বসের সঙ্গে নিচে পড়ে গেছে! এখন উপায়! যে ভাবেই হোক তাকে তো উদ্ধার করতেই হবে। সুধীরকে কাছে ডেকে এখানে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নিচে টর্চের আলো ফেলতে বলে অনুতোষ নেমে যায়। কিন্তু টর্চের আলোতে দৃষ্টি রেখে ঐ দিকে কি ভাবে এগোবে? জায়গাটা গাছপালা ঝোপঝাড় নিয়ে গভীর ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। তার মাঝ দিয়ে এই ঘনঘোর অন্ধকারে দিক ঠিক রেখে এগোনো

এক মহা সমস্যা। অনুতোষ সরাসরি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে না গিয়ে কেল্লার ধার ধরে চলতে থাকে। লাঠি ঠকঠক করে গাছপালা ভেঙে ঝোপঝাড় এড়িয়ে এঁকে বেঁকে টর্চ-এর আলো লক্ষ্য করে সে এগিয়ে যেতে যেতে দেখে টর্চ-এর আলো অদূরে একটা বড় গাছের উপর পড়েছে। নিজের টর্চ-এর আলো ঐ দিকে ফেলতেই কতগুলি জন্তুর ছুটে পালাবার শব্দ তার কানে আসতেই সে চমকে ওঠে। ব্যাপার কী? হঠাৎ এক সাথে এতগুলি জন্তুর ছুটাছুটি? তবে কি নিবারণ ঐখানে পড়ে আছে আর জন্তুগুলি তাকে একসঙ্গে আক্রমণ করবার উপক্রম করছে! অনুতোষ আর স্থির থাকতে পারে না। সে টর্চ-এর আলোতে গাছটা নিশানা করে জোরে ঠক ঠক করে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দ্রুত এগোতে থাকে। গাছের কাছে এসে দেখে তলাটা ফাঁকা—তার চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল। নিবারণ কি তা হলে ওর ভেতরেই কোথাও পড়ে আছে। ওপর থেকে সুধীর তখনও টর্চ-এর আলো দেখাচ্ছে। ঐ আলোতে অনুতোষ দেখে কেল্লার দিকে গাছের একটা ভাঙা ডাল ঝুলছে। নিবারণ কি তবে ধসকানো বুরুজ থেকে ঐ ডালটার ওপর পড়ে ধাক্কা খেয়ে নিচের জঙ্গলে পড়েছে? এই অনুমান করে জঙ্গলের ঐ দিকে এগোয়। যেতে যেতে ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে যায় যদি আশপাশ থেকে কোন গোঙানি শুনতে পায়। আরো খানিক যেতেই মনে হলো ডান দিক থেকে ক্ষীণ গোঙনি তার কানে এলো! ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকের জঙ্গলে টর্চ-এর আলো ফেলতেই শাদা মত কি একটা দেখতে পায়। কাছে গিয়ে দেখে নিবারণ কাত হয়ে পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ উপরের দিকে পর পর দু'বার টর্চের আলো জ্বেলে সুধীরকে নেমে আসার সংকেত জানিয়ে বাঁ কাঁধের ঝোলাটা ডান কাঁধে নিয়ে নিবারণকে বাঁ কাঁধে তুলে নেয়। তারপর অতি সাবধানে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে লাঠি ঠুকেঠুকে কেল্লার সামনের খোলা জায়গাটুকুতে এসে দাঁড়ায়। সেখানে নিবারণকে নামিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। টর্চ জ্বেলে প্রথমে মাথাটা ভাল করে পরীক্ষা করে। মাথার পেছনে কানের নিচে ঘাড়ের অনেকটা জায়গা ছড়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে মাথার পেছনটা মোটা ডালটার ওপর পড়ে প্রচণ্ড চোট খেয়ে ছিটকে নিচে পড়েছে এবং তাতেই জ্ঞান হারিয়েছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ঠিক আছে, গোঙানিও আগের চাইতে বেড়েছে। হাত পায়ের আঙুল এবং শরীরের অন্যান্য জায়গা অক্ষত আছে। জন্তুগুলি কামড়ানোর ফুরসত পায়নি।

ব্যাগ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধপত্র বের করে শরীরের যে সব জায়গা ছড়ে, কেটে গেছে কিংবা ক্ষত হয়েছে তা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। সুধীর আসতেই তার সাহায্যে নিবারণের মাথাটা একটু তুলে ধরে কয়েক ফোঁটা কোরামিন তার মুখে ঢেলে দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে ধরে রাখে। যখন বোঝা গেল ওষুধ গিলেছে তখন মাথাটা একটু নামিয়ে ধরে তালুতে হাতটা আস্তে আস্তে বুলোতে এবং মৃদু আঘাত করতে থাকে।

এভাবেই নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিবারণের জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তাকে নিয়ে এখন তো শহরে ফেরা যাবে না। সে অত্যন্ত দুর্বল—হাঁটা চলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। অনুতোষ আকাশের দিকে চায়। রাত্রি অনুমান দ্বিপ্রহর। ভোরের দিকে জোয়ার না আসা অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। মাঝিকে অবশ্যই অপেক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। এই পরিস্থিতিতে এখনেই রাত্রি যাপন করতে হবে। নিবারণকে একটা ঘুমের টেবলেট খাইয়ে অনুতোষ সুধীরকে ঘুমোতে বলে। সুধীর প্রতিবাদ করে—না না, আপনিই শুয়ে বিশ্রাম করুন—অনেক পরিশ্রান্ত আপনি। আমি পাহারায় থাকি।

—না, না তুমি পাহারায় থেকে সব দিক সামাল দিতে পারবে না সুধীর। এই বিস্তৃত পরিত্যক্ত অঞ্চলটা হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও সাপ-খোপে ভর্তি। আমি ঠিক সময়ে না পৌঁছলে অচৈতন্য নিবারণকে জন্তুগুলি কামড়ে খুব্‌লে শেষ করে দিতো না। চিন্তা কর কি বীভৎস মর্মান্তিক ঘটনাই না ঘটতো। জন্তুগুলি সবে জড়ো হয়েছিল। আমার লাঠির আওয়াজ ও টর্চ-এর আলো পড়তেই সব পালায়। তাছাড়া এখানের ওপর পুলিশেরও নেক নজর আছে। একটু অপেক্ষা কর। আমি কাছেপিঠে থেকে কিছু শুকনো কাঠ খড় লতাপাতা যোগাড় করে আনি। প্রয়োজন হলে জন্তু তাড়াবার জন্য আগুন জ্বালতে হবে। চতুর্দিকে নজর রেখে পাহারা দিও। যাবার আগে অনুতোষ নিবারণের নিশ্বাস প্রশ্বাস, বুকের স্পন্দন বুঝবার জন্য কান পেতে পরীক্ষা করে। মনে হলো ভালো ঘুম হলে সুস্থ হবে এবং হাঁটা চলা করতে পারবে।

চলতে গিয়ে অনুতোষ চিন্তিত—পর্তুগীজ পরিত্যক্ত এই কেল্লার বাতিঘর, সুড়ঙ্গ ইত্যাদি নানা স্থানে কার্যোপলক্ষে তার যাতায়াত আছে কিন্তু নিশিথে এরূপ আটকে থাকবার মতো অবস্থা ইতিপূর্বে কখনো

হয় নি। এখান সম্পর্কে অনেক কিছুই সে শুনেছে—নদী নালায় পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌকো লুট করে ডাকাতরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসে থানা গাড়ে। তাছাড়া বন্য হিংস্র শ্বাপদ—শেয়াল, হায়না বাঘ, ভালুক ইত্যাদির সঙ্গে প্রচণ্ড বিষাক্ত সাপেরও উপদ্রব আছে। সুতরাং সুধীরকে পুনরায় হুঁশিয়ার করে এবং ঘুমন্ত নিবারণের চারদিক ঘুরে লাঠি ঠক ঠক করে পাহারা দিতে বলে। অন্ধকারে দূরে কিংবা নিকটে বেড়ালের মতো উজ্জ্বল জ্বলন্ত চোখ দেখলেই মুহূর্ত দেরী না করে টর্চের আলো ফেলবে আর লাঠি ঠকঠকানি জোরদার করবে। তবে জানোয়ারটা যদি ভল্লুক হয় তবেই চিত্তির। মুখে তা না বলে বিষয়টার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুতোষ কাছেপিঠে থেকে কাঠখড় কুড়োবার মনস্থ করে। কাঠখড় কুড়নো হতে সেগুলিকে লতা দিয়ে বেঁধে অনুতোষ চলতে থাকে। কিছু দূর যেতেই হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে বোঝাটা ফেলে সে সুধীর ও নিবারণ যেখানটায় আছে সেদিকে দৌড়তে থাকে। চিৎকার ঐ দিক থেকেই আসছে। দৌড়তে দৌড়তে অনুতোষ সম্মুখে টর্চ-এর আলো ফেলেই হতভম্ব! প্রকাণ্ড কুকুরের মতো লোমশ একটা জন্তু হেলে দুলে দ্রুততালে চলেছে। শংকিত হলেও জন্তুটা কি তা বুঝে উপস্থিত বুদ্ধি মতো অনুতোষ ছোরা ও রিভলবার ঠিক করে জোরে হাঁক পাড়ে—ভয় পেয়ো না সুধীর, আমি ওটার পেছনে আছি। তুমি ওর মুখের দিকে তাক করে টর্চ-এর আলো ফেলো। আলো দেখে জন্তুটা থমকে দাঁড়ায়। এই ফাঁকে অনুতোষ পাশ থেকে জন্তুটার মুখে জোর লাঠির খোঁচা মারে। ওটা তখন পাশ ফিরে সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে অনুতোষকে আক্রমণে উদ্যত হতেই অনুতোষ দ্রুত পেছনে হটে ওর চোখের উপর টর্চের আলো ফেলে। চোখে ধাঁধা লেগে ভালুকটা না নড়েচড়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মুহূর্তের মধ্যেই অনুতোষ ছোরাটা ভালুকটার বুক তাক করে সজোরে ছুঁড়ে মারে। টর্চ-এর আলোতে দেখা যাচ্ছে ছোরাটা ভালুকটার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়েছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ক্রোধোন্মত্ত জানোয়ারটা ঐ অবস্থাতেই আক্রমণ করবার জন্য তেড়ে আসে। অনুতোষ রিভলবারটা তাক করে দ্রুত পেছনে হটে। কিছুদূর এসেই জানোয়ারটা আর এগোতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে ধপাস করে মাটিতে পরে কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করে থেমে যায়—আর ওঠে না। দূর থেকে

টর্চ-এর আলোতে অনুতোষের এই অসীম সাহসিক কাণ্ড দেখে সুধীর থ হয়ে থাকে, তার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

জানোয়ারটা আর উঠছে না দেখে অনুতোষ কাছে আসে। লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে দেখে। না, আর নড়েচড়ে না—সাড়াও নেই। কাত হয়ে পড়ে আছে। ধূসর রোমশ শরীরের অনেক জায়গা রক্তে রাঙা। জামা কাপড়ে রক্ত এড়িয়ে কিভাবে ছোরাটা বুক থেকে বার করা যায়? টর্চ জ্বেলে দেখে পেছনের দিকে ঘাসের উপর রক্ত সামান্য। প্রথমে লাঠি দিয়ে ওটাকে ঠেলে চিৎ করে। তারপর হাতে তুলো নিয়ে ছোরার বাটটা ধরে একটা হেঁচকা টানে তুলে এনে সেটা ঘাসে মুছে, স্পিরিটে তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করে খাপে রেখে অনুতোষ উঠে দাঁড়ায়।

গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনী। মাঝে মাঝে নাম না-জানা পোকার গুঞ্জন, পাখীর ডাক, জানোয়ারের হুঙ্কার আর দূরে কালিদহের গর্জন ভিন্ন আর কিছু শ্রুতি-গোচর নয়। এই মাত্র মানুষ ও জানোয়ারে মধ্যে যে খণ্ড যুদ্ধ হলো তার সঙ্গে প্রকৃতির এই ভয়াল পরিবেশের যেন মিল রয়েছে। রাত্রি নিরূপণের জন্য অনুতোষ উর্ধ্বপানে চায়। অনুমান করে রাত্রির শেষ যাম আসন্ন। এমনি সময় কেল্লার দিক থেকে অস্বাভাবিক ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ কানে আসে। সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হলো একসঙ্গে কতগুলি জন্তু যেন হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে। ঐগুলি যদি এই মৃত জানোয়ারটার সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী হয় এবং খুঁজতে খুঁজতে এখানে হাজির হয় তা হলে যে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা এক অসুস্থ রোগীকে নিয়ে সামাল দেওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতোষ হাঁক দেয়—সুধীর তৈরি হও, আমাদের এখনই চলে যেতে হবে। জড় করা কাঠখড় গুলিতে আগুন লাগিয়ে সে দৌড়ে এসে নিবারণকে কাঁধে তুলে নিয়ে জংগলের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে এগোয়। চলতে চলতে সুধীরকে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পেছনের জংগলটা দেখতে বলে। হঠাৎ একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই নিবারণ চিৎকার দিয়ে ছটফট করতে থাকে। অনুতোষ বিমূঢ়। এত সতর্ক হয়ে চলা সত্ত্বেও কিভাবে যে ধাক্কা লাগলো! আঘাত নিশ্চয়ই গুরুতর নচেৎ এত ছটফট করছে কেন। অনুতোষ তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে শোয়াতে গেলে সে না শুয়ে বসে পড়ে। অনুতোষ টর্চ জ্বেলে

দেখে নিবারণ চোখ মেলে চাইছে। বুঝলো তার জ্ঞান ফিরছে। স্মৃতি-শক্তিতে আলোড়ন চলছে। পরিবেশটা বুঝবার চেষ্টা করছে। অনুতোষ টর্চ নিবিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করছে নিবারণ নিজ থেকে কিছু বলে কিনা। কিছু সময় পরেই নিবারণ হঠাৎ উঃ মাগো, আমি কোথায় বলেই শুয়ে পড়ে। আর্তের সেবায় অভিজ্ঞ অনুতোষ বুঝলো উত্তেজক কিছু দিয়ে ওর জড়তা কাটিয়ে শরীরকে চাঙা করে কথা বলে বলে ওর স্মরণ শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। ফার্স্ট-এইড বাক্স থেকে একটা শিশি খুলে কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি গ্লাশে নিয়ে জল মিশিয়ে ডাকে—নিবারণ, নিবারণ। কোন সাড়া নেই। অনুতোষ তখন নিবারণের ঘাড়ে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু জোরে ডাকতেই সে সাড়া দেয়। তারপর তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে—হাঁ করো, বলতেই সে হাঁ করে। গ্লাশের ব্র্যাণ্ডিটুকু তৎক্ষণাৎ তার মুখে ঢেলে দেয়। ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিবারণ আবার শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুতোষ আবার তাকে ডাকে—উঠে বোসো। নিবারণ উঠে বসতেই বলে—আমার হাত ধরে দাঁড়াও। এবার হাঁটো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর নিবারণ শ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাত ধরে টান দিয়ে অনুতোষ তাকে বলে—না, না, আমাদের দাঁড়ানো চলবে না ভাই। যুদ্ধের মোহড়া দিতে এসে আটকে পড়েছি। রাত্রি থাকতে থাকতেই আমদের ফিরতে হবে। এভাবেই হাঁটার সঙ্গে বিশ্রাম ও কথা বলে বলে অনুতোষ নিবারণের স্মৃতি শক্তি উজ্জীবিত করে বনের উপান্তে এসে থামে। নিবারণ এখন অনেক সুস্থ। আরো কিছুদূর চলে একেবারে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। পুব গগনে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরি নেই। নদীতে জোয়ারের খরস্রোত বয়ে চলেছে—এ-কূল ডুবু ডুবু। অপেক্ষমান নৌকোতে উঠে পরপারে একটা ভাঙা জেটিতে নেমে তারা গা ঢাকা দেয়।



কলেজের শেষের একটা ক্লাশ কামাই করে দেবযানী আশ্রমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। দিদিকে আজ যে ভাবেই হোক ধরতে হবে। রাস্তা ছেড়ে সোজা মাঠের মধ্য দিয়ে দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ায়। উভয় তীরে সাঁতারুদের ভিড় তখনও কমেনি। দিদি সেখানে নেই। অতঃপর সে মেয়েদের ব্যায়াম ঘরের দিকে যায়। সেখানেও তিনি নেই। তাকে দেখে সুলতা ছোরা খেলার জন্য ডাক দেয়।—না ভাই, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, তার উপর বড্ড তাড়া আছে। হাঁরে দিদি এসেছিলেন ?—হাঁ, তিনি কিছুক্ষণ থেকে সব দেখে শুনে একটু আগেই চলে গেছেন ; কিছু না বলে দেবযানী বেরিয়ে যায়। চলতে চলতে কেবল ভাবছে কোথায় দিদিকে পাবে! ছেলেদের ব্যায়াম ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো ভেতরে থেকে যেন আগের মতো শরীর চর্চার হুমহাম দুপদাপ আওয়াজ আসছে না। ছোরা লাঠি খেলার জায়গায়ও ছেলেদের সেরকম ভিড় নেই। পরিবেশটা কেমন যেন ছাড়াছাড়া, ফাঁকা-ফাঁকা, থমথমে! আবার ভাবে সত্যি কি তাই! না তার মনের অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিফলন! কি জানি! কিন্তু দিদিকে যখন এ দু'জায়গায় পাওয়া গেল না তখন একবার সেবা কেন্দ্রে খোঁজ নিলে কেমন হয়? কিন্তু সেখানে যদি মহারাজ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! তবে কোথায় তাঁকে পাবো? তাঁর বাড়িও সে চেনে না। অগত্যা দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে দেবযানী আম্রকুঞ্জের দিকেই পা বাড়ায়। কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিতেই গুরখা তার নজরে আসে। দূরে আম্রকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে সে আসছে। তবে তার নিকটে কিনা, কাছে না এলে তা বোঝা যাবে না। আশ্চর্য তার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত। বিপদ কালে তার দর্শন মেলে—এক অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার! দেবযানী না দাঁড়িয়ে ঐ দিকেই এগোতে থাকে। সামনা সামনি হতেই গুরখা বলে—বাঁচা গেল দিদি, আপনাকে অনায়াসে পেয়ে গেলাম। বড়দি আপনার অপেক্ষায় সেবাকেন্দ্রে আছেন, বলে আর কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ না

দিয়ে সে হন হন করে বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করে। দেবযানী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যাক গুরখার সঙ্গে সাক্ষাতের ফল হাতে হাতে পাওয়া গেলো—অবশেষে দিদির খোঁজ মিললো। তাঁকে কি বলবে ইতিপূর্বেই সে ঠিক করে রেখেছে। তথাপি মনে মনে তার পুনরাবৃত্তি করে কঠিন সংকল্প নিয়ে দৃঢ় চিত্তে সেবাকেন্দ্রমুখী অগ্রসর হয়।

দিনের শেষ। আম্রকুঞ্জের ঘন-বীথির এখানে ওখানে বেলাশেষের ম্লান ছায়া জমাট বেঁধেছে। হুঁশিয়ারির যথাযথ উত্তর দিয়ে দেবযানী সেবা-কেন্দ্রের দুয়ারে পৌঁছয়। সাংকেতিক টোকা দিতেই দরজা খুলে যায়। চারদিকে গাছপালা ঘেরা ঘরের ভেতরকার স্বল্পালোকে সদা-প্রসন্নময়ী, অক্লান্তকর্মী দিদিকে দেখে দেবযানী চমকে ওঠে। উষ্কখুষ্ক চুল, মনে হলো অভুক্ত অস্নাত।—ভেতরে আয়, বলেই সুদেষ্ণা টেবিলের দিকে সরে যায়। দেবযানী ঘরে ঢুকেই ওষুধের গন্ধ পায়। দেখে আলমারি খোলা। টেবিলের ওপর কাগজপত্র সব ছড়ানো। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমার এ কি চেহারা হয়েছে দিদি!

সুদেষ্ণা মৃদু হেসে বলে—কেন, কি হয়েছে? তবে হাঁ, খাটাখাটুনি খুবই চলেছে, মনের ওপরও প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তা তো তুই বুঝতে পারছিস—গতকাল তুই পাশ দিয়ে গেলি তবুও তোকে দেখতে পেলুম না। যাকগে, তোকে জিজ্ঞাসা করছি—তুই কয়েকদিনের জন্য মফস্বল যাবি?

—সে কি দিদি! তুমি এই সময়ে একথা বলছো?

—কেন এই সময়ের কিছু বিশেষত্ব আছে নাকি?

—আহা, তুমি যেন কিছু জানো না? তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছো দিদি। সত্যি করে বলো তো দিদি, কি ঘটতে চলেছে। সত্যি করে বলো, না হলে তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো। দেবযানী হুমড়ি খেয়ে সুদেষ্ণার পায়ের ওপর পড়ে।

সুদেষ্ণা এতটা ভাবেনি। সে বিস্মিত। দেবযানীকে দু'হাতে তুলে ধরে বলে—তুই কি পাগল হলি? ঐ চেয়ারটায় বোস। নিজে আরেকটা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করে গম্ভীর স্বরে বলে—তুই কি জানতে চাস?

—বিপ্লবের দামামা বাজছে। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। যোদ্ধবর্গের সমবেত হবার তূর্য-নিনাদ কখন শোনা যাবে দিদি?

সুদেষ্ণা হতবাক। ও কি করে এতটা জানলো! অভ্যুত্থানের সব কিছুই অতি সংগোপনে ও সাবধানে তৈরি। কাক-পক্ষী কারো

জানবার কথা নয়। আসন্ন-সমর হেতু তার মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে চলেছে তার বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ না করে বলে—বিপ্লবের জন্য আমরা সকলে সব সময়ই প্রস্তুত, বল ঠিক কি না ?

—হঁা, তা তো বটেই।

—তার জন্য আমাদের এত দিনের প্রচেষ্টা এত আয়োজন সার্থক হতে চলেছে। সুতরাং দেশোদ্ধার কল্পে এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সর্বতোভাবে সফল করবার জন্য আমাদের যার যা কাজ তা সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তবেই না বিপ্লব সফল ও সার্থক হবে। বল, সত্যি কিনা।

—যথার্থ বলেছেন দিদি। সে উদ্দেশ্য নিয়েই তো সত্যিকারের সংগ্রাম শুরুর দিন, ক্ষণ, স্থল জানতে চাইছি।

—তা জেনে তোর কি হবে ? আমরা মেয়েরা হচ্ছি পশ্চাদ্-রক্ষী। আমাদের কাজ সম্মুখ-সংগ্রমরত বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা, ও প্রয়োজনীয় তথ্য, খবরাখবর, জিনিষপত্র ও খাদ্যাদি সরবরাহ করা।

—এ তুমি কি বলছো দিদি। আমাদের মেয়েদের জন্য সম্মুখ-সমর নিষিদ্ধ! তাই যদি হয়, তাহলে এতদিন ধরে যে শরীরচর্চা, অস্ত্রচালনা-শিক্ষা, সামরিক কুচকাওয়াজ ইত্যাদি করানো হলো তা কি বৃথা। সবই বিফলে যাবে।

—বিফল বলছিস কেন ? সম্মুখ-সংগ্রামরত বাহিনীর পৃষ্ঠদেশরক্ষাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ—সশস্ত্র সংগ্রামেরই সমতুল্য।

তোমার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু দিদি, শরীর চর্চা, অস্ত্রচালনা, সামরিক কুচকাওয়াজ ইত্যাদিতে আমি পুরুষের মতোই নিজেকে একজন যুদ্ধনিপুণ সৈনিকরূপে তৈরি করেছি। আমার একমাত্র আশাআকাঙ্ক্ষা সম্মুখ-সংগ্রামে অংশ নিয়ে শত্রু নিধন করে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। সেই সঙ্গে শহীদের সম্মান লাভ আমার স্বপ্ন। আমার এই সাধনা ও সংকল্প আমি সার্থক করবোই। আমাকে তার থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না। কোন প্রতিবন্ধক আমি মানবো না।

দেবযানীর এই মরণপণের বিকল্প কোন সুষ্ঠু প্রস্তাব সুদেষ্ণা খুঁজে পাচ্ছে না। অসহায়ের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে দেবযানীকে কাছে আসতে বলে। দেবযানী কাছে আসতেই সে আদর করতে করতে বলে—কিন্তু বোন, মেয়েদের যে সম্মুখ-সমরে যাওয়া বারণ। এ

যে দলের কড়া নির্দেশ। আমান্ত করলে ভীষণ শাস্তি—এমন কি প্রাণদণ্ডও হতে পারে—কোন ক্ষমা নেই।

—ঠিক আছে দিদি, আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও। সম্মুখ-সমরে শত্রু সংহার করতে করতে মরে গেলে তো সব ল্যাঠাই চুকে গেলে। আর যদি যুদ্ধে বিজয়িনী হয়ে ফিরে আসতে পারি তখন দলীয় বিধানে যে শাস্তি হয় দিও—মৃত্যুদণ্ড! তাও আমি হাসতে হাসতে মাথা পেতে নেব। আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ থাকবে না দিদি, এ তুমি ঠিক জেনো। আর মেয়েরা যে অসীম বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করতে পারে তার তো ভূরি ভূরি উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় রয়েছে।

দেবযানীর এই অদম্য অসীম সাহসিক ও আবেগপূর্ণ যুক্তি-বহ কথায় সুদেষ্ণা বিস্মিত ও স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুঃখের হাসি হেসে বলে—কিন্তু বোন, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হবো। তোমার মতো আমারও শাস্তি হবে।

দেবযানী বিষয়টা আগে ভাবেনি—অন্যায় যে করে এবং করায় তারা উভয়েই সমদোষে দুষ্ট। সে অস্থির হয়ে ওঠে—না দিদি, তুমি আমার জন্য শাস্তি পাবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না—আমি হতে দেবো না। দলের প্রধানকে আমার যুদ্ধ যাত্রার ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলে তাঁর হাতে পায়ে ধরে তোমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেব। আমার দোষে তোমার শাস্তি আমি সইতে পারবো না দিদি, সইতে পারবো না, বলেই সে কেঁদে ফেলে। দেবযানীর কান্নায় সুদেষ্ণাও বিচলিত। তাকে জড়িয়ে ধরে—কাঁদিস না বোন, কাঁদিস না বলে, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাঁর চক্ষু দিয়েও টস্ টস্ করে জল গাড়িয়ে পড়ে। চক্ষু মুছে দু'হাত ধরে দেবযানীকে চেয়ারে বসিয়ে চুপ করে মনে মনে দেবযানীর সঙ্গে নিজের মনের অবস্থা ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করে। যুদ্ধে যাবার জন্য দেবযানী উতলা, আকুল। আর পৃষ্ঠদেশ রক্ষী হয়ে আসন্ন সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলাফল নিয়ে সে সংশয়ে ব্যাকুল। সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা—যা তার গোচরে এসেছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে অস্ত্রাগার ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ ব্যারাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দখলের পর লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রে নিজেদের সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করা। অস্ত্র বলে বলীয়ান হয়ে অতঃপর নগর আক্রমণ ও দখল করে নিয়ে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ভারতে প্রথম স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। স্বাধীনতা লাভ কল্পে এতদিনের উদ্যোগ আয়োজন, কৃচ্ছ্র-সাধন, মৃত্যুবরণ, ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ ইত্যাদি সব কিছু যদি সত্যিকার এই সংগ্রাম মুহূর্তে অভাবিত ও অচিন্তনীয় কোনো বাধার সম্মুখীন হয়, যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে যদি কোন বিভীষণের আবির্ভাব, ঘটে, তাহলে? শত্রুর কবলে পড়ে সব কিছু কি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে? যোদ্ধৃবর্গ তখন এদিক ও দিক ছিটকে পড়ে অপ্রতিরোধ্য এক সর্বনাশের সম্মুখীন হবে। যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ—হয় মৃত্যুবরণ, নয় পলায়ন? না, সুদেষ্ণা আর ভাবতে পারছে না! তার মনের এই আকুলি-বিকুলি অবস্থা শুধু এই অন্তিম মুহূর্তেই নয় ইতিপূর্বেও হয়েছে। যুদ্ধের অবস্থা বিপ্লবীদের পক্ষে অনুকূল না হলে "অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিত"— আপ্তবাক্য অনুসরণ করে পশ্চাৎ অপসরণের ইংগিত সে কথাচ্ছলে তাঁর নিকট একদিন ব্যক্ত করেছে। এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁকে তীর্থক্ষেত্রের পাহাড়িয়া অঞ্চল পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়েছে। তিনি সেখানে গিয়ে কি দেখেছেন কি বুঝেছেন তা অবশ্য তার অজ্ঞাত। তথাপি অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে দেবযানীকে সেখানে পাঠিয়ে চৌকিদারের সহায়তায় প্রয়োজন বোধে পশ্চাৎ অপসরণ নির্বিঘ্নকরণ কিংবা সীমান্তের ওপারে প্রেরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যুদ্ধে যাবার জন্য দেবযানী মরিয়া হয়ে ওঠায় তাতে বাধা পড়লো। এই পরিস্থিতিতে সে এখন কি করবে? দেবযানীর পরিবর্তে একমাত্র রঘুর আশ্রমের চিরঞ্জীবকে ঐ কর্মে নিয়োগ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে সেখানে তার নিজের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সময়ে অভ্যুত্থানের পূর্ব মুহূর্তে শহর ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে তো আদৌ সম্ভব নয়। এই সব নানা ভাবনার মধ্যে আবার দেবযানীর বিষয়টা মনে হতেই প্রশ্ন জাগে—ওর যুদ্ধ করবার এই তীব্র বাসনার সঙ্গে কি অন্যকোন কামনা জড়িয়ে আছে—স্বদেশ প্রেমের মধ্যে কি অন্য কোন প্রেম লুকিয়ে আছে! তবে কি দলের যোদ্ধা কোন বিপ্লবীর নিকট সে মনে মনে তারই মতো নিজেকে সমর্পণ করেছে! এবং সেই প্রেমিকের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করার ইচ্ছাই কি দেবযানীর এই মরণপণের হেতু!' এরূপ মনে হতেই দেবযানীর জন্য সহানুভূতিতে সুদেষ্ণার হৃদয় গলে যায়। সে পাশ ফিরে তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি করে বল তো বোন, যুদ্ধে যাবার জন্য তোর এই উগ্র ছটফটানি, কঠিন মরণপণ শপথ-এর কারণ তুই যা বললি তা ছাড়া কি অন্য কিছু কিম্বা আর কোন

রহস্য জড়িয়ে আছে? সত্যি করে বললে তোর আর্জি ভেবে দেখতে পারি।

এই সংকটময় মুহূর্তে দিদি যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তার সে কি জবাব দেবে? দলীয় বিধান অনুযায়ী মেয়েরা পুরুষ সভ্যদের নিকট মা, বোন মাসী পিসি রূপেই গণ্য। এর ব্যতিক্রম দণ্ডনীয় অপরাধ। সুতরাং তারও অনুতোষের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা প্রকৃতই দলীয় শৃঙ্খলা-ভঙ্গ-অপরাধ। এরূপ অবস্থায় সে দিদিকে কি বলবে? তার মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না।

উত্তর না পেয়ে সুদেষ্ণা দেবযানীর মুখের দিকে চেয়ে তার নির্বাক আননে নানা ভাবের খেলা দেখে বুঝে নেয় যে দেবযানীর দেশ-প্রেম-উদ্ভূত শৌর্য বীর্যের সঙ্গে হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার ও জড়িয়ে আছে। নিজের সঙ্গে দেবযানীর হৃদয়ের অবস্থা বিবেচনা করে সুদেষ্ণা কণ্ঠে দরদ এনে মুচকি হেসে বলে—চুপ করে আছিস কেন? তোর যদি কিছু বলার থাকে তা এই বেলা বল।—বিলম্বে কর্ম-নাশ। ঘৃণা লজ্জা ভয় ত্যাগ করে তোর মনের কথা আমাকে খুলে বল, বোন।

দেবযানী সুদেষ্ণার স্বরে আশ্বাসের আভাস পেয়ে কতকটা নির্ভীক চিত্তে বলে—আমার অতীত তুমি সবই তো জানো দিদি। তার থেকে একটা বিষয় বুঝেছ কিনা জানি না। সেটাই আভাসে বলছি:

কঠিন রোগাক্রান্ত এক রোগী মৃত্যুশয্যায়। তার মৃত্যু নিয়ে যমের সঙ্গে এক সেবাব্রতীর কঠিন অক্লান্ত লড়াই চলেছে। রোগীর সেই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে অবশেষে সেবাব্রতী জয়ী হলো। একদিন রোগীর চৈতন্য ফিরে এলো। সেদিন ক্ষণিকের তরে অবাক হয়ে প্রথম সে কি দেখলো তা স্মরণে আনতে পারছে না। তবে অন্ধজনের দৃষ্টিলাভের মতো সেদিন আধো-ঘুম আধো-চেতনার ঘোরে মুহূর্তের জন্য প্রথম যাকে দেখলো সেই তার অন্তরে রেখাপাত করলো। ক্রমে ক্রমে সেই রেখা মলিন না হয়ে ভাস্বর হয়ে উঠলো। অবশেষে জীবন্ত হয়ে দেখা দিলো। তখন থেকে মনে মনে তার সঙ্গে যে-বন্ধনে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা আর ছিন্ন হবার নয়। আমৃত্যু তা অটুট থাকবে। এই হলো আমার কথা দিদি। তারপর যে দিন আঁচে বুঝলাম বিপ্লবের জয়ডঙ্কা বাজছে তখনই বুঝলাম সংগ্রামের আর দেরি নেই। এই হলো সুবর্ণ সুযোগ—এক সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রু নিধন করে হয় জয়ী হয়ে ফিরবো নচেৎ লড়তে লড়তে

একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবো—এই আমার পণ। কিন্তু কবে কখন কোথায় প্রথম আক্রমণ আরম্ভ হবে তা জানি না। জানতে না পারলে আমি ব্যর্থ হয়ে যাবো দিদি। তাই তোমার শরণাপন্ন হলাম। তুমি আমাকে বিমুখ করো না।

সুদেষ্ণা চুপ করে সব শুনলো। তার গম্ভীর আননে চিন্তার বঙ্কিরেখা ফুটে উঠছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কিন্তু পাত্রটি কে তা তো বললি না।

—কেন তুমি কি জানো না। তোমাকে তো বলেছি।

—হুঁ, বলে উঠে দাঁড়িয়ে সুদেষ্ণা দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে বলে—তুই অবাক করলি বোন। দাঁড়া, বলেই সে পাশের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে—চ, এখানে আর নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে নানা জনের আনাগোনা শুরু হবে। দেবয়ানীকে নিয়ে সুদেষ্ণা বেরিয়ে যায়।

দিনের শেষ। আম্রকুঞ্জে ঝোপ ঝাড়ে গাছের নিচের জমাট বাঁধা অন্ধকার ক্রমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অমৃতকানন তখনও কর্মচঞ্চল। ডাইনে স্কুলের খেলার মাঠ থেকে ছেলেদের কলকোলাহল ভেসে আসছে। রাস্তায় লোক চলাচল করছে। দূরে মাঠ থেকে গোধূলি বেলায় গোহাল-মুখী-ফেরা গরু বাছুরের হাম্বা রব কানে আসছে। সুদেষ্ণা দেবযানী সমভিব্যহারে ছেলেদের আখড়া ডাইনে রেখে, বাঁয়ে কুন্তীর চালাঘর ছাড়িয়ে দীঘির দিকে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা ততক্ষণে তার ধূসর আঁচল-খানা বিছিয়ে দিয়েছে। দীঘির এপাড়ে মেয়েদের ঘাট ফাঁকা—কেউ নেই। ও-পারে ছেলেদের ঘাটে তখনও দু'একজন রয়েছে। সুদেষ্ণা ঘাটলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বসে পড়ে দেবযানীকে ডেকে বলে—কাছে এসে বোস।

দেবযানী সুদেষ্ণার পাশে বসে পড়ে। দিদি কিছু বলছে না দেখে আরো সরে গা ঘেঁষে বসে জিজ্ঞাসা করে—বলো দিদি, বলো, আমার আবেদন নিবেদন সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিলে? আমার ভাগ্য কি ভাবে নির্ধারণ করলে, বলেই দেবযানী সুদেষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে। কয়েক ফোঁটা অশ্রু দেবযানী গায়ে পড়তেই সে চমকে উঠে—একি দিদি তুমি কাঁদছো, বলেই সে দিদিকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। নিজেকে সংযত করে সুদেষ্ণা আস্তে আস্তে দেবযানীর হাত ছাড়িয়ে নিজের আঁচল দিয়ে তার চক্ষু মুছিয়ে দিয়ে বলে—জীবনে কত দুঃখ কষ্টই যে ভোগ

করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। তুই চলে যাবি ভাবতেই মনের ভেতরে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠলো। চোখের জল আর রোধ করতে পারলাম না। 'এখন কথা হচ্ছে তোর ভাগ্য তুই নিজেই নির্ধারণ করে ফেলেছিস। আমি নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তোকে বাধা দেবার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ অপরাধের জন্য তোর মতো আমার শাস্তিও আমি মাথা পেতে নেবো। যে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে তার ফলাফল—"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহী"। এর বিকল্প বোধ হয় আর কিছু নেই। সুতরাং আমাদের অপরাধের বিচারও তদরূপ ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাক। এ নিয়ে আমাদের এখন মাথাঘামিয়ে কি লাভ। আমার হাতে আর সময় বেশি নেই। তুই যা, জানতে চাইছিস তা মনযোগ দিয়ে শোন —আগামী পরশু ঠিক রাত দশটায় একযোগে টেলিগ্রাফ টেলিফোন আপিস, অক্সিলিয়্যারী ফোর্স আর্মারি এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ ব্যারাক আক্রান্ত হবে। অস্ত্রাগারের লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অতঃপর নগর আক্রমণ ও দখল। সুতরাং বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে কোথায় যোগ দিবি তা তুই বেছে নিস। আর স্থানগুলি নিজে গিয়ে দেখে চিনে নিবি। না চিনতে পারলে স্থান পরিচিতির জন্য গুরখার সাহায্য নিবি। সে তোর জন্য কলেজ গেটে বেলা দুটোয় অপেক্ষা করবে।

সুদেষ্ণা উঠে দাঁড়ায়। কোমর থেকে তার ছোট্ট রিভলবার, কার্তুজ ও বেল্ট সহ দেবযানীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে—এই নে তোর আত্মরক্ষা ও শত্রু নিধনের হাতিয়ার। তারপর দেবযানীর মাথায় হাত রেখে—তোর যাত্রা শুভ হোক, মনোবাসনা পূর্ণ হোক। বিজয়ী বীরাঙ্গনার মতো যুদ্ধ জিতে ফিরে আয়, বলেই সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অন্ধকারে দিদি হাত বাড়িয়ে কি দিচ্ছে প্রথমে দেবযানী বুঝতে পারে নি। জিনিষটা হাতে পড়তেই সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ইচ্ছা হলো দিদি, দিদি ডাকতে ডাকতে পেছনে ছুটে যায়। পরক্ষণেই ভাবে, যাক আর কেন—মাত্র একটা রাত্রি। সকলকে ছেড়ে যখন যেতেই হচ্ছে তখন আর মায়া বাড়িয়ে কি লাভ। ঘাটলা থেকে দেবযানী ধীরে ধীরে মাঠে নামে। দূরে লোকজনের কথাবার্তা কানে আসছে। আশেপাশে জোনাকিরা নানা ভঙ্গিতে ছুটোছুটি করে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঊর্ধ্বপানে অসীম আকাশে লক্ষ কোটি তারার মেলা। ঝিকিমিকি দিচ্ছে

তারা কি যেন তাকে বলতে চাইছে। বিস্ময়ে বিমোহিত দেবযানী আত্ম-বিস্মৃত হয়ে চেয়ে আছে। কতক্ষণ সে এইভাবে আছে, চেয়ে চেয়ে কি দেখেছে, তাদের কি বার্তা শুনেছে তা সে বলতে পারে না—বিস্ময়কর এক অনুভূতি! হঠাৎ অদূরে পেচকের কর্কশ কণ্ঠস্বরে তার সম্বিত ফিরে আসে। কতকটা আত্মবিস্মৃতের মতোই বুঝি সে অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করে। মাঠের প্রান্তে গেটের ধারে এসে দাঁড়ায়। গেট খুলে রাস্তায় পড়তেই সে সচেতন হয়। রেতেবিরেতে এ রাস্তায় সে অনেক যাতায়াত করেছে। আপদ বিপদও যে না ঘটেছে এমন নয়। হঠাৎ তার মনে আসে আজ সে সশস্ত্র। কোমরে হাত দিয়ে দিদির দেওয়া রিভলবারটা স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত। কতদিন সে এরূপ একটা অস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা করেছে। আজ তা পূর্ণ হয়েছে। মন সতেজ ও বলদীপ্ত হয়ে ওঠে। তবে হাঁ, পুলিশ ও টিকটিকি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। যাকৃগে, আর তো মাত্র একটা রাত্রি। তারপর শত্রু নিধনে সে ইহার পূর্ণ সদব্যবহার করবে। দিদির দানের মর্যাদা রক্ষা করবে।

চলতে চলতে তার মনে হলো রাস্তাটা যেন আজ বড্ড অন্ধকার। অন্যদিন রাস্তার মাঝখানে যে একটা ল্যাম্প টিমটিম করে জ্বলে তাও নেই। দূরে বড় রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের পাশ দিয়ে যাবার কালে আচম্বিতে গাছের আড়াল থেকে এক ব্যক্তি দেবযানীর সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও দেবযানী সাহস সঞ্চয় করে বলে—তুমি কে? রাস্তা ছাড়, বলেই সে কোমরে হাত দেয়।

—থাম, অস্ত্র সংবরণ কর দেবযানী।

—একি, তুমি!

—হাঁ, আমি। এই সংকীর্ণ কানা গলিটা আমাদের উভয়ের জীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। জীবনের শেষ ঘটনাটারও সে সাক্ষী হয়ে থাক। অনুতোষ ছুটে এসে দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে বলে—চলি দেবযানী, আমার আর সময় নেই। যদি বিজয়ী হয়ে কোন দিন ফিরতে পারি তবেই দেখা হবে নচেৎ এখানেই আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি। অনুতোষ দেবযানীকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত-পদে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়।

অনুতোষের আলিঙ্গনের উষ্ণতায় মুহুর্মুহু শিহরিত, চুম্বনের স্বাদে পরিতৃপ্ত

-স্বরমিত দেবযানী এতই বিবশ বিহ্বল যে অনুতোষের বাহুবন্ধন আলগা হতেই সে তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হাত বাড়াতেই বুঝলো— ফাঁকা, সে নেই। দেবযানী—দাঁড়াও দাঁড়াও চিৎকার করতে করতে দিশেহারা হয়ে ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছেদ বেদনাতুর দেবযানী অন্ধকারে শূন্য-দৃষ্টি মেলে নিশ্চল নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।



অন্ধ তিমির রাত্রি—নিঝুম নিঃশব্দ। একটা পাতা পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যায়। চতুর্দিকে নিচ্ছিদ্র পাহারার মধ্যে আম্রকুঞ্জে বিপ্লবীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আখেরি বৈঠক বসেছে। এতদিনের রক্তঝরা সংগ্রাম, নানা বিপদ আপদ, কঠিন সমস্যাও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের যে বীজ বোনা হয়েছে তা বিকশিত। ফসল তোলাব মুহূর্ত আসন্ন। শুরুতেই মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় আসন্ন সংগ্রামের পূর্ণ চিত্র সভ্যদের সম্মুখে মেলে ধরেন। এবং সংক্ষিপ্ত বয়ানে তা ব্যাখ্যা করে—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে তার ভাষণ শেষ করেন। সমবেত কণ্ঠে ভুম্ব স্বরে তাব প্রতিধ্বনি সকলের বজ্র কঠিন সংকল্প ঘোষণা করে। অতঃপর বড়দা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ভারতের স্বাধীনতা লাভে বিপ্লবেব অপরিহার্যতা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে আসন্ন এই ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের গুরুত্ব কতখানি তা জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করে সকলকে এক-মন এক-প্রাণ হয়ে সংগ্রামে আগুয়ান হতে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করেন। তাঁর পরে বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক হিসাবে তিনি প্লাটুন কমাণ্ডার—প্রভাত, দেবেশ, অনুতোষ ও নরেশকে সম্বোধন করে কে কোথায় নিজ নিজ প্লাটুন সহ উপস্থিত হবে এবং কখন নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ আরম্ভ করবে তারও নির্দেশ দেন। পরিবহন সম্পর্কে তিনি বলেন—যে যে সদস্যদের মোটর গাড়ি আছে তারা অন্যদের সঙ্গে নেবেন। প্রয়োজন বোধে ট্যাক্সি কিংবা প্রাইভেট গাড়িও জোর

করে দখল নেওয়া চলবে। অন্যথা সভ্যগণ হেঁটে রাতের অন্ধকারে অলক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের আগেই যথাস্থানে পৌঁছবে। অস্ত্রাধ্যক্ষকে মজুত অস্ত্র-ভাণ্ডার থেকে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করতে বলেন। কেউ যেন বিনাহাতিয়ারে না যায়—তা সে বন্দুক, বোমা, রিভলবার, তলোয়ার ছুরি যাই হোক না কেন—সকলকেই সশস্ত্র হতে হবে। নারী ও বালবাহিনীর অধ্যক্ষাকে কি ভাবে নগরে থানা, পুলিশ ও সাহেবদের আস্তানার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে এবং নগর অভিযান কালে বাহিনীর অগ্রগামী গোয়েন্দাদের নগরের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও অভিযান সম্পর্কে যে প্রচার পত্র ছাপা হয়েছে তাহা রাত্রি বারোটার পর নগরের প্রতি ঘরে ঘরে বণ্টন করতে এবং হেঁকে হেঁকে নগর বাসীদের সজাগ করে ঘটনাটা জানাতে হবে। সর্বশেষে উপস্থিত সকলকে এই অপরেশন-এর (অভিযানের) পাশ-ওয়ার্ড (সাংকেতিক নাম) রেড রোজ (লাল গোলাপ) জানিয়ে দেন। সেই সঙ্গে প্লাটুন কমাণ্ডারদের হুঁশিয়ার করেন, কাউকে সন্দেহ হলে, পাশ-ওয়ার্ডের সঠিক উত্তর না পেলেই তৎক্ষণাৎ গুলি। কেননা জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা আটক রাখবার মত স্থানকাল ও অবস্থা তখন নয়।

ভাষণ শেষে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তিনি অভিবাদন (স্যলুট)-এর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠে দাঁড়ান। প্লাটুন কমাণ্ডারগণ দলের প্রধানদের প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করে।

অতঃপর নেতৃবৃন্দ পুলিশ লাইন ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপ্লবী বাহিনী কখন কোথা দিয়ে নগর অভিমুখে সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু করবে তাহা নির্ণীত হয়। নগর দখলের পর কিভাবে সরকারী পুলিশ মিলিটারি ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিহত করে নগর রক্ষা করা হবে তারও মোটামুটি কৌশল স্থিরীকৃত হয়।

সর্বশেষে নেতৃবৃন্দ কে কোথায় পজিশন নিয়ে (অবস্থান করে) আক্রমণ ও যোদ্ধা এবং যুদ্ধের গতিবিধির ওপর নজর রাখবেন তাও পরস্পর আলোচনা দ্বারা স্থির করে উঠে দাঁড়ান। মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে গীতার বাণী আবৃত্তি করেন—"...নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

নিষ্কাম নির্মম এবং শোক শূন্য হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হও। অতঃপর পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বন্দেমাতরম ও ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিয়ে—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, অঙ্গীকার করে যখন সভাভঙ্গ হয় বাইরে তখন গাছে গাছে পাখির কাকলিতে ভোরের আগমনী শুরু হয়েছে। মহারাজ দরজার ধারে এসে দাঁড়ান। নেতৃবৃন্দ এই কাক-ভোরেই একে একে বেরিয়ে যান। মহারাজ তখনও দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে তক্ষকের ধ্বনিতে সকলের নিরাপদে প্রস্থানের সংকেত জেনে তিনি ঘরে ফিরে আসেন। টেবিলের ধারে চেয়ারটায় বসে ছোট্ট ডায়ারিখানা বের করে মনযোগ দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে নিবিষ্ট মনে দেখে চলেছেন।

সভাভঙ্গের পর সুদেষ্ণাও উঠে ভিন্ন দরজা দিয়ে সেবা কেন্দ্রে প্রবেশ করে। আলমারি খুলে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স এবং ওষুধপত্র ঠিক মতো সাজানো আছে কিনা কিংবা ঘরের কোথাও সন্দেহজনক কিছু পড়ে আছে কিনা তা দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে ঢুকে মহারাজকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। মহারাজ একমনে একের পর এক ডায়ারির পাতা উল্টে দেখছেন। যাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে কঠোর তপস্যা এতদিন ধরে করে আসছেন তারই উদ্‌যাপন এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হতে চলেছে। সুদেষ্ণা দূর থেকে দেখে অবাক। জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর সৌম্য প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর আননে উদ্বেগ কিংবা আশঙ্কার লেশ মাত্র নেই। যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত—হার-জিত, জীবন মরণ মহাকালের গর্ভে নিহিত। সুদেষ্ণা দাঁড়িয়েই আছে। শুধু অনিমেষ নয়নে দেখছে—তার দেখার যেন আর শেষ নেই। এ তার কি হলো। সে যেন হঠাৎ এক ষোড়শী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়ে চপল চঞ্চল চাউনিতে আপন ধ্যানে নিমগ্ন তপস্বীর তপোভঙ্গের জন্য ব্যাকুল বিহ্বল চিত্তে পা বাড়িয়ে এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। খেয়াল হয়—এ সে কি করছে। সেই মুহূর্তেই পকেট্ থেকে ঘড়ি বার করতে গিয়ে মহারাজ-এর দৃষ্টি সুদেষ্ণার ওপর পড়ে। কিছুটা অবাক হয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—তুমি দাঁড়িয়ে যে, ডাকলে না কেন?

সুদেষ্ণা বিব্রত বোধ করে। যেন ধরা পড়ে গেছে এমন ভাব—মুখে কোন কথা যোগায় না। পরক্ষণেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলে—চলেই

যাচ্ছিলাম, ভাবলাম যদি আর কিছুর প্রয়োজন হয়, তাই দাঁড়িয়েছিলাম।

তার কোন উত্তর না দিয়ে—দাঁড়াও, বলেই মহারাজ ভেতরে চলে যান।

মহারাজ-এর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভিন্ন সুর সুদেষ্ণার কানে বাজে। অন্তরে একটা আনন্দের হিল্লোল জাগে। সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মনে ভাবে—তবে কি এই চরম মুহূর্তে পাষাণ গলতে শুরু করেছে। আশায় উদ্দীপ্ত সুদেষ্ণা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু তার এত আশার প্রদীপ ফুৎকারে নিবে যায় যখন দেখে মহারাজ-এর চোখে মুখে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার আবেশ নেই। হাতে আছে কেবল কতকগুলি শুকনো কাগজের ফাইল। সুদেষ্ণার অন্তরের অন্তস্থলে বেদনা গুমরে ওঠে। হৃতআশ সুদেষ্ণা নির্জীবের মতো টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজ ফাইলগুলি টেবিলে রেখে তাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে বলেন—এগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য তোমাকে দিলাম। এদের পাঠ শেষ হয়েছে। আগামী দিনে নতুন ঊষারআলোকে নতুন করে যাত্রা ও নতুন ভাবে পাঠ শুরু হবে। বলতে বলতে মহারাজ উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু সুদেষ্ণার অনড় অচল তুষ্ণীম্ভাব লক্ষ্য করে প্রথমে বিস্মিত হন। পরমুহূর্তে বিষয়টা উপলব্ধি করে ক্ষণেকের জন্য বুঝি আনমনা হয়ে যান। নিজেকে তৎক্ষণাৎ সংযত করে সহাস্যে বলেন—তোমার হলো কি সুদেষ্ণা, চুপ করে দাঁড়িয়ে যে। তারপর আরো উচ্চ হেসে বললেন—শংকরাচার্য প্রণীত বলিয়া কথিত "মোহমুদগর" পড়েছ কি? তবে আমাদের বিপ্লবীদের "মোহমুদগর" অবশ্যই গীতা। আপদে বিপদে মনের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে, ক্লৈব্য, ক্লেদ দূরীকরণের ব্যবস্থাপত্র একমাত্র গীতাতেই বোধ হয় পাওয়া যায় এবং ক্ষেত্র বুঝে তার প্রয়োগে মহৌষধির কাজ করে। বর্তমান ক্ষেত্রোপযোগী গীতার বাণী তোমার স্মরণে আনছি—দেখ মেলে কিনা:

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ"

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য কুরু-পাণ্ডব যোদ্ধবর্গ পরস্পরের সম্মুখীন।

"তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম আনন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

সিংহনাদ-এর সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করেন। সম্মুখে অত্যাসন্ন এই কঠিন সংগ্রাম কালে "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্"। এমন সংকটপূর্ণ সময়ে কোথা হতে তোমাকে মোহ অধিকার করে অবশ করলো। সুতরাং, নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধাস্বঃ বিগত জ্বরঃ। শোক মমতা শূন্য হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হও। "তদা বিজয়ায় ন সংশয়ঃ", বলে মহারাজ উঠে দাঁড়ান। হাত তুলে বরদানের ভঙ্গীতে—মাভৈঃ মাভৈঃ, হবে জয় নাহি ভয়, শুভমস্তু। সুদেষ্ণাকে আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি গম্ভীর আননে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে আম্র কাননে অদৃশ্য হয়ে যান।

মহারাজ মুখ নিঃসৃত গীতার বাণী সুদেষ্ণার বিবেক বুদ্ধিতে আঘাত করে যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলেছিলো তা বুঝি তার হৃদয়ের বন্য কামনা, বাসনা আবেগের তোড়ে আর মাথা তুলতে না পেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহ্যমান, হৃত-আশ সুদেষ্ণা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাশ্রু নয়নে মহারাজ-এর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে।

অন্ধকারে সেই গাছটার নিচে দেবযানী কতক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ পাশের ঝোপে খস্‌খস্ আওয়াজ শুনেই তার হুঁশ হয়। রাত্রি অনেক হয়েছে অনুমান করে সে খুবই চিন্তিত। মা নিশ্চয়ই তার অপেক্ষায় হা-পিত্যেশ করে ঘর-বার করছে। ক্ষমা করো মা, ক্ষমা করো। মায়ের দুঃখে তার চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে কি করবে? সে নিরুপায়। তাকে তো যেতেই হবে। চলতে চলতে চোখের জলে গলিপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। মনকে সান্ত্বনা দেয়—যত পারিস এই বেলা কেঁদে নেরে মন। কেঁদে কেঁদে দুঃখ লাঘব কর। সারা গলি পথ সে এভাবেই কাঁদে। বড় রাস্তার আলো দেখেই চোখ মোছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। যেতে যেতে সে আজকের রাত্রি, আগামী দিন এবং সন্ধ্যা রাত্রির একটা কর্মসূচী তৈরি করে। মনকে সাবধান

করে—এই কর্মসূচীর যেন কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে—বিভ্রাট না বাঁধে! খুব সাবধান, হুঁশিয়ার! আর কান্নাকাটি নয়!

বাড়ির দরজায় এসে ঘা দিতেই দরজা খুলে যায়। উৎকণ্ঠিত ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করে—এতো দেরি হলো যে! অন্ধকারে মায়ের মুখ দেখা না গেলেও কণ্ঠস্বরে তার মনের গভীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও ভয় প্রকাশ পায়। দরজার চৌকাঠের ভেতর পা দিয়ে মায়ের হাত ধরে বলে—চলো। কেন যে তুমি খালিখালি ভেবে মর! আমি এখন বড় হয়েছি, মস্ত বড়—রাস্তা ঘাটে একা চলতে ফিরতে শিখেছি। একটা পাশ করে আর একটা পাশ করতে যাচ্ছি। উঠোনের তুলসী মঞ্চের কাছে আসতেই বলে—দাঁড়াও মা। তুলসী মঞ্চে প্রণাম করে মায়ের পায়ে ঢিপ করে মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের হাত ধরে বলে—চলো। মাকে কোন কথার অবকাশ না দিয়েই বলে—তুমি রান্না ঘরে যাও। এখন অন্যকিছু নয়, একেবারে ভাত দিও। আমি মামা ও সুদেবকে নিয়ে আসছি। উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠে মামা, মামা ডাকতে ডাকতে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। মামা শুয়েছিলেন। ডাক শুনেই উঠে পড়ে বলেন—বড্ড দেরি হলো যে—তোর মামীতো খালি ঘরবার করছিলো। সে কথার জবাব না দিয়ে দেবযানী বলে—চলো খেতে চলো। আমি সুদেবকে নিয়ে এক্ষুনি যাচ্ছি। বারান্দায় দিদির গলা শুনেই সুদেব স্বস্তি অনুভব করে। দিদির দেরি দেখে তার খুবই ভাবনা হচ্ছিলো। পড়ায় আদৌ মন বসছিলো না। দেবযানী ঘরে ঢুকেই বলে—very good boy. এতক্ষণ নিশ্চয়ই ভালো লেখাপড়া করেছ। তুমি পড়ো আমি এক্ষুনি কলতলা থেকে আসছি। একসঙ্গে খেতে যাবো। ঘরে ফিরে এসে বলে—চলো। এখন বই গুছোবার দরকার নেই। খাওয়ার পরে এসে করো।

—তুমি বড্ড তাড়া দিচ্ছ দিদি। বসো একটা জিনিষ বুঝবার আছে।

—এখন নয় ভাই। খেয়ে দেয়ে এসে বুঝিয়ে দেবো। মা রান্না ঘরে একা বসে আছে না! সুদেব আর দ্বিরুক্তি না-করে দিদির অনুগমন করে। বারান্দায় দাঁড়ানো মামাকে সঙ্গে নিয়ে তিনজন রান্না ঘরে গিয়ে উপস্থিত। নিজেকে অটল অচল রাখবার জন্য দেবযানী স্থির করে—মায়ের মুখের দিকে চাইবে না কিংবা বেশি কথা বলবে না। খেতে বসার আগে মাকেও বসতে বলে উঠে গিয়ে আসন পেতে, জল গড়িয়ে, ভাত বেড়ে মায়ের সম্মুখে রেখে নিজের আসনে এসে বসে।

প্রতিবাদ বৃথা। উর্মিলা অপ্রসন্ন চিত্তে খেতে বসে। খেতে খেতে দেবযানী জিজ্ঞাসা করে—দেশের খবর বলো মামা।

—খবর একই—কেবল রকমফের। সবরমতি আশ্রম থেকে গান্ধিজীর ফতোয়া অনুযায়ী লবন সত্যাগ্রহ জোর কদমে চলেছে।—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—"fight to finish"। দেশের চতুর্দিকে অপ্রতিহত লাঠি, গুলি ধরপাকড় চলেছে। কলকাতায় সেনগুপ্ত ও বোস মহাশয়ের দল পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে যৌথভাবে হরতাল ডেকেছেন। সর্বত্রই থমথমে ভাব—এই বুঝি সাংঘাতিক কিছু ঘটে। এইভাবে রাজনীতি ও খেলাধুলো খবরের পরে লেখাপড়া প্রসঙ্গে মামার প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়ার পাট শেষ হয়। দেবযানী উঠে সকলের বাসনপত্র গোছাতে গোছাতে বলে—তুমি যাও মা। আমি রান্না ঘরের সব কাজ সেরে তালা দিয়ে আসছি।

দেবযানীর একগুঁয়েমি উর্মিলার বুঝি আর সহ্য হয় না।—কেন এত বাড়াবাড়ি করছিস যানী?

কর্মরত অবস্থাতেই মায়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে দেবযানী বলে—বাড়াবাড়ি মোটেই নয় মা, অনেক খেটেছো, খাটছো, আরো কত খাটতে হবে। যতটুকু পারি করছি—সাহায্য তো নয়ই—গোষ্পদে জল তুল্য।

দিদির ভাষার ব্যঞ্জনায় সুদেব হাততালি দিয়ে বলে—চমৎকার। দারুন বলেছ দিদি। তা, আমি থাকি না দিদি, যদি কিছু সাহায্য হয়।

—ডেঁপোমি করো না, যাও পড়তে বসোগে। আমি আসছি। সকলেই ঘর ছেড়ে চলে যায়। যাবার কালে মায়ের খিন্ন বিষন্ন মুখের দিকে এক পলক চেয়ে দেবযানী বুঝি আর চোখের জল রোধ করতে পারে না। নিজেকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে শাসন করে—না আর কান্না নয়—তা হলে সব ভেস্তে যাবে। এই গৃহসংসার—মায়ের, মামার অতুলনীয় স্নেহ বাৎসল্য, ভাইয়ের অনুপম ভালোবাসা—সব ছেড়ে যেতে হবে। আজই এই গৃহের শেষ রাত্রি। তারপর সব ভবিষ্যতের গর্ভে—মরতে হলে একত্রে মরবো, বাঁচতে হলে বাঁচার মতো বাঁচবো। রান্না ঘরের সব কাজ সেরে ঘরে তালা এঁটে দেবযানী দাওয়ায় উঠে দেখে—মা দাঁড়িয়ে।

—তুমি এখনো দাঁড়িয়ে?

—হ্যাঁ, তোর দেরি দেখে ভাবনা হচ্ছিলো, তাই অপেক্ষা করছিলাম।

—সব কাজ সেরে এসেছি। এমনকি কয়লার উনুনও সাজিয়ে

রেখেছি। তাই একটু দেরি হলো। যাও তুমি ঘরে যাও। দেবকে আবার কি জানি বুঝিয়ে দিতে হবে। উর্মিলা একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেবযানী আর দাঁড়ায় না। ঘরের দিকে এগোয়। অন্ধকারে মায়ের মুখ দেখতে না পেলেও গলার স্বরে তার অন্তরের বিষাদ বেদনা পরিস্ফুট। পেছন না ফিরেও মায়ের চিন্তা ভাবনা জর্জরিত ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি তাকে যে অনুসরণ করছে তা দেবযানী অনুভব করছে। সারা দিনের ছুটোছুটি উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত, অবসন্ন দেবযানী ঘরে ঢুকে ধপ করে চেয়ারে বসে সুদেবকে ডাকে—তোমার কি বুঝবার আছে নিয়ে এসো।

সুদেব দিদির গম্ভীর ভাব দেখে কিছু না বলে অঙ্ক বইটা দিদির সম্মুখে রাখে। বইটা খুলে দাগ দেওয়া অঙ্কটা দেখেই দেবযানী বুঝলো সুদেব নিয়মে ভুল করেছে। নিয়মটা বুঝিয়ে অঙ্কটা কষতে দেয়। সেটা করার পর ঐ রকম আর একটা প্র্যাকটিস অঙ্ক সুদেব ঠিক মত কষে। সুদেবের অঙ্ক করা শেষ হতেই—যাও এবার শুয়ে পড়ো—রাত্রি অনেক, বলেই দেবযানী উঠে দাঁড়ায়।

—তুমি বুঝি এখন পড়তে বসবে দিদি ?

দেবযানী কি জবাব দেবে ? সুদেবের যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় সে জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—আমার পড়া তো প্রায় শেষ। পরীক্ষারও আর বেশী দেরি নেই। তাছাড়া শরীরটাও ম্যাজ-ম্যাজ করছে।

—তাই নাকি ? না হলে একটা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক দিন তো তোমার গল্প শুনিনি দিদি। যাক্‌গে, বলেই সুদেব উঠে পড়ে।

ছোট থেকেই দিদির কাছে শুয়ে গল্প না শুনলে সুদেবের ঘুম হতো না। সুতরাং যাবার বেলা সুদেবের এই গল্প শোনার আকুতি তার অতীত স্মৃতি জাগিয়ে তুলে তার মনের দুঃখ বেদনা আরো বাড়িয়ে তোলে। সে সুদেবের কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলে—চলো তোমাকে আজ গল্পের চাইতেও সেরা অনেক চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী শোনাবো।

—সে তো আরো ভালো দিদি, বলে সুদেব দিদিকে জড়িয়ে ধরে।

ভাইকে বিছানায় শুইয়ে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দেবযানী শুরু করে :

ভারতের চরম দুর্দিন। মোগল রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের চতুর্দিকে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা—সে এক অবিশ্বাস্য রোমহর্ষক রক্তঝরা মর্মান্তিক কাহিনী। বাঙলার মসনদে তখন নবাব আলিবর্দি খাঁ। মারাঠা বর্গীরা সুবে বাংলার ঘর বাড়ি শস্যের গোলা লুট করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সর্বস্ব ছেড়ে লোকজন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে শুধু পালাচ্ছে। কোন প্রতিরোধ নেই। দেশ এক মহা-শ্মশানে পরিণত। নবাব বহু লড়াই করে দেশকে বর্গী-মুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লা বাংলার মসনদে আসীন হলেন। অল্প বয়স, অস্থির মতি এবং দুর্বল চরিত্র সিরাজ তাঁর কর্ম-ফলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। ইতিমধ্যে বাণিজ্য করতে এসে শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরেজের, এদেশের ডামাডোল অবস্থা দেখে, রাজ সিংহাসনের লোভ জাগলো। সুযোগও মিলে গেল। নবাবের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস-ঘাতকতা, হঠকারিতা ইত্যাদি ইংরেজ বণিকের রাজ্য-গ্রাস লালসার ইন্ধন জোগালো। মিরজাফর জগৎ শেঠের ষড়যন্ত্রে রাজবল্লভ, দুর্লভরাম, মাণিক চাঁদ প্রভৃতি যোগ দিয়ে রাজদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করলো। সিরাজের ঐ দুঃসময়ে একমাত্র রাণী ভবানী নবাবের নানা কলঙ্ক জনক কর্মকাণ্ড সত্বেও হিতাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে কৃষ্ণনগর অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানালেন। ফল কিছুই হলো না। নবাবের সর্বনাশ ঘনিয়ে এলো। কালস্রোত্র তাঁকে পলাশীর আম্রকাননে টেনে আনলো। তখন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ। পলাশী ক্ষেত্রে একদিকে ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকের সৈন্য বাহিনী, অন্যদিকে ফরাসী বীর সিন ফ্রেঁ, বাঙালী বীর মোহনলাল এবং সেনাপতি মীরমদনের অধীন নবাব বাহিনী পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে সমবেত। শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। উভয় পক্ষের মুহুর্মুহু কামানের গোলায় নবাব এবং ক্লাইভের ইংরেজ সৈন্য ধরাশায়ী হতে লাগলো। যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন বুঝে ক্লাইভ যুদ্ধের কৌশল পাল্টে ফেললেন। সারাদিন আম্রকাননে আত্মরক্ষা-মূলক লড়াই করে রাত্রে পুনরায় দ্বিগুণ বিক্রমে নবাব শিবির আক্রমণ করবেন। সিরাজের মন্দ কপাল!—আকাশে মেঘের ঘনঘটা—প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি দিয়ে মুসলধারে বৃষ্টি নামলো। গোলাবারুদ সব ভিজে একশা। নবাব শিবিরে চরম হতাশা ও বিশৃঙ্খলা। তাঁর কামান আর গর্জে না। কোম্পানীর কামানের গোলায় মীরমদনের ঊরুদেশ ছিন্ন হলো। নবাবের

অন্য সেনাপতিরা কেউ যুদ্ধ করছে না। সিপাহীসালার মিরজাফর তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করতে বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে। নবাব হায় হায় করতে লাগলেন। এই সময়ে মোহনলাল নবাবের সৈন্য বাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। দুর্ভাগ্য তিনি হঠাৎ কামানের গোলায় আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলো।

ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হলো। স্বাধীনতা সূর্য হলো অস্তমিত। সেই কাল রাত্রি শেষে পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিলো রাজদণ্ড রূপে। সেই থেকে শুরু হলো ইংরেজের রাজ্য বিস্তার। ক্রূর কুটিল চক্র, ছলাকলা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্ত হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচার— এমন কোন অপকর্ম নেই যা তারা করেনি। তাঁতিদের আঙুল কেটে বাঙলার তাঁত শিল্পের সর্বনাশ সাধন ও ধ্বংস করলো। তাদের অকথ্য অত্যাচারে নীল চাষীরা বিদ্রোহ করলো। এলো ১৭৭০ সাল—৭৬-এর মন্বন্তর। সারা বাংলা ছারখার হলো। না খেয়েও মড়কে দেশের অর্ধেক লোক মরে গেলো। তার ফলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বন প্রান্তর কাঁপিয়ে তারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনেক লড়লো। সৈন্যদের রসদ লুণ্ঠন করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের মধ্যে বণ্টন করলো। এইভাবে দেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমশঃ দানা বাঁধতে লাগলো।

ইংরেজ রাজত্বের একশত বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই আরম্ভ হলো সশস্ত্র বিদ্রোহ বিপ্লব। ১৮৫৭ সালে বাংলার ব্যারাকপুরের ছাউনিতে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ করলো। এই বিদ্রোহ-স্ফুলিঙ্গ ক্রমে দাবানল হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। মিরাট ও দিল্লী সিপাহীরা দখল করলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়ালো। নানা স্থানে ইংরেজদের নির্বিচারে হত্যা করা হলো। ভারতের সামন্ত রাজা মহারাজ ও ভূস্বামীরা অনেকে বৃটিশের পক্ষ নিলো। অনেকে সিপাহীদের পক্ষাবলম্বন করে বিদ্রোহের সামিল হলো। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঝাঁসীর জনসাধারণ বীরাঙ্গনা রানীর স্বদেশ হিতৈষণা, অসীম শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের কাহিনী :

পত্থর মিট্টিসে ফৌজ বনাই
কাঠসে কাটোয়ার

পাহাড় উঠাকে ঘোড়া বনাই
মহারানী বড়ি তেজিসে চলি গোয়ালিয়র।

গানে গাথায় ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে যুদ্ধের সামিল হতে আহ্বান ও উদ্বুদ্ধ করে।

বৃটিশ বাহিনী ঝাঁসীর দুর্গ অবরোধ করে। প্রাণপণ লড়াই চললো। রানীর গোলান্দাজ গোলাম ঘৌস খাঁ, যুবক খুদাবক্স সহ সৈন্যবাহিনী অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলো। কিন্তু যারপরনাই মন্দ ভাগ্য ও দুঃখের কথা রানীর সহযোগী কয়েকজন সামন্তরাজার ভীরুতা, নির্বুদ্ধিতা ও অসহযোগিতার ফলে প্রচণ্ড লড়াই ও হাতাহাতি যুদ্ধের পর দুর্গের পতন হলো। দুর্গে প্রবেশ করে ইংরেজ নির্বিচারে হত্যা, ধনরত্ন লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নানা নির্মম দুষ্কর্ম সাধন করলো। সকলে রানীকে দুর্গ পরিত্যাগের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো। কেননা তাদের ভয়, ইংরেজের হাতে বন্দিনী হলে রানীর অশেষ দুর্গতি হবে। অগত্যা রানী কয়েকজন সহচরী, সহচর ও বাছা বাছা সিপাহী সমভিব্যহারে ছদ্মবেশে দুর্গ পরিত্যাগ করলেন। রানীর পেয়ারের ঘোড়ী সারংগীকে আগেই কেল্লার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে রানী অবিলম্বে সদলে গোয়ালিয়র অভিমুখে ছুটলেন। পথে কয়েকজন সামন্তরাজ তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। কাল্পিতে কাম্পু ময়দানে ইংরেজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। কি হয়, কি হয়!! ইংরেজ বাহিনী হটেও হটছেনা, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ভারতীয়দের শিবিরে আনন্দ উল্লাস। হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি—এক সামন্তরাজের শৈথিল্য, সমঝতার অভাব। ঠিক সময়ে তিনি সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গর-হাজির। ফলে যুদ্ধের গতি ভারতীয়দের প্রতিকূলে গেল। রানী বুঝলেন সর্বনাশ যা ঘটবার ঘটেছে। এখন প্রতিরোধ বৃথা—শুধু সৈন্য ক্ষয়। ইংরেজ যাতে তাঁর পশ্চাৎ-ধাবন করতে না পারে সেজন্য তাদের ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্য রেখে তিনি গোয়ালিয়র দখলের উদ্দেশ্যে তড়িৎ-গতিতে ছুটলেন। গোয়ালিয়র রাজ সিন্ধিয়া প্রথমে রানীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা ভঙ্গ করলেন। রানী দুর্গ আক্রমণ করে দখল করলেন। বেগতিক বুঝে সিন্ধিয়া দুর্গ ছেড়ে পালালেন।

ওদিকে ইংরেজ রানীর পিছু ধাওয়া করে গোয়ালিয়র পৌঁছে দুর্গ

অবরোধ করে। পরিশ্রান্ত রানী আর বিশ্রামের অবসর পেলেন না। দুর্গ থেকে বেরিয়ে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হলেন। ১২৫ ডিগ্রি গরম। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের লেলিহান শিখায় মাঠঘাট সব উত্তপ্ত কটাহে পরিণত। তারই মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে—ফলাফল অনিশ্চিত। রানী তরবারি হাতে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্রই তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কেল্লা থেকে বৃটিশ সৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলেছে। তা সত্ত্বেও মরণপণ যুদ্ধ করে ইংরেজ ফুলবাগ ছাউনির গোলান্দাজদের হাত থেকে কামান ছিনিয়ে নেয়। ফলে ভারতীয় ছাউনিতে চরম বিশৃঙ্খলা। একটানা যুদ্ধে তারা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। রানী ও তার বাহন ঘোড়া সারংগী দুর্বল হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও রানী ছাউনির বাইরে সৈন্যদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শেষ চেষ্টা করছেন। অধিকাংশ সৈন্য নালা পেরিয়ে দুর্গের দিকে পালাবার চেষ্টা করছে। ব্রিটিশ সৈন্য ইতিমধ্যে ছাউনির ভেতর ঢুকে পড়েছে। ফলে যুদ্ধের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রানী তাঁর সহচরী মান্দার আর রঘুনাথ সিং সহ দলছাড়া সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। দুদিকের জমি খাড়াই—সেই উঁচু জায়গা থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ইংরেজ সৈন্য ভীম বেগে ছুটে আসছে। রানী প্রমাদ গণলেন। এমন চূড়ান্ত বিপন্ন অবস্থার মধ্যেও তিনি প্রাণপণ শক্তি ও প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে নালা অতিক্রমের চেষ্টা করছেন। এমনি সময় আচম্বিতে একটা গুলি এসে তাঁর সহচরী মান্দারের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। রানী বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ঘুরিয়ে মান্দারের আততায়ীকে আক্রমণ করে তার বুকে আমূল তরবারি বসিয়ে দেয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এক ইংরেজ সৈন্যের তলোয়ারের কোপ এসে রানীর ওপর পড়ে। তাঁর মাথার ডান দিক থেকে ডান কান অবধি কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। মাথার পাগড়ির পাল্লা দিয়ে রানী রক্ত বন্ধ করবার প্রয়াস করছেন এবং ঘোড়ার পেটে আঘাত দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছেন। নালা ডিঙোবার মুহূর্তেই একটা গুলি ছুটে এসে রানীর বুকের বাঁ দিকে বিদ্ধ হয়। তিনি ঘোড়ার পিঠে উবু হয়ে পড়েন। সৈন্যগণ হায় হায় করতে থাকে।

অন্তিম সময়ে রানীর শেষ কথা শোনা গেল—যুদ্ধ করো, ফিরিঙ্গি নিধন করো। আমার মৃত দেহ যেন ফিরিঙ্গি যবনের হাতে না পড়ে, বলতে বলতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর সৈন্যদের কণ্ঠে—

স্থানী অমর রহে, ধ্বনি উঠে রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যদের মনে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করে। তারপরে ছোটো বড় অনেক যুদ্ধ হয়, রণক্ষেত্রে ভারতীয়দের কখনো জয় কখনো বা পরাজয়ে ঘটে। সে ইতিহাস আর এক মহাভারত। যুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সমঝতা ও একতার অভাবে বিদ্রোহ প্রশমিত হলো কিন্তু শেষ হলো না। যুদ্ধের রক্তঝরা দগদগে ক্ষত শুকলো বটে কিন্তু ভারতবাসীর মনে সেই গভীর ক্ষতের দাগ রয়ে গেল। ব্রিটিশ-রাজ এর অপসারণ, স্বাধীনতা অর্জন ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা-করণের আশা আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে বলবতী হয়ে তাতে অপ্রতিরোধ্য গতি সঞ্চারিত হলো। নানা জনে নানা পথ বেছে নিলো। সকলেরই লক্ষ্য কিন্তু এক—স্বাধীনতা লাভ। অনেকে আবার সশস্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লবকেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পথ মনে ভাবলো।

খৃষ্টাব্দ ১৮৫৭-এর পর ১৮৯৪তে পুণাতেই প্রথম গণপতি পূজা উপলক্ষ্যে ছাত্রগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শিবাজীর মতো বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি করে। চাপেকার ভাইরা যুবকদের শরীর-চর্চা এবং সামরিক শিক্ষা দানের জন্য শিবির স্থাপন করেন। র‍্যাণ্ড সাহেবের হত্যা সম্পর্কে কেশরী পত্রিকায় লেখার জন্য বালগঙ্গাধর তিলককে সাজা দেওয়া হয়। ঐ কেশরী পত্রিকাতেই আবার মজফরপুরে মিস কেনেডিকে হত্যার দায়ে বালক খুঁদিরামের ফাঁসী সম্পর্কে লেখার জন্য পুনরায় বালগঙ্গাধর তিলকের হলো কয়েক বৎসরের জেল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচনা দানের জন্য বিনায়ক ও তাঁর দাদা গণেশ সাভারকার-এর হলো সাজা। ইতিমধ্যে দেশের এখানে সেখানে চলেছে ইংরেজ হত্যা। এভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিপ্লব-বহ্নি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আবালবৃদ্ধবণিতাকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসাহী ও উদ্দীপ্ত করে তুলছে।

বাংলায় এলেন অরবিন্দ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র। এখানে তাঁদের আগমন বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে এক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী কর্মতৎপরতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে। বোমা ও অস্ত্র তৈরির গুপ্ত কারখানা নানা জায়গায় গড়ে ওঠে। ফলে সারা বাংলায় বিপ্লব-আন্দোলন সমুদ্র ঢেউ-এর মতো উত্তাল হয়ে ওঠে। হলো বঙ্গভঙ্গ। বিপ্লবের পালে লাগলো প্রচণ্ড হাওয়া। গড়ে উঠলো নানা জায়গায় নানা গুপ্ত সমিতি। বাংলার ঘরে ঘরে চলেছে মাতৃ পূজা, গানে গাথায় দেশ-মাতৃকার বন্দনা, ব্রিটিশ বিতারণ ও স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের শপথ

গ্রহণ। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গুপ্তহত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুক, রিভলবার ইত্যাদি লুণ্ঠন। এই প্রসঙ্গে ঐ সময়ের এক উল্লেখযোগ্য খুনের ঘটনা—দিন দুপুরে কুমিল্লা জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার হত্যা। তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ সরবরাহ করতেন।

শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বৃটিশের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে জার্মান সম্রাট কাইজার ভারতে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে উন্মুখ হলেন। বীর সাভারকার স্থল পথে কাবুলের মধ্য দিয়ে অস্ত্র চালানের চেষ্টা করছেন। আর জলপথে জাহাজ থেকে উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলে অস্ত্র সরবরাহ কালে বিপ্লবীদের সঙ্গে বালেশ্বরের নিকট বুড়ি বালামের তীরে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে। বুড়িবালাম বহু শহিদের রক্তে রাঙা হয়ে যায়। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে সে এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এভাবেই বিপ্লবের শোণিতাক্ত পিচ্ছিল পথে ভারত-মুক্তি এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তার বিরাম নেই। যুদ্ধ চলছে, চলবে—ক্ষান্ত হবে না।

ঘুমে সুদেবের চক্ষু মুদে এসেছে। তার নিদ্রাজড়ানো ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল—হাঁ দিদি, চলবে—আমিও শহিদ হবো। দেবযানী ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে চাদরটা গায়ের ওপর টেনে দেয়। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে সেটা সিক্ত করে। উর্মিলা দুয়ারে এসে উঁকি দিয়ে বলে—তোরা এখনও ঘুমোস নি। দেবযানী চক্ষু মুছে জবাব দেয়—শুতে যাচ্ছি মা, সুদেবকে ঘুম পাড়ালাম।

গভীর রাত্রি—সব নিশ্চুপ নিঝুম। বিছানায় শুয়ে দেবযানী আগামী-কালের কর্মসূচী ঠিক করতে গিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দিনের শুরু এবং শেষ কিরূপে সুসম্পন্ন করবে তা ঠিক করতে পারছে না—কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে পেচকের কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। দূরে জেলখানার রাত্রি দু'টার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করতে করতে কখন যেন সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

তখনো রাত পোহায়নি। একটা অস্বাভাবিক চিৎকার দিয়ে হঠাৎ দেবযানীর ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু কেন চিৎকার দিলো। নিশ্চয় কোন দুঃস্বপ্ন—নচেৎ চিৎকার দেবে কেন? নাকি অন্য কিছু। স্মৃতির কোঠায়

আতিপাতি করে খুঁজেও কিছু স্মরণে আনতে পারছে না। দেবযানী ঝিম ধরে শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে স্মৃতির জালে টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলি বোনে। শুধু ক্ষীণ আভাস : দুর্গম গিরি কান্তার—কেবল ছুটছে, ছুটছে। তারপর সব ফাঁকা, শূন্য। বাইরে থেকে কাকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। পাশের বিছানায় স্বপ্নের ঘোরে কিছুক্ষণ সুদেবের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তারপর হঠাৎ—দিদি, দিদি, ডাক দিয়েই চুপ। ইচ্ছা হলো ছোটবেলাকার মতো ছুটে গিয়ে সুদেবকে কোলা তুলে নিয়ে ষাট ষাট। বালাই। বলে সান্ত্বনা দেয়। পর মুহূর্তেই মনকে চোখ রাঙায় —না, মায়া মোহ আর কেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তো সব ছিন্ন করে চলে যেতে হবে। কি ভাবে কোন বেশে, কখন কি কি উপায় মা, ও মামার চক্ষু এড়িয়ে গৃহত্যাগ করবে—শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। বাইরে আলো ফুটতেই দেবযানী উঠে পড়ে। ভাইয়ের বিছানার ধারে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ তার নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। চোখ মুছে সুদেবকে রুদ্ধ কণ্ঠে ডাক দেয়। জেগে উঠে সুদেব দিদিকে দেখে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—একি, দিদি তুমি।

—হাঁ, আমিই তো। কেন, কি হলো ?

কথা না বলে সুদেব পাশ ফিরে গুম হয়ে শুয়ে থাকে। দেবযানীর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সব বৃথা—কোন সাড়াশব্দ নেই। নাচার হয়ে দেবযানী বিছানায় উঠে ভাইয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে অবাক—সুদেবের চোখ মুখ অশ্রু-সিক্ত। আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে ভাইয়ের চোখ মুখ মুছিয়ে দেয়।—ষাটষাট, করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—কি ব্যাপার। আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি—শুধু নাম ধরে ডেকে জাগিয়ে দিয়েছি।

সুদেব ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—তুমি কি বলবে ? ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে করতে তো হাওয়া হয়ে গেলে। কত ডাকলুম—দিদি ফিরে এসো, ফিরে এসো। একবারটি তাকালে না পর্যন্ত। কথা শেষে দিদির কোলে মাথা গোঁজে।

—ও হরি। এই ব্যাপারে। বুঝলুম স্বপ্ন দেখে মন খারাপ হয়েছে। রাত্রে যে ইতিহাসের কাহিনী শুনিয়েছি ঘুমের ঘোরে অবচেতন মনে তাই দেখেছো। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় নাকি বোকা ছেলে। এ বিষয়ে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি তো তোমাকে কতবার শুনিয়েছি। এখন তাঁরই একটা কবিতায় তোমাকে আদেশ করছি:

—ওঠো শিশু মুখ ধোও পরো নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

কবিতা পাঠ শেষে দেবযানী সুদেবের কপালে একটা চুমো দিয়ে উঠতে যেতেই সুদেব দিদিকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে বলে—স্বপ্ন তো বটেই। তবু জেগে উঠে সেই দুঃস্বপ্নের রেশ কাটাতে পারছি না দিদি। মন ভীষণ কেমন কেমন করছে।—তুমি আজ কোথাও যেয়ো না দিদি, বলেই সুদেব দিদিকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে। দেবযানী অসহায়ের মতো বসে পড়ে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে। আর বুঝি নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না। অতিকষ্টে উদগত অশ্রু রোধ করে নিজেকে সংযত করে একটু জোরের সঙ্গে সুদেবের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—দূর বোকা ছেলে, বারবার বলছি স্বপ্ন মিথ্যা, মিথ্যা, তবুও বুঝছে না। একটু জোর দিয়ে বলে—যাও মুখ ধুয়ে পড়তে বসো গে। আমি রান্না ঘর থেকে তোমার খাবার নিয়ে আসছি, একসঙ্গে বসে খাবো।

কলতলায় পৌঁছে দেবযানী আর স্থির থাকতে পারে না। অশ্রুসনয়নে কাঁদতে থাকে। কেঁদে কেঁদে মনের ভার কিছুটা লাঘব হলে পর মনকে রক্ত-চক্ষু দেখিয়ে পূর্বের মতো আবার শাসন করে—আর কান্না নয় —এই শেষ কান্না! গৃহত্যাগ কালেও আর কিছুতেই কাঁদতে পারবে না। মা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে। সেই চরম মুহূর্তে অচল অটল নিশ্চল থাকতে হবে। সারা দিনের কর্মসূচী যাতে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় মনে মনে সে সবের মোহড়া দিয়ে দেবযানী চোখ মুখ ধুয়ে রান্না ঘরের দিকে এগোয়। ঘরে ঢোকবার আগে মনকে আবার সাবধান করে—যতটা পারিস মায়ের মুখের দিকে কম তাকাবি। ঘরে ঢুকেই বলে—দাও মা, খেতে দাও।

—নে, বোস। সুদেবকে ডাক।

—সুদেবের খাবারটাও দাও। আমি নিয়ে যাচ্ছি। দু'জনে ঘরে বসে একসঙ্গে খাবো।

ঊর্মিলা কথা না বাড়িয়ে উভয়ের খাবারের রেকাবি দু'খানা দেবযানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—নে।

দেবযানী রেকাবি দু'খানা নিয়ে বেরিয়ে যায়। একবারও মায়ের মুখের দিকে চায় না—

শিশুকাল থেকেই দেবযানীর খেয়াল, খুশি, রাগ বিরাগ, আচার আচরণ, স্নেহ মমতা ইত্যাদি উর্মিলার নখ-দর্পণে। সুতরাং ঘরে ঢোকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেবযানীর মুখাবয়বের মুহুর্মুহু পরিবর্তন, হাবভাব ও কথাবার্তা উর্মিলা সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু কেন এবং কি এই অশান্তির জ্বালা তা সে বলতে পারছে না। শুধু অনুভব করছে। এ যেন ভূতের কানমলা—বোঝা যায়, দেখা যায় না।

মনের এই যন্ত্রণা নিয়েই উর্মিলা রান্না ঘরের কাজ করে যাচ্ছে। স্বামী বাজার নিয়ে এসে ঘরে রেখে বেরোবার সময় উর্মিলা বলে—একটু দাঁড়াও। রমেশ দরজার ধার থেকে স্ত্রীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকায়। স্ত্রীর মুখখানা বিষাদ-ঘন। কিছুটা অবাক হয়ে সে তাকে জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে ?

উর্মিলা পূর্বের মতোই গম্ভীর কণ্ঠে বলে—যানীকে দেখ।

রমেশ সহজ সরল কণ্ঠেই জবাব দেয়—না, সকাল থেকে দেখিনি। কিন্তু কেন ? হঠাৎ আবার দেখবার মতো কি ঘটলো ? রমেশের আপিসের বেলা হয়েছে সুতরাং তাড়া আছে। তার উপর উর্মিলার কোন উত্তর নেই। বিষয়টা স্ত্রীর খেয়াল খুশি ধরে নিয়ে এ সম্পর্কে আর উচ্চবাচ্য না করে চলে যায়। তবু ঘরে ঢুকবার মুখে একবার ছেলেমেয়ের ঘরে উঁকি দেয়—ভাই বোন ঘরেই আছে। ভাইকে বোন কি যেন বোঝাচ্ছে। কাজেই উর্মিলার কথার কোন মানে খুঁজে না পেয়ে রমেশ স্বস্তি বোধ করে। চান টান সেরে রান্না ঘরে খেতে বসে রমেশ একপলক স্ত্রীর মুখের দিকে চায়। সে মুখ গম্ভীর ও চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হাল্কা করার উদ্দেশ্যেই রমেশ খেতে খেতে বলে—তোমার কথা মত যানীকে দেখলাম —ভাইকে পড়াচ্ছে।

—হুঁ, বলেই উর্মিলা চুপ হয়ে যায়। রমেশ চেয়ে দেখে স্ত্রীর মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। আপিস যাবার তাড়ায় সে আর বাক্যব্যয় না-করেই খাওয়া শেষে উঠে পড়ে।

ভাইয়ের পাঠন্য শেষ হতেই দেবযানীর মামার কথা মনে পড়ে। মামা এখন আপিস চলে যাবেন, ফিরবেন সেই রাত্রে। এখন দেখা না হলে

তাঁর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না। বুকটা তার হু হু করে ওঠে। দেবযানী উঠে পড়ে। মামার ঘরে ঢুকে দেখে তিনি নেই। তাঁর জামা কাপড় আলনায় রয়েছে। তা হলে তিনি খেতে গেছেন। কিন্তু এ-সময়ে মামাকে দেখতে রান্না ঘরে গেলে মায়ের মনে সন্দেহের উদ্রেক অবশ্যম্ভাবী। কেননা এখন রান্না ঘরে যাবার কোন অজুহাত তার নেই। খাওয়া শেষে মামাকে টিফিন ও পান দেবার জন্য মামীও এ-ঘরে আসবেন। তাহলে উপায়। মামাকে দেখা ও প্রণাম করা এ জীবনে বোধ আর হলো না। দেবযানী খুবই মুষড়ে পড়ে। চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করে আর কি উপায়ে মামীর অসাক্ষাতে তাঁর দেখা পাওয়া ও তাঁকে প্রণাম করা সম্ভব। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। মামা বাড়ি থেকে বেরনোর পরে যদি হঠাৎ তাঁর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায় তা হলে কেমন হয়—দর্শন ও প্রণাম উভয় কাজই নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়-নাকি। কিন্তু মামা বেরোবার পর মা এসে যদি তার খোঁজ করে সেজন্য একটা ওজর দেখানো দরকার বইকি। সুতরাং দেবযানী ঘরে এসে সুদেবকে বলে—আমি ধীরাদের বাড়ি যাচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবো। বারান্দায় ফিরে দেখে—মামা কলতলার দিকে যাচ্ছেন। দেবযানী আর দেরি করে না। পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সময় কাটাবার জন্য কিছুক্ষণ বকুল গাছটার নিচ থেকে বকুল ফুল কুড়োয় তারপর গলি পথ ধরে বড় রাস্তার দিকে এগোয়। যেতে যেতে কিছুক্ষণ পরপরই কেবল পেছন পানে চায়। মামার আসবার সময় হয়েছে অনুমান করে দেবযানী এবার পেছন ফিরে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করে। খানিক যেতেই মামাকে দেখতে পায়। কাছাকাছি হতেই দেবযানী বলে—একটু দাঁড়াও মামা তোমাকে একটা প্রণাম করি। ওর খেয়াল খুশি রমেশের অজানা নয়। ওদিকে আপিসের সময় হয়েছে—দেরি করবারও সময় নেই। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে মামা দাঁড়ান। নিজেকে সংযত করে দেবযানী কোঁচড় থেকে বকুল ফুল নিয়ে মামার পায়ের উপর রেখে প্রণাম করে। মামা অবাক হয়ে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেই হাঁটতে থাকেন। কেন হঠাৎ পথের মাঝে এই ভাবে প্রণাম করা তাড়াহুড়ায় জিজ্ঞাসা করবার ফুরসৎও তাঁর হয় না।

মামাকে প্রণাম করতে পেরে দেবযানী মনের মধ্যে এক প্রগাঢ় প্রশান্তি অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে মাকে কি ভাবে প্রণাম করবে ভেবে

মন বেদনায় ভরে ওঠে। যে কোন ছলেই মাকে প্রণাম করুক আর মনকে যত ভাবেই বোঝাক না কেন, আবেগী প্রণাম কালে সে কিছুতেই চোখের জল রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না। ফলে এক মহা অনর্থপাত ঘটে সব কিছুই পণ্ড করে দেবে। না, না, তা সে কিছুতেই হতে দেবে না, হতে দিতে পারে না। মাতৃ-প্রণাম আর তার হবে না। দূর থেকে মনে মনে জননীকে, (জঠরে না হলেও) স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে প্রণাম করে চলে যাবে।

ভারি মন নিয়েই দেবযানী বাড়ি ফেরে। ঘরে ঢুকেই দেখে সুদেব বইটই গুছোচ্ছে। দিদিকে দেখেই বলে আমি চানে যাচ্ছি। দেবযানী কাছে এসে কোঁচড় থেকে বকুল ফুলগুলি হাতে নেয়—দেখ কত ফুল এনেছি। নে, মাথা পাত। সুদেবের মাথায় ফুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বলে—মা সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানাই—পরীক্ষায় ভাল ফল করবি—প্রথম হবি।

—এই আশীর্বাদের ফাঁকে তোমাকে একটা প্রণাম করি দিদি। সুদেব দিদির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে ভাইকে দু'হাত দিয়ে তুলে কপালে চুমু দিয়ে বলে—বাহাদুর ছেলে—বাপ মার, দশের দেশের মুখোজ্জল করো। যাও চট্ করে স্নান করে এসো। পুকুরে বেশীক্ষণ থেকো না। আমার কলেজের সময় হয়ে এলো। সুদেব চলে যেতেই দেবযানীর চোখের জল আর বাঁধ মানে না। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বইগুলিকে অতি যত্নে গুছিয়ে রাখতে রাখতে মনে মনে বলে—তোদের পাট সারা হলো—জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। চোখ মুছে দেবযানী কাপড়চোপড় নিয়ে কলতলার দিকে যায়।

চান সেরে ঘরে এসে দেখে সুদেব এসে গেছে। তাকে রান্না ঘরে খেতে পাঠিয়ে দেবযানী মায়ের মুখোমুখি হবার জন্য নিজেকে তৈরি করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়। আসনে বসে এক ফাঁকে মায়ের দিকে চেয়ে আঁৎকে ওঠে—মুখখানা ছোট হয়ে গেছে—চিন্তা জ্বরে জর্জর, বিষাদ-মলিন। তবে কি মায়ের মনের স্বতঃস্ফূর্ত কোন চেতনা জেগেছে—আগাম কোন শঙ্কার উদয় হয়েছে যে, সে চলে যাচ্ছে—চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছে। না, সে আর ভাবতে পারছে না। নিজেকে সামলে নিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে মায়ের বিরস ভাব কাটাবার উদ্দেশ্যে সুদেবের

সাজে ছেলে মেয়ে বকর বকর করতে থাকে—আসন্ন পরীক্ষায় ফল কেমন হবে, প্রথম স্থান অধিকার করবে কিনা, স্কুল থেকে কখন ফিরবে, ফিরে আবার বেরুবে কিনা, আশ্রমে যাবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সাবধানে মায়ের মুখের দিকে চায়, না, তাঁর মুখে কোন বৈলক্ষণ্য দেখতে পায় না।

খাওয়া শেষে ভাই বোন উঠে চলে যাবার সময় উর্মিলা ডেকে বলে—আমি বিকেলে বেরুচ্ছি। সন্ধ্যার আগেই ফিরবো। তোমাদের বিকেলের খাবার রান্না ঘরে ঢাকা থাকবে—খেয়ে নেবে। আমি না ফেরা পর্যন্ত সবলা বাড়ি থাকবে। হাঁ, বলেই সুদেব চলে যায়। আর দেবযানী দাঁড়িয়ে থেকে বলে—আমি কলেজ থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে বেরবো, ফিরতে দেরি হতে পারে—তুমি কিছু ভেবো না মা। কথা শেষে মায়ের মুখের দিকে না তাকিয়েই দেবযানী বেরিয়ে যায়।

কলতলায় গিয়ে মায়ের জন্য কিছুক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে মনের ভার লাঘব করে চোখ মুখ ধুয়ে দেবযানী ঘরে এসে দেখে সুদেব স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। দেবযানী তার কাছে গিয়ে বলে—আমার তো যেতে কিছু দেরি হবে। তুমি যাও লক্ষ্মী ভাই। তারপর সুদেবকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দিয়ে তাকে শেষ বিদায় দেয়।

ভাইকে ছেড়ে দিয়ে মন তার ব্যথায় টন টন করে ওঠে। ব্যথার ভারে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে—সব ফাঁকা শূন্য মনে হচ্ছে। মনকে শাসন করে কান্না সংবরণ করে দেবযানী বাক্সটা টেনে এনে খোলে। কার্তুজ সহ রিভলবার এবং যে জামা কাপড় পরে গৃহত্যাগ করবে তা একসঙ্গে একটা পাতলা চাদর দিয়ে মুড়ে অন্য কাপড় চাপা দিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে যথা স্থানে রাখে। তারপর কলেজে যাবার জামা কাপড় পরে বইখাতা হাতে উঠনে নামে। অন্যদিনের মতোই—মা, আমি যাচ্ছি। দরজার ধার থেকে মায়ের কণ্ঠ শোনা যায়—সকাল সকাল ফিরিস। মায়ের গলা শুনে দেবযানী সদর দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। ইচ্ছা হলো দৌড়ে গিয়ে বলে—তোমার সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না। এজন্মের মতো বিদায় দাও মা। চোখের কোণে অশ্রু জমাট বাঁধে। অশ্রু মুছে, কান্না রোধ করে দেবযানী দ্রুত হেঁটে গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে কলেজমুখী হাঁটতে থাকে।

সে দিন দেবযানীর কলেজে উপস্থিতি কেবল লোক-ভোলানো ব্যাপার। আসল উদ্দেশ্য হলো সেখান থেকে গুরখার সঙ্গে বেরিয়ে রাতের সামরিক অভিযানের স্থানগুলি চিনে নেওয়া। ক্লাশে বসে দেবযানী শুধু উসখুস করছে কখন বেলা ছুটো হবে। এক সহপাঠিনীর হাতঘড়ি দেখে দেবযানী ক্লাশ ছাড়ে। কলেজের প্রধান ফটকের কাছে এসে গেটের বাইরে কিংবা আশপাশে কোথাও গুরখাকে দেখতে না পেয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়। গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে পাছে দারোয়ানের সন্দেহের উদ্রেক হয় সে ভয়ে সে গেটের বাইরে চলে যায় এবং গুরখাকে বাঁদিকের লতা-কুঞ্জের ধারেই দেখতে পায়। দেবযানীকে দেখেই গুরখা হাত ইশারায় তাকে ডান দিকের রাস্তা ধরে এগোবার নির্দেশ দেয়। কিছুক্ষণ পর সেও দেবযানীর অনুগমন করে। তবে কাছে না গিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে রাস্তার ডান পাশ ধরে চলতে থাকে। বিষয়টা বুঝতে পেরে দেবযানী রাস্তা ও তার আশ পাশের ওপর নজর রেখে চলতে থাকে যাতে রাতের বেলা একা একা চলা কালে পথটা চিনতে অসুবিধা না হয়।

চৈত্র-এর প্রথম—রোদের উগ্রতা তেমন বাড়েনি। বসন্তও পালাই পালাই করে তখনও পালায় নি। রাস্তার উভয় পার্শ্বের তরুবীথি গুলি নানা রঙের পুষ্প সম্ভার নিয়ে যেন পথিককে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। রাস্তার এই অপরূপ মনলোভা সাজসজ্জা সংগ্রামী দয়িত সন্দর্শন ও আশু সংগ্রাম স্থলের পরিচয় ও পরিদর্শনের পথে দেবযানীর শ্রান্তি ক্লান্তি অনেকাংশে লাঘব করে। এভাবেই একটানা চলে উভয়ে শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌছে। চলতে চলতে এখানের রাস্তাটা দেবযানীর যেন চেনা চেনা মনে হয়। উভয় দিকের ঝোপ-ঝাড় মাঠ-ঘাট যেন সে আগে দেখেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে—হাঁ, এখান দিয়েই তো সে চাঁদমারী, পিকনিক ইত্যাদিতে যাতায়াত করেছে। সুতরাং অপরিচয়ের ভয় ভীতি কেটে গিয়ে অঞ্চলটাকে অনেক আপন বলে মনে হয়। হঠাৎ গুরখা কাছে এসে দূরে ঐ অনুচ্চ টিলাটার উপরে টহলদার সান্ত্রীর প্রতি দেবযানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে —ওটাই অস্ত্রাগার। অতঃপর রাস্তা ধরে কোণাকুণি চলে এক জায়গায় টিলার উপর পুলিশ লাইন ও ব্যারাক আর তারই অনতিদূরে অন্য টিলার ওপর সাহেবদের ক্লাব দেখিয়ে দেয়। পরিচায়কের কাজ শেষে গুরখা বলে —এবার আমি চলি দিদি—আমার এখনও অনেক কাজ বাকী। আশা করি তুমি সব দেখে শুনে বুঝে নিয়েছ। গুরখা আর দাঁড়ায় না।

কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে—তোমাকে প্রণাম করতে এলাম দিদি। উবু হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দেবযানী তাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটা চুমো দিয়ে বলে—বীর হও, উন্নতশির হয়ে চলো, দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করো। গুরখা আর দাঁড়ায় না। দ্রুত হেঁটে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বেলা পড়ে আসছে। আর দেরি করলে বাড়ি পৌঁছে সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসা মুশকিল হবে। দেবযানী রাস্তার দু'ধারের কয়েকটা ঝোপঝাড় যুদ্ধের কৌশল হিসাবে আত্ম-রক্ষার জন্য বেছে নেয়। কেননা নিজেকে আড়ালে রেখে শত্রুকে আক্রমণ এবং সুযোগ বুঝে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ধ্বংস সাধনই হলো রণনীতি। রাতের অন্ধকারে জায়গা চিনতে যাতে কোন ভুলভ্রান্তি না ঘটে তার জন্য দেবযানী আরো কয়েকটা লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে।

বাড়ি পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়তেই সরলা দরজা খুলে দিয়ে বলে—এ মাসীমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তিনি তোমার ছোট মামার বাড়ি হয়ে আসবেন। খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে গেলে তোমাকে সকাল সকাল ফিরতে বলেছেন। দাদাবাবু আগেই খেয়ে বেরিয়ে গেছে দেবযানী ঘরে ঢুকে বই খাতা রেখে কাপড় চোপড় ছেড়ে কলতলা যায়। সেখান থেকে ফিরে টেবিলে বসে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর খাতা থেকে একখান কাগজ ছিঁড়ে লিখতে বসে :—

মা, করুণাময়ী মা, আমি বিদায় নিচ্ছি। তোমার কাছ থেকে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—বিদায় দাও মা, ভিক্ষা চেয়ে আমি কিছুতেই চলে যেতে পারতাম না মা, পারতাম না। তাই তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করে তোমার অজ্ঞাতে চলে যাচ্ছি। যার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধেছি তারই সাথী হয়ে স্বদেশের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে চলেছি। আশীর্বাদ করো মা, যুদ্ধ জয় করে বিজয়িনী হয়ে আবার তোমার কাছে যুগলে ফিরে আসতে পারি।

তুমি ও মামা আমার শতকোটি প্রণাম নিও। দেরের জন্য চির সস্নেহ আশীর্বাদ রেখে গেলাম। ইতি—

পুনঃ চিঠিটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলো। প্রণতা তোমার যানী

চিঠিটা ভাঁজ করে খাতার ভেতর রাখতে গিয়ে কপোল বেয়ে কয়েক

চোখের জল তাতে গড়িয়ে পড়ে। আঁচল দিয়ে মুছে খাতাটা টেবিলে রেখে দেবযানী কলতলায় যায়। সেখান থেকে রান্না ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারে। বেরিয়ে যাবার সময় সরলা দেবযানীকে বলে—আমি রান্না ঘরের কাজ সারছি। তুমি বার হলে বলো। দেবযানী—হুঁ, বলেই উঠোনে এসে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার আঁধার গাছপালা ঘেরা ছোট্ট উঠোনটুকুতে নেমে এসেছে। আর দেরি করা ঠিক নয়। মা এসে পড়লে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এই ভরা-সাঁঝে তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ জ্বালা ও ধূপ-ধুনো দেওয়া দরকার। দেবযানী তাড়াতাড়ি কোনরকমে প্রদীপটা জ্বালিয়ে দেয়। ধূপ-ধুনো আর দেওয়া হয় না। কেননা তাতে অনেক সময় লাগবে। তুলসী মঞ্চে হাঁটু-গেড়ে প্রণাম করে দেবযানী ঘরে ফেরে। কাপড় চোপড় পাল্টে রিভলবার আর কার্তুজসহ বেল্টটা শাড়ির ভেতরে কোমরে বাঁধে এবং তার উপর চাদরখানা জড়িয়ে নেয়। বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান দেবযানী বাতিহীন স্বল্প অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দিয়ে তার টস্‌টস্‌ করে জল পড়ছে। ঘরখানার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। টেবিল চেয়ার এবং বইগুলিকে সস্নেহে হাত বুলিয়ে সুদেবের বিছানার ওপর উবু হয়ে পড়ে বালিশটাকে ইনিয়ে বিনিয়ে আদর করে চুমো দেয়। অশ্রুজলে বালিশটা ভিজে যায়। ঘর থেকে বেরোবার মুহূর্তে আর একবার পেছন ফিরে চেয়ে দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় নেমে মায়ের ঘরে ঢোকে। খাটে উঠে মায়ের বালিশের ওপর মাথা রেখে মা মা বলে কাঁদতে থাকে। তারপর বালিশটা মাথায় নিয়ে—মা, চললুম বলে সেটাকে আবার যথাস্থানে রেখে খাট থেকে নেমে খাটে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। আর ফিরে চায় না। উঠোনে নেমে তুলসী মঞ্চে আবার একবার মাথা ঠুকে দুয়োরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সজল চোখে বাড়িটার দিকে চেয়ে সরলাকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলে দেবযানী বেরিয়ে যায়। আর ফিরে তাকায় না। পা চালিয়ে গলিটা ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছে। ততক্ষণে রাতের অন্ধকার ধরণীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আত্মপ্রত্যয় অটুট রাখতে মনে মনে :

"অক্ষয় কিরীট শির তব পদধূলি
মাতৃনামে অক্ষয় কবচ বুকে
সম্মুখ সমরে বিমুখ করে কে মোরে।"

এই সংকল্প নিয়ে সেবকানী নির্ভীক দৃঢ় পদক্ষেপে শহরতলীর পুকুর দিকে অভিমুখে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে এগিয়ে চলে।

শৈল-কিরীটিনী, সরিৎ-মালিনী, সাগর চুম্বিতা এই শান্ত শীতল [illegible] ঘেরা ছোট্ট জনপদে রাত্রি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। তিন শতাব্দী ব্যাপী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো পরাধীনতার শৃংখল টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলার জন্য বিপ্লবের দামামা বাজছে। বিপ্লবীদের সাজ সাজ রব। সকলেই উৎসাহে উদ্দীপ্ত ও রণসাজে সজ্জিত। রক্তে যেন তাদের আগুন লেগেছে। সকলেরই অন্তরে বাঁধন-ছেঁড়ার গান গর্জে ওঠে—"আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান"। রণোন্মত্ত বিপ্লবী বাহিনীর এগিয়ে চলার পথে এক মহাসঙ্গীতের ধ্বনি বুঝি ভেসে আসছে:

ঝঞ্ঝা বাদলে অশনি আঘাত
মহারণে সহি ঘাত প্রতিঘাত;
হৃদয়ের বল অটুট রাখিয়া
দেবতা আশীষ মাথে
তুলে ধর আজ বিজয় নিশান
বজ্র কঠোর হাতে।

এক অবিস্মরণীয় স্মরণীয় রাত্রি নেমে এলো। আম্রকুঞ্জে ও অন্যান্য স্থানে প্রহরী বদল ঘটেছে। ছেলেদের পরিবর্তে মেয়ে মোতায়েন করা হয়েছে। সুদেষ্ণা বিশেষ বিশেষ সভ্যদের মধ্যে অর্থ, ও প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ইত্যাদি বিলি-ব্যবস্থার জন্য সেবা কেন্দ্রে ব্যস্ত। নারী বাহিনীর ওপর অর্পিত কর্মভারও সে এখান থেকেই পরিচালনা করছে। জিরো আওয়ারের আর দেরি নেই অথচ মাহারাজ-এর দেখা নেই। তবে কি তিনি অর্থ ও প্রাথমিক চিকিৎসার ভেষজাদি না নিয়েই চলে গেলেন। সুদেষ্ণা খুবই বিচলিত। শেষ মুহূর্তে আর দেখা হলো না। এ জীবনে হয়তো আর তা হবার নয়। স্বাধীনতা অর্জন যাঁর মূল মন্ত্র—দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্ন—অন্য চিন্তার অবসর তার কোথায়। এই চরম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অর্থ ও ওষুধপত্রে যে তার একান্ত প্রয়োজন। সুদেষ্ণা উঠে মহারাজ-এর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। না, তিনি নেই। [illegible]

[illegible] সুদেষ্ণা ফিরে চলে। এমনি সময় [illegible] [illegible]

[illegible] ধ্বনি কানে আসে। বুঝলো এদিকে কেউ আসছে। এ সময়ে তিনি ভিন্ন আর কে আসবে! এ জিজ্ঞাসা মনে জাগতেই হৃদয়ে অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার হয়—অস্বাভাবিক একটা স্পন্দন জাগে। সারা শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে! সুদেষ্ণা দুয়ার থেকে সরে নিজের ঘরে ফিরে আসে। অন্যমনস্কের মতো বাকী কাজটুকু সেরে মহারাজার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে।

মহারাজ অন্যদিনের মতোই স্কুলের শিক্ষকতা শেষে খেলার মাঠে আসেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেদের উৎসাহ দিয়ে আখড়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। আখড়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় ক্ষীণ। তবুও তিনি সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সকলকে উৎসাহিত করে বেলা শেষে আপন কুটিরে ফিরে চলেন। পড়ন্ত রোদের ম্লান আলোতে গাছপালা গুলির দীর্ঘ অপরিস্ফুট ছায়া-পাত চলার পথে যেন এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে মহারাজ অমৃতকাননের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে অবাক হয়ে যান। এমন নৈসর্গিক দৃশ্য আগে তো কোন দিন তার দৃষ্টি কাড়েনি! আজ কেন এমন হলো! এ যেন ভিন্ন রকম—মায়া-মোহময় এক অনুভূতি! 'মায়ামোহমিদং অখিল বিশ্বম্'—! এতো বৈকল্য! এর তো আর কোন ব্যাখ্যা নেই। মহারাজ ঘাবড়ে যান! সেই মুহূর্তেই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" মনে হতেই চিত্তের বিহ্বলতা কেটে যায়! আশ্বস্ত হয়ে তিনি দ্রুতপদে চলতে থাকেন।

আপন কুটিরে এসে আহ্নিকাদি শেষে সামান্য কিছু আহার করেন। বাকী শুকনো খাবার ঝোলায় ভরে নেন। অতঃপর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, ঘরে আর কিছু পড়ে রইল কিনা এক নজরে দেখে অর্থ ও ওষুধ সংগ্রহের জন্য যখন সেবা-কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন ঘড়িতে তখন রাত সাতটা। আর দেরি করার ফুরসৎ নেই! আম্রকুঞ্জে এসে প্রথমেই তাঁর নিজের ব্যবহৃত ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে কোথাও আর কিছু ফেলে রেখে যাচ্ছেন কি না তা দেখে সেবা-কেন্দ্রে যান এবং অপেক্ষমানা সুদেষ্ণাকে দেখে অবাক হন! তার উপর রাতের আঁধারে শহরের নানা কর্মের গুরুভার ন্যস্ত। এ সময়ে তার এখানে থাকার কথা নয়। কেননা প্রত্যেকের জিনিসপত্র নামে নামে লেবেল আঁটা রয়েছে। সুতরাং বন্টনের

জন্য কারো উপস্থিতির কোন ব্যবস্থা [illegible] প্রত্যেকেই নিজ নিজ জিনিষ আলমারি থেকে [illegible] ঘটনাটা কী ? বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করে আপন মনের [illegible] চেপে রেখে মহারাজ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন—আমার জিনিষপত্রগুলি দাও। আমার জন্য তোমার দেরি হলো। যে সব গুরুত্বপূর্ণ কর্মের ভার তোমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা সম্মুখ রণাঙ্গণে যুদ্ধরত সৈনিকের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। জিনিশগুলি নিয়ে ঘড়ি দেখে মহারাজ বিনা বাক্যব্যয়ে তড়িঘড়ি দরজার দিকে এগোন।—যুদ্ধকালে আবার সাক্ষাৎ হবে—মাভৈঃ, মাভৈঃ,—হবে জয়, নাহি ভয়, বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে নেমে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যান। সুদেষ্ণা তাঁকে অনুসরণ করে দরজার ধারে গিয়ে চিত্রার্পিতবৎ অচল হয়ে সজল নয়নে অন্ধকারে শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। যা বলার ছিল তা বলা হলো না। কোন দিন হবে কিনা তা ভবিতব্যই জানেন। রিক্ত হৃত-আশ সুদেষ্ণার বুক-ভাঙা বেদনার দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে বুঝি অন্ধকারে মিশে গেল।

আত্মস্থ হতেই সুদেষ্ণা পেছন ফিরে আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলে—ফাঁকা, দেরাজ টেনে দেখে ফাঁকা। চেয়ার টেবিল কাঠের তাক—সবই ফাঁকা—সবই শূন্য। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—ফাঁকা—শূন্য। এই অসীম শূন্যতা বুঝি আর কোন দিন ভ'রে উঠবে না—শেষ হবে না। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হতাশার অন্ধকার তাকে বুঝি চেপে ধরেছে। এই ঘরের নানা স্মৃতি তার চতুর্দিকে পোকার মত কিলবিল করে যেন তাকে দংশন করছে। না সে আর সহ্য করতে পারছে না। এই অন্ধকার ঘরে আর কোনদিন বাতি জ্বলবে না। চোখের কোণে অশ্রু জমে ওঠে। চোখ মুছে নিজেকে সুস্থির সংযত করে সুদেষ্ণা দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে যায়। এই সংকটপূর্ণ যুদ্ধকালে মোহাবিষ্ট হয়ে স্বার্থহানিকর শোকে অভিভূত হওয়া অনুচিত ও ক্ষতিকর। সুতরাং কর্মতৎপর হয়ে সাংকেতিক হাততালি দিয়ে প্রহরীদ্বয়কে ডেকে এনে আম্রকুঞ্জের পাহারার কাজ ন্যস্ত করে অন্যত্র তার উপর ন্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার সুষ্ঠু সম্পাদন করে তৎপর হয়।

সূর্য পাটে বসেছে। সন্ধ্যা তার কালো আঁচল খানি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে

নিয়ে দিনের শেষ রশ্মিটুকু ঢেকে দিয়েছে। যুদ্ধে চলার পথে বিপ্লবী বাহিনী উর্ধ্বে সান্ধ্য গগনে উজ্জ্বল রক্ত-রাঙা জ্যোতিষ্কের যাত্রা-শুভ-এর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছে। রণ-ডঙ্কার গুরু গম্ভীর দ্রিম্-দ্রিম্ ধ্বনি ও তূর্য-নিনাদে যেন আকাশ বাতাস মুখরিত। শুনতে পাচ্ছে:

শুভ জয় যাত্রা পথে চল, কদম কদম
এগিয়ে চল; চলরে চলরে চল।

অনুতোষ বাহিনীর অন্যান্য পল্টন অধিনায়কদের সঙ্গে রাতের আঁধারে এক গোপন আড্ডায় সম্মিলিত। দলের সভ্যদের বাড়ি বাড়ি থেকে সংগৃহীত বন্দুকগুলি সেখানে জড় করা আছে। সমাগত বিপ্লবীদের সকলেরই যোদ্ধৃ-বেশ—ক্রশ বেল্টের সঙ্গে একদিকে কার্তুজ সহ খাপের ভেতর রিভলবার, অন্যদিকে খাপের ভেতরে লম্বমান দীর্ঘ একখানা ছোরা। পৃষ্ঠ দেশে হ্যাভার-স্যাক্-এ ফার্স্ট এইড বক্স। জলের বোতল, খাবার ইত্যাদি। সকলেরই চোখমুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার অধীর আগ্রহ উদগ্রীব। তাজি-ঘোড়ার মতো ছুটবার অপেক্ষায় যেন টগবগ করছে।

অনুতোষ বন্দুকগুলি একে একে পরীক্ষা করছে। সবগুলি ভাল এবং সযত্নে রক্ষিত। কিন্তু বন্দুকের নলে (বোর-এ) গুলি ভরতে গিয়ে অনুতোষ হতবাক। একটা গুলিও বন্দুকের ছেঁদায় ঢুকছে না। ঘাবড়ে গিয়ে সে নিজেকেই বুঝি প্রশ্ন করে—এ কি হলো! একটি বন্দুকও যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। এখন উপায়! অন্য বন্দুক যোগার করবারও তো আর সময় নেই। অনুতোষ খুবই মুষড়ে পড়ে। মুখে তা প্রকাশ করে না। সহযোদ্ধাদের মুখেও হতাশার আভাষ। তাদের আশ্বস্ত করবার জন্যই বুঝি অনুতোষ জোরের সঙ্গে বলে—কুছ্ পরোয়া নেই। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হবে। সুতরাং এই বন্দুক কয়টা আমাদের কাজে না আসার ক্ষতিটা পুষিয়ে যাবে। সবাইকে আশ্বাস দিলেও অনুতোষ নিজে কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারছে না। কেননা আক্রমণ কালে এই দূর পাল্লার বন্দুকগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। বন্দুক সংগ্রহকালে বন্দুকের বোরের (নলের) নম্বর সংগ্রাহক জেনে নিলে ঐ নম্বরের কার্তুজ সংগ্রহের কোন অসুবিধা দেখা দিত না। নিজেদের অসাবধানতাই এই মারাত্মক ভুল ও বিভ্রাটের জন্য দায়ী। বিষয়টা দলের কর্তাদের গোচরে আনারও আর অবকাশ নেই। এই পরিস্থিতির

পরিপ্রেক্ষিতে অনুতোষ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আক্রমণাত্মক রণ-কৌশল স্থির করে যুদ্ধস্থল অভিমুখে যাত্রা করে।

সশস্ত্র অভিযানের জিরো আওয়ার (নির্ধারিত সময়) এগিয়ে আসছে। বিপ্লবী বাহিনীর সকলেই সন্তর্পণে সংগোপনে যুদ্ধক্ষেত্রের লক্ষ্যস্থল অভিমুখে হেঁটে, মোটর গাড়ি, সাইকেল, কিংবা ট্যাক্সি দখল করে—যে যেভাবে পারে সকল বাধা বিঘ্ন হেলায় তুচ্ছ করে দুরন্ত সাহসে, প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে যেন দিগ্বিজয়ে চলেছে। মহারাজ সময় মতোই তার পর্যবেক্ষণ স্থলে এসেছেন। বড়দাও যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছেছেন।

অন্ধকারে চলতে অনভ্যস্ত দেবযানী গায়ের চাদর খানাকে বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে কোমর অবধি কোমরবন্ধের মতো পরে ঢিলে-ঢালা পোশাকটাকে আঁটসাঁট করে যোদ্ধবেশে রাত্রি নিশিথে একা-সন্তর্পণে সঙ্গোপনে সদর রাস্তা ধরে না-চলে পাশের ঝোপঝাড় কাঁটাবনের আড়ালে আবডালে লক্ষ্যস্থল অভিমুখে এগোচ্ছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি দূরবর্তী একটা টিলার বাতির ওপর নিবদ্ধ হয়। আরো এগোতেই স্পষ্ট দেখতে পায় টহলদার সান্ত্রীর কাঁধের বন্দুকের ডগায় সঙ্গিন উজ্জ্বল আলোকে চিক চিক করছে। ঐ টিলার ওপরে নিশ্চয়ই গুরখা প্রদর্শিত অস্ত্রাগার। তার বিপরীত দিকের রাস্তার ওধারে অন্ধকারে ঢাকা প্রকাণ্ড ঝোপটাই তার লক্ষ্যস্থল। ঝোপটার কাছে গিয়ে দেবযানী দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে দেখে সামনের রাস্তাটা ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঢালু হয়ে গেছে। নিঝুম রাত্রি। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। রাত্রি কত তাও দেবযানী অনুমান করতে পারছে না। ঝোপের পাশে সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি রাস্তার ওধারে টিলাটার দিকে পড়তেই মনে হলো অন্ধকারে কতগুলি মূর্তি যেন নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি পায়ে পায়ে টিলা বেয়ে উপরে উঠছে। হয়তো অভিযানের অগ্রদূত—পেছনে আরও আছে। কিন্তু বহুক্ষণ চেয়ে থেকে আর কিছু নজরে আসে না। যাই হোক একটা কিছু ঘটতে চলেছে। দেবযানী হুঁশিয়ার হয়ে রিভলবার হাতে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টি তার টিলার ওপর নিবদ্ধ। হঠাৎ পরপর কতগুলি গুলি ও বোমার শব্দ কানে আসে। সঙ্গে সঙ্গে টিলার বাতি নিবে যায়। দেবযানী বুঝলো সত্যিকার বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে এবং অস্ত্রাগার দখলের লড়াই চলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝোপটার ধার দিয়ে আরো এগোতেই মনে হলো রাস্তার

ওখানে অদূরে টিলাটার পাদদেশে দুটো কালো মূর্তি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দ্রুতগামী একটা মোটর গাড়ির শব্দের সঙ্গে হেডলাইটের তীব্র আলোতে রাস্তা ও তার দুপাশের ঝোপঝাড় আলোকিত। দেবযানী ঝোপের আড়ালে আরও এগোয়। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছে ফৌজী পোশাকে দুই ব্যক্তি ছুটে এসে ফৌজী কায়দায় হাত তুলে হাঁক পাড়ে—হল্ট। গাড়িটা তৎক্ষণাৎ জোরে ব্রেক্ কষে থেমে যেতেই তারা গুলি চালায়। গুলিতে গাড়ির ভেতরে কেউ আহত হয়েছে কিনা বোঝা না গেলেও সে দেখতে পাচ্ছে গাড়ি ছেড়ে একটা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। লোকটা কোন দিকে দৌড়চ্ছে অন্ধকারে তা ঠাহর করেই দেবযানী গুলি চালায়। অব্যর্থ লক্ষ্য। লোকটা চিৎকার দিয়ে পড়ে যায়—আর ওঠে না। প্রহরীদ্বয় হকচকিয়ে যেদিকে চিৎকার ও গুলির শব্দ হয় সেদিকে তাকায়। অন্ধকারে কিছুই তাদের নজরে আসে না।

ঘটনাটা তাদের নিকট হতবুদ্ধিকর। এখানে তারা দু'জন ছাড়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই। সুতরাং এই অন্ধকারে কে বা কারা পলাতককে গুলি করলো? তারা দৌড়ে গাড়িটার কাছে গিয়ে দেখে গাড়ি ফাঁকা দু'টো দরজাই খোলা। সম্মুখের বাতি দুটো তখনও জ্বলছে। তবে কি দু'জনেই একসঙ্গে পালাচ্ছিলো? বেগতিক বুঝে পরিচয় (identity) লোপ করার জন্য একজন অপরকে গুলি করে পালিয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার জট খোলার উদ্দেশ্যে প্রহরীদের একজন যেদিকে গুলির আওয়াজ ও চিৎকার শুনছে সেদিকে ধেয়ে যায়। টর্চ জ্বেলে দেখে ঝোপটার অনতিদূরে খাকি পোষাক পরা রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটা লোক মরে পড়ে আছে। গুলিটা তার বুকে ভেদ করে গেছে। লোকটা ড্রাইভার এবং নিশ্চয়ই কোন হোমরাচোমরা সাহেবের গাড়ি। হায়, হায় খুবই আপশোষের ব্যাপার—সায়েবটাকে ধরা গেল না। বিষয়টা অগৌণে অধিনায়কের গোচরে আনা জরুরী মনে করে প্রহরীদের একজন অন্যকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে টিলার দিকে রওনা দেয়।

ওদিকে তখন অস্ত্রাগার দখলের লড়াই চলেছে। এই লড়াইতে পল্টন অধিনায়ক অনুতোষকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। পূর্ব পরিকল্পনার মতো অস্ত্রাগারের চারদিকে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানে (স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে) এবং গার্ডরুমের ধারে অন্ধকারে বিপ্লবী বাহিনীর সৈন্য মোতায়েন করে অনুতোষ দু'জন সঙ্গী নিয়ে অন্ধকারে শ্বাপদের মতো চুপিচুপি এগোতে

থাকে। টহলদাররক্ষীর দিক পরিবর্তন মুখে—হ্যাণ্ডস আপ, বলে হাঁক দেওয়া মাত্রই রক্ষী ঘুরে শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করবার জন্য বন্দুক উঁচিয়ে ধরেতেই অনুতোষের রিভলবার গর্জে ওঠে। প্রহরী চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অনুতোষ ছুটে গিয়ে তার রাইফেল ও কার্তুজের বেল্টটা হাতে তুলে নেয়। প্রহরীর আর্তনাদ ও বন্দুকের শব্দে কিছু অঘটন ঘটেছে মনে করে গার্ডরুম থেকে দু'জন রক্ষী পুলিশ বন্দুক হাতে ছুটে বার হয়। সঙ্গে সঙ্গে নজরদার বিপ্লবী সৈন্য উভয়কে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। বোমার ঘায়ে একজন ছিটকে পড়ে অন্যজন বন্দুক ফেলেই প্রাণভয়ে পালায়। বিপ্লবী সৈন্যদ্বয় ছুটে গিয়ে বন্দুক দুটো উঠিয়ে নেয়। একটা বন্দুকে রক্ত লেগে আছে। বোঝা গেল লোকটা বোমার ঘায়ে ঘায়েল হয়েছে। কিন্তু সে গেল কোথায়—নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও লুকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও হদিশ পায়না। যাক্‌গে মূল্যবান বন্দুক দুটো তো পাওয়া গেছে। কিন্তু কার্তুজ? দৌড়ে তারা গার্ডরুমের ভিতর ঢুকে কার্তুজের বেল্টটা পায়। খুশি হয়ে তারা অধিনায়কের নিকট গিয়ে যুদ্ধের বিবরণ দেয়। অনুতোষ আপাতত বন্দুক দুটো তাদের হেপাজতে রাখবার অনুমতি দিয়ে তাদের ভিন্ন কাজে নিয়োগ করে।

অস্ত্রাগারের কঠিন লৌহ দরজা হাতুড়ি, গাঁইতি ও শাবলের ঘায়ে ভাঙা যাচ্ছে না। অবশেষে দরজার কড়ার সঙ্গে শেকল বেঁধে মোটর গাড়ির পেছনে লাগিয়ে কয়েকবার হেঁচকা টান দিতেই বিরাট লৌহ দরজা গাঁথুনি শুদ্ধ সশব্দে ভেঙে পড়ে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভেতরে ঢুকে তাদের চক্ষু স্থির। থরে থরে সাজানো রাইফেল, কারবাইন, ব্রিচ-লোডার, পিস্তল, রিভলবার, লুইসগান ইত্যাদি নানা রকমের নতুন পুরাতন বিস্ময়কর অস্ত্রসম্ভার। কিন্তু এ সকল ব্যবহারের কার্তুজ কোথায়? পাশে যে সব বাক্স রয়েছে তা সব ফাঁকা কার্তুজ নেই। শুরু হয় তার অনুসন্ধান—কামরার পর কামরার দরজা হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে চলেছে তল্লাশী। এই ব্যস্ততার মধ্যেই টিলার পাদদেশের প্রহরী এসে রাস্তার ঘটনাটা অনুতোষের গোচরে আনে। প্রহরীকে বিদায় দিয়ে গুরুদের সঙ্গে বিষয়টা বিবেচনা করে সে অকুস্থলে যাবার জন্য তৈরি হয়। তার অনুপস্থিত কালে অস্ত্রাগারের কর্মভার সহকারীকে বুঝিয়ে দিয়ে সে বন্দুক হাতে নিয়ে রওনা হয়।

টিলার উপরে আর্মারি কোর্স-অস্ত্রাগার নিচের রাস্তা থেকে দেখা গেলেও তার অবস্থান কিছুটা ভেতরের দিকে।—নির্জন স্থানে। অনুতোষ তাড়াতাড়ি করে আর্মারি ঢোকার প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে ঢালু রাস্তা ধরে কিছু দূর যেতেই তার দৃষ্টি সামনের ছোট্ট টিলা দুটোর মাঝখান দিয়ে অস্ত্রাগারে আসার রাস্তাটায় একটা মোটর গাড়ির হেড লাইটের ওপর পড়ে। গাড়িটা অস্ত্রাগারের দিকে এগোচ্ছে। অনুতোষ সাবধান হয়। সে আর এগোয় না। গেটের ধারে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকে। দেখে একটা ট্যাক্সি গেট দিয়ে ঢুকে অস্ত্রাগারের সামনের প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায়। ট্যাক্সি থেকে রাইফেল হাতে রক্ষীর সঙ্গে এক সাহেব নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়। সাহেবকে রক্ষীর সঙ্গে আর্মারির দিকে এগোতে দেখে অনুতোষ হাতের বন্দুক লোড করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে।

ঐ সময়েই আর্মারির ভেতর থেকে বিপ্লবী বাহিনীর উৎফুল্ল কণ্ঠ ধ্বনি :

মহামানবের মুক্তি সাগরে রক্তধারা

তরঙ্গ তুলে ছুটবে। বন্দেমাতরম, বিপ্লব জিন্দাবাদ, রাতের অন্ধকারে প্রবল আলোড়ন তুলে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

সাহেব হতভম্ব। ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ায়। পর মুহূর্তেই রক্ষীকে গুলি চালাবার হুকুম দেয়। রক্ষী রাইফেল তুলবার আগেই অনুতোষের রাইফেল গর্জে ওঠে। প্রথম গুলিতে রক্ষী চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গুলিতে সাহেবকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখা যায়। কোন চিৎকার শোনা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষ দৌড়ে যায়। দেখে রক্ষী পড়ে আছে ; কিন্তু সাহেব নেই। টর্চের আলোতে কাছে পিঠে ঝোপঝাড় খুঁজে দেখে। সাহেবকে পাওয়া গেল না। সে পালিয়েছে। গুলি লেগে থাকলেও মারাত্মক ভাবে আহত হয় নি। অনুতোষ মৃত রক্ষীর রাইফেল এবং ব্যাণ্ডোলিয়রটা (গুলি ভর্তি বেল্ট) খুলে নেয়। ততক্ষণে আর্মারী থেকে অনুতোষের সহকর্মী বেরিয়ে এসেছে। অনুতোষ তার হাতে রাইফেলটা দিয়ে সাহেবের পলায়নের গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানিয়ে দেয়। তাকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে এবং সে অল্পক্ষণে ফিরে আসছে জানিয়ে দ্রুত-পদে অন্তর্হিত হয়।

অকুস্থলে পৌঁছে অনুতোষ—লোকটা গাড়ি ছেড়ে পলায়ন কালে কোন জায়গায় অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক গুলি বিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে তা জেনে

নেয়। অতঃপর সে মৃত লোকটার কাছে গিয়ে কিভাবে এবং কোথা থেকে গুলি এসে লেগেছে তা অনুমান করে। এই ঘোর অন্ধকারে একজন দৌড়ে পালানো লোককে যে ভাবে গুলি করেছে তাতে যে গুলি চালিয়েছে নিঃসন্দেহে সে একজন পাকা বন্দুকবাজ (সার্পস্যুটার)। গুলিটা অবশ্যই নিকটবর্তী ঝোপের আড়াল থেকেই এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন সে কি কারণে গুলি করলো ? মৃত ড্রাইভার যে সাহেবের সে নিশ্চই একজন হোমরা-চোমরা এবং খুবই ধূর্ত। ক্ষণিক সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করে পালিয়েছে। ঘটনাটা খুবই অশুভ। সাহেবকে আটক কিংবা হত্যা করতে পারলে আমাদের অভিযানের সূচনা শুভ হতো।

না, আর দেরি করা যায় না—সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। ঝোপের ভেতরের ব্যক্তিকে—শত্রু মিত্র যেই হোক না কেন—অবিলম্বে বের করে আনা দরকার। একজন প্রহরী সঙ্গে নিয়ে উদ্যত বন্দুক হাতে ঝোপের অনতিদূর থেকে অনুতোষ হাঁক পাড়ে—ভেতরে যেই থাক হাত তুলে বেরিয়ে এসো। নচেৎ এলোপাতাড়ি গুলি চালাবো। আত্মপ্রকাশে উৎসুক ও অধীর দেবযানী বুঝি অন্ধকারে ঝোপের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করে এমন লগ্নের অপেক্ষায় ছিল। অনুতোষ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার হুকুম মতো হাত তুলে হাসতে হাসতে দেবযানী বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে আবির্ভূত হাত-তোলা মূর্তির ওপর টর্চ-এর তীব্র আলো ফেলে ক্ষণেকের জন্য বুঝি অনুতোষের বুদ্ধি লোপ পায়। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে অনুতোষ রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—এ তুমি কি এবং কেন করলে।

অনুতোষের কণ্ঠস্বরে দেবযানী কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও ধীর স্থির কণ্ঠে জবাব দেয়—কেন ? তুমি কি তা জানো না ? তোমাকে তো আগেই জানিয়েছি—আমাকে কেউ কোন প্রকারেই আমার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আমি যুদ্ধে যাবোই এবং যুদ্ধ করবোই। দেবযানী হাসি মুখেই জবাব দেয়।

অনুতোষ কি করবে! রুক্ষ অশোভনীয় ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিলেও সে যাবে না। এবং সে তা করতেও পারবে না। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বে-আইনি কাজে দলপতির অনুমোদনেরও বা অবকাশ কোথায়। সুতরাং ঘটনা বিপাকে নিরুপায় অনুতোষ অকুস্থাটাকে ঝিঁঝির

অমোঘ বিধান মেনে নিয়েই বুঝি দেবযানীকে দলভুক্ত করে প্রহরীদ্বয়ের সঙ্গে পাহারার কাজে নিযুক্ত করে। লুণ্ঠিত রাইফেল ও ব্যাণ্ডোলিয়ার দেবযানীর হাতে সমর্পণ করে অনুতোষ আর কিছু না বলে অন্ধকারে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অস্ত্রাগারে ফিরে এসে অনুতোষ সহকারীর নিকট যে খবর শুনলো তা শুধু নৈরাশ্য জনকই নয় বিপ্লবের পক্ষে এক মারাত্মক বিঘ্ন-কর দুঃসংবাদ। এত খোঁজাখুঁজি করেও রাইফেল লুইস গান ইত্যাদির কার্তুজ পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কি হবে! এগুলি কি কার্তুজের অভাবে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে? বৈপ্লবিক অভিযানের পক্ষে ঘটনাটা মস্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে এক বেটা—হামরা-চোমরা সাহেব গাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। সে নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। পুলিশ মিলিটারিও অন্যান্য সাহেব সুবাদের একত্র করে বিপ্লবীদের আক্রমণ রুখবার মতলব আঁটছে এবং একটা অনর্থ ঘটাবার চেষ্টা করছে। এদিকে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী নগর আক্রমণ আসন্ন। অথচ এতগুলি অস্ত্র হাতে পেয়েও তারা ব্যবহার করতে পারছে না। না, আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না। অনুতোষ মরীয়া হয়ে পুনরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে। একটা বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে দেখে কার্তুজ নয়—ঘরভর্তি ছুরি কাঁটা কাঁচের ও চিনামাটির বাসন কোষণ। রেগে গিয়ে সেগুলিকে হাতুড়ি মেরে ভাঙবার হুকুম দিয়ে অনুতোষ পাহাড়ের গায়ে উপরে নীচে আর কোথাও কোন লুক্কায়িত ঘর আছে কিনা আতিপাতি করে অনুসন্ধান চালিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফেরার পথে অন্ধকারে পার্শ্ববর্তী এক বাংলো থেকে নারী কণ্ঠের চাপা কান্নার সঙ্গে এক সাহেবের কণ্ঠে —darling, it is not time for weeping, ring up police and doctor, শুনতে পায়। তবে এ কি সেই সাহেব যে গুলি খেয়ে পালিয়েছে? অনুতোষের মনে আক্রোশ জাগে, ডাক বাংলো আক্রমণ করে সাহেবটাকে মেরে ফেলার প্রচণ্ড ইচ্ছা হয়। কেননা শত্রুর শেষ রাখতে নেই! কিন্তু সময়ের অভাবে তার সে ইচ্ছা ফলবতী হলো না।

অস্ত্রাগারে ফিরে এসে অনুতোষ সহকারীর সঙ্গে পরামর্শ করে—এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়? দলপতির সঙ্গে সংযোগ-সাধন করে তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণের সময় আর নেই। ইতিপূর্বেও সঠিক নম্বর কার্তুজের অভাবে কতগুলি বন্দুক ফেলে আসতে হয়েছে। এখন অনুরূপ ঘটনারই

পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। এতগুলি রাইফেল, লুইস গান ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র—যার উপর বৈপ্লবিক অভিযানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল—ফেলে যেতে হচ্ছে কার্তুজের অভাবে। এ এক মর্মান্তিক মারাত্মক পরিহাস। অথচ এগুলিই শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে তাদের উপর প্রয়োগ করে সব তছনছ করে দেবে। সুতরাং এগুলিকে ভেঙেচুরে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়াই শ্রেয় যাতে সেগুলি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে না পারে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সব বন্দুকের নলে তাদের কার্তুজ ঢোকে সেগুলি এবং সব ব্রিচ্‌লোডার সহ কিছু রাইফেল এবং লুইস গান নিয়ে বাকী সবগুলিকে হাতুড়ি পিটে নষ্ট করে গাড়ি থেকে পেট্রল এনে অস্ত্রাগার আগুনে পুড়িয়ে দেবার হুকুম দেয়। এই কাজে সহকর্মীসহ তিনজনকে রেখে অনুতোষ দলের বাকী সকলকে নিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়। সহকর্মীকেও কর্ম-অন্তে মালপত্র সহ গাড়ি নিয়ে সত্বর ঐ স্থানে আসার নির্দেশ দেয়।

একসঙ্গে বন্দুক ও কার্তুজ পেয়ে দেবযানীর খুশি আর ধরে না! সে যেন নতুন উদ্যম উৎসাহে উদ্দীপিত, নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত! ইচ্ছা হলো অনুতোষকে শুধু ছোট্ট একটি প্রশ্ন শুধায়—কেমন আছ? কিন্তু তার প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে সুযোগ আর পায় না। প্রহরী হিসাবে তার কি কর্তব্য তা জেনে নেবার আগেই অনুতোষ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। দেবযানী অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মনের ব্যথা গুমরে ওঠে।

না, এখন দুঃখ ও অলসতার সময় নয়। নিজেকে সংযত করে দেবযানী কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। প্রথমেই সে সিপাহীদের মতো ব্যাণ্ডোলিয়ারটা পরে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। খাপ শুদ্ধ রিভলবারটা তো কোমরে বাঁধা আছে। তারপর প্রহরী হিসাবে আশু কি করণীয় তা ভেবে কাজ শুরু করে। প্রথমেই রাস্তার ওপর যে লাশ ও গাড়িটা পড়ে আছে তা সরিয়ে দেওয়া দরকার। কেননা পথে যাতায়াতকারী—তা সে গাড়ি ঘোড়া, যাতে করেই হোক না কেন—এ দৃশ্য দেখলে বিপ্লবীদের পক্ষে বিঘ্নকারী কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। সুতরাং রাস্তায় পড়ে থাকা লাশটাকে টেনে ঝোপের আড়ালে রেখে দেয়। তারপর সকলে মিলে মোটর গাড়িটাকে ঠেলে ঠেলে রাস্তার ধারে নিয়ে ঝোপের

ধাক্কা দিতেই সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ একটা বিকট শব্দে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুন দেখেই তারা উল্লাসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে আপন পাহারার স্থলে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় পিছন থেকে আগত একটা মোটর গাড়ির হেডলাইট প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাড়িটা ঢালু রাস্তা দিয়ে দ্রুত বেগে এদিকে আসছে। তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গাড়িটা গুলির পাল্লার মধ্যে আসা মাত্রই হাত তুলে হল্ট বলে চিৎকার দিয়েই গাড়ির দিকে ধেয়ে যায়। গাড়িটা ব্রেক কষে থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালায়। গাড়িটার তীব্র হেড লাইটের দরুন সামনে থেকে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না এবং সেখান থেকে কোন সাড়া শব্দও আসছে না। দেবযানী টর্চ জ্বেলে রিভলবার উঁচিয়ে গাড়ির পাশে এসে দেখে ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মুখ থুবড়ে আর আরোহী —এক শ্বেতাঙ্গ, পেছনের সীটে রিভলবার হাতে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। মনে হয় হল্ট্ শুনেই সে রিভলবার হাতে নিয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই একটা গুলি তার কানের পাশ ভেদ করে চলে যায়। দেবযানী গাড়ি উদ্ধারের ভার নিয়ে সাথীদের গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করতে বলে সাহেবের হাত থেকে রিভলবার এবং পেছনের সীটের মাথার কাছে খালি জায়গা হতে টোটা ভর্তি একটা থলে তুলে নেয়। ইতিমধ্যে সাথীরা গাড়ির বাতি নিবোতে না পেরে কাঁচ ভেঙে তা সম্পন্ন করে। পরবর্তী সমস্যা গাড়ির লোক দুটো বেঁচে আছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং গাড়ির ভেতর থেকে তাদের টেনে বের করে আনা। এতে অনেক সময় নষ্ট এবং হাঙ্গামা হুজ্জত বিবেচনা করে গাড়িতেই ওদের কবর দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। তদনুযায়ী তিনজনে মিলে গাড়িটাকে টেনে রাস্তার ধারে এনে পূর্বের মতোই জোর ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে চলে যায়—আগুন দেখা যায় না। কিন্তু আগুন দেখা গেল অদূরে টিলার উপরে। সেখানের অস্ত্রাগার হঠাৎ আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আগুনের লেলিহান শিখায় চতুর্দিক লাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ফট্‌ফট্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রহরীরা সব থ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর অবাক হয়ে ভাবছে—অস্ত্রাগারে কেমন করে আগুন লাগলো। দেবযানী অমৃতোষের নিরাপত্তার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। তা সত্ত্বেও নীরবে দাঁড়িয়ে আগুনের তাণ্ডব নৃত্য দেখা

আর হা-পিত্যেশ করা ছাড়া কী-ই বা তার করবার আছে। বৈপ্লবিক অভিযানের এই বিপজ্জনক মুহূর্তে সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারে না।

গাড়িতে অস্ত্রবোঝাই করে আর্মারিতে আগুন দেবার হুকুম দিয়ে অনুতোষ সদলে টিলা থেকে নেমে কিয়দ্দূর গিয়েই আবার ফিরে আসে। কেননা পেট্রল ঢেলে আগুন লাগাবার পদ্ধতি ও নিয়মকানুন সিতাংশুর জানা আছে কিনা সে সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ জাগে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অনুতোষ ফিরে এসে দেখে সিতাংশুর তত্ত্বাবধানে আর্মারি, গার্ডরুম ইত্যাদিতে তার নির্দেশ মতো জিনিষপত্র স্তূপাকার করা হয়েছে—এখন শুধু পেট্রল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া বাকী। অনুতোষ দাঁড়িয়ে থেকে সিতাংশুকে সাবধানে নিজের কাপড়চোপড় বাঁচিয়ে সবত্র পেট্রল ছিটিয়ে দিতে বলে। তারপর দূর থেকে কিভাবে আগুন ছুঁড়ে দিতে হয় তা দেখিয়ে দেয়। একসঙ্গে সর্বত্রই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। আগুনের লেলিহান শিখা অস্ত্রাগারের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনুতোষ সদলে টিলা থেকে নেমে প্রহরীরা রাস্তার মোড়ে যেখানে পাহারা দিচ্ছে সেদিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়।

অভিযানের শুরু থেকে অনুতোষ প্রতিক্ষেত্রে পরপর কেবলই নিষ্ফলতা বরণ করে চলেছে। আর্মারির ঘটনা শুধু তার পরাজয়ই নয় অভিযানের মূলে কঠিন আঘাত। এইসব উপসর্গের সঙ্গে দেবযানীর আকস্মিক উপস্থিতি আর এক নতুন উপসর্গ যুক্ত হয়ে তাকে নিয়ত কাঁটার মতো বিদ্ধ করছে। এইসব অকৃতকার্যতা, তার উপর দেবযানীর উপস্থিতি দলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত অপরাধের জন্য সে মহারাজকে কি কৈফিয়ৎ দেবে। এতদসত্ত্বেও অনুতোষ নিজের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট এবং অভিযানের সাফল্য ও বিজয় সম্পর্কে নিঃসংশয়।

পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তার মোড়ে রক্ষীদের নিকটবর্তী হতেই অনুতোষের দৃষ্টি বিপরীত দিক থেকে দ্রুত অগ্রসরমান মোটরগাড়ির হেড লাইটের ওপর নিবদ্ধ হতেই একজন সঙ্গী নিয়ে সে রাস্তার দিকে ছুটে যায়। গাড়ি গুলির পাল্লার মধ্যে আসতেই হাত তুলে হল্ট্ বলে চিৎকার দিয়েই গুলি চালায়। গাড়ি থেমে যায়। হেড লাইটের প্রবল

গাড়ির ভেতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনুতোষ দৌড়ে গাড়ির নিকট পৌঁছে দেখে ড্রাইভার সীটের ওপর কাৎ হয়ে আর গুরখা বডিগার্ড দরজার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ড্রাইভার ও গার্ডের উর্দি দেখেই বুঝলো গাড়িটা জেলা শাসকের। তিনি পেছনের সীটে ছিলেন। হেড লাইটের সদ্ব্যবহার করে দরজা খুলে পালিয়েছেন। তাঁর বন্দুক ও কার্তুজ ভর্তি একটা বাক্স সীটের ওপর পড়ে আছে। গুলি মারার সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি গাড়ির নিকট ছুটে আসতো তা হলে শাসক মহাশয় এভাবে পালাতে পারতেন না। হয় তিনি গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যেতেন কিংবা আহত হয়ে ধরা দিতেন। যুদ্ধকালে তাঁকে হাতে পেলে অনেক কিছুই করা যেত! হায় হায় এত বড় একটা মূল্যবান শিকার হাতে পেয়েও ফস্‌কে গেল! অনুতোষের আপশোষের আর শেষ নেই!

বুলেট খোঁজাখুঁজি এবং এই সব ব্যাপারে অনেক সময় ব্যয় হয়। সুতরাং গাড়িটাকে রাস্তার ধারে এনে হাতুড়ির ঘায়ে ইঞ্জিন অকেজো করে দিয়ে অনুতোষ সকলকে নিয়ে লক্ষ্যস্থল অভিমুখে রওনা দেয়। কিছু দূর গিয়েই তার মনে হয় দেবযানীকে তো দলের মধ্যে দেখেনি। কি ব্যাপার, সে গেল কোথায়? উৎকণ্ঠিত অনুতোষ রাস্তার প্রহরী একজনকে ডেকে দেবযানীর কথা জিজ্ঞাসা করে।

প্রহরী অবাক হয়ে উত্তর দেয়—দিদি তো রাস্তার ওধারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে দৌড়ে এসে দ্বিতীয় গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়। গাড়ির আরোহী ড্রাইভার ও সাহেব—উভয়েই মারা যায়। তারপর গাড়িটাকে রাস্তা থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। প্রথম যে গাড়িটা আমরা আটকে ছিলাম সেটাকে অনুরূপ ভাবে রাস্তা থেকে ঠেলে ফেলে দিতেই তাতে আগুন লেগে যায়।

সব শুনে অনুতোষ বুঝলো তার কিছু করবার নেই। সে পলাতকা! পালিয়ে এসেছিলো, আবার পালিয়েছে। ভালোই হয়েছে—থাকলে হয়তো একটা অনর্থ ঘটতো। পথে নারী বিবর্জিতা—বিশেষত এই সঙ্কটপূর্ণ যুদ্ধ কালে—মহাজন উক্তি মনে করে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। তথাপি কেন যে অন্তরের অন্তস্থলে একটা ব্যথা কুশের অঙ্কুর-সম বিদ্ধ হতে থাকে। গীতার বাণী—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" স্মরণে এনে অনুতোষ দৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যাভিমুখী এগিয়ে চলে—চলরে চলরে চল।—বীরদর্পে সকল বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে তুই বুক ফুলিয়ে চল।

টিলার ওপর অস্ত্রাগারে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে দেবযানী প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অমুতোষের বিপদ ঘটেছে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে। লকলকে অগ্নিশিখার দিকে চেয়ে তার মনে হঠাৎ আর এক নূতন ভাবনার উদয় হয়, নতুন জিজ্ঞাসা জাগে—কিন্তু যদি অমুতোষের ত্রুটি বিচ্যুতি কিংবা অনবধানতা হেতু এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে যার ফলে প্রজ্বলিত বিপ্লববহ্নি প্রতিকূল হাওয়ার ঢেউয়ে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তা হলে অমুতোষকেই তার জন্য দায়ী হতে হবে। তার উপরে তাকে নিজ দলভুক্ত করে অমুতোষ দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত আর এক অপরাধে অপরাধী। উভয়ই দণ্ডার্হ। বিশেষত বিপ্লবের এই সংকটপূর্ণকালে নিশ্চয়ই ক্ষমার অযোগ্য। না, দেবযানী আর ভাবতে পারছে না। অমুতোষের এই উভয় সংকটে সে কি ভূমিকা নেবে। মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়ে অমুতোষের দোষস্খলনের জন্য যদি সে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের জন্য আপন অপরাধ অকপটে স্বীকার করে? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই দেবযানী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মহারাজ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি কোথায়? কি ভাবে কোথায় গেলে তার দেখা পাবে? অস্ত্রাগার দখলের যুদ্ধের মতো ইতি মধ্যে নিশ্চয়ই পুলিশ লাইন এবং সায়েবদের ক্লাব দখলের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মহারাজ এখানে যখন আসেননি নিশ্চয় তিনি ঐ দুই জায়গার কোথাও আছেন। দিনের বেলায় গুর্খা প্রদর্শিত উভয় স্থানের দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশী নয় বলেই তার মনে হলো। সুতরাং সঙ্গী প্রহরীদ্বয়কে কিছু না বলেই দেবযানী মহারাজের খোঁজে উপরুক্ত লক্ষ্যাভিমুখী চলতে থাকে।

পূর্বের মতোই দেবযানী রাস্তা এড়িয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে কাঁটাবনের ধার দিয়ে অসীম সাহসে নির্ভয় করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পেছনে অস্ত্রাগারের আগুন তখনো দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ যে ফটাফট গুলির আওয়াজ শোনা গেছে তা আর নেই। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর বুঝি ক্ষণিক বিশ্রাম চলেছে। আবার প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ শুরু হবে। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার—গাছগাছড়া, ঝোপঝাড়ের জন্য তা আরো গাঢ় ও গভীর। রাত্রি কত তা অনুমান করা সম্ভব হচ্ছে না। রাস্তাটা বাঁক নিতেই দেখা গেল দূরে একটা টিলার ওপর অনেকগুলি বাতি জ্বলছে। ঐ আলো দৃষ্টিপথে রেখে দেবযানী রাস্তার ধার থেকে উঠে এসে জোর কদমে

হাঁটতে থাকে। হঠাৎ বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি নির্জন রাতের অন্ধকারে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে পাশের টিলাগুলির ওপর ঠোক্কর খেয়ে মিলিয়ে যায়। দেবযানী আশ্বস্ত হয়। ঐ টিলার ওপরেই পুলিশ লাইন বলে নিশ্চিত ধারণা হলো। সুতরাং এদিকের রাস্তার আশপাশ দিয়ে চলা খুবই বিপজ্জনক। যুদ্ধকালীন অবস্থা—নিশ্চয়ই কড়া খবরদারি পাহারা চলেছে, তার উপর এদিকের রাস্তার দু'পাশে ঝোপঝাড় নিবিড় জঙ্গল ও গাছপালায় ভর্তি হওয়ায় ঘন অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। পাহারাদার গাছের ওপর, নাকি জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে আছে বোঝা অসাধ্য। হঠাৎ পায়ের শব্দে সতর্ক না করেই যদি গুলি চালায়। দেবযানী রাস্তা ছেড়ে ধারে নেমে গিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু রাস্তাটা উঁচু এবং ধারটা এত ঢালু যে পা ফস্কে গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। সাবধানে চলা সত্ত্বেও হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যাবার মুখে দেবযানী একটা ঝাড়ের ডাল আঁকড়ে ধরতেই জোর একটা খশ্‌খশ্ শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরীর হাঁক শোনা যায়—কে, ওখানে কে? হাত তুলে এগিয়ে এসো। দেবযানী দু'হাত তুলবে কি করে? দু'হাত তুললেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। সুতরাং বাঁ হাতটা তুলে ধরে। প্রহরী গুপ্তচর ভেবে টর্চ জ্বেলে রিভলবার তাক করে ছুটে আসে। টর্চের আলোতে যোদ্ধবেশে এক নারীকে দেখে সে হতবাক! এক অভাবনীয় ব্যাপার! সে দেবযানীকে উঠে আসতে আদেশ করে।

দেবযানী ঝোপ ধরে ধরেই রাস্তার ওপর উঠে এসে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করে—মহারাজ কোথায়?

—তিনি কোথায় তা তো আপনাকে বলতে পারিনা। তাঁর অনুমতি ভিন্ন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়েও যেতে পারিনা। আপনার পরিচয় বলুন। প্রহরী রিভলবার উঁচিয়েই আছে।

দেবযানী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর কিছুটা উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে—আপনাকে আমার পরিচয় দেবার তো কোন প্রয়োজন দেখছি না। তাঁকে গিয়ে শুধু বলুন—এক নারী তাঁর দর্শন-প্রার্থী।

—হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু এ সময়ে পরিচয় ছাড়া মহারাজ-এর দর্শন লাভ অসম্ভব। তবে হাঁ, আপনাকে নিরস্ত্র করে তাঁর নিকট নিয়ে যাওয়া যায়—তাও তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষ। সুতরাং আমি নাচার, বলেই সে অপর সঙ্গীকে আসার সংকেত জানায়।

দেবযানী বুঝলো বাকবিতণ্ডা বৃথা। হুকুমের বাইরে প্রহরী কোন কাজ করতে পারে না, করবে না এবং করা উচিতও নয়। নরম মেজাজে বলে—দেখুন, নিরস্ত্র আমি হবো না, পরিচয়ও দেবনা। আপনি দয়া করে গিয়ে বলুন—তাঁর ছোট্ট দিদি দর্শন-প্রার্থী হয়ে এসেছে।

প্রহরী একটু ঘাবড়ে যায়। আর বাক্যব্যয় না করে দেবযানীকে দ্বিতীয় প্রহরীর হেপাজতে রেখে মহারাজ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

মহারাজ অভিযান পরিচালনার জন্য তখন সদলে পুলিশ লাইনের পাহাড়ের পাদদেশের অদূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করছেন। অভিযানার পল্টন অধিনায়কেরা সেখানে উপস্থিত। তিনি তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রত। বিনা রক্তপাতে কিভাবে টেলিগ্রাফ টেলিফোন আপিস দখল এবং ধ্বংস করা হয় পল্টন অধিনায়ক প্রভাত তার বর্ণনা দেয়। তবে ফেরার পথে আপিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট সাহেবের কোয়ার্টার থেকে গুলি ছোড়ার প্রত্যুত্তরে গুলি চালাতে হয়। অতঃপর পুলিশ লাইন দখল অভিযানের নায়ক দেবেশ বলে পুলিশ আর্মারি ও গার্ডরুম দখলের যুদ্ধে দলের কেহ হতাহত হয়নি। লড়াইয়ের সময় কেবল তিনজন পুলিশ মারা গেছে। একজন পুলিশ সার্জেন ঘায়েল হয়েছে। তাকে ধরা গেল না। পলায়মান পুলিশরা তাকে নিয়ে গেছে। যেসব বন্দুক, কার্তুজ, ইত্যাদি পাওয়া গেছে তারও পূর্ণ বিবরণ দেয়। সবশেষে নরেশ হতাশার সুরে জানায়—ক্লাবে ইউরোপিয়ান কোন সাহেব ছিল না। সব ফাঁকা একজনকেও ধরা গেল না—সব পালিয়েছে। খুবই আপশোষের ব্যাপার। জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অন্যান্য স্থানের ব্রিটিশের নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের বদলা নেওয়া গেল না।

মহারাজ মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। প্রত্যেককে কৃত-কার্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং আসন্ন গুরুত্ব ও সংকটপূর্ণ সংগ্রামের জন্য তৈরি হতে বললেন। মহারাজ এদের মধ্যে অনুতোষকে না দেখে চিন্তিত। সকলেরই এই সময়ে এখানে সম্মিলিত হবার নির্দেশ থাকা সত্বেও সে এখনও কেন আসছে না। তবে কি কোন বিভ্রাট ঘটলো। বিপ্লবী অভিযানের অনেক কিছুই অস্ত্রাগার দখলের সফলতার উপর নির্ভরশীল। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে পায়চারি করছেন। এমনি সময় স্বল্প আলোকে তাঁর দৃষ্টি অদূরে অপেক্ষমান প্রহরীর দিকে পড়তেই তিনি হাত ইশারায় তাকে কাছে ডাকেন। প্রহরী নিকটে এসে যোদ্ধবেশে এক

[illegible] [illegible] বিবরণ এবং বন্দিনী যে তাঁর দর্শন প্রার্থী তাও তাঁর গোচরে আনে। সব শুনে মহারাজ খানিক ভাবলেন তারপর তাকে এখানে নিয়ে আসার আদেশ দেন।

পুলিশ লাইন টিলার উপর থেকে ঘন ঘন নির্ঘোষিত বন্দেমাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বিপ্লব জিন্দাবাদ রাতের অন্ধকার চিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবীদের যেন আশ্বাস দিচ্ছে—মাভৈঃ, মাভৈঃ হবে জয় নাহি ভয়। বিপ্লবীরা জংগলের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে রণোন্মত্ত উল্লাসে ঐদিকে এগিয়ে চলে—চলরে চলরে চল, ঊর্ধ্বগগনে বিজয়ের মাদল বাজছে নিম্নে ধরণীতল তাদের পদভারে উতলা হচ্ছে। সকলেরই লক্ষ্য ঐ পুলিশ লাইন—যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত স্থান।

উপস্থিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রণকৌশল নিয়ে মহারাজ বড়দার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। এমনি সময় দূরে রাস্তা থেকে বন্দেমাতরম্ ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি ভেসে আসে। মনে মনে অধীর প্রতীক্ষারত মহারাজের নিকট ঐ ধ্বনি বুঝি অনুতাষের আসার বাণী নিয়ে আসে। তিনি স্বস্তি অনুভব করেন। এই সময়েই প্রহরী দেবযানীকে মহারাজ সমীপে এনে উপস্থিত করে। টর্চ জ্বেলে বন্দিনীকে দেখেই তিনি অবাক হয়ে বলেন—একি, দিদি তুমি! দেবযানী মহারাজ এবং অদূরে দণ্ডায়মান বড়দাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ দাদা, আমি। এত অস্ত্রশিক্ষা ও সামরিক কুচকাওয়াজে পটু করিয়ে শেষে কিনা মেয়ে বলে পর্দার আড়ালে রেখে দিলেন। দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারবো না। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তাই নিষেধের বেড়াজাল তুচ্ছ করে পালিয়ে এলাম। যে শাস্তি দেবার হয় দিন—খুশি মনে মাথা পেতে নেবো। মহারাজ গম্ভীর হলেন। ঘড়ি দেখে বললেন—এখন শাস্তি দেবার কিংবা তর্কবিতর্কের সময় নয়। তুমি এখন আমাদের সঙ্গে থাক। তবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হেতু শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। রায় শুনে খুশি মনে দেবযানী পুনরায় মহারাজ ও বড়দাকে প্রণাম করে তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ওদিকে রাস্তা থেকে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যুত্তরে টিলার ওপর পুলিশ লাইন থেকেও উল্লসিত বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মুর্দাবাদ ধ্বনি নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে প্রবল আলোড়ন তুলে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়। পর মুহূর্তের সম্মিলিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠের সুরধ্বনি :

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে—

অন্ধকার মথিত করে বুঝি আকাশ-তলে উঠলো ফুটে আলোয় উদ্ভাসিত বিজয়ের শতদল।

অনুতোষ এসে উপস্থিত। মহারাজ ও বড়দাকে প্রণাম করে সে উঠে দাঁড়ায়। মহারাজ টর্চ জ্বেলে তার মুখাবয়ব দেখেই নিমেষে কি ঘটেছে, কেন এই অহেতুক দেরি, তা আঁচ করে নেন। এতবড় একটা অভিযানের সাফল্যের দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিফলন তার মুখে নেই। অনুতোষ অস্ত্রাগার আক্রমণ, অধিকার এবং তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা আদ্যোপ্রান্ত বলে যায়। আসার পথে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি আক্রমণ ও তার পলায়নের খবরও মহারাজের গোচরে আনে। সেই সঙ্গে কি কি অস্ত্র, গোলা বারুদ ইত্যাদি এসেছে তার ফিরিস্তি দেওয়া কালে হঠাৎ ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ শুনে মহারাজ উৎকর্ণ ও উচ্চকিত হয়ে ওঠেন—একি! মনে হচ্ছে যেন মেশিন গানের আওয়াজ পাহাড়ের আশপাশ থেকে আসছে। আন্দাজে বুঝলেন সাহেবরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করেছে। অনুতোষ যেসব গোলাগুলি খুঁজে পায়নি তাই নিয়েই হানা দিয়েছে। কিন্তু মেশিন গান? উপর থেকে বন্দেমাতরম্ ইনক্লাব জিন্দাবাদ-এর সঙ্গে গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে। বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করে মহারাজ অনুতোষকে নিজের পল্টন নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে কোন্ দিক থেকে গুলি আসছে, নাকি পাহাড়টাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে বলেন। তারপর দেবযানীর ওপর গাড়ি রক্ষার ভার অর্পণ করে সেটাকে আরও ভেতরে নিয়ে জঙ্গলের আড়ালে রাখবার আদেশ দেন।

অনুতোষ নিজের দলকে জড় করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। যাবার পূর্বে মহারাজ ও বড়দাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবার মুহূর্তে দেবযানীর নাম শুনে অনুতোষ অবাক! ধন্যি মেয়ে, যেমনি চতুর তেমনি দুঃসাহসী! মহারাজকে সম্মত করেছে! যাক্ এক মহাদুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার অবসান হলো। মনের মধ্যে যেন শান্তি উদ্দীপনা ও সাহসের জোয়ার এলো। যুদ্ধে পরমশত্রু ব্রিটিশের মোকাবিলা করতে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিন গানের গুলি চলেছে। তার জবাবে টিলার উর্দ্ধ থেকে গুলি ছোড়ার সঙ্গে বিপ্লবীদের বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ

ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্‌ প্রকম্পিত। অমুতোষও সদলে বন্দেমাতরম্‌, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উপরের সহযোদ্ধাদের বল, ভরসা ও উৎসাহ যোগাচ্ছে।

অমুতোষ প্রথমে একাই কিছুটা এগিয়ে যায়। স্থির লক্ষ্যে গুলির শব্দ কোনদিক থেকে আসছে তা অনুমান করে সদলে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে বুঝলো পাহাড়ের উত্তর-পুব কোণের জঙ্গলে সাহেবরা আস্তানা গেড়েছে এবং সেখান থেকেই মেশিনগানের গুলি চালাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য উপরের পুলিশ লাইন দখল। যে গুলি বহু খোঁজাখুঁজি করেও সে পায়নি তা নিয়েই শত্রুপক্ষ এখন তাদের আক্রমণ করেছে। কিন্তু মেশিন গান? দুটো সঙ্গে নিয়ে বাকীগুলো তো সে ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে নিশ্চয়ই জেটির পুলিশ লাইন থেকে মেশিন গান সংগ্রহ করে এনেছে। এই সবই বেটা জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কারসাজি। হাতে পেয়েও ফস্কে গেল। বেটা যতই ধুরন্ধর হোক ওর জারিজুরি খতম করতেই হবে।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ মূল্যায়নের পর অমুতোষ রণকৌশল স্থির করে। শত্রুকে হয় পেছন নয় পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ করতে হবে। পেছন থেকে আক্রমণ করতে হলে অনেক ঘুরে যেতে হবে ফলে সময়ের অপচয়। সুতরাং পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ জলদি ফলপ্রসূ হবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অমুতোষ সদলে কখনো গুটিগুটি, কখনও হামাগুড়ি, কখনও বা বুকে হেঁটে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে চলে শত্রুর অবস্থানের নিকটবর্তী ঝোপটার মধ্যে নিঃশব্দে আস্তানা গাড়ে। নিঃসীম অন্ধকারে মেশিন গানের ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আওয়াজের সঙ্গে অগ্নি উদ্‌গীরণ হচ্ছে। মাঝে মাঝে রাইফেলের গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। উপর থেকে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির সঙ্গে অবিরাম ভলী ভলী গুলি আসছে। আচম্বিতে মেশিন গান স্তব্ধ হয়ে যায়। এখন কেবল মাঝে মাঝে রাইফেলের গুলির শব্দ হচ্ছে। ব্যাপার কি? হয় সাহেবদের গুলি নিঃশেষ নয় তো পরবর্তী আক্রমণের জন্য তারা পায়তারা কষছে। অমুতোষ পল্টনের সকলকে বন্দুকে টোটা ভরে আক্রমণের ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে। শুধু বন্দুকের নল ঝোপের বাইরে বেরিয়ে আছে। সে নিজে মাথা উঁচু করে দূরবর্তী ঝোপটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। না কোন সাড়া শব্দ নেই। ঝোপের ভেতর কোন নড়াচড়াও নজরে আসছে না। সব

নিঝুম নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন বিক্ষিপ্ত রাইফেলের গুলির আওয়াজ আসছে। বেটারা নিশ্চয়ই আরো লোকজন এবং গোলাবারুদের অপেক্ষায় আছে। সুতরাং আক্রমণের এই সুযোগ বুঝে অনুতোষ উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তিন ভলী—যুগপৎ তিনবার—গুলি চালাবার আদেশ দেয়। আশ্চর্য ওদিক থেকে বিন্দুমাত্র সাড়া শব্দ নেই। এমনকি এতক্ষণ যে মাঝে মাঝে রাইফেলের গুলির আওয়াজও হত তাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। সব নিথর নিস্তব্ধ! পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে অনুতোষের পল্টনের বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ উচ্চনাদের সঙ্গে পরপর তিন রাউণ্ড গুলি বর্ষণের শব্দ পাহাড়ের উপরিস্থিত বিপ্লবীবাহিনীর শক্তি যোগায়। উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রত্যুত্তরে তাদের কণ্ঠনিসৃত বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিপাত যাক ধ্বনি গভীর রাতের অন্ধকারে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে বিপ্লবের বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়।

অনুতোষ সময় নিরূপণের জন্য উর্ধ্বপানে চায়। অনুমান রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। সময় সূচী অনুযায়ী ইতিপূর্বেই নগর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কথা। এখন এখানে আবদ্ধ হয়ে থাকা নিরর্থক। এখানের অবস্থা মহারাজ-এর গোচরে এনে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করাই সমীচীন। সুতরাং অনতিবিলম্বে নিঃশব্দে এখান থেকে সদলে প্রত্যাবর্তন শুরু করে।

ফাল্গুনের শেষ। চৈত্রের প্রারম্ভে অমাবস্যা তিথি উপলক্ষে তীর্থধামে অনেক যাত্রী সমাগম হয়েছে। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে লোকজন গিজগিজ করছে। জম জমাট মেলা—সামনে চৈত্র-সংক্রান্তির পরেও বৈশাখ অবধি চলবে।

অমাবস্যা রাত্রির শেষে ঘন, নিবিড় কুয়াশা সারা অঞ্চলটা ঢেকে ফেলেছে। পাহাড় পর্বত, পথঘাট, গাছপালা, উঁচু-নিচু কিছুই নজরে

আসছে না। এমনকি কাছের লোকটাও কুয়াশার আবরণে অস্পষ্ট। ফলে অচেনা জায়গায় যাত্রীদের চলাচলে ঘটছে বিঘ্ন। যে যেখানে আছে সেখানেই আটকে পড়েছে। পরস্পরকে দেখতে না পেয়ে—ও দাদা, ও মামা, ও ভাই, ও বাবা, ও মা, কোথায় আছ বলে চিৎকার চেঁচামেচি হৈ হল্লা চলছে।

এই পরিস্থিতিতে—কুয়াশার অন্ধকারে ডাকবাংলোর চৌকিদার গফুর ধাক্কাধাক্কি থেকে নিজকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রঘুর আশ্রমের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। সায়েবদের গোছলখানায় গরম জল দিতে গিয়ে ছেলে সাবুর পায়ে গরম জল পড়ে পা-টা জখম হয়েছে। জলদি চিকিৎসার দরকার। এই অসময়ে ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং এখন একমাত্র ভরসা চিরঞ্জীব ওরফে প্রেমদাস বাউল। হেকিমিতে হালে তার নাম হয়েছে। বাউলের সঙ্গে তার একটা হার্দিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। গফুর তাকে ছোট ভাই এবং সে তাকে মিঞা ভাই বলে ডাকে। দিক্‌ভ্রমের ভয়ে গফুর মাঠে না নেমে বুড়ো বটের রাস্তা ধরে চলে সে আর এগোতে পারছে না। মনে হচ্ছে সম্মুখে যেন একটা নিরেট কুয়াশার স্তূপ! কোথা দিয়ে ঢুকবে। কোথায় দীঘি, কোথায় তার পাড় আর কোথায় বা সিঁড়ি! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সোজা সম্মুখে এগোতে থাকে। বুড়ো বটের তলার বেদীটা পেলেই দীঘিটার পাড় সিঁড়ি কোথায় কোনদিকে আঁচ করতে পারবে। চলে চলে গফুর বটতলার বেদীটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ডান বাঁ ঠিক করে বাঁদিকে চলেই সিঁড়িটা পায়। অতপর হাতড়ে হাতড়ে ভাঙ্গা সিঁড়ির গর্ত এড়িয়ে নিচে নেমে আসে। এরপর আর কোন ধাপ নেই ভেবে নিচের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু কেবল জঙ্গল—মাটি পায়না। আন্দাজে এই জঙ্গলে নামলেই বিপদ। সুতরাং পুবদিকে মুখ রেখে উচ্চৈঃস্বরে—রঘু রঘু চিৎকার দেয়। কোন সাড়া নেই। সম্মুখে দীঘির দিকেই সে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে ক্ষীণ স্বরে কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হলো দীঘির অচল কুয়াশা যেন সচল হয়ে উঠছে এবং পেছনে বুড়োবটের দিক থেকে অল্প অল্প হাওয়া বইছে। কুয়াশাও ক্রমে পাতলা হয়ে আসছে। গফুর এবার নজর দিয়ে দেখে নিচে আরও একটা ভাঙা ধাপ। সেটায় নেমে বাঁয়ে দৃষ্টিপাত করতেই জঙ্গলে মধ্যে পায়ে চলার পথটা তার নজরে আসে। ততক্ষণে কুয়াশা আরও পাতলা হয়েছে। দীঘির পাড়ের গাছপালাগুলির যুঝি তন্দ্রা টুটেছে—

ঝিরিঝিরি হাওয়ার কাঁপন লেগেছে। আকাশে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। গফুর জঙ্গলের পথ ধরে রঘুর আশ্রমে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে নাম ধরে রঘুকে ডাকে। রঘু বাগানে। কে ডাকছে বুঝতে না পেরে বেরিয়ে এসে চৌকিদারকে দেখে অবাক!—কি চৌকিদার ভাই, এমন অসময়ে। অসময় বলেই তো এসেছি। সুসময়ে কি কেউ কারো খোঁজ খবর নেয়? বড় বিপদে পড়েছি—গরম জল পড়ে সাবুর পা পুড়ে গেছে। ছোটভাই কোথায়? তাকে ডাক, এক্ষুনি যেতে হবে।

—দুঃখের কথা, প্রেমদাস তো নেই। তাকে কাল সন্ধ্যারাতে আশ্রমে এসে কুলশী নিয়ে গেছে। তার ছেলে গাছ থেকে পড়ে খুবই জখম—জ্ঞান নেই। গাঁও তো বেশি দূর নয়। রাতেই ফেরবার কথা। এখনো যখন এলো না তাহলে হাসপাতালেই নিয়ে গেছে। যাকগে, তুমি আর দেরী করোনা। আমি একটা মলম দিচ্ছি। তুমি এখানে একটু জিরোও। রঘু একখণ্ড কলাপাতা নিয়ে ঘরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কলাপাতা বেঁধে মলম নিয়ে এসে বলে—মলমটা আস্তে আস্তে পোড়া জায়গায় লাগাবে—সাবধান ফোস্কাগুলি যেন ফেটে না যায়। এতে জ্বলুনি কমবে। প্রেমদাস এলেই পাঠিয়ে দেব। গফুর ওষুধ নিয়ে চলে যায়।

চিরঞ্জীব বেলায় ফিরে আসে। হাসপাতালে ডাক্তার ছিল না। রোগী নিয়ে তাকে সেখানেই রাত কাটাতে হয়েছে। জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তার এলে পর রোগীকে তাঁর হেফাজতে রেখে এসেছে। রঘুর নিকট গফুরের সংবাদ এবং সে রোগীকে কি দাওয়াই দিয়েছে তা জেনে চিরঞ্জীব আর দেরি করে না—অনেক কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে দরকারী ওষুধপত্র নিয়ে সে ডাকবাংলোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে পৌঁছে সাবুর জখমী পা-টা দেখে রঘু যে মলমটা দিয়েছে তাই ব্যবহার করতে বলে। ফেটে গেলে পর যে ওষুধ ও পাউডার লাগাতে হবে তা গফুরের হাতে দিয়ে কি ভাবে নেকড়া দিয়ে বাঁধবে তা দেখিয়ে দিয়ে সে উঠে পড়ে। গফুর তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকবাংলোর নিচ অবধি পৌঁছে দেয়।

ডাকবাংলো থেকে বেরতে চিরঞ্জীবের বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। আগেই সে খবর পেয়েছে—টেলিগ্রাফ টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রেলপথ ধ্বংসের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে আজ সন্ধ্যার কিংবা রাতের ডাকগাড়িতে সেকন্না বমন পরিস্থিতি ক্ষোলা কাঁধে

কণ্ঠিধারী এক যুবা বোষ্টম আসছে। তার পরিচয় দানের ব্রজবুলি—গিরিধারী ঘনশ্যাম। সেজন্য চিরঞ্জীব খুবই ব্যস্ত। সন্ধ্যা নাগাদ তাকে স্টেশনে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। যাবার পথে ঐ বোষ্টমের জন্য একটা আস্তানাও দেখে রাখা দরকার সময়ও আর বেশী নেই। সংগ্রাম শুরুর আর তিন দিন মাত্র বাকী। চতুর্থদিন শুক্লা পঞ্চমী রাতে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলে উঠবে। আসন্ন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে নিজেকে সামিল করতে পেরে চিরঞ্জীব যারপরনাই উৎফুল্ল। তার এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের সাধ—পরাধীনতার নিগড় ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন পূর্ণ হতে চলেছে। মনের আনন্দে সে গেয়ে চলে :

চলরে নওজোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ আগল
চলরে চলরে চল—
চল্ চল্ চল্।

চৈত্রের উত্তাপে ছায়াবীথি দিয়ে চলতে চলতে অকস্মাৎ চিরঞ্জীবের মনে ক্ষীণ প্রশ্ন জাগে—আশা তার পুর্ণ হবে তো! পরমুহূর্তেই মন থেকে সন্দেহের কুয়াশা দূর করে সে পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। হঠাৎ অপরাহ্নের শীতল হাওয়া উত্তাল হয়ে গাছে গাছে লুটোপুটি, ছিন্ন পাতার ছুটোছুটি লাগিয়ে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত বয়ে আনে। কিন্তু ঝড় এলো না। খেয়ালী প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা তার আকস্মিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের সঙ্গে বুঝি মিলে গেল। বনপথ ছেড়ে রাস্তার ডাইনে চলে হনুমান মন্দির ছাড়িয়ে বিশাল বিশালাক্ষী বটের নিচে এসে সে থামে। মেলা উপলক্ষে এখানে প্রচুর সাধুসন্ত, বৈরাগী ভিখিরী, ঠগ জোচ্চোর আস্তানা গেড়েছে। প্রত্যাশিত বোষ্টমের জন্য একটা আস্তানা সন্ধানকালে তার দৃষ্টি অদূরে একস্থানে কৌতূহলী জনতার ভিড় দেখে সে এগিয়ে যায়। কাছে যেতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে—হরে রাম, হরে হরে ধ্বনি চিরঞ্জীবের কর্ণগোচর হয়। সে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকে। দেখে এক গৈরিক-বসনা বৃদ্ধ শুয়ে আছে—মাথার নিচে একটা ঝোলা। কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলো অবস্থা সঙ্গিন। শিরা অনুভব করে চিরঞ্জীব ঘিরে

দাঁড়ানো লোকদের বলে—আপনারা দয়া করে চলে যান, নয়তো দূরে সরে দাঁড়ান। হাওয়া বন্ধ করবেন না—রোগীর শ্বাস-কষ্ট বেড়ে যাবে। লোকজন সরে যেতেই সে বৃদ্ধার চোখের পাতা টেনে দেখে, পেট পরীক্ষা করে। শ্বাস কষ্টের জন্য ওষুধের আশু প্রয়োজন। চিরঞ্জীব কি করবে! আশ্রম থেকে ওষুধ এনে চিকিৎসা করতে হলে সময়ের প্রয়োজন। এদিকে বেলা শেষ—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। স্টেশনে যাওয়া একান্ত দরকার। অথচ এই মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধাকে অচিকিৎসায় ফেলে রেখেও বা যায় কি করে! তার মন মানছেনা। রোগী ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে—হরে রাম, রাম রাম বলে তারপর শুধু ঠোঁট নাড়ে। চিরঞ্জীব স্বীয় কর্মপন্থা স্থির করে অদূরে দাঁড়ানো এক ভদ্রবেশী বয়স্ক তীর্থযাত্রীকে দেখতে পেয়ে বলে—আপনি যদি দয়া করে এই রোগীর প্রতি একটু লক্ষ্য রাখেন। আমি এর চিকিৎসার জন্য দরকারী ওষুধপত্র নিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব ফিরে আসছি। ভদ্রলোক এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীবের এই মহত্বপূর্ণ সেবা-পরায়ণতা মুগ্ধ নেত্রে দেখছিলেন। চিরঞ্জীবের আহ্বানে কাছে এসে বলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—আপনি ভাববেন না।

চিরঞ্জীব গাছতলা ছেড়ে রাস্তায় এসে জোরে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় যাত্রী চলাচল আগের চেয়ে কম। সূর্যদেব পাটে বসেছেন। সারা পশ্চিম গগন লালে লাল হয়ে গেছে। চিরঞ্জীবের মনে হলো বিপ্লব-বহ্নি যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। লাল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি আকাশের গায়ে লাল পতাকার মতো সেঁটে আছে। রাস্তাধরে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে। সুতরাং চিরঞ্জীব মাঠে নেমে কোণাকুণি হাতীচরা দীঘি-মুখো দৌড়তে থাকে। আকাশের রঙ ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে।—লালে কালো মিশে ছাই রঙ ধরেছে। তার মাঝে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। রঘুর আশ্রমে এসে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, জলের বোতল ইত্যাদি একটা হ্যাভারসেক-এ ভরে লেংচাকে সঙ্গে নিয়ে একটা হ্যারিকেন সহ গাছতলায় ফিরে আসে। প্রথমেই সে রোগীর হাতখানা তুলে শিরা অনুভব করে। শিরার গতি আরও খারাপ—মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। শ্বাস-কষ্ট আরো বেড়েছে। এই অবস্থায় ইনজেকশনে কোন কাজ হবে না বুঝে দু'ফোঁটা ওষুধ জলে গুলে মুখটাকে হাঁ করিয়ে ভেতরে ঢেলে দেয়। বৃথা—ঠোঁট বেয়ে তা গড়িয়ে পড়ে যায়। যে ভদ্রলোকের উপর

রোগী দেখবার ভার দিয়ে গিয়েছিল তিনি বললেন—এখন আর হরে রাম বলেন না—শুধু ঠোঁট নাড়েন। একবার চোখ মেলে দেখে কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না। চোখ বুজে ফেলেন। চিরঞ্জীব ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দেয়। কিছুদূর গিয়ে তিনি পুনরায় ফিরে এসে বলেন—আপনার পরহিত-ব্রত দরদী পরসেবা দেখে আমি মুগ্ধ। এই অজ্ঞাত কুলশীলা মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধার চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য আপনার হাতে এই সামান্য অর্থ রেখে গেলাম।

চিরঞ্জীব হাত পেতে টাকাটা নিয়ে লেংচার হাতে দিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলে—আপনার দান এই বৃদ্ধার সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদিতে ব্যয় হবে। ভদ্রলোক আর দাঁড়ান না। পেছন ফিরে হেঁটে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান।

রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে। প্রকাণ্ড গাছতলায় জ্বলছে অসংখ্য চুলার আগুন—তৈরি হচ্ছে নানা জনের নানা খাবার। চতুর্দিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। বিচিত্র পরিবেশ। জীবন-যুদ্ধে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাণপাত প্রয়াসের সঙ্গে চলেছে জৈবিক কামনা বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য গানবাজনা আমোদ আহ্লাদ, হুল্লোড়। এরই মধ্যে অপরদিকে আর এক চিত্র। পরপারের যাত্রী লোলচর্ম বৃদ্ধার জীর্ণ শীর্ণ শরীরের খাঁচা থেকে প্রাণ-পাখি যায় যায় করে কিছুতেই যেতে চাইছে না। বেঁচে থাকার জন্য চলেছে প্রচণ্ড যুদ্ধ! বিচিত্র জীবধর্ম—মায়াময়মিদমখিলং! চিরঞ্জীব ক্ষণেকের জন্য বুঝি দার্শনিক বনে যায়। পর মুহূর্তেই বাস্তবে ফিরে আসে—স্টেশনে যেতে হবে। সন্ধ্যার গাড়ি এতক্ষণে এসে নিশ্চয়ই চলে গেছে। প্রত্যাশিত বোষ্টমকে খুঁজে বার করতে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হবে না। চিরঞ্জীব নিজেকে প্রবোধ দেয়। লেংচাকে হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিতে বলে চিরঞ্জীব রোগিনীর কাছে গিয়ে শিরা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখে—দুটোই অনিয়মিত। যে কোন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। লেংচাকে রোগিনীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে, বিশেষত হাঁ করলে কমণ্ডলু থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে বলে চিরঞ্জীব স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

স্টেশনে এসে দেখে সারা প্ল্যাটফরম যাত্রীতে গাদাগাদি। টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। তাতে কিছুতো দেখাই যায় না অধিকন্তু আঁধার সৃষ্টি করছে। চিরঞ্জীব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত বর্ণিত বোষ্টমকে

খুঁজছে। বৈরাগী পোষাকে লোক দেখলেই সে কাছে পিঠে ঘুরঘুর করছে। যদি তাকে দেখে—গিরিধারী ঘনশ্যাম, সাংকেতিক শব্দ (পাস ওয়ার্ড) উচ্চারণ করে আপন পরিচয় দেয়। না, বৃথা। সম্ভাব্য সবরকম খোঁজা-খুঁজি করে বুঝলো—যার আসার কথা সে সন্ধ্যার গড়িতে আসে নি। সুতরাং পরবর্তী ডাক গাড়িতেই আসবে। স্টেশনের ঘড়ি দেখে—ডাক গাড়ির এখনো আড়াই ঘণ্টা বাকি। এই অবস্থায় এখন সে কি করবে? ওদিকে রোগিনীর অবস্থা এখন-তখন। লেংচার পক্ষে একা সামাল দেওয়া কঠিন। সুতরাং চিরঞ্জীর গাছতলায় ফিরে আসে। এখানের অবস্থা একই—জ্বলন্ত উনোনের সংখ্যা কমলেও চেঁচামেচি গানবাজনা, হৈ-হল্লা সমান তালেই চলেছে। লেংচাকে রোগিনীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে জানে—তিনি হঠাৎ একবার ছটফট করে চক্ষু মেলে হাত তুলে কিছু খোঁজার চেষ্টা করে, এত হাঁপাতে থাকেন যে মনে হলো এই বুঝি নিশ্বাস বন্ধ হলো! লেংচার কথা শুনে চিরঞ্জীব হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বসে। আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে অবাক হয়! বেঁচে থাকার জন্য তিনি প্রাণপণ যুদ্ধ করছেন। তাঁর গায়ের রঙ, শরীর ও মুখের গড়ন ইত্যাদি দেখে কোন ভদ্রঘরের মহিলা বলেই অনুমান হয়। নিশ্চয়ই এমন কোন মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছেন যার জন্য ঘর ছেড়ে তিনি ভবঘুরে বৃত্তি নিয়েছেন! সহানুভূতিতে চিরঞ্জীবের হৃদয় গলে যায়। সে আরও কাছে ঘেঁষে রোগিনীকে লক্ষ্য করছে। এমনি সময় তিনি হঠাৎ অদ্ভুত এক অস্ফুট শব্দে হাঁ করতেই চিরঞ্জীব কমণ্ডলু থেকে কয়েক ফোঁটা জল তাঁর মুখে দেয়। সেই মুহূর্তেই বৃদ্ধা মাথা তোলার চেষ্টা করে কমণ্ডলু সহ চিরঞ্জীবের হাতটা শিয়রের দিকে ঠেলে দিয়েই এলিয়ে পড়ে কয়েকবার হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিরঞ্জীব মৃতার আঁচলের কাপড়খানা টেনে তাঁর মুখ ঢেকে দিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে উঠে পড়ে।

কাছে পিঠের লোক লণ্ঠনের আলোকে বৃদ্ধার মুখ ঢাকা দেখেই মৃত বলে ধরে নিয়েই হরিধ্বনি দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃতাকে দেখবার জন্য ভিড় জমে। বৃদ্ধার মৃতদেহ ঢাকবার জন্য একখানা চাদরের প্রয়োজন। মৃতার ঝোলার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে ভেবে ঐদিকে হাত বাড়াতেই চিরঞ্জীবের মনে জাগে জীবনের শেষ মুহূর্তে ঝোলাটা তাকে সমর্পণের জন্যই হয়ত তার হাতটা ধরে তিনি শিয়রের দিকে নিতে চেয়েছিলেন—

কিন্তু পারলেন না। হায় অদৃষ্ট! ঘটনাটা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি কৌতূহল উদ্দীপক! চিরঞ্জীব লেংচাকে মাথাটা ধরতে বলে নিচ থেকে ঝোলাটা নিয়ে মাথাটা আস্তে মাটিতে রাখে। ঝোলাটা বেশ ভারি। হাত ঢুকিয়ে দেখে কয়েকখানা বাসন, একখানা গৈরিক কাপড় ও চাদর। তার নিচে কাপড়ে জড়ানো কষে বাধা একটা পুঁটলি—রহস্যজনক বলেই মনে হয়! চাদরখানা বার করে মৃতাকে ঢেকে দেয়। তারপর বাঁধা পুঁটলিটা নিজের ঝোলায় নিয়ে মৃতার ঝোলাটা লেংচার হেফাজতে রেখে চিরঞ্জীব উঠে পড়ে।

রাতের ডাকগাড়ির সময় হয়েছে। স্টেশনে যাবার পথে চিরঞ্জীব মিশনের মহারাজ-এর সঙ্গে দেখা করে বিশালাক্ষী বটতলায় অজ্ঞাত অপরিচিতা মৃতা বৃদ্ধার বর্ণনা দিয়ে তাঁর দাহ ও আনুষঙ্গিক কর্ম নিষ্পন্নের জন্য মহারাজের হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে লোকজন সেখানে কখন পৌঁছবে জেনে মিশন পরিত্যাগ করে। স্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি আসার ঘণ্টাধ্বনি হয়। স্টেশনে যাত্রীর সংখ্যা সন্ধ্যারাতের গাড়ির তুলনায় কম। গাড়ির গুমগুম শব্দ কানে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনের উজ্জ্বল সন্ধানী আলোতে প্ল্যাটফরম্ উদ্ভাসিত। গাড়ি প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ায়। চিরঞ্জীব গাড়ির কামরার ধার দিয়ে অবতরণকারী যাত্রীদের লক্ষ্য করে করে হাঁটতে থাকে। গাড়ি ছেড়ে যেতেই প্ল্যাটফরম্ ঘুরে দেখে। কোথাও বর্ণিত বোষ্টমের দর্শন মিলে না। অবশেষে বিশ্রাম-ঘরের দিকে এগোতেই স্বল্প আলোকে এক নওজোয়ান বোষ্টমকে দেখতে পায়। তার নিকটবর্তী হতেই সে—গিরিধারী ঘনশ্যাম, উচ্চারণ করে নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করে। চিরঞ্জীব সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে নবাগত-এর হাত ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করেই তাকে অনুসরণের ইংগিত দিয়ে চলতে থাকে।

রাত্রি অনেক। বাজারে কিন্তু তখনও যাত্রীদের কেনাকাটা চলেছে। সঙ্গীকে নিয়ে চিরঞ্জীব একটা খাবারের দোকানে প্রবেশ করে। হাতমুখ ধুয়ে উভয়েই কিছু খেয়ে নেয় এবং লেংচার জন্য কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘুমটিঘর পেরতেই রাস্তায় লোকজনের ভিড় কম। চলতে চলতে দু'জন প্রথমেই স্বনাম ও বে-নাম বলে একে অন্যকে জেনে নয়। উভয়েই সমবয়সী, নওজোয়ান—একই উদ্দেশ্য সাধনে কৃত-সংকল্প। ক্ষণিক আলাপেই একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কথায় কথায় কর্মসূচী প্রসঙ্গও

এসে পড়ে। নবাগত নিতাই বোষ্টম জানায় যে, যন্ত্রপাতি সবই সঙ্গে এনেছে, শুধু একটা শাবল ও গাঁইতির প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এগুলি সর্বক্ষণ ঝোলায় নিয়ে বয়ে বেড়ানো বাহক, বাহ্য পদার্থ কারো পক্ষেই নিরাপদ নয়। সুতরাং এগুলি কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখাই শ্রেয়। চিরঞ্জীব সেগুলি নিজের ঝোলায় নিয়ে নেয়। তারপর বিপ্লব গুরুর রাতে কর্ম-অন্তে তার উপর কি নির্দেশ আছে তা জানতে চায়। উত্তরে নিতাই জানায় যে অন্য নির্দেশ না আসা অবধি তাকে এখানেই থাকতে হবে। ততক্ষণে তারা বিশালাক্ষীর নিকটে এসে গেছে। চিরঞ্জীব নিতাইকে হাত দিয়ে অদূরে ঐ বটগাছটা দেখিয়ে বলে—তাহলে ঐ গাছতলাতেই তুমি সাময়িক থাকো। খাওয়া দাওয়া আমরা এখন যেখানে করেছি সেখানেই করবে। ভাল কথা—বোষ্টম চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, তিলককাটা ইত্যাদিতে ওয়াকিফহাল আছো তো?—হাঁ, কিছুটা তালিম নিয়েছি। গাছতলায় এসে দূরত্ব বজায় রেখে চিরঞ্জীব ঘুরে ঘুরে নিতাইকে জায়গাটা দেখিয়ে যাবার সময় বলে—আগামী দিন সন্ধ্যার পূর্বে "রাধা মাধব" বলতে বলতে এখান দিয়ে যাবার সময় তুমি আমার অনুসরণ করবে।

কালিপদ ওরফে নিতাই বোষ্টমকে ছেড়ে দিয়ে চিরঞ্জীব বৃদ্ধার শব-এর নিকটে এসে দাঁড়ায়। মিশন থেকে লোকজন ইতিমধ্যে এসে গেছে। শব বয়ে নেবার জন্য বাঁশের মাচাও তৈরি! শব বাহকগণ—'বল হরি হরি বল' ধ্বনি দিয়ে শব কাঁধে তুলে নেয়। উচ্চৈঃস্বরে 'বল হরি, হরি বল' রাতের অন্ধকারে গাছ তলার জনারণ্যে একটা ভীতিকর কাঁপন তুলে মিলিয়ে যায়। ক্ষণিকের দেখা অজানা অচেনা বৃদ্ধার জন্য চিরঞ্জীব অদ্ভুত মমতা বোধ এবং তাঁর মরদেহের সদ্‌গতি করতে পেরেছে বলে তৃপ্তি অনুভব করে। শববাহীদের হরিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই চিরঞ্জীব লেংচাকে মৃতার ঝোলাটা তুলে নিতে বলে। নিজের ঝোলায় তাঁর পুঁটুলিটার কথা স্মরণ হতেই ওটার মধ্যে কি আছে তা দেখবার বিশেষ কৌতূহল জাগে।

গাছতলা থেকে রঘুর আশ্রমে এসে যখন পৌঁছে তখন আনুমানিক রাত্রির তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত। আগের রাতে এবং আজকের সারাদিনের পরিশ্রমে চিরঞ্জীব ক্লান্ত শ্রান্ত। তথাপি বিছানায় গা দেবার পূর্বে পুঁটুলিটা খুলে দেখার অদম্য ঔৎসুক্য রুখতে পারে না। লণ্ঠনটা বিছানার কাছে এনে ঝোলা থেকে পুঁটুলিটা তুলতে গিয়ে বৃদ্ধার কথা মনে

হতেই বিষাদ বেদনা অনুভব করে। হাতে নিয়ে মনে হলো সেটা বেশ ভারি ও বড় যা সে আগে লক্ষ্য করেনি। পাড়ের বাঁধন খুলতে খুলতে চিরঞ্জীবের আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়তে থাকে—ভেতরে কি আছে, কি দেখবে? একবার ভাবে এর মধ্যে হয়তো পরলোকগতা বৃদ্ধার সারাজীবনের ভিক্ষালব্ধ অর্থ সঞ্চিত। আবার ভাবে—নাকি, অন্যকিছু। পাড়ের বাঁধন শেষ হতেই নেকড়ার বাঁধন, সেটা খুলেই একটা খাতা। খাতাটার মধ্যে আর একটা নেকড়া ও পাড় জড়ানো পোঁটলা। এর ভেতরে কী? চিরঞ্জীব উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত হয়। পোঁটলাটা খুলতে গিয়ে উত্তেজনায় তার হাঁত কেঁপে ওঠে। খুলে দেখে কয়েকটা 'শ টাকা নোটের তাড়া আর সেই সঙ্গে নেকড়া জড়ানো হার চুড়ি ইত্যাদি সোনা-দানা। এসব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। চিরঞ্জীব বিস্ময়ে হতভম্ব। না, না, এসব কখনো ভিক্ষালব্ধ অর্থে সম্ভব নয়। বৃদ্ধার জীবন রঙ্গমঞ্চে নিশ্চয়ই কোন রহস্য; কোন শোকাবহ ঘটনা অভিনীত হয়েছে এমনও হতে পারে তিনিই ছিলেন তার প্রধান নায়িকা। খাতাটাই হয়ত এসব রহস্যের সন্ধান দিতে পারে। খাতাটায় কি আছে তা দেখবার জন্য চিরঞ্জীব উদ্‌গ্রীব। টাকার বাণ্ডিল ও সোনা-দানাগুলি নেকড়া জড়িয়ে বালিশের তলায় রেখে লণ্ঠনটা শিয়রেব কাছে এনে খাতাখানা খুলে অবাক হয়ে যায়—যখন দেখে পাতার পর পাতা নানা কথা সুন্দর গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ, যা মৃতার জীবনকথা বলেই অনুমিত। তিনি যে শিক্ষিতা ও ভদ্রঘরের তা তাঁর জীবনদীপ নির্বাণের পূর্ব মুহূর্তে তাকে দেখেই চিরঞ্জীব আঁচ করেছিল। মৃতা বৃদ্ধার জন্য সে খুবই দুঃখিত। এত সম্বল থাকা সত্ত্বেও তিনি এক নিঃসম্বল নিঃসহায়ের মত অযত্নে অচিকিৎসায় মারা গেলেন! জীবনের কি শোচনীয় পরিণতি! অন্তিম মুহূর্তে না হয়ে যদি কয়েকদিন আগে সে তাঁকে দেখতে পেতো! নিয়তি কেন বাধ্যতে! এই মুহূর্তে খাতাখানা খুলে পড়বার তার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে কিন্তু আগামী কালের কাজকর্ম ও খাটাখাটুনির কথা ভেবে খাতাখানা শিয়রের পাশে রেখে সে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে অর্থ ও গয়নাগাটিগুলির বিলিব্যবস্থা চিন্তা করে। অর্থ তার জন্য নয়—বিপ্লবের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সে-কথা মনে রেখেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই চিরঞ্জীব উঠে পড়ে। একটা ঝোলায় যন্ত্রপাতিগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। দূরে মাঠের ওধারে পাহাড়ের

আড়ালে সূর্য উঠি উঠি করছে। দীঘির পাড়ে ঝোপে ঝাড়ে অন্ধকার তখনও লেপ্টে আছে। জংগলের মধ্যে পায়ে চলার রাস্তার ধারে ঝোলাটা লুকিয়ে রেখে একটা চিহ্ন দিয়ে চলে আসে। ইতিমধ্যে রঘুও উঠে পড়েছে। লেংচা উঠে ঘরদুয়ার উঠোন ঝাড় দিয়ে পরিষ্কারের কাজে লেগে গেছে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে চিরঞ্জীব ঘরে আসে। আজ মঙ্গলবার রঘুরও তাড়া আছে—বুড়ো শিবতলায় তার ক্রিয়াকর্ম রয়েছে। রঘু ঘরে ফিরতেই চিরঞ্জীব তাকে কাছে ডাকে।—বসো। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। রঘু বসতেই ঝোলা থেকে নেকড়া জড়ানো পুঁটুলিটা বার করে তার হাতে দিয়ে বলে—খোলো। পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে রঘু অস্বস্তি বোধ করে। তথাপি চিরঞ্জীবের কথা মেনে সেটা খুলে জিনিষগুলি দেখামাত্র তার হাত থেকে সেগুলি ছিটকে পড়ে যায়। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রঘু সেগুলির দিকে চেয়ে আছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জীবনে সে কখনো এত টাকা ও গয়নাগাটি দেখেনি। তার অবস্থা দেখে চিরঞ্জীব হেসে বলে—কি ব্যাপার রঘুদা এমন করছো কেন ?

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাই, এসব কিসের খেলা এবং কেন আমাকে দিলে ?

—অতি সহজ কথা—জিনিষগুলি তোমার হেফাজতে রাখলাম। আমি ভবঘুরে বৈরাগী বাউল, গান গাই ঘুরিফিবি, কখন কোথায় থাকি তার নাইকো ঠিকানা—আজ আছি দেখবে কাল আর নেই। তোমার কাছে থাকলে তুমি এসব পর-হিতে, পর-সেবায় ব্যয় করতে পারবে। তুমি বলেছিলে, আশ্রমটা বাড়িয়ে একটা দস্তুর মতো সেবা-কেন্দ্র করবে। তাতে ওষুধপত্র, কাঁটা-ছেঁড়ার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব কিছু থাকবে। এখন তোমার সেই সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। এখানে নগদ চার হাজার টাকা এবং গয়নাগুলোর দামও কম করে কয়েক হাজার টাকা। প্রথমে গয়না বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে আগে ঘর, তারপর ওষুধ রাখবার জন্য আলমারি বানাও। তুমি নিজে নানা ওষুধের প্রয়োগ, ক্রিয়া প্রক্রিয়া ইত্যাদি শিখেছ এবং জেনেছ। এখন প্রয়োজনীয় কি কি চাই বলো। আমি লিখে দেবো। তাছাড়া এখানের কম্পাউণ্ডারবাবু বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তাঁর সাহায্য চাইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। আমি তাঁকে বলবো। রঘু কিছুই বলছে না, বলতে পারছে না—হাবাগোবার

মতো ছড়ানো জিনিষগুলির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চিরঞ্জীব হাঁক পাড়ে—বলো, রঘুদা কথা বলো।

—আমার মাথা ঘুলিয়ে গেছে। আমি কিছু বলতে পারছি না—এত অর্থ এত সোনাদানা—আমি স্বপ্ন দেখছি!

না, না, এসব কথা তোমার সাজে না। কত ঘাটের জল খেয়ে কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা সয়ে তুমি পরসেবার জন্য এমন একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছ। এতে অবাক হবার কিছু নেই। এমন অঘটন পৃথিবীতে হামেশাই ঘটছে, তা নিজের জীবন দিয়েই তো বুঝতে পারছ। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই। টাকাগুলি তোমার হেফাজতে সাবধানে রাখবে। আমার যদি প্রয়োজন হয় আমি নেব। নচেৎ সবই তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যে খরচ করবে। আজই গয়নাগুলি স্যাকরার দোকানে গিয়ে ওজন করে কত ভরি হয় এবং খাদ বাদ দিয়ে ভরি প্রতি কত টাকা দেবে তার একটা পুরো হিসাব লিখিয়ে আনবে। এসব কোথায় পেলে জিজ্ঞাসা করলে বলবে এক সহৃদয়া দয়াবতী মহিলা আশ্রমের সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করেছেন। রঘু তখনো নিরুত্তর। চুপ করে স্থবিরের মতো বসে আছে। চিরঞ্জীব উঠে ছড়ানো গয়না ও নোটের তাড়া নেকড়াটায় বেঁধে রঘুর হাতে দিয়ে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বাগানে এসে চিরঞ্জীব একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে। অজানা, অচেনা, আত্মপরিজন-বিহীন পরলোকগতা বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে খাতাখানা খোলে এবং পড়া শুরু করে:

আমি অনুরাধা। স্বার্থপরায়ণতা, অর্থগৃধ্নুতা জীবনে কিরূপ মারাত্মক বিষময় পরিণতি ডেকে আনে আমি তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। এই জীবন কথায় তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেলাম।

দেখতে শুনতে কিংবা লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না। কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে বাদ সাধলো বয়স অনুপাতে আমার বাড়ন্ত-গড়ন। চৌদ্দ বছর পেরোতে না পেরোতেই পিতামাতা বিয়ে দিতে অস্থির উদ্‌বিগ্ন হলেন। সবে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি। লেখাপড়ায় উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও বাবা মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতা মেয়েদের থাকে কতটুকু? বরও জুটে গেল—গঞ্জের ছোট দেওয়ানী আদালতের মোক্তার। আদালতে পসার আছে—অর্থবান। দেখতে খারাপ নয়, তবে আমার তুলনায় বয়স ভারী।

বিবাহোত্তর পর্বের প্রথম তুই বৎসর গাঁয়ের বাড়িতে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট কাটালাম। প্রথমে পিতামাতা, তারপর শ্বশুর শ্বাশুড়ী, সবশেষে কতকটা নিজ প্রচেষ্টায় গঞ্জে স্বামীর একার সংসারে এসে উঠলাম। চাকর বাকরই ঘর সংসার রান্নাবান্নার কাজ করে। স্বামী সকাল বিকেল বৈঠক-খানায় মক্কেল নিয়ে ব্যস্তসমস্ত। তুপুরে কাচারি। কাচারি থেকে ফিরে আবার মক্কেলের নথিপত্র নিয়ে বসেন। রাত্রি বেড়ে চলে। অনেক ডাকাডাকির পর ঘরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই নাক-ডাকা শুরু। বুঝি, সারাদিনের খাটাখাটুনিতে স্বামী অত্যধিক পরিশ্রান্ত। এ ভাবেই বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। আগে পাড়াপড়শীদের বাড়ি হামেশাই যাতায়াত করতাম। কিন্তু তারা কেমন যেন ঈর্ষার চোখে দেখে। কথাবার্তার ধরন-ধারণ ভাল লাগে-না। ক্রমে ক্রমে তা কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেপুলে নেই—কালক্রমে বুঝলাম তা হবার আর আশা নেই! মাতৃত্বের আশা আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরই বিনষ্ট হলো। কিন্তু আমি করি কী? অফুরন্ত অবসর—দিন কাটে তো সময় কাটে না! তিতবিরক্ত হয়ে অবশেষে চাকরবাকর সব ছাড়িয়ে দিলাম। ঘর সংসারের পুরো হাল নিজের হাতে নিয়ে নিলাম। স্বামীকেও আঁকড়ে ধরলাম। বেশীক্ষণ চোখের আড়াল হতে দিতাম না। বৈঠকখানার সকাল সন্ধ্যা মক্কেলদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্তার সময় সীমিত করে দিলাম। স্বামী কিছু বলেন না। ছেলেপুলের অভাবে আমার মনোবেদনা বুঝেই হয়তো সহানুভূতির সঙ্গে নীরব থাকেন। আদালত ফেরৎ টাকা পয়সা সবই আমার হাতে তুলে দেন। আমার অভাব অভিযোগ নিরসনের জন্যই হয়ত করেন। কিন্তু দিনে দিনে আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি। আমার ভেতর বিরাট এক পরিবর্তন ঘটছে বুঝতে পারছি। টাকা পয়সার প্রতি আমার লোভ লালসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আদালত থেকে স্বামীর ফেরার জন্য যতটা না উদগ্রীব হতাম তার চাইতে অধিক হতাম অর্থের জন্য—কখন কত অর্থ নিয়ে আসবেন। দিনের শেষে কর্মক্লান্ত স্বামী ঘরে এসে বসে ব্যাগ খুলে টাকা দেবার তর সইত না। নিজেই তার হাত থেকে ব্যাগটা একরকম ছোঁ দিয়ে টাকা বের করে নিতাম। টাকার লোলুপতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটা জমাবার নেশাও পেয়ে বসলো। খাওয়া দাওয়ায় কার্পণ্য শুরু হলো। সংসারের ব্যয়ভারও কমিয়ে দিলাম। প্রাপ্ত টাকার সিংহভাগই শোবার ঘরে খাটের ওপর তোষকের নিচে এবং

সামান্য অংশ পাটাতনের উপর মট্‌কির ভেতর রাখতাম। চাকরবাকর তো আগেই ছাড়িয়ে দিয়েছি, এখন ভিখিরী আতুর এবং লোকজন কেউ বাড়ির কাছে এলে চেঁচিয়ে তাড়া করতাম। আমার ভয়ে বাড়ির ত্রিসীমানাও কেউ মাড়াতো না। স্বামী আপিসে গেলে পর আমার একমাত্র কাজ ছিল খাটের উপর তোষকটা তুলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দেখে পরিতৃপ্তি লাভ।

বিবাহিত জীবনের ত্রিশ বৎসর কাল এভাবেই অতিবাহিত হলো। একদিন ভোরে উঠে ঘরকন্নার কাজ সেরে এসে দেখি স্বামী তখনও শুয়ে আছেন—এ এক অভাবিত ঘটনা। এতদিনের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কোন দিন এমনটা দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হলো? বললেন, —শরীরটা ভাল না। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম—গরম। ভাবলাম সামান্য জ্বর। বললাম ওঠো—কোর্টে যাবে না? কোর্টের নাম শুনেই উঠে পড়লেন। তারপর যথারীতি দৈনন্দিন কাজ সেরে কোর্টে গেলেন। এভাবেই কিছুদিন চললো। স্বামীর শরীর ক্রমেই দুর্বল ও খারাপ হতে লাগলো—পেটে ব্যথা ঘুষঘুষে জ্বর, ঐ অবস্থাতেই টাকার জন্য তাগাদা দিয়ে আদালতে পাঠাতাম। টাকা খরচের ভয়ে চিকিৎসাও করতাম না। ভাবতাম, বয়স হয়েছে—সামান্য অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু আমার আশা আশংকায় পরিণত হলো। স্বামী শয্যাশায়ী হলেন। উত্থান শক্তি রহিত হলো। পেট ফুলে উঠলো—নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট এবং পেটে অসহ্য ব্যথা। কি করি? আমার ভয়ে লোকজন বাড়ির কাছে ঘেঁষে না। কাউকে ডাকি না ডাকতেও পারছি না। ঘরে স্বামীর বিছানার নিচে টাকা—তাড়া তাড়া নোট যদি চুরি যায় বা অন্য কিছু হয়। স্বামীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিলো—কথা বলতে পারছেন না। নিরুপায় হয়ে স্বামীকে না জানিয়েই দরজায় তালা দিয়ে বের হলাম। বড় ডাক্তার ডেকে আনলাম। তিনি দেখে বললেন—এ কি করেছেন! রোগীকে তো শেষ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। এ উদরী রোগ, এখন আর কিছু করবার নেই। এত নোংরার মধ্যে রেখেছেন। রোগীর সারা শরীরে ঘা। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন খাবার ওষুধটা জল দিয়ে গুলে খাওয়াবেন এবং পাউডারটা গায়ে মাখাবেন। ফি নিয়ে চলে যাবার মুহূর্তে সামনে এসে বললাম—ডাক্তারবাবু আমি বড় অসহায়—লোকজনের খুবই অভাব। আপনার কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে দয়া করে যদি

ওষুধগুলি পাঠিয়ে দেন—খুবই উপকৃত হবো। ওষুধের দাম ইত্যাদির জন্য হাত বাড়িয়ে টাকা দিতে গেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্তির সঙ্গে—না, বলেই কি ভেবে আমার দিকে চেয়ে, বোধহয় আমার অবস্থা উপলব্ধি করে, টাকা নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথার জের—এ কী করেছেন! রোগীকে তো শেষ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। আমার আর কিছু করবার নেই—মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। হায়, হায় এ কি করলাম! জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামী, তাঁকে কিনা অবহেলায়, অনাদরে, অচিকিৎসায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলাম। অনুশোচনার সারা অন্তর দগ্ধ হতে লাগলো। অন্তরেব অন্তস্তল থেকে ধিক্কার উঠলো—অর্থের ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়! স্বামীর শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদতে লাগলাম। তাঁর ছটফটানি আবো বেড়ে গেছে। যন্ত্রণায় মাথাটা কেবল এপাশ ওপাশ করছেন। মনে হলো পেট আরো ফুলেছে—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট হচ্ছে। কি করি? ইচ্ছা হলো ডুকরে কেঁদে মনের ভার কিছুটা লাঘব করি। কম্পাউণ্ডারবাবু ওষুধ নিয়ে এলেন। তিনি এসে রোগী দেখেই বুঝলেন শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। তথাপি বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একটা কাপে জল নিয়ে ওষুধ গুলে মুখে দেবার চেষ্টা করলেন। বৃথা ওষুধ সব গড়িয়ে পড়ে গেল। তিনি বললেন—আপনার আত্মীয় স্বজনকে এখন সর্বদা রোগীর কাছে থাকতে বলবেন। কথা শেষে—আমি যাচ্ছি; বলে তিনি পিছন ফিরতেই বললাম—আমার আপনজন বলতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।—সে কি, বলেই তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চান। তারপর—আচ্ছা, আমি পাড়ার ছেলেদের পাঠাচ্ছি, আপনি ঘাবড়াবেন না। তাঁর আশ্বাস পেয়ে তাঁকে একটু দাঁড়াতে বলে পাশের ঘর থেকে দু'শ টাকা এনে তাঁর হাতে দিয়ে বলি—এর দ্বারা আপনি এঁর শেষ কৃত্যের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু তাদের সঙ্গে দয়া করে পাঠাবেন। আমি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে স্বামীর শয্যা পাশে বসে পড়ি। টাকা নিয়ে কম্পাউণ্ডারবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্বামীর বিছানার পাশে এসে তাঁকে দেখলেন। তারপর যেতে যেতে বললে—আমি মিশনে খবর দিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। আপনাকে প্রবোধ দেবার মতো ভাষা আমার নেই। বুঝলাম স্বামীর জীবনদীপ নির্বানের মুখে।

দুপুর পেরিয়ে বেলা দ্রুত গড়িয়ে চলেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় স্বামী হাত পা ছুঁড়ছেন। একবার কিছু বলবার জন্য উঠে বসবার চেষ্টা করতেই বুকে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দিলাম। কাঁদতে কাঁদতে প্রতিজ্ঞা করলাম যে অর্থ অনর্থের মূল হয়ে আমার জীবনে এতবড় অভিশাপ ডেকে এনে আমার কপাল পোড়ালো সেই অর্থ—যা স্বামীর বিছানার নিচে রক্ষিত তার সব কিছুই তাঁর সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

দিনের আলো নিবে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর জীবনদীপ কেঁপে কেঁপে নিবে গেলো। আমার জীবনেও আঁধার নেমে এলো। ডুকরে কেঁদে উঠলাম। শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে ভিড় করলো, মিশন থেকে লোকজন এসেছে। শব বইবার জন্য তাদের বাঁশের মাচা করতে দেখে কান্না রোধ করে দৃঢ়চিত্তে নিজ অভিপ্রায় নির্বিঘ্নে সিদ্ধির জন্য নিজেকে সংযত ও অবিচলিত রেখে তাদের বললাম আপনারা খাটে করেই শব বয়ে নিয়ে যান। নদীর তীরে শ্মশান এখান থেকে বেশী দূর নয়। আমার ইচ্ছা ভিন্ন চিতা তৈরী না করে মৃতদেহ খাটের উপর রেখেই তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র সহ দাহ কার্য নিষ্পন্ন হোক।

—কিন্তু এটা তো বিধিসম্মত নয়।

আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি অটল অনড়। তাদের বললাম—অশাস্ত্রীয় বলতে তেমন কিছু নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা বিধানও তো শাস্ত্রে রয়েছে। যে রোগে ভুগে ভুগে আমার স্বামীর দেহান্ত হয়েছে তাতে পেট ছাড়া তাঁর শরীরের আর কিছু নেই বললেই হয়। সারা শরীরে ঘা দগদগ করছে। এই অবস্থায় তাঁর শেষ শয্যা থেকে তুলে অন্যত্র স্থাপন করা দৃশ্যটা নিশ্চয়ই বীভৎস ও অমানবীয়। মিশনের লোক বোধ হয় আমার যুক্তি মেনে নিলেন। তাদের কয়েকজন বেরিয়ে গেল। প্রয়োজনীয় বাঁশ দড়িদড়া ইত্যাদি নিয়ে তারা ফিরে এলো। খাটে অগুরু ছড়িয়ে দিয়ে ফুল চন্দন ইত্যাদি তার উপর রাখতে বললাম। বাঁধাছাঁদা শেষ হলে হরিধ্বনি দিয়ে খাট তোলা হলো। মিশনের একজনকে বাড়ি পাহারার জন্য রেখে আমিও শববাহকদের সঙ্গে যাত্রা করলাম। স্বামীর শ্মশানযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবন যাত্রার এক অধ্যায়ও সমাপ্ত হলো। জীবন রঙ্গমঞ্চে নটের অন্তর্ধান-এর সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা পতন আর নির্জন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে লোকচক্ষুর অন্তরালে শুরু হলো নটীর বিলাপ ও তার আত্মার ক্রন্দন।

বিলাপ করতে করতেই শববাহীদের অনুগমন করছিলাম। নদী তীরে এসে হরিধ্বনি দিয়ে শবসুদ্ধ খাট রেখে বাহকগণ দাহকরার জন্য কাঠ, খড় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। খাট ধরে বসে আছি। নিঃসীম অন্ধকার—অদূরে একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে তাতে অন্ধকার আরো ঘনীভূত। তার মধ্যে শববাহকদের চলাফেরা অশরীরীর মতোই মনে হচ্ছে। কিছুদূরে খরস্রোতা নদীর কলকল শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ার ঝুপঝাপ শব্দ ভেসে আসছে। অদূরে আর একটা চিতা জ্বলছে। চিতাগ্নির ফট্‌ফট্ আওয়াজের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি রাতের অন্ধকারের বুক চিড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এক অস্বাভাবিক ভীতিকর পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে ঐহিক জগতের অসারত্ব ও নশ্বরত্ব যেন সদর্পে ঘোষণা করছে। খাটের বাজু আঁকড়ে ধরলাম ইচ্ছা হলো স্বামীকে জড়িয়ে ধরে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে চিরবিদায় নিই। সে সুযোগ আর পেলাম না। শ্মশান বন্ধুগণ এসে বললো—চলুন, খাট নিয়ে যাচ্ছি—চিতা তৈরি করতে হবে। চিতা থেকে কিছু দূরে গিয়ে বসলাম। শোকাবেগে চিন্তা ভাবনা, সুখ দুঃখ ইত্যাদির অনুভূতি ও চেতনা সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন এসে ডাকতেই চমকে উঠলাম—চলুন চান করাবেন। গঙ্গাজল আর অশ্রুজলে স্বামীকে চান করালাম। তারপর অগুরু ছিটিয়ে পুষ্প চন্দন দিয়ে মনোমত সাজিয়ে নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে প্রণাম করে আর মাথা তুলতে পারি না। হুহু করে চোখের জল পড়ে তাঁর পা সিক্ত হতে থাকে। যিনি মন্ত্র পড়ালেন তিনি হাতধরে উঠুন—বলে একটু দূরে বসিয়ে দিলেন। খানিক পর আবার এসে বললেন—চলুন, মুখাগ্নি করতে হবে। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। উঠছি না দেখে তিনি কাছে এসে হাতধরে বললেন—চলুন মুখাগ্নি করবেন। হাত ধরতেই আমার হুঁশ হলো। আমি উঠে তাঁর অনুসরণ করে স্বামীর চিতা-শয্যা-পার্শ্বে এসে দাঁড়ালাম। স্বল্প আলোকে দেখলাম খাটের নিচে মাটিতে চুলো করে তার নিচে উপরে কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরি হয়েছে। স্বামীর মুখখানা শুধু একটু কাঠের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মিশনের একজন এক আঁটি বাঁশের কঞ্চিতে আগুন লাগিয়ে আমার হাতে দিয়ে আমাকে ধরে ধরে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণের সঙ্গে স্বামীর মুখে আগুন ছুঁইয়ে হরিধ্বনি দিয়ে চুলায় স্থাপন করালো। ঘি ছিটিয়ে দেবার সঙ্গে চিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে একটা

অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। আমি দূরে দাঁড়িয়ে স্বামীর মরদেহ আগুনে ভস্মসাৎ-এর মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছি। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি নিশুতি রাতের অন্ধকারে একটা প্রবল আলোড়ন তুলে এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। রাত্রি কত অনুমান করতে পারছি না। উর্ধ্বে চেয়ে দেখি আশ্বিনের নির্মল নির্মেঘ আকাশে অসংখ্য তারা চিক্ চিক্ করছে। কেঁদে কেঁদে তাদের দিকে চেয়ে বলি—দেখ, দেখ—যুগ যুগান্তধরে তোমাদের বিনিদ্র নয়নের সম্মুখে রাতের অন্ধকারে মানবজীবন-নাট্যের এরূপ মর্মান্তিক দৃশ্য কতই না অভিনীত হচ্ছে। রিক্ত, নিঃস্ব, নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে অদূরে স্বামীর বহ্নিমান চিতা দেখছি আর চোখের জল ফেলছি। সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। অন্তরের শোক গুমরে গুমরে উঠছে। অনুশোচনায় অন্তর দগ্ধ হচ্ছে। কি করি। নিজেকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। অথৈ জলে পড়েছি—কূল কিনারা দেখছি না—হাবুডুবু খাচ্ছি।

চিতার আগুন ক্রমে নিবে আসছে। আশপাশের অন্ধকারও গাঢ় হচ্ছে। হঠাৎ উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি একজন একটা বাঁশ নিয়ে নির্মমভাবে চিতাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুন উস্কে দিচ্ছে। আলো আঁধারে সে এক বীভৎস দৃশ্য। শিউরে উঠলাম। মনে হলো আমার শরীরটাকেই নিয়েই যেন খোঁচাখুঁচি করে ক্ষত বিক্ষত করছে। যদিও বুঝতে পারছিলাম স্বামীর দেহাবশেষ ভস্মসাৎ-এর উদ্দেশ্যে চিতার আগুন উস্কে দিচ্ছে তথাপি এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলাম না। একটা চিৎকার দিয়ে দু'হাত দিয়ে চোখমুখ ঢেকে বসে পড়লাম। চিৎকার শুনে মিশনের একজন দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—কি হলো? বললাম—কিছু নয়—ভয় পেয়েছিলাম তাই গলা দিয়ে আকস্মিক চিৎকার বেরিয়ে গেছে। কি ভয়, কেন ভয় পেলেন—সে সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে কি ভেবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে—আসুন। চিতার ধারে গিয়ে দাঁড়াই—চিতা নিবু নিবু। একজন এক কলসী জল নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললে চিতায় নিক্ষেপ করুন। চিতায় জল ঢালা হলো অতপর এক মালসা চিতা ভস্ম নিয়ে বললে চলুন। গঙ্গার ধারে পৌঁছে তার নির্দেশ মতো গঙ্গায় নেমে ভস্ম জলে ভাসিয়ে দিয়ে ডুব দিয়ে উঠলাম, শাখা খুলে গঙ্গায় ফেলে সিঁথির সিঁদুর মুছে পরিধানের বস্ত্র ছেড়ে সাদা থান পরে বিধবার বেশে গৃহাভিমুখী হলাম। পেছনে আর

ফিরে তাকালাম না। কিন্তু চোখের জল বাধ মানলো না। মিশনের লোক বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলো।

ঘরে ঢুকে দরজায় আগল দিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লাম। কতক্ষণ কেঁদেছি জানি না—চোখে বুঝি আর জল নেই—সব শুকিয়ে গেছে। উঠে রাতের আঁধারে অশরীরীর মতো এ ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব ফাঁকা শূন্য নির্জন নিথর। শূন্যতার বেদনা আর স্মৃতির ভার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শোবার ঘরে এসে ঢুকি—একেবারে ফাঁকা—সব শূন্য! খাটপালঙ স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে দিয়েছি। একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ি। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও অধিককালের দাম্পত্য জীবনের লীলা খেলা, নানা স্মৃতি চক্ষু মুদলেই সাকারে এসে উপস্থিত হয়। এভাবে স্মৃতির বেড়া জালে আটকে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। বাইরে দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়। চেয়ে দেখি—দিনের আলো ছেয়ে গেছে। উঠে দরজা খুলে দিই। পাড়া প্রতিবেশীরা সহমুভূতি জানাতে এসেছে। সঙ্গে ফলমূলও রয়েছে। আশ্চর্য যাদের সঙ্গে বহুদিন কোন সম্পর্ক রাখিনি তাদের সমবেদনাশীল ব্যবহার, কথাবার্তা এবং সান্ত্বনার সঙ্গে বৈধব্য দশায় পালনীয় রীতি নীতি সম্পর্কে উপদেশ আমার হৃদয় স্পর্শ করলো, কর্তার মক্কেলরাও অনেকে সহানুভূতি জানাতে এসেছে। ইতিমধ্যে লোক পরম্পরা রটে গেছে যে মোক্তারবাবুর চিতা ভস্মের সঙ্গে অনেক দগ্ধ ও অর্ধদগ্ধ নোটের বাণ্ডিল রয়েছে। সারা জনপদ উতলা। বহু লোক নদী তীরে জড় হয়েছে। যাদের মোহে আমার কপাল পুড়েছে তাদের পোড়া সংবাদে আমার ইচ্ছা সফলকাম হয়েছে জেনে স্বস্তি পেলাম—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো।

বাপ মা, শ্বশুর শাশুড়ি অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। স্বামী বিয়োগের খবর বাপের কিংবা শ্বশুর বাড়ি পাঠাই নি। সুতরাং স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম আমার অনুরোধে মিশনের সহায়তায় বিনা আড়ম্বরে যথা রীতি নিষ্পান্ন হলো। খবর পেয়ে একদিন দাদাভাই এবং দেবররা এলো। ভাইরা আমার দুঃখে অশ্রুপাত এবং নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলো। সময় হলে অবশ্যই যাবো বলে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে নিরস্ত ও আশ্বস্ত করলাম। আর দেবরদের কথাবার্তা ও হাবভাব কেমন

যেন মনে হলো। দাদার মৃত্যুতে তারা যতটা না দুঃখিত ও শোকার্ত তার চাইতে অধিক ব্যগ্র ও উদ্‌গ্রীব দাদা স্থাবর অস্থাবর কি রেখে গেছেন তা জানতে। তার উপর দাদার চিতা ভস্মের সঙ্গে অর্থ ভস্মের সংবাদ তাদের লালসার ইন্ধনে প্রচণ্ড হাওয়া যুগিয়েছে। তারা নাছোড়বান্দা। আমি তুষ্ণীম্ভাবই শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করলাম। আমার নিকট ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে বাইরে অনেক ছুটোছুটি করে কি সংবাদ সংগ্রহ করলো জানি না। তবে যাবার দিন সান্ত্বনা দিয়ে বললে—বৌদি আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক করে দেব। আমরা আবার আসছি। আপনার তো ছেলেপুলে নেই আমারই দাদার সম্পত্তির তদ্বির তদারক করবো—নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের যাতায়াত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এলেই মৃত স্বামীর সম্পত্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। দাদা এলেন। বললেন—চল। একাএকা আর কতদিন থাকবি? ওখানে গেলে আমরা আছি, ছেলে পুলেরা রয়েছে। মন সুস্থ ও ভাল থাকবে। এ ভাবেই আত্মীয় স্বজনের পীড়াপীড়ি চলছে। এর উপর নিজেকে নিয়েও আর এক বিপদে পড়েছি। যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোট! কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি দেহ-সৌষ্ঠর সম্পর্কে যার-পরনাই সচেতন ছিলাম। এখন বয়স হলেও দেহের গড়ন শক্তি সামর্থ্য অটুট। বিধবার সাদা থানের আড়ালে তা প্রকট হয়ে আকৃষ্টতর হয়েছে কি না জানি না। আগে ক্বচিৎ কদাচিৎ ঘরের বার হতাম। এখন নানা কাজে হামেশাই বার হতে হচ্ছে। ফলে লোকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে—যা অনেক সময় দৃষ্টিকটু বলেই মনে হয়। স্বামীর কোর্ট কাচারির সহকর্মিরা এসে নানা উপদেশের ছলে জ্বালাতন করে। তারা এমন ভাবে সব কথাবার্তা বলে ও তাকায় যা অনেক সময় অশালীন বলেই মনে হয়। এরূপ নানা ভাবে চলেছে আত্মীয় ও অনাত্মীয় জনের উৎপীড়ণ ও উপদ্রব। এ সবের থেকে কি ভাবে রেহাই পাই! মনে মনে অনুক্ষণ এ চিন্তাই চলেছে।

অবশেষে উপায়ান্তর না পেয়ে মিশনের শরণাপন্ন হলাম। কোর্ট থেকে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার জন্য মিশনের অধ্যক্ষ মহোদয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম। তিনি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় সব কিছু করবেন বলে আমাকে ভরসা দিলেন। আমি আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি। বেলা বোধহয় তখন দশটা। দরজা

খুলে সবে ঘরে ঢুকে বসেছি এমনি সময় বৌদি বলে হৈ হৈ করে তিন দেবর এসে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে তাদের নারকেল, কলা ইত্যাদি নানা ফলমূল। বরাবরই তারা দু'জনে পালা করে আসে। এবার তিনজন একত্রে এবং ঘটা করে এত আদর আপ্যায়নের হেতু কি। স্বভাবতই মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। যাই হোক তারা কি বলে বা কি বলতে চায় শোনবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি। এ-কথা সে-কথার পর দাদার মৃত দেহের সঙ্গে এত অর্থ কি করে ভস্মীভূত হলো সে প্রসঙ্গ তারা পুনরায় উত্থাপন করে। আমি উত্তর দিলাম—এতো পুরণো কাসুন্দি। লোকটা ছ'মাস রোগগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন যদি তোমরা এসে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে তা হলে বুঝতে পারতে। তা যখন করোনি তখন তাঁর পোড়া অর্থের জন্যে মন পুড়িয়ে কি লাভ বলো। আর যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো।

—হ্যাঁ, বলবার মাত্র একটা কথাই আছে সেটা হলো দাদার সম্পত্তিতে, আমরা যখন এক বাপের সন্তান—আমাদেরও অধিকার বর্তেছে। কথা শেষে একজন পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে আমাকে সই করতে বলে। অন্য দুই ভাই দু'দিকে দাঁড়িয়ে। রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। সেটা ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ না করে উঠে দাঁড়াই। এর মধ্যে এক ভাই পাশ কেটে দরজার দিকে এগোতেই তার মতলব বুঝে আমি চট্ করে তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াই। বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বলি—দরজা বন্ধ করবার দরকার কি? এতো জোর জুলুমের কোন ব্যাপারই নয়। আমি এক অবলা আর তোমরা তিন পুরুষ। তোমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব কেন? সুতরাং কি এনেছ পড়ে দেখি। খতখানা হাতে নিতেই তিন ভাই শকুনের মতো তিন দিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছে—যেন সুযোগ মাত্রই আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। অবস্থার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে খতখানা পড়বার ফাঁকে কি কৌশলে এদের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করবো সেটা স্থির করে ফেলেছি। পড়া শেষে সেটা ছিঁড়ে ফেলতেই একজন আমাকে ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই আমি তার পেটে জোরে এক লাথি কষে দরজার আড়ালে রাখা আমার সঙ্গী লাঠিখানা হাতে নিয়েই প্রচণ্ড চিৎকার করি—কি এত বড় দুঃসাহস আমার গায়ে হাত! বেরো শেয়াল কুকুরের দল, আমার বাড়ি থেকে বেরো, বলেই আর একজনকে লাঠি মারতেই দু'জনে দৌড়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—এর ফল ভালো হবে না। আর একজন যাকে লাথি মেরেছি সে তখনো শুয়ে কাতরাচ্ছে। সেটাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে রেখে দিয়ে নারকেল কলা ইত্যাদি ফল মূল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দি।—নে সব নিয়ে ভাগ, আর কখনো এ মুখো হবি না। আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য—উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি।—হতচ্ছাড়া শেয়াল কুকুরের দল ভাগ, বলে পুনরায় চিৎকার দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে এসে বসে পড়ি। বাইরে যে সব লোক জড় হয়েছে তারা এই সব কাণ্ডকারখানা এবং আমার রণরঙ্গিণী-মূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করবার সাহস ও ফুরসৎ পায় না।

বিধবার একার সংসার—সন্তান-বিহীনা, আত্মপরিজন থেকে বিচ্ছিন্না এক বৈচিত্র-হীন একঘেয়ে জীবন—অ.গু পিছু নেই কোন আকর্ষণ। দিন কাটে তো রাত কাটে না। এ ভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিবাহিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মিশনের প্রচেষ্টায় কোর্টের আদেশ-বলে মৃত-স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে জীবন-বীমার টাকা পেয়েছি এবং ব্যাঙ্ক-এ টাকা লেনদেন করছি। দেবররা কোর্ট কাচারীর মাধ্যমে এবং ভাড়াটে লোকজন দিয়ে নানাভাবে উৎপাত সৃষ্টি ও উৎপীড়ণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার উপর নারী জীবনের—বিশেষত বিধবার—আর এক অভিশাপ নিঃসঙ্গতা। এরই সুযোগ নিয়ে কতলোক যে হিতৈষী সেজে নানাভাবে প্রবঞ্চনার এবং কামনা লালসার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে জীবনটাকে জর্জবিত করবার চেষ্টা করছে তার ইয়ত্তা নেই। সে ঘৃণ্য কাহিনী বলতে গেলে আর এক মহাভারত!

ক্রমেই এই জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছি। ভাল মন্দ জানি না—জপ তপ পূজার্চনার প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ কোনদিনই অনুভব করি নি। সুতরাং গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে পূজার্চনা নিয়ে জীবন কাটাতে মন আদৌ সায় দিচ্ছে না। কি করি! মাঝে মাঝে মনের কোণে সংসার ত্যাগের বাসনা উঁকিঝুঁকি দেয়। অনুভব করছি ঘরের বাইরের জগৎ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। মন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। পর মুহূর্তেই আবার ইতস্তত করি—ভাল হবে কি মন্দ হবে। এইভাবে দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। অবশেষে মনস্থির করে ফেললাম। দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে একদিন আশ্রমে উপস্থিত হলাম। অধ্যক্ষ মহারাজকে বললাম—আমি দীক্ষা নিতে চাই—সন্ন্যাসিনী হবো।

তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—সে কি? তাঁকে আরো বললাম—আমার বাড়িটা আমি সংকার্যে দান করতে চাই। যেখানে দুস্থ জনের সেবা ও চিকিৎসা হবে, আর ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থ ও তার সুদ থেকে ঐ কেন্দ্রের ব্যয়ভার বহন করা হবে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ তার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করবেন। এই মর্মে আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমি উইল করে যেতে চাই। সব শুনে তিনি যারপরনাই খুশি হয়ে আমাকে সাধুবাদ দিলেন এবং অচিরেই আমার ইচ্ছামত সব কাগজ-পত্র তৈরি ও দীক্ষার ব্যবস্থা করবেন, বলে আশ্বাস দিলেন।

বাড়ি ফিরে সবে ঘরে এসে বসেছি। স্বামীর ভিটা ছেড়ে চলে যাবো! মনে কেমন যেন একটা উদাসী উদাসী ভাব। সুদীর্ঘ কালের সুখ দুঃখ বেদনা বিজড়িত নানা স্মৃতি মনের আকাশে ছায়াপাত ঘটিয়ে তাকে আরো প্রকট করে তুলছে। হঠাৎ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিই। আমার এক প্রতিবেশিনী দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন—আমার ঘরে আপনার দু'জন অতিথি অপেক্ষা করছেন। আপনি ছিলেন না তাই আমি তাদের আমার ঘরে বসিয়েছি। ভদ্র-মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম—তাদের আসতে বলুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকল্মো ছোট দেবর—যাকে ইতিপূর্বে লাঠি-পেটা করেছি—সঙ্গে এক মহিলা। অনুমান করলুম দেবর-পত্নী। উভয়ে প্রণাম করে। মহিলাটি মাথা তুলে বলে—আমরা ক্ষমা চাইতে এসেছি দিদি। পূর্বেকার আচরণের জন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত—আমাদের ক্ষমা করুন।

আমি উঠে দাঁড়াই। জিজ্ঞাসা করি—ক্ষমা? কেন, কিসের জন্য? তাদের বসতে বলে আমি বেরিয়ে যাই। ফিরে এসে বৌ-এর হাতে দু'শ' টাকা দিয়ে বললাম—আমার আশীর্বাদ। তোমরা এসেছ সুখের কথা। কিন্তু খুবই দেরী করে এলে বোন। আগে এলে হয়তো এই পরিবারের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। আমি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দুস্থজনের চিকিৎসা ও সেবার জন্য আশ্রমে দান করছি। সংসার ছেড়ে শীঘ্রই আমি চলে যাচ্ছি। দেবর-পত্নী টাকা হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে বলবার অবকাশ না দিয়ে বলি—তোমরা এসো। আশীর্বাদ করি তোমাদের মঙ্গল হোক—সুখে থাক। কথা শেষে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাই।

সারাদিনেও মনের উন্মনা ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। নিজের নিকটও ঘটনাটা আশ্চর্য মনে হচ্ছে। অনেক চিন্তা ভাবনার পরই বিষয়-আশয় পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাবার সঙ্কল্প নিয়েছি। তারপরেও এই বিষন্নতার একমাত্র কারণ—সংসারের প্রতি আকর্ষণ—এই ভিটার মোহ ভিন্ন এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। ছোট-বেলায় শোনা ভবা বৈরাগীর গান মনে পড়ছে।—খঞ্জনী বাজিয়ে সে নেচে নেচে গাইতো।

ওরে মন, শোনরে দিয়া মন।
কেহ নয় তোর আপন।
এখন ভব-বন্ধন ছিন্ন করে,
চল নিজ নিকেতন।
বলরে হরি শ্রী মধুসূদন॥

অন্যদিন অপরাহ্নে মাঝে মাঝে নদী তীরে যাই। কখনও পদ-চারণ কখনও বা স্বামীর চিতার অদূরে বসে স্মৃতিচারণ করি। কিন্তু আজ আর বাড়ির বার হতে মন চাইল না। কেমন একটা জড়তা যেন আমাকে গ্রাস করেছে। ছাদে গিয়ে বসলাম। পৌষ-এর শেষ বেলা। কুয়াশার অস্বচ্ছ আবরণে আকাশের রং ধূসর। সূর্য দৃষ্টির অগোচর। সন্ধ্যা না হতেই সন্ধ্যার ঘোর নেমে এসেছে—এক কান্না-পাওয়া বিষাদ-সন্ধ্যা। মনকে কিছুতেই চাঙা করতে পারলাম না। নিচে নেমে এলাম। হাত মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে একখানা উপন্যাস—দেবী চৌধুরাণী—নিয়ে বসলাম। না, মন বসলো না। তিতবিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছি—ঘোরার যেন আর শেষ নেই। তারপর হঠাৎ কি হলো—বুঝতে পারলাম না। ভূতগ্রস্ত-এর মতো উপরে উঠে এলাম—যেখানে ধনরত্ন সঞ্চিত রেখে যকের মতো পাহারা দিয়েছি। আশ্চর্য কি ভাবে যে উঠে এলাম নিজেই বুঝতে পারলাম না—মনে হলো কেউ যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। ধনরত্নের সম্ভার দেখে নিজেই বিস্মিত হলাম। এত সম্পদ্‌! এতো আগে লক্ষ্য করিনি। সঞ্চয়ের নেশাতেই মশ্‌গুল ছিলাম—পরিমাণ দেখিনি—প্রয়োজনও বোধ করিনি। এর পরিণাম হয়ে দাঁড়ালো ভয়াবহ। নারীর একমাত্র গতি পতি, তাঁকে হারালাম। সেজন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। পরোক্ষে আমি এক পতিঘাতিনী পাপীয়সী নারী! এক

প্রায়শ্চিত্ত কী? অনেক অর্থ পুড়িয়েছি। এগুলো আর পুড়িয়ে নষ্ট করবো না। স্বামীর নামে এই বাড়িটা একটা দাতব্য চিকিৎসালয়—দুস্থজনের সেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে। আর এই অর্থ ঐ কার্যের ব্যয়ভার বহন করবে। স্বামীর এই বাড়িটাকে চিকিৎসালয় ও সেবায়াতন করবার ইচ্ছা মনে প্রচণ্ড শক্তি ও উৎসাহ যোগায়—মনের জড়তা দূর হয়ে যায়। বহুরাত্রি অবধি নিজের প্রয়োজনের অর্থ রেখে বাকী সব ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য গুনে গেঁথে রাখি। অলংকারগুলিও তদরূপ নিজের প্রয়োজনের জন্য কিছু রেখে বাকীটা স্যাকরার নিকট বিক্রি করবার জন্য রেখে দিই। শোবার ঘরে এসে আমার উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে একটা খসড়া তৈরি করে তৃপ্ত মন নিয়ে শুয়ে পড়ি।

পর দিন ঘুম ভাঙতেই নিজেকে খুবই হালকা মনে হয়। মাথা থেকে যেন একটা প্রচণ্ড বোঝার ভার ঝেড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করেছি। বাইরে কাকের কলরব শুনতে পাচ্ছি। রাতের অন্ধকার তখনও দূর হয় নি। শুয়ে শুয়েই সারাদিনের কর্মের একটা ফিরিস্তি করি। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই উঠে পড়ি। দিনের কাজ প্রথমেই শুরু করি স্যাকরা ডেকে। দরদস্তুরের পর গয়নাগাটি বিক্রি করে হাতে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা আসে। ঐ টাকা এবং ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য যে নগদ টাকা আলাদা করে রেখেছি তা নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিই। মোট আমানতী টাকার অঙ্ক দেখে হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরে আসি। বিকেলের দিকে মিশনে গিয়ে উপস্থিত হই। অধ্যক্ষ মহারাজ আমাকে দেখেই বললেন—আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাগজপত্র সব তৈরি করার জন্য আগামী কাল সকালের দিকেই উকিল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের লোক আপনার ওখানে যাবে। আগামী পরশু বুধবার বেলা ৯টা ৩৭ মিঃ শুভক্ষণে এখানে আপনার দীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবানন্দ মহারাজ আসবেন।

পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনেই যথা সময়ে মিশনের লোক উকিলবাবুকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। উকিলবাবুর কথায় বুঝলাম তিনি আমার স্বামীর বেশ পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পরের ঘটনা সম্পর্কেও দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। মিশন থেকে সব কিছু জেনে শুনে তিনি লিখে এনেছেন তথাপি আমার বক্তব্য তিনি মনযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, পর-সেবা পর-হিতে দান উৎসর্গ নিঃসন্দেহে অতি উত্তম ও মহৎ কাজ। বিশেষত এই দুর্ভাগা দেশে যেখানে সাধারণের চিকিৎসা

খুবই দুরূহ—প্রতি বিশ হাজারে একজনের চিকিৎসা লাভের সৌভাগ্য ঘটে কিনা সন্দেহ। আপনার স্বামী আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, বাকী জীবন আপনি কি ভাবে কাটাবেন।

—কেন, অধ্যক্ষ মহারাজ আপনাকে বলেন নি? আমি তো সন্ন্যাস-ব্রত নিচ্ছি। এদিকের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমি সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে আশ্রমবাসী হয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব বলেই মনস্থ করেছি।

—উত্তম প্রস্তাব—নিঃসন্দেহে সাধু সংকল্প। তথাপি আপনার স্বামীর নামে—অনাথ বন্ধু সেবায়তন চুক্তি পত্রে ব্যাঙ্ক একাউন্টে আপনি এবং মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ লেন দেন-এর অধিকারী থাকবেন—আপনার অথবা এখানের মিশনের প্রধান অধ্যক্ষের সই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেন না বলা তো যায় না। যদি কোন দিন দেশে ফিরে আসেন। আপনার বদান্যতার পরাকাষ্ঠা, স্বামীর নামে উৎসর্গিত এই কীর্তি দেখবার বাসনা জাগে। সাধুবাদ ও শুভকামনা জানিয়ে তিনি প্রস্থান করেন।

আশ্চর্য হয়ে যাই নিজের জীবনের এই অদ্ভুত পরিণতি দেখে। অনূঢ়া কালে বাপের বাড়ি, বিবাহোত্তর জীবনে স্বামীর ঘর ভিন্ন আর কোথাও বার হবার সুযোগ সুবিধা ঘটে নি। সুতরাং দেশে দেশে ও তীর্থে তীর্থে ঘুরে জীবন কাটাবার বাসনা কোন দিন কল্পনায় আসে নি। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন কাটাবার অন্য কোন বিকল্প পন্থাও মনে আসেনি। মিশনের প্রধান অধ্যক্ষকে মনের কথা খুলে বলাতে তিনি দেশ ভ্রমণ সম্পর্কে নানা উপদেশ দিয়েছেন। সুদূর হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত ভারতে কোথায় কি উপভোগ্য দৃশ্য, দেবস্থান ইত্যাদি রয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ম্যাপ সহ একখানা পুস্তিকাও দিয়েছেন। যাক্ ইচ্ছামতো সমুদয় কর্মই প্রায় সমাধা হয়ে এলো। এখন বাকী শুধু দলিলে সই সাবুদ আর গৈরিক বস্ত্র পরিধানান্তে সন্ন্যাসিনী হয়ে গৃহ সংসার পরিত্যাগ।

বিকেলের দিকে প্রয়োজনীয় গেরুয়া পরিচ্ছদ এবং ভ্রমণ সঙ্গী হিসাবে জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। যা পেলাম তা নিলাম আর যা না-পেলাম তার জন্য অর্ডার দিয়ে ক্রীত জিনিষগুলি মুটের মাথায় চাপিয়ে বাড়ি রওনা হই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে

আসছে। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি বাড়ির সামনে লোকজনের ভিড়। কি ব্যাপার! কাছে এসে দেখি পাড়ার মহিলারা যাদের মনে হলো আমার কিছু স্বস্তা হয়েছে। আমাকে দেখেই তারা রাস্তা ছেড়ে দেয়। —কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেই দরজা খুলে তাদের বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে মুটে নিয়ে আমি ভেতরে যাই। মুটে বিদায় করে বৈঠকখানায় মহিলাদের সামনে এসে দাঁড়াই। হেসে বলি—আপনাদের দেখে খুশি হলাম। এক বয়স্কা মহিলা যিনি বিধবাদের কি করণীয় ও পালনীয় সে সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি বললেন—শুনলাম আপনি সমুদয় ধন সম্পত্তি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিশনের হাতে তুলে দিচ্ছেন। খুবই আনন্দ সংবাদ। এর ফলে আমরা এ অঞ্চলের অধিবাসীরা খুবই উপকৃত হবো। সে জন্য আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

—হ্যাঁ, ইচ্ছা তো আছে। তবে মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। তারা খবরটা কি ভাবে পেলো তা আর জিজ্ঞাসা করলাম না।—আশাকরি আপনাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে আমার মনস্কামনা সফল ও পূর্ণ হবে। তারা চলে গেলো। তাদের চোখে মুখে একটা শ্রদ্ধাভাব দেখে খুশি হলাম।

পরদিন ভোর হতেই উঠে পড়লাম। আজ দীক্ষা নেবার দিন। গৃহধর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ—এক নতুন জীবনের আরম্ভ। কিন্তু কোন উদ্দীপনা অনুভব করছি না। ভোরের আলোতে নতুন আলোর পরশ পাচ্ছি না—পাখীর কূজনে নতুন সুর শুনছি না। যথা সময়ে গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি সহ মিশনে উপস্থিত হলাম। এক ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশে দীক্ষিত হলাম। নতুন নামকরণ হলো—পরিব্রাজিকা মহাপ্রাণা। দীক্ষান্তে শিবানন্দ মহারাজ মিশনে অধ্যক্ষকে ডেকে বললেন—একে একটা পরিচয় পত্র লিখে দিন। ভারতের যেখানে যেখানে আমাদের মিশন কিংবা সহকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে তিনি যাতে বিনা খরচে থাকা খাওয়া ও অন্যান্য সাহায্য লাভের সুযোগ সুবিধা পান। আমি পরিচয় পত্রে সই করে দেব। প্রণামের জন্য মাথা নত করতেই তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মিশন আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদিতে অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেলো। বাড়ি রওনা হলাম। দুয়ারে এসেই বাধা পেলাম। বাড়ির সামনে রাস্তায় ক্রিড়ারত ছেলেরা আমি দরজা খুলতে গেলেই হাঁ হাঁ করে

ছুটে এলো।—আপনি কে। আমি ফিরে দাঁড়িয়ে বড় ছেলেটিকে বললাম—হ্যারে শামু আমাকে চিনলি না। ছেলেটি হাঁ করে তাকিয়ে বলে—ওমা, মাসিমা আপনি বোষ্টমী হয়েছেন। চ, ছুটে গিয়ে বাড়িতে খবরটা দেই। আমি হেসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি।

ঘরে এসে চুপ করে বসে নিজেকে বিশ্লেষণ করি।—ছিলাম অনুরাধা হলাম পরিব্রজিকা মহাপ্রাণা। কিন্তু আশ্চর্য দীক্ষান্তে একমাত্র গেরুয়া বসনের আঁচ লাগা ভিন্ন মনের আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন বোধ হচ্ছে না। তবে হাঁ এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি—ঘরের খেলা সাঙ্গ হলে, এবার বাইরের পালা শুরু। কিন্তু—আয়রে ছুটে আয়, মনের মধ্যে বাইরের এমন কোন সাড়া জাগানো আহ্বান তো শুনতে পাচ্ছি না কিংবা আকর্ষণও অনুভব করছি না। উঠে পড়ি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাড়াময় রটে গেছে আমি বোষ্টমী হয়েছি। বেলা পড়ে এসেছে। খুবই পরিশ্রান্ত, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিই এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে চক্ষু মেলে দেখি—ঘরের আনাচে কানাচে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। কি আর করি। শয্যা ত্যাগ করে বেশবাস সংযত করে চোখে মুখে জল দিয়ে দরজা খুলে দিই। পাড়াপড়শীদের দেখে হেসে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে বসাই। তারা আমার বেশ ভূষা লক্ষ্য করে বললেন—দেখছি সত্যই আপনি বৈষ্ণবী হয়েছেন।

উত্তরে হেসে বলি—বৈষ্ণবীদের বেশভূষা কি আমারই মতো? লক্ষ্য করুন—আমার গলায় কি কণ্ঠী আছে? তাদের চোখেমুখে ভ্যাবাচাকা ভাব ফুটে ওঠে পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করে। হেসে বলি আপনারা আমার প্রতিবেশী, তাই বলছি আমি সন্ন্যাস নিয়েছি। আপনাদের শুভেচ্ছাই আমার কাম্য। তাদের আর কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ না দিয়ে আমি উঠে পড়ি। তারাও প্রকৃত ঘটনাটা জেনে আর কিছু না বলেই প্রস্থান করে।

ঘরে ফিরে আসি। পরিব্রাজিকারূপে ভ্রমণের জন্য যেসব জিনিসপত্র এনেছি তা নাড়াচাড়া করে গুছিয়ে রাখি। অতপর ভ্রমণপঞ্জী ও ভারতের মানচিত্রখানা মেলে ধরি। অবাক হয়ে দেখি রেলপথ সাপের মতো এঁকে-বেঁকে সারা দেশ ছড়িয়ে আছে। তারা কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে কোথায় পৌঁচেছে তাদের নাম ধাম ইত্যাদি মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ

ধরে দেখি। লেখা শেষে সেগুলি মনে মনে আউড়ে বুঝলাম বিষয়টা একদিনের চর্চায় কিছু হবার নয়। অনেকদিন অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে রপ্ত করতে হবে।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। পুস্তিকা ও মানচিত্রখানা সরিয়ে রেখে রাতের আহারাদি শেষ করি। তারপর মিশনের দেওয়া বইগুলির মধ্যে হিমালয় ভ্রমণ সম্পর্কিত বইখানা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ি। পড়তে পড়তে বইখানাতে এতই নিবিষ্ট হয়ে পড়ি যে মনে মনে আমিও বুঝি ঐসব অচিন অজানা দেশে বিচরণ করছি। সময়ের খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরে কাকের কর্কশ কণ্ঠ শুনে ভাবলাম—তবে কি রাত্রি শেষে ভোরের পূর্বাভাষ। বাতি নিবিয়ে বইখানা শিয়রে রেখে শুয়ে পড়ি। পড়েই যখন এত আনন্দ ভ্রমণে না জানি কত সুখ কত কত তৃপ্তি। ঐ আনন্দে মশগুল হয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন ভোরে উঠে ঘরকন্নার কাজ শেষ করে ঐ বইখানা নিয়েই আবার বসি। বেলা বাড়তেই দরজা বন্ধ করে বাজারে যাই। বাজার থেকে এসে দেখি মিশনের লোক অন্য এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে তাদের বসতে দিয়ে আমি ভেতরে গিয়ে জিনিসপত্র রেখে ফিরে আসি। মিশনের লোক সঙ্গের ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়ে আগমনের উদ্দেশ্য জানাতেই আমি বাড়ির পেছনের দিকের দরজাটা খুলে দিই। ওভারসিয়ার ভদ্রলোক ফিতে নিয়ে পেছনের ডোবাটা শুদ্ধ বাড়িটার চৌহদ্দি জরিপ করে চলে যান। আমি দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে বসি। এভাবেই দিনের পর দিন সংগৃহীত ভ্রমণ কাহিনী পাঠ সাঙ্গ করি এবং সেই সঙ্গে ভ্রমণপঞ্জী, দেশের রেলপথের মানচিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই। ফলে ভিটের টানের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়ার সাড়া ক্রমেই অধিকতর অনুভব করছি।

অবশেষে একদিন অনাথবন্ধু সেবায়তনের দলিলপত্র ইত্যাদি সইসাবুদ হলো। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা পয়সাও ঐ নামে পরিবর্তিত ও অর্থ লেনদেনের অধিকারীদের নাম যথারীতি উল্লিখিত ও স্বাক্ষরিত হলো।

স্বামীর যে ফটোখানা বড় করবার এবং একটা তৈলচিত্র আঁকবার ফরমাশ দিয়েছিলাম তা এনে ঘরের যথাস্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সেবায়তন নামের একটা পাষাণ-ফলক বাড়ির সামনের দেওয়ালে

ঝলালো এবং উক্ত নামের বিজ্ঞপ্তিও একটা বড় টিনের ফ্রেমে বড় বড় করে লিখিয়ে বাড়িতে ঢুকবার মুখে দরজার উপরে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। মিশন থেকে লোক এসে গৃহের আসবাব, বাসন-কোসন ইত্যাদির তালিকা তৈরি করলো। গৃহরক্ষী হিসাবে একজন লোকও নিযুক্ত হলো।

স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে যাবতীয় সব কিছুই সাঙ্গ হলো। এবার আমার যাবার পালা। দিনের শেষ—দেহ কর্মক্লান্ত অবসন্ন। বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি ঘরে-ফেরা পাখির উৎফুল্ল কণ্ঠধ্বনি। শুয়ে পড়ি, কান পাততেই যেন শুনতে পাচ্ছি যাবার বেলার অন্তরের বিষাদ সুর। মনে পড়ে এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে একমাত্র অর্থ ভিন্ন আর কিছু জানবার ইচ্ছা জাগেনি কিংবা অবকাশ ঘটেনি। ফলে জীবন-মধ্যাহ্ন হৃদয়-বিদারক এক বিয়োগান্ত নাটকে সমাপ্ত হলো। বিধিলিপি! না, এমন ছলনার আড়ালে সান্ত্বনা খুঁজে পাবার অবকাশ কতটুকু! আমি তো জানি এ আমার দুষ্কর্মের ফল। স্বখাত সলিলে ডুবে মরা ভিন্ন অন্য গতি কি? এইসব এলোমেলো চিন্তা জালে জড়িয়ে কখন বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে স্বামীর রোগ-জর্জরিত অসহ্য বেদনার্ত গোঙানি শুনে হঠাৎ এক ভয়াল চিৎকার দিয়ে জেগে উঠি। চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত—হয়তো কাঁদছিলাম। না—এখানে আর নয়। হাসিকান্না, সুখদুঃখ বেদনা বিজড়িত এই ঠাঁই ছেড়ে দেশে দেশে ঠাঁই খুঁজে শান্তির সন্ধানে বেড়িয়ে বেড়াবো। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। দরজা খুলে দেখি বাইরে কাক-জ্যোৎস্না। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ রূপালী আলোর রেখা আর গাছে গাছে পাখির কাকলিতে ভোরের আগমনী। ভোর হতে আর দেরি নেই। ঘরে না ঢুকে ইচ্ছা হলো এই স্বল্প আলো আঁধারে বাড়িটাকে শেষ বারের মতো একবার প্রদক্ষিণ করি। ঘুরতে ঘুরতে শোবার-ঘরের সামনে আসতেই বহুদিন আগেকার মধুময় স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। গাঁয়ের শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে প্রথম যেদিন এখানে স্বামীর ঘর করতে এলাম সে-রাত্রির স্বামী সহবাসের স্মৃতি বাসর ঘরে স্বামী সহবাসের প্রেমোজ্জ্বল সুখ-স্মৃতির চাইতে কোন অংশে ন্যূন নয়। তার পরের দিনগুলি ছায়াছবির মতো একে একে মানসপটে ভেসে ওঠে। অবশেষে সেই কালরাত্রি—শেষ আলিঙ্গন ও চুম্বন করে চিরবিদায় নিলাম। স্মৃতির ভারে বিগলিত ধারায় কপোল বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। রোয়াকের ওপর চক্ষু বুজে বসে পড়ি।

কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম মনে নেই। চক্ষু মেলে দেখি ভোরের আলো চতুর্দিক ছেয়ে ফেলেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে ফালি ফালি হলুদরাঙা রোদ উঠোনে এসে পড়েছে। গাছের দোলায় তারা হেসে হেসে এঁকে বেঁকে নবারুণের নতুন আলোয় নৃত্য করছে। বুঝি কোন নব বারতা বয়ে এনেছে—আমার আগামী দিনের চলার পথের দিশারী। চোখের জলে অতীতকে ধুয়ে মুছে ফেলে পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান জবাকুসুম সংকাশং মহাদ্যুতি দিবাকরকে প্রণাম নিবেদন করে উঠে পড়ি। অতঃপর প্রাতকৃত্যাদি সেরে সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কয়েকটা টুকিটাকি কাজ সেরে ঘরে এসে বসি। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি শোবার ঘর আর ব্যবহার করিনি। তাঁর এই লাইব্রেরি ঘরেই আমি বাসা বেঁধেছি। একটু বেলা হতেই বেরিয়ে পড়ি। সোজা মিশনে গিয়ে হাজির হই। অধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি—আমার ইচ্ছা ও কামনা আপনাদের প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন সব কিছু আপনাদের হাতে—সেবা প্রতিষ্ঠানটি যতশীঘ্র সম্ভব গড়ে তুলে আমার স্বপ্ন সার্থক ও সফল করুন, এই আমার প্রার্থনা। এখানে আমার থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমাকে যাবার অনুমতি দিন। এ সম্পর্কে আমার নিবেদন—কোনদিন আমি ঘরের বার হই নি। দূর থেকে স্টীমার দেখেছি মাত্র। কোনদিন চড়বার সুযোগ হয় নি। রেল দেখিনি সুতরাং চড়বার কোন প্রশ্ন আসে না। এমন এক আনাড়ী ভ্রমণ অনভিজ্ঞা নারী দেশে দেশে ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন করে বাকী জীবনটা কাটাতে মনস্থ করেছে। সুতরাং ভ্রমণ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে তীর্থে পাণ্ডা পুরোহিত সাধুসন্ত প্রভৃতির সঙ্গে আচার আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দিন।

মহারাজ খানিক চিন্তা করে বললেন এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ কাহিনী মানচিত্র, পুস্তিকা ইত্যাদিও আপনাকে দিয়েছি। তথাপি আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপনাকে অবশ্যই বলবো। আপনি সান্ধ্যপূজা আরতির সময় এখানে আসবেন। কথা শেষে তিনি নিত্যানন্দ নামে একজনকে ডাক দিয়ে বললেন—আমার শিয়রের দিকে যে লাঠিখানা আছে তা নিয়ে এসো। শুনে আমি হতবাক। লাঠি, কিন্তু কেন? লাঠি খানা নিয়ে আসতেই তিনি তা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তাঁর দেখাদেখি আমিও যন্ত্রবৎ উঠে দাঁড়াই। লাঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরে তিনি

বললেন—এ এক প্রথিতযশা পরিব্রাজকের ব্যবহৃত লাঠি। আপনি পরিব্রাজিকা, দণ্ডপাণি আপনাকে সাজে।... এ আত্মরক্ষা, পাহাড়ে পর্বতে হাঁটাচলা ইত্যাদি অনেক কাজে লাগবে। আমি নত-জানু হয়ে লাঠিখানা হাতে নিই। একে প্রথমে যেভাবে সশঙ্ক-চিত্তে দেখছিলাম হাতে নিতেই বুঝি তা কেটে যায়। লাঠির ছোঁয়ায় শরীরে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হলো কি না জানি না। তবে ভেতরে কেমন যেন উত্তেজনা ও শিহরণ অনুভূত হলো। মহারাজকে প্রণাম করে উঠে পড়ি। বাইরে এসে গায়ের উত্তরীয়খানাকে কাঁধ বদল করে ডান হাতে লাঠিখানা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলি। নিঃসন্দেহে শরীর ও মনে কোন জড়তা নেই—একটা মুক্তানন্দ ভাব। বাড়ির সামনে আসতেই ক্রীড়ারত ছেলেরা আমাকে দেখেই—চলরে চল পালাই। মাসীমা লাঠি হাতে তেড়ে আসছেন। আমি হেসে তাদের ডেকে বলি—হারে, ছুটছিস কেন? তোদের কোন দিন কি আমি গালমন্দ কিংবা মারধোর করেছি? তোরা খেলা কর। আগামীকাল বিকালে তোদের মিষ্টি খাওয়াবো। আমার কথা শুনে ছেলেরা থমকে দাঁড়ায়। অবাক দৃষ্টি মেলে আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাস করে—মাসীমা, সত্যি?

আমি হাসতে হাসতে বলি—হাঁরে, সত্যি, সত্যি, সত্যি—তিন সত্যি। তোরা মনের আনন্দে খেলাধুলো কর। কাল বিকেলে তোদের ডাকবো। তখন এসে মিঠাই মণ্ডা খাবি, বলে তালা খুলে ঘরে ঢুকি। ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছি, ছেলেরা মনের উল্লাসে—মাসীমার জয় হোক, জয় হোক বলে হৈ চৈ করছে। মনে মনে আনন্দ অনুভব করি সেই সঙ্গে কেন জানি মনে হলো এই সব ছেলেপুলে এবং পাড়াপড়শীদের সঙ্গে যদি মেলমেশা থাকতো, পরস্পরের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ বিনিময় হতো, মমতা গড়ে উঠতো তা হলে আমার জীবন-ধারা হয়তো অন্য দিকে মোড় নিতো আমার জীবন ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।, বনপ্রস্থে যাবার প্রয়োজন হতো না। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। টেবিলে রাখা পরিব্রাজকের ডাইরি খানা খুলে তাঁর ছবি মতো নিজেকে সজ্জিত করে লাঠি হাতে আয়নার সামনে দাঁড়াই। পোষাকের খুটিনাটি সেরে নিজেকে আয়নার মধ্যে দেখে তৃপ্ত ও উল্লসিত বোধ করি। মনের মধ্যে একটা উড়ু উড়ু ভাব এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা জাগে। বেলা শেষের সঙ্গে একেলা ঘরে আগে মনের মধ্যে যে বিষাদভাব অনুভব করতাম আজ যেন ত

অন্তর্হিত। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই পরিব্রাজিকা বেশেই মিশনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দূর থেকেই সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। সত্য নিষ্ঠায় হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত। প্রণাম করে অন্যান্য ভক্তজনের মধ্যে বসে পড়ি। অর্চনান্তে প্রসাদ বিতরণের পর মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠান। ভ্রমণ সম্পর্কে এবং তীর্থ ক্ষেত্রে চলাফেরা খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আমাকে নানা কথা বলেন ও উপদেশ দেন। তীর্থ ক্ষেত্রে, দেবস্থানে পাণ্ডা পুরোহিতরা যে একটা কলুষ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাতে কিন্তু দেবতার মর্যাদা ও মহিমা ক্ষুণ্ণ কিংবা ম্লান হয় না—দেবতা তাঁর আপন মহিমায় বিরাজিত। সংসার ধর্ম, ধন সম্পত্তির মায়ামোহ পরিত্যাগ করে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও মনের জোর নিয়ে যাযাবরের মতো ভ্রমণ করেই যখন বাকী জীবনটা কাটাতে মনস্থ করেছেন তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার এই শুভ সংকল্প কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। কিছুদিন ভ্রমণের পর যে অভিজ্ঞতা আপনি সঞ্চয় করবেন তাই আপনার পরিব্রাজিকা জীবনের পাথেয় হয়ে আপনাকে পরিচালিত করবে। টাকা পয়সা আপনি কি নিচ্ছেন জানিনা বা জানতে চাই না। তবে তীর্থক্ষেত্রে ঠগ, জোচ্চোর, গাঁট-কাটা ইত্যাদিরা নানা বেশে, নানা ভাবে, নানা ছলে যাত্রীদের দোহন করে সর্বস্বান্ত করে। সুতরাং সে সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তীর্থে আমাদের মিশন ছাড়াও নানা সঙ্ঘ, আশ্রম, দানসত্র ইত্যাদি আছে। থাকবার জন্য আপনি নিজেই তা যাচাই করে নেবেন। প্রবাসে পথে কোন বিপদ আপদ কিংবা অর্থাভাব হলে জানাবেন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনার সম্পর্কে আমি কলকাতা গয়া, কাশী, দিল্লী ও বৃন্দাবনের মিশনকে জানিয়ে দিয়েছি। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে আপনাকে নেবার জন্য মিশন থেকে লোক আসবে। আপনার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মিশন তার তত্ত্বাবধানের ভার নেবে। যাবার দিন মিশন থেকে লোক গিয়ে টিকিট সহ আপনাকে স্টীমারে তুলে দেবে। পরিশেষে তিনি পরিচয় পত্রখানা—দেখতে কতকটা পাশ বই-এর মতো—আমার হাতে দিয়ে 'শুভমস্তু' বলে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। আমি প্রণাম করে মিশন থেকে বেরিয়ে পড়ি।

ঘরে ফিরে চুপ করে বসে মহারাজ-এর উক্তি, নির্দেশ আদেশ, উপদেশ ইত্যাদি মনে মনে আউড়ে স্মৃতির পটে এঁকে রাখি যাতে লেশমাত্র

বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন না হয়ে যায়। কেননা তারাই হবে আমার আগামী দিনের ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনের দিশারী। বাইরের অন্ধকার ভেদ করে কাছারী ঘরের রাত্রি দশটার ঘন্টা ধ্বনি ভেসে আসে। শুনেই উঠে পড়ি। রাতের আহারাদি শেষ করতে রাত্রি আরও গভীর হয়। শরীরও ক্লান্ত শ্রান্ত। শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না। সুদীর্ঘ তিন দশকোধ্ব বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবনের লীলাখেলা আগামী দুদিনের মধ্যেই সাঙ্গ হবে। শুরু হবে সন্ন্যাসিনী বেশে পরিব্রাজিকা রূপে ভ্রাম্যমান এক নতুন জীবন। তাতেই হবে আমার বাকী জীবনের পরিসমাপ্তি—জীবন রঙ্গমঞ্চে শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন। এইরূপ নানা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন ঘুম ভাঙতে চেয়ে দেখি ঘরে তখনো অন্ধকার। বাইরে কাকের কা-কা ও অন্যান্য পাখীর কিচিরমিচির শুনে বুঝলাম রাত পোহাতে আর দেরী নেই। শুয়ে শুয়ে অতীত স্মৃতির জাবর কেটে চলেছি। ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত—তাই রঙীন কোন স্বপ্নের জাল বুনতে পারছি না—তিমিরাচ্ছন্ন কিনা জানিনা। আমার গৃহবাসের মেয়াদ আর মাত্র এক রাত্রি। তারপরেই শুরু হবে সেবা-প্রতিষ্ঠান পত্তনের কাজ। যে বীজ রোপন করা হলো আশা করছি তা অদূর ভবিষ্যতে ফলে ফুলে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে। প্রতিষ্ঠানের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে অমরত্ব লাভ করবে। লক্ষ অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় হৃদয়ে যদি সত্য না থাকে। এই মহান প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে আমার হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা এবং তা রূপায়ণে মিশনের ঐকান্তিকতা ও সত্যনিষ্ঠা কখনও ব্যর্থ হবার নয়।

মিশন থেকে বিদায় নেবার সময় মহারাজ অবশ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছি—কেননা গৃহে আমার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানের কাজ দ্রুত সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এইসঙ্গে তিনি সেবায়তনের মহিলা বিভাগ আমার নামে নামকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি হাঁ, না, কিছুই বলিনি। শুধু জানিয়েছি আপনারা এই প্রতিষ্ঠানের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। আপনাদের যা ইচ্ছা করবেন। তবে যদি কোনদিন সুস্থ কিংবা অসুস্থ হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমার জন্য একটু ঠাঁই রাখবেন।

ঘরের মধ্যে জানালা দিয়ে প্রভাত অরুণের এক ফালি সোনার কিরণ

মশারি ভেদ করে দেয়ালে পড়ে ঘর আলোময় করে ফেলেছে। উঠে পড়ি। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ পরেই মিশনের লোক একজন ডাক্তার নিয়ে উপস্থিত। তিনি গৃহের আশু কোন যোগ কিংবা পরিবর্তন সাধন না করে কোথায় কোন বিভাগ স্থাপন করা যায় তা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখেন। তিনি চলে যেতেই রান্নাবান্নার যোগার করতে গিয়ে মনে পড়লো যে আজ বিকেলে ছেলেদের মিঠাই খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ি। বাজারে গিয়ে ময়রাকে মিষ্টির অর্ডার দিয়ে ফিরে আসি।

বিকালে বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। ছেলেরা খেলছে বটে কিন্তু তাদের দৃষ্টি রয়েছে আমার বাড়ির দিকে। আমি ঘর ছেড়ে বার হই। ফাল্গুনের শেষ। শীত যাই যাই করেও যাচ্ছে না। ঊর্ধ্ব গগনে খণ্ড খণ্ড উড়ন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত বেলার তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মি আকাশের গায়ে যেন ফুলঝুড়ি হয়ে ঝড়ে পড়ছে। বিস্ময়-ভরা চোখে চেয়ে আছি। হঠাৎ ছেলেদের চিৎকারে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দেখি ঝুড়ি হাতে মিঠাইওয়ালার লোক বাড়ির দিকে আসছে। ছেলেরা খেলা ভঙ্গ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমি এগিয়ে গিয়ে তাদের ডেকে বলি—তোমরা সকলে পেছনের পুকুর থেকে হাত ধুয়ে এসে লাইন করে দাঁড়াও। কথা মতো ছেলেরা দাঁড়িয়ে পড়তেই আমি প্রত্যেকের হাতে ঝুড়ি থেকে একটা করে মিঠাইয়ের ঠোঙা তুলে দি। মিঠাই মণ্ডা খেয়ে ছেলেরা মহা খুশি হয়ে অতর্কিতে আমাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে ধেই ধেই করে নেচে নেচে—সন্ন্যাসিনী মাসীমার জয় বলে চেঁচাতে থাকে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। আশপাশের বাড়ি থেকে বেটাছেলে মেয়েছেলে সব বেরিয়ে ছেলেদের এই কাণ্ড দেখে হতবাক। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিও কম অবাক হই নি। তথাপি রাগের বদলে হেসে তাদের চুপ করতে বলি। সঙ্গে সঙ্গে তারা থমকে সরে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। ছেলেরাও বাড়ি মুখো। এমনি সময় তাদের ডেকে বলি—তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হচ্ছেনা। আমি কাল সকালেই এখানে থেকে চলে যাচ্ছি। আশীর্বাদ করি তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, দেশের ও দশের মুখোজ্জল কর। আমার কথা শুনে তারা আবার ফিরে আসে। স্বল্পান্ধকারে দেখতে পাচ্ছি তাদের চোখে মুখে অবাক হওয়ার চিহ্ন পরিস্ফুট। তাদের মধ্যে যেটি বড় সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—সে কী মাসীমা? চলে যাচ্ছেন মানে—

আপনি কি আর ফিরবেন না? আপনার বাড়ি ঘরের কি হবে? তাকে কাছে টেনে আদর করে বলি—হ্যাঁ বাবা, আমি আর ফিরছি না। বাড়ি ঘর সব হাসপাতালের জন্য দান করে যাচ্ছি। এখানে একটা বড় হাসপাতাল হবে—গরীব, দুঃখী, দুস্থ ও আর্তজনের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হবে। ছেলেরা সবাই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। তাদের প্রত্যেককেই আদর করে বিদায় দিই। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রত্যেকেরই চক্ষু ছল ছল করছে। ঠিক এই মুহূর্তে আমারও ছেলেদের জন্য কেমন একটা কোমল অনুভূতি ও মমত্ববোধ জাগে। আশ্চর্য মানুষের মন—এতদিন যাবৎ এইসব ছেলেদের দেখে আসছি কোনদিন তো এমনটি ঘটে নি। মনে হলো যেন আত্মজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। ঘরে এসে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকি। নিজেকে বিশ্লেষণ করেও মনের হদিশ মেলে না। হঠাৎ মনে পড়লো পাড়াপড়শীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে বিদায় নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তাদের প্রত্যেকের শুভেচ্ছা কামনা করে বিদায় নিই। বাড়ি ফিরে প্রত্যেকের সঙ্গে অভাবিত এক নৈকট্য অনুভব করি। যাবার বেলা পেছু-টান!

খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সারা দিনটাই ছুটোছুটি ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। স্নান করে কিছুটা আরাম বোধ করি। রাতের আহার শেষ করছি এমনি সময় কাছারির ঘন্টাধ্বনি কানে আসে—রাত্রি বারোটা। সঙ্গের সাথী যেসব জিনিসপত্র যাবে সেগুলি সবই গুছিয়ে রেখেছি। তবু আর একবার দেখে নিই কিছু ফেলে গেলাম কিনা। রাত পোহালেই তাড়াহুড়া লেগে যাবে। মিশন থেকে লোক আসবে আমাকে ষ্টীমারে তুলে দিতে। বেলা ১০টা নাগাদ ষ্টীমার ঘাটে ভিড়বে। না, আর দেরি করা ঠিক নয়। শোবার আগে নিজেকে আর একবার পরিব্রাজিকার বেশে সজ্জিত করে লাঠি হাতে আরশীর সামনে দাঁড়াই। নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে খুশি হয়ে পোশাক বদলে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম আসছে না। আজই আমার গৃহবাসের শেষ রজনী। অতীতের দিনগুলি ছায়াছবির মতো আমার বোজা চোখের সামনে একের পর এক মিছিল করে চলেছে। মনকে চোখ রাঙিয়ে বলি ঘরকে বাহির আর বাহিরকেই যখন ঘর করেছিস তখন আর ঘরের কাহিনী কেন! চোখের সম্মুখে চলার পথে তীর্থক্ষেত্র, দেবধাম, পাহাড় পর্বত, নদনদী, গিরিগুহা ইত্যাদির

চিত্তাকর্ষক ছবিগুলি মেলে ধরে অতীত ভুলে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ ধুপধাপ শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখি রৌদ্রকিরণ জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। আশ্চর্য এত বেলা হয়েছে! ধড়মড় করে উঠে পড়ি। বাইরে কেউ যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। নিজেকে সংবৃত করে দরজা খুলে দেখি পাড়ার ছেলেরা। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করে মাসীমা, আপনি কখন যাবেন? আমরা সেসময় আপনাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবো। ছেলেদের কথা শুনে আমি হতবাক। আমার জন্য তাদের হৃদয়ের বিচ্ছেদ বেদনা বোধ আমাকে বিচলিত করে। হাবভাবে তা প্রকাশ না করে আমি স্টীমারে যাত্রার সময়টা তাদের বলে দিই। আচ্ছা মাসীমা, বলেই তারা দ্রুত প্রস্থান করে। পাড়ার ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে আমার জন্য সকলের এত দরদ। এ যদি আগে জানতাম কিংবা বুঝতাম। না, আর পেছন-পানে নয়। সামনে এগিয়ে চলো। স্নানাহারের পাট চুকিয়ে পূর্ণ পরিব্রাজিকা বেশে ঝোলা কাঁধে বাঁ হাতে ব্যাগ ও ডান হাতে লাঠি নিয়ে ভয়ভাবনাহীন নিঃশঙ্ক চিত্তে যাত্রার জন্য তৈরী হই।

গৃহরক্ষী এসে খবর দেয়—মিশন থেকে লোক এসেছে। শুনেই বুকটা ধকধক করে ওঠে। অজানা অচিন দেশে যাত্রারম্ভের সময় হলো। মনকে চক্ষু রাঙিয়ে বললাম—সা-ধান আর অশ্রুপাত নয়। অতীতকে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে সম্মুখে চক্ষু রেখে এগিয়ে চলো। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হতে হবে। ঘাবড়ে যেওনা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে স্বামীর তৈল-চিত্রের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। আর পেছন ফিরে তাকাই না। দূর থেকে স্টীমার ঘাটের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে আমি অভিভূত। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কিছু মহিলা এবং দর্শকরা লাইন করে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে। আমি ঘাটের দিকে এগোতেই ছেলেরা আমাকে ঘিরে-মাসীমার জয়, ধ্বনি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করে। একটি ছেলে এগিয়ে এসে প্রণাম করে গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দেয়। আমি তাকে কাছে টেনে আদর করি। অতঃপর প্রত্যেক ছেলেকে কাছে টেনে আদর করে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করি। মহিলাদের দিকে হাত তুলে নমস্কার জানাই। তারাও হাত তুলে প্রত্যভিবাদন জানায়। এক অভাবনীয় বিদায় সম্ভাষণ। আর সময় নেই। ভোঁ ভোঁ শব্দে স্টীমার ঘাটের দিকে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিকলের ঝনঝন শব্দে

নদীতে নোঙর পড়ে। বিচিত্র হাঁকডাকের মধ্যে জেটিতে স্টীমার ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি লাগে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে স্টীমারে উঠে আসি। মিশনের লোক আমাকে উপরের ডেকে নিয়ে এসে একটা জায়গায় বসিয়ে আমার হাতে ছোট একটা থলে দিয়ে বলেন এর মধ্যে কলকাতা অবধি টিকিট ইত্যাদি আছে। সাবধানে রাখবেন ও চলবেন— গাঁটকাটা পকেটমার পথেঘাটে কাছেপিঠে ঘুরে বেড়ায়। তিনি নেমে যেতেই আমি রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়াই। দেখি ছেলেরা তখনো নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে স্টীমারের দিকে চেয়ে আছে। আমি হাত নেড়ে বিদায় জানাতেই তারাও হাত নাড়তে থাকে। ততক্ষণে ভোঁ শব্দে স্টীমার ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু ছেলেরা হাত নেড়েই চলেছে। আমার মনে হলো ছেলেরা যেন হাতছানি দিয়ে কাতর কণ্ঠে কেবল ডেকে চলেছে—মাসী ফিরে এসো, ফিরে এসো। নিজের অজ্ঞাতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কপোল সিক্ত করে। স্টীমার ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর দেখলাম আকাশ যেন নেমে এসে নদীর জল ছুঁয়ে কূলকিনারা বিলীন করে দিল। ছেলেরাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেলিং-এর ধার থেকে জায়গায় এসে বসলাম। মহারাজ প্রদত্ত থলেটা খুলে দেখি—একখানা টিকিট, একগুচ্ছ দশ টাকার নোট, সঙ্গে পুষ্প বিল্বপত্র ও একখানা চিরকুট। তাতে লেখা দেবতার আশীর্বাদ পাঠালাম, সগর্বে নির্ভয়ে পরিব্রাজন করবেন। জীবন সার্থক সুন্দর হোক। অর্থের প্রয়োজন হলে জানাবেন, শুভমস্তু। পুষ্প বিল্বপত্র মাথায় ছুঁইয়ে পরমানন্দে অর্থ ও টিকিট শরীরের যথাস্থানে রেখে দিই। হঠাৎ স্টীমারের ভোঁ শব্দে বাইরের দিকে তাকাই। চলমান জলযান তরঙ্গ কেটে মাঝ দরিয়া দিয়ে ছুটে চলেছে। নদীর উভয় দিকের দৃশ্যমান তটরেখাও যেন সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। সে এক উপভোগ্য মনোহর দৃশ্য যা জীবনে আগে কখনো দেখিনি। মনের মধ্যে আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়লো—চোখ ফেরাতে পারছি না। স্টীমার মাঝে মাঝে থেমে যাত্রী নিয়ে আবার ছুটছে। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেছে। খাবার জন্য কিছু ফলমূল নিয়ে বসেছি এমনি সময় স্টীমারে জোর ঘণ্টি বাজাতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হাঁক শোনা যায়—যাত্রীরা হুঁশিয়ার জিনিসপত্র সামলে রাখুন, ঝড় আসছে। যাত্রীদের মধ্যে চেঁচামেচি হৈচৈ—সবাই আপন আপন মাল পাঁটরি পোঁটলা সামলাতে ব্যস্ত। অবশেষে [illegible]

ধারটিতে কেটে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে চেয়ে দেখি আশপাশে কোথাও মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই—উজ্জ্বল সূর্যকিরণে নদীতরঙ্গ নেচে নেচে চলেছে। স্টীমার কোন দিকে চলেছে জানিনা। হঠাৎ নজরে পড়ে —...র যেদিকে চলেছে তার বাঁয়ে দূরদিগন্তে কালো কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ফাল্গুনের শেষ—অনুমান করলাম কালবৈশাখী-ঝড় আসছে। দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘনঘটা, সূর্য ডুবে গেল। আর শোঁ শোঁ শোঁও শব্দে প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে গুম গুম গুড়ুম বজ্র বিদ্যুৎ আছড়ে পড়লো। নদীর জল উথাল-পাথাল। বড় বড় ঢেউগুলি নিচের ডেকের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। উপরের ডেকে মালপত্তর ও অসাবধানী যাত্রীরা গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঝড়ের বেগে স্টীমার থর থর করে কাঁপছে, হেলছে দুলছে—এই বুঝি উল্টে দেয়। নদীর এক ভীষণ ভয়াল রূপ। ঝড়ের দাপটের তুলনায় বৃষ্টি কম। এভাবেই এক নাগাড়ে যুদ্ধ করে করে ঝড়তুফানের এলাকা ছাড়িয়ে স্টীমার এগিয়ে চলে। এদিকের আকাশ মেঘে ঢাকা হলেও হাওয়ার জোর নেই। আরো চলার পর স্টীমারের বাঁশি বেজে ওঠে। বুঝলাম পাড়ে ভিড়বার সময় হয়েছে। যাত্রীরা বাঁধাছাদা শুরু করেছে। আমিও তৈরি হই।

চিরঞ্জীব এতক্ষণ একনাগাড়ে মনোযোগ দিয়ে যে কাহিনী পড়ছিল এখানে এসেই তা বাধা পেল। কেননা খাতার অনেকগুলি পাতা জলে ভিজে একেবারে সেঁটে গেছে—পাঠোদ্ধার অসম্ভব। পড়ার নেশায় এতক্ষণ সে বুঁদ হয়েছিল কোনদিকে দৃকপাত করেনি। হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে উঠে পড়ে—বেলা অনেক। এখনও যে অনেক কাজ বাকি।

খাতাখানা বেঁধে যথাস্থানে রেখে সে বেরিয়ে আসে। রঘুর বুড়ো শিবতলা থেকে ফিরতে আজ দেরী হবে। এখন প্রথম এবং প্রধান কাজ গাঁইতি শাবল যোগাড় করা। কিন্তু কিভাবে? ভেংচাকে পাঠিয়ে কিনতে গেলে তার মনে সন্দেহ হতে পারে—আশ্রমে তো গাঁইতি শাবল রয়েছে, বৈরাগী দাদার তা আবার কিনবার কি প্রয়োজন? সে নিজে কিনতে গেলে দোকানীর মনে সন্দেহ হবে—বৈরাগী ভিক্ষুকের গাঁইতি শাবলের কি দরকার? বিশেষত এ অঞ্চলে এখন অনেকেই তাকে জানে চেনে। নিতাইকে দিয়ে কেনাতে গেলেও সে একই প্রশ্ন একই জিজ্ঞাসা

অবকাশ রয়েছে। সুতরাং অধিক চিন্তায় কালহরণ না করে ছদ্মবেশেই সে তা কেনার মনস্থ করে। ঘরে ঢুকে ঝোলা থেকে ছদ্মবেশের পুঁটলিটা খুলে একটা লুঙ্গি, ফতুয়া ও একটা মুসলমানী টুপি বার করে বড় ব্যাগটার মধ্যে পুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। রঘু ফেরার আগেই কাজ ফতে করতে হবে। দিঘির উত্তর পশ্চিম কোণে যেখানে লোক চলাচল কম সেখানে জঙ্গলে ঢুকে বেশ পরিবর্তন করে বুড়ো বটের পেছনের মাঠে নেমে কোণাকুণি বাজারের রাস্তা ধরে। দোকান থেকে গাঁইতি শাবল কিনে চটে বেঁধে ব্যাগে ভরে যে গোপন জায়গায় যন্ত্রপাতি রেখেছে সেখানে তা রেখে পোষাক পরিবর্তন করে আশ্রমে ফিরে আসে। রঘুও ইতিমধ্যে বুড়ো শিবতলা থেকে ফিরেছে। তাকে দেখেই চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করে গয়নাগাঁটিগুলি ওজন করে স্যাকরা কি লিখেছে? কাগজপত্রগুলি দেখাও দেখি। দু'জন স্যাকরার হিসাব প্রায় সমান। সে রঘুকে আজই গয়না বেচে টাকা এনে কাজ শুরু করে দিতে বলে। মনে রেখো দাদা—শুভস্য শীঘ্রম, বিলম্বে বহু বিঘ্নানি—কাজ যত তাড়াতাড়ি করবে ততই মঙ্গল, কেননা দেরি করলে অনেক বাধাবিঘ্ন ঘটে।

—ঠিক আছে ভাই, তাই হোক। আজই ঘরের কাঠ খড় কেনবার ব্যবস্থা করি। ঘরটা কিভাবে তৈরি হবে এবং কোথায় কি রাখা হবে তা তুমিই ভালো বোঝ। একটা আলমারিরও অর্ডার দিয়ে আসবো।

—আমার ভরসা কি? তারপর চিরঞ্জীব হেসে হেসে গানের সুরে বলে—আমি এক ভবঘুরে বাউল দেওয়ানা, কখন কোথায় থাকি তার নাইকো ঠিকানা।

রঘুর মুখে কোন কথা যোগায় না। গম্ভীর কণ্ঠে শোনায়—মুসাফিরকো ধরে রাখবার মতো মহব্বতের জোর তার নেই। তবে এতগুলি টাকা কিভাবে খরচ হবে তার তো খবরদারি দরকার। সে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।

চিরঞ্জীব হাসতে হাসতে বলে—রঘুদা তুমি অনেক পোড়-খাওয়া মানুষ। যে এতটা করতে পারে সে না-করতে পারে এমন কিছু নেই। আভি বাত ছোড়ো, জলদি খানে চলো,—ম্যায় বহুত ভুখা হুঁ। চিরঞ্জীব-এর কথার ধরনে রঘু না হেসে পারে না। উভয়েই খেতে বসে। খাওয়া শেষে চিরঞ্জীব ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখে সূর্য মাঝগগন ছাড়িয়ে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর বইখানা পড়ে। তা বুঝি আর হলো না। তাঁর শেষ জানা হয়তো আর হবে না। এখনও যে অনেক কাজ বাকি। রেল

লাইনটা ঘুরে দেখতে হবে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বেছে নিতে হবে যাতে একযোগে রেললাইন ধ্বংস, রেল চলাচল বন্ধ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কয়েকদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। সে এ ব্যাপারে আনাড়ী, তবু অভিজ্ঞতা অর্জনে বাধা কোথায়? ঝোলা থেকে ছদ্মবেশের পুঁটলি নিয়ে ব্যাগে ভরে বেরিয়ে যায়। দিনের বেলা, সাবধানে দিঘির জঙ্গলের আগের জায়গায় ঢুকে মুসলমান বেশে মাঠে নামে। রেললাইন কত দূরে জানা নেই। তবুও নিশানা ঠিক করে ডাইনে বাঁয়ে গ্রাম এড়িয়ে মাঠ দিয়েই এগতে থাকে। চলতে চলতে তার দৃষ্টি স্টেশনের দূরবর্তী সিগন্যাল স্তম্ভটির উপর পড়তেই চিরঞ্জীব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি হেঁটে রেললাইনে এসে পৌঁছে। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে রেলপথে চলতে চলতে আচম্বিতে উবু হয়ে লাইনের ধার থেকে পাথর নুড়ি সরিয়ে রেল কিভাবে নিচের কাঠের মোটা তক্তার সঙ্গে আঁটা তা দেখে। আরো এগোতেই একটা জল নিকাশী পুলের কাছে আসতেই তার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তক্তার সঙ্গে আঁটা রেলের হুক টেনে তুলে পুলের উভয় দিকের রেলের জোরা মুখের প্লেট সরিয়ে দিয়ে নিচের ইট সরিয়ে দিলে কেমন হয়? গাড়ি দ্রুত বেগে পুলের কাছে আসা মাত্রই নিশ্চয়ই লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পুলের নিচে পড়ে যাবে। ফলে একই সঙ্গে রেললাইন উৎপাটন গাড়ি ধ্বংস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্যয়সাধন সম্ভব। অতঃপর রেললাইনের দুদিকের টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার কেটে কিভাবে থামগুলি উপড়ে ফেলবে তাও স্থির করে। বিষয়টার পূর্ণ চিত্র মনের পটে এঁকে খুশী মনে চিরঞ্জীব রেললাইন ত্যাগ করে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা দিনের আলো গ্রাস করে নেমে আসছে। নিশানা ঠিক করে চিরঞ্জীব ত্বরিৎপদে দিঘির দিকে হাঁটা শুরু করে। এই পথেই আজ রাতে পুনরায় এবং আগামীকাল বিপ্লব শুরুর রাতে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ধ্বংসের জন্য নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করতে হবে। চিরঞ্জীব দিঘির ধারে পৌঁছে। চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন নিঝুম নিস্তব্ধ। ঊর্ধ্বে আকাশ জুড়ে হাজার হাজার তারা হাজির হয়ে মেলা বসিয়েছে। নিচে দিঘির ঝোপে ঝাড়ে নানা রঙে নৃত্যরত অসংখ্য জোনাকির ঝিকিমিকি আর ঝিল্লির কর্কশ কণ্ঠগীত ভিন্ন আর কিছু শ্রুতিগোচর নয়। চিরঞ্জীব পোষাক পরিবর্তন করে অন্ধকারে বিশালাক্ষী [illegible] দিকে [illegible]

থাকে। তার অন্তর উৎসাহ উদ্দীপনায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আগামী দিনের রক্তাক্ত বিপ্লবের ধ্যান ধারণাই বুঝি তার এরূপ অনলস অফুরন্ত কর্মোদ্যমের উৎস। গাছতলায় পৌঁছে সে দেখে সারাটা অঞ্চলে ধোঁয়াশার আবরণ। তারই মধ্যে চলেছে রান্নাবান্না, নাচগান, বাজনা ইত্যাদি জৈবিক ক্ষুৎ পিপাসা মেটাবার নানা উপচার উপকরণের উৎকট প্রকাশ। এরই মধ্যে চিরঞ্জীব দেখতে পাচ্ছে নিতাই তার জায়গায় বসে মালা জপছে আর চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, হয়ত তাকেই তল্লাশ করছে। কাছে এসে সে 'রাধামাধব' বলতে বলতে এগিয়ে যায়। নিতাই তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে এবং দূরত্ব বজায় রেখে চিরঞ্জীবের অনুসরণ করে। গাছতলা ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে কিছুদূর চলেই মাঠে নেমে সে চলার গতি বাড়িয়ে দেয় এবং নিতাইকে দিক নির্ণয় করে চলার পথের নিশানা ঠিক রাখতে বলে যাতে প্রয়োজন হলে তার একা যাতায়াতের অসুবিধা না হয়। নিতাই চলার পথের সব লক্ষ্য রেখেই হুঁশিয়ার হয়ে চলেছে। সুতরাং চিরঞ্জীবের কথার উত্তরে ছোট্ট একটু—হুঁ, বলেই সে চুপ হয়ে যায়।

হাতিচরা দিঘির ধারে পৌঁছে উভয়েই পোষাক পরিবর্তন করে। তারপর মাঠে নেমে গ্রামের পথ পরিহার করে এঁকে বেঁকে মাঠের মধ্য দিয়েই রেল লাইনের দিকে এগোয়। গ্রামের পথে এত রাতে অপরিচিত মানুষের আনাগোণা গ্রামবাসীর মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। রেল লাইনে পৌঁছে চিরঞ্জীব নিজের মতলব প্রকাশ না করে নিতাইয়ের কর্ম পদ্ধতির ওপর নজর রাখে। পর্যবেক্ষণ শেষে রেললাইন ছেড়ে চলতে চলতে উভয়ের মত বিনিময়ের পর একটা পরিণত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাত্রি দশটায় নগরে বিপ্লব শুরু হবে। এখানেও ঐ সময়েই রেলের নাশকতা কর্ম আরম্ভ ও শেষ করার ইচ্ছা। তবে রেল গাড়ির আসা যাওয়ার সময় জানবার পর তার কিছুটা হেরফের ঘটতে পারে। চলার পথে মাঠের মাঝে একটা ঝোপের আড়ালে পোষাক পরিবর্তনের পর তারা দিঘির দিকে না চলে ভিন্ন পথে বাজারে এসে পৌঁছে। বাজার তখনও ঝিমিয়ে পড়েনি, কেনা বেচা চলছে, তবে আগের মতো নয়। চিরঞ্জীব নিতাইকে নিয়ে একটা খাবার দোকানে ঢুকে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর নিতাইকে বিশালাক্ষী গাছের নিচে রেখে আগামীকাল কখন কোথায় দেখা হবে তা বলে আপন ডেরায় ফিরে আসে।

[illegible]

কুয়ারে বসে দুলছে। তাকে একটানে তুলে কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে নাচতে গাইতে থাকে—আমি এক ভবঘুরে বাউল দেওয়ানা, দিবানিশি ঘুরি ফিরি নাচি গাই, সময়ের হিসাব রাখি না।' তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে কবিতা করে বলে—চলো ভাই শুয়ে পড়ি, রাত ভোরের আর নেইকো দেরি। লেংচা ঘরে যেতেই চিরঞ্জীব ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখে। তারা ঝলমল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীব নিজের মধ্যে এক প্রচণ্ড কর্ম-প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার অনুভব করছে। মনে হলো সে যেন তাতে ভেসে চলেছে। তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ—তা সফল হতে চলেছে। সহসা তার মনের আকাশে বিজয় দর্পে যুদ্ধে আগুয়ান বিপ্লবীদের হস্তধৃত উড্ডীয়মান তেরঙা স্বাধীনতার জয়-পতাকা ভেসে ওঠে। সেইসঙ্গে বিপ্লবীদের রণ-হুঙ্কার, জয়ঢাক আর তোপের নিনাদের সঙ্গে উচ্চ-কণ্ঠে দেশ-মাতৃকার বন্দনাগীতি বন্দেমাতরম্ সহ শঙ্খধ্বনি যেন কানে বাজে। চিরঞ্জীব রোমাঞ্চিত, বিনম্র চিত্তে করজোড়ে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই সে উঠে পড়ে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বাইরে বসে চিকিৎসাকেন্দ্রের ঘরের একটা নক্সা আঁকে। তারপর প্রয়োজনীয় আসবাব ঔষধ ইত্যাদির তালিকা তৈরি করে রঘুনন্দনকে ডাক দেয়। রঘু তখন বাগানে। হাঁক শুনে কাছে আসতেই চিরঞ্জীব তাকে কাছে বসিয়ে ঘরের নক্সা, আসবাব ও ঔষুধ-পত্রের তালিকাটা বের করে একে একে সব ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। রঘু কাগজগুলি হাতে নিয়ে বলে—সবইতো বুঝে নিলাম ভাই। তবু ভুল ত্রুটি হলে—তুমি তো আছ। শুধরে দেবে। চিরঞ্জীব উঠে রঘুকে জড়িয়ে ধরে নৃত্যের তালে গানের সুরে জবাব দেয়:—

আমি এক ভবঘুরে বাউল দেওয়ানা।
কোথায় থাকি কোথায় যাই বলতে পারিনা॥
সেবা করিবার তরে নিয়েছি সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া ঘুরিফিরি পরি চীর-বাস॥
আমার মন রঙ্গরসে মেতেছে আজ,
তাই সেরে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি নিজ বাস॥

তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকে খোলা থেকে একতারাটা নামিয়ে

বেরিয়ে এসে টুংটাং করে—হরে মুরারে মধুকৈঠভ হারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে—গাইতে গাইতে জঙ্গল পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। রঘুনন্দন বাউলের চলার পথের দিকে চেয়ে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ভেবে হর্ষোৎফুল্ল হয়। নচেৎ এমন সব মহাজনের সঙ্গলাভ কখনো সম্ভব।

চিরঞ্জীব বুড়ো বট ছাড়িয়ে রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে কোনদিকে যাবে স্থির করতে পারছে না। কেননা তার প্রথম ও প্রধান কাজ রাত্রি ন'টার পর দশটার মধ্যে আপ ডাউন ট্রেন চলাচল করে কিনা তা জানা। নিজে স্টেশনে গিয়ে এখবর সংগ্রহ করা সঙ্গত নয়। তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। নিতাইকে ছদ্মবেশে স্টেশনে পাঠিয়ে এ খবর জেনে নিতে কোন ঝুঁকি নেই। সুতরাং চিরঞ্জীব বিশালাক্ষীর দিকে রওনা দেয়। সূর্য পুব পাহাড়ের আড়াল থেকে উপরে উঠেছে। বেলা আটটার বেশি নয়। বিশালাক্ষী গাছ তলা পৌঁছে দেখে সাধু সন্ত, বৈষ্ণব বৈরাগীর ভিড় কমেছে। কিন্তু নিতাইয়ের জায়গাটা খালি। ব্যাপার কি, সে গেল কোথায়? তার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করা সমীচীন। সুতরাং সময় কাটাবার জন্য একতারাটা টুং টাং করে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু তার পাত্তা নেই। চৌকিদারের ছেলেরও খোঁজ নেওয়া দরকার। তাকে সে কথা দিয়েছে। অগত্যা সে ডাকবাংলোর দিকেই এগোয়। চলতে চলতে তার খেয়াল হয় যে ট্রেন চলাচলের সময় সম্পর্কে চৌকিদার নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল কেননা সাহেবসুবারা ডাকবাংলোতে হামেশাই যাতায়াত করে। কিন্তু প্রসঙ্গটা কথাচ্ছলে এমনভাবে তুলতে হবে যাতে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের ছায়াপাত না ঘটে। অবশ্য বিষয়টা উত্থাপনের সুযোগ না পেলে তা সম্ভব নয়। কেননা রাতে রেল চলাচলের খবর জানতে গেলেই সন্দেহ উদ্রেকের অবকাশ থাকবে।

চিরঞ্জীব বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। বাগান থেকে তাকে দেখেই চৌকিদার দৌড়ে এসে বলে—এই রোদের মধ্যে আসতে অনেক মেহনত হলো তো! আরে ও শোভন বারান্দায় একটা কুর্শি বের করে দে।

—না না, আমার বসবার অবসর নেই মিঞাভাই। এখনো নানা জায়গায় ছুটতে হবে। সাবু কোথায়, চলো আগে তাকে দেখি। হাঁটা চলা করে নাকি? চৌকিদার জানায়, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া করেনা। কোস্কাগুলি টান ধরেছে—চামড়া কুঁচকে গেছে। কথা বলতে বলতে চিরঞ্জীব চৌকিদারের ঘরে ঢোকে। সাবুকে দাঁড় করিয়ে পা'টা দেখে

বলে কোথায় জল শুকোচ্ছে। এখন একটু 'একটু হাঁটতে পারে, তবে সাবধান কোন চোট যেন না লাগে। ওষুধ যা আছে তাই চালাবে। চিরঞ্জীব দরজার দিকে এগোতেই চৌকিদার বাইরে নেমে বলে—আরে ভাই একটু দাঁড়াও। চৌপরদিন তো কেবল ছুটছো। এত বেলা হলো পেটে নিশ্চয়ই এখনো দানাপানি পড়েনি। আরে ও ওসমান, বৈরাগী ভাইয়ের জন্য এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ আর সাহেবদের জন্য আনা ফলপাকড়ি কেটে নিয়ে একটা প্লেটে বারান্দায় টিপয়ের ওপর রাখ। তারপর চিরঞ্জীবের হাত ধরে বলে—চলো তোমাকে আমি কিছু না খাইয়ে ছাড়ছি না। চিরঞ্জীব হাসতে হাসতে বলে—সায়েবদের খাবার আমায় দিলে ওদের ভাগে কম পড়বে যে, তখন তোমাকেই ঠেলা সামলাতে হবে। চিরঞ্জীবকে বারান্দায় এনে চেয়ারে বসিয়ে বলে—কাল খবর এলো কয়েকজন হোমরাচোমরা সাহেববিবি আসছে—শিকার করতে। সেইমতে আমি ওসমানকে নিয়ে বাজার করলাম। নিজেই দুপুর, বিকেল সন্ধ্যা স্টেশনে হাজির রইলাম। রাত আটটার আপ ডাউন গাড়ির পর মেল ট্রেন তো সেই রাত ১১টায় তাও দেখলাম—সব ফক্কা। আর আমি যাইনি। রেল স্টেশনে এন্তেজারি করতে নেয়ামৎকে পাঠিয়েছি। চিরঞ্জীব যেন হাতে চাঁদ পেল। যে খবরের জন্য সে অস্থির উদগ্রীব তা যেন অনায়াসে পেয়ে গেল। সে যারপর নাই খুশি। কয়েক খণ্ড আপেল কলা আর সরবৎ খেয়ে উঠে পড়ে।—চলি মিঞাভাই, সাবুর খবর জানিও। খোদা হাফেজ।

চিরঞ্জীব বিশালাক্ষীর তলায় এসে দেখে নিতাইয়ের জায়গা পূর্ববৎ খালি। তার অনুপস্থিতি উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তাকে না-বলেকয়ে, বিশেষত অদ্য রাত্রির গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে, কোথাও যাওয়াটা যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তাঁকে দিয়ে রাতের রেল চলাচলের খবর নেওয়ার তো আর দরকার নেই। সে নিজেই তা পেয়ে গেছে। এখন কেবল দিনের বেলা গিয়ে একবার রেল লাইনের নির্দিষ্ট কর্ম-ক্ষেত্রটা পর্যবেক্ষণ করা। তবে কি সে তা করতেই সকাল সকাল বেরিয়েছে? এই প্রশ্নও তার মনে জাগে। যাই হোক চিরঞ্জীব গাছতলা ছেড়ে বাজারের পথ ধরে। চলতে চলতে সে ঊর্ধ্বে তাকায়—সূর্য্য মধ্য গগন ছুঁয়েছে। আর দেরি করা যায় না। বাজারে পৌঁছে নিতাইকে খুঁজে না পেয়ে স্টেশনমুখী পা বাড়াতেই তার

খেয়াল হয় এই দুপুরে খাবার জন্য সে যদি কোন হোটেলে ঢুকে থাকে। প্রথমে সে যে-হোটেলে নিতাইকে খেতে বলেছে সেখানে ঢুকেই দেখে নিতাই ভিন্ন বেশে অন্যের সঙ্গে বসে খাচ্ছে। নিতাইও তাকে দেখা মাত্রই চোখ ইশারায় আপন পরিচয় জ্ঞাপন করে। চিরঞ্জীব দুটো মিষ্টি নিয়ে বসে। খাওয়া শেষে নিতাই বেরিয়ে যেতেই সে উঠে পড়ে। বাজার ছাড়িয়ে চিরঞ্জীব নিতাই-এর আগে আগে চলে মাঠে নেমে পড়ে। ভর দুপুর মাঠে ঘাটে লোকজন বিরল। চলতে চলতে নিতাই তার ভোর বেলার রেলপথ অভিযানের বর্ণনা দেয়। সেইসঙ্গে স্টেশন থেকে রাতের রেল চলাচলের খবর প্রাপ্তিরও উল্লেখ করে। সব শুনে চিরঞ্জীব—সাবাস, সাবাস, বাহাদুর ভাই বলে নিতাইকে জড়িয়ে ধরে। দীঘির ধারে পৌঁছে উভয়েই উত্তর পশ্চিম কোণের বড় শিমুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। রাত্রি আটটায় নিতাইকে এখানে আসতে বলে চিরঞ্জীব তাকে বিদায় দিয়ে আশ্রমে ফিরে আসে।

সেবার ঘরের কাজ শুরু হয়েছে। মাটিতে বাঁশের গোঁজ পুঁতে দড়ি বেঁধে মাপজোখ করে চৌহদ্দিতে মোটা মোটা কাঠের থাম বসানো হচ্ছে। তাকে দেখেই রঘু দৌড়ে এসে বলে—তোমার আঁকা নক্শা মতো ঘর তৈরি হচ্ছে কিনা দেখ। চিরঞ্জীব কাগজ না দেখেই জবাব দেয়—হাঁ, সবকুছ্ ঠিক সে হো রহা, ঘাবড়াও মৎ। তোম বহুৎ হুঁশিয়ার আদমি, দেমাক ভি আচ্ছা হ্যায়। খুশিসে কাম চালাও।

স্নানাহার সেরে বেরোবার মুহূর্তে চিরঞ্জীবের খেয়াল হয় নিতাই যে যন্ত্রপাতিগুলি এনেছে তা দেখে রাখা দরকার যাতে কাজের সময় সেগুলি ঠিক মতো প্রয়োগ করে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করা যায়। যাবার পথে সে ঘর তৈরির জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে রঘুকে ডেকে কোন রুগীর খবর আছে কিনা জেনে বেরিয়ে যায়। জংগলে ঢুকে নিতাইয়ের থলিটা খুলে একে একে যন্ত্রগুলি বের করে তার ব্যবহার কি ভাবে কোথায় করতে হবে তা মনে মনে আঁচ করে সেগুলিকে দুই থলির মধ্যে সমান ভাগে রাখে। বেলা শেষ। জংগলের ভেতরকার ঘোর ক্রমেই ঘন হচ্ছে। রাখালদেরও গরুরপাল নিয়ে ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। এ সময়ে তাকে এখানে ঘুর-ঘুর করতে দেখলে তাদের মনে হয়তো ভিন্ন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং জংগলের এদিকটাতেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা সে সমীচীন মনে করে।

রাতের অন্ধকার দিনের আলো গ্রাস করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিরঞ্জীবের অন্তরেও উৎসাহ উত্তেজনা ও উদ্দীপনা বেড়ে চলেছে। তার অন্তরে নিরন্তর যে বিপ্লব-বহ্নি ধিকিধিকি জ্বলছে রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝি বিরাট এক রক্তবর্ণ গোলকে রূপান্তরিত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। না, সে আর অপেক্ষা করতে পারছে না। তার একমাত্র লক্ষ্য রেল পথে পৌঁছে তার সকল সাধন করে বিপ্লব-বহ্নিতে ইন্ধন সংযোজন। চিরঞ্জীব মনের আনন্দে গর্জে উঠে ছোট্ট করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে মায়ের বন্দনা করে। উর্দ্ধপানে চেয়ে দেখে রাতের আকাশে হাজার হাজার তারা মেলা বসিয়ে ঝলমল করছে। তাদের ক্ষীণ দ্যুতি অতি সূক্ষ্ম রূপালী ধারায় ধুলোর মতো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। চিরঞ্জীব যন্ত্রের থলে দুটো হাতে নিয়ে দিঘির উত্তর পশ্চিম কোণে শিমূল গাছের নিচে এসে নিতাইয়ের অপেক্ষায় দাঁড়ায়। সময় বয়ে যাচ্ছে। নিতাইও আসছে না কিংবা রাতের সাড়ে আটটার রেল গাড়ির চলে যাবার শব্দও শুনতে পাচ্ছে না। চিরঞ্জীব অস্থিরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তবে কি তার সময়ের হিসাব ভুল হলো। এমনি সময়ে রেলের গুম্ গুম্ শব্দ তার কানে আসে। কিছুক্ষণ পরেই দূরে অন্ধকারে এক মূর্তি তার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। সে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাকে চিনতে না পেরে চিরঞ্জীব গাছের আড়ালে সরে মূর্তির গতিবিধি লক্ষ্য করে। আরো কাছে আসতেই চিনতে পেরে চিরঞ্জীব আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর উভয়েই চটপট পোষাক পরিবর্তন করে লক্ষ্যস্থল অভিমুখে দ্রুত হাঁটতে থাকে। লোকালয় থেকে দূরে নির্জন রেল পথে এ সময়ে লোক চলাচল সম্ভব নয়। তথাপি রেল লাইন উৎপাটন এবং পুলের ধ্বংস সাধন কালে হাতুড়ি, গাঁইতি, শাবল ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ঠুং ঠাং; খট খট ও ঠোকাঠুকির শব্দ যতটা কম সম্ভব সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। রেল পুলের ধারে পৌঁছে নিতাই যন্ত্রপাতি নিয়ে রেল লাইন এবং চিরঞ্জীব গাঁইতি শাবল নিয়ে পুল ধ্বংসের কাজে লেগে যায়। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই উভয় কর্ম নিষ্পন্ন হয়। তারপর নিতাই পায়ে দড়ি লাগিয়ে নারকেল গাছে উঠার মতো তরতর করে টেলিগ্রাফ টেলিফোনের থামে উঠে তার কাটতে শুরু করে। আর চিরঞ্জীব তুলে ফেলা লোহার পাত নাট বল্টু ইত্যাদি বয়ে নিয়ে পাশের জলায় ফেলে দিয়ে সরিয়ে ফেলা যন্ত্রপাতি থলের মধ্যে ভরে রাখে।

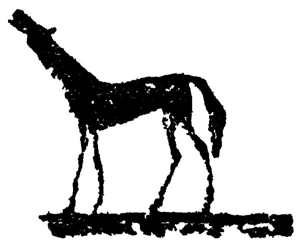
নিতাই-এর দু'দিকে দু'টো করে থামের তার কাটা শেষ হয়েছে। চিরঞ্জীব থামের মাঝখানে করাত চালাতে থাকে যাতে সেগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা যায়। কিন্তু এ কী, হঠাৎ রেল গাড়ির শব্দ কানে আসতে উভয়ে অবাক হয়ে যায়। মেল ট্রেনের আসার তো সময় হয় নি। না কি তাদের সময়ের ভুল। যন্ত্রপাতি দড়িদড়া লোহালক্কর সব চটপট থলেতে ভরে রেল লাইনের ওপর এসে দাঁড়ায়। মেল ট্রেন যেদিক থেকে আসার কথা তার বিপরীত দিক থেকে সশব্দে একটা ট্রেন আসছে। কিন্তু ইঞ্জিনের সন্ধানী আলো দৃষ্টি গোচর নয়। তবে কি এটা মাল গাড়ি না অন্য কোন গাড়ি। না, তাদের আর কিছু করার নেই। তারা নালা টপকে থলে ভর্তি যন্ত্রপাতি সব অদূরের পুকুরে নিক্ষেপ করে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। শোঁ শোঁ শব্দে গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। পুলের কাছে আসতেই ইঞ্জিনটা কেঁপে কেঁপে বিকট শব্দে পুলের নিচে পড়ে আর তার পেছনের গাড়িগুলি ছিটকে লাইনের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনোটা বা কোনোটার উপর উঠে গেছে। হঠাৎ নাকে কেরোসিনের গন্ধ ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই কোন ওয়াগনে কেরোসিন আছে। ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু একান্তই দুঃসাহসের কার্য হবে ভেবে তারা অকুস্থল ত্যাগ করে।

মেল ট্রেন ধ্বংস হলো না বটে কিন্তু যেভাবে মালগাড়ি ইঞ্জিন সহ লাইন-চ্যুত হয়েছে তা পরিষ্কার করে গাড়ি চলাচল শুরু হতে অন্ততপক্ষে দু'দিন লাগবে। ফলে মিলিটারি ও পুলিশ চলাচল বন্ধ। ততক্ষণে বিপ্লবীরা নগর দখল করে ফেলবে এবং ভারতে প্রথম বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। নগরের প্রতি সরকারী অট্টালিকার শীর্ষে শীর্ষে স্বাধীনতার তে-রঙা পতাকা উড্ডীন হবে। মনের উল্লাসে কদম কদম বাড়ায়ে তারা নিশীথে নির্জন প্রান্তর দিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চতুর্দিক কেঁপে ওঠে রাতের অন্ধকার লাল হয়ে যায়। পেছনে চেয়ে দেখে রেল-লাইনে ফটাফট শব্দে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে—দাহ্য পদার্থপূর্ণ কোন ওয়াগনে আগুন লেগেছে। ইচ্ছা হলো উচ্চৈস্বরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও বিপ্লবের বন্দনা-গীতি গেয়ে চলে—

কে কোথায় আছ নওজোয়ান
হও সবে আগুয়ান ॥
বিপ্লবের [illegible]

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ॥
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।
নিম্নে উতলা ধরণীতল।
চলরে চলরে চল ॥

পাছে ঐ প্রচণ্ড শব্দে আশপাশের গ্রামের লোকজন জেগে উঠে মাঠে বেরিয়ে পড়ে সে কারণে-তারা ত্বরিতপদে হাঁটতে থাকে। দীঘির ধারে এসে পোষাক পরিবর্তন করে। তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা হাইকমাণ্ডের নির্দেশ সাপেক্ষ। সুতরাং সতর্ক হয়ে অতি সাবধানে এখানেই থাকতে হবে এবং প্রতিদিনই একবার উভয়ে মিলিত হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা স্বস্থানে প্রস্থান করে।



মহারাজ-এর আদেশ অনুযায়ী স্বীয় পল্টন সহ লড়াই করে অমুতোষ পাহাড়ের আশপাশ থেকে সাহেবদের মেশিন-গান সহ অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ ও স্তব্ধ করে খুশী-মনে সাময়িক সামরিক কেন্দ্র অভিমুখী ফিরে চলে। ওদিকে টিলার ওপর পুলিশ লাইন থেকে দেবেশের অনুপস্থিতিতে অনঙ্গের নেতৃত্বে যুগপৎ গুলি বৃষ্টি করে শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অমুতোষকে সাহায্য করে। বিজয়ে উৎফুল্ল অনঙ্গ সমুদয় পুলিশ লাইন আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করবার মনস্থ করে যোদ্ধাদের চারজন ব্যক্তিকে [illegible] সকলকে ব্যবহার যোগ্য আগ্নেয়াস্ত্র সহ সাময়িক সমর শিবিরে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেয়। মেশিনগান সমেত অন্য যে সব অস্ত্রের কার্তুজ মেলেনি সেগুলি সহ পুলিশ লাইনের সর্বত্র মোটর গাড়ি থেকে পেট্রল এনে আগুন দেবার ব্যবস্থার জন্য অনঙ্গ নলিনকে ডাকে। বারংবার হাঁক দেওয়া সত্ত্বেও তার সাড়া নেই। অগত্যা খুঁজতে খুঁজতে দেখে সে বারান্দার এক কোণে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। কি ব্যাপার! কাছে গিয়ে গায়ে হাত দেয়—শরীরে প্রচণ্ড উত্তাপ—জ্বরে ধুঁকছে। [illegible]

উৎসাহে ছেদ পড়ে। আর দেরি করবার সময় নেই—নগর আক্রমণের সময় আগেই পেরিয়েছে। ধরাধরি করে নলিনকে একটা গাছের নিচে নিয়ে আসে। তারপর নিজের তত্ত্বাবধানেই অস্ত্রদের দিয়ে পেট্রল এনে সর্বত্র ছিটিয়ে দেয় এবং দূর থেকে অগ্নি গোলক নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ সুরজিৎ মহা বিপত্তি ঘটায়। তার গায়ে আগুন লেগে যায়। একটা অগ্নি মূর্তি চিৎকার দিতে দিতে মাঠের এদিক ওদিক দৌড়চ্ছে। অনঙ্গ কিংকর্তব্য বিমূঢ়। চিৎকার দিয়ে সুরজিতকে মাঠে গড়াগড়ি দিতে বলে। এর ফলে আগুন নিবলো বটে কিন্তু ততক্ষণে সে অগ্নি দগ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাঠে পড়ে আছে। এই আকস্মিক বিপদে অনঙ্গের সম্যক বিবেচনা জ্ঞান লোপ পায়। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত আহত কমরেডদের সম্পর্কে যুদ্ধরত সৈনিকের আচরণ বিধি, আদেশ, ও অনুজ্ঞা এবং যুদ্ধকালীন নিয়ম শৃঙ্খলা ভুলে গিয়ে কেবল মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অগ্নিদগ্ধ ও অচৈতন্য কমরেডদ্বয়কে গাড়িতে তুলে নিয়ে নগর অভিমুখে রওনা দেয়। এমন কি গাড়ি ছাড়ার সময় অপর দুই কমরেডকে সামরিক ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার আদেশ না দেওয়া হেতু তারাও গাড়িতে উঠে তার সঙ্গ নেয়। বৈপ্লবিক ও সামরিক বিধিবিধান লঙ্ঘন করে বিশেষত নগর আক্রমণ কালে তার ওপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব কর্মের ভার ভুলে দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের অজ্ঞাতে আচম্বিতে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ এক গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধ। ফলে বিপ্লবের কর্মসূচীতে প্রকাণ্ড ছেদ ঘটে এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আর্তজনকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে না এসে অনঙ্গ নানা জায়গা ঘুরে দেখে নগর নির্জন নিস্তব্ধ, বিপ্লবের কোন আঁচ লেগেছে বলে মনে হলো না। তারপর যুদ্ধ স্থলে ফিরে এসে দেখে সব ফাঁকা—কেউ কোথাও নেই। সামরিক শিবির শূন্য—খাঁ খাঁ করছে। মনে হলো হা হা অট্টহাসিতে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে। বিপ্লবী বাহিনী যে নগর আক্রমণ করে নি সে সম্পর্কে সে নিশ্চিত। এই ব্যর্থতার জন্য সে প্রত্যক্ষরূপে দায়ী। তার উপস্থিতিতে এরূপ হতো না। কিন্তু গেল কোথায়। হায় হায় এ কী করলাম। তখন যদি সামরিক রীতি নীতি ও অনুশাসন অনুসরণ করতাম। খুবই দেরী হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। রাত্রি শেষ। গাছে গাছে কাক ডাকছে। পলায়ন ভিন্ন গতি নেই বুঝে অনঙ্গ সে পন্থাই অবলম্বন করে—এ পলায়নটি ন [illegible]।

ওদিকে পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলের সাময়িক শিবিরে বিপ্লবী বাহিনীর একমাত্র অনন্ত ও তার সহকারী নবীন, সুরজিৎ আর দুই কয়েক ব্যতীত প্লাটুন কমাণ্ডার এবং যোদ্ধারা সকলেই হাজির। নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে মহারাজ উঠে দাঁড়ান। প্রথমেই তিনি ব্রিটিশের অস্ত্রাগার ও পুলিশ লাইন দখল এক ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য বিপ্লবী বাহিনীর কৃতিত্ব ও শৌর্য বীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা বাহিনীর গোচরে আনবার জন্য বলেন যে সেগুলি সংখ্যায় যথেষ্ট হলেও বস্তুত গোলাগুলির অভাবে অকেজো। অধিকন্তু লুইস গান ইত্যাদি ভারি অস্ত্র বয়ে নিয়ে পদাতিক বাহিনীর পক্ষে চলা খুবই কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়ত আক্রান্ত ইংরেজগণ যেরূপ তৎপরতার সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করেছে তাতে আমাদের নগর আক্রমণের বিলম্ব হেতু তারা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে আমাদের আক্রমণ করবার জন্য তৈরি হয়েছে। আমাদের অনবধানতা বশতঃ শহরের কয়েকটা অস্ত্রাগার, কোতোয়ালী সহ অন্যান্য থানার স্ট্রংরুম থেকে ইংরেজের অস্ত্র সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে। এইভাবে বর্তমান পরিস্থিতি নিখুঁত বিশ্লেষণ করে মহারাজ নগর আক্রমণের বলটা বাহিনীর বিচার সভায় নিক্ষেপ করে চুপ হয়ে যান।

দেখা গেল অম্বুতোষ এবং কয়েকজন যোদ্ধা ব্যতীত বাকীরা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নগর আক্রমণে দ্বিধাগ্রস্থ। যুবকদের কথা আলাদা, তারা যুদ্ধের জন্য সদাই প্রস্তুত, উদ্গ্রীব ও উন্মত্ত। কিন্তু অম্বুতোষের বক্তব্য এই সময়ে নগর সম্পূর্ণ অরক্ষিত। নগরে প্রবেশ করলে স্থানীয় যুবকদের অনেকেই সংগ্রামে যোগ দেবে। সহানুভূতিশীল নগরবাসীরাও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এযুক্তি অবশ্য হেলা-ফেলার নয়। কিন্তু অস্ত্রবলে-হীন যুদ্ধের পরিণতি রক্তক্ষয় ও জীবন-নাশ ভিন্ন আর কি হতে পারে। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তো স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে লেখা আছে।

নেতৃদ্বয় নির্বাক। তাঁরা বুঝেছেন যুদ্ধের পরিকল্পনা, পন্থা ও রণ-কৌশলের ভুল ত্রুটি এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় বুলেট সংগ্রহের অপারগতা ও অনন্তের অবিমৃষ্যকারিতা নগর জয়ের অভিযান বিফল হতে চলেছে [illegible]

[illegible]

[illegible]

ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু নজির বিদ্যমান। স্পেনিশ যুদ্ধ এবং সম্প্রতি জাপান ও নানা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে চীনের গেরিলা যুদ্ধের নানা রোমহর্ষক কাহিনী মহারাজ-এর মনে যুদ্ধাভিযানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তার মনেও ঐ উপায়ে বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্বতে আত্মগোপন করে ক্রমাগত আচম্বিতে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের নির্মূল করতে হবে। নীরবতা ভঙ্গ করে মহারাজ হুংকার ছাড়েন—কুছ্ পরোয়া নেহি। যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।—হবে জয় হবে জয়, ওহে বীর, হে নির্ভয়। পরক্ষণেই ব্রিটিশ সিংহের ধ্বংসের জন্য সিংহনাদের সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীকে উৎসাহিত উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করতে তিনি উচ্চকণ্ঠে—বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, বিপ্লবী বাহিনী অমর রহে ধ্বনি দেন। সমবেত কণ্ঠে সে-ধ্বনি মুহুর্মুহু উচ্চারিত হয়ে রাতের অন্ধকার চিরে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

সমর শিবিরে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। নির্জন বনভূমিতে মশালের কাঁপা-কাঁপা স্বল্প আলোতে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গেরুয়া বসনাবৃত মহারাজ ধ্যান গম্ভীর মূর্তিতে আসীন। তারই পার্শ্বদেশে শুভ্র খদ্দর পরিহিত বড়দা—শিরে গান্ধিটুপির সম্মুখভাগে রিপাবলিকার বাহিনীর সোনার গিল্টি করা সেনা নায়কের পদক জ্বল জ্বল করছে। সম্মুখ সারিতে সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গ নিশ্চল পাষাণবৎ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে অদূরবস্থিত সেনাপতির ভাষণের অপেক্ষারত। হঠাৎ প্রভাত উঠে জানায়—রাত্রি বিগত প্রায়—আকাশের রঙ ফিকে এবং তারারা বিলীন হচ্ছে। নেতৃদ্বয় শহরের খবরের জন্য প্রেরিত বার্তাবহ দ্বয়ের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তারা এখনো এল না। তার উপর অনঙ্গের অনুপস্থিতি হেতু প্রত্যাশিত রসদও আর পৌঁছলো না। না, আর দেরি নয়। মহারাজ ও বড়দা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র দেবযানী তাঁদের পেছনে এসে এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। বড়দা দু'কদম এগিয়ে স্যালুট করে দাঁড়ান। তার কণ্ঠোত্থিত বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তুলে আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যায়। পরক্ষণেই তিনি গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দেন—Cmpany fall in—সৈন্যগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও। take arms—অস্ত্র তুলে নাও। পরবর্তী আদেশ—Collect the useful arms from the yonder car and destroy the rest along with the car setting fire to it—অদূরবর্তী গাড়ি থেকে

প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে বাকী সব ধ্বংস করে বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দাও। ধ্বংস ও দাহ কর্ম নিষ্পন্ন হতে না হতেই পৌরুষ কণ্ঠের আদেশ হয় Company fall in file—সৈন্যগণ পর পর এক লাইনে দাঁড়াও। Attention—স্থির হও। March forward—সামনে এগিয়ে চলো। পা বাড়াবার মুহূর্তে দূরবর্তী পাহাড় থেকে এক ঝলক আলো এসে পড়েই মিলিয়ে যায়। বড়দা সচকিত হন। পুলিশের সন্ধানী আলো সন্দেহ করে তিনি হাঁক দেন—company take cover under nearby bush—সেনাদল পার্শ্ববর্তী ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আশ্রয় নাও। Be ready for fire—গুলি ছোড়ার জন্য বন্দুক উঁচিয়ে ধরো। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও যখন আর আলো দেখা গেল না তখন বোঝা গেল দূরবর্তী পাহাড়ের ঘোরা পথে কোন চলতি মোটর গাড়ির আলো হঠাৎ ঝলকানি দিয়ে মিলিয়ে গেছে। বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ পুনরায় পরপর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মুখে জোর কদমে এগিয়ে চলার আদেশ দেওয়া হয়।

রাত ভোরের আর দেরি নেই। সময়ের ক্ষতিপূরণের জন্য লোক লোচনের অন্তরালে দূরবর্তী পাহাড়ের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে বাহিনী এগিয়ে চলেছে। আত্মগোপন করে দীর্ঘ সংগ্রাম চালাবার জন্য তৈরি হতে হবে। বাহিনীতে একমাত্র নারী সৈনিক দেবযানী মহারাজ-এর পেছন পেছন পশ্চাৎরক্ষীর মতো বীরদর্পে অক্লান্ত পদক্ষেপে অন্যের সঙ্গে সমান তালে চলেছে। বাহিনীর অন্যদের মতোই তাহার মুখ ক্লান্তি-বিহীন উৎসাহে উজ্জ্বল ও উদ্দীপিত। পুব গগনে আলোর আভা ফুটে উঠেছে। মাঠের উপর একটা স্বচ্ছ কুয়াশার আবরণ ভেসে বেড়াচ্ছে। চলার পথে সবুজ শশা ও তরমুজ-এর ক্ষেত বাহিনীর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম আসে—যে যা পার তুলে নাও। দূর পাহাড়ের আড়াল থেকে ঝিকিমিকি দিয়ে উঠে নবারুণের সোনার বরণ নতুন কিরণ বুঝি নব আশার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাছের পাতাগুলি সোনারঙ মেখে প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসে হেলেদুলে হাতছানি দিচ্ছে—এসো। সেই সঙ্গে শত সহস্র পাখির কাকলির মঙ্গল গীতি তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে—এসো বীর উন্নত করি শির—হবে জয় নাহি ভয়। মহারাজ-এর গুরু গম্ভীর কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি—বন্দে মাতরম্। বিপ্লব জিন্দাবাদ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চতুর্দিকের পাহাড়ের প্রাকার ভেদে প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে মিলায়ে যায়। [illegible]

নতুন শক্তি যোগায়। নাঙল কাঁধে এক চাষী তাদের দেখে এবং চিৎকার শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালায়। বিপ্লবী বাহিনী কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শুরু হলো বাংলা মায়ের দামাল ছেলে একদল বিপ্লবীর পরাধীনতার শেকল ভেঙে, লৌহ আগল চূর্ণ করে স্বাধীনতার সূর্যকরোজ্জ্বল দুর্গ তোরণে পৌঁছবার এক কঠিন অতুলনীয় দুঃসাহসিক ঐতিহাসিক অভিযান। যার তুলনা মেলে চীনের মহান নেতা মাও-এর নেতৃত্বাধীন চীনা বাহিনীর 'Long March'—সুদূর বিস্তারি দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধাভিযান।



বাড়ি ফিরে ঊর্মিলা দরজার কড়া নাড়তেই ঝি দরজা খুলে দেয়। উঠোনে পা দিয়ে দেখে তুলসী মঞ্চে টিমটিম করে প্রদীপ জ্বলছে। বুঝলো ধানীই বাতি দিয়েছে। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ধানী বলে ডাক দিতেই ঝি বলে, দিদি তো কলেজ থেকে দেরিতেই ফিরেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ থাকে। তারপর বেরিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে ডেকে বলে—আমি যাচ্ছি, মাকে বলো, ফিরতে রাত হবে। দাদা স্কুল থেকে দিদির আগেই ফিরেছে। খাওয়া দাওয়া করে বলে গেছে আসতে দেরী হবে। ঝি চলে যেতেই ঊর্মিলা দরজা বন্ধ করে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। সব ফাঁকা, শূন্য—বুকটা হু হু করছে। সকাল থেকেই তার এই অবস্থা চলেছে। মনটা অস্থির চঞ্চল—কেমন যেন এক মহা অমঙ্গলের অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনে তার বুক কেঁপে উঠছে। বাড়ি ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু দিদিমার শরীর খুব খারাপ—খবর দিয়েছে। ঠাকুরপোও যাবার জন্য জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে। না, ঊর্মিলা আর দাঁড়াতে পারছে না—বুঝি পড়ে যাবে। আস্তে আস্তে হেঁটে দাওয়ার সিঁড়িতে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে অন্ধকারে শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, জোনাকি উড়ছে—সব কিছুই যেন

এলোমেলো। উর্মিলা নির্জীবের মতো বসে আছে। কতক্ষণ এভাবে বসে আছে খেয়াল নেই। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই উর্মিলা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে চলে দরজা খুলে দেয়—দেখে স্বামী। রমেশ ঢুকে দরজা বন্ধ করে চলতে গিয়ে আবার দরজা খোলার শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখে উর্মিলা দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে আছে। রমেশ অবাক হয়ে বলে—রাত্রিতে দরজা খুলে এভাবে দাঁড়িয়ে কেন? উর্মিলার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর—যানী সুদেব এখনো ফেরেনি।—সে কী? বলেই ঘড়ি দেখে—রাত্রি স আট। নিজে চিন্তিত হলেও স্ত্রীকে দেবার জন্যই বলে—রাত্রিতো বেশি হয় নি—ওরা এলো বলে। দরজায় খিল দিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে উঠান পেরিয়ে দাওয়ায় উঠতেই উর্মিলা বলে—তুমি যাও। আমি এখানে খোলা হাওয়ায় একটু বসি। রমেশ ঘরে ঢুকে আপিসের পোশাক ছেড়ে কলতলায় যায়।

উর্মিলা আর বসে থাকতে পারছে না। ছেলে মেয়ের চিন্তায় অস্থির আকুল হয়ে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে গলিমুখে দাঁড়ায়। অন্ধকারে যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে—সব ফাঁকা। সে এখন কি করবে? দুশ্চিন্তায় উতলা উর্মিলা বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অন্ধকারে গলিপথ ধরে বড় রাস্তার দিকে এগোতে থাকে। কিছুদূর যেতেই মনে হলো কেউ যেন আসছে। কাছাকাছি হতেই সুদেব মাকে দেখে—মা বলে চিৎকার দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে।—তুমি কোথায় চলেছ মা? চলো, ঘরে চলো। উর্মিলা সুদেবকে জড়িয়ে ধরে বলে—তুই এলি, কিন্তু যানী কোথায়।—কেন দিদি ফেরেনি? না, যা যানীকে নিয়ে আয়, না হলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আগে তুমি ঘরে চলো, তারপর আমি দেখছি।

ওদিকে কলতলা থেকে ফিরে রমেশ বারন্দা খালি দেখে এঘর ওঘর, এখানে ওখানে উর্মিলার খোঁজ করে। সে কোথাও নেই। গেল কোথায়? বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে দরজার দিকে এগোতেই দেখে সেটা হাঁপাট খোলা। সে অবাক। তবে কি উর্মিলা পাগলের মতো এত রাতে ছেলে মেয়ের খোঁজে রাস্তায় বেরিয়েছে। রমেশ অস্থির হয়ে গলিপথ ধরে চলতে থাকে। কিছুদূর যেতেই মনে হলো অন্ধকারে অদূরে দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। উর্মিলার কান্না-জড়িত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—না, আমি যাবো না। যানীকে নিয়ে আয়, বলে সে কান্নায়

ভেঙে পড়ে। রমেশ হতভম্ব। এ অবস্থায় সে কি করবে? রাত্রি অনেক, দেবযানী এখনো ফিরলো না। কেন? কি অঘটন ঘটলো। নাকি আবার সে গুণ্ডার ঝামেলায় পড়লো। নাকি আরও সাংঘাতিক কিছু ঘটলো। মেয়েটার জন্য তার প্রাণ কাঁদছে। তাই বলে, এত রাত্রে রাস্তার মাঝখানে এরূপ কান্নাকাটির দৃশ্য কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না। এতে হিতে বিপরীত হবে এবং মহা অনর্থ ঘটবে। কেননা বিষয়টা এভাবে জানাজানি হলে নানা গুজব রটে ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলবে। রমেশ এগিয়ে গিয়ে মাতা পুত্রকে চুপ করতে বলে উভয়ের হাত ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। বাড়িতে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে রমেশ উর্মিলাকে ঘরে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলে চাবি নিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজায় তালা এঁটে ঘরে ফিরে দেখে উর্মিলা নির্জীবের মতো চোখ বুজে পড়ে আছে। দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। রমেশ কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। উর্মিলাকে কিছু না বলে সুদেবের ঘরে গিয়ে দেখে সে বিছানায় পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। রমেশ তাকে কোলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—লক্ষ্মী বাবা কেঁদোনা। তোমার কান্না শুনে মা আবার কাঁদতে শুরু করবে। এখন তোমার খবর বলো। এত দেরি করেই বা ফিরলে কেন?

সুদেব কান্না-জড়িত কণ্ঠে বলে—স্কুল থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে আমি বেরিয়ে যাই। মিশনের কাজ কর্ম, ব্যায়াম ইত্যাদি সেরে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফেরার পথে ক্লাব হয়ে যাবার ইচ্ছা হতে সেখানে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। অবাক হলাম। আমি তো ক্লাব ছেড়ে দিয়েছি। কেননা দিদি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে—ক্লাবে যাবে না, বাবা মাকে দেখবে। সেই সঙ্গে দিদি আরও বলেছে—আমি মেয়ে, চিরকাল তো বাপেরবাড়ি থাকবো-না বলেই সুদেব আবার কান্না শুরু করে। সুদেবের চোখের জল মুছিয়ে রমেশ বলে—তারপর।—ক্লাবঘরের অদূরেই মালতী মাসীর বাড়ি। অনেকদিন তাকে দেখিনি। ভাবলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। কিন্তু বাড়ি ঢোকবার মুখে নরেশদার ছোটভাই সাধু বলে —সুদেব দাদা, এখন মায়ের কাছে যেও না। মার মন খুব খারাপ, শুয়ে আছে। দাদা ক্লাবের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিলিটারি পোষাক পরে বন্দুক কাঁধে গটগট করে বেরিয়ে গেছে—লড়াই করবে। আমি—সে কী

[illegible]

পথে কেবলই মনে হচ্ছে এতদিন ক্লাবে ক্লাবে যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আলোচনা শুনেছি, তাই কি শুরু হলো। কিন্তু চলার পথে শহরের অবস্থার কোন ব্যতিক্রম দেখলাম না—লোকজনের চলাচল স্বাভাবিক। শান্তু ছেলেমানুষ হলেও তার কথায় মনে খটকা বেঁধেছে—সত্যিই কি নরেশদা ওরা যুদ্ধে গেছে? এই সব ভাবতে ভাবতে গলিতে নেমে কিছুদূর এগোতেই এ-সময়ে পথে মাকে দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি।—হুঁ, বলেই রমেশ সুদেবকে নিয়ে উঠে পড়ে বলে—যাও মাকে নিয়ে কলতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসো। মায়ের সামনে কান্নাকাটি আদৌ নয়। মাকে সান্ত্বনা দেবে।

রমেশ ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় টেবিলের মাঝখানে পড়ে থাকা একটা খাতা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাতাটা এমন খাপছাড়া মতো পড়ে আছে দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ জাগে। খাতাখানা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতেই একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে। যানী মাকে লিখে গেছে। চিঠি পড়ে রমেশ হতভম্ব। এ যে তার কল্পনার বাইরে। সুদেবের কথার আভাসে আর যানীর এই চিঠি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আজ রাতেই ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বদেশীওয়ালাদের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হচ্ছে। যানী তাতে যোগ দিতে গৃহত্যাগ করেছে। ফেরার আর কোন সম্ভাবনা নেই। হায়, মেয়েটা এভাবেই নিজেকে বলি দিলে। রমেশ আর ভাবতে পারছে না। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। কয়েক ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। ঊর্মিকে সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। নির্বিবাদী ভালো মানুষ রমেশ এক কঠিন সংকটের সম্মুখীন। কিভাবে সে এর মোকাবিলা করবে। মনের আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে, চোখের জল মুছে রমেশ নিজেকে দৃঢ় করে উঠে দাঁড়ায়। ঊর্মিকে, সুদেবকে এ চিঠির সংবাদ কিছুতেই জানানো যাবে না। তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। পুলিশের হাঙ্গামা হুজ্জতের আশংকা তো রয়েছেই। সুতরাং চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে গলিতে ফেলে দেয়। ঊর্মির কান্না, সুদেবের অশ্রুজল আর তার নিজের দুঃখ বেদনা সময়ের প্রলেপে মুছে না গেলেও ধীরে ধীরে, উপশম হবে। সুতরাং যানীর অন্তর্ধান চিরকালের মতো অজ্ঞাত রহস্যে আবৃত হয়ে থাক। আড়ালের অধ্যায়।



২

রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ। নগরের কলকোলাহল ও লোক চলাচল ক্রমেই কমে আসছে। আচমকা চৈত্রের প্রচণ্ড দমকা হাওয়া ধুলো বালি উড়িয়ে রাস্তার টিমটিমে বাতিগুলি ঢেকে দিয়ে রাতের আঁধার আরো গাঢ় করে দেয়। পথিকের পথ-চলার বিঘ্ন ঘটায়। দূরে জেলখানার ঢং ঢং ঘণ্টা ধ্বনিতে রাত্রি দশ ঘটিকা ঘোষিত হয়। নগরে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমর্থকগণ অধীর আগ্রহে তাদের নগরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান। ওদিকে সাহায্যকারী বালবাহিনীর চৌকশ কয়েকটি ছেলে নগরের উপকণ্ঠে নির্দিষ্ট জায়গায় মোতায়েন থেকে বিপ্লবী বাহিনীর নগর প্রবেশের পথে অতি সাবধানে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। সুদেষ্ণা বাল ও নারী-বাহিনী নিয়ে অস্থির চঞ্চল চিত্তে অপেক্ষা করছে—বিপ্লবী বাহিনী আর কত দূরে। কখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নগরের ঘরে ঘরে বিলি করে নগর বাসীদের এই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানাবে। ওদিকে জেলখানার ঘণ্টা ঢং ঢং করে রাতের সময় ঘোষণা করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুদেষ্ণার অস্থিরতা ও দুর্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। রাত্রি দুটোর ঘণ্টা ধ্বনি শোনা মাত্র সুদেষ্ণার অন্তর কেঁপে ওঠে। নগর প্রান্তে মোতায়েন ছেলেদের কাছ থেকেও কোন খবর আসছে না কেন। তবে কি অভাবনীয় চরম কোন বিপদ বিপর্যয় ঘটেছে। সুদেষ্ণা আর ভাবতে পারছে না। অন্তরের অমঙ্গল আশংকা ও বেদনার্ত্ত হাহাকার ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না। এমনি সময় গুরখা পরিতোষ ও অন্য স্কাউটরা ভগ্নদূতের মতো এসে সামনে দাঁড়ায়। সুদেষ্ণা বুঝলো তার আশংকা মিথ্যা নয়। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বলে—কিরে, তোরা এরকম বেজার মুখে দাঁড়িয়ে যে! পরিতোষ এগিয়ে এসে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে—না দিদি, দাদাদের কোন পাত্তা পেলাম না। চৌকি ছেড়ে শহরের বাইরে অনেক দূর গিয়েও তাদের দেখতে পেলাম না, গোলাগুলির শব্দও শুনলাম না। ফেরার পথে দেখি পুলিশের তৎপরতা বেড়েছে।

তাদের গাড়ি ঘোড়া শহরের পথে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। কি যে হলো!

শুনে সুদেষ্ণার মন ভারী হয়ে যায়, চোখ ভিজে আসে। নিজেকে দৃঢ় ও সংযত করে এই পরিস্থিতিতে বাল ও নারী বাহিনীর নৈরাশ্য কিভাবে কাটানো যায়, কি বলে তাদের চাঙ্গা ও উৎসাহিত করা যায় তাই ভাবে। হঠাৎ এক উপস্থিত বুদ্ধি তার মাথায় আসে। বিষয়টাকে হালকা করার উদ্দেশ্যে গুরখা ও পরিতোষের দিকে চেয়ে বলে—এই ব্যাপার, তাতে ঘাবড়ে যাবার কি আছে? দাদারা হয়তো—নগরে রক্তপাত ও লোকক্ষয় এড়াবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। সে-যুদ্ধ জয়ের পর নগরে প্রবেশ সুগম ও সহজ হবে। সুতরাং নিরাশার কিছু নেই। তোমরা তাদের আরব্ধ কর্ম ও উদ্দেশ্য সাধন করে এই ঘোষণাপত্রগুলি জনে জনে ভাগ করে নিয়ে নগরবাসীদের পৌঁছে দাও। তাদের ঘরে দুয়ারে প্রাঙ্গণে, নগরের পথে পথে ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাও। এখন কয়েকদিন ঘরের বার হবে না। কিংবা এদিক মাড়াবে না। তারপর অবস্থা বুঝে বার হবে। গুরখা, পরিতোষ, তোমরা দাদাদের যুদ্ধের খবর—অস্ত্রাগার, পুলিশ লাইন দখল, টেলিগ্রাফ টেলিফোন আপিস ধ্বংস ইত্যাদি সংবাদ আমাকে বাড়িতে কিংবা আপিসে এসে জানাবে। আমি বাড়ি না থাকলে অপেক্ষা করবে না। তোমাদের জয় হোক। সুদেষ্ণা বিপ্লব জিন্দাবাদ বলে নারী বাহিনীর ধীরা সুধীরা বিনতাদের এবং বালবাহিনীর গুরখা পরিতোষ ও অন্যদের তার সামনে এসে দাঁড়াতে বলে। সকলেই কেমন যেন বিরস বিষণ্ণ। সুদেষ্ণা হাত তুলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে আশ্বাসের সুরে বলে—মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় আমাদের হবেই হবে। তারপর সামনে এগিয়ে কাউকে চুমো দিয়ে, কাউকে বা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে জড়িয়ে ধরে বিদায় দেয়। সুদেষ্ণা বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অন্ধকারে তাদের যাত্রা-পথের দিকে চেয়ে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে। বিগলিত ধারায় তার কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।



বিপ্লবের হাতেখড়ি—রেলপথ ও রেলগাড়ি ধ্বংস নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে চিরঞ্জীব আশ্রমে ফিরে মনের আনন্দেই রাতে ঘুমিয়েছে। অন্যদিনের তুলনায় পরদিন দেরিতেই তার ঘুম ভেঙেছে। বিছানায় বসেই বিগত-রাত্রির ঘটনাবলী এবং এতক্ষণে নগরে যে ভারতের প্রথম ব্রিটিশ-শাসন-মুক্ত এক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা মনে ক'রে হৃষ্টচিত্তে চিরঞ্জীব বাইরে আসে। নবপ্রভাতের নবীন সূর্যের নূতন আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। গাছের পাতাগুলি সোনার কিরণ মেখে ভোরের মৃদুমন্দ বাতাসে দুলে দুলে পরস্পর কানাকানি করে বুঝি স্বাধীনতার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাছে গাছে পাখির কূজনে, আকাশে বাতাসে চিরঞ্জীব বিপ্লবেব বিজয়-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে—তুলে ধর আজ বিজয় নিশান বজ্রকঠোর হাতে। বাগানের বেদীটার ওপর গিয়ে সে বসে। দলপতিদের নিকট থেকে পরবর্তী কর্মসূচীর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাকে এখানেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

বাগানের কাজ সেরে রঘু চিরঞ্জীবের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে—বৈরাগী ভাই, আমি ঘরের কিছু জিনিস-পত্র কিনতে বাজারে যাচ্ছি। তুমি এদিকটা দেখো। বেদী ছেড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আর কি কাজ বাকী তা দেখতে দেখতে চিরঞ্জীবের খেয়াল হয় যে, বেলা অনেক অথচ লোকজনের দেখা নেই। ব্যাপার কী? তবে কি রেলগাড়ি ধ্বংসের খবর ইতিমধ্যেই গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তা দেখতে সকলে ঐ দিকেই ছুটেছে। অনেক বেলায় কাজের লোকজন আসতে শুরু করেছে। তাদের মুখে একটা ত্রাসের ছায়া। চিরঞ্জীব কিছু জিজ্ঞাসা না করে কেবল কাজের তদারক করছে। রঘুও ফেরেনি। সেও কি তবে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর জেনে দেরি করছে? দুপুর গড়িয়ে যাবার পর রঘু এসে হাজির। তারও মুখ চিন্তা-ক্লিষ্ট। ঘরামিদের জিনিসগুলি বুঝিয়ে দিয়ে রঘু চিরঞ্জীবকে কোন জিজ্ঞাসার অবকাশ না-দিয়েই বলে—চলো, খেতে চলো। বাজার থেকে শুকনো খাবার, ফলমূল যা এনেছে তা নিয়ে লেংচা ঘরে ঢোকে। রঘু ও চিরঞ্জীব চান সেরে খেতে বসে। খেতে খেতে রঘু বলে—রেল ধ্বংসের ঘটনাটা অনেকের সম্বন্ধে

আলোচনা করা ঠিক নয়। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ঘোরালো এবং ভাবনার বিষয়। মালগাড়ি উল্টে পড়েছে, আগুন লেগেছে সত্যি কিন্তু তার সঙ্গে টেলিগ্রাফ টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে কেন। স্টেশনের ছোটবাবু বললেন আপ ডাউন কোন দিকের সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। ওদিকে পুলিশ থানা থেকে বেরোচ্ছে না। থানা ঘিরে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে, অথচ কিছু বলছে না। বাজারে দোকানীরা সন্ত্রস্ত—লুটতরাজের ভয় করছে। উত্তরে চিরঞ্জীব বলে—ঘটনাটা যা শোনালে তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক। লুটতরাজ একবার শুরু হলে তার শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে না। সুতরাং আমাদেরও সর্বক্ষণ হুঁশিয়ার থাকতে হবে। মনে মনে কিন্তু সে খুশী ও স্বস্তি অনুভব করে এই ভেবে যে, আর কিছু না রটে শুধু লুটতরাজের আশংকার কথাটাই রটেছে। কিন্তু রঘুর অন্য সংবাদ—স্টেশনের সঙ্গে আপ ডাউন কোন দিকেরই যোগাযোগ নেই—চিরঞ্জীবের মনে সংশয় জাগায়। তারা তো শুধু নগরের সঙ্গের যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন করেছে। তবে কি তাদের মতো আরেক দলকে অন্যত্র নাশকতা কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছিল? কিন্তু ঐ দলকে যদি তার সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে? রঘুর আশ্রমকে বিপ্লবীদের আস্তানা করা যাবে না। বর্তমানে নিতাইকে রাখবারই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেননা বিশালাক্ষী তলা থেকে বৈষ্ণবগণ একে একে প্রস্থান শুরু করেছে। যাই হোক এই সব গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজের দায়িত্ব পাওয়াতে সে খুবই খুশি। তার উপর নগর থেকে দলপতিদের পরবর্তী নির্দেশ যেকোন মুহূর্তে এসে যেতে পারে ভেবে সে উৎসাহে অধীর। মন তার আনন্দে নেচে ওঠে। ইচ্ছা হলো একতারাটা নিয়ে নেচে নেচে গায়—শোনরে ভাই শোনহ সকলে, কংসকে ধ্বংস করতে কৃষ্ণ এলেন মথুরাতে।

বেলা পড়ে আসছে—গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়ায়। রঘুকে ঘরের বাকী কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ঝোলা কাঁধে একতারাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। দীঘির পাড় ধরে মাঠে নেমে পুব দিকে বিশালাক্ষী গাছ বরাবর হাঁটতে থাকে। তার মনে কেবল এক চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে—নিতাইকে রাখবার কি ব্যবস্থা হবে? তার উপর যদি অপর দিকের রেলপথ ধ্বংসকারীদের রাখবার ভার তার ওপর এসে পড়ে তবেই চিন্তির?

দূর থেকে দেখে গাছতলাটা বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের প্রস্থান। মনে হলো

[illegible] বৈরাগীই এসে ওখানে জড় হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার কী? কোন গান বাজনা, হৈ-হল্লোর নেই—কেমন যেন থমথমে ভরাস ভাব। বুঝলো ঐ লুটতরাজের গুজবই তাদের একত্রজোট ও নিরুৎসাহ করেছে। সুতরাং তাদের মনে উৎসাহ যোগাতে চিরঞ্জীব দূর থেকেই একতারাটা নিয়ে নেচে নেচে গাইতে গাইতে এগোয়:

শোনরে ভাই শোন দিয়া মন।
ভয়ের নেইকো কারণ॥
দুষ্টের দমন শিষ্ট-পালনের তরে।
যুগে যুগে আবির্ভূত ভগবান হন ধরাধামে॥
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে॥

গাছতলায় এসে দাঁড়াতেই চারদিকে বোষ্টম বোষ্টমীর সে কি ভিড়! হঠাৎ এক বোষ্টমী ভিড় ঠেলে কাছে এসে বলে—হ্যাঁগা, তুমি সেই প্রেমদাস বৈরাগী না? মনে পড়ে একদিন দুইরাত রেল স্টীমারে এক সঙ্গে ছিলাম। স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই নিমেষে না-পাত্তা হয়ে গেলে! তা, এদ্দিন কোথায় ছিলে? আমি তো এ-তল্লাটে ঘুরিফিরি। তোমায় তো দেখিনি। কোথায় থাকো?

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। চিরঞ্জীব বৈষ্ণবীকে চিনতে পারে। হোঁতকা ভুঁড়িওয়ালা গোপালদাস বোষ্টমের দলের বোষ্টমী। পাছে সে বেচাল কিছু করে কিংবা বেফাঁস কিছু বলে তাই চিরঞ্জীব নিরুত্তর থেকে আবার গান ধরে:

আমি এক বাউল দেওয়ানা
হেথায় থাকি হোথায় যাই
চলি ফিরি গান গাই
মোর নাইকো ঠিকানা।

গাইতে গাইতে চিরঞ্জীব ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যায়। পেছনে বোষ্টমীর গলা শুনতে পায়—প্রেমদাস, প্রেমদাস। বুঝলো কমলি ছোড়তা নেহি। সে আর পেছনে তাকায় না। চলার গতি বাড়িয়ে নিতাই-এর আসনের সামনে দিয়ে রাধামাধব, রাধামাধব বলতে বলতে গাছতলা ছেড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

চিরঞ্জীব নির্দিষ্ট জায়গায় এসে নিতাই-এর জন্য অপেক্ষা করে। সন্ধ্যা-

রাতেই রাস্তায় লোক চলাচল একরকম নেই বললেই চলে। সকলেই লুঠেরাদের ভয়ে তটস্থ। ওদিকে শহরের খবর কি? ২৪ ঘন্টা হতে চললো। সেখানে কি ঘটেছে বা ঘটছে তাও কিছু জানতে পারছে না। বিষয়টা ক্রমেই ভীষণভাবে তাকে ভাবিয়ে তুলছে। এদিকে নিতাই-এর দেখা নেই। তার আবার কি হলো? তবে কি গাছতলা দিয়ে আসবার কালে নিতাই তার আসনে আছে কিনা তাড়াহুড়ায় তা লক্ষ্য করেনি? না, সব কিছুই যেন কেমন এলোমেলো গোলমেলে ঠেকছে। নিতাইয়ের জন্য আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সে বাজারের দিকে রওনা দেয়। যদি সেখানে তার দেখা মেলে। সেই সঙ্গে বাজার-গপ থেকে হাল-খবর কিছু আঁচ করা যাবে। বাজারে পৌঁছে দেখে অধিকাংশ দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ। অল্প দোকানেই আলো জ্বলছে। পরিচিত একটা দোকানে ঢুকতেই দোকানী অভ্যর্থনা জানায়—আসুন, আসুন, বসুন, অনেকদিন পরে এলেন। দেখছেন তো অবস্থা—সাঁঝ হতে না হতেই সব ভোঁ ভোঁ। একজন খদ্দেরও নেই—সকলেই জুজুর ভয়ে ভীত। আরে, লুটতরাজ যদি হবে তাহলে রেলগাড়ি রেললাইন ধ্বংস করার সঙ্গে টেলিগ্রাফ টেলিফোন তার কাটার কিবা প্রয়োজন। পুলিশ বেটারাও ভয়ে জবুথবু, থানা থেকে মোটেই বেরোচ্ছে না। ফলে জনসাধারণের মনে আরো ত্রাস ঢুকেছে। তবে আমার সোজা কথা—এ লুটতরাজের ব্যাপার নয়—এর পেছনে অন্য কোনো গভীর চক্রান্ত আছে। দেখবেন ২।১ দিনের মধ্যে সব খোলসা হবে। ওরে হরি, গোঁসাইজীকে খাবার দে।

চিরঞ্জীব কিছু শুকনো খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চলতে চলতে সে দোকানীর শেষ কথাটা কিসের ইংগিত তা বুঝবার চেষ্টা করে। ক্রমেই সে অস্থির উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠছে। একে শহরের কোন খবরই নেই তার ওপর নিতাই না-পাত্তা। একবার ইচ্ছা হলো সরাসরি আশ্রমে চলে যায়। পরক্ষণেই বিশালাক্ষী হয়ে নিতাই-এর খোঁজ নিয়ে যাওয়া উচিত মনে করে সে ঐদিকেই হাঁটতে থাকে। ঘোর অন্ধকার। রাস্তার উভয় দিকের জঙ্গল তাকে আরো গাঢ় করেছে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখা না গেলেও তার মনে হলো কিছু দূরে ছায়া মতো কি যেন চলেছে। জন মনুষ্য হীন রাস্তা—এত রাতে ও কিসের ছায়া। মানুষের আকৃতি বলেই তো মনে হলো। চিরঞ্জীব সন্তর্পণে [illegible] টর্চের আলো ফেলতেই মনে হলো দুই মূর্তি [illegible] হলো।

মূর্তি দুটোকে যেখানে দেখা গেছে চিরঞ্জীব দ্রুত সেখানে এসে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলে কিছু দেখতে পায় না। এমন কি ঝোপঝাড় থেকে কোনো নড়াচড়া কিংবা খচ্‌খচ্‌ শব্দ কানে আসে না। নিজের চোখকে সে কি করে অবিশ্বাস্‌ করবে। টর্চ-এর আলোতে দুই মূর্তি তার নজরে এসেছে। তবে কি এরা জঙ্গলের আড়ালে মিশে গেলো। আশ্চর্য এদের লুকোবার ক্ষমতা। হয় এরা পুলিশের গুপ্তচর অথবা চোর, নয়তো বিপ্লবী দলের কেউ। শেষোক্তদের কথা মনে হতেই তার ভাবনা ভিন্ন খাতে বয়ে চলে।—তবে কি ওরা সেই রেল-পথ ধ্বংসকারী বিপ্লবী দল। কর্ম-অন্তে তারা কোথায় যাবে এমন নির্দেশ অবশ্যই দেওয়া আছে। সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। বিশেষত পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য দলের কোড নং যখন তার জানা নেই। সুতরাং সে আর দাঁড়ায় না। একতারাটা নিয়ে গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে গাইতে চলতে থাকে :

কালিয়া দমন করে
কৃষ্ণ চলেন মথুরায়।
কংসের নিধনে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে॥

হঠাৎ পেছন থেকে—ও বৈরাগী ভাই, ডাক শুনে চিরঞ্জীব থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে টর্চ জেলে অবাক। আগের দেখা সেই দুই মূর্তি। রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—কি চাও।

—আমরা তীর্থযাত্রী, বহুদূর থেকে হেঁটে আসছি। এ জায়গাটা সেরকম চেনা জানা নেই। তাই আপনার সঙ্গ নিলাম।

তাই যদি, তাহ'লে আগে আমার টর্চের আলো দেখা মাত্রই পালালে কেন?

—এখানে আসবার পথে শুনলাম লোকজন রাত্রে রাস্তায় বার হয় না। কিসের ভয়ে সকলে তটস্থ জানি না। তাই এত রাতে নির্জন পথে আচমকা আলো দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য আত্মগোপন করলাম। আপনার গান শুনে বুঝলাম, আপনি আমাদের মতোই এক পথিক। তাই ডাকলাম।

—হুঁ, বলেই চিরঞ্জীব হাঁটা শুরু করে। ঐ দু'জন ও তার পেছনে [illegible] পেছনে [illegible]

বলে—তোমরা এখানে দাঁড়াও 'কেউ না আসা অবধি যাবে না, সাবধান! কথা শেষে অনুসরণকারীদের কোন জিজ্ঞাসাবাদের অবকাশ না দিয়েই চিরঞ্জীব অন্ধকারে মিশে যায়।

উভয়েই হতভম্ব। বোষ্টম হলে কি হবে? চেনা জানা নেই, যদি কোন বদমতলব থাকে! বলা তো যায় না, যে ভাবে না বলে কয়ে ছুট করে চলে গেলো! সাবধানের মার নেই! সুতরাং নিজেরা পরামর্শ করে দু'জনে রাস্তার দুই দিকে অন্ধকারে ঝোপের ধারে ঘাপটি মেরে থাকে। তাদের খোঁজে যেই আসুক দেখা মাত্র দু'দিক থেকে দু'জনে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে তাকে ঝাপটে ধরবে তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।

গাছতলার দিকে চলতে চলতে চিরঞ্জীব রাস্তায় রেখে-আসা আগন্তুক দু'টিকে বিপ্লবী দল-ভুক্ত ও রেলের নাশকতা সাধন করে ফিরছে বলেই মনে হয়েছে। কেননা তাদের চোখের নিমেষে অন্তর্ধান এবং আচম্বিতে আবির্ভাবের রকমসকম ও কথাবার্তার ধরণ ধারণ ঐ সাক্ষ্যই বহন করছে। সুতরাং নিতাইকে তাদের নিকট পাঠালে সে অবশ্যই তাদের চিনবে। তাছাড়া শহর থেকে দলের বিধায়কদের পরবর্ত্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এদের পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। গাছতলায় পৌঁছে দেখে সেই একই চিত্র—ধোঁয়ার আবরণে চোখে জ্বালা ধরে, লোক চেনা কঠিন। এখানে ওখানে জটলা, আবার গানবাজনাও চলেছে। তবে এত লোকের সমাবেশে হৈ হুল্লোড় তুলনায় কম। নিতাই তার আসনে আছে দেখেই চিরঞ্জীব তার সুমুখ দিয়ে রাধামাধব বলে কিছুদূর গিয়ে দিক পরিবর্ত্তন করে হাঁটতে থাকে। নিতাই কাছে আসতেই তাকে ঘটনাটার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে ব্যক্তিদ্বয় কোথায় আছে তা বলে চিরঞ্জীব আশ্রমাভিমুখী রওনা দেয়।

নিঃসীম অন্ধকার, নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তর। শহরের খবর না পাওয়ায় চিরঞ্জীব অস্থির ও উন্মনা। রাত্রি কত অনুমান করতে সে ঊর্দ্ধপানে চায়। আকাশ-ভরা তারার মেলা। হঠাৎ একটা নক্ষত্র কক্ষ-চ্যুত হয়ে আকাশের এদিক থেকে ও-দিকে ছুটে বিলীন হয়ে যায়। উল্কাপাত! এ যে কি এবং কেন ঘটে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সে ওয়াকিবহাল। আজকের ঘটনাটা তার বিচার বুদ্ধিকে বুঝি [illegible] করে। [illegible]

না। অধিকন্তু একে এক মহা অমঙ্গলের ছায়াপাত ও অশুভ ইংগিত ভেবে সে মনের ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। দ্রুতপদে মাঠ পেরিয়ে আশ্রমে পৌঁছে। লেংচা তখনও তার অপেক্ষায় দুয়ারে বসে। তাকে শুতে যেতে বলে চিরঞ্জীব খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না, দুশ্চিন্তা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু কেন? তার সঠিক ব্যাখ্যাও করতে পারছে না। শহরের খবরের জন্য এতটা অস্থির ও উদ্‌গ্রীব হওয়ার কোন কারণ নেই। চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সুতরাং সেখানের খবর পেতে বিলম্ব অনিবার্য। আগামীদিন অবশ্যই ভালো খবর আসতে পারে। ইতিমধ্যে এখানের কাজকর্ম সেরে ফেলা জরুরী। এভাবেই নিজেকে প্রবোধ দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরে লেংচার ডাকে তার ঘুম ভাঙে। চোখ মেলে দেখে রোদের আলোতে ঘর ছেয়ে গেছে। এত বেলায় ঘুম ভাঙা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ, সুতরাং ঘটনাটা তার মনে দাগ কাটে। ঘর থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঘরের আর কি কি কাজ বাকী তা দেখে সে বাগানে রঘুর নিকট যায়।

রঘু তাকে দেখে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করে—কি ভাই, শরীর খারাপ?

—না না, কাল রাত করে শুয়েছি, তাই এত দেরি। যাকগে, ঘরের মালপত্র সবই তো এসেছে দেখছি। তৈরি কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। যতশীঘ্র সম্ভব এটাকে একটা খাঁটি জন-সেবা-কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

ইতি মধ্যে রাখাল এবং জনমজুররা সব এসে গেছে। কাজ শুরু হয়েছে। চিরঞ্জীব তদারক করছে। কিন্তু বড়-মিস্ত্রি সবির তখনও গর-হাজির। সে এসে তার দেরির কারণ প্রসঙ্গে বলে—আসবার পথে দেখি লোকজন সব রেললাইনের দিকে ছুটছে। কি ব্যাপার? আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি এলাহী কাণ্ড। রেললাইন পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। অনেক লোকলস্কর রেললাইন সারাতে ব্যস্ত। পুলের ওধারে দেখি কপিকল সহ একটা রেলগাড়ি। সেটা থেকে ঝনঝন্ শব্দে শেকল নামছে আর উঠছে। পুলের নিচে নালায় উবু হয়ে পড়ে থাকা ইঞ্জিনটাকে তোলবার চেষ্টা চলেছে। পুলিশ কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম।

হাবভাব কথাবার্তায় তা যাতে বিন্দুমাত্র প্রকাশ না পায় সে-বিষয়ে সে খুবই সাবধান ও সতর্ক হয়। ইতিমধ্যে সব্বিরের মুখের খবর সকলের কানেই পৌঁচেছে। রঘু শুনে বলে—যাক পুলিশ যখন বেরিয়েছে তখন লুটতরাজের ভয় থেকে রেহাই পেয়ে লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে—কি বলো ?

—হ্যাঁ। তা যা বলেছ। লোকে যে কি ভয় পেয়েছিলো। সন্ধ্যা হতে না হতেই রাস্তাঘাট জনমনুষ্যহীন—দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ। যাক, জুজুর ভয় তো কেটেছে। আমি বেরোচ্ছি। ঘর থেকে ঝোলা নিয়ে বেরুবার মুখেই রঘু বলে—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ভাই। পুব পাহাড়ের ধারের ভাসনা গাঁও থেকে রমজান এসেছিলো তোমাকে নিতে। তার বিবি পুকুরঘাটে আছাড় খেয়ে হাঁটতে পারছে না। চিরঞ্জীব ঘরে ফিরে বাক্স থেকে কিছু ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তার মন হতাশায় ভরা। বিপ্লব সফল হলে শহর থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন লোকলস্কর সহ আসতে পারতো না। বিপ্লবীরা যুদ্ধে হেরে হয় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে নয়তো পিছু হটেছে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পুনরায় শত্রুর মোকাবিলা করবে। সে এখন কি করবে ? তার মনে-গড়া স্বাধীনতার স্বপ্ন-সৌধ কি এভাবেই ভেঙে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে সে পুব-পাহাড়ের দিকে চলেছে। পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলি তার নখদর্পণে। এখানকার দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবিকার একমাত্র উপায় পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করা। ফলে দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটে এবং চিকিৎসার জন্য তার ডাক পড়ে। গ্রামের লোকজন তাকে আদর ও ভক্তিশ্রদ্ধা করে। রমজানের বাড়ি পৌঁছে সে হতভম্ব। ফকির ওঝার নানা এলাজ চলেছে আর সমানে তার বিবির কেবল উঃ আঃ শুনতে পাচ্ছে। রমজান তাকে দেখেই বলে—এসো দাদাভাই। চলতে চলতেই চিরঞ্জীব বলে আছাড় খেয়ে তোমার বিবির পা ভেঙেছে নয় মচকেছে। এতো ডাক্তারের ব্যাপার। ফকির ওঝা কি করবে ? ভূত পেত্নীর ভয় তো নয়। এখন ঘটনা বলো—কোথায় আছাড় খেয়েছে, কিভাবে পড়েছে। রমজানের কথা শুনে চিরঞ্জীব বলে, চলো বিবিজীকে দেখি। বিবির কাছে গিয়ে সে কিভাবে পিছলে পড়েছে তা শুনে পা-টা পরীক্ষা করে বুঝলো গোড়ালিটা মচকেছে। ওখানটা কিছুটা ফোলা। তারপর কিভাবে চিকিৎসা [illegible] [illegible] বলে—পা-টাকে [illegible] গরম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

জলে ভিজোবে। এই প্রক্রিয়া কমসে-কম দিনে দু'বার করবে। তারপর কোঁড়া জায়গাটায় এই মলমটা লাগিয়ে তুলো দিয়ে বেঁধে রাখবে। আর দিনে দু'বার করে এই বড়ি জল দিয়ে গিলে খাবে। দু'দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। না কমলে আমাকে খবর দিও বলেই চিরঞ্জীব উঠে পড়ে।

পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধরেই চিরঞ্জীব বিশালাক্ষীর দিকে চলেছে। মনে পড়ে এখান দিয়েও সে একদিন মহারাজ-এর সঙ্গে গিয়েছে। তিনি অদূরের পাহাড়ের চড়াই উৎড়াই গুলি মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে চলেছেন। মাঝেমাঝে তিনি জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করে কিসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তারপর ডাকবাংলোর টিলার পাশের রাস্তা ধরে তিনি তাকে নিয়ে অনেকদূর অবধি গিয়েছিলেন। পাহাড়ের উপরে উঠে, গাছে চড়ে নানাভাবে ঐ অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করেছেন। মহারাজ-এর উদ্দেশ্য সেদিনও তার কাছে যেরূপ অজ্ঞাত ছিলো এখনো তদরূপ। তবে পাহাড়ে, পর্বতে ও জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তার খুবই ভালো লেগেছে। সে সময়ে কেন জানি তার মনে হয়েছে পথ প্রান্তর ছেড়ে পাহাড়ের দুর্গম অরণ্যে ঘাঁটি গেড়ে ব্রিটিশ শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালালে তাদের অনেক বেশী ঘায়েল করা এবং পরিণামে তাদের হটিয়ে দেওয়া খুবই সম্ভব। পর মুহূর্তেই তার মনে হলো মহারাজ যদি সদলে শহর থেকে সরে গিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তিনি অন্য কোথাও ঘাঁটি করেছেন। তদনুরূপ সেও এখানে এই পাহাড়ের জঙ্গলে একটা যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরি করবে। সেখানে থেকে সে সংগোপনে বিরামহীন খণ্ড যুদ্ধ চালাবে। মহারাজার সাক্ষাৎ পেলে ভালো না হলেও কুছ পরোয়া নেই। সে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তার মনের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা-বোধ দূর হয়ে যায়। মনকে আশ্বস্ত করে—মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধে নৈরাশ্য ও হতোদ্যমের অবকাশ মাত্র নেই। গাছের ফাঁকে ঊর্ধ্বে চেয়ে সে বিশালাক্ষীর দিকে তড়িঘড়ি হাঁটতে থাকে।

গাছতলায় পৌঁছে দেখে নিতাই নেই। বেলা অনেক হয়েছে। এখানে তার জন্য অপেক্ষা না করে একবার ডাক-বাংলো ঘুরে আসা যাক। চৌকিদারের ছেলেকেও দেখা হবে এবং হাদের সংবাদও পাওয়া যাবে। সেখানে পৌঁছে দেখে দুই সাদা-পোষাকের আর্দালি বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। আসগর, কাশেম ও গফুর কান্ত—ছুটোছুটি করছে। গফুর [illegible]—[illegible]। [illegible]

একটু হাঁটা-চলাও করছে। চলো, দেখবে চলো। গিয়ে দেখি গফুর ঠিকই বলেছে।—ওষুধের আর দরকার নেই, বলে উঠে পড়ি। গফুর বাধা দেয়। —এই ভরদুপুরে তোমাকে আমি কিছু না খাইয়ে ছাড়তে পারি? বসো, বলেই সে বেরিয়ে যায়। একগ্লাস শরবৎ ও কিছু কাটা ফল নিয়ে এসে একটা টিপয়-এর ওপর রেখে বলে—শহর থেকে রেললাইন সারাবার তদ্বির তদারক করতে দুই বড় ইঞ্জিনীয়ার মোটর করে এসেছে। তাদের আর্দালির কাছে যা শুনলাম সে তো এক সাংঘাতিক পেল্লায় কাণ্ড! স্বদেশীওয়ালারা নাকি সাহেব, মিলিটারি ও পুলিশের সঙ্গে জোর লড়াই করে তাদের মেরেধরে অস্ত্রশস্ত্র লুট করে সব আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। তারপর শহর দখল করবার জন্য তোড়জোড় করছে। রেললাইন ধ্বংসও নাকি ওদের কাজ। ফলে মালগাড়ি পুল ভেঙে উল্টে পড়েছে। বাইরে থেকে অনেক গুর্খা সৈন্য আসছে। রেলপথ সারানো হলেই শহরে পৌঁছে ওদের মোকাবিলা করবে।

জব্বর খবর শোনালে! এই ব্যাপার, অথচ লোকজন লুটতরাজের ভয়ে জুবুথবু—সন্ধ্যার পর আর বার হয় না। দোকানী দোকানের ঝাঁপ খোলে না। যাক্ জুজুর ভয় যে কেটেছে তাতেই আমি খুশি। আশ্রমের কাজে বড় ব্যস্ত আছি। একটা সেবা-কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। লোকজনের চিকিৎসা হবে, ওষুধপত্র থাকবে। প্রয়োজন হলে রোগী রাখা হবে। ঘর তৈরির কাজ শেষ। সময় করে একদিন এসো। কখন কোথায় থাকি যাই, তার তো কোন ঠিক নাই। খোদা হাফেজ, বলে সে রওনা দেয়। গাছতলায় এসে দেখে নিতাই নেই। তবে কি ঐ দু'জনকে নিয়ে খেতে গেছে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেছে—এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ উকিঝুঁকি দিচ্ছে। তবে কি তাকে না-জানিয়েই ওরা চলে গেলো? গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে চিরঞ্জীব বাজারের দিকে এগোয়। নিতাইকে নিয়ে যে দোকানে খাবার খেতো সেখানে গিয়ে কিছু খাবার দিতে বলে সে বসে পড়ে। ছোকরা খাবারের সঙ্গে একটা চিরকুটও টেবিলে রাখে। চিরকুটখানায় লেখা ঈশ্বরের ইচ্ছায় চললাম। যাক, তার এতক্ষণের উদ্বেগ ও অশান্তির অবসান হলো। সেইসঙ্গে এদের সহযোগিতায় যে গুপ্ত লড়াইয়ের ছক সে মনে মনে এঁকেছিলো তারও আজ সম্ভাবনা পিছিয়ে গেলো। তাই বলে কি সে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?

কখনও নয়—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। বেরোবার মুখে দোকানি হাঁক দেয়—বৈরাগী ভাই চললে নাকি ?

—হ্যাঁ, আশ্রমের কাজে বড় ব্যস্ত। একটা সেবা-কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে রোগীদের চিকিৎসার জন্য। জনমজুর খাটছে।

—খুব ভালো, পর-সেবা পরম-ধর্ম। পুণ্যের থলি তোমার ভরে উঠছে। কিন্তু সংসারের হাল খবর তো রাখা দরকার। এদিকে তো রাম-রাবণের যুদ্ধ—লঙ্কা দহন হচ্ছে। শুনেছ ?

—এসবের জন্যই তো দাদা সংসার ছেড়েছি। সে বড় নোংরা জায়গা, বলেই হেঁয়ালী কণ্ঠে ছড়া কাটতে কাটতে বেরিয়ে যায়—

সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার
দু'কূল ভাসাইল। ফিরিল তরীর মুখ
মৃদু আর্তনাদে কাছিতে পড়িল টান।

চৌকিদার ও দোকানীর মুখে শহরে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ একই রকমের—সামান্য হেরফের মাত্র। এ সময়ে সে যদি মহারাজ-এর সঙ্গে থাকতো তাহলে সেও তো যুদ্ধে লিপ্ত হতো। দু'গাড়ি সৈন্য যাচ্ছে। এদের যদি কোনোরকমে রুখতে পারতো! হায় সে ঢাল তলোয়ার বিহীন এক নিধিরাম সর্দার! তার না আছে বেললাইন ধ্বংস করবার যন্ত্রপাতি না আছে অস্ত্র যা দিয়ে চলন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে দূর থেকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে সৈন্যদের ঘায়েল করা যায়। একটা রাইফেল থাকলেও না হয় সে চেষ্টা করতো। সামান্য একটা পিস্তল নিয়ে দূর থেকে কিছুই করা যায় না। এক করুণ অসহায় অবস্থা। যে আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে সে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে তাতে বুঝি এগিয়ে আসছে নিরাশা ও আশংকার ছায়া। আশ্রমের পথে চিরঞ্জীব এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছে। দিনের শেষে অস্তগামী তির্যক সূর্যরশ্মি আকাশের গায়ে সচল অচল মেঘে নানা রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে আর পুবের পাহাড় শোণিত রঙে রাঙা করেছে। তাতে যেন কোন আশার আলো নেই। শুনতে পাচ্ছে কেবল আকাশ-ভরা বেলা-শেষের এক বিষাদ-ঘন করুণ সুর। দীঘির ধারে পৌঁছেই চিরঞ্জীব মনের ক্লৈব্য নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে। ছি ছি, এসব সে কি ভাবছে! স্বাধীনতা তার দিবসের চিন্তা রাতের স্বপ্ন। স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বল তোরণে পৌঁছবার জন্য আবার সে নতুন করে শপথ নেয়—



বিপ্লবী বাহিনী অরণ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। বিগত রাত্রির যুদ্ধবিগ্রহ তার উপর ভারি সমর-সম্ভার নিয়ে এতটা পথ হেঁটে সকলেই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসা কাতর। সুতরাং আপাতত পাহাড়ের মধ্যদেশে একটা জায়গা অবস্থানের জন্য বেছে নিতে হয়। পাহাড়ে উঠবার মুখে একটা ঝরনা থেকে সকলে আকণ্ঠপুরে জল খেয়ে যার যার বোতল ভরে নিয়ে নেয়। অতঃপর বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের নির্বাচিত স্থানে পৌঁছে পথে সংগৃহীত ফলাদি আহারের পর অধিনায়কদের আদেশ মতো বাহিনীর সকলেই শুয়ে পড়ে। ব্যতিক্রম দেবযানী ও সুবোধ। ঘুরে ঘুরে শিবির পাহারা দেবার জন্য তারা আদিষ্ট। এ পাহাড়িয়া অঞ্চলে গরু ছাগল চরাবার, ঘাস ও কাঠ সংগ্রহের জন্য কৃষকদের আনাগোনা হয়। বাহিনীকে তাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অগোচরে রাখার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্দেহজনক কিছু নজরে এলেই তৎক্ষণাৎ সেনাধ্যক্ষের গোচরে আনার এবং প্রয়োজনবোধে সন্দেহভাজনকে বন্দী করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিবিরের অন্যত্র বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী যুদ্ধের কলাকৌশল এবং নগর আক্রমণ কিভাবে করা যায় তা নিয়ে সেনাধ্যক্ষ ও ও প্লাটুন কমাণ্ডারদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। তারপর মহারাজ অনুতোষকে নিয়ে অনুসন্ধান কার্যে (Scouting)-এ বেরিয়ে যান। ছাউনির চতুর্দিকে বৃত্তাকারে দেবযানী ও সুবোধের অবিশ্রান্ত টহলদারি চলেছে। এমনি সময় পাক নিয়ে চলতে গিয়ে দেবযানী অদূরবর্তী জঙ্গলে খস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনতে পায়। সে উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর জঙ্গলের ধারে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে চায়। ছোট ছোট গাছপালা লতাপাতা ভর্তি ঘন জঙ্গল। কোনো চাষাভুষো এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসবে কেন? পুলিশের গুপ্তচর হলে হামাগুড়ি দিয়ে আসতো সেক্ষেত্রে গাছপালা নড়তো। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও নয়। তবে জানোয়ারটা কী? সরীসৃপ না অন্য কিছু? কিন্তু

হলে দুর্ভাবনারই কথা। কেননা ছাউনিতে সব নিদ্রাচ্ছন্ন। হঠাৎ বেরিয়ে কোন বিপত্তি ঘটাতে পারে। সুতরাং ওটাকে জঙ্গল থেকে বের করে আনার মতলব এঁটে দেবযানী কতগুলি বড় বড় পাথরের টুকরো জড় করে। সুবোধ টহল দিয়ে আসতেই তাকে বড় বড় দু'খানা লাঠি কেটে আনতে বলে। সুবোধ লাঠি নিয়ে আসতেই একখানা নিজে নিয়ে অন্যখানা সুবোধকে দিয়ে তাকে তার বিপরীত দিকে জঙ্গলের ধারে দাঁড়াতে বলেই দেবযানী বড় বড় পাথরের টুকরো গুলি জঙ্গলের মধ্যে যেখানে খস্‌খস্ শব্দ হচ্ছে সেদিকে তাক করে ছুঁড়তে থাকে। খস্‌খস্ শব্দ ক্ষণেকের জন্য থেমে থাকার পর আবার শোনা যায়। সেই সঙ্গে গা সিরসির করা একটা অস্পষ্ট শিসও কানে আসে। সাপ হলে ফোঁস ফোঁস করতো, এতো তা-ও নয়। তবে জানোয়ারটা কী? দেবযানীর প্রচণ্ড কৌতূহল জাগে। ওটাকে জঙ্গল থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টায় পাথর ছোঁড়ার সঙ্গে সুবোধকে লাঠি দিয়ে দমাদম্ ওদিকের জঙ্গল পেটাতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল জন্তুটা সড়সড় করে তাদের দিকেই এগোচ্ছে এবং গা-সিড়সিড়-করা শিস্ মাঝে মাঝে কানে বাজছে। হঠাৎ দেবযানীর নজরে আসে—তারই অনতিদূরে জঙ্গল থেকে কিছু একটা বেরোচ্ছে। গলাটা বার হতেই দেবযানীর মনে হলো একটা সাপ। আরো বার হতেই দেখে একটা অজগর—আকারে বিরাট ও পেট-ফোলা। জঙ্গলের মধ্যে হয়তো কোনো জন্তু গিলছিলো। সুবোধকে আর আটকে না রেখে দেবযানী নিজেই দূরত্ব বজায় রেখে অজগরটার পিছু নেয়। ওদিকে সাপ দেখেই গাছে গাছে পাখির কিচির-মিচির শুরু হয়েছে। হঠাৎ একটা বাজ পাখি ছোঁ মারতেই অজগরটা মাথা তুলে দিক পাল্টে ছাউনির দিকেই চলতে থাকে। দেবযানী প্রমাদ গোনে। ওটাকে তো আর এগোতে দেওয়া যায় না। কাউকে ডাকবে এমন সময়ও পায় না, সুতরাং পিস্তল তুলে নির্ভুল লক্ষ্যে পরপর দুটো গুলি ছোঁড়ে। গুলি খেয়ে অজগরটা মাথা তুলে ছটফট করে উল্টেপাল্টে নেতিয়ে পড়ে। আর নড়ে না। গুলির শব্দে শিবিরের অনেকেরই নিদ্রাটুটে যায় কিন্তু সেটা কোথায় হলো তা ঠাহর হয় না। সুবোধ দৌড়ে আসে। বড়দাও শব্দ লক্ষ্য করে উপস্থিত হন। ক্রমে ক্রমে অনেকেই এসে জড়ো হয়। মহারাজ ও অশুতোষ মুড়ি ভর্তি খাবার নিয়ে এসে উপস্থিত। বিরাটাকার মৃত অজগরটাকে দেখে সকলেই

একবাক্যে দেবযানীর সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে।

শিবিরের আহার-পর্ব শেষ। বাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে অধিনায়কদের বর্তমান পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণের পরে এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে শহরের নিকটবর্তী অন্য পাহাড়ে শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ রেল চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। ফলে ইংরেজ তার শক্তি সংহত করবার ফুরসত পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতেই শহর আক্রমণ করে দখল করবার সুবর্ণ সুযোগ। শুভস্য শীঘ্রম্—বন্দেমাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সভা শেষ। এই ঘাঁটি ছেড়ে অন্যত্র গমনের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের সংবাদে বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মুহূর্তেই কণ্ঠপাকড়ি শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করবার উদগ্র বাসনা জাগে।

সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের অন্তরালে অন্তর্হিত। দিনের শেষ আলোটুকু শুষে নিয়ে রাত্রি তার কালো-ছায়া ক্রমে ক্রমে বিস্তার করে পৃথিবীকে গ্রাস করছে। বিপ্লবী বাহিনীর সমস্বরে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি তুলে রাতের অন্ধকার চিরে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। শুরু হয় অন্ধকারে অচিন বন্ধুর দুর্গম গিরিপথে বিপ্লবীদের পদযাত্রা। আগে পিছে মশাল হাতে পথ প্রদর্শক মধ্যখানে বাহিনী উঁচু নিচু এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠে কখনো বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, কখনো বা সাথী হো হুঁশিয়ার, আজাদীকা ডঙ্কা বাজাও উঠাও অগ্নি-ধ্বজা, সাথী হো হুঁশিয়ার। এইভাবে চলে চলে তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে—পাহাড়েব পাদদেশে এসে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্লাটুন কমাণ্ডাররা নিজ নিজ পল্টন পরিদর্শনের পর বিশ্রামের আদেশ দেয়। সৈন্যগণ জঙ্গলের মধ্যে যে যেখানে পারে শুয়ে বসে পড়ে। সকলেই নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বিগ্ন। তাদের মুখাবয়ব উৎসাহে উদ্দীপ্ত, মশালের লাল আভায় জ্বল জ্বল করছে তাতে যেন লেখা—দুর্গম গিরি কান্তার মরু···লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

ইতিমধ্যে বাহিনীর অধিনায়কদের বৈঠকে স্থির হয় যে সৈন্যদলের এখনই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সানুদেশের কোথাও সরিয়ে নেওয়া দরকার। কেন না ভোর হতে না হতেই এ অঞ্চলে কাঠুরিয়া ও চাষা-ভূষার আনাগোনা

শুরু হয়। ফলে এক সঙ্গে এতগুলি সশস্ত্র লোক তাদের নজরে এলেই নানা গুজব নানা কাহিনী পল্লবিত হয়ে শত্রুপক্ষের কানে পৌঁছনো অসম্ভব কিছু নয়। বিপ্লবীদের পক্ষে তা হবে মারাত্মক ক্ষতিকারক। পুবাকাশ উজ্জল হচ্ছে। সেই সঙ্গে আকাশের তারারাও ক্রমে বিলীয়মান। রজনী তার কালো আঁচলখানি গুটিয়ে নিয়ে সরে যাচ্ছে। গাছে গাছে পাখির কলতানে উষা-লগ্নে এবড়োখেবড়ো পিচ্ছিল পথে শুরু হলো বাহিনীর পর্বতারোহণ।

বিপ্লবের তৃতীয় দিন। দেবযানী বাহিনীর পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলেছে। ভয় ভাবনা দুঃখ ক্লান্তি শ্রান্তি সব কিছুই যেন সে জয় করে নিয়েছে। অন্তর তার তৃপ্তি ও আনন্দে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যাকে সে হৃদয়ের সমুদয় প্রেম প্রীতি ভালোবাসা অর্পণ করেছে সে অনুক্ষণ তার দৃষ্টিপথে রয়েছে। সহচারী না হলেও বিচ্ছেদের ভয় নেই। জীবনে কিংবা মরণে সে বন্ধন অটুট অক্ষয় থাকবে। চলতে চলতে মহারাজ পেছনে তাকিয়ে হয়তো পথশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যেই সহাস্যে দেবযানীকে আচম্বিতে জিজ্ঞাসা করেন—দিদি, বীরাঙ্গনা অর্থ কী? মহারাজ-এর আকস্মিক প্রশ্নে দেবযানী থতমত খেয়ে পরমুহূর্তেই উত্তর দেয়—সমাস অনুযায়ী বীর অঙ্গনা—বীরাঙ্গনা, বীরনারী।

—বাঃ বাঃ, একটা উদাহরণ দাও তো দিদি। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব—ঝাঁসীর রানী, লক্ষ্মী বাঈ।

—সাধু সাধু, চমৎকার। স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সেই বীর রমণীর প্রাণ বিসর্জন—ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নেই। অদূর ভবিষ্যতে পরবর্তী দৃষ্টান্ত হয় তো এ-ভাবেই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যদি না তাকে খেলো ও নস্যাৎ করবার প্রচেষ্টা হয়। কেননা ইতিহাসে এরূপ ভুরি ভুরি নজির রয়েছে যেখানে অযোগ্য অক্ষম ও অপদার্থ জনের স্মৃতি রক্ষার্থে পেল্লায় পেল্লায় স্মৃতি-সৌধ নির্মিত ও প্রচুর স্তুতি রচিত হয়েছে।

কথাবার্তায় ছেদ পড়ে। বাহিনীর পর্বত আরোহণ শুরু হয়েছে। দূর পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য ধীরে-ধীরে উঠে একটা প্রকাণ্ড উজ্জল সোনার থালার মতো আত্মপ্রকাশ করছে। ক্রমে ক্রমে তা জলন্ত অগ্নি শিখায় রূপান্তরিত হয়ে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে ধরণীকে উত্তপ্ত করছে।

চলে চলে বাহিনী ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গাছপালা পরিবেষ্টিত পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো একটা চওড়া জায়গায় পৌঁছে—বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পল্টন অধিনায়কগণ নিজ নিজ পল্টনকে বিশ্রামের সঙ্গে বন্দুক, মাস্কেট, রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার ইত্যাদি যার কাছে যে অস্ত্র রয়েছে তার বোর (ছিদ্রপথ) পরিষ্কারের আদেশ দেন। কেননা আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই জরুরী। যুদ্ধের সংবাদে সৈন্যগণ উৎসাহে উদ্দীপ্ত। একজন তো ঝোঁকের সঙ্গে বলেই ফেললে—কখন শুরু হচ্ছে? উত্তরে অধিনায়কের মুখে—যে কোন মুহূর্তে, শুনেই সকলে হৈ হৈ করে ওঠে। ক্ষুৎপিপাসা, শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে এখনই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু নিধনে অস্থির হয়ে ওঠে। বাহিনীর অধিনায়ক সৈন্যদের এরূপ মনোবল এবং অসীম সাহস দেখে যারপরনাই প্রীত। যুদ্ধের জন্য তাদের মনের এরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ বজায় রাখার জন্য অবিলম্বে তা শুরু করা প্রয়োজন। নচেৎ হতাশা তাদের উৎসাহ উদ্দীপনাকে গ্রাস করে নির্জীব নিরুদ্যম করে দেবে। মহারাজ পাহাড়ের পার্শ্বদেশে দাঁড়িয়ে এ অঞ্চলের অবস্থান এবং চতুর্দিকের পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আচম্বিতে বাহিনীর উল্লসিত কলরবে আকৃষ্ট হয়ে পেছন ফিরে চায়। তাঁর দৃষ্টি বন্দুক কাঁধে দেবযানীর নিশ্চল মূর্তির ওপব নিবদ্ধ হয়। তিনি কিশোরীটিকে তার মনোবল, সাহস, কর্তব্যবোধ, কর্মনিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি নানা গুণাবলীর জন্য এই বুঝি প্রথম সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মনে মনে সস্নেহ আশীর্বাদ করলেন। ভাগ্যদেবতা তাঁর আশিষ-বাণী কান পেতে শুনে বুঝি অলক্ষ্যে থেকে হাসলেন।

দেবযানী তখন গাছেব ফাঁকে ফাঁকে সূর্য কিরণের লুকোচুরি খেলা দেখছে আর ঝরা-পাতার শব্দে ফেলে-আসা জীবনের দিনগুলির পদধ্বনি শুনছে। নিঃশব্দ চরণ সঞ্চারে তারা একে একে এসে তার স্মৃতির মণি-কোঠায় ভিড় করে। জ্ঞান হওয়া অবধি মা, মামা ও ভাই—এই তিনজনকে নিয়েই তার জীবন গড়ে উঠেছে। তাদের সে চিরকালের মতো ছেড়ে এসেছে। ফিরে যাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন। মামা নেহাৎ নিরীহ ভালোমানুষ—মনের দুঃখ বেদনার বাহ্যিক প্রকাশ তিনি কচিৎ কদাচিৎ করেন। তথাপি অবসর মুহূর্তে সহোদরা ও তার আত্মজার একই পরিণতি—এক বৃন্তে দুটি ফুল অকালে

ঝরে পড়লো ভেবে বুক-কাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আর ভাই সুদেব—কেঁদে কেঁদে দিদির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে। না, সে আর ভাবতে পারছে না। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে উদ্‌গত অশ্রু অতি কষ্টে রুদ্ধ করে দেবযানী ভিন্নমুখী ফিরে দাঁড়ায়।

আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী বাহিনীর উঁচু নিচু সর্বস্তরে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা চলেছে। প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে আপন আপন কর্মসূচী রূপায়নে ব্যগ্র। নগরের অবস্থা সরজমিনে জানবার জন্য ইতি মধ্যেই গুপ্তচর পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে বাহিনীর রসদ নিয়ে। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে তথাপি অনুতোষের দেখা নেই। এই পাহাড়িয়া অঞ্চল ও তার পথঘাট, হাটবাজার, কোথায় কি পাওয়া যায় সবই অনুতোষের নখদর্পণে। এদিকে পাহাড়ের পাদদেশে ঝরনা থেকে যারা জল আনতে গেছে তারা সব ফিরে এসেছে। মহারাজ ও বড়দা যেখানে আলোচনা-রত তার কিছু দূরে দেবযানী দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে সে অনুতোষ যে পথে পাহাড় থেকে নেমে গেছে সে দিকে যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করছে। এমনি সময় তার দৃষ্টি দূরে রেল পথের ওপর পড়তেই মনে হলো একটা রেল ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু খাকি পরা লোকও তাতে রয়েছে। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেবযানী ছুটে গিয়ে মহারাজ-এর দৃষ্টি ঐ দিকে আকর্ষণ করে। তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঐ দিকে চেয়ে দেবযানী প্রদত্ত খবরের সত্যতা নিরূপণ করে গম্ভীর হয়ে যান। দেবযানী আগের জায়গায় ফিরে এসে অনুতোষের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদিকে অনুতোষ পাহাড়িয়া অঞ্চলের বন বাদাড়, খানা খন্দ, পেরিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে হাটে পৌঁছে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে। কারণ হাটবার নয় বলে বড় বড় অনেক দোকান ঝাঁপ খোলে নি। ফলে ঘুরে ঘুরে নানা দোকান থেকে ছোলা, মুড়ি, চিড়ে গুড় নারকেল ইত্যাদি দরদস্তুর করে কিনে সেই সঙ্গে দোকানীদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হাট থেকে বেরুতে অনুতোষের দেরি হয়ে যায়। হাটে বাজারে কানা ঘুষো চলেছে যে স্বদেশী বাবুরা সরকারের মালখানা, অস্ত্রাগার লুট, পুলিশ ব্যারাক, সাহেবদের ক্লাব ইত্যাদি ধ্বংস ও অনেক সাহেব ও পুলিশ খুন করে পাহাড়ে এসে যুদ্ধের তোড়জোড় করছে। অনুতোষ চক্ষুকর্ণ সজাগ

রেখে সঙ্গীসহ দ্রুত হেঁটে চলেছে। পাহাড়ের পাদদেশে এসে জঙ্গলে ঢোকবার মুখে সে থমকে দাঁড়ায়। কেউ কোথা থেকে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে কিনা তা নিরূপণের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখে। সে সময় তার মনে হলো একটা লোক হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে চেয়েই অদৃশ্য হয়। অনুতোষ অবাক। লোকটা তাদের দেখেই লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই শত্রুর গুপ্তচর গোপনে অনুসরণের জন্য ওত পেতে আছে। ওকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। অনুতোষ সঙ্গীদের খাবার নিয়ে এগিয়ে যেতে বলে। তারপর গাছের ডাল কেটে একটা লাঠি বানিয়ে চুপটি করে আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকটা যেখানে মাথা তুলেছিলো সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অনুতোষের অনুমান নির্ভুল। কিছুক্ষণ পরেই লোকটা তার লুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে দ্রুত চলতে থাকে। অনুতোষ আড়ালে আবডালে তার পশ্চাৎ চলেছে। আশ্চর্য নীরেন ভবেশ যেদিকে গিয়েছে লোকটা সেদিকেই চলেছে। না, আর তো এগোতে দেওয়া চলে না। জঙ্গলের একটু খালি জায়গা পাওয়া মাত্রই অনুতোষ নির্ভুল লক্ষ্যে লোকটার পা বরাবর সাঁই করে লাঠিটা ছুঁড়ে মারে। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়া মাত্রই অনুতোষ বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসে জিজ্ঞাসা করে—তুই কে? কেন এখানে ঘুরঘুর করছিস? বাবু, আমি একজন কাঠুরিয়া কাঠের সন্ধানে ঘুরছি। মিথ্যে কথা। অনুতোষ লোকটার গলা টিপে ধরে—বল তুই কে, কে তোকে এখানে পাঠিয়েছে? অনুতোষের হাতের নিষ্পেষণে লোকটা শ্বাসরুদ্ধ এবং চক্ষু কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম। সে গোঁ গোঁ করে বলে—থানার দারোগাবাবু স্বদেশীবাবুদের খোঁজ করতে আমাকে পাঠিয়েছে। শোনা মাত্রই অনুতোষ তাকে হিড়হিড় করে টেনে গভীর জঙ্গলে নিয়ে একটা গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে হাত দুটো পিছ মোড়া এবং পা দুটো একত্র করে বাঁধে। একবার ইচ্ছা হলো গুলি করে শেষ করে দেয় কিন্তু তাতে ওর যোগ্য শাস্তি হবেনা। সুতরাং গায়ের ফতুয়াটা ছিঁড়েমুখে গুঁজে দেয়। লোকটা আর্তনাদ করে কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু অনুতোষ আর দাঁড়ায় না।

সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। দেবযানীর দুর্ভাবনা ও অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমনি সময় অনুতোষের সহকারীদ্বয়ের উপস্থিতি

বিপ্লবী শিবিরের উদ্বেগ প্রশমিত এবং দেবযানীর চিন্তাভার লাঘব করে। বেলা শেষে অনুতোষ এসে শিবিরে পৌছে। ফেরার পথে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর মোকাবিলার কাহিনী দলের অধিনায়কদের গোচরে আনার উদ্দেশ্যে যাবার সময় দেবযানীকে দেখতে পায়। উভয়ের চোখের মিলনে পরস্পরের অন্তরে যে পুলক-শিহরণ জাগে তাতে না-বলা অনেক কথাই বুঝি বলা হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশে সন্ধ্যাতারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বিপ্লবী-শিবিরে সাজ সাজ রব। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী অদ্য রাত্রেই নগর আক্রমণ করা হবে। বাহিনীর উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। তাদের মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। কিন্তু শহরের খবর নিতে গুপ্তচর হিসাবে যাকে পাঠানো হয়েছে সে এখনো ফেরেনি। তারওপর শত্রুপক্ষ বিপ্লবীদের আস্তানার খোঁজে গুপ্তচর ও অনুসন্ধানী দল পাঠিয়েছে। এর থেকে অনুমিত হচ্ছে ইংরেজ শহরের অবস্থা সামাল দিয়ে বিপ্লবীদের চূর্ণ করবার পাঁয়তারা কষছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ কল্পে বাহিনীর পরিচালকবর্গের বৈঠকে এখনই নগর আক্রমণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত হয়। ফলে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করার কর্মসূচী অগ্রাধিকার লাভ করে। তদনুযায়ী ইংরেজকে বিভ্রান্ত করবার এবং বাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বারংবার এ-পাহাড় ও-পাহাড়ে স্থান পরিবর্তন করে লড়াইয়ের জন্য নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে শত্রুকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসা আবশ্যিক বিবেচিত হয়। এই পরিকল্পনানুযায়ী অদ্য রাত্রে নগর আক্রমণ মুলতবি রেখে অন্যত্র গমনই স্থিরীকৃত হয়।

রাতের অন্ধকারেই বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, স্বাধীনতা জিন্দাবাদ ধ্বনির সঙ্গে বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। মনের গরবে চলার হরষে তারা গাইতে গাইতে চলেছে—ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল চলরে চলরে চল। বিজয় নিশান উচ্চে তুলে পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে শত্রু নিধনে এগিয়ে চল। এই বিপদসঙ্কুল গিরি-পথে অন্ধকারে ঝোপঝাড় বনবাদার অতিক্রম করে সর্পিল গতিতে পরস্পর সান্নিধ্য বজায় রেখে বাহিনী চলেছে। আগে পিছে মশালের আলো তাদের চলার গতি নির্দেশ করছে। দেবযানী সকলের সঙ্গে সমান কদমে

মহারাজ-এর অনুগমন করছে। মাঝে মাঝে মহারাজ একটু পিছিয়ে পড়ে দেবযানীকে উৎসাহিত করছে। কিন্তু দেবযানীর তখনকার একমাত্র চিন্তা—অনুতোষ। অন্ধকারে যতদূর অবধি দৃষ্টি চলে সে অনুতোষকে খুঁজছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তাকে যে তার চাই। কেননা যুদ্ধকালে তাকে অনুতোষের সঙ্গে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে হবে। এর ব্যত্যয় সে কিছুতেই হতে দেবে না। যুদ্ধে হার, জিৎ, মৃত্যু যাই ঘটুক না কেন উভয়ে এক সঙ্গেই তা বরণ করবে—এই তার পণ, এর একচুলও সে ব্যতিক্রম হতে দেবে না।

অবিশ্রান্ত চলে পরিশ্রান্ত বাহিনী অবশেষে এক পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত। বড়দা মশালের পাশে দাঁড়িয়ে যোদ্ধবর্গকে সম্বোধন করে বলেন :—

প্রিয় কম্রেডস, যে স্বাধীনতা অর্জন ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে আমাদের অভিযান তার আগমনী গীতি দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। তার আগমন আমরা ইতিপূর্বেই তীরে দাঁড়িয়ে দূর সমুদ্রে আগানো জাহাজের মাস্তুলের মতোই আর পাহাড়ের সানুদেশে দাঁড়িয়ে ঊষালগ্নে নবোদিত সূর্যরশ্মির ঝিকিমিকির মতোই প্রত্যক্ষ করছি। ভূমিষ্ঠ-হওয়া-লগ্নে মাতৃ-জঠরে শিশুর অস্থির সঞ্চরণের মতোই তার শুভাগমনের ইংগিত পাচ্ছি। আপাতত আমরা নগর আক্রমণ থেকে বিরত থাকছি। সর্বাগ্রে যুদ্ধে ইংরেজকে পরাস্ত করার পরিকল্পনা করেছি। মাভৈঃ, জয় আমাদের হবেই হবে। তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই বাহিনী সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, স্বাধীনতা জিন্দাবাদ ধ্বনির সঙ্গে সমর্থন সূচক হাততালি দিয়ে অধিনায়ককে অভিনন্দিত করে। নিবিড় জঙ্গলের অন্ধকারে ঐ ধ্বনি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে মিলিয়ে যায়। হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠের নির্দেশ আসে (attention) সৈনিকগণ স্থির হয়ে দাঁড়াও। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতি-বাহিত। তার পরেই তীব্র কণ্ঠের আদেশ শোনা যায়—সুশৃংখলার সঙ্গে এগিয়ে চলো (March in order)। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গভীর জঙ্গলের অন্ধকারে গাছপালার ভেতর দিয়ে মশালের অনুজ্জ্বল আলোতে চলমান বাহিনী প্রতিটি সৈন্যকে মনে হচ্ছে এক একটি ইস্পাত-দৃঢ়-মূর্তি বজ্রকঠিন সংকল্প নিয়ে রণহুঙ্কার দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। এমন দৃশ্য বুঝি আয়র্লণ্ডের জলে জঙ্গলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী আইরিশ

ভলাণ্টিয়ার কোর-এর যুদ্ধকালে হামেশাই দেখা গেছে। ইতিহাসের সে আর এক বেদনার্ত্ত কাহিনী।

চলে চলে বিপ্লবীবাহিনী পাহাড়ের উঁচুতে পৌঁছে। ঊর্দ্ধাকাশে চেয়ে রাত্রির তৃতীয় প্রহর অনুমান হয়। পল্টন কমাণ্ডারগণ নিজ নিজ পল্টন আবেক্ষণের পর বিশ্রামের আদেশ দেয়। পথশ্রমে পরিশ্রান্ত বাহিনীর সকলেই বিশ্রাম-রত। শুয়ে বসে, ঘুমে কিংবা জেগে কে কোথায় জিরোচ্ছে অন্ধকারে তা বোঝার উপায় নেই। চতুর্দিক নিঝুম নিস্তব্ধ— মাঝে মাঝে কোন নিশাচর পাখির পাখা ঝটপটানি ও চিৎকার এবং দূর জঙ্গলে কোন শ্বাপদের হুঙ্কার ভিন্ন আর কিছু শ্রুতি গোচর নয়। অতন্দ্র দেবযানী একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। গভীর ভাবনার অতলে ডুবে আছে, না কি পুব-আকাশের চিত্র পরিবর্ত্তনের খেলা দেখছে। পুব-আকাশের অন্ধকার বিলোড়ন করে একটা উজ্জ্বল শ্বেত শুভ্র তারা উঁকি দিচ্ছে। আকাশের পটে-ও ক্রম-বিবর্তন শুরু হয়েছে। দেবযানী বুঝলো ওটা শুকতারা—ভোরের আগমন বার্ত্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আচম্বিতে পিঠে মৃদু হাতের স্পর্শে দেবযানী চমকে পেছন ফিরে চায়— এ কি তুমি?

—হাঁ, আমি, ভয় পেলে নাকি?

—ভয়, ভাবছি নিয়ম ভঙ্গ হলো।

—সে তো অনেকদিন আগেই হয়েছে। এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ বলো। আখেরি নিয়ম ভঙ্গের দিকেই যখন আমরা শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছি তখন অচিরেই সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে উভয়েই প্রথমে ভোঁ তারপর একেবারে না-হয়ে যাবো।

—বুঝলাম, সে তো শেষ কথা। জীবন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি, যে কোন মুহূর্ত্তে তলিয়ে যেতে পারি। তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। এখন জিজ্ঞাস্য—সারাদিন রাত কোথায় কাটিয়ে এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এসে উপস্থিত হলে।

—দৈত্য দানোর মতো জলস্থল, নভঃস্থল ঘুরে ঘুরে উল্কাবেগে নেবে এলাম। দেখলাম ধরণী সুষুপ্তিমগ্না। হঠাৎ নজরে এলো একাকী এক অতন্দ্র প্রহরী দাঁড়িয়ে, ও কে? কাছে এসে বুঝতেই আলতো ভাবে ছুঁলাম। না, আর না।" মহারাজ কোথায়?

—ডানদিকে এগিয়ে যাও। যাবার কালে হাতখানা একটু বাড়িয়ে

দাও। অনুতোষ হাত বাড়াতেই দেবযানী মাথা নিচু করে ঠোঁট নামিয়ে চুমো দিয়ে হাত ছেড়ে দেবার মুহূর্তে অনুতোষ বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। দেবযানীর হাতখানা সজোরে টেনে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। দেবযানীর সারা শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হতে থাকে। ঊর্ধ্বাকাশে শুকতারা নির্নিমেষ নয়নে দিবারাত্রির সঙ্গম মুহূর্তে জীবন রঙ্গমঞ্চে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই নট নটীর বেদনা বিধুর অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে রইল।

দেবযানীর মধুর অধর পরশে অনুতোষের শরীরে বিগত ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রমের গ্লানি সব ধুয়ে মুছে তাকে নতুন উৎসাহে উজ্জীবিত ও নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করে। পুব দিগন্তে নবারুণের নতুন আলোকে পৃথিবী জেগে উঠেছে। গাছে গাছে পাখির কাকলিতে তার বন্দনাগীতি চলেছে। এই শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে অনুতোষ মনের আনন্দে এক রঙীণ ছবি এঁকে চলেছে—যুদ্ধে জিতে সে দেবযানীর হাত ধরে স্বাধীনতার দুর্গ তোরণে প্রবেশ করছে। সেই মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে আচম্বিতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ভোরের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অনুতোষ কল্পনার সৌধ থেকে নেমে আত্মস্থ হয়ে চলতে থাকে।

অনুতোষ মহারাজ সমীপে উপস্থিত। তিনি তখন বড়দা এবং অন্যান্য পল্টন অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনা রত। তাকে দেখে সকলেই উল্লসিত। কিছুক্ষণ পূর্বে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনে সকলেই অপৌণে তার উপস্থিতি আঁচ করছিলেন।

বিগত ২৪ ঘণ্টার এক অতি দুঃসাহসিক অভিযানে আহৃত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-সমূহ অনুতোষ সর্বসমক্ষে পেশ করে :

জনসাধারণকে আমাদের প্রতি বিরূপ করার প্রয়াসে ধূর্ত ইংরেজ আমাদিগকে স্বদেশী হিন্দু ডাকাত বলে প্রচার চালাচ্ছে এবং আমরা এদিকের পাহাড়ের কোথাও লুকিয়ে আছি বলে তাদের হুঁশিয়ার করেছে।

ধ্বংস করা রেলপথ ও সেতুগুলির মেরামত প্রায় হয়ে এসেছে। দু' একদিনের মধ্যেই ইংরেজ এ অঞ্চল পুলিশ মিলিটারি দিয়ে ছেয়ে ফেলবে।

খাদ্য সংগ্রহ খুবই মুশকিল। বেশি পরিমাণ কেনা হলেই দোকানীদের সন্দেহ জাগে। ফলে যে কোন সময় বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটা অসম্ভব নয়।

শহরের অবস্থাও খারাপ। থানায় পুলিশকে সশস্ত্র সচকিত রাখা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় দিবারাত্র তাদের অবিরাম টহল চলেছে। সন্দেহ ভাজন মনে হলেই কোন জিজ্ঞাসাবাদ নেই। গ্রেফ ধরে নিয়ে কোতোয়ালীতে এনে চলেছে ডলাই-মলাই।

অনুতোষ কথিত সমাচার সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনে তার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করলেন। সর্বশেষ আলোচনার পর স্থির হলো: ইংরেজ যাতে তাদের অবস্থান সঠিক নির্ণয় করতে না পারে সেজন্য গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে ও সদা সতর্ক থাকতে হবে। যুদ্ধের জন্য তাদের রেল স্টেশন থেকে দূরে এমন এক পাহাড়িয়া জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে হবে যেখানে তাদের পক্ষে যাতায়াত সহজ-সাধ্য নয়, এবং পাহাড়ের উপরের আড়াল থেকে তাদের আক্রমণকারী সৈন্যদের সহজে ঘায়েল ও পরাস্ত করা সম্ভব। তদনুযায়ী কর্মসূচী স্থির করে তা রূপায়ণে ভারপ্রাপ্তের নাম উল্লেখের পর সভা ভঙ্গ হয়।

সদ্য-ভোরের রাঙা-রবির আলোক-ছটায় পাহাড়টা হাশিখুশি ও ঝলমল করছে। শিবিরের সকলেরই ঘুম ভেঙেছে। জেগে উঠে মানুষ প্রথমেই ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়না অনুভব করে। সুতরাং এতগুলি ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষের রসদ যোগাবার জন্য অনুতোষ বিগত ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রমে শরীরের অস্বাভাবিক অবসাদ তুচ্ছ করে দু'জন সঙ্গীসহ ছদ্মবেশে সশস্ত্র বেরিয়ে পড়ে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী যুদ্ধের অনুকূল পাহাড়ের সন্ধানে বেরোবার সময় মহারাজ দেবযানীর খোঁজ করেন। কিন্তু তাকে শিবিরের কোথাও দেখা গেলো না। প্রাতকৃত্যাদির জন্য আশেপাশে কোথাও গিয়েছে অনুমান করে মহারাজ এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না। সময় নষ্ট না করে তিনি সুবোধকে নিয়ে চলবার মুহূর্তে দেবযানী পাহাড়ের অপর দিক থেকে উঠে মহারাজকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করে বলে—চান সেরে খাবার জল নিয়ে এলাম দাদা। মহারাজ থমকে দাঁড়ান। সুবোধকে যেতে বলে দেবযানীকে কতকটা আদেশের সুরে তাঁর অনুগমন করতে বলে তিনি চলতে থাকেন। বিপ্লবী শিবির থেকে পাহাড়ের শীর্ষে উঠবার জন্য মহারাজ ঘন ঝোপঝাড় জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছেন। দেবযানী নীরবে তাঁকে

অনুসরণ করছে। পাহাড় বেয়ে যতই উপরে উঠছে ঝোপঝাড় জঙ্গলও ক্রমেই পাতলা হচ্ছে। চলতে চলতে হঠাৎ মহারাজ-এর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—দিদি, তুমি কিন্তু আজ সামরিক আইন ভঙ্গ করেছ যা খুবই গুরুতর অপরাধ। যুদ্ধাবস্থায় কর্তৃপক্ষের অগোচরে শিবির পরিত্যাগ, যে কোন কারণেই হোক, দণ্ডনীয় অপরাধ।

—বিষয়টা আমি জানতাম না দাদা। তার ওপর ঘটনাটা এমন সময় ঘটলো যখন শিবিরের সকলে নিদ্রা-মগ্ন আর আপনারা আলোচনায় ব্যস্ত। এখানে আসবার পথে ঝরনাটা দেখেছি। কয়েকদিন চানটান হয়নি। ভাবলাম এই সময়টায় চট্ করে চানটা সেরেনি। ভবিষ্যতে এমন ভুল ত্রুটী আর হবে না।

মহারাজ—হুঁ, বলেই চুপ হয়ে যান। ততক্ষণে তারা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। চতুর্দিকে পাহাড়—ঢেউ খেলে খেলে দিকচক্রবালে মিশে গেছে। কাছের গুলি রৌদ্রালোকে চিক্‌চিক্ করছে আর দূরের গুলি পাতলা কুয়াশার আবরণে এক অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করেছে। দেবযানী নির্বাক নিস্তব্ধ ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। মহারাজ-এর আহ্বান শুনে তার সংবিৎ ফিরে আসে। কাছে যেতেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—দিদি, তোমার সম্মুখে দক্ষিণের স্পষ্ট দৃশ্যমান পাহাড়গুলির মধ্যে রণচাতুর্যের দিক থেকে কোনটায় আশ্রয় নিলে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের সুবিধা হবে বলে তুমি মনে করো।

মহারাজ-এর আকস্মিক প্রশ্নে দেবযানী থতমত খেয়ে বলে—বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারছিনা। নিকটের সব পাহাড়গুলিকে একরকমই মনে হচ্ছে। তবে হাঁ, তফাৎ যে নেই তা নয়। কোনোটা দেখতে খাড়াই, কোনোটা বা ঢালু। কোনোটায় গাছপালা জঙ্গল বেশী কোনোটায় বা কম। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তার পর মহারাজ-এর প্রশ্নের উত্তরে বলে—যে পাহাড়টা ঢালু এবং নিচের দিকে গাছপালার আড়াল কম সেই পাহাড়ের উপর ঘাঁটি করে নিচ থেকে শত্রুর আক্রমণ শুধু রোখা নয় তাকে হঠানো এবং হারানো সম্ভব বলেই মনে হয়। চমৎকার! তাহলে সুমুখে আর একবার দৃষ্টিপাত করে বল তো দিদি, কোন পাহাড়টায়, তোমার মতে, আমরা ঘাঁটি করে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি। অঙ্গুলি নির্দেশে সেটা দেখিয়ে দাও।

দেবযানী নির্নিমেষে একে একে পাহাড়গুলিকে দেখে। তারপর আঙ্গু

মনোনীত পাহাড়টাকে কোমর থেকে পিস্তল খুলে হাত বাড়িয়ে নিশানা করে।

মহারাজ উল্লসিত কণ্ঠে দেবযানীকে বাহবা দিয়ে তাকে শিবিরে ফিরে যেতে বলে তিনি তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের অপরদিক দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে যান।

মহারাজ-এর আদেশ অনুযায়ী পাহাড়েব চূড়া থেকে নামতে গিয়ে দেবযানী থমকে দাঁড়ায়। চতুর্দিকের নৈসর্গিক দৃশ্য তাকে প্রবল ভাবে টানছে। ডাইনে বাঁয়ের ঝোপ ঝাড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ নাম-না-জানা রাশি রাশি ফুলের বাহার তাকে যেন হাতছানি দিচ্ছে—এসো এসো। দেবযানীর মন আনন্দে নেচে ওঠে। হঠাৎ কি যে হলো! একটা পাথরের ওপর বসে দেবযানী মাথার রুখু শুকো চুলগুলির জট খুলে হাত দিয়ে আঁচড়ে বেণী পাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সদ্য ফোঁটা ফুলের মতো ফুল বনে ফুল কুড়োতে কুড়োতে উদ্ভিন্ন যৌবনা দেবযানীর দয়িতের সঙ্গলাভের বাসনা বলবতী ও প্রণয় লালসা তীব্র হয়ে ওঠে। নেশাগ্রস্তেব মতো সে তার নানা অঙ্গ ফুলে ফুলে সাজাতে থাকে—বেণীতে, গলায়, বাজু এমন কি নীবিতেও ফুলের মালা পরে শকুন্তলার মতো সেজে লতাপাতা ঝোপঝাড়, গাছের আড়ালে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দুষ্মন্ত-রূপী দয়িতের খোঁজে বেড়িয়ে বেড়ায়। হায়, কোথায় সেই মৃগ শিশু, কোথায় বা তার দুষ্মন্ত! সবই বুঝি ভুল! আশাভঙ্গে দেবযানী গাছের ছায়ায় এলিয়ে বসে। দূর গগনে মেঘের কোলে শৈল মালায় রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

নিচে বিপ্লবী শিবির তখন কর্ম-চঞ্চল। দলে দলে যোদ্ধারা, ঝরনার জলে চান সেরে ফলমূল কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্তি করে নিয়ে আসছে। ঝরনার জলে পিপাসা মিটিয়ে ক্ষুধার আধার ফলমূল খেয়ে পূরণ করে আপৎকালের জন্য কিছু পুঁজিও রেখে দেয়। যুদ্ধের জন্য তারা কি পরিমাণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অপেক্ষা করছে তাহা তাদের কথোপকথনের মধ্যেই ব্যক্ত হচ্ছে। একজন তো হুঙ্কার দিয়ে বলেই ফেললে—দেখো আমি একসঙ্গে তিন তিনটে গোরাকে কি ভাবে কোতল করি! সৈন্যদের এরূপ আলাপ আলোচনা শুনে অধিনায়কগণও যারপর নাই খুশি।

নানা ঝক্কি ঝামেলা পোহানোর পর অনুতোষ যখন খাবার নিয়ে শিবিরে পৌঁছে সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগন ছোঁয় ছোঁয়। খাবার রেখেই সে মহারাজের সন্ধানে কিছুদূর যেতেই তাঁকে দেখতে পায়। কাছে আসতেই —দেখতো দেবযানী ফিরেছে কিনা, বলেই মহারাজ অন্য দিকে চলে যান। অনুতোষ তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ পায় না।

মহারাজ-এর আদেশ শুনে অনুতোষ বিভ্রান্ত। দেবযানী কোথায় কার সঙ্গে গেছে। কোথা থেকে কার সঙ্গে ফিরবে ইত্যাদি কি বিদ্ কি বৃত্তান্ত, কিছুই তার জানা নেই। মহারাজও তাকে জিজ্ঞাসার অবকাশও দেননি। অগত্যা অনুতোষ বাহিনীর সকলে যেখানে খাওয়া-দাওয়া শেষে বিশ্রাম ও গল্পগুজব করছে সেখানে গিয়ে দেবযানীর খোঁজ করে। সেখানে এবং তার আশপাশে কোথাও দেবযানীকে দেখতে পায়না। এ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করাও তার সমীচীন মনে হলো না। বিষয়টা তাকে ক্রমেই গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলছে। দেবযানীর অনুপস্থিতি আকস্মিক কোন ঘটনার জের মনে করে অনুতোষ আরও শংকিত হয়। নিরুপায় অনুতোষ মহারাজের নিকটে গিয়ে দেবযানীর দেখা-না-পাওয়ার কথা জানাতেই তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—সে কী! আমি তো এই পাহাড়ের চূড়া ছেড়ে যাবার সময় তাকে শিবিরে ফিরে যেতে বলেছি। তবে কি মেয়েটা নামার সময় পা পিছলে আছাড় খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও পড়ে আছে, না কি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোথাও ঘুমিয়ে আছে! যাও, শীগগীর যাও। পাহাড়ে ওঠবার সময় চতুর্দিক নজর রেখে উঠবে। পাহাড়ের ওপরটাও ভাল করে খুঁজবে। কোথাও না কোথাও ওকে নিশ্চয় পাবে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আমাকে খবর দেবে।

মহারাজের কথায় অনুতোষ দেবযানী সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হলেও তার তল্লাসের ভার পেয়ে উৎফুল্ল। সে আর দেরি করে না। মহারাজ-এর নির্দেশ মতো শিবিরের দিক থেকে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকে। না, দেবযানী কোথাও নেই। উদ্বিগ্ন চিত্তে সে পাহাড়ের উপরে পৌঁছে। প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে বুঝি ক্ষণেকের জন্য সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। মধ্যাহ্নের সূর্যকরোজ্জ্বল শৈলমালা যেন এক স্তব্ধ তরঙ্গ—নেচে নেচে দিক্‌চক্রবালে মিশে গেছে। পর মুহূর্তেই আত্মস্থ হয়ে অনুতোষ দিক পরিবর্তন করে দেবযানীর খোঁজ করতে থাকে। গাছের ছায়া, ঝোপঝাড়ই তার লক্ষ্য। চলতে চলতে হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে

বৃক্ষতলে শায়িতা এক নারীর ওপর পড়তেই সে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। কাছে গিয়ে অমুতোষ অবাক বিস্ময়ে দেখে পত্রপুষ্পে শোভিতা দেবযানী যেন এক নিদ্রামগ্না বিদ্যাধরী—রূপ-সায়রে ডুবে আছে। ক্ষণকাল পূর্বে-দৃষ্ট প্রকৃতির অতুলনীয় রূপ যেন তার প্রিয়ার রূপ-সত্তার সঙ্গে একীভূত। পত্রপুষ্পে, আকাশের মেঘমালায় যেরূপ ছড়িয়ে আছে তা বুঝি দেবযানীর নারী সত্তার মূর্তরূপ। মোহাভিভূত অমুতোষ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দেবযানীর স্পর্শ সুখ লাভের সৌভাগ্য ইতিপূর্বেও তার হয়েছে। কিন্তু এমনতর রূপে ভরা যৌবন-জোয়ার-স্ফীত আলুলায়িতা দেবযানীকে আগে কোনদিন সে প্রত্যক্ষ করে নি। তার সংযমের বাঁধ ভেসে যায়। নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারে না। ছুটে গিয়ে নিদ্রিতা দেবযানীকে কোলে তুলে জাপটে ধরে। প্রিয়ার চিকুর সুবাসে আত্মহারা অমুতোষ অধরে অধর রেখে চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। শকুন্তলার মতো নিজেকে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করে দেবযানী ব্যাকুল হয়ে নিজেকে হারায়ে দয়িতের খোঁজে বনের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ ক্লান্তশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে। আচম্বিতে ঘুমঘোরে নিজেকে অন্যের বহু-বন্ধনে আবদ্ধ বুঝে কোন দৈত্য দানোর কবলে পড়েছে ভেবে দেবযানী ছটফট করে মুক্তির জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করে। ঘুমঘোর ভাঙতেই নিজেকে আপন দয়িতের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ বুঝে সে অবাক হয়ে যায়। এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর। এমন পরম লগ্নে সে নিজেকে নির্দ্বিধায় সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করে। চিত্রার্পিতের মতো প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হয়ে তার আদর সোহাগ সম্ভোগ করতে থাকে। কতক্ষণ যে উভয়ে পরস্পরের সাহচর্য উপভোগে মগ্ন সে খেয়াল নেই। ধাতস্থ হতেই দেবযানী নিজেকে সংবৃত ও পুষ্পাভরণ থেকে মুক্ত করে। অতঃপর উভয়ে হাত ধরাধরি করে পাহাড় থেকে নামতে থাকে। দেবযানীর মনে হলো স্বর্গোদ্যান ছেড়ে তারা ভূতলে অবতীর্ণ হচ্ছে। শিবিরে পৌঁছে অমুতোষ সর্বাগ্রে দেবযানীর খবর মহারাজের গোচরে আনে।

বেলা গড়িয়ে চলেছে। শিবিরে সাজ-সাজ রব উঠেছে। আজ রাতেই এ পাহাড় ছেড়ে যেতে হবে। আহারাদি শেষ হতেই রাতের আঁধার নেমে আসে। ঊর্ধ্বাকাশের ক্ষীণ চন্দ্রালোক গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘন তমসাচ্ছন্ন জঙ্গলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক অদ্ভুত অবর্ণনীয় কুহেলিকার

সৃষ্টি করেছে। বিপ্লবী বাহিনীর কণ্ঠ থেকে মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি রাতের অন্ধকার চিড়ে দিকে দিকে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে। এক বিচিত্র পরিবেশ।

রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ। বাহিনীর যাত্রারম্ভের আর দেরী নেই। মশাল জ্বলে উঠেছে। কুচকাওয়াজ শুরু হয়েছে। মশালের আলোতে বিপ্লবী জোয়ানদের মুখের রক্তাভা তাদের যুদ্ধংদেহি—মারি অরি পারি যে কৌশলে—দৃঢ় সংকল্পেরই অভিব্যক্তি। অভিযান পরিচালনার জন্য মহারাজ সম্মুখে এবং পৃষ্ঠরক্ষক হিসেবে বড়দা দাঁড়িয়েছেন। বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে শুরু হলো তাদের যুদ্ধাভিযান। ঘোর অন্ধকারে গভীর পার্বত্য অরণ্যের উঁচু নিচু বন্ধুর পথ বেয়ে উৎফুল্ল চিত্তে —কখনো চলরে চলরে চল জীবন আহরে চল, কখনো বা—হবে জয় নাহি ভয়, গেয়ে গেয়ে, কখনো বা বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে বাহিনী এগিয়ে চলেছে। দেবযানী সমোৎসাহে অক্লান্ত চরণে মহারাজ-এ অনুগমন করছে। মহারাজ তার পথশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে রানা প্রতাপের হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁর স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম অদ্ভুত বীরত্ব ও তাঁর ঘোটক চৈতকের বিস্ময়কর প্রভুভক্তির কাহিনী বলে চলেছেন।

এই ভাবে অবিশ্রান্ত চলে চলে বাহিনী অন্য এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ায়। বাহিনীকে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে মহারাজ এগিয়ে যান। পাহাড়ে ওঠার মুখে অপেক্ষাকৃত একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ান। টর্চ-এর আলোতে তিনি কিছু একটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেলেন না। তবে কি তিনি জায়গা ও পাহাড় ভুল করেছেন? রথীনও বা কোথায়! তার নিকট কি তিনি নিশানার উল্লেখ করেছিলেন? একই সঙ্গে এত জিজ্ঞাসা তাঁর মনে এসে ভিড় করে। ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখেন, আকাশের রঙ ফিকে হয়ে আসছে। এই পাহাড়েই এখন আশ্রয় নেওয়া যাক,— তারপর দেখা যাবে।

ফিরে এসে মহারাজ বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে এ্যাটেন্‌শন্ বলে হাঁক দেন। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পর মুহূর্তেই—মার্চ, বলে পেছন ফিরে মহারাজ চলতে শুরু করেন। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে দিক দিগন্ত কাঁপিয়ে বাহিনী মহারাজ-এর অনুগমন করে। যেদিক দিয়ে বাহিনীর পর্বতারোহণ চলেছে

সেদিকে চড়াই, উতরাই, ঝোপঝাড়, গাছপালার প্রতিবন্ধক তুলনামূলক ভাবে কম। প্রভাত অরুণের রক্তরাগে উদ্ভাসিত ও পাখির কলতানে মুখরিত পর্বতশৃঙ্গ বাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তাদের উল্লসিত কণ্ঠ-নিসৃত বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে দূর দূরান্তে মিলিয়ে যায়। পরক্ষণেই সম্মিলিত উদাত্ত কণ্ঠে মনের আনন্দে তারা গেয়ে চলে—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে মহারাজ নিঃসন্দেহ যে রাতের আঁধারে তিনি পাহাড় ভুল করেন নি। কিন্তু তাঁর প্রোথিত চিহ্ন না পেয়ে মনে মনে খুবই বিচলিত। পাহাড়ের ওপরে উঠে বাহিনীকে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে তিনি পল্টন অধিনায়কদের সঙ্গে মিলিত হন। তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পাহাড়টা ঘুরে ঘুরে দেখে যুদ্ধ পরিচালনার কলা কৌশল, ব্যূহ রচনাপ্রণালী ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর অনুতোষকে ভাঁড়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বুঝলেন যে অবস্থাটা প্রায়— ভাঁড়ে ভবানী। সুতরাং অনুতোষকে হাটবাজারের খোঁজ খবর নিয়ে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে বলে তিনি প্রস্থান করেন।

অনলস দেবযানী অনুক্ষণ মহারাজ-এর অনুগমন করে চলেছে। কিন্তু তাঁর চলা বলায় দেবযানী আজ যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি ও অস্থিরতা লক্ষ্য করছে যা ইতিপূর্বে কখনো তার নজরে পড়েনি। অনুতোষের সঙ্গে কথাবার্তায়ও তা বিশেষভাবে প্রকট বলেই মনে হয়েছে। ফলে তার মনের মধ্যেও অশান্তি দানা বেধেছে। সেই সঙ্গে অনুতোষ খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে কখন ফিরে আসবে তাও এক মহা চিন্তার বিষয়। হঠাৎ মহারাজার আহ্বান কানে আসতেই দেবযানী সচকিত হয়।— দিদি, চল পাহাড়ের নিচটা একবার ঘুরে দেখি কোথায় কি আছে। বলা মাত্রই তিনি ভিন্নমুখী চলে নামতে শুরু করেন। দেবযানী নিঃশব্দে তার অনুগমন করছে। মহারাজ চতুর্দিকের গাছপালা, ঝোপঝাড়, জঙ্গলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নেমে চলেছেন। আচম্বিতে একটা গাছের নিচ থেকে ফল কুড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এটা কি ফল? বলতে পারলে না। এর নাম সফেদা—বেশ মিষ্টি ফল, খাওনি বুঝি। ভাল ফলগুলি কুড়িয়ে নাও। একটা খেয়ে দেখো। অদূরেই ঘন গভীর জঙ্গল। কাছে যেতেই একটা

ক্ষীণ ঝরঝর আওয়াজ কানে আসছে। জঙ্গল পেরতেই শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে একটা ঝরনা তরতর করে বয়ে চলেছে। ঐ দিকে এগোতেই কেমন একটা গন্ধ মহারাজের নাকে আসে। তিনি থমকে দাঁড়ান এবং দেবযানীকে চুপ করে দাঁড়াতে হাত-ইশারা করেন। হাতের মুঠোয় বাতাস নিয়ে শুঁকে কোমর থেকে পিস্তল হাতে নিয়ে তিনি দেবযানীকে অনুসরণ করবার ইংগিত দিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে চলেন। একটা ঘন ঝোপের ধারে এসে মহারাজ নিঃশব্দে দাঁড়ান। এখানে গন্ধ আরো তীব্র। বুঝলেন যেই হোক ঝোপের আড়ালে বসে বিড়ি ফুঁকছে। দিক নির্ণয় ও কর্মপন্থা ঠিক করে তিনি হঠাৎ ছুটতে ছুটতে বাজ-খাঁই কণ্ঠে—হাত তুলে দাঁড়াও নচেৎ গুলি করবো, হাঁক দিয়ে ঝোপটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। একটা লোক ভ্যাবা-চাকা খেয়ে দৌড়বার মুখে মহারাজ গুলি চালাতেই সে পড়ে যায়। আর একজন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটতে থাকে। মহারাজ পড়ে যাওরা লোকটাকে দেবযানীর হেপাজতে রেখে পলাতকের পেছন পেছন জঙ্গলেব ভেতর দিয়ে ভীমবেগে ছুটে ছুটে পাকড়াও করে তাকে দু'হাত দিয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে এসে দেবযানী যাকে পাহারা দিচ্ছিল তার ওপব ছুঁড়ে ফেলে। তারপর কালান্তকের মতো সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুভয় দেখিয়ে তাদের জবানী থেকে বুঝলো গাছের ডাল তারাই সরিয়েছে। ক্রুদ্ধ মহারাজ খানিক দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ কীচক বধের মতো তদের হাত পা থেতলে শূন্যে তুলে সজোরে অদূরের গভীর জঙ্গলে নিক্ষেপ করে হাঁটতে থাকেন। দেবযানী এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে মহারাজ-এব কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করছে। তাঁর মুখাবয়ব এতই নির্মম কঠোর কঠিন দেবযানীর মনে হলো তিনি যেন ক্ষমা ও তিতিক্ষা বিহীন এক রুদ্র ভয়াল মূর্তিতে রূপান্তরিত। নিঃশব্দে সে মহারাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেছে। মহারাজ হঠাৎ থেমে ফিরে দিক নির্ণয় করে বলেন—এখন ফেরা যাক্।

শিবিরে ফিরে মহারাজ বড়দার সঙ্গে মিলিত হন। দেবযানী ইতস্তত ঘুরে অনুতোষের সন্ধান করে জানলো যে সে এখনো ফেরেনি। এদিকে বেলা গড়িয়ে দুপুর পেরিয়েছে। বাহিনীর সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং যে যা ফল সংগ্রহ করেছে দেবযানী সহ সকলে মিলে মহানন্দে ভাগাভাগি করে তাই খায়। অনুতোষের অনুপস্থিতি হেতু চিন্তান্বিত মহারাজ ব্যবস্থাদি দেখবার জন্য বড়দাকে নিয়ে তাদের মধ্যে উপস্থিত

হন। তাঁদের দেখে সকলেই সহর্ষে বন্দেমাতরম্ ও বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানলেন যে সংগৃহীত ফলমূল দিয়েই সকলে মধ্যাহ্নভোজন সাঙ্গ করেছে। সুতরাং আরও ফলমূলাদি সংগ্রহের জন্য জঙ্গলের কোথায় কি ফল দেখেছেন তা তাকে জানিয়ে তিনি চলে যান।

অমুতোষ তিন সঙ্গী সহ খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। এ অঞ্চলে হাট বাজার সম্পর্কে সে সম্যক ওয়াকিবহাল নয়। সুতরাং অনেক জিজ্ঞাসা-বাদের পর বেলা শেষে হাটে পৌঁছয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে হাটে ঢুকে ঝোলা ভর্তি করে খাবার কিনে ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে মাঠে নেমে দ্রুত হাঁটতে থাকে।

হঠাৎ পেছনে হৈহল্লা শুনে অমুতোষ চেয়ে দেখে কিছুলোক লাঠি সোঁটা নিয়ে ডাকু ডাকু চিৎকার দিতে দিতে তার দিকে ছুটে আসছে। এখন উপায়। হাতে লাঠি নেই যে রুখবে; রিভলবার খুলে গুলি ছুঁড়লে সাংঘাতিক কিছু ঘটলে জনসাধারণের মনে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-প্রচার-সৃষ্ট কুৎসা বিদ্বেষে আরও ইন্ধন যোগাবে। সুতরাং এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিতে হবে নচেৎ লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী হতে হবে। সেই মুহূর্তেই একটা লোক আঘাত করবার জন্য লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসতেই অমুতোষ মাথা নিচু করে দ্রুত বেগে ছুটে অন্ধকারে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। লোকগুলি তখনো তার পেছনে লেগে আছে। লাঠি নিয়ে জঙ্গল এলোপাতাড়ি পিটিয়ে চলেছে। তাদের না তাড়াতে পারলে সঙ্গীদেরও ডাকা যাচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে হল্লাকারীদের তাড়াবে। আচম্বিতে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে। বাঘের ডাক দিতে দিতে জঙ্গল নাড়িয়ে এগোতেই লোকগুলি বাবাগো, মাগো বলে চেঁচাতে চেঁচাতে জঙ্গল ছেড়ে ছুটে পালায়। নিষ্কণ্টক হতেই অমুতোষ শেয়াল ডেকে সঙ্গীদের জড়ো করে। শিবিরে যখন পৌছে রাতের আঁধার তখন জেঁকে বসেছে। সকলেই উল্লাস ধ্বনি দিয়ে তাদের স্বাগত জানায় এবং খাওয়ার জন্য ফলমূল এগিয়ে ধরে। ফলাহার শেষে অমুতোষ মহারাজ-এর নিকট গিয়ে সারাদিনের ঘটনাবলী তাঁর গোচরে আনে। সব শুনে চিন্তার বলি-রেখা তাঁর মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুঝলেন এ অঞ্চল থেকে খাদ্য সংগ্রহ আর সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে ইংরেজ তাদের অবস্থান অবশ্যই জানতে পারবে। এখান

থেকে রেল স্টেশনের দূরত্ব তিন ক্রোশ-এর মতো। সুতরাং দু'একদিনের মধ্যেই তাদের আক্রমণের আশঙ্কা করে তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করেন। ফলে শিবিরে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। বাহিনীর মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে চলেছে। যে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ সম্ভব সেদিকে বড় বড় গাছ কেটে এনে ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে গাছের ডাল পুঁতে পুঁতে (ক্যামুফ্লাজ্) শত্রুকে ফাঁকি দেওয়া এবং নিজেদের গোপন করার কাজ চলেছে। এভাবেই সারারাত্রিব্যাপী ব্যূহ রচনা চলেছে। একদল কাজ করছে, অন্যদল পাহারা দিচ্ছে এবং আর একদল ঘুমোচ্ছে। দিনের বেলাও একই ধারায় কাজ চলেছে—ব্যতিক্রম শুধু কয়েকজন এ-পাহাড় ও-পাহাড় ঘুরে ফলমূলের সন্ধান ও আহরণ। দ্বিতীয় দিন নির্বিবাদে কাটে। তৃতীয় দিন ভোরে প্রহরীর দৃষ্টি দূরে মাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দেখে পরপর কয়েকটা বড় মোটর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তার থেকে দলে দলে ইংরেজের সৈন্য মাঠে নামছে। হুঁশিয়ার সংকেত-ধ্বনি শোনা মাত্রই বিপ্লবী বাহিনী প্রচণ্ড উৎসাহে মেতে ওঠে। ব্লাণ্ডারবাস, কারবাইন, মাস্কেট, বন্দুক, রাইফেল, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তাজী ঘোড়ার মতো টগবগ করছে। মনে হচ্ছে এতো যুদ্ধ নয়। ভয় ভীতি বিহীন জীবনোৎসর্গের এক মহা-আনন্দোৎসবে সবাই মেতে উঠেছে—কার আগে প্রাণ কে করিবে দান! প্লাটুন কমাণ্ডারগণ নিজ নিজ প্লাটুন নিয়ে তৈরি। ইতিমধ্যেই দুই প্লাটুন বিপ্লবী সেনা ব্যারিকেডের পেছনে উপুর হয়ে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষমাণ। দূরে নিচে মাঠের মধ্যে তখন ব্রিটিশের গুর্খা বাহিনী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। বাঁশি বাজা মাত্রই তারা পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ায়। পরবর্তী হুকুম শুনেই তারা বন্দুকে সঙিন চড়িয়ে আক্রমণের জন্য পা বাড়িয়ে তৈরি। পরক্ষণেই হুইসিল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুর্খাবাহিনী প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করতে করতে বেয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক লক্ষ্যে বিপ্লবীদের প্রথম ভলি ফায়ার আগুয়ান ব্রিটিশ সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়—হতাহতরা ছিটকে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে। উৎফুল্ল বিপ্লবীদের বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঠোকর খেয়ে, ব্রিটিশের মনে ত্রাস জাগিয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

শুরু হলো এক মরণপণ যুদ্ধ—বিপ্লবীদের বাঁচার লড়াই। এই

সর্বকনিষ্ঠ তরুণ বিপ্লবী মনের আনন্দে বন্দুক তুলে গুলি করবার জন্য লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে না দিলে সেই মুহূর্তেই শত্রুর গুলি তার মাথা ভেদ করে চলে যেত। চলেছে তুমুল লড়াই—শত্রু সৈন্যর পাহাড়ে উঠবার জন্য বারংবার আক্রমণ বিপ্লবীদের অব্যর্থ গুলি ও বোমার আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। শত্রুর গুলি বিপ্লবীদের স্পর্শ না করে মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে ছুটে গাছের ডালপালা উড়িয়ে নিচ্ছে। রণাঙ্গন ঝড়াপাতায় ভরে গেছে। দিনের শেষে যুদ্ধবিরতির রণসিঙা (বিউগল্) বেজে উঠে। পরাজিত ব্রিটিশ বাহিনী হতাহতদের কাঁধে তুলে নিয়ে পশ্চাদপসরণ করে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ব্রিটিশ গাড়ি গাড়ি সৈন্য নিয়ে আসে। দলে গুর্খা ছাড়াও পাগড়িধারী সৈন্য দেখা যায়—সংখ্যায় তারা-ই বেশি। একই কায়দা কৌশলে শত্রুর আক্রমণ শুরু হয়। বিপ্লবী বাহিনীও উপর থেকে বোমা ও গুলি ছুড়ে ছুড়ে তাদের হটিয়ে দেয়। শত্রুর আক্রমণ তথাপি অব্যাহত। কিন্তু দুপুর নাগাদ বিপ্লবীদের অস্ত্রে গোলযোগ দেখা দেয়। অতি ব্যবহারে কিছু ব্লাণ্ডারবাস, কারবাইন, মাসকেট, ও বন্দুক অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। এখন উপায়! মহারাজ, বড়দা ও দেবযানী হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যোদ্ধাদের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে তেল ও রড দিয়ে ব্যারেল পরিষ্কার করে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। তা সত্বেও কয়েকটা একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে। ফলে গুলি বর্ষণের মাত্রা হ্রাস হলেও বিপ্লবীদের উৎসাহের কমতি ও বন্দেমাতরম্ ও বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনির বিরাম নেই। কিন্তু এই সুযোগে শত্রুর অগ্রগতি বৃদ্ধি পায়। বিপদ আসন্ন বুঝে মহারাজ নিরুপায় হয়ে নিদান-কালের জন্য রক্ষিত বোমা ব্যবহারের অনুমতি দেন। অবিরল গুলি ও বোমা বর্ষণের সঙ্গে গাছের গুঁড়ি ফেলে ফেলে শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ করা হয়। বেলা শেষে প্রত্যাবর্তনের রণশিঙা বেজে ওঠে। পরাজিত শত্রু আহত ও নিহতদের তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে।

রাতের আঁধার ধীরে ধীরে নেমে এসে দিনের শেষ আলোটুকু গ্রাস করেছে। বিপ্লবী শিবিরে যোদ্ধাদের রণ-ক্লান্তি কিংবা অবসাদের কোন লক্ষণ নেই। বিগত এবং সদ্য-সমাপ্ত যুদ্ধে তাদের মধ্যে কেহ আহত কিংবা নিহত হয় নি। নিজেদের দুর্ভেদ্য মনে করে তারা আনন্দে উৎফুল্ল। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে বিজয়-উৎসব পালন

করে। আগামী দিনের যুদ্ধে শত্রুকে কিভাবে খায়েল করবে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা ও আলোচনা চলে। খাবার আসে। মুষ্টি ভিক্ষার মতো এক মুঠো খাদ্য ও সামান্য জল আহার করে সকলেই তুষ্ট। অতঃপর একদল কাজ করে অন্য দল ঘুমোয়। ঘড়ির কাঁটার মতো এ-ভাবেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে। কর্ম অন্তে বাহিনী বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ে। একমাত্র গুপ্তচর ও প্রহরী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিবির পাহারা দিয়ে চলেছে।

পুবের আকাশের রঙ ফিকে, তারার আলো নিবুনিবু। ভোরের পাখির কলতানে উষার আগমনী বিপ্লবী শিবিরে সাড়া জাগায়। যোদ্ধাদের কেউ উঠে বসেছে, কেউ আড়মোড়া ভাঙছে, কেউ বা জেগে চোখ বুজে আরাম করছে। প্রভাত সূর্যের সোনা-রঙ চতুর্দিকের গাছপালা রাঙিয়ে বিপ্লবীদের মন আশার আলোকে রঙীন করে তোলে। সকলে হৈ হৈ করে উঠে মনের আনন্দে মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। প্রাতঃকৃত্য পাতরাশ শেষে যোদ্ধাদের কুচকাওয়াজ শুরু হয়েছে। যুদ্ধের জন্য সবাই তৈরি। এমনি সময় খবর হলো—শত্রুপক্ষ গরহাজির। তাদের উপস্থিতির কোন লক্ষণ নেই। বোঝা গেল তাদের এই নিষ্ক্রিয়তা ও অনুপস্থিতি ঝড়েরই পূর্ব লক্ষণ—প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি জনিত নয়। শত্রু নতুন করে আক্রমণের জন্য দুষ্ট ফন্দি আঁটছে, মারাত্মক কোন চক্রান্ত করছে। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ শুরু হতে পারে। সুতরাং বিপ্লবীদের আরো সতর্কতা ও তৎপরতার প্রয়োজন—শৈথিল্যের কোন অবকাশ নেই।

কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধের পাঁচি আরো শক্ত করার কাজে বিপ্লবীদের সারা-বেলা কেটে যায়। রাত্রি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দিনের শেষ আলোটুকু শুষে নিয়ে ধরণীকে গ্রাস করে। শত্রুর নজর থেকে নিজেদের আড়াল রাখার জন্য শিবির আলোবিহীন—নিবিড় অন্ধকার আচ্ছন্ন। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিবির নিঝুম নিস্তব্ধ। একমাত্র প্রহরীদের টহল ঘড়ির কাঁটার মতো অবিরাম চলছে। চতুর্দিকের পাহাড়গুলি প্রকাণ্ড কালো কালো দৈত্যের মতো নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নিচের জঙ্গল থেকে রাতের পাখির কলরব রাত্রির দ্বিতীয় যাম ঘোষণা করে। এমনি সময় চলতে চলতে প্রহরীর দৃষ্টি হঠাৎ সম্মুখের পাহাড়টার ওপর পড়তেই একটা আলো তার নজরে আসে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঐদিকে চেয়ে সে অবাক। মনে হয় আলোটা এদিক ওদিকে নড়াচড়া করছে। [illegible]

মানুষের না হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই কাউকে সংকেত জানাচ্ছে। প্রহরীর অনুশোচনা হয়। ঘটনাটা আগেই তার নজরে পড়া উচিত ছিল। তৎক্ষণাৎ সে সঙ্গীকে ডেকে পল্টন কমাণ্ডারকে খবর দিতে বলে। খবর পাওয়া মাত্র নরেশ ছুটে আসে। প্রহরী আঙুল নির্দেশে সম্মুখের পাহাড়টা দেখিয়ে দেয়। নরেশ চেয়ে দেখে সত্যই আলোর ফুলকি ইতস্তত নড়াচড়া করছে। সে প্রমাদ গোনে। ছুটে গিয়ে বিষয়টা সর্বাধিনায়কের গোচরে আনে। বড়দা ও মহারাজ সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রহরীদের হুঁশিয়ার করে প্লাটুন কমাণ্ডারদের সলাপরামর্শের জন্য আহ্বান করেন। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর মহারাজ বললেন, উপর্যুপরি দু'দিনের যুদ্ধে শত্রুর প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। ফলে তারা রাতের অন্ধকারে গোপনে সম্মুখের পাহাড়ে ঘাঁটি করে নতুন যুদ্ধ কৌশলে আমাদের আক্রমণের ফিকির করছে। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? তোমাদের বিবেচনার জন্য বলছি—আমাদের সম্মুখে তিনটি পথ খোলা—হয় এই মুহূর্তে আক্রমণ করে ওদের চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে বিনাশ করা; নয়, এখান থেকেই যুদ্ধ করে ওদের আক্রমণ প্রতিহত করে পরাজিত করা। অথবা পশ্চাদপসরণদ্বারা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় ও নব-বলে বলীয়ান হয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরাজিত করা। শত্রুর তুলনায় আমরা অস্ত্রবলে হীন ও লোকবলে ক্ষীণ। সুতরাং আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা কি হবে তা ভেবে চিন্তে অনতিবিলম্বে স্থির করা অত্যাবশ্যক। সময় বেশী নেই—রাত্রির শেষ যাম।

ভাষণ শেষে মহারাজ বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য গম্ভীর কণ্ঠে গীতার বাণী আবৃত্তি করেন:

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।

(ধর্মযুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিক শ্রেয় আর কিছু নাই।)

সকলের কণ্ঠ থেকে সমর্থন সূচক বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়। সেই সঙ্গে তাদের এখান থেকেই যুদ্ধে শত্রুকে মোকাবেলা করার ইচ্ছা ঘোষিত হয়। মহারাজার মুখে কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। পল্টন কমাণ্ডারদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ব্যারিকেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। সম্মুখে উঁচু পাহাড়টায় পুনরায় শত্রুর ঘাঁটি লক্ষ্য-পথে এনে কমাণ্ডারদের অগোচরে আক্রমণাত্মক রণকৌশল স্থির করতে বলে তিনি অদূরে ঝোপের আড়ালে শত্রুর অবস্থান নিরীক্ষণ-রত দণ্ডায়মান বড়দার

সঙ্গে মিলিত হন। মহারাজ তাঁকে বললেন—বাহিনী এখান থেকেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। অতঃপর রণ-কৌশল এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে উভয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরিশেষে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উভয়ে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। সকলে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, হুকে জয়, নাহি ভয় ধ্বনি দ্বারা তাঁদের সংবর্ধিত করে। অনুতোষ এগিয়ে এসে যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বাধিনায়ককে অবহিত করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখে—দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান হেতু শত্রুপক্ষের অবস্থানের দূরত্ব নিরূপণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—রাইফেল ব্যতীত শত্রুকে আঘাত হানা সম্ভব নয়। সে কারণে বাহিনীর মধ্যে যারা রাইফেলধারী নিপুণ গুলিবাজ (সার্প শুটার) তারাই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুকে লক্ষ্য করে প্রথমেই যুগপৎ গুলি বর্ষণ (ভলি ফায়ার) করবে। নির্বাচিতদের মধ্যে দেবযানীও অন্তর্ভুক্ত।

সব শুনে মহারাজই—তথাস্তু বলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে—নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ (বাসনা শূন্য মমতা রহিত ও শোকত্যাগ করে যুদ্ধ কর) বলতে বলতে প্রস্থান করেন। সকলের সমবেত কণ্ঠধ্বনি—উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নির্ভয়ে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই—ভোরের আকাশ বাতাস মথিত করে প্রতিধ্বনি তুলে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঠোকর খেয়ে খেয়ে দূরে দূরান্তে মিলিয়ে যায়।

ভোর হয়েছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশা গাছপালা সব জড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়েও তা লেপ্টে রয়েছে। সম্মুখের ও আশপাশের পাহাড় আদৌ দৃষ্টি গোচর নয়। ব্যারিকেডের পেছনে ১৪টা রাইফেলের মুখ শত্রু ঘাঁটি তাক করে আছে। সেটা দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলেই একসঙ্গে গর্জে উঠবে। সকলেই উৎফুল্ল চিত্তে শত্রুকে আক্রমণের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। দেবযানী বন্দুক হাতে অনুতোষের পাশে দাঁড়িয়ে। মনে মনে সে তার সমুদ্রপল্লির জীবনের সুখ দুঃখ কান্না বিজড়িত ফেলে আসা নানা রঙের দিনগুলি পরিক্রমণ করছে। নিজেকে সফল ও পরিতুষ্ট করবার বাসনায় সে মায়ের ও মামার অপরিসীম স্নেহ, ভাইয়ের ভালবাসা পরিত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। যাকে সে প্রেমপ্রীতি ভালবাসা ঢেলে একান্তভাবে জেনেছে

তাকেই সে পরিপূর্ণভাবে জীবন মরণের সাথী রূপে পেয়েছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য দু'জনে একই সঙ্গে লড়বার রঙীন স্বপ্ন আজ তার সফল হতে চলেছে।

আনমনা দেবযানীর হস্তধৃত বন্দুকের মুখ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। সেটাকে স্থির করবার মুহূর্তে তার বাঁ হাত অমুতোষের ডান হাতে ছোঁয়া লাগতেই তার শরীরে পুলক শিহরণ জাগে। সেই মুহূর্তেই দলপতির কণ্ঠস্বর শোনা যায়—কোম্পানী (be ready) তৎপর হও। স্থির হয়ে দাঁড়াও, বন্দুক নিশানা কর। নির্দেশ মতো দেবযানী ঠিক হয়ে দাঁড়ায়। চেয়ে দেখে সম্মুখের পাহাড় থেকে কুয়াশার আচ্ছাদন ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে। আকাশের কুয়াশার আবরণও বিলীয়মান, সূর্যালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। সম্মুখের পাহাড়ে শত্রু-ঘাঁটি স্পষ্ট দৃশ্যমান। পর মুহূর্তেই হুকুম শোনা গেল—ফায়ার (fire)। পরপর তিনবার এক সঙ্গে ১৪টি রাইফেল গর্জে উঠলো। গুলি বর্ষণের পর দেখা গেল হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণে শত্রুর ঘাঁটি তছনছ হয়ে গেছে—সৈন্যরা ছুটোছুটি করছে। এ পাহাড়ে হর্ষোৎফুল্ল বিপ্লবী বাহিনী বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে শত্রুর অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করে দিগ্‌বিদিগ্‌ কাঁপিয়ে তোলে। তারপর শুরু হলো উভয় পক্ষের বিক্ষিপ্ত (sporadic) গুলি বর্ষণ। সুবিন্যস্ত ব্যাবিকেডের আড়ালে অবস্থিত বিপ্লবী বাহিনীর কোন ক্ষয় ক্ষতি তখনো পর্যন্ত হয়নি। অপর দিকে শত্রু-ঘাটিতে ছোটাছুটি দেখে তাদের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা আঁচ করা যায়। এ ভাবেই যুদ্ধ মধ্যাহ্ন অবধি গড়িয়ে চলে। অতঃপর বাহিনীতে দল বদলের পালা—নরেশের নেতৃত্বাধীন পল্টন অমুতোষের পল্টনের স্থান গ্রহণ করে। পূর্বের মতোই উভয় তরফে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলেছে। আচম্বিতে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মতো মুহূর্তের মধ্যে ক্যাট ক্যাট শব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিন-গানের অনলবর্ষী গুলি ব্যারিকেড ঝাঁঝড়া করে পেছনে দণ্ডায়মান যোদ্ধাদের শুইয়ে দেয়। মহারাজ-এর সকলে শুয়ে পড়ো—সাবধান বাণী উচ্চারণের আর অবকাশ হলো না। ঘটনাটা বোঝা মাত্রই বড়দা নিজেকে গাছের আড়ালে রেখে চিৎকার দিয়ে অমুতোষ ও প্রভাতকে হামাগুলি দিয়ে গাছের আড়াল থেকে মেশিনগান লক্ষ্য করে গুলি চালাবার আদেশ দেন। কিন্তু বৃথা—ততক্ষণে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে পাহাড়ের অন্তরালে অন্তর্হিত। ধীরে ধীরে আঁধার নেমে এসে চতুর্দিক

ঢেকে ফেলে সব কিছু দৃষ্টির আড়াল করে দেয়। শত্রু পক্ষের মেশিন গানও স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিপ্লবী শিবিরে বিষাদ-ঘন সন্ধ্যা এক শোকাবহ করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে শহিদদের ধরাধরি করে এনে একপাশে শুইয়ে রাখা হচ্ছে। আহতদের অমুতোষ টর্চের আলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা করছে। আহত নিহতদের রাইফেল বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার গুলিভর্তি ব্যাণ্ডলিয়ার ইত্যাদি ইতিমধ্যেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মশাল জ্বালবার উপায় নেই। শত্রু তা লক্ষ্য করে আবার নির্বিচারে গুলি চালাতে পারে। সুতরাং সব কিছুই উন্মুক্ত আকাশের নিচে নক্ষত্রালোকে নিষ্পন্ন হচ্ছে। সকলেই ব্যস্ত। এই শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিবেচনা পর মহারাজ ও বড়দা আজ রাত্রেই এই ঘাঁটি পরিত্যাগের জন্য এক চরম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেননা অস্ত্র ও লোকবলে দীন হীন অবস্থায় এখান থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা আত্মহত্যারই সামিল। ইতিমধ্যেই শত্রু বিপ্লবীদের অবস্থা বুঝে নিয়েছে। ভোর হতেই তারা দু'দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে জাঁতা কলে ফেলে তাঁদের ইঁদুরের মতো পিষে মারবে। কিন্তু শহিদদের এবং আহতদের কি ব্যবস্থা হবে। রাতের অন্ধকারে তাদের এভাবে ফেলে রেখে গেলে জন্তু জানোয়ার তাদের ছিঁড়ে খাবে। তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে খবর এলো পল্টন কমাণ্ডার নরেশের জ্ঞান ফিরেছে। সব কিছু খোঁজ খবর নেবার জন্য মহারাজ নিজে অকুস্থলে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখেই অমুতোষ জানালো যে আহতদের মধ্যে দু'জন ব্যতীত সকলেই গত হয়েছে। শুনে তিনি নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অমুতোষকে আহত দু'জনের সঙ্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। শুনে নরেশ ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়—দাদা অমন কাজ করবেন না। তাতে আপনাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তার চাইতে আমাকে গুলি ভর্তি একটা রিভলবার দিন। এক হাত পঙ্গু হলেও অন্য হাত দিয়ে এখান থেকেই শবভুখ জন্তু জানোয়ারদের অবশ্যই তাড়াতে পারবো। শুনে মহারাজ ঐ দুই আহত—নিরোদ ও অনন্তের অবস্থা অমুতোষকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলেন যে তাদের অচৈতন্য (coma) জ্ঞান আর ভাঙবার নয়। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মহারাজ অমুতোষের রিভলবারটা চেয়ে নিয়ে নরেশের নিকট গিয়ে যেখানে উঠে বসেছে

তাঁর হাত থেকে রিভলবার নিয়ে নরেশ বলে—দাদা, রাত ভোর না-হওয়া অবধি আমি এদের পাহারা দেব। তারপর শিবির পরিত্যাগ করবো। শত্রুর হাতে সহজে ধরা দেব না। মহারাজ তার মাথায় হাত রেখে বললেন—তুমিই পরুষর্ষভ, সম দুঃখ-সুখং ধীরং, বলতে বলতে অদূরে শায়িত চির নিদ্রাভিভূত বিপ্লবীদের পাশে গিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে দাঁড়ান। তারপর উবু হয়ে একে একে সকলের মাথায় হাত রেখে বন্দেমাতরম্ বলতে বলতে প্রস্থান করেন।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। শহিদদের শেষ বিদায় জানাতে বড়দা এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে অমুতোষ এগিয়ে এসে নিরোদ ও অনন্তের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের খবর তাঁর গোচরে আনে। সংবাদ শুনে বড়দা নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন অমুতোষও একই ভঙ্গীতে তাঁর পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে যায়। উন্মুক্ত আকাশের নিচে ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে তারা বারোজন শহীদ পাশাপাশি শুয়ে আছে। সকলেই নিরাবরণ—ঢেকে দেবার মতো কিছু নেই। এক শোকাবহ করুণ দৃশ্য। এই অবস্থায় এদের ফেলে যেতে হচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বড়দার কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে প্রত্যেকের কপালে চুমো দিয়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। অদূরে নরেশের অস্পষ্ট বেদনার্ত কণ্ঠ-স্বব শোনা যাচ্ছে। তিনি তার কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে জ্বর অনুভব করেই তার পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে শহীদদের উদ্দেশ্যে সেই মরমিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?

তারপর সকলের উদ্দেশ্যেই বললেন—প্রিয় বন্ধু গণ, তোমাদের এভাবে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। অন্তর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লববহ্নি অনির্বান শিখায় জ্বালিয়ে রাখার জন্য যেতে হচ্ছে। হাত তুলে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ বলতে বলতে তিনি অন্ধকারে অন্তর্হিত হন। নরেশ অন্ধকারে তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে তখনো যেন শুনতে পাচ্ছে—

রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবেনা দিন—এত শহিদের রক্ত-ঝরা আকাঙ্খিত স্বাধীনতার সূর্যকরোজ্জ্বল সেই শুভ দিন!

শিবির ছেড়ে যাবার সময় আসন্ন। বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তার পূর্বে শহিদদের দাহকার্য এক সঙ্গে নিষ্পন্ন করবার মনস্থ করেও ক্ষান্ত হন, এই ভেবে যে শত্রুপক্ষ শহিদদের নামধাম ইত্যাদির খোঁজ খবর নিয়ে তাদের পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেবে। নচেৎ স্বাধীনতার জন্য তাদের আত্মহুতির স্মৃতি ইতিহাস থেকে চিরতরে মুছে যাবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাহিনী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দুই সারিতে দাঁড়িয়েছে। কুচকাওয়াজ শুরু হয়েছে। যোদ্ধাদের প্রথম সারি বড়দার নেতৃত্বে নদী পেরিয়ে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে শক্তি সংহত করে পুনরায় শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দ্বিতীয় সারি মহারাজার অধীনে বনে জঙ্গলে থেকে গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করে শত্রুকে চোরাগোপ্তা আক্রমণে নাজেহাল করে পিছু হটতে বাধ্য করবে। অনুতোষ তার পল্টন নিয়ে মহারাজার এবং প্রভাত তার পল্টন এবং নরেশের পল্টনের অবশিষ্টদের নিয়ে বড়দার অনুগমন করবে। অদূরে যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদরা শুয়ে আছে—জননীর কোলে শিশু যেমতি লভয়ে বিরাম। তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে সর্বাধিনায়কের আদেশ মতো বাহিনী সোজা হয়ে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়। পরবর্তী আদেশে বাহিনী বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে টর্চের আলো নিম্নমুখী রেখে শহিদদের তিনবার প্রদক্ষিণ করে সামনে এসে নত-মস্তকে ডান হাতে বন্দুক কাত করে এগিয়ে ধরে অশ্রুজলে তাদের কাছে থেকে বিদায় নেয়। রাতের অন্ধকারে—আকাশ ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

এক মর্মান্তিক নিষ্করুণ পরিস্থিতি। বিচ্ছেদ বেদনায় জর্জরিত নিরুপায় নির্মম নিশীথে সকলে সজল চোখে ঐতিহাসিক যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করে। মনের ব্যথা বিমর্ষতা কাটাবার জন্য মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ধ্বনিতে রাতের অন্ধকারে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে তারা পর্বত অবরোহণ আরম্ভ করে। অন্ধকারে চলার পথের সকল বাধা বিঘ্ন ও ধাঁধা অতিক্রম করে বাহিনী বিজয়ীর মতো উন্নত শিরে, নিঃশঙ্ক চিত্তে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে চলে:

বিপ্লবের দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এলো
ঝড়ো যুগের মাঝে।
দামামা তাই উঠেছে বাজি
ঝড়ো যুগের মাঝে ॥ মাভৈঃ মাভৈঃ

আচম্বিতে অন্ধকার ভেদ করে কণ্ঠধ্বনি হলো : হল্ট (দাঁড়াও)। বাহিনী থমকে দাঁড়ায়। মশাল জ্বলে ওঠে। চারদিকের গাছপালা সব আলোয় উদ্ভাসিত—যেন নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত। অনেকক্ষণ অন্ধকারের পর আলোর ছোঁয়া লেগে বিপ্লবীরা উল্লসিত। তাদের কণ্ঠ নিসৃত বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি ঘন জঙ্গলের ঠাস বুনান গাছপালায় লেগে ঘুরপাক খেয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে যায়। এবার বাহিনীর বিভাজনের পালা—মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গিত, দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা বেদী দু'ভাগে বিদীর্ণ হয়ে গেল। উন্মোচিত হলো এক বেদনাকর দৃশ্য পট। প্রভাত ও অনুতোষের পল্টন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দুই সারিতে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়দা ও মহারাজ উভয়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। মশালের আলোতে তাঁদের মুখাবয়ব কঠোর সংকল্পের প্রতিচ্ছবি ও আশার আলোকে দেদীপ্যমান। মনে হচ্ছে যেন দুই মূর্তিমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বড়দাই প্রথমে বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করেন—প্রিয় সহযোদ্ধগণ, এক অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে স্বাধীনতা বিপ্লবের স্বার্থে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার পর আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে—বাহিনীকে দ্বিধা হয়ে স্বকার্য সাধনে ভিন্ন ভিন্ন পথে এগোতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। বন্দেমাতরম্ বলেই তিনি ভাষণ শেষ করেন। অতঃপর মহারাজ সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—বড়দার বক্তব্যের সঙ্গে আমি এক মত। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের শত্রুর আড়ালে রেখে আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি করে ইহাই একমাত্র পন্থা—নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। প্রভাত তার পল্টন নিয়ে বড়দার অনুগামী হবে। অনুতোষ তার পল্টন সহ আমার অনুগমন করবে। এখনই যাত্রা করতে হবে। বিলম্বে বহু বিঘ্ন।—ভস্মাচ্ছাদিত কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়, বলেই তিনি অদূরে দণ্ডায়মান বড়দার সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। বিভক্ত বাহিনীর যোদ্ধারা একে অন্যকে আলিঙ্গন করে অশ্রু জলে পরস্পর থেকে বিদায় নেয়। বন্দেমাতরম্

বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে ভিন্ন ভিন্ন পথে দলপতিদের অনুগমন করে জঙ্গলের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। তাদের নির্ভীক সুশৃঙ্খল পদক্ষেপে আকাশে বাতাসে বুঝি একই ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে—

চলরে চলরে চল, জীবন আহবে চল।
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল
চলরে চলরে চল ॥

গভীর রাত্রির তারা খচিত আকাশ-ই বিপ্লবের প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতনের একমাত্র নীরব সাক্ষী হয়ে রইলো।



ইংরেজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর বিপ্লবী বাহিনীর হটে যাওয়ার দুঃসংবাদে চিরঞ্জীব যার পর নাই বিচলিত। বিপ্লবীদের মধ্যে একমাত্র মহারাজকে সে জানে। তাঁর উপর তার অসীম ভক্তি বিশ্বাস। তিনি রণে ভঙ্গ দেবার পাত্র নন। নিশ্চয়ই পরবর্তী বড় রকমের যুদ্ধের পরিকল্পনা রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চাদপসারণ করেছেন মাত্র।

নাহি ভয়, হবে জয়; 'মাভৈঃ মাভৈঃ।'

চলতে চলতে নিজের মনকে এইরূপে নানাভাবে প্রবুদ্ধ করে চিরঞ্জীব তার অন্তরের বিষণ্ণতার কালো মেঘ কিছুটা কাটিয়ে উঠে। আশ্রমে এসে দেখে রঘু সেবা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, আসবাব সব নিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে লেংচাকে নিয়ে গুছোবার কাজে লেগে যায়। অনেক রাত্রে কাজ শেষে খাওয়াদাওয়া করে রঘু ও লেংচা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে কেবল ছটফট করছে। দুশ্চিন্তা তাড়িত চিরঞ্জীবের হঠাৎ মনে হলো সে যেন ঝড়-ঝাঞ্ঝা তাড়িত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তরঙ্গে দিগনির্ণয় যন্ত্র বিহীন এক নাবিক—কি করে তরী পাড়ে ভেড়াবে। এইসব চিন্তা করতে করতে রাত্রি শেষের দিকে সে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে। বেলাতে ঘুম ভাঙে। ভোরের কাজ সেরে সেবা কেন্দ্রে দু'কে ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতির ফর্দ তৈরি করে রঘুকে নিয়ে বাজার থেকে সেসব কিনে আনে। ওষুধ ও যন্ত্রপাতির নাম, কখন ব্যবহার করতে হবে তা বলে বলে রঘুর হাত দিয়েই আলমারি কিম্বা বাক্সে রাখে যাতে

প্রয়োজনের সময় সে নিজের হাতে বের করে তা ব্যবহার করতে পারে। এইসব করে খাওয়া দাওয়া সারতে বেলা গড়িয়ে যায়। এমনি সময় চৌকিদার গফুর এসে হাঁক পাড়ে—কোথায় হে রঘু, বৈরাগী ভাই বা কোথায়। চিকিৎসার জন্য কিসব ঘর দুয়ার বানালে; ব্যবস্থাদি করলে, দেখি।

চৌকিদারের ডাক শুনে উভয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এসো, এসো বলে তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সব দেখে শুনে চৌকিদার অবাক হয়ে বলে—কামাল করেছ ভাই! এতো দেখছি এক সরকারী হাসপাতালেরও বাড়া! গরীব দুখীর মহা উপকার করলে। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। গাঁও গাঁও এ খবর পৌঁছে দিতে হবে। সকলে এসে দেখুক তোমরা তাদের জন্য কি ইলাহি কাণ্ড করেছ। আজ চলি ভাই, দাঁড়াবার ফুরসত নেই। মহা ঝঞ্ঝাটে আছি। নানা রকম সাহেবসুবার আনা গোনা চলছে। খাটাখাটুনির অন্ত নেই। জঁাদরেল দুই লালমুখো সি ডি পুলিশ এসেছে। তাদের সঙ্গে দারোগা পুলিশ সব স্টেশন চত্বরে থানা গেড়েছে। কদ্দিন জ্বালাবে, খোদায় মালুম! তাদের আর্দালীর মুখে যা শুনলাম তা এক দিল-ফাটা দুঃখের কাহিনী—চোখের জল রোখা যায় না। ঘটনাটা শুনবার জন্য রঘু ও বৈরাগী তাকে চেপে ধরে। এড়াতে না পেরে গফুর বলতে থাকে—কয়েকদিন পাহাড়ে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর স্বদেশী বাবুরা সেখান থেকে সরে গিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে। সরকার সর্বত্র—থানা, গ্রামপঞ্চায়েত, চৌকিদার, পুলিশ চৌকি এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তার ওপর সকলকে ভাঁওতা দেওয়ার জন্য সরকার এদের হিন্দু ডাকাত বলে প্রচার করছে এবং ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক ইনামের লোভ দেখিয়েছে। সেদিন খুব ভোরে নদী পেরিয়ে স্বদেশীবাবুদের জনা-তিনেক খাল ধার দিয়ে চলেছে। খাল পেরোবার জন্য পুলে উঠতেই অদূরের পুলিশ চৌকি থেকে হাঁক দেয়—দাঁড়াও। তারা দাঁড়ায় না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে ডাকাত ডাকাত চিৎকার দিয়ে তাদের তাড়া করে। পুলের ওধারে বাজার। পুলিশের হাঁক ডাকে দোকানীরা জেগে ওঠে। অগত্যা পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা গুলি চালায়। তাতে একজন পুলিশ মারা যায় অন্যজন আহত হয়। ইতিমধ্যে পুলিশের ডাকু ডাকু চিৎকার ও গুলির আওয়াজ শুনে দোকানীরা লাঠি সোঁটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ডাকু কোথায়!

কিছু দোকানী কয়েকটি ছেলেকে মাঠের দিকে দৌড়তে দেখে তাদের পিছু নেয়। ততক্ষণে তারা প্রাণপণে ছুটে মাঠ ছাড়িয়ে গ্রামে ঢুকেছে। দৌড়তে দৌড়তে এক চাষীর বাড়ি ঢুকে পড়ে। মুসলমান চাষী ও তার বিবি সবে ঘুম থেকে উঠে এসে দাওয়ায় বসেছে। এমনি সময় ছেলেরা ছুটে তাদের সামনে এসে বলে নানা নানী আমাদের বাঁচাও—কোথাও লুকিয়ে রাখ। বুড়োবুড়ীর তাদের দেখে মায়া হয়। তার উপর পেছনে লোকজনের ডাক চিৎকার শুনে বুঝলো যে তারাই এদের তাড়া করেছে। ছেলে কয়টিব জীবন বিপন্ন। সুতরাং বুড়োবুড়ী দেরি না করে দু'জনকে ডোবার ধারে খড়ের গাদায় আর একজনকে রসুই ঘরের পেছনে ছাইয়ের গাদায় কচুবনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। হৈ হৈ করে পুলিশ চৌকিদার সহ লোকজন এসে বুড়ো বুড়িকে জিজ্ঞাসা করে—ডাকুরা ছুটে এ দিকে এসেছে, তারা কোথায়? বুড়োবুড়ি ছাপ জবাব দেয়—জানিনা। তথাপি পুলিশ চৌকিদার লোকজন ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক দেখে। তারপর ঘরের বাইরে আশপাশ খোঁজাখুঁজি করে কাউকে না পেয়ে হৈ হৈ করে অন্যদিকে ছোটে। হল্লা সরে যেতেই বুড়ি তৎক্ষণাৎ লুকনো যায়গা থেকে ছেলেদের ঘরে নিয়ে এসে বলে—বাবারা, তোমরা এখানে থাকলে বাঁচাতে পারবো না। তোমরা বরং এখান থেকে কিছু দূরে একটা প'ড়ো দীঘির ধারে কাশ ও হোগলা বনে গিয়ে লুকোও—এখনই সময়, গাঁয়ের লোক সব অন্যদিকে গেছে। —ঠিক আছে নানী, তুমি দূর থেকে জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও, আমরা যাচ্ছি। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে নানী। শুনে বুড়ি তৎক্ষণাৎ তাদের যেতে না দিয়ে ঘরে ঢুকে পান্তা ভাত আর ছালন একটা সানকিতে বেড়ে দিয়ে বলে শেষ বেলায় আমি নাস্তা নিয়ে যাবো—কিচ্ছু ভেবোনা। খাওয়া শেষে ছেলেদের বাড়ির বাইরে নিয়ে ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা দূরের দীঘিটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—খোদা তোমাদের ভালো করুন, বলে দোয়া মাঙে। ছেলেরা এদিক ওদিক চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে চট্ করে জঙ্গলে ঢুকে যায়। এক ছোঁড়া তখন দীঘির ধারে কর্ম করছিল। তার দৃষ্টি ঐ দিকে পড়তেই সে উঠে পড়ে। কাশ বনের ধারে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে সে তাদের পাত্তা পায়না। ছোকড়ার মনে সন্দেহ জাগে। এর আগে ডাকু ডাকু সোরগোল তার কানে এসেছে। সুতরাং সে গ্রামে পৌঁছে ঘটনাটা বলে। একান সেকান হয়ে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের লোক একদল পুরি

খবর দিতে যায়। আরেক দল লাঠিসোঁটা নিয়ে দীঘির দিকে ছুটে যায়। চেঁচামেচি ও চিৎকার দিয়ে হোগলা ও কাশবন এলোপাতাড়ি পেটাতে পেটাতে তারা এগোতে থাকে। জঙ্গলের ভেতর বাবুরা বোধ-হয় লোকজনকে ভয় দেখাবার জন্য গুলি ছোঁড়ে। তাতে একজন আহত হয়। ভয় পেয়ে তারা আর এগোয় না। কেবল হৈ চৈ করছে। ততক্ষণে এক গোরা পুলিশ ফৌজ সহ এসে পড়েছে। লোকজনকে হটিয়ে দিয়ে তারা চারদিক ঘিরে ফেলে এগোতে থাকে। সুরু হলো এক বিষম যুদ্ধ। জঙ্গলের যেদিক থেকে গুলি আসছে সেদিক লক্ষ্য করে পুলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে আর এগোচ্ছে। এভাবে অনেকক্ষণ লড়াই চলে। তারপর আর বাবুদের সাড়া নেই। কোন গুলিও আসছে না। পুলিশ এগিয়ে চলে। বেলা শেষ—সাঁঝের অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই অন্ধকারে বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ দেখতে পায় বাবুরা তিনজন পাশাপাশি শুয়ে আছে। শরীর রক্তে মাখামাখি! ডাকাডাকি, নাড়া চাড়াতে কোন সাড়া নেই। বুঝলো তাদের এন্তেকাল হয়েছে, বলেই গফুর গামছা দিয়ে চোখ মুছে বেরিয়ে যায়। সকলে শোকে মুহ্যমান হয়ে নীরবে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

চৌকিদারের মুখে বিপ্লবীদের নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী চিরঞ্জীবকে বুঝি পাগল করে তোলে। কি করে সে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবে। তার অন্তরে জিঘাংসার আগুন জ্বলছে। ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে বাংলোর দুই পুলিশ সাহেবকে খুন করে আর স্টেশনে অবস্থানকারী সিপাহী ও পুলিশগুলিকে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করে। উত্তেজনায় সে কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় তার মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে—এ সময়ে এখানে পুলিশ, মিলিটারি ও টিকটিকির আবির্ভাব কেন? খোঁজ নিতে হয়। সে নিজে একজন ফেরারী—তার নামে হুলিয়া রয়েছে। সুতরাং তাকে খুব সাবধানে এগোতে হবে, তবে বিপ্লবীদের হত্যার বদলা তাকে নিতেই হবে এই তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়-নিশ্চয় ও নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে সে মনে মনে বিখ্যাত সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে:

মুক্তি-রণ ঘোষণাবাণী
জাগাও বীররবে,
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু—
পরাণ দিয়ে বাঁধতে হবে সেতু॥

এই হত্যাকাণ্ড থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে বিপ্লবীরা নদীর ওপাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মহারাজ, তিনি কোথায়? তিনিও কি ঐ দিকে গিয়েছেন? চিরঞ্জীবের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। মনে পড়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পুব-পাহাড়ের বহুদূর পর্যন্ত তরাই উৎরাই পরিভ্রমণ। পেছনেই চম্পকারণ্য—সেও তাঁর নখদর্পণে। তাহলে তিনি কেন ওদিকে যাবেন? এ প্রশ্নের উত্তর সেও খুঁজে পায় না। বিভ্রান্ত চিত্তে সে বেরিয়ে যায়। বুড়ো শিবতলা এসে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণের পর অপেক্ষা করাই তার সমীচীন মনে হয়।

বেলা শেষ। সে উঠে পড়ে। বাজার গপ থেকে হালের সংবাদ আহরণের জন্য সে ঐ দিকে রওনা দেয়। সেখানে পৌঁছে একটা দোকানে ঢুকে কিছু খাবার চেয়ে বসে পড়ে। ছোকরাকে খাবার দিতে বলে দোকানী এসে তার পাশে বসে বলে—কি বৈরাগী ভাই তোমার যে আর দেখা নেই।

—চিকিৎসা কেন্দ্র নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত—তাই আসা হচ্ছে না।

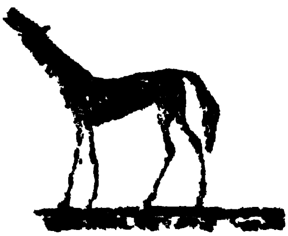
—কিন্তু এদিকে তো মহা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড—পুলিশ এসে স্টেশনে থানা গেড়েছে। রেলে ওঠা-নামা যাত্রীদের তল্লাশি করছে। কখনো-সখনো রেলগাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের বাক্স পেটার খুলে দেখছে। যেখানে রেল-পুল ভেঙেছিলো সেখানেও পুলিশ-ক্যাম্প বসেছে—দিবা-রাত্রি রেল লাইন পাহারা দিচ্ছে। চৌকিদার বলছিলো, পুব-পাহাড়ে যাতায়াতকারী গাড়ি, ঘোড়া, লোকজনকেও তল্লাশ করবে—তার জোর-জোর চলেছে। তাজ্জব ব্যাপার—ঝড় উঠলো হোথা দাপট এলো হেথা!

মনের উৎকণ্ঠা চেপে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে চিরঞ্জীব জবাব দেয়—কেন ভালোইতো হলো, চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে রেহাই পেলেন। —রাধা মাধব বলে সে বেরিয়ে যায়। আরো কয়েক জায়গা ঘুরে একই কাহিনী শুনে সে ডাক্তারখানায় যায়। ডাক্তার বাবুকে সেবা কেন্দ্র পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তার মনেও অন্ধকার জমাট বাঁধছে। শত্রু-পক্ষ নদীর ওপারে বিপ্লবীদের ঘিরে যেভাবে খুন করছে এখানেও কি তারা সে কৌশলে প্রয়োগের মোহড়া দিচ্ছে! বিপ্লবীদের বহির্গমন রুদ্ধ করে তাদের ইঁদুরের মতো যাঁতা কলে পিষে মারবে! তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি শত্রু-পক্ষ খবর পেয়েছে যে বিপ্লবীদের একদল এদিকে এসেছে কিম্বা আসছে? মহারাজও হয়তো এই দলে আছেন ভেবে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তিনি এদিকে এলে নিশ্চয়ই তার খোঁজ নেবেন। ইতিমধ্যে তাঁদের সাবধান করে দিতে হবে—শত্রুপক্ষ এখানে ওঁৎ পেতে আছে। কিন্তু মুশকিল হলো সে তো বিপ্লবীদের কাউকে চেনে না কিংবা তাদের কোড নম্বরও জানেনা। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চিরঞ্জীব অন্ধকারে পথ বেয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে—কে আগে গেল, কে পিছে এলো সে খেয়াল নেই! রাস্তায় কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেতেই তার হুঁশ হয়। নিজেকে সে ধিক্কার দেয়, এভাবে বে-হুঁশ হয়ে চলা ঠিক হয়নি। যখন পুলিশ ও তার টিকটিকি গিরগিটীর দল কাছে পিঠে আছে। দূর থেকে অন্ধকারে উঁচু ঢিবিটা নজরে পড়তেই সে কোথায় এসেছে বুঝতে পারে। রাস্তায় লোক চলাচল বিরল—হয়তো পুলিশের ভয়। কবরখানা ছাড়িয়ে দীঘির ধার ধরে চলতে চলতে সম্মুখে চেয়ে মনে হলে কয়েকটা অস্পষ্ট মূর্তি এগিয়ে আসছে। সে মাঠে নামবার জন্য পা বাড়িয়েছে এমন সময় তিনজন লোক তার পাশ কেটে চলে যায়। মাঠে নেমে দিক ঠিক করে হাঁটতে শুরু করেছে সেই সময় পেছনে "রাধা মাধব" শুনেই চিরঞ্জীব থমকে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে চায়। এই সাংকেতিক শব্দ (pass word) তার পরিচিত কেবল একজনই জানে—সে নিতাই। তবে কি সে ফিরে এলো! অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করছে। নিতাই কাছে আসতেই সে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে আসতে বলে—কেননা এখানে শত্রুর পুলিশ ও টিকটিকির দল অস্তানা গেড়েছে। নিতাই-এর প্রত্যাবর্তনে চিরঞ্জীবের মনে যেরূপ ভরসা জেগেছে তদরূপ ভাবনাও হচ্ছে—এদের নিয়ে কি করবে এবং কোথায় কি ভাবে রাখবে। সঙ্গীদের নিয়ে নিতাই এসে তাদের আকস্মিক অন্তর্ধান ও পুনরাগমন প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে—দলের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের যেতে হয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। শহরে প্রবেশের সমুদয় রাস্তাঘাট পুলিশ কর্তৃক

অবরুদ্ধ। তারা প্রবেশকারীর শরীর তল্লাশীর সঙ্গে নানা কৌশলে নির্যাতন চালাচ্ছে। সুতরাং শহরে ঢোকার প্রচেষ্টা ছেড়ে শত্রুকে এখানেই মোকাবিলার সংকল্প নিয়ে ফিরে এসেছে।

চিরঞ্জীব নিতাই-এর কথা শুনছে আর মনে মনে ভাবছে—এতদিন সে যা চেয়েছে তা রূপায়িত করার মস্ত সুযোগ এসেছে। কথা শেষে চিরঞ্জীব কাছে এসে দেখে সকলেরই দরবেশ সাজ—মানিয়েছে বেশ। সুতরাং ওদের থাকা খাওয়া চলাফেরা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। কবরখানার পেছনে পশ্চিম কোণে মাঠের ধারে পুরনো মসজিদে তাদের আস্তানা নিতে এবং ফের দেখা হবে বলেই সে চলে যায়।



পাহাড়ে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে চারদিন ব্যাপী প্রচণ্ড ঐতিহাসিক লড়াইয়ের পর বড়দার নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী বাহিনীর এক অংশ নদী পেরিয়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। সে যুদ্ধের বুঝি আর শেষ নেই। নানা ঘটনা বিজড়িত স্বাধীনতা অর্জনের স্মরণীয় সেই প্রাণপণ রক্তঝরা একের পর এক যুদ্ধ যেমনি দুঃসাহসিক তেমনি বেদনাময়। আর অন্যদিকে মহারাজ-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনীর অপর অংশ এক বিপজ্জনক অভিযানে কয়েকদিন অবিরত পাহাড় পর্বত আরোহণ অবরোহণের পর এক নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। নদীর বুকে ছোট বড় পাথর ও উপলখণ্ড ছড়ানো। তারই মাঝখানে শীর্ণ জলধারা তরতর করে বয়ে চলেছে।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠেছে। আধা আলো অন্ধকারে ওপারের গহনবন পরিবৃত পর্বতমালা—মনে হয় বিরাট এক দৈত্যপুরী। পূবআকাশে ঐ পুরীর আড়াল থেকে ধীরে ধীরে লাল টকটকে প্রকাণ্ড থালার মতো সূর্য উঠে চতুর্দিক যেন সোনা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে এক অপরূপ অনির্বচনীয় মন-লোভা দৃশ্য—চোখ ফেরানো যায় না। নদীর ধারে আর

অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। কেননা বেলা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠুরিয়া ও জেলেদের আনাগোনা শুরুর আশঙ্কা রয়েছে। নদী পেরিয়ে মহারাজ সদলে অরণ্যে প্রবেশ করে এক পাহাড়ের নাতি-উচ্চ দেশে শিবির স্থাপন করে। প্রাতরাশের পর যোদ্ধাদের বিশ্রামের আদেশের সঙ্গে সুবোধকে শিবির পাহারার ভার দিয়ে মহারাজ অনুতোষকে নিয়ে শিবির পরিত্যাগ কালে দেবযানী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রহরীর কার্যভার গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেই মহারাজ—তাই হোক, বলে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যান।

ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মহারাজ অনুতোষকে নিয়ে পাহাড়ের শীর্ষে এসে পৌঁছেন। সূর্য মধ্য গগনে পৌঁচেছে। গাছপালা জঙ্গল এড়িয়ে পুবপ্রান্তে একটু খালি জায়গায় অনু-তোষকে দাঁড় করিয়ে মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন—সম্মুখে চেয়ে কি দেখছো? অনুতোষ দৃষ্টিপাত করে হাঁ হয়ে যায়। প্রথমে কিছুই বলতে পারেনা। তারপর আস্তে আস্তে বলে—যা দেখছি তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। তবে স্থূল দৃষ্টিতে দেখছি পাহাড়টা চলে চলে অনেকদূর গিয়ে দুভাগ হয়ে দুদিকে গেছে। মাঝখানটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা বিরাট প্রান্তর। ডান দিকের পাহাড়টা সবুজের ঢেউ তুলে মাথা উঁচু করে আকাশ ছুঁয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। আর বাঁয়ের পাহাড়টা মনে হয় গেরুয়া বসন পরে, কখনো কুঁজো হয়ে কথনো বা মাথা তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয় চলেছে।

—চমৎকার! চমৎকার!! অনুতোষকে বাহবা দিয়ে মহারাজ বলেন—হাঁ, ডাইনেরটা বড় বড় নদ-নদী ধরে সমুদ্র ঘেঁষে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে চলে গেছে। আর বাঁয়েরটা দেশের অভ্যন্তরে নানা নদনদী, নালা প্রস্রবণের উৎসরূপে নানা জনপদের কল্যাণ সাধন করে সুদূর হিমগিরিতে গিয়ে মিশেছে। মাঝখানের ঐ ঘন জঙ্গলাকীর্ণ বিশাল প্রান্তর চম্পকারণ্যই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল, বলে মহারাজ অবরোহণ শুরু করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উভয়েই শিবিরে ফিরে আসেন। রাত্রিটা কাটিয়ে পরদিন উষালগ্নে শিবির গুটিয়ে বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। হাট-বাজার কাছে পিঠে নেই—ভাঁড়ার খালি, গাছের ফল আর বনের পশু-পাখীর আগুনে ঝলসানো মাংস আহারই সম্বল। এভাবেই বাহিনী অমিত বিক্রমে গহন বন, বন্ধুর উঁচু নিচু গিরিপথ নদীনালা অতিক্রম করে কয়েকদিন পরে চম্পকারণ্যে প্রবেশ করে আপন লক্ষ্যে এসে পৌঁছে।

এখান থেকেই—হতো বা প্রাগ্যাসি স্বর্গং জিবা বা ভোক্যসে মহীম্, মন্ত্র অনুসারী শত্রুকে আখেরী মোকাবিলার জন্ত পূর্ণোত্তমে প্রস্তুতি চলবে। বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ; হবে জয়, নাহি ভয় ধ্বনির দিয়ে বাহিনী শিবির প্রতিষ্ঠা করে।



দিদি নেই। কোথায় যে গেল! বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে—সব শূন্য বিষাদ-ভরা! ঘরে ঢুকে সুদেব দিদির বিছানার বালিশে মাথা রেখে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। সে কি করবে! মায়ের কান্না, পিতার দীর্ঘশ্বাস তাকে অস্থির করে তুলেছে, সে উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে শক্ত করে ঘর থেকে বেরিয়ে—মা তুমি কেঁদোনা, আমি দিদিকে খুঁজে নিয়ে আসছি, বলে উঠনে নেমে ছুটে খিরকি দিয়ে বেরিয়ে যায়।

—সুদেব, দাঁড়া দাঁড়া বলে রমেশ উঠোনে নেমে আসে। বৃথা সুদেব নেই। ততক্ষণে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

বড় রাস্তায় পড়ে সুদেব হাঁটতে থাকে। দিদিকে খুঁজে বার করতেই হবে। রাস্তায় লোক চলাচল অস্বাভাবিক কম। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। মাঝে মাঝে দু'একটা মোটর গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। সুদেব তার ক্লাবের এক বন্ধুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে থেমে যায়। না, দিদিতো সেখানে যায় না। দিদি তা হলে কোথায় যায়? এ জিজ্ঞাসার সঙ্গে মনে পড়ে সে এক আখড়ায় যায়। যদিও সে কোন দিন সেখানে যায়নি কিংবা তা দেখেনি, তবে আখড়ায় যাবার রাস্তাটা কোন দিকে কোথায় তা তার মনে আছে। সে ঐ দিকে জোরে হাঁটতে থাকে। টিলাটার সামনে রাস্তাটা যেখানে ত্রিভুজের মতো তিন দিকে গেছে, সুদেব সেখানে এসে দাঁড়ায়। রাস্তার বাতিটা টিমটিম করে জ্বলছে। সেটাও গাছের আড়ালে পড়ে আলো ছড়াতে পারছে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রাস্তাটা মনে মনে ঠিক করে ডানদিকের রাস্তা ধরেই সুদেব এগোয়। কিছুদূর যেতেই ডান ধারে আর একটা রাস্তা দেখতে পায়। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখতে না পেলেও মনে হলো—ওটা জঙ্গলের দিকেই গেছে। এটাই দিদির আখড়া যাবার রাস্তা নিশ্চিত

ধরে নিয়ে সে পা বাড়িয়ে ঐ রাস্তায় নেমে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার দু'দিকে জঙ্গল, মাঝখানে সরু একফালি পথ। তা ধরেই সে আন্দাজে দিদি জপতে জপতে চলেছে। চোখ দিয়ে তার অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ ডান পাশের জঙ্গলে একরকম অদ্ভুত সড় সড় শব্দ শুনে তার গা সির-সির করে ওঠে। ভয়ে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হলো একটা জানোয়ার তার গা ঘেঁষে চলে গেল। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে ধিক্কার দেয়—না-না, ভয় পেলে চলবেনা। দিদিকে তার পেতেই হবে। মনে পড়ে দিদিরই মুখে শোনা প্রহ্লাদের কথা। সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি জন্তু জানোয়ার তাকে হরির দর্শন লাভে বাধা দিতে পারে নি। সেরূপ দিদিকে খুঁজে পেতে কোন ডর ভয় বাধা বিপত্তি সেও মানবেনা, গ্রাহ্য করবে না। সুদেব নির্ভিক চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে।

রাতের ঐ সময়েই আখড়ার আম্রকুঞ্জে এক বিষাদময় বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। পূর্ব নির্ঘণ্ট অনুযায়ী রাতের অন্ধকারে বিপ্লবী বাহিনীর নগর প্রবেশ, আক্রমণ ও অধিগ্রহণেও সময় পেরিয়ে গেছে। সুতরাং নগর অভিযানে বিপ্লবীদের সাহায্যকারীদের মধ্যে বালক ও নারী বাহিনী তাদের নেত্রী সুদেষ্ণার নিকট এসে জড় হয়েছে। নগর আক্রমণের ব্যর্থতা হেতু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে সুদেষ্ণা বৈপ্লবিক কাজকর্মের সাময়িক বিরতি ঘোষণা করে। প্রয়োজন মতো যথা সময়ে যথাযথ নির্দেশ পাবে বলে তিনি সকলকে প্রচারপত্র বিলি করে ঘরে ফেরার আদেশ দেয়। তদনুযায়ী উভয় বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আশ্রম পরিত্যাগ করে। এদেরই একদল আশ্রম সংলগ্ন জঙ্গলের পথে গৃহাভিমুখী চলেছে। দূর থেকে তাদের কথাবার্তা দিদির আখড়া অনুসন্ধানরত উৎকণ্ঠিত সুদেবের কানে আসে। আখড়া আর বেশী দূরে নয় ভেবে সুদেব থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু না, কথাবার্তার শব্দ ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে। সুদেব সন্ত্রস্ত হয়। এত রাত্রে পুলিশ কিম্বা গুণ্ডা বদমাস যেই হোক, তাদের হাতে পড়লে অশেষ দুর্ভোগ ও দুর্গতি হবে। দিদির খোঁজ আর পেতে হবে না। সুতরাং জঙ্গলে লুকনো ভিন্ন গতি নেই। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের জঙ্গলে ঢোকার মুখে সামনে থেকে সন্ধানী আলো তার ওপর পড়তেই সে দিশেহারা হয়ে

ছুটতে থাকে। অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে একটা গাছের সঙ্গে জোর ধাক্কা খেয়ে সুদেব—ও মাগো, চিৎকার দিয়ে পড়ে যায়।

এত রাতে গভীর জঙ্গলে ঐ চিৎকার শুনে আশ্রম-ফেরতা সকলে থমকে দাঁড়ায়। টর্চ হাতে পরিতোষ রাস্তা দেখবার জন্য আলো জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিৎকার। পরিতোষ তা শুনেই সে-দিকে দৌড়তে থাকে। ধীরার ডাক শুনেই থমকে দাঁড়ায়। সে কাছে আসতেই পরিতোষ জিজ্ঞাসা করে—দিদি তুমি একটা চিৎকার শুনেছ? আমার মনে হলো কোন বালকের কাতর কণ্ঠ স্বর—নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোন বিপদ ঘটেছে—না হলে এত রাতে এই গভীর জঙ্গলে কেন! ধীরা তাকে অনুসন্ধানের জন্য অরুণকে সঙ্গে নিতে বলে। অরুণকে নিয়ে পরিতোষ জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। যেদিকে চিৎকার শুনেছে সেদিকের জঙ্গলে অন্ধকারে ইতস্তত তল্লাশি চালিয়েও কারো হদিশ মেলে না। তবে কি তার দিক ভুল হলো? হঠাৎ পরিতোষের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। কিছু দূর হেঁটে সে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। গাছটা ভালো করে দেখে সে তড়তড় করে তাতে উঠে একটা মগডালে দাঁড়িয়ে টর্চ-এর আলোতে চতুর্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। তার দৃষ্টি সম্মুখের ঝোপটার পেছনে গাছের নিচে পড়তেই সে স্পষ্ট দেখতে পায় একটা কিছু ওখানে পড়ে আছে। গাছ থেকে নেমে অরুণকে নিয়ে ঝোপটার পেছনে গাছের নিচে গিয়ে দেখে একটা ছেলে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। কোন সাড়া শব্দ নেই। পাশ ফেরাতেই সে উঃ আ শব্দ করে গোঙাতে থাকে। দু'জনে মিলে কাঁধে তুলে নিতেই সে হাত পা ছুঁড়ে বাধা দেয়—না, আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দাও, বলে সে কাঁদতে থাকে। কান্না শুনে ধীরা এগিয়ে এসে—আমাকে দে, বলে সে সুদেবকে কোলে নিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। অন্ধকারে ধীরার গলা শোনা মাত্রই সুদেব কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—চলো দিদি, ঘরে চলো, মা কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে আছে, বাবা অবিরত ঘরবার করছে। চলো দিদি ঘরে চলো, বলে সুদেব আরো জোরে কাঁদতে থাকে। সকলে অবাক। কি ব্যাপার ভেবে পায় না। ধীরা সুদেবকে শান্ত করবার জন্য—আর কেঁদো না ভাই বলতেই সে—তুমি আমার দিদি নও, দিদি নও, বলে জোর করে তার কোল থেকে নেমে যায়। ধীরা তার হাত ধরতেই সে—উঃ, লাগছে, লাগছে বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে দলের সকলে এসে গেছে। পরিতোষ

এগিয়ে আসে। টর্চ-এর আলোতে পরীক্ষা করে দেখে হাতটা মচকেছে, কপালটা ছড়ে গিয়ে ফুলে উঠেছে। সঙ্গের ফাষ্ট্-এড বাক্স থেকে ওষুধ নিয়ে লাগাবার সময় পেছন থেকে তপন বলে—আরে, ওতো টাউন স্কুলের ছাত্র। আমাদের পাড়ায় আসে—গোবরার বন্ধু। ধীরা এগিয়ে বলে—আচ্ছা ভাই, তোমার পরিচয় তো পেলাম। এখন তোমার ও দিদির নামটা বলো তো দেখি, কিছু করতে পারি কি না। আমরা আর দেরি করতে পারছি না। সুদেব এদের কথা বার্তা, আচার আচরণে আখড়ার লোক ভেবে নিজের ও দিদির নাম বলে। দেবযানীর নাম শুনেই ধীরার চোখে গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার মুখে দীঘির পাড়ে দিদিকে দেবযানীর প্রণামের দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। এখন সুদেবের মুখে দেবযানী বাড়ি ফেরেনি শুনে ধীরা ধরে নেয় যে সে যুদ্ধের কোন জরুরী কাজে নিযুক্ত আছে। সুতরাং দেবযানীর প্রকৃত খবর জানবার জন্য পরিতোষ ও অরুণকে সুদেবকে সঙ্গে নিয়ে দিদির নিকট যেতে বলে ধীরা অন্যদের নিয়ে রওনা দেয়।

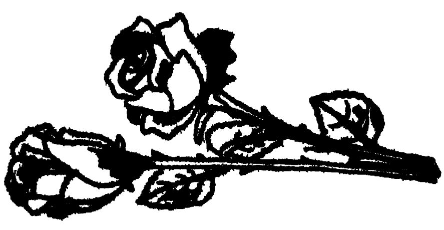
সুদেবকে সঙ্গে নিয়ে পরিতোষ ও অরুণ আখড়ার ভিন্ন দিকে গোশালার পাশ দিয়ে, কলাবাগান পেরিয়ে গলি পথে চলে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। রাস্তা জনমানব শূন্য—চতুর্দিকে থমথমে ভাব—ভয়ালো নিস্তব্ধতা! কিছু দূর এগোতেই নজরে পড়ে দক্ষিণ দিক থেকে তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা মোটর গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। পরিতোষ সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে বন্দুক উঁচিয়ে এক লড়ি-ভর্তি পুলিশ চলেছে। অতঃপর বড় রাস্তা থেকে গলিতে পড়ে পরিতোষ দূর থেকেই দেখে দিদির ঘরে আলো জ্বলছে। এগিয়ে দরজায় সাংকেতিক টোকা দিতেই সুদেষ্ণা দরজা খুলে সঙ্গীসহ পরিতোষকে দেখে অবাক। কেননা সে তো আগেই তাদের ঘরে ফেরার আদেশ দিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকে পরিতোষ সুদেবের পরিচয় দিয়ে সমুদয় ঘটনা দিদির গোচরে আনে। সুদেষ্ণা সুদেবের হাত ধরতেই সে কাঁদতে কাঁদতে বলে—দিদি কোথায়? তাকে এনে দাও। মা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে আছে, বাবা কেবল ঘরবার করছে। শুনে সুদেষ্ণা খুবই বিচলিত। নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ারে বসে সুদেবকে কোলে নিয়ে প্রবোধ দিয়ে বলে—কেঁদোনা ভাই। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলো—দিদি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে শহরের বাইরে গেছে—

ফিরতে দেরি হবে। কথা শেষে সুদেষ্ণা আঁচল দিয়ে সুদেবের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—তুমি পুরুষ—পুরুষের কান্না শোভা পায় না। সুদেবকে কোলে নিয়ে দরজা বাইরে নামিয়ে দিয়ে পরিতোষকে বলে—একে নিয়ে মা বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ে তোমরা বাড়ি যাবে। ভোরের আর দেরি নেই। ভোর হলেই শহরে অবস্থা পাল্টে গিয়ে আরো সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ক্রন্দনরত সুদেবকে নিয়ে সঙ্গী সহ পরিতোষ চলে যায়। সুদেবের করুণ ক্রন্দন নির্জন রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছে।

সুদেষ্ণা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ কান্নার ধ্বনি বুঝি তার অন্তরের হাহাকারের প্রতিধ্বনি। শূন্য দৃষ্টি মেলে সে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে অন্তরের নিরাশার অন্ধকার মিশে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তাতেই বুঝি সে কূল-হারা হয়ে ভেসে চলেছে। সেই সঙ্গে মনের আকাশে পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনার ভার অশ্রুজলে নেমে আসে। মনে মনে শ্রদ্ধেয় সেই পরম-প্রিয় পুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন জানায়ঃ

"বেদনা যদি দাওহে প্রভু,
ক্ষমতা দাও বহিবারে।
হৃদয় আমার যোগ্য কর
তোমার বাণী বহিবারে।"

সুদেষ্ণা ঊর্দ্ধে তাকায়। লক্ষ কোটি তারকা খচিত তিমির-ঘন অসীম আকাশ। তাতে কি লেখা রয়েছে মহাকালের অবোধ্য লিপি—সমাপ্তির সংকেত। তার বেদনা মথিত বক্ষ থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়।



অরণ্যে শিবির সংস্থাপনের পর বিপ্লবী বাহিনী শত্রুকে আখেরী মোকাবিলার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে। যুদ্ধোদ্যোগ পর্বের প্রথমেই দুটো জিনিস—রসদ ও হাতিয়ার—একান্ত জরুরী। এই যোধ পাহাড়ের

লড়াইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসূত। রসদ-যোগাড় হয়ত কঠিন নয় কেননা শিবিরের আশপাশ অঞ্চল অপরিচিত নয় কিন্তু হাতিয়ার? সে তো শত্রুর শক্ত ঘাঁটি পুলিশ চৌকি, থানা ইত্যাদি লুণ্ঠন করা ভিন্ন পাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য প্রখর সতর্কতা সুচতুর গোয়েন্দাগিরি আবশ্যক। সব কিছু বিচার বিবেচনার পর মহারাজ অস্ত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। অনুতোষ রসদ সংগ্রহের সঙ্গে দেবস্থান থেকে খুঁজে পেতে তিন বিপ্লবী —যারা রেল লাইন ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল এবং রঘুর আশ্রম থেকে চিরঞ্জীবকে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। দেবযানীকে দেওয়া হয় শিবির রক্ষার ভার। এইভাবে সুষ্ঠু কর্ম বণ্টনের পর শিবিরে রাতের আহার শিকারলব্ধ হরিণ, বন্য মোরগের মাংস ও ফল মূল সহ-যোগে মহোৎসাহে সম্পন্ন হয়।

গভীর নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। অন্ধকারাচ্ছন্ন শিবিরের মধ্যখানে অনুজ্জ্বল শিখায় একটা মশাল জ্বলছে, মাঝে মাঝে শিবিরে চতুর্দিকে চলমান রাতের প্রহরীর পদশব্দ ভেসে আসছে; আর দূরে হরিণ, শেয়াল ইত্যাদি নানা বন্যপ্রাণীর কর্কশ কণ্ঠস্বর রাতের অন্ধকারে কাঁপন তুলে ছড়িয়ে পড়ছে। দরবেশ বেশে মহারাজ নিবারণকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। অনুতোষ বৈরাগী-সাজে দুই কাঁধে দুই ঝোলা নিয়ে উপস্থিত। শিবির অধিনায়িকা দেবযানীও হাজির। মহারাজ তাকে সম্বোধন করে বললেন—দিদি, চোখ কান সজাগ রেখো। অনুতোষকে নির্ধারিত কর্মসূচী শেষ করে সত্বর ফিরবার আদেশ দিয়ে মহারাজ নিবারণ সহ পুব পাহাড়ের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যান। অনুতোষ ভিন্নমুখী চলবার জন্য পা বাড়িয়েছে। দেবযানী ছুটে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে—চলে তো যাচ্ছ, কিছু বলে গেলে না?

—বলবার তো কিছু নেই। আমি কোথায় কেন যাচ্ছি তা তুমি জানো। সংসারের মায়া মমতা, সুখ শান্তি ছেড়ে আমাকে যখন জীবন মরণের সাথী করে নিয়েছো তখন যেখানে যাই, যেখানেই থাকি আমি অণুক্ষণ মনে প্রাণে তোমার কাছে কাছেই আছি ও থাকবো। বলেই দেবযানীকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়।

দেবযানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন-পথে চলতে চলতে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে অনুতোষ শংকিত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেছে। বুড়ো-

শিবতলা অনেকটা পথ। দুপুরের ভেতর সেখানে পৌঁছতে না-পারলে যে পরিকল্পনার ছক সে কেটেছে তা যে ভেস্তে যাবে। অনুতোষ উর্দ্ধশ্বাসে হাঁটতে থাকে। অরণ্য ছাড়িয়ে জনপদে পা দিতেই দেখে সূর্য পাহাড়ের পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পুজো চলাকালীন রঘুকে অবশ্যই ধরতে হবে। সামনেই রসুলপুর। গেঁয়োপথে না গিয়ে পেছনের জঙ্গল পেরিয়ে মাঠে নেমে কোণাকুণি চলে হাতিচরা দীঘি বাঁয়ে রেখে সোজা বুড়োশিবতলা পৌঁছতে মনস্থ করে। সূর্য মধ্য গগণে এসে গেছে। অনুতোষ দীঘি ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠেছে। কিন্তু বুড়োশিবতলা থেকে কাঁসর ঘণ্টার কোন আওয়াজ তো আসছে না। গাছতলায় পৌঁছে দেখে সব ফাঁকা—প্রখর রোদে যেন ঝিমোচ্ছে। অনুতোষ অবাক হয়ে ভাবে—তবে কি সে দিন ভুল করেছে। অসম্ভব নয়। এত দিন পাহাড় পর্বত জঙ্গলে কাটিয়ে কোন দিন এলো কোন দিন গেল সে হিসাব রাখার ফুরসত হয় নি। এখন সে কি করবে? বাইরে ঠাঠা রোদ্দুর কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কোন পাখীর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না। অনুতোষ গাছের ছায়ায় বসে ভাবছে। এ অঞ্চলে শত্রু পক্ষের অবস্থিতি ও তৎপরতা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তা না জেনে রাস্তায় বার হওয়া অহেতুক বিপদ ডেকে আনা। সুতরাং সর্বাগ্রে চিরঞ্জীবের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন। সে জন্য হয় রঘুর আশ্রমে গিয়ে তার খোঁজ নেওয়া অথবা দীঘির ও-পাড়ে গরু-চরানো কোন রাখালকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা। এমন সময় তার নজরে পড়ে—এক বৈরাগী দীঘির ঘাটলার দিকে চলেছে। সে চিরঞ্জীব হোক কি না-হোক অনুতোষ এ সুযোগ ছাড়তে পারে না। বৈরাগী ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে। অনুতোষ বেদীতে বসা অবস্থাতেই উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে চিরঞ্জীব বলে হাঁক পাড়ে। নিজ নাম শুনে চিরঞ্জীব থতমত খেয়ে চলচ্ছক্তি ও বাক্যহীন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। নিশীথে নিশি ডাকে বলে শুনেছে। তবে কি নিদাঘ-পীড়িত মধ্যাহ্নেও ঐ প্রেত-যোনীর ডাক শোনা যায়। এখানে তার নাম জানে এমন তো কেউ নেই। সে অবাক হয়ে চারিদিকে চায়। না, কাহাকেও দেখতে পায় না। সংশয় পীড়িত চিরঞ্জীব পুনরায় সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য পা বাড়াতেই আবার তার নাম-ধরে ডাক শুনতে পায়। অনুতোষ ইতিমধ্যে গাছতলা ছেড়ে ঘাটলায় এসে দাঁড়িয়েছে। চিরঞ্জীব পেছন ফিরে ওপরের দিকে চাইতেই দেখে তারই মতো এক বৈরাগী

তাকে ডাকাছে। এবার তার কৌতূহলের পালা। কে ইনি? এঁকে আগে কোথাও দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না। তার নামও বা ইনি জানলেন কি করে? তবে কি শত্রু পক্ষের কোন গুপ্তচর। তাকে ভাঁওতা দেবার জন্য এই বেশ ধরেছে। কিন্তু নাম। এই সব ভাবতে ভাবতে সে ওপরে উঠে আসতেই অমুতোষ তার কাঁধে হাত রেখে বলে ঘাবড়ে যেও না ভাই, আমি মহারাজ-এর দূত। তোমাকে সহ অপর তিন বিপ্লবীকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সেই সঙ্গে রসদ তার ওপর অস্ত্রশস্ত্র জুটে গেলে তো সোনায় সোহাগা। যাক্, তোমার সঙ্গে এরূপ নাটকীয় ভাবে সাক্ষাৎ আমাকে তোমার খোঁজে রঘুর আশ্রমে যাবার অনভিপ্রেত কাজ থেকে রেহাই দিয়েছে। চলো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি।

অপরিচিত আগন্তুকবাহিত বার্তা চিরঞ্জীবের প্রাণে খুশির জোয়ার আনে। এতদিনে বুঝি নির্বাসন থেকে তার মুক্তিলাভ আসন্ন। সে এখানে শত্রুপক্ষের পুলিশ, মিলিটারী, অস্ত্রাগার ইত্যাদি সব খবর অমুতোষের গোচরে আনে। সব শুনে অমুতোষ—হুঁ, বলেই চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বলে আমরা আজ রাতেই অরণ্যের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছি। তোমার তিন বন্ধুকে নিয়ে এসো। আমি এখানেই আছি। এখানে শত্রুপক্ষের আনাগোনা নেই তো?

—তা কি করে বলি? দিনের বেলা, কেবল শনি মঙ্গলবারেই এখানে জন সমাগম হয়। তখন এবং অন্য দিন এখানে শত্রুর চর অনুচর আনাগোনা করে কি না জানি না। তবে রাতের বেলা, জনশ্রুতি মতে, ভোলাবাবা এখানে নন্দী-ভৃঙ্গী, ভূত প্রেত নিয়ে ধেই ধেই করে নাচে আর সাপের সঙ্গে খেলা করে তাদের গালে চুমো খায়। সে সময়ে শত্রুপক্ষের কেউ যে এখানে ঘোরাফেরা করতে সাহস করবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবুও সাবধানের মার নেই।

চিরঞ্জীবের অনুপ্রাসযুক্ত কথাবার্তা শুনে অমুতোষ হেসে বলে—চমৎকার। বেলা পড়ে আসছে। এসো আমার ঝোলায় যা আছে ভাগাভাগি করে খেয়ে নি। খাওয়া শেষে অমুতোষ বড় দুটো ঝোলা তার হাতে দিয়ে বলে এ দুটো ঝোলা এবং তোমার ঝোলা ভর্তি করে খাবার-ফলমূল, রুটি, বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, নারকেল ইত্যাদি নিয়ে আসবে। টাকা দিতে গেলে চিরঞ্জীব দরকার নেই বলে ঝোলা হাতে

উঠে দাঁড়ায়। অনুতোষ এখানেই থাকবে জানিয়ে তাকে ঐ তিন কমরেডকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলে। তারা স্ব স্ব কোড নম্বর বলে যেন পরিচয় দেয়।

হঠাৎ চিরঞ্জীব ঝোলা কয়টা বেদীর ওপর রেখে দিয়ে বলে—রঘুর আশ্রম থেকে ঘুরে আসছি। সেখানে আমার লঙ রেঞ্জ পিস্তল ও কারট্রিজ রয়েছে। তা ছাড়া সেবা কেন্দ্রের রোগীদের দেখা এবং দূর-গ্রামের রোগীদের অবস্থা জানা এবং ডাক্তারকে নিমন্ত্রণের কথাটাও রঘুকে বলা দরকার। আমার এক চেলা আমার অপেক্ষায় না-খেয়ে বসে আছে। আসছি বলেই সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুতোষ হৃতবাক্। ছেলেটির অদ্ভুত কর্তব্য-জ্ঞান ও কর্ম-নিষ্ঠা দর্শনে সে মুগ্ধ।

—রাধা মাধব, রাধা মাধব বলতে বলতে চিরঞ্জীব আশ্রমে প্রবেশ করে। প্রথমেই দুয়ারে অপেক্ষমান লেংচাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে বসে খেয়ে নিয়ে তাকে কোলে বসিয়ে আদর করে বলে—আমার জন্য আর কখনও বসে থাকবে না। সময় মতো খেয়ে নেবে ভাই, আমি বৈরাগী মানুষ, কখন কোথায় থাকি কোথায় যাই তার তো কিছু ঠিক নেই। বল, আমার জন্য আর বসে থাকবে না। লেংচা তার বৈরাগী দাদার স্নেহের আতিশয্যে, মনে মনে কি ভাবলো বোঝা গেল না। তার মুখে রা নেই—কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। চিরঞ্জীবের বুঝি এদৃশ্য আর সহ্য হয় না—স্নেহের আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে লেংচাকে কাছে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ভিন্ন ঘরে ঢুকে যায়। সেখান থেকে জামা, কাপড় ও অর্থ ঝোলায় ভেতর রাখতেই মৃত বৃদ্ধার আত্মজীবনী খাতাটার কথা মনে পড়ে। সেটা নিয়ে একতারাটা হাতে করে প্রথমেই সেবা কেন্দ্রে ঢুকে রোগীদের দেখে তারপর জঙ্গলের গোপন জায়গা থেকে পিস্তল ও কারট্রিজ সহ থলেটা ঝোলায় পুরে বাগানে কর্মরত রঘুর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সেবা কেন্দ্রের এবং দূর গাঁয়ের রোগীদের অবস্থা এবং ডাক্তারের আসার কথা তাকে অবহিত করে চিরঞ্জীব তাকে নিয়ে মোতিয়ার কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রঘুর হাতে নেকড়া-জড়ানো খাতাটা দিয়ে বলে—যাঁর কাছ থেকে সোনদানা অর্থ পেয়েছি, এটা তাঁর। মোতিয়ার কবরের কাছে মাটির নিচে কোথাও রেখে দিও। সকাল সন্ধ্যা ধূপ ধুনো বাতি দেবার কাজে

তাঁকে স্মরণ করো—পুণ্য হবে। রঘুর কাছ থেকে বিদায় নেবার মতো মনের অবস্থা বুঝি তখন তার আর নেই। চলতে চলতে একতারাটা বাজিয়ে মনের ভার লাঘব করবার জন্য—

ঐ মহা সিন্ধুর ও-পার থেকে
কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে
আয় চলে আয় আমার পাশে,

গাইতে গাইতে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। চিরঞ্জীবের খামখেয়ালী হাবভাব, ও চলাফেরায় রঘু অভ্যস্থ। সে কিছু না বলে শুধু তার চলার পথের দিকে একবার মুখ তুলে চেয়ে আপন কাজে মন দেয়।

চিরঞ্জীব বুড়ো শিবতলায় ফিরে হতবাক। সব শূন্য। কেউ কোথাও নেই। শুধু ঝোলা কয়টা গাছের ফোকরটার পাশে পড়ে আছে। তবে কি সবই ফাঁকি? সে শত্রুর ফেরেব্বাজের পাল্লায় পড়েছে? হায়, সবই জেনে গিয়েছে। সময়মতো চড়াও হবে। সর্বনাশ, রঘুর আশ্রমের উল্লেখও সে করে ফেলেছে। এখন উপায়? সে দিশেহারা। গুম হয়ে বেদীর ওপর বসে পড়ে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। পাখিরা কলরব করতে করতে আপন কুলায় ফিরছে। হঠাৎ তার খেয়াল হয়—আগন্তুক নিজেকে মহারাজার দূত বলে পরিচয় দিয়ে তাকে এবং অন্য তিন বিপ্লবীকে নিতে এসেছে। এসব অন্য কারো পক্ষে জানা কিছুতেই সম্ভব নয়, তা সে যতবড় গোয়েন্দা বিশারদই হোক না কেন। ধেৎ যতসব বাজে চিন্তা ও অলীক ধারণা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সে সময় নষ্ট করছে। আগন্তুক নিশ্চয়ই কোন জরুরী গোপন কাজে বেরিয়েছেন, সময়মত অবশ্যই ফিরবেন। চিরঞ্জীব সওদা করবার জন্য ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পথে ভাঙা মসজিদের তিন দরবেশকে বুড়ো শিবতলা হাজির হতে বলে যায়। বাজার করে ফেরার পথে সময় বাঁচাবার জন্য সে রাস্তার ধারে দীঘির পাড় থেকে মাঠে নেমে কোনাকুনি বুড়ো শিবতলার দিকে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ তার মনে হলো কেউ যেন দ্রুতপায়ে তাকে অনুসরণ করছে।

চিরঞ্জীব তার চলার গতি কমিয়ে দেয়। পশ্চাৎ আগমনকারী কাছে এসে বলে—চলো ভাই, দাঁড়িওনা, আমি দেরি করে ফেলেছি। কথা

শুনে সে পেছন ফিরে আধো আলো-আঁধারে দেখে এক মুসলমান—গালে দাড়ি, মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গি। প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও গলার স্বরে বোঝা গেলো যে তিনি ঐ আগন্তুক ভিন্ন অন্য কেউ নন। হাঁটার পাল্লায় সে তাঁকে এঁটে উঠতে পারেনা। ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে। গাছতলায় পৌঁছে দেখে আগন্তুক ইতিমধ্যে তাঁর ধরা-চূড়া ছেড়ে ছদ্মবেশী দরবেশদের সঙ্গে কথা বলছে। তাকে দেখেই তিনি দৌড়ে এসে কাঁধ থেকে ঝোলাগুলো নিয়ে বলেন শাবাশ। এসো সকলে মিলে কিছু খেয়েনি। আর দেরী করা যায় না। খাওয়া শেষে সকলেই চলবার জন্য তৈরি। চিরঞ্জীব এক ফাঁকে দীঘির ধারে এসে দাঁড়ায়। তার চলার পথে রঘুর আশ্রমের দিনগুলি একে একে মানসপটে ভেসে ওঠে। রঘু, লেংচা, রাখাল বালকেরা, সেবাকেন্দ্র, মোতিয়ার কবর এমন কি অদূরে তমসাচ্ছন্ন দীঘিটার জন্যও বুঝি সে কেমন একটা অন্তরের টান অনুভব করে। অনুতোষের আহ্বানে তার স্মৃতিচারণ স্তব্ধ হয়ে যায়। সে এসে লাইনে দাঁড়ায়। সকলেই সশস্ত্র। রাতের অন্ধকারে বিপদ-সংকুল এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে পথ-বিভ্রম ঘটলে কিংবা আকস্মিক বিপদ এলে কিভাবে টর্চ-এর আলোর সংকেত দেওয়া হবে তা অনুতোষ সকলকে বুঝিয়ে দেওয়ার পরেই যাত্রা শুরু হয়। সকলেই নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে —চলার বিরাম নেই। পুব পাহাড়ের আড়াল থেকে কৃষ্ণপক্ষের বিশীর্ণ চাঁদ উঠে এসেছে। তার ক্ষীণ আলোর প্রভা মাঠ-ঘাট-বাটে ছড়িয়ে বাহিনীর চলার পথ কিছুটা সুগম করেছে।

পঞ্চ পাণ্ডবের মতো বিপ্লবীরা চম্পকারণ্যের দিকে জোর কদমে চলেছে। আকাশের রঙ ক্রমেই ফিকে এবং নক্ষত্রালোক ম্লান হয়ে আসছে। বাহিনী চলার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। সামনেই বাঁ-দিকে রসুলপুর, ডান দিকে জঙ্গল। রাস্তার দূরত্ব কমানোর জন্য এই জঙ্গলের ভেতর দিয়েই তারা জোর কদমে এগিয়ে চলে। রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতারণ্যে প্রবেশ করে। চতুর্দিকে নানা পাখির কুজন তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ভোরের হাওয়ায় গাছের পাতার কাঁপনে পুব গগনের নবারুণ-ছটায় যেন আলোর নাচন লেগেছে। এক জায়গায় বসে বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাতরাশ সমাধা করে উঠে পড়ে। চলে চলে বাহিনী পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে এক গভীর অরণ্যাবৃত উপত্যকায় এসে দাঁড়ায়—তার চতুর্দিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী।

অনুতোষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করে পুব পাহাড়ের দিকে চলতে থাকে। দু'দিকে উঁচু পাহাড় মাঝখানে জঙ্গলে ভরা এককালি পথ। এই গিরি সংকট ধরে এগোতে এগোতে একটা ঝরনার ধারে এসে পৌঁছে। অতঃপর ডাইনের পাহাড় অতিক্রম করে দুপুর নাগাদ বাহিনী চম্পকারণ্যের পথে রওনা দেয় এবং শেষ বেলায় সেখানে পৌঁছে।

শিবিরে প্রচণ্ড উৎসাহ জাগে। একজন নতুন সহযোদ্ধা পেয়ে সকলেই খুশী। অরণ্যের অন্ধকার ক্রমেই জমাট বাঁধছে। শিবিরের মাঝখানে একটা মশাল জ্বলে উঠেছে। অরণ্যের শ্বাপদকুল বিবর থেকে বেরিয়ে বিচরণ শুরু করেছে। তাদের ডাক চিৎকার ভেসে আসছে। বাহিনীর রাতের আহার শেষ। মহারাজ ও নিবারণের ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে। অনুতোষ মহা উদ্বিগ্ন। দাদার কথার তো কখনো নড়চড় হয়না। কি হলো? তবে কি তাঁর কোন বিপদ ঘটলো? সে অস্থির চিত্তে কেবল এ-দিক ও-দিক করছে। অবশেষে দাদা জঙ্গলের যে পথে গেছেন সে পথ ধরেই অনুতোষ কাউকে কিছু না বলে শিবির থেকে বেরিয়ে যায়। শিবির রক্ষয়িত্রী দেবযানী রাতের চৌকির ব্যবস্থা করে দলের অন্যান্যদের বিশ্রামের আদেশ দিয়ে অনুতোষের খোঁজ করে। আশ্চর্য, তাকে কোথাও দেখতে পায় না। গেল কোথায়? এদিকে মহারাজ ও নিবারণের দেখা নেই। তার মধ্যে অনুতোষ না-পাত্তা! বিশেষতঃ তার অজান্তে অনুতোষের এই আকস্মিক অন্তর্ধান—চিন্তার বিষয়। হয়তো তেমন কিছু নয়, সকলেই অতি পোড়-খাওয়া শক্ত ধাতুর তৈরি—সহজে গলবার নয়। তথাপি চিন্তার হাত থেকে সে রেহাই পায় না।

দাদার জন্য অস্থির চঞ্চল হলেও অনুতোষ চক্ষু-কর্ণ সজাগ রেখে বনপথে চলেছে। মাঝে মাঝে সঞ্চরমান শ্বাপদের জন্য চলার গতি ব্যাহত হচ্ছে। চলতে চলতে হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হলো চতুষ্পদের বদলে কোন চলমান দ্বি-পদ প্রাণীর পদধ্বনি। অনুতোষ হিংস্র শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে ঐ শব্দ অনুসরণ করে চলেছে। ঐদিকটা ঘন জঙ্গলের পরিবর্তে গাছ-পালা পরিপূর্ণ। কিছু দূর গিয়ে সে দাঁড়িয়ে যায়। ভাল করে কান-পেতে স্পষ্ট চলমান পায়ের শব্দ শুনতে পায়। অনুতোষ ঐ শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলতেই

একটা বেঁটে মতো লোক তথমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষ চেঁচিয়ে তাকে হাত তুলে দাঁড়াতে আদেশ করে। ভয় পেয়ে লোকটা চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। দৌড়ে গিয়ে যে তাকে ধরবে তা ঠাস-বুনোনি গাছের প্রতিবন্ধ হেতু অন্ধকারে সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা টর্চের আলোতে পা লক্ষ্য করে গুলি করতেই লোকটা চিৎকার দিয়ে পড়ে যায়। তার কাছে গিয়ে অনুতোষ তার জবানী থেকে সব জেনে নিয়ে পরনের লুঙ্গি ছিঁড়ে হাত পা পিছ-মোড়া করে বেঁধে জামাটা ছিঁড়ে মুখে গুঁজে তাকে ওখানেই ফেলে রাখে। কিছুদূর গিয়ে অনুতোষ থমকে দাঁড়ায়। লোকটার জবান মতো তার সঙ্গীকে যিনি পাকড়াও করেছেন এ অরণ্যে তিনি মহারাজ ভিন্ন অন্য কেউ তো হতে পারেন না। সেজন্যই তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছে। অনুতোষ আর এগোয় না। ওখানে দাঁড়িয়ে মহারাজকে নিজের উপস্থিতি জানাবার উদ্দেশ্যে তার বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি অরণ্যের অন্ধকার কাঁপিয়ে পশুপাখির ত্রাস সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যুত্তরে মহারাজ-এর কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়। তিনি উপস্থিত হতেই শিবির অভিমুখী চলার পথে তাঁর দেরির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শত্রুর এক গুপ্তচর নিধনের ঘটনা উল্লেখ করেন। অনুতোষও অনুরূপ শত্রুর আর এক গুপ্তচর মোকাবিলার ঘটনা তাঁর গোচরে আনে। রাত্রির শেষ প্রহরে তাঁরা শিবিরে পৌঁছন।

দেবযানীর চোখে ঘুম নেই। সান্ত্রীকে সরিয়ে সে নিজেই রাতের শিবির পাহারার কাজ নিয়ে নেয়। রাত বয়ে চলেছে—মহারাজ, নিবারণ কিংবা অনুতোষের দেখা নেই। আচম্বিতে দূর অরণ্য থেকে রাতের অন্ধকার চিরে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি ভেসে আসতেই সে আশ্বস্ত হয়—তাঁরা ফিরছেন। শিবিরে যখন পৌঁছন ভোরের আলো তখন ফুটে উঠেছে। বিশ্রামের আর অবকাশ নেই। মহারাজ দেবযানীকে শাবাশ দিদিভাই বলে সাধুবাদ দেন। শিবিরে জাগরণের চাঞ্চল্য। একে একে সকলেই উঠে পড়েছে। এরই ফাঁকে দেবযানী অনুতোষকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে—না বলে-কয়ে চলে গেলে, আমার মনের অবস্থাটা বিবেচনা করলে না। —বিবেচনার তো কিছু নেই দেবযানী। যুদ্ধাবস্থা, সুতরাং আমাদের সবসময়ই চরম কিছুর জন্য তৈরি থাকা উচিত, বলেই অনুতোষ আর দাঁড়ায়না। তার উক্তিও এরূপ তড়িঘড়ি প্রস্থান দেবযানীকে বিমর্ষ করে। পরক্ষণেই হেতুটা সময়ের তাগিদ বলে তা কাটিয়ে ওঠে।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষে বাহিনী প্রাতঃকালীন কুচকাওয়াজের জন্য তৈরি হচ্ছে। চিরঞ্জীব দূর থেকে মহারাজকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মহারাজ তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন—রঘুর সঙ্গে দুস্থজনের সেবা ও খেটেখুটে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছ তা এক মহৎ কর্ম, সেজন্য সাধুবাদ দিই। চিরঞ্জীব অতঃপর মহারাজ-এর কাছ থেকে সরে গিয়ে কুওকাওয়াজে যোগ দেয়। শিবির অধিকর্ত্রী দেবযানী কুচকাওয়াজ পরিচালনা করছে। মহারাজ অনুতোষ ও নিবারণ দর্শকরূপে অদূরে দণ্ডায়মান। তা শেষ হতেই প্রাতরাশ, তারপরেই খাদ্য-সংগ্রহাভিযান—কয়েকজন বন্য ফলমূল আহরণে এবং কয়েকজন মৃগয়ায় বেরিয়ে যায়।

শিবিরের অনতিদূরে গাছতলায় মহারাজ বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-রত। শত্রুপক্ষ এ অরণ্যে আমাদের অবস্থান ধরে নিয়েই গুপ্তচর পাঠাতে শুরু করেছে। তাদের ফিরে যাওয়া না-যাওয়া কোনটাই তাদের হিসেবে গরমিল ঘটাবে না। সুতরাং আজ রাতেই আমাদের এ অঞ্চল ছেড়ে যেতে হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অস্ত্রসংগ্রহ অভিযানে আমার নিবারণ ও অনুতোষের নেতৃত্বে দলের জোয়ানদের সমসংখ্যায় বণ্টন করে নতুন করে গড়তে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমার প্রস্তাব হলো—আমার সহযোগী চিরঞ্জীব সহ আটজন, নিবারণের সহযোগী আনন্দ সহ আটজন এবং অনুতোষের সহযোগী দেবযানী সহ আটজন নিয়ে অভিযাত্রী দল গঠিত হোক। অনুতোষ দেবস্থান পর্বতের আবিষ্কৃত পার্বত্য দুর্গে শিবির স্থাপন করে তার অভিযান পরিচানান্তে সেখানে ফিরে অবস্থান ক্ষেত্রের পরিসীমা দৃঢ়তর করবে। অভিযান শেষে আমরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হব। অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে আমরা নিজেদের এক অজেয় বাহিনীতে পরিণত করে শত্রুর মোকাবিলা করবো। শুরু হবে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণের পতন। অনুতোষ সান্ধ্যকালীন অবসর কালে বাহিনী পুনর্গঠন করবে। অতঃপর বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনির সঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত হয়।

ইতিমধ্যে খাদ্য সংগ্রহকারী দল ফিরে এসেছে। চিরঞ্জীব মহাখুশি। সে এক জব্বর হরিণ শিকার করে এনেছে। মধ্যাহ্নের আহার শেষ হতে বেলা গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে। অরণ্যের রাত্রি ক্রমেই [illegible] অনুতোষ এসে দাঁড়িয়েছে।

সম্মুখে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক পাড়ে—company stand in file—সঙ্গে সঙ্গে বাহিনী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মশালের আলোতে তাদের প্রত্যেকের মুখমণ্ডল কঠিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল। অনুতোষ বাহিনীকে তিন দলে ভাগ করে সমান্তরালে দাঁড়াবার আদেশ দেয়। অতঃপর মহারাজ তাদের সম্মুখে এসে বন্ধুগণ সম্বোধন করে বলেন—আমরা স্বাধীনতা ও বিপ্লবের স্বার্থে এভাবে বিভক্ত হয়ে অভিযানে চলেছি। অভিযান শেষে পুনরায় একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবো। মাভৈঃ।

সকলেই উৎফুল্ল চিত্তে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করে সমস্বরে গেয়ে ওঠে :

অভ্রভেদী মুক্তি ধ্বজা উড়লো আকাশ পথে।
ঐ খোলেরে বিজয়-তোরণ দেখনা চেয়ে চেয়ে ॥
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান এগিয়ে চল এগিয়ে চল।

সঙ্গীত শেষে সকলেই আদেশ মতো নিজ নিজ জিনিষপত্র গোছানোর কাজে লেগে যায়।

বাহিনী এভাবে ভাগ হয়ে যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক হলেও শৃঙ্খলা-বোধ ও দলীয় স্বার্থে ইহা অপরিহার্য ভেবে সকলেই মনের বিমর্ষতা কাটিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। রাতের আহার মনখোলা কথাবার্তায় শেষ হয়। তারপর যাত্রার পালা। রিহার্সাল শুরু হয়েছে। মহারাজের দল ফকির দরবেশে। নিবারণের দল ভিখারী এবং অনুতোষের দল বৈরাগী সাজে রঙ্গমঞ্চে অবির্ভূত। এবার বিদায়ের পালা। পূজনীয়দের প্রণাম এবং সমবয়সীরা পরস্পর কোলাকুলি করে নিজ নিজ দলে যোগ দেয়। দলের অধিনায়ক উচ্চকণ্ঠে হাঁক পাড়ে—স্থির হয়ে দাঁড়াও। মশালের আলোকে প্রত্যেকের মুখেই বিদায়-বেদনা করুণ হয়ে ফুটে ওঠে। তারপর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভক্ত দল বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে আপন আপন পথে অরণ্যের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। পরিত্যক্ত মশালটাও বুঝি সঙ্গীহারা হয়ে ক্ষণেকের মধ্যেই কেঁপে কেঁপে নিবে যায়।

দলপতিরা আপন আপন বাহিনী নিয়ে দ্রুত পায়ে চলেছে। ভোরের আগেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের কণ্ঠনিঃসৃত

বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি বন্ধুর চলার পথের শ্রান্তি দূর করে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

নিশিভোরে অনুতোষ অরণ্য ছাড়িয়ে, জনবসতি এড়িয়ে ঘোরানো পথে পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত। চলে চলে অবশেষে গিরিসংকট দিয়ে যখন লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে নবোদিত সূর্য-কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। সকলকে একজায়গায় বিশ্রাম করতে বলে অনুতোষ সুবোধকে নিয়ে উপত্যকায় শিবির স্থাপনের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করে যেখান থেকে নিজেদের আড়ালে রেখে বাইরের সব কিছু দেখা যাবে। অতঃপর সকলকে সেখানে এনে শিবির স্থাপনের কাজে লাগিয়ে অনুতোষ একাই পুব পাহাড়ের দিকটা পর্যবেক্ষণ করে ফেরার পথে একটা হরিণ শিকার করে যখন শিবিরে পৌঁছে সূর্য তখন মধ্য-গগন ছাড়িয়ে গেছে। ইতি-মধ্যে দেবযানীর তত্ত্বাবধানে শিবির স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ঘুরে ঘুরে তা দেখে অনুতোষ খুশি হয়ে তাকে সাধুবাদ দেয়।

খেতে খেতে বেলা শেষ। দেবযানীকে রাতের ব্যবস্থা করতে বলে অনুতোষ সুবোধকে নিয়ে পশ্চিম দিকের পর্বত থেকে নিচের সমতল ভূমিতে যাতায়াতের পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তাতে অনেকখানি ঘুরো পথ বেঁচে অভিযানের সুবিধা হবে। খুঁজে খুঁজে হয়রান, তবু পথের সন্ধান মেলে না। অনুতোষ মরিয়া, দমবার পাত্র নয়। রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। কিছুই আর দৃষ্টি-গোচর নয়। সুতরাং বিষয়টা আগামীকালের জন্য মুলতবী রেখে উভয়েই শিবিরের দিকে রওনা দেয়। রাত অনেক, শিবির থেকে বাহিনীর বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি অন্ধকার মন্থন করে ভেসে আসছে। প্রত্যুত্তরে দূর থেকেই অনুতোষ ও সুবোধ বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাদের উৎসাহ যোগায়। চৌকির নিকটবর্তী হতেই তাদের সমবেত উল্লসিত কণ্ঠ-গীত শোনা যায় :

ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশুফণী
উল্লাসে হাঁকিল জয়ধ্বনি
ফণা নিঙরানো গরলের ধারা গলে।

চমৎকার—সাধু সাধু, বলে অনুতোষ তাদের উৎসাহ দেয়।

রাত্রির আহার শেষে শিবির নীরব নিস্তব্ধ। শুধু রাতের প্রহরীর

টহল চলেছে। অনুতোষ পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে দেবযানী ও সুবোধের সঙ্গে একান্তে আলোচনা-রত। হাতে আর মাত্র একটি দিন। লুণ্ঠন অভিযান নির্ভুল ভাবে নিষ্পন্ন করবার জন্য আটঘাট বেঁধে তৈরি হতে হবে। লুণ্ঠনের পরবর্তী তৃতীয় দিনের শেষে মহারাজ ও নিবারণ সদলে এখানে পৌঁছবেন। তারপর এই ঘাঁটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেই শুরু হবে প্রচণ্ড ঐতিহাসিক যুদ্ধ। চম্পকারণ্য ছাড়বার পূর্বে এভাবেই যুদ্ধের ছক্‌ কাটা হয়েছে। মন্ত্রণা শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত অনুতোষ ও সুবোধ শুয়ে পড়ে। কিন্তু দেবযানীর চোখে ঘুম নেই। তার মনে কেবল আগামী দিনের অনুতোষের দুঃসাহসিক অভিযানের বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বল্পসংখ্যক সহচর নিয়ে ধূর্ত সিংহের বিবরে প্রবেশ করে নিরাপদে বেরিয়ে আসা সম্পর্কে নিশ্চিত নিঃসন্দেহ হলেও অন্তরের দুর্বলতা তাকে পীড়া দিচ্ছে। এই মুহূর্তে অনুতোষের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে মনের ভার লাঘবের প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে। কিন্তু সে হবে দলীয় অনুশাসন ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গ জানিত এক চরম অপরাধ। দেবযানীর আপন বিবেকই তাকে এর থেকে নিবৃত্ত করে। নিরুপায় নিশিথে আপন শয্যায় শুয়ে দেবযানী মনে মনে অনুতোষের সঙ্গ-সুখ অনুভব করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে!

ভোরের পাখীর কলরবে শিবির জেগে ওঠে। প্রাতঃকালীন কাজকর্ম শেষে যোদ্ধারা যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক কাঠামো বজায় রেখে শিবির আরো পাকাপোক্ত করবার কাজে লেগে যায়। অনুতোষ সুবোধকে নিয়ে পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে বেরোবার পথ আবিষ্কারের জন্য ফকির বেশে বেরিয়ে যায়। গতকাল-দৃষ্ট-অঞ্চল ছেড়ে তারা পাহাড়ের উত্তর দিকে এগোতে থাকে। পাহাড়টা হঠাৎ বাঁয়ে বাঁক নিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। অনুতোষ খুশী মনে নামতে থাকে। হয়তো এখান দিয়ে তার ঈপ্সিত পথের সন্ধান পাবে। শ'দেড়েক ফুট নেমে দেখে পাহাড়টা ডান দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে। আর এগনো বৃথা, ওখানে দাঁড়িয়েই সে পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করে। গাছপালা, লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে দূরে মাঠ-ঘাট-বাট দেখা যাচ্ছে। অনুমান শ'দেড়েক ফুট নামলেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছনো যাবে। তারপর জঙ্গল ছাড়িয়ে মাঠ। সুতরাং এখান দিয়েই যাতায়াত মনস্থ করে অনুতোষ সঙ্গী সহ পাহাড় বেয়ে নেমে যায়। জঙ্গলের পর খোলা জায়গা—

দূরে মাঠের ধারে ছাড়াছাড়া ঘর বাড়ি। একটাকে মকবুল শেখের বাড়ি বলেই মনে হয়—যার পায়ের চিকিৎসার জন্য রঘু তাকে ওখানে নিয়ে এসেছিলো। যাক, ভালই হলো ঐ বাড়িটাকে নিশানা করে এখান দিয়ে দিনে রাতে জঙ্গলের পথে ঢুকতে বেরোতে কোন অসুবিধা হবে না। তবু অনুতোষ জঙ্গলের ধারটা ঘুরে ঘুরে জায়গাটাকে রপ্ত করে নেয়।

আর দেরি করা যায় না। বেলা পড়ে যাচ্ছে। অনুতোষ আজই আগামী কালের অভিযানের মহড়া দিতে মনস্থ করে। জঙ্গলের ধার দিয়ে চলে চলে তারপর হাঁটা-পথ পার হয়ে বিশালাক্ষীর বাঁয়ের জঙ্গলে ঢুকে দীঘির ধারে পৌঁছে। কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক দেখে চট্ করে বড় রাস্তাটা পেরিয়ে ডাইনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে স্টেশনের পুবে ঝিলের ধারের হোগলা বনের ভেতর দিয়ে একেবারে রেল লাইনে উঠে আসে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আজ হাটবার বলে স্টশনে লোকের ভিড়। এরই মধ্যে অনুতোষ সঙ্গী সহ হাত বাড়িয়ে ভিখ মাঙতে মাঙতে স্টেশন চত্বরের উত্তর দিকে রেলিং-এর ধারে দুটো তাঁবু দেখতে পায়। একটার বাইরে সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে আর একটা পাহারা-বিহীন। অতঃপর হাটে গিয়ে খাবার কিনে থলে ভর্তি করে কিছু খেয়ে আটটার ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় প্লাটফরমে ফিরে লক্ষ্যস্থলটা ঘুরে দেখে অলক্ষ্যে ঝিলের ধারের হোগলা বনের ভেতর দিয়ে আগের পথ ধরে পাহাড়ের ধারে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার সত্ত্বেও লক্ষ্যস্থলটা চিনতে আদৌ অসুবিধা হয় না। জঙ্গলে ঢুকে পাহাড়ে উঠে রাতের প্রহরীর হুঁশিয়ারির জবাব দিয়ে যখন শিবিরে পৌঁছে রাত্রির দ্বিতীয় যাম তখন উত্তীর্ণ।

মনের অস্থিরতাকে ভিন্নমুখী করার প্রয়াসে দেবযানী এতক্ষণ নিজেই শিবির পাহারা দিচ্ছিল। অনুতোষের প্রত্যাগমনে প্রহরী পরিবর্তন করে সে এসে তাদেব সঙ্গে মিলিত হয়। আহার শেষে দেবযানী শিবির সুরক্ষা কাজের অগ্রগতি অনুতোষের গোচরে আনে। বিষয়টা সরেজমিনে দেখা দরকার। সুতরাং আগামীকালের জন্য তা মুলতবী রেখে যে যার শয্যা গ্রহণ করে। কিন্তু দেবযানীর চোখে ঘুম নেই। তার মনের চিন্তা-ভাবনাগুলি অনুক্ষণ অনুতোষকে ঘিরে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে কখন বুঝি ক্লান্ত হয়ে গিয়ে চোখের পাতা বুজে যায়।

রাত পোহানোর সঙ্গে শিবির জেগে উঠেছে। বাহিনীর কাজ শুরু

হয়েছে। অম্বুতোষ দেবযানী সমভিব্যাহারে শিবির সুরক্ষার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছে। শিবিরের চতুর্দিকের পরিখাগুলি পাহাড়ের গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। আশপাশের গাছগুলিতে সতর্কীকরণের জন্য প্রহরী মোতায়নের ব্যবস্থা হয়েছে।—চমৎকার। অম্বুতোষ দেবযানীকে বাহবা দেয়।—সব কিছুই নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে একজন বিচক্ষণ সমরবিদ-এর মতো। দাদা এলে খুশি হয়ে বড় ইনাম দেবেন—একেবারে কমাণ্ডার পদে তোমাকে বৃত করবেন। দেবযানী খিল খিল করে হেসে বলে—ভুল। সবই ভুল।। তুমি তো জানো আমার কামনা কী। দাদার নিকট সে প্রার্থনা-ই জানাবো, তিনি যেন আমাকে তোমার সঙ্গে যুগলে লড়াই-এর অনুমতি দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক স্মরণীয় কীর্তি স্থাপনের সুযোগ দেন।—শাবাশ! শাবাশ।। তথাস্তু। জীবন রঙ্গমঞ্চে তুমি আমার চিরসাথী। সুতরাং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক মনে প্রাণে আমিও তাই কামনা করি দেবযানী, বলেই অম্বুতোষ চলে যাবার মুহূর্তে দেবযানী নিম্নকণ্ঠে অনুরোধ করে—রাতের অভিযানে পূর্বে শিবিরের বাইরে ক্ষণেকের জন্য আমাকে তোমার পাশে দাঁড়াবার সুযোগ দিও।—তথাস্তু, বলেই অম্বুতোষ সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে গিরিসংকটের দিকে রওনা দেয়।

আগমন ও নিষ্ক্রমনের পথটাকে নিষ্কণ্টক করার সঙ্গে ভেতরের ঘাঁটিটাকে কবির গাথা মতো'—বাঙলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি দেখবিরে দুর্বৃত্ত দুর্জন—দুর্ভেদ্য করার একটা ছক, দাদার প্রব্যার্জন ও অনুমোদন সাপেক্ষ তৈরি করার উদ্দেশ্যে জঙ্গলাকীর্ণ সরু পথটা ধরে তারা এগিয়ে চলে। দু'দিকে কয়েক শ' ফুট উঁচু খাড়াই পাহাড়। অসংখ্য বেতশ লতা গাছপালা জড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেছে। আরো এগোতেই ঝরনা। ডান দিকে নাতি-উচ্চ পাহাড়ের পরেই অরণ্য। সব কিছু পর্যবেক্ষণের পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে তারা শিবিরের দিকে রওনা দেয়। ফিরতি পথে কয়েকটা বন্য মোরগ শিকার করে শিবিরে পৌঁছে। আহারাদি করতে করতেই বেলা শেষ। আর দেরী করা যায় না। বাহিনী নির্দিষ্ট পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অভিযানের জন্য তৈরি। সুবোধ অম্বুতোষের কিছু আগেই পাঁচ জনকে নিয়ে শিবির পরিত্যাগ করে। অম্বুতোষের বেরোবার সময় দেবযানী তার হাত ধরে চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে—জয় যাত্রার যাও গো

ফলে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে চুম্বনের জয়-তিলক কপালে, কপোলে, অধরে এঁকে দিয়ে দূরে সরে যায়। চলতে চলতে দেবযানী উচ্চৈস্বরে প্রথমে—

নাহি ভয় হবে জয়
ওরে বীর হে নির্ভয়। তারপর :

নবীন প্রভাত লাগি
দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি—
দীপ না নিবায়ে বরমালা হাতে নিয়ে,

বলতে বলতে শিবিরের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুতোষ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে অভিযানের পথে অগ্রসর হয়।

পর্বতের নির্দিষ্ট স্থানে সুবোধ বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছে। অনুতোষ পৌঁছতেই অবরোহণ শুরু হয়। পাহাড়ের পাদদেশে এসে অনুতোষ বাহিনী নিয়ে বিগত রাত্রির পথ ধরেই দ্রুত স্টেশনের অদূরে ঝিলের ধারে হোগলা বনে এসে দাঁড়ায়। সকলেই ছদ্মবেশী যাত্রী। তাদের কার কি কাজ তা স্মরণ করিয়ে বিন্দুমাত্র ভুল বুকের ফলে চরম বিপদ বিপর্যয় অনিবার্য বলে হুঁশিয়ার করে। ক্ষীণ আলোকে স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের ভিড় চোখে পড়ছে। গাড়ি আসার ঘণ্টা পড়তেই অনুতোষ স্বদলে হোগলা বন ছেড়ে প্লাটফরমে উঠে যাত্রীদের মধ্যে মিশে যায়। ডাক গাড়ি— অধিকক্ষণ দাঁড়ায় না। সুতরাং গাড়ি স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতোষ সঙ্গী সহ তাঁবুর দিকে হাঁটতে থাকে। একটার সামনে সিপাহী বন্দুক কাঁধে টহল দিচ্ছে। অন্যটার সামনে এক সিপাহী খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা বেজেছে। প্লাটফরম ছেড়ে ট্রেন বেরিয়ে যেতেই কয়েকটা বাতি নিবে যায়। এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অনুতোষ টহলদার সিপাহীকে লক্ষ্যে রেখে এগোতে থাকে। সিপাহী দিক পরিবর্তন করতেই অনুতোষ ত্বরিৎগতিতে পেছন থেকে নিঃশব্দে ডান হাত দিয়ে তার গলা এমন ভাবে বেড়ে ধরে যে সে আর টু-শব্দটি করবার অবকাশ পায় না। অনুতোষ বাঁ হাতে তার রাইফেল নিয়ে তাকে হোগলা বনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই সুযোগে সুবোধ সঙ্গীদের নিয়ে তাবুতে ঢুকে রাইফেল, বন্দুক, রিভলবার, কার্তুজ ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র যা পায় তাই ছালায় ভরে হোগলা বনের দিকে চলে যেতেই সিপাহীদের তাঁবু পাহারা-রত গনেন ও অরবিন্দ দুই তাঁবুতে আগুন দিয়ে দৌড়ে

হোগলা বনে, অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টেশনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে দেখে লোকজন ঐ দিকেই ছুটে যায়। অগ্নিদাতারা ততক্ষণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে—অনেক দূরে।

দুর্জয় সাহস, অসাধারণ ক্ষমতা ও নির্ভুল লক্ষ্যে এক বিপজ্জনক অভিযান বিনা-রক্তপাতে সাঙ্গ করে অনুতোষ স্বদলে স্বগর্বে শিবির অভিমুখে চলেছে। শিবিরে চিন্তা-ভাবনা-ক্লিষ্ট বিনিদ্র দেবযানী রাতের পাহারার ফাঁকে অভিযাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য বন ফুলে মালা গাঁথে। রাত্রি শেষ হতে চলেছে অভিযাত্রীদের সাড়া নেই। দেবযানীরও চিন্তাভাবনার শেষ নেই। হঠাৎ অন্ধকার চিড়ে আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে—বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি ভেসে আসে। শিবিরের চৌকির ভার অন্যকে দিয়ে দেবযানী মালা গুচ্ছ হাতে নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে চলতে থাকে। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে অভিযাত্রী বাহিনী এগিয়ে আসছে। আচম্বিতে অদূরে—দাঁড়াও দাঁড়াও চিৎকার শোনার সঙ্গে টর্চের আলো দেখে বাহিনী থমকে দাঁড়ায়। দেবযানী মনের আনন্দে—এসো বীর উন্নত করি শির—বলতে বলতে ও টর্চের আলোতে দেখতে দেখতে একে একে প্রত্যেকের গলায় বিজয়-মাল্য পরিয়ে দেয়। সব শেষে অদূরে দাঁড়ানো অনুতোষের গলায় মালা পরাতেই সে তা'শ তুলে দেবযানীর গলায় পরিয়ে দেয়। এভাবেই সকলের অলক্ষ্যে দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে উভয়ে মধ্যে মালা বদল জীবনের রঙ্গমঞ্চে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেবযানীর আর এক অভিনব অভিনয়!

শিবিরে পৌঁছে অনুতোষ সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে লুণ্ঠিত অস্ত্র বার করে সাজিয়ে রাখে—দশটা বন্দুক, একটা পিস্তল ও রিভলবার সঙ্গে গুলি ভর্তি বেল্ট ও এক বাক্স কার্তুজ। যুদ্ধ চালাবার মতো অস্ত্রাগারে ভাল অস্ত্রই জমা হলো। আগামী পরশু মহারাজ ও নিবারণ এলে যোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অস্ত্র-ভাণ্ডার আরো স্ফীত হয়ে উঠবে এবং আগামী সংগ্রামে শত্রুকে চরম আঘাত হানা যাবে। খুশী মনে শিবিরের চতুর্দিক ঘুরে দেখে বাকী রাতটুকু বিশ্রাম নিতে অনুতোষ শুয়ে পড়ে।

ভোরের আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত। নবারুণের সোনালী কিরণ অসংখ্য গাছপালার ভিতর দিয়ে তির্যক রেখায় ছিটকে পড়ে গহন বন এক মোহনীয় কমনীয় রূপ ধরেছে। জেগে উঠে অনুতোষ বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে

আছে। নতুন প্রভাত বুঝি এক নব-বারতা নিয়ে এলো। শিবিরে সকলের ঘুম ভেঙেছে। আপন আপন কাজ শেষে সকলে একত্রিত হয়েছে। লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র যেখানে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে দেবযানী তাদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত। উৎসাহে উদ্দীপ্ত বাহিনীর প্রত্যেকেই এক একটা বন্দুক কাঁধে নিয়ে সগর্বে হাঁটা শুরু করে। দেবযানী হেসে বলে—বেশ এই বন্দুক কাঁধে নিয়েই কুচকাওয়াজ শুরু হোক। তা শেষ হতেই সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে দেবযানী অস্ত্রগুলি খাদের অদূরে একটা গুহায় নিয়ে রাখে। গাছপালা লতাপাতা ঘেরা গুহাটা সত্যিই দেবযানীর একটা আবিষ্কার। প্রাতরাশের পর দেবযানীর নির্দেশ মতো ফলমূল আহরণ ও শিকারের উদ্দেশ্যে কয়েকজন বেরিয়ে যায়। অমুতোষ সুবোধকে নিয়ে শত্রুর সন্ধানে (scouting) দেবযানীকে বলে শিবির পরিত্যাগ করে।



সেইরাত্রে মহারাজ ও নিবারণ পূর্ব সীমান্তে অভিযানের উদ্দেশ্যে স্বদলে অরণ্যের ঘাঁটি ছেড়ে অবিরাম চলে চলে উভয়েই যথা সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে আপন আপন লক্ষ্যে—পুলিশের ঘাঁটির অদূরে পাহাড়ের জঙ্গলে থানা গাড়ে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমণে বাহিনী পরি-শ্রান্ত। খাওয়া দাওয়ার শেষে বাহিনীকে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে মহারাজ শিবিরের আশপাশটা ঘুরে দেখেন। তারপর একটা উঁচু গাছে উঠে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ কালে দূরে পশ্চিম দিকে জঙ্গলের বাইরে থানা বাড়িটার প্রহরী কক্ষের ওপর উড্ডীন ব্রিটিশ পতাকা ইয়ুনিয়ন জ্যাক পড়ন্ত বেলার তেরছা আলোকে নজরে আসে। জঙ্গল থেকে থানার দূরত্ব অনুমান করে তিনি নেবে আসেন। বাহিনী ততক্ষণে জেগে উঠেছে। শিবিরে এসে তিনি সকলকে দাঁড় করিয়ে চিরঞ্জীবকে অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে থানা আক্রমণ ও লুণ্ঠনের অভিসন্ধি বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদনুযায়ী মই তৈরি হতেই মোহড়া শুরু করতে আজ্ঞা করেন। থানার অভ্যন্তরে গমন নির্গমন, লুণ্ঠিত অস্ত্র হস্তান্তর, পুলিশী আক্রমণ প্রতিহত

ইত্যাদির মোহড়া নিখুঁত ভাবে নিষ্পন্ন হতেই খুশি মনে মহারাজ সকলকে বাহবা দেন।

অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের অধিবাসী শ্বাপদকুলও বিবর থেকে বেরিয়ে ডাক চিৎকার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর পাহাড় থেকে বাঘের হুঙ্কারও ভেসে আসছে। রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ। আহার শেষে বাহিনী দরবেশ সাজে লাইনে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্রবলে হীন হলেও মনোবলে কেহ নহে দীন। সকলেরই আনন উৎসাহে উদ্দীপ্ত, শত্রুর কবল থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনবার জন্য অটুট সংকল্প মশালের আলোকে ভাস্বর। অসীম সাহস, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ও বিজয়ে নিঃসংশয় মহারাজ শিবির রক্ষার ভার সর্বকনিষ্ঠ অনুপকে দিয়ে স্বগর্বে—সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈ মুষ্টিমেয় যোদ্ধা নিয়ে পুলিশ ঘাঁটির দেয়ালের ধারে এসে দাঁড়ান। সুরেশ অজয় ও বিপুলকে দেয়ালের ধারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করে তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দেন। তারপর তিনি চিরঞ্জীব, বিপিন, সুজয় ও অনন্তকে নিয়ে মই বেয়ে থানার অভ্যন্তরে নেমে যান। এ যেন রানা প্রতাপের স্বল্প সংখ্যক রাজপুত সৈন্য নিয়ে দুর্ধর্ষ মোগল অক্ষৌহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকল্পে হলদিঘাটে অবতরণ। বিপিনকে মইয়ের ধারে, সুজয় ও অনন্তকে সমান দূরত্বে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে মহারাজ চিরঞ্জীবকে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেন। সব কিছু অভিসন্ধি মাফিক ঘড়ির কাঁটার মতো এগিয়ে চলেছে। বারান্দা থেকে রাতের প্রহরীর বুটের আওয়াজ আসছে। বাঁয়ে অস্ত্রাগার, গার্ডরুম এবং শেষ প্রান্তে আপিস ঘর। ডাইনে এক খণ্ড মাঠ। তাতে গাছপালা ফুলের কেয়ারী ইত্যাদি। তার-পরই মাঠের ধারে ছাউনি। দেয়ালের ধার থেকে উঁকি দিয়ে প্রহরীর দিক পরিবর্তন দেখেই উভয়ে চট্ করে বাগানে ঢুকে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বার জন্য ওত পেতে সময় গুনছে। যেই মুহূর্তে প্রহরী দিক পরিবর্তন করে সেই মুহূর্তে মহারাজ শ্বাপদের মতো পেছন থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ে এমন ভাবে গলা বেড়ে ধরে যে সে টুঁশব্দ করতে পারে না। শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে নেতিয়ে পড়ে। মহারাজ তার হাত থেকে রাইফেল ও কোমর থেকে গুলিভর্তি বেল্ট খুলে নিয়ে পাঁজা কোলে তাকে বাগানে নিয়ে ফেলে রাখে। গার্ডরুমের জমাদার তেওয়ারী তখন খৈনির নেশায় ঢুলছে। সেখানে ঢুকে মহারাজ তার ঘাড়ের মোক্ষম জায়গায় এমন ভাবে আঘাত করে যে সে নিঃশব্দে উবুড় হয়ে

লুটিয়ে পড়ে। মহারাজ তার কোমর থেকে রিভলবার সহ গুলির বেল্ট খুলে নিয়ে দেয়াল থেকে চাবির গোছা চিরঞ্জীবের হাতে দিয়ে তাকে ষ্ট্রং রুম থেকে বন্দুক, রিভলবার, গুলি যা পায় তাই নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসতে বলে দেয়ালের ধারে দাঁড়ানো বিপিন. সুজয় ও নন্দকে বন্দুক হাতে আসা মাত্র চালান করে দেয়ালের ওধারে তাকে দিতে বলে তিনি মই বেয়ে দেয়ালের বাইরে নেমে যান। মহারাজ হাতের রাইফেল-টাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে তাতে গুলি ভর্তি। আপৎকাল ব্যবহারের জন্য সেফটি ক্যাচ খুলে অধীর হয়ে চিরঞ্জীবের দলের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছেন।

ওদিকে চাবির গোছা থেকে চাবি মিলিয়ে ষ্ট্রং রুম খুলতে চিরঞ্জীবের কিছুটা দেরী হয়। বাতি জ্বালা নিষেধ। টর্চের আলোতে স্ট্যাণ্ড থেকে চারটা বন্দুক তুলে নিয়ে দেয়ালের ধারে অপেক্ষমান নন্দকে দিয়ে গুলির বাক্স খুঁজে পেতে বার করবার মুহূর্তে আচম্বিতে সতর্কীকরণ ঘণ্টা (পাগলা ঘন্টি) বাজতে থাকে। চতুর্দিকে আলো জ্বলে উঠে, জঙ্গলের দিকের আলো আরো তীব্র ও জোরালো। পুলিশ সব ব্যারাক থেকে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েছে। উপরের গম্বুজে বন্দুক উঁচিয়ে প্রহরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক লক্ষ্য করছে। চিরঞ্জীব আর গুলির বাক্স বার করবার ফুরসত পায় না। সে চাবির গোছা ও একটা খালি বন্দুক হাতে দেয়াল ঘেঁষে বেরোবার জন্য এগোতে থাকে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে সে চমকে দেয়ালের সঙ্গে মিশে থমকে দাঁড়ায়। বাইরে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ানো মহারাজ অধীর হয়ে সঙ্গীসহ চিরঞ্জীবের ফিরে আসার অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ পরপর তিনবার গুলির শব্দে তিনি বুঝলেন কি বিপত্তি ঘটেছে। নিশ্চয়ই অস্ত্রসহ ওদের চারজনের ফেরার পথে বুরুজের প্রহরীর নজর পড়তেই সেগুলি চালিয়েছে। তাহলে চতুর্থজন নিশ্চয়ই অক্ষত আছে। সে কোথায়? মহারাজ অস্থির হয়ে সুরেন, অজয় ও বিপুলকে পুলিশ ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার আদেশ দিয়ে রাইফেল তুলে বুরুজের প্রহরীকে গুলি করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। প্রহরী পড়ে যেতেই তিনি বোমা ছোঁড়া বন্ধ করে তিনজনকে শিবিরে ফিরে যাবার আদেশ দেন। দেয়ালের ভেতরে পুলিশের হাঁক ডাক ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আর তো চতুর্থ জনের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। মহারাজ ভেতরের মইটাকে তুলে আনবার জন্য বাইরের মইতে পা দিয়েছেন এমনি সময় চিরঞ্জীব উপর থেকে বাইরের

মইতে পা দিয়ে ভেতরের মইটা টেনে তুলে জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে নেমে আসে। চিরঞ্জীবকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলার মুখে মহারাজ বুরুজের দিকে চাইতেই দেখেন সেখানে নূতন প্রহরী দণ্ডায়মান—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জঙ্গলের দিকটা দেখছে। তাকে না সরালে দেয়াল থেকে বন-জঙ্গলের দূরত্বের মাঝখানের জায়গা এই তীব্র আলোকে পার হওয়া অসম্ভব। সুতরাং রাইফেল তুলে তাকে গুলি করেই হামাগুড়ি দিয়ে উভয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। তারপর পেছন ফিরে মহারাজ মাথা নত করে—

"মহাকাল শক্তি দাও মোরে,
নরঘাতী কুৎসিৎ বীভৎস-সাপরে
হানিতে পারি যেন,"

বেদনা-ভরা কণ্ঠে শহিদদের উদ্দেশ্যে সম্মান জানিয়ে—বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে শিবিরমুখী রওনা দেন।

সেদিন মহারাজ থেকে আলাদা হয়ে অবিশ্রান্ত চলে পরদিন মধ্যাহ্নে সীমান্তের জঙ্গলে নালার ধারে নিবারণ স্বদলে ঘাঁটি স্থাপন করে। স্নানাহারের পর সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে সে আনন্দকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে মহারাজ সমভিব্যাহারে এই অঞ্চলের থানার অবস্থান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের পর অস্ত্র লুণ্ঠনের যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা রূপায়ন করে উক্ত লক্ষ্যবস্তু সরজমিনে তদারক করা একান্ত জরুরী। বেলা শেষে উভয়ে লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছে।

থানাটা আকারে ছোট হলেও অবস্থান বৈশিষ্ট্যে গুরুত্বে অসীম। দু'দিকে লোহার দরজা এবং চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত। পুলিশ ব্যারাক (ছাউনি), গার্ডরুম, অস্ত্রাগার ইত্যাদির অবস্থান পরস্পরের কাছাকাছি। সন্ধ্যা হতেই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে টিনের চালা ঘর দেখা যাচ্ছে। তার নিচ থেকেই ইঞ্জিনের ভটভট শব্দ ভেসে আসছে। চতুর্দিক আলোতে উজ্জ্বল একমাত্র ব্যতিক্রম গাছের নীচ ও জঙ্গলের আড়াল

নিজেদের গোপনে রেখে সব কিছু দেখে এবং আনন্দকে দেখিয়ে অভিযান পরিকল্পনা কিভাবে কার্যকর হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে উভয়েই শিবিরে ফিরে আসে।

শিবিরে সাজ সাজ রব উঠেছে। আহার শেষে অভিযানের জন্য তৈরি। সকলেরই ভিখিরী বেশ—নিবারণের আদেশ মাত্রই ঝোলা কাঁধে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। থানা লুণ্ঠন অভিযান কিভাবে পরিচালিত হবে নিবারণ তা বিশদ বর্ণনা করে তাদের বুঝিয়ে দেয়। অস্ত্রাগারের দেয়াল ভেঙে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিবে গেলে পর পুলিশ আক্রমণ কিভাবে রুখতে রুখতে লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র সহ কোথা দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে জঙ্গলের নালার ধারে শিবিরে ফিরে আসবে তা বলে সাবধান করে—নির্দিষ্ট কর্মসূচীর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হলে চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

সকলেই উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর; নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। চলার আদেশ দেওয়া মাত্রই বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়। এক দুঃসাহসিক অভিযানের নেশায় দুর্মদ বেগে বনবাদাড় অতিক্রম করে তারা জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। থানা থেকে রাত্রি বারোটার ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে আসে। আরো এগোতেই থানার আলো তাদের নজরে আসে। না, আর দেরি নয়। নিঃশব্দে কাঁটাতার কেটে বাহিনী থানার মধ্যে প্রবেশ করে।

নিবারণ তরুণকে নিয়ে অস্ত্রগারের পেছনের দেয়ালের ধারে গর্ত খুঁড়তে থাকে। আনন্দ বাকী ছ'জনকে নিয়ে চুপি চুপি গাছের আড়ালে চলে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের একে একে দাঁড় করিয়ে নিজে ইঞ্জিন ঘরের দিকে এগোয়। ওদিকে অস্ত্রাগারের ধারে খোঁড়া খুঁড়ি শেষ হতেই নিবারণ প্রতিটি গর্তে শক্তিশালী বোমা রেখে নিরাপদ দূরত্ব থেকে জলন্ত পলতে ছুঁড়ে মারতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সারাটা অঞ্চল কেঁপে ওঠে দেয়ালের একদিক ধ্বসে পড়ে ছাদ সুদ্ধ কাত হয়ে ঝুরঝুর করে চূণ, বালি, সুরকি, ইট খসে পড়তে থাকে। এই অবস্থায় অস্ত্রাগারে ঢুকে কিভাবে বন্দুক, গুলি ইত্যাদি বার করে আনবে? অন্যদিকে একই সঙ্গে আনন্দ বোমা মেরে ডাইন্যামোর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। সারাটা চত্বর অন্ধকারে ডুবে যায়। ক্ষণকালের জন্য পুলিশ হতভম্ব। পর মুহূর্তেই বন্দুক হাতে হুংকার দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা বিপ্লবীদের বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ

ধ্বনির সঙ্গে বোমার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কয়েকটা পুলিশ বোমার ঘায়ে ঘায়েল হতেই তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোতে থাকে। বিপ্লবীরা বোমা ছুঁড়ে তাদের বাধা দিচ্ছে। এভাবেই চলেছে অসম-সাহসী খণ্ড-যুদ্ধ। বোমার গুমগুম শব্দের সঙ্গে বন্দুকের গুলির তীব্র শুঁই শুঁই আওয়াজ ও আগুনের হলকা মিলে অন্ধকারে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করছে। আনন্দ নিজেকে গাছের আড়ালে রেখে পুলিশ দেখা মাত্রই বোমা মেরে মেরে নিবারণের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছে। অগ্রসরমান পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সহযোদ্ধাদের অস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং নিবারণ মরিয়া হয়ে পুনরায় টর্চ জ্বেলে তরুণকে নিয়ে ভাঙা দেয়ালের মধ্য দিয়ে অস্ত্রাগারের ভেতরে ঢোকার জন্য যে মুহূর্তে পা বাড়িয়েছে সেই মুহূর্তেই ভাঙা ছাদ হুড়মুড় করে পড়ে উভয়কে সমাহিত করে।

এতক্ষণে ব্যারাকের সর্বত্র গ্যাসবাতি জ্বলে উঠেছে। পুলিশ নিজেদের সংঘবদ্ধ কবে ছ'দিক থেকে শত্রুর অবশেষ ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে চলেছে। যেদিক থেকে বোমা কিংবা গুলি ছোঁড়া হচ্ছে পুলিশ সে-দিক ঘিরে ফেলছে। তাদের কাছে কেউ আত্মসমর্পণ করে না। লড়ে লড়ে তারা মৃত্যু বরণ করে। আনন্দ গাছের আড়াল থেকে একদল পুলিশ এগোতে দেখে নির্ভুং. লক্ষ্যে রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়ে। অগ্রগামী পুলিশটি পড়ে যেতেই অন্যেরা এক সঙ্গে গুলি চালিয়ে গাছটা ঘিরে ফেলে। আনন্দ শেষ অবধি যুদ্ধ করে পুলিশে গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এভাবেই বাংলার বিপ্লবীদের এক ক্ষুদ্র দল স্বদেশের মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্ণাক্ষরে এক অতুলনীয় বীরত্বের চিরস্মরণীয় কীর্তি. রেখে গেল।

কীর্তির্যস্য স জীবতি।

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

এক রাত্রে একই সময় দূর দূরূ অঞ্চলে অবস্থিত তিন জায়গায়—সীমান্তবর্তী দুই পুলিশ ঘাঁটি, রেল স্টেশনের পুলিশ ফাঁড়ি লুণ্ঠনের ঘটনা ফেঁপে ফুলে যেভাবে পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে বেরোয় তা যেমনি ভয়ানক ও রোমহর্ষক তেমনি মর্মন্তুদ। সারা দেশ এই সংবাদে স্তম্ভিত ও বিচলিত। খবরের কাগজে বিপ্লবীদের নামোল্লেখ না থাকলেও নগরের নানা মহল্লায় গভীর বিষাদের ছায়া নেমে আসে—অনেকেই শোকে মুহ্যমান। সুদেষ্ণা এ সংবাদে বিনা-মেঘে বজ্রপাত-এর মতো নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে যায়। বিপ্লবীদের স্মরণীয় সেই রাত্রির অভ্যুত্থানের পর দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিগত। নানা উড়ো খবর ভিন্ন তাদের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। কিন্তু এতো পত্রিকার সংবাদ—নিঃসন্দেহ ঘটনা। কিন্তু কোন সীমান্তের পুলিশ ঘাঁটি আর কোন রেল স্টেশনের পুলিশ চৌকি? এর থেকে শুধু বোঝা যাচ্ছে বিপ্লবীরা তিন দলে ভাগ হয়ে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু তারা কে, কে, এবং কয়জন? না, সুদেষ্ণা আর ভাবতে পারছে না, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় তার বুক কাঁপছে—দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসছে। সে শুয়ে পড়ে। কতক্ষণ যে সে এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরে থেকে দিদি, দিদি ডাক শুনে সে উঠে বসে। নিজেকে সংযত ও বিস্রস্ত বেশ-বাস ঠিক করে দরজা ঠেলে বাইরে ধীরা, সুতপা, শুরথা, পরিতোষদের দেখে মুখে হাসি এনে বলে—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? দরজা তো খোলাই ছিল। আয়, ভেতরে আয়। তাদের বসতে বলে ভেতরে গিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে অন্তরের হাহাকার ও মনের গুমরনো ভাব কিছুটা কাটাবার চেষ্টা করে সুদেষ্ণা ছেলে মেয়েদের মধ্যে ফিরে আসে। প্রথমেই সে তাদের সতর্কতার জন্য বলে—গত কয়েকমাস যাবৎ শহরে যে স্থিতাবস্থা ফিরে এসেছে এবং পুলিশের তাণ্ডব হ্রাস পেয়েছে তা আজকের প্রভাতী সংবাদপত্রের সমাচারের পর পুনরায় বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং আমাদের পূর্বের মতোই সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে হবে।

—কিন্তু দিদি, এতদিন পর হঠাৎ এ আবার কি ঘটলো? এরা কি সত্যই বিপ্লবী দল, যারা ঐ দূর দূর অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃসাহসিক লুণ্ঠন কার্যে এভাবে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করলো! না অন্য কারা?

ধীরার এই আকস্মিক প্রশ্নে সুদেষ্ণা বিচলিত হলেও ধীর স্থির কণ্ঠে উত্তর দেয়—আমিও তোমাদের মতো অজ্ঞ—অন্ধকারে হাতড়ে মরছি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সুদেষ্ণা হঠাৎ বুঝি অন্ধকারে একটা আলোর ঝলকি দেখতে পায়। মনে পড়ে মহারাজ প্রেরিত চিরঞ্জীব রঘুর আশ্রমে বাউল-বেশে আছে। সে নিশ্চয়ই তাঁর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সন্ধান দিতে পারবে। ভাবা মাত্রই সুদেষ্ণা উঠে দাঁড়ায়। ধীরাকে বলে—তোমরা আজ এসো। আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি। মাঝে মাঝে দেখা করো পূর্ব নির্দেশ মতো সাবধানে চলো। তারপর গুরখা পরিতোষকে লক্ষ্য করে বলো—তোমরা একটু বসো ভাই, আমি আসছি। সুদেষ্ণা ভেতরে এসে একখণ্ড কাগজে রেল স্টেশন থেকে রঘুর আশ্রম পর্যন্ত পথের পরিচয়ের নিদর্শন সহ একটা নক্শা এঁকে বেরিয়ে এসে গুরখাকে দেয়। গুরখা তা মনোযোগ দিয়ে দেখে পথের চিহ্নগুলির উল্লেখ করে রঘুর আশ্রমে অনায়াসে যাতায়াত সম্ভব বলে দিদিকে আশ্বাস দেয়। শুনে সুদেষ্ণা বলে—নক্শা দেখে কিন্তু যাতায়াত নয়। সেটা মনের পটে গেঁথে রেখে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তোমাকে রঘুর আশ্রমে গিয়ে কিছু জরুরী সংবাদ নিয়ে আসার ভার দিচ্ছি। বল, পারবে তো?

—এ বলছেন কি দিদি? আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে আমি সব কিছু করতে পারি। গুরখা উঠে দাঁড়াতেই সুদেষ্ণা উভয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে। তারপর গুরখাকে বলে—এখন নকশাটার ওপর নজর রাখ। সুদেষ্ণা অঙ্গুলি দিয়ে পথের নিদর্শনগুলি বুঝিয়ে বলে—রঘু শনি মঙ্গলবার বুড়ো শিবের মানত-কারীদের বুড়ো বটের তলায় এসে পুজো-আচ্চা করায়। সুতরাং তুমি তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে বলবে—দিদি তোমাদের খবর নেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে তার সঙ্গে আশ্রমে গিয়ে প্রেমদাস বাউলের খোঁজ করবে। তার দেখা পেলে রঘুর আড়ালে মহারাজ ও অন্যান্য বিপ্লবীদের খোঁজ খবর নেবে। কিন্তু সাবধান, তার দেখা না পেলে রঘুর নিকট এসব জানতে চাইবে না।

কথা শেষে সুদেষ্ণা রেলের ভাড়া সহ কিছু বাড়তি টাকা দিয়ে বলে—তুমি শেষ রাত্রির ট্রেনে যাত্রা করে ভোর নাগাদ ঘাটা [illegible]

দেবস্থানের স্টেশনে পৌঁছে পূর্বোক্ত সব খবর নিয়ে সেখান থেকে সন্ধ্যা সাতটার ট্রেন ধরে ফিরে সটান আমার কাছে আসবে। পরিতোষ তোমার টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দেবে এবং পুনরায় সন্ধ্যা-রাতে তোমাকে নিতে স্টেশনে উপস্থিত থাকবে। মুসলমান ভিখিরীর মতো ছেঁড়া লুঙ্গি, জামা, টুপি পরে যাবে। কথাবার্তা, চাল চলনও সেরূপই হবে। আমি অনেকদিন ওদিকে যাইনি। তুমি বুদ্ধিমান, চালাক চতুর ছেলে। সেখানের অবস্থা অস্বাভাবিক কিছু দেখলে নিশ্চয়ই তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে ফিরে আসবে। আমি উদগ্রীব হয়ে তোমার অপেক্ষা করবো। পরিতোষ ও গুরখা সুদেষ্ণাকে প্রণাম করে—আপনার আদেশ শিরোধার্য, বলে বেরিয়ে যায়।

ছেলে দুটি চোখের আড়াল হতেই সুদেষ্ণা ঘরে আসে। মনে প্রশ্ন জাগে—ভাল করলুম, কি মন্দ করলুম। মনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ যেন আরো বেড়ে গেছে। স্থৈর্য হারিয়ে ঘরের মধ্যে কেবল পায়চারি করছে। হঠাৎ খেয়াল হতেই সে নিজেকে ধিক্কার দেয়—ছি ছি, সে কি পাগল হয়ে গেছে। গীতার-উক্তি মনে পড়ে:

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি যথাদর্শ মলেন চ।

যেমন ধূম বহ্নিকে, ধূলি দর্পণকে আবৃত করে, সেরূপ কামনা বাসনা সুস্থ-সবল জ্ঞানকে আবৃত করে। ফলে বুদ্ধি-নাশ ও জীবন সংশয় দেখা দেয়। না, তা সে কখনো ঘটতে দেবে না। জীবনের খেলা ঘরে ফেলে-আসা দিনগুলি স্মরণ করে সুদেষ্ণা আগামী দিনের জন্য তৈরী হয়। গীতার উপদেশ: ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং

ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ,

মনে করে সে স্থির হয়ে বসে।

দিদির কাছ থেকে বাইরে এসে পরিতোষ ও গুরখা মুসলমান ভিখিরীর বেশভূষা চলাফেরা নকল করবার উদ্দেশ্যে কাছাকাছি এক মসজিদে উপস্থিত হয়। আজ শুক্রবার মসজিদে জুম্মার নমাজের ভিড়। ভিখিরী আতুরের জমায়েত থেকে এক অল্পবয়সী খোঁড়া ভিখিরীর চলন, বলন, বসন ইত্যাদি লক্ষ্য করে উভয়েই মসজিদ ছাড়ে।

পরের দিন ভোর রাতে দেবস্থান স্টেশনে রেলগাড়ির শেষ দিকের বগি থেকে চট্ করে নেমে তাড়াতাড়ি সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়বার মতলবে সামনে পিছনে চেয়ে গুরখা হতবাক। চতুর্দিকে পুলিশ মিলিটারী

ক্যাম্পের সামনে সান্ত্রী বন্দুক কাঁধে পাহারা দিচ্ছে। সে কি করবে? দিদির আঁকা নকশা মনের পটে দেখে রেললাইন বাঁয়ে রেখে সে দক্ষিণমুখী চলতে থাকে। কিছুদূর যেতেই লাঠি হাতে পুলিশ দেখে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে থাকে। কাছাকাছি হতে এক পুলিশ লাঠি উচিয়ে তেড়ে আসে। খোঁড়া দেখে বাড়ি না মেরে—ভাগ্‌ যা, বলেই ছেড়ে দেয়। গুরখা ভয়ে ভয়ে খুঁড়িয়েই চলেছে। পুলিশের দৃষ্টির আড়াল হতেই সে স্বাভাবিকভাবে দ্রুত চলে ঘুমটিঘর দেখে রেললাইন পার হয়ে খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় নেমে পুবদিক বরাবর হাঁটতে থাকে।

রাস্তায় লোকজন নেই, হয়ত পুলিশ মিলিটারীর তাণ্ডবে রাতে তারা বার হয় না। ভোর হয়েছে। পুবের পাহাড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার পেছনে প্রভাত সূর্যের লাল আভা ফুটে বেরচ্ছে। আরো এগোতেই রাস্তাটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। দূরে একটা উঁচু ঢিপির মতো দেখেই দিদির আঁকা নকশাটা মনের পটে ভেসে ওঠে। হঠাৎ পেছনে বুটের শব্দ শুনে গুরখা রাস্তার ধারে জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে একদল গুরখা সৈন্য বন্দুক কাঁধে মার্চ করে পুবদিকে চলছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে—খবরের কাগজে যে রেল স্টেশনের পুলিশ চৌকি লুণ্ঠনের উল্লেখ সে কি তবে এই রেল স্টেশন? তা হলে দাদাদের কোন দল নিশ্চয়ই ঐ পু পাহাড়ের কোথাও ঘাঁটি করেছে। সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সেদিকেই চলেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করবার ইচ্ছা হতেই গুরখা খুবই উত্তেজিত হয়। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দিদির নির্দেশ মতো আগে রঘুর নিকট খোঁজখবর নেওয়া স্থির করে মাঠে নামে এবং দিদির নকশা অনুযায়ী দক্ষিণ-পুব কোণ বরাবর বুড়ো শিবতলার দিকে হাঁটতে থাকে। কাঁটার জঙ্গল পেরিয়ে গাছতলায় পৌঁছে দেখে—রঘু, লোকজন কিংবা বাস্তভাণ্ড কিছুই নেই; সব ফাঁকা—খাঁ খাঁ করছে। দিদির নকশা মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁয়ের জঙ্গলের সরু পথ ধরে রঘুর আশ্রমে পৌঁছে কাউকে দেখতে পায় না। সে কি করবে। ঘরে ঢুকতেও সাহস হয় না। অতঃপর উঠোন থেকেই—রঘুদা রঘুদা, বলে ডাকতে থাকে। একটি ছেলে দৌড়ে এসে তাকে দেখে অবাক। ততক্ষণে রঘুও এসে পড়েছে। চতুর্দিকে গোলমাল—পুলিশ, মিলিটারীর হাঙ্গামা হুজ্জত। নোংরা ছেঁড়া জামা-কাপড়-পরা ছেলেটাকে গুপ্তচর ভেবে রঘু কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—তুমি কে,

কি চাও, আমার নাম জানলে কি করে? রঘুর গলার স্বর এবং এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের কারণ বুঝে গুরখা হেসে বলে—ঘাবড়াও মৎ দাদা। আমি দিদির দূত। তোমাদের খবর নিতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রেমদাস বাউল কোথায়?

রঘু দৌড়ে এসে গুরখাকে জড়িয়ে ধরে বলে—পুলিশ, মিলিটারীর ভয়ে সন্ত্রস্ত আছি। আমার আশ্রমে অবশ্য এখনও তারা চড়াও হয়নি। আর প্রেমদাস ভাই—সে তো সেই যে একদিন সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে গেল, আর ফিরলো না।

—কিন্তু পুলিশ মিলিটারীর হাঙ্গামা হুজ্জত কেন? গুরখা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে।

—আরে ভাই, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। একদিন রাত্রে স্টেশনের পুলিশ চৌকির পাহারাদারকে বেহুঁশ করে হোগলা বনে ফেলে দেয়। তারপর পুলিশের বন্দুক-টন্দুক—সব হাতিয়ার লুট করে তাম্বুতে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। সেই থেকে শুরু হলো পুলিশ-মিলিটারীর তাণ্ডব—হাটে বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে খানা-তল্লাসী। এখন শুনছি পাহাড়ে পাহাড়ে আসামী খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার দোস্ত মকবুলেব গাঁও রসুলপুরের কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে পুলিশ-মিলিটারী তাম্বু ফেলেছে। দিবারাত্র চলেছে তাদের আনাগোনা। লোক জমায়েত নিষেধ, ফলে পুজো-আচ্চা বন্ধ—কি যে সব কাণ্ড চলেছে। আচ্ছা ভাই, তুমি এখানে বসে আরাম করো, আমি লেংচাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রঘুর নিকট সব শুনে গুরখার মনে হলো দাদাদেরই কোন দল পুলিশ ফাঁড়ি লুট করেছে। কিন্তু তারা কারা এবং কোথায়? রঘুর পরিচয় নিয়ে রসুলপুরে মকবুলের কাছে গেলে কেমন হয়? লেংচা আসতেই গুরখা তাকে রসুলপুর চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

—বলো কি? মকবুল মিঞার পা একবার কুড়ুলে কেটে গেল। রঘুজী চিকিৎসা করলেন। ঘা সারে না, শেষে দাদাজীকে নিয়ে তার চিকিৎসা করায়। তখন ওষুধপত্র নিয়ে আমি সেখানে কয়েকবার গিয়েছি। এমনি সময় রঘু আসতেই গুরখা তাকে রসুলপুরের কথা বলে। শুনে রঘু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লেংচাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে গুরখাকে নিয়ে আশ্রমের সেবাকেন্দ্র, বাগান ইত্যাদি দেখিয়ে রাখালদের পথ ধরে দীঘির কোণ দিয়ে মাঠে নামে। গুরখা অবাক—পুবদিকে

ঢেউ-খেলানো পর্বতশ্রেণী সূর্য কিরণে ঝকমক আর পর্বত শীর্ষে এক মন্দিরের চূড়া জ্বল জ্বল করছে। তার দৃষ্টি ফেরানোর জন্য রঘু বলে—সম্মুখে যে মাঠটা দেখছো এরকম তিনটে মাঠ, দুটো গাঁও ছাড়িয়ে রসুলপুর। এখন ফেরা যাক। ভাল কথা, তুমি কোন গাড়িতে শহরে ফিরছো? গুরখার জবাব শুনে রঘু বলে—চলো, খাওয়াদাওয়ার পর বুড়ো শিবতলা বসে বহিনজীকে জানাবার সংবাদ তোমাকে বলবো। তারপর তুমি বেলাবেলি স্টেশনে যাবে। রাতে চলাফেরায় খুব বিপদ।

রঘু আশ্রমে ফিরে প্রথমে রোগীদের তত্ত্বাবধান করে এবং গ্রামের রোগীদের খবরাখবর নেয়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সারতে বেলা গড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গুরখাকে নিয়ে রঘু বেরিয়ে পড়ে। বুড়ো শিবতলা এসে সে বহিনজীকে জানাবার জন্য বলে—এখানের স্টেশনের পুলিশ ফাঁড়ি একদিন রাত্রে লুঠ হয়। লুণ্ঠনের পর দ্বিতীয়দিন রাত্রে দাদাজী মকবুলের বাড়ি এসে চাল ডাল ইত্যাদি নিয়ে যায় এবং আবো জোগাড় রাখতে বলে। তারপর আর তার ভাইজানের দেখা নেই। এখন রসুলপুরের ওদিকে পাহাড়ের ধারে পুলিশ মিলিটারী ঘাঁটি করেছে। দিবারাত্রি তাদের টহল চলেছে। এখানের অবস্থা যা দেখে গেলে তাও তাঁকে বলবে। কথা শেষে রঘু গুরখাকে নিয়ে মাঠে নেবে তাকে বিদায় দেয়।

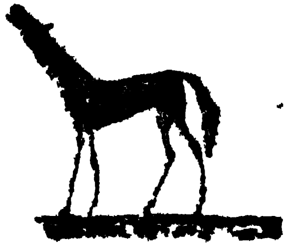
দিদির জন্য রঘুর খবরে তার দাদাজী এবং মকবুলের ভাইজান কে, কি তার নাম, জানবার জন্য গুরখা উদ্‌গ্রীব ও অস্থির। উভয় নাম কি একজনের না ভিন্ন ভিন্ন জনের? একবার ইচ্ছা হলো রঘুকেই জিজ্ঞাসা করে, পরক্ষণেই ভাবে—না, রঘুর পক্ষে তার উল্লিখিত জনের নাম জানা সম্ভব নয়। দিদির নিকট রঘুর প্রদত্ত সংবাদ পরিবেশনের পরে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হয় এবং তিনি কি বলেন দেখি। স্টেশনের পথে মাঠ থেকে গুরখা দেখে রাস্তা দিয়ে সকালের মতো আরেক দল সৈন্য মার্চ করে পুব-পাহাড়মুখী চলেছে। তবে কি যুদ্ধ শুরু হয়েছে? কার সঙ্গে? মকবুলের ভাইজানের সঙ্গে? অস্থির উদ্বিগ্ন চিত্তে গুরখা এরূপ সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে স্টেশনে এসে পৌঁছে দেখে স্টেশন চত্বরে পুলিশ মিলিটারীর সংখ্যা ভোরের চাইতে অধিক। গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়াতেই অবতরণকারী যাত্রীদের অনেককেই পুলিশ পরীক্ষা করছে।

গুরখা কয়েকজনের সঙ্গে মিশে গাড়িতে উঠে পড়ে। যথাসময়ে শহরের স্টেশনে পৌঁছে অপেক্ষমান পরিতোষের সঙ্গে সোজা দিদির বাড়ি আসে। তিনি আপিস ঘরে বসে আছেন। দরজা খোলা। তাদের দেখা মাত্রই দিদি বেরিয়ে আসেন—চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। তাদের ঘরে নিয়ে গুরখার হাত ধরে কাছে এনে জিজ্ঞাসা করেন—বল ভাই, কি দেখলে, কি শুনলে আর কি জানলে ?

গুরখা দেবস্থানের অবস্থা, রঘুর আশ্রমে যাতায়াতের পথে পুবপাহাড়ে দিকে সৈন্য চলাচল এবং রঘু কথিত সমাচারের পূর্ণ বয়ান দিদির গোচরে আনে। ভাইজানের উল্লেখে দিদি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি বললে, ভাইজান ? পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সুদেষ্ণা গুরখাকে প্রশংসা করে বলেন—সারাদিন খুবই খাটা-খাটুনি গেছে, রাত্রিও অনেক, তোমরা এখন এসো ভাই। মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিও। তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে সুদেষ্ণা তাদের বিদায় দেয়।

ভাইজানের উল্লেখে দিদির বিচলিত ভাব গুরখা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ভাইজান কে দিদিকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না। বিফল-মনোরথ গুরখা পরিতোষকে নিয়ে চলে যায়।

গুরখা পরিতোষ চলে যেতেই সুদেষ্ণা রঘু প্রেরিত সংবাদ বিশ্লেষণ করে সঠিক কিছুই বুঝতে পারেনা। কে বা এই ভাইজান এবং দাদাজী-ই বা কে ? এরা কখনও তিনি হতে পারেন না। কেননা তাঁর সঙ্গে ওখানের লোকজনের পরিচয় নেই। তবে তিনি কোথায় ? তিনিই কি সীমান্তের উভয় থানা আক্রমণ পরিচালনা করেছেন ? পুব পাহাড়ে সৈন্য চলাচল থেকে সেখানে যুদ্ধ চলেছে কিনা তাও অস্পষ্ট। এই সব এলোমেলো চিন্তা ভাবনায় সুদেষ্ণা অস্থির ; উদ্বিগ্ন চিত্তে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সীমান্তের থানা আক্রমণের পরিণতির কথা ভেবে সে শিউরে উঠে। অসহায়ের মতো ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। অবিরলধারে কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।



স্টেশনে পুলিশ ঘাঁটি-লুণ্ঠিত অস্ত্র শস্ত্রে বলীয়ান হয়ে পাহাড়ের যুদ্ধ শিবির সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে অনুতোষ অধীর হয়ে দাদা ও নিবারণের আগমনের অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয় দিনের শেষ, মধ্যরাত্রিও অতীতপ্রায়—তাঁদের দেখা নেই। অনুতোষ শঙ্কিত। তথাপি আগামীকাল অবশ্যই তাঁরা এসে পৌঁছবেন, এ আশা সে মনে মনে পোষণ করছে। সুতরাং খাদ্য সংস্থানেরও প্রয়োজন। কি উপায়ে তা যোগাড় করা সম্ভব মনে হতেই প্রথমেই মকবুলের কথা মনে পড়ে। সে-ই কাছে আছে এবং এবিষয়ে সাহায্য করতে পাবে। অনুতোষ প্রহরীকে বলে বেরিয়ে যায়।

এত রাত্রে মকবুল তার ভাইজানকে দেখে অবাক। সে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই অনুতোষ এমন সময়ে তার আসবার কারণ বলে তার ভাণ্ডারে চাল, ডাল শাক সবজি যা আছে তাই নিয়ে আরও সংগ্রহ করে রাখবার জন্য তাকে টাকা দিয়ে ফেরার সময় তাকে সাবধান করে—এখানে তার উপস্থিতি কেউ যেন জানতে না-পারে।

তৃতীয় দিন ও রাত্রি শেষ হতে চলেছে। অনুতোষের চোখে ঘুম নেই। দাদা এবং নিবারণের আগমন-প্রত্যাশা বিফলে যায়। অনুতোষের ভয় হলো তবে কি তাঁরা এমন কোন বিপাকে পড়েছে যার ফলে আসতে পারছেন না, কিংবা তাঁদের উপস্থিতি বিলম্বিত হচ্ছে। না কি মারাত্মক কিছু ঘটেছে। না, না, তা হতেই পারেনা, দাদা এমন কোন বিপদে পড়তে পারেন না, কখনোই না। মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বর্তমান পরিস্থিতি একাই মোকাবিলা করতে সে বদ্ধ-পরিকর হয়। শিবিরে যোদ্ধার সংখ্যা সব মিলে মাত্র নয় জন। এই মুষ্টিমেয় সংখ্যা নিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান বাতুলতা মাত্র। সুতরাং এ ঘাঁটি থেকেই পাহাড়ের জঙ্গলের আড়ালে আবডালে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুকে ঘায়েল করে সীমান্ত পার হতে হবে। এছাড়া অন্য পন্থা নেই। সুবোধ ও দেবযানীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে উঠে পড়ে।

অন্য দিনের মতোই চতুর্থ দিনের ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

অনুতোষ দাদা ও নিবারণের আগমনের আশায় উদ্দীপিত। কুচকাওয়াজ শেষে প্রাতরাশের পর শিবির অধিনায়িকা দেবযানী পুব পাহাড়ের গিরি বর্ত্মে ও পশ্চিম পাহাড়ের চৌকিতে বদলী পাঠিয়ে অনুতোষের সঙ্গে শিবির অভেদ্য-করণের কাজে যোগ দেয়। চতুর্দিকে পরিখার সামনে গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা রেখে শিবিরকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টির আড়াল করা হচ্ছে। সুবোধ অস্ত্রশালার বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার ইত্যাদি পরিষ্করণে ব্যস্ত। এরূপ কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেই মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যায়। অনুতোষেরও দাদা ও নিবারণের আগমন প্রত্যাশা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বুঝি নিরাশায় মিলিয়ে যায়।

মধ্যাহ্ন আহারের পর অনুতোষ সুবোধকে নিয়ে আপৎকালে নিষ্ক্রমণের অনুসন্ধানে শিবিরের দক্ষিণ অঞ্চলটা দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল দক্ষিণে সুদূর অরণ্য এবং পশ্চিমে সমতল ক্ষেত্রে গমনাগমন উত্তর দিকের আবিষ্কৃত পথের চেয়ে সহজ-সাধ্য ফলে শত্রুপক্ষ এখান দিয়ে তাদের আক্রমণ করতে পারে ভেবে অনুতোষ খুবই চিন্তান্বিত। বেলা শেষ। আর দেরি করা যায় না। অনেক দূর যেতে হবে। পথে কিছু শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ করে নেবার মন করে শিবিরমুখী চলতে থাকে।

সন্ধ্যা রাতে পশ্চিম পাহাড়ের দিনের প্রহরী চৌকি থেকে ফিরে অধিনায়িকার নিকট শত্রু সেনার চলাচলের যে খবর পেশ করে তা আশু যুদ্ধের সম্ভাবনার ইংগিত বহন করছে। দেবযানী বুঝলো শত্রু তাদের অবস্থান এ পাহাড়ে ধরে নিয়ে যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু করেছে। কিন্তু আক্রমণ কোথা দিয়ে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টা অনুতোষের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় মুলতবী রেখে দেবযানী শিবিরকে শত্রুর চোখের আড়ালে (ক্যামুফ্লাজ) রাখার কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি শিবিরে উপস্থিত যোদ্ধাদের নিয়ে সেরে ফেলে। তারপর পরিখাতে প্রতিটি যোদ্ধার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এনে রাখে। অপসরণের গোপন পথটা একবার দেখে শিবিরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেবযানী চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে। অন্তর তার ক্লান্তি শ্রান্তি, দুঃখ বেদনা বিহীন সুখ-তৃপ্ত। স্বদেশের মুক্তির জন্যে অনুতোষের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করে সহমরণের অভীষ্ট পূরণের মুহূর্ত শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে। কিন্তু অনুতোষ আসছে না কেন? রাত্রি বেড়ে চলেছে। ক্ষীণ মশালের আলো নিবিড় অরণ্যের গাছপালা যেন

শিবিরের পরিবেশকে অদ্ভুত রহস্যময় করে তুলেছে। নিকটে কিংবা দূরে নৈশ-শ্বাপদের নানারকম কণ্ঠস্বর, চিংকার তাকে আরো ঘনীভূত করছে। আচম্বিতে পরিখার পশ্চিমদিকের জঙ্গল থেকে খস্‌খস্‌ শব্দ কানে আসতেই দেবযানী হুঁশিয়ার হয়ে পিস্তল নিশানা করে ঐ দিকে এগোতে থাকে। শব্দটা পরিখার ওধারে এসেই থেমে যায়। অন্ধকারে মনে হলো গাছের গুঁড়ির পাশে একটা কালো কিছু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। টর্চ-এর আলো ফেলতেই দেখে কুড়ুল কাঁধে পুঁটলি হাতে একটা মানুষ। দেবযানী অবাক। পিস্তলটা তাক-করা অবস্থায় এ-পাড় থেকে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কে?

—আমি মকবুল। ভাইজান কোথায়? নাম শুনেই পিস্তল নামিয়ে দেবযানী থমকে দাঁড়ায়। মনে পড়ে অনুতোষের মুখে এরই নামই সে শুনেছে। পরিখা পেরিয়ে তার কাছে গিয়ে হাত ধরে—এসো বলে তাকে শিবিরে এনে বসিয়ে বলে—তোমার ভাইজান খেয়েদেয়ে সেই যে বেরিয়েছে এখনো অবধি ফিরলো না। দক্ষিণ পশ্চিম পাহাড় থেকে হয়তো তোমাদের ঐ দিকে যেতে পারে।—সর্বনাশ দিদি, সর্বনাশ!! পুলিশ মিলিটারি রাত্র থেকেই এই পাহাড়ের ধারে এসে থানা গেড়েছে। হঠাৎ চুপি চুপি তাদের এখানে আসার কারণ কি? মনে পড়ে ভাইজান আমাকে সাবধান করেছিল তার খবর কেউ যেন জানতে না পারে। সন্দেহ হলো—তবে কি তার খোঁজেই এখানে সরকারী ফৌজের এত আমদানি! করি কি? ভাইজানকে পেতেই হবে। উতলা হয়ে উঠলাম, ঘরে থাকতে নারলাম। বিবিকে বলে ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম, ভিন্ন গাঁয়ের ভেতর দিয়ে পাহাড় উঠলাম। দক্ষিণ পুব পাহাড় তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। তারপর উত্তর পশ্চিম পাহাড়ে ঢুকলাম। রাত্রি নেমে এলো। কুছ্ পরোয়া নেই—আমি কাঠুরিয়া, হাতে কুড়ুল আছে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পুব দিকে নজর পড়তেই নিচে আলোর ফুলকি দেখতে পেলাম। তাকে নিশানা করেই নামতে নামতে এখানে এসে পড়লাম—ভাইজানের পাত্তা পেলাম, বলেই দেবযানীর হাতে পোঁটলাটা দিয়ে বসে পড়ে। দেবযানী মনোজকে ডেকে পোঁটলাটা দিয়ে মকবুলের জন্য খাবার আনতে বলে। খেতে খেতে মকবুল কেবলই বলে—ভাইজান এখনো এলো না, ভাইজান এখনো এলো না; তবে কি গুরু গাঁয়ের পথে নেমে গেলো? মকবুলের ভাবনা ও কথায় কোনো খেয়াল

জন্য দেবযানী সেবাশ্রমের মন্নু, লেংচা, ও ডাকবাংলোর চৌকিদার কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে। তার ছোটদিমণি ও দাদাজী ভাল আছে এখবর যেন চৌকিদার সুযোগ পেলে তার বড়দিমণিকে জানায়। এমন সময় অনুতোষ এসে দাঁড়িয়েছে। টর্চ-এর আলোতে মকবুলকে দেখেই সে তার কাছে ছুটে যায়। মকবুল ভাইজান ভাইজান বলে তাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর আদ্যোপান্ত তার গোচরে আনে। শুনে অনুতোষ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর তার হাত ধরে বলে—শত্রুর উপস্থিতি জানাবার জন্য তুমি যে ভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে এসেছ তার জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। এ এক ঐতিহাসিক বিরল দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতে আমাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে সম্প্রীতি, প্রেম প্রীতি, ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করবার প্রেরণা যোগাবে। তুমি আর দেরী করো না। তোমার সংবাদ মতো শত্রু যেভাবে সৈন্য সমাবেশ করেছে তাতে পাহাড় ঘিরে তারা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ শুরু করতে পারে। অনুতোষ সুবোধকে পুব পাহাড়ের গিরিসংকট পর্যবেক্ষণ এবং অপ্রয়োজনীয় বোধ হলে ওখানের প্রহরী ফিরিয়ে আনবার আদেশ দিয়ে মকবুলের হাত ধরে পরিখার ওপারে নিয়ে আসে। তারপর তার দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে—বিদায় বন্ধু বিদায়, বলে পেছন ফিরতেই মকবুল দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। পরমুহূর্তে—ভাইজান, ভাইজান, বলে কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলে ঢুকে যায়। নিশীথ রাতে মকবুলের কান্না জঙ্গল ভেদ করে ভেসে আসছে। শুনতে পাচ্ছে যেন তার দুঃখে সারা অরণ্য-জুড়ে অশ্রু বিগলিত নিশীথিনীর গুমরনো কান্না। অনুতোষ থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনুতোষ ফিরছে না কেন? উদগ্রীব দেবযানী পরিখার ও-ধারে গিয়ে দেখে সে প্রতিমূর্তিবৎ জঙ্গলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।—কি হলো, বলে দেবযানী তার হাত ধরতেই, অনুতোষ ঘুরে দাঁড়িয়ে—চলো, বলেই হাঁটতে থাকে। শিবিরে এসে অনুতোষের উন্মনাভাব কেটে যায়। কর্মতৎপর হয়ে দেবযানীর সঙ্গে শিবির পরিক্রমা কালে তার যুদ্ধোদ্যোগপর্ব এবং শত্রুর প্রথম আক্রমণ বোমাবারা প্রতিহত করবার ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়ে তাকে বাহবা দেয়। দেবযানীকে বিশ্রাম করতে বলে অনুতোষ শিবির পাহারার ভার নিয়ে নেয়। ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখে—ভোর হতে আর দেরি নেই। কিন্তু সুবোধ ফিরছে না কেন! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অনুতোষ অস্থির হয়ে শিবির পরিক্রমা করছে।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠেছে। সুবোধ এসে উপস্থিত। তার প্রদত্ত সংবাদ যেমনি উদ্বেগজনক তেমনি গুপ্তচর নিধনের কর্মটিও সাহসিকতা ও দক্ষতার পরিচায়ক। এ পাহাড়ে আমরা রয়েছি শত্রু নিশ্চিতভাবে তা ধরে নিয়েছে। তবে আমাদের অবস্থান পাহাড়ের কোথায় কোন অঞ্চলে তা নির্ধারণ করেই গুপ্তচর পাঠিয়ে অনুসন্ধান করছে। সুতরাং গুপ্তচর ফিরে যাওয়া না-যাওয়ায় শত্রুর ধারণার বিশেষ হেরফের ঘটবে না। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পশ্চিম ও পুব পাহাড়ের গিরিসংকট চৌকি থেকে প্রহরী ফিরিয়ে এনে শিবিরের পাহারা ও শক্তিবৃদ্ধি করা জরুরী বলে স্থিরীকৃত হয়।

দেবযানী অনুতোষকে ছেড়ে দিয়ে শিবিরে ভার নিয়ে নেয়। শিবিরে মাত্র দু'জন যোদ্ধা। কুচকাওয়াজ না করিয়ে প্রাতরাশের পর তাদের ফলমুল সংগ্রহ ও শিকারে পাঠিয়ে দেয়। বেলা হয়েছে। পশ্চিমের চৌকি থেকে কোন প্রহরী এখনও অবধি খবর নিয়ে এলোনা। অনুতোষ খুবই চিন্তিত, প্রাতরাশের পর সুবোধকে খাবার সহ গিরি সংকটে পাঠিয়ে অনুতোষ নিজে পশ্চিম পাহাড়ের চৌকিতে খাবার নিয়ে শিবির পরিত্যাগ কালে দেবযানীকে ডেকে শিবিরের পশ্চিম দিকের বেরোবার সঙ্কীর্ণ পথটা বন্ধ করে দিতে বলে। শুনে দেবযানী হেসে বলে—কেন যুদ্ধ করতে করতে পশ্চাদপসারণের অভিসন্ধি কি বাতিল হলো? অনুতোষ দেবযানীর কথা শুনে তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক! তাতে চিন্তা ভাবনা দুঃখ বেদনার লেশ মাত্র নেই। অধিকন্তু মনে হলো তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বুঝি আর দেরী নেই ভেবে আনন্দোজ্জ্বল। উৎকণ্ঠিত অনুতোষ দেবযানীকে লক্ষ্য করে বলে—শত্রু কোন দিক থেকে আক্রমণ করবে বুঝতে পারছি না। আমাদের শিবিরের খোঁজে হয়তো ইতিমধ্যেই তারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সাবধান—শিবিরে তুমি একা, বিপদের আঁচ পাওয়া মাত্র তিনবার বন্দুকের শব্দ করবে!

চিন্তা ভাবনা পীড়িত অনুতোষ শিবির থেকে বেরিয়ে চক্ষুকর্ণ সজাগ রেখে দ্রুত চলেছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠবার মুখে উপরদিকে চাইতেই দেখে মনোজ হাত তুলে তাকে দাঁড়াবার ইশারা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই শিবিরের দক্ষিণ-পুব থেকে বন্দুকের শব্দ ভেসে আসে। অনুতোষ অস্থির হয়ে মনোজের অপেক্ষা করছে। সে এসে যা বললো তাতে বোঝা গেল শত্রু সৈন্য দক্ষিণের অরণ্যের দিক থেকেই পাহাড়ে

উঠছে। চৌকি থেকে অনিলকে নিয়ে মনোজকে সত্বর শিবিরে ফেরার আদেশ দিয়ে অনুতোষ হন্তদন্ত হয়ে শিবিরে পৌঁছে দেখে সশস্ত্র দেবযানী একাই পরিখার কোণের সরু পথটা যে সব কাটা গাছ ও ডালপালা রয়েছে তা দিয়ে বন্ধ করতে ব্যস্ত। অনুতোষ হেসে বলে—ধন্যি মেয়ে।

—কেন, যাবার কালে কি বলেছিলে? দুন্দুভি ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। স্বর্গের তোরণ তৈরি করছি। তা, তুমি একা যে! অন্যরা কোথায়?

—তারা আসছে, চৌকি থেকে শত্রুর সৈন্যের চলাচল দেখে তাদের ধারণা শত্রুসৈন্য অরণ্যের পথে পাহাড়ে উঠে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সন্ধান করছে। কিন্তু তুমি যাদের ফল আহরণ ও শিকার করতে পাঠিয়েছিলে তারা কোথায়? তাদের কি অস্ত্র দিয়েছিলে? ঐ বন্দুকের শব্দই বা কোথায় হলো এবং কে করলো? উত্তরে দেবযানী বলে—তাদের শিকারের জন্য বোধ হয় একটা ত্রিচলোডার দিয়েছিলাম। তারা ফিরছে না দেখে আমিও উদ্বিগ্ন। যাক আমার কাজ শেষ। অনুতোষ ব্যারিকেডটা দেখে দেবযানীকে খুব তারিফ করে। তারপর—আমি বেরুচ্ছি। সরোজ নিশিথের খোঁজ নেওয়া দরকার, বলে শিবির থেকে বেরুবার মুখে দেবযানী তার পথ অবরোধ করে বলে—এখন থেকে তোমাকে আমি একা বেরোতে দেবনা। যেতে হয়তো দু'জনে একসঙ্গে যাব। দেবযানী ছন্দোবদ্ধ কণ্ঠে বলে :

উত্তরী ফেলে পরেছি বর্ম ধরেছি হাতিয়ার।
মাভৈঃ মাভৈঃ বাজছে ভেরি ॥
ভৈরবের সাথে চলি হাতে হাত ধরি ॥

অনুতোষের হাতে হাত রাখতেই সে দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। আলিঙ্গন ও চুম্বনে বিহ্বল দেবযানী অনুতোষকে জোরে জড়িয়ে ধরে। সেই মুহূর্তেই শিবিরের বাইরে গোলমাল কানে আসতেই অনুতোষ দেবযানীকে ছেড়ে ঐ দিকে ছুটে যায়। দেবযানীও তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে। বাইরে এসে দেখে মনোজ ও অনিল কুড়ুল কাঁধে ভিখিরি মতো একটা ছেলেকে আটকে রেখেছে।—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বলে সে চেঁচামেচি করছে। কাছে গিয়ে অনুতোষ ছেলেটিকে দেখে অবাক। তার হাত ধরে কাছে এনে আদর করে জিজ্ঞাসা করে—তুই এখানে কি করে এলিরে লেংচা? এই বিপদের মধ্যে কে তোকে এখানে নিয়ে এল। লেংচা অনুতোষকে প্রণাম করে উঠে

দাঁড়াতেই দেবযানীকে দেখে তাকেও প্রণাম করে খাবার থলেটা তার হাতে দিয়ে বলে—দাদাজী, মকবুল চাচার নিকট তোমার খবর শুনে রঘুজী, চৌকিদার জ্যাঠা অস্থির হয়ে পড়েছে। তখন আমি বলি—আমাকে যেতে দিলে আমি দাদাজীর খবর এনে দিতে পারি। রঘুজী শুনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর ঘরে ঢুকে যান। থলে ভর্তি খাবার নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে বলেন—যাও, কিন্তু সাবধান। যুদ্ধ লেগে থাকলে আর ও-মুখো হবেনা। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। মকবুল চাচাকেও সেভাবে হুঁশিয়ার করে দেয়। চাচার সঙ্গে এসে রাত্রে তার বাড়ি থাকি। রাতের ঘোর থাকতে থাকতেই কুড়ুল কাঁধে খাবারগুলো দুই ঝোলায় ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দূর থেকে আমাদের দেখেই সান্ত্রী হাঁক পাড়ে—দাঁড়া। অন্য এক সিপাহী দৌড়ে আসে। কুড়ুল কাঁধে দেখে কাঠুরিয়া ধরে নিয়ে ঝোলাটা দেখে ছেড়ে দেয়। আমরা জঙ্গলে ঢুকে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠি। ওঠা নামা করে করে চাচা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলে—ডান বাঁ না করে সোজা নেমে গিয়ে ভাইজানকে দেখে আয়, বলে ঐখানেই বসে পড়ে।

লেংচার কথার মাঝখানে গিরিবর্ত থেকে প্রহরী তুলে নিয়ে এসে সুবোধ যা বললে তাতে বোঝা গেল শত্রু সৈন্য অরণ্যের দিক থেকে পুব পাহাড়ে উঠে গিরি সংকট ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চলেছে। এভাবেই নিশ্চয়ই তারা পশ্চিম পাহাড়ে উঠে উত্তরমুখী এগিয়ে এ পাহাড় ঘিরে ফেলে আক্রমণ আরম্ভ করবে। সুতরাং যুদ্ধ যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে। এ সময়ে সরোজ ও নিশিথ এসে উপস্থিত। তাদের একজনের কাঁধে একটা হরিণ অন্যজনের এক কাঁধে ঝোলা ভর্তি ফল মূল ও অন্য কাঁধে রিভলোভার-এর পরিবর্তে বন্দুক। দেবযানী বুঝলো এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার জন্য সে-ই দায়ী।

অমুতোষ দেবযানীকে সকলকে নিয়ে শিবিরে গিয়ে তার রক্ষার ব্যবস্থাদি এবং বিপদের আঁচ পেলে দু'বার বন্দুকের আওয়াজ করতে বলে ঝোলা থেকে লেংচার জন্য কিছু খাবার নিয়ে তাকে মকবুলের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য তার হাত ধরে রওনা দেয়।

দেবযানী উভয় সঙ্কটে পড়েছে—একদিকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় শিবির রক্ষার দায়িত্ব অন্যদিকে অমুতোষকে একা ছেড়ে দেওয়া। দাদার উক্তি মনে পড়ে—সে যোদ্ধা, যুদ্ধকালীন নিয়মানুবর্তিতা তাকে অবশ্যই পালন

করতে হবে। সুতরাং অনুতোষকে লক্ষ্য করে—শীগ্‌গির এসো, বলে সে শিবিরে ফিরে যায়।

লেংচা খেতে খেতে অনুতোষের হাত ধরে চলেছে। বন জঙ্গল ভেঙে পাহাড় বেয়ে লেংচা নির্দেশিত স্থানে এসে দেখে মকবুল নেই। এদিক ওদিক খোঁজ নিয়েও তার সন্ধান মিলে না। অনুতোষ খুবই চিন্তিত—সে গেল কোথায়? নাকি শত্রুর খপ্পরে পড়েছে। চিৎকার দিয়ে যে ডাকবে শত্রুর ভয়ে তারও উপায় নেই। বেলা পড়ে আসছে। আর তো দেরী করা যায় না। অগত্যা লেংচা একা যেতে পারবে কিনা সে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে লেংচা বলে—না, সে যাবে না। তাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করবে। অনুতোষ অবাক। —বলিস কি। তুই কি কোন হাতিয়ার ধরতে জানিস যে যুদ্ধ করবি? তুই ফিরে না গেলে রঘুব কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছিস্—সেবাশ্রম নষ্ট হয়ে যাবে। যাক ওসব কথা ছাড়, তুই একা যেতে পারবি, নাকি আমি তোকে নামিয়ে দিয়ে আসবো? লেংচা খানিক চুপ করে থেকে বলে—না, দাদাজী, তার দরকার নেই। চাচার সঙ্গে যে-পথ দিয়ে এসেছি সে পথ ধরে আমি অনায়াসে নেমে যেতে পারবো। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, বলেই সে অনুতোষকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। অনুতোষ তাকে জড়িয়ে ধরে, তারপর তার হাত ধরে কিছুদূর চলে থেমে যায়। লেংচা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বনপথে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুতোষ বিষন্ন—মনে হলো এক অতি আত্মজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অনুতোষ জোর কদমে শিবিরের দিকে চলেছে। ওদিকে শিবির অধিনায়িকা দেবযানী মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে শিবির থেকে বেরিয়ে অনুতোষের আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে করে ফিরে যাচ্ছে। সন্ধ্যানাগাদ অনুতোষ শিবিরে পৌঁছে। লেংচার খোঁজে মকবুল এসে ফিরে গেছে জেনে তার সম্পর্কে অনুতোষের দুশ্চিন্তার লাঘব হয়। তবে দুঃখ রয়ে গেল—তার সঙ্গে শেষ দেখা আর হলো না। চলতে চলতে শিবিরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবযানী হাসতে হাসতে বলে—আমার অবস্থা হারাধনের মতো। বর্ত্তমানে হাতে আছে মাত্র চার।

চারও হাসতে হাসতে জবাব দেয়—ছেলেরা তোমার সংকেত পেলে অভিযান অবশ্যই পূর্ণ করবে। কি বলো।—তা যা বলেছ। শিবির রক্ষার ব্যবস্থাপনা দেখবে চলো।—ও আর কি ইতিপূর্বে পাহাড়ের যুদ্ধে তোমার (sharp shooting) গুলি

ছোঁড়ার নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছি; পথ-চলার কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে এসে তোমার ব্যূহরচনার দক্ষতা দেখে দাদার কথা উল্লেখ করে কি বলেছিলাম, মনে পড়ে?—দাদার কথা মনে পড়তেই অনুতোষ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—হায়, দাদা যে কোথায় গেলেন, কি যে হলো। বড়দাও বা কি করলেন। স্মৃতি-ক্লিষ্ট উভয়েই খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবযানী নীরবতা ভঙ্গ করে বলে—চলো। অনুতোষ সাড়া দেয়—হাঁ। উভয়েই পরিখার দিকে এগোতে থাকে। সুবোধও এসে যোগ দেয়। যুদ্ধকালে যোদ্ধাদের কিভাবে (deploy) ছড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তা ঘুরে ঘুরে দেখে। সব কিছুই সুষ্ঠু ও সুকৌশলে করা হয়েছে যাতে যুদ্ধের সংকট মুহূর্তে সে ও দেবযানী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। শিবিরে রাতের আহার শেষে সুবোধ বাইরের চৌকিতে খাবার দিয়ে আসে। অনুতোষ সকলকে বিশ্রাম করতে বলে নিজেই প্রহরীর কাজ নিয়ে নেয়। বাইরে বন্য শ্বাপদের হুংকার চিৎকার রাতের আঁধার আলোড়িত। এরই মধ্যে আচম্বিতে পশ্চিম চৌকি থেকে তক্ষকের কণ্ঠধ্বনি শুনে অনুতোষ সে দিকে দৌড়ে যায়। প্রহরীর নির্দেশে পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখে—দূর পাহাড়ের নানা জায়গায় মিটমিটে আলো। প্রহরীকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে ভেতরে এসে অনুতোষের মনে হলো বিশ্রামরত যোদ্ধারা তক্ষকের কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেয়েছে। ফলে নিদ্রাহীন অবস্থায় তারা অস্থির চঞ্চল।

কবি গালিবের গাঁথার যথাযথ চিত্র:
কোই উম্মিদ বার নাহি আতি
....
মৌত কা এক দিন মোয়া ঐন হ্যায়
নিদ কিউঁ রাত ভর নেহি আতি॥
তাৎপর্য:
কোন খানে নেই আশার আলো,
....
মরণের দিন স্থির হয়েছে—,
সারা রাত কেন চোখে নামেনি ঘুম?

অনুতোষ তাদের উদ্দেশে তক্ষকের কণ্ঠধ্বনি ব্যাখ্যা করতেই অস্থিরতা দূর হয়ে বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি তাদের কণ্ঠে গর্জে উঠে অন্ধকারে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যেন বাদলা দিনের জল-ভরা মেঘের গুরুগম্ভীর নাদ যে কোন মুহূর্তে অজস্র বৃষ্টিধারায় ফেটে পড়বে।

ভোর হয়েছে। আকাশ হতে রক্তরাঙা প্রভাত আলো জাগো জাগো বলে যেন তাদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। উল্লসিত হয়ে তারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে পড়ে। প্রাতঃক্রিয়া শেষে প্রাতঃবাশ, তারপর চৌকির প্রহরী বদল। উৎসাহে উদ্দীপ্ত সশস্ত্র যোদ্ধারা নিঃশঙ্ক চিত্তে শত্রুর মোকাবিলা করতে দাঁড়িয়েছে। পরিখায় দাঁড়ানো অনুতোষের সঙ্গে দেবযানীর সহাস্য দৃষ্টি বিনিময়—তাদের না-বলা অনেক কথাবই বুঝি অভিব্যক্তি।

এভাবেই বেলা গড়িয়ে চলেছে। সূর্য মধ্যগগন ছোঁয় ছোঁয়। এমনি সময় শিবিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমের চৌকি থেকে যুগপৎ ঘুঘু ডেকে ওঠে। অনুতোষ ছুটে গিয়ে ঘটনাটা শুনে প্রহরীদের ফেরার সংকেত দেয়। তারা শিবিরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আগমণ নিষ্ক্রমণের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যোদ্ধারা পরিখাতে দাঁড়িয়ে বন্দুক তাক করে শত্রুর প্রতীক্ষা করছে। সময় বয়ে চলেছে—শত্রুর দেখা নেই। হঠাৎ শিবির অধিনেত্রী দেবযানীর নজরে পড়ে দূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকের জঙ্গলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রবল আলোড়ন চলেছে—শত্রু সৈন্য তাদের খোঁজ করতে করতে এগোচ্ছে। এ খবর বিদ্যুৎ গতিতে পরিখায় ছড়িয়ে পড়ে। অনুতোষ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তারা গুলির পাল্লার মধ্যে না-আসা পর্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। বেলা শেষ। পশ্চিম গগনের সূর্য রশ্মি গাছের ফাঁকে ফাঁকে তেরছা হয়ে সম্মুখের জঙ্গলে পড়ে তার আলোড়ন দৃশ্য আরো প্রকট করেছে। আচম্বিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। অনুতোষ বুঝলো সন্ধ্যা সমাগমে সামরিক প্রথা মতো শত্রু সৈন্যের কার্যকলাপ সাময়িক বন্ধ হলো। আগামীকাল তা পূর্ণোদ্যমে শুরু হবে। নিজেদের অবস্থান লুকোবার উদ্দেশ্যে শিবিরে আলো চলাচল, উল্লাস কিংবা রণধ্বনি নিষিদ্ধ। বিপ্লবী যোদ্ধারা যুদ্ধ না হওয়াতে ম্রিয়মান। মনকে চাঙা রাখবার মতো কোন ধ্বনিও দেওয়া যাচ্ছে না। রাত্রির আহার শেষে বিশ্রামের আদেশ দিয়ে অনুতোষ তাদের বলে,—বন্ধুগণ

শত্রুর অগ্রগতির সাময়িক বিরতি তাদের আগামী দিনের নির্ভুল লক্ষ্যে অগ্রসর ও প্রচণ্ড যুদ্ধের আভাস। সুতরাং আমাদের মুহূর্তমাত্র অবসর নেই—সর্বক্ষণ যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাদের উপস্থিতি মাত্রই সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন করতে হবে। মাভৈঃ। মাভৈঃ ॥

অতন্দ্র অনুতোষ পরিখা ঘুরে রাতের টহল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে শ্বাপদের আর্তনাদ ও পাখির কোলাহল নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার চিড়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গাছপালার আবরণে আকাশ স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর না হলেও অনুমান রাত্রি দ্বিপ্রহর। হঠাৎ ব্যারিকেডের বাইরে একটা অস্বাভাবিক শব্দে অনুতোষ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। পরিখার গা ঘেঁষে ব্যারিকেডের ফাঁক দিয়ে বাইরের জঙ্গলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু নজরে আসে না, শব্দটা দ্বিপদ না চতুষ্পদ জন্তুর তা বোঝা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দটা আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। অনুতোষ খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। সুবোধ এসে প্রহরীর কাজ বুঝে নেয়। ঘটনাটা তার গোচরে এনে অনুতোষ তাকে সাবধান করে। অস্বাভাবিক কিছু দেখা মাত্রই পেচকের কণ্ঠের কিচির মিচির ধ্বনি দিয়ে তা ঘোষণা করতে বলেই অনুতোষ বিশ্রাম করতে যায়।

ভোর হয়েছে। শিবির জেগে উঠেছে। ব্যূহে আবদ্ধ হয়ে থাকার দ্বিতীয় দিনের আরম্ভ। প্রাতঃকৃত্যাদির পর কুচকাওয়াজ করিয়ে দেবযানী স্বহস্তে যোদ্ধাদের প্রাতঃরাশ পরিবেশন করে। সকলেই উৎসাহে উদ্দীপ্ত। কিন্তু তা প্রকাশের উপায় নেই। সব কিছুই চলেছে শব্দহীন নীরব পরিবেশে। সশস্ত্র যোদ্ধারা পরিখায় স্থান নিয়েছে। সুবোধ এসে প্রত্যেকের বন্দুকের নল, টিপকল (ট্রিগার) পরীক্ষা করে আপন স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। অনুতোষ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শত্রু সৈন্যের প্রতীক্ষা করছে। দেবযানী নব-যোদ্ধ-বেশে রাইফেল কাঁধে নিয়ে এসে পরিখাতে স্থান গ্রহণ করে ক্ষণেকের জন্য বুঝি অনুতোষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। পরিখাতে ব্যারিকেডের ফাঁক দিয়ে যোদ্ধাদের দৃষ্টি সম্মুখের জঙ্গলে নিবদ্ধ। শত্রুর মোকাবিলা করতে সকলে অধীর উদগ্রীব। হঠাৎ অনুতোষের কণ্ঠোত্থিত সাংকেতিক হুশিয়ার পরিখাতে ছড়িয়ে পড়ে। তার নজরে আসে সম্মুখের জঙ্গলে প্রবল আলোড়নের, ফাঁকে ফাঁকে চলমান উর্দীধারী শত্রুসেনা। জঙ্গলের নড়াচড়া থেকে প্রথমে শত্রু-সৈন্যের গতি কোন দিকে তা বোঝা যায়নি। কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল তারা ব্যারিকেডের দিকেই এগোচ্ছে।

বিগত রাত্রে ব্যারিকেডের বাইরে যে খচখচ শব্দ শোনা গেছে তা কোন চতুষ্পদ শ্বাপদের নয়, দ্বিপদ বিশিষ্ট নিশ্চই শত্রুর গুপ্তচরের। নচেৎ এই বন্ধুর ঘন জঙ্গলে তাদের অবস্থান সঠিক নিরূপণ খুবই কঠিন ছিল।

অনুতোষের অদূরে দাঁড়ানো দেবযানীর প্রাণে শত্রুর অগ্রগতি দেখে কবিত্ব জাগে :

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন।

সেই মুহূর্তে অনুতোষের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখে তার দৃষ্টি অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো সমুখ-পানে নিবদ্ধ। তাতে শুধু লেখা আঘাতে পর আঘাত হেনে শত্রুকে ছিন্ন ভিন্ন করে নিঃশেষ করো। মৃত্যুকে হেরিয়া কেন কাঁদি—জীবন তো মৃত্যুর সমাধি বলে কিছু নেই। ওতো বুঝি এক মহা-সঙ্গীত ধ্বনি। দেবযানির ইচ্ছা হলো জীবন-রঙ্গমঞ্চের শেষ অভিনয় মুহূর্তে অনুতোষকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তা বুঝি আর হবার নয়।

দলে দলে শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসছে। পূর্ব নির্দেশ মতো শত্রু যে দিক দিয়ে আক্রমণ শুরু করবে পরিখাতে সেদিকেই বিপ্লবী যোদ্ধারা সমান দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। শত্রু বোমার পাল্লার মধ্যে আসা মাত্রই বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ। ইংরেজের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পিছু হটে যায়। বিপ্লবীদের উল্লাসের সঙ্গে চলেছে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি। সে ধ্বনি শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টি করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই বিপ্লবীদের উচ্চ-কণ্ঠে সঙ্গীত শোনা যায় :—

দামামা ঐ বাজে,
দিন বদলের পালা এলো ঝড়ো যুগের মাঝে।

দেবযানী পরিখা থেকে উঠে এসে যোদ্ধাদের খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করে। আহার শেষে বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় তাদের হৃদয় নিঙড়ানো কণ্ঠ গীতি :

বজ্র ডাকে শূন্য তলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো দুঃখরাতের রাজা॥

সূর্য মধ্য গগন ছোঁয় ছোঁয়। পরিখাতে বিপ্লবীরা শত্রুর মোকাবিলা করতে অধীর উতাল। সেই মুহূর্তে অমুতোষ হাঁক পাড়ে—বন্ধুগণ তৈরী হও। শত্রুসেনা প্রবল বিক্রমে ছুটে আসছে। এই চরম মুহূর্তে মহারাজ কণ্ঠশ্রুত গীতার বাণী তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই :

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ

(স্বদেশ সধর্ম রক্ষার্থে এরূপ যুদ্ধেই ক্ষত্রিয়েরা সুখী)

বিপ্লবীদের উল্লসিত বন্দেমাতরম্, বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ মুর্দাবাদ ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করতে করতে গাছের ডালপালা উড়িয়ে শত্রু সেনা এগিয়ে আসছে। শত্রু গুলির পাল্লার মধ্যে আসা মাত্রই বিপ্লবীদের বন্দুক গর্জে ওঠে। অগ্রসরমান শত্রু সেনা গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনির সঙ্গে চলেছে তাদের হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠ-গীত :

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কতো প্রাণ হ'লো বলিদান
লেখা আছে অশ্রু জলে ॥

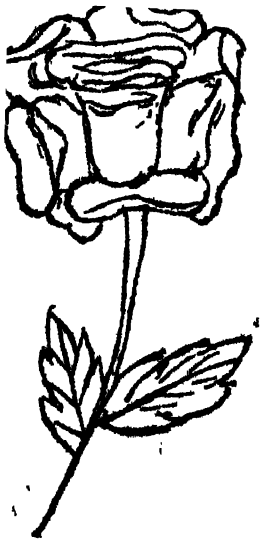
এভাবেই চলেছে অসম-সাহসিক গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। শত্রুপক্ষের অবিরল গুলি বৃষ্টিতে ব্যারিকেডের আঁট ক্রমে ক্রমে খসে পড়ছে। বিপ্লবীদের আড়ালে রাখবার মতো আর নেই কোন আচ্ছাদন আবরণ। উন্মুক্ত আকাশের নিচে চলেছে বন্দুকের লড়াই—কণ্ঠপাকড়ি লড়ালড়ি! সেই সঙ্গে চলেছে উচ্চ-কণ্ঠে দিক-প্রকম্পিত বন্দেমাতরম্ বিপ্লব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মুর্দাবাদ ধ্বনি। এই মরণপণ যুদ্ধে বিপ্লবীরা একে একে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ছে। ভগ্ন ব্যারিকেডের গুঁড়ির আড়াল থেকে দেবযানীর রাইফেল অবিরত অগ্নি উদগীরণ করে শত্রুকে ধরাশায়ী করছে। তার কিছু দূরে শত্রু-নিধনে চলেছে অমুতোষের অবিরাম গুলি বর্ষণ। এমনি সময় হঠাৎ একটা গুলি এসে দেবযানীকে আঘাত করে। সে অমুতোষ বলেই ঢলে পড়ে। দেবযানীর কাতর আহ্বান শোনা মাত্রই অমুতোষ ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। সেই মুহূর্তে পর পর শত্রুর কয়েকটা গুলি এসে উভয়কে ঝাঁঝরা করে দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে যুগলে লড়াইয়ের আকাঙ্খা পূর্ণ করে দেবযানী সহমরণ বরণ করলো।

আর অশুতোষ মাতৃভূমির মুক্তি-যুদ্ধে জীবন দিয়ে শৌর্য বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রণয়িনীর প্রত্যাশা পূর্ণ করে প্রেমের মর্য্যাদা রাখলো।

রাতের আঁধার ধীরে ধীরে নেমে এসে ধরণীকে গ্রাস করল। বিপ্লবীদের শিবিরে নেমে এলো শ্মশানের নিস্তব্ধতা। আকাশে বাতাসে বেদনভরা রোদনের রোল উঠেছে।

বাংলার এক ক্ষুদ্র বিপ্লবী দলের স্বাধীনতা সংগ্রামের যবনিকা পতন হলো। রেখে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে আত্মাহুতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর॥

শহিদের রক্তমাখা রথের চূড়ে।
স্বাধীনতার বিজয় কেতন উড়ে॥
বন্দেমাতরম্।



উপসংহার

সে রাত্রে সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ থানা ও পুলিশ চৌকি আক্রমণ শেষে জঙ্গলের ঘাঁটিতে ফিরে মহারাজ শুধু অনুপকে দেখতে পান। সুরেশ, অজয় ও বিপুল তখনও ফেরেনি। ওরা কি তবে পথ হারিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এখন উপায়! এই দুর্গম নিবিড় পার্বত্য-অরণ্যে ওদের খুঁজে বার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! চিন্তান্বিত মহারাজ শেষ চেষ্টা হিসাবে ঘাঁটির চতুর্দিক ঘুরে উচ্চকণ্ঠে দলীয় সাংকেতিক আহ্বান জানান। না, কোন সাড়া নেই – বৃথা চেষ্টা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নিবারণ, অনুতোষ এবং নিজের অবস্থা বিশ্লেষণের পর মহারাজ এই অঞ্চল অগোণে পরিত্যাগ করাই স্থির করে বিষয়টা চিরঞ্জীব ও অনুপের গোচরে আনেন। টর্চের আলোতে একখানা মানচিত্র খুলে তিনি মনযোগের সঙ্গে দেখে অঙ্গুলি নির্দেশে ওদের দু'জনকে গন্তব্য স্থল এবং গমনের পথ দেখিয়ে উঠে দাড়ান। তারপর দৃপ্ত কণ্ঠে :

'মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।'

আবৃত্তি করে বন্দেমাতরম বিপ্লব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে মাভৈঃ মাভৈঃ বলতে বলতে তিনি চিরঞ্জীব ও অনুপকে নিয়ে দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল গিরিপথে যাত্রা করেন।

ব্রিটিশরাজ তার সন্ধানে সারা পবত অরণ্য খুঁজে বিফল হয়ে সীমান্ত চৌকি ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যকে এই বিপজ্জক বিপ্লবী সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত অঞ্চলের পবত অরণ্য অতিক্রম করে, মগের

মুল্লুক ছাড়িয়ে আরাকান পর্বতমালা লঙ্ঘন করে, ইরাবতী পার হয়ে কিরূপ অসীম আত্মবিশ্বাস, দুর্জয় সাহস ও সুচতুর রণকৌশলে মহারাজ মিত্থ্ পৌঁছলেন সে বিস্ময়কর বিচিত্র অমিত-বিক্রম কাহিনী এক বিশাল পর্ব !

তারপর বর্মার বিপ্লবী বিদ্রোহীদের এমন কি এক সহাধ্যায়ীর সহযোগে কমুনিষ্টদের সঙ্গে মিশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নানাভাবে নানা স্থানে অরণ্যে পর্বতে সুদীর্ঘকাল অক্লান্ত লড়াই করে চলেন। অবিশ্বাস্য ভয়লেশহীন তাঁর সেই যুদ্ধাভিযানের আখ্যান ! অবশেষে থারাওয়াড্ডির অদূরে টহলদার শত্রুসৈন্যের সঙ্গে সারাদিন ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে বাঙলা-মায়ের চিরবিপ্লবী সন্তান—মহারাজ এক অদ্বিতীয় অমর কীর্তি রেখে গেলেন—যা গানে গাথায় বন্দনীয় এবং ভাবী বংশধরদের প্রেরণা যোগাবে।

স্বাধীনতার বেদীমূলে
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করি রক্ত-পদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছি তারে ;
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।
আমেন : স্বস্তি !!

